তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০ (৩৩০০)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৩ (২২০০)

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এম.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও আর. রায় কর্তৃক সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৫১ রামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা	শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	✓০
কীর্তিহাটের কড়চা প্রথম খণ্ড	... ...	১
মঞ্জরী অপেরা প্রথম পর্ব	... ...	২৫৭
বিপাশা	... ...	৪২৫
গ্রন্থ-পরিচয়	... ...	৫২৬
কীর্তিহাটের কড়চা উপন্যাসের রায়বংশের বংশলতিকা	...	৫৩৪
কীর্তিহাটের কড়চা উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র তালিকা	...	৫৩৫

ভূমিকা

১

সর্বাগ্রে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করি যে, যে-কাজ আমি করতে বসেছি তাতে আমার অধিকার নেই। যদিচ আমি এই রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলীর সর্বকনিষ্ঠজন, তবু এ কাজে হাত দেওয়া আমার উচিত ছিল না। কারণ কোন লেখকের রচনার গুণাগুণ বিচার ক'রে পাঠকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার দুর্লভ অধিকার আর যারই থাকুক লেখকের পুত্রের হাতে না থাকলেই ভাল হয়। বিশেষ করে সে পুত্র যদি সে কর্মের যোগ্য না হয়। আমার সে যোগ্যতা নেই, তা সত্ত্বেও এ দায়িত্ব আমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়েছে।

এর কারণ আছে। সেই কারণটিই এখানে সর্বাগ্রে নিবেদন করি। তারাশঙ্কর বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলি প্রথমেই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান মুহূর্তে তারাশঙ্করের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা যথেষ্ট থাকলেও উপন্যাস দু-একখানি ছাড়া অপ্রকাশিত নেই।

সেই অপ্রকাশিত উপন্যাসের একখানি 'কীর্তিহাটের কড়চা'। যদিও এ রচনাটি সাময়িক পত্রে প্রায় পনের বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল, এটি তারাশঙ্কর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে দেননি। প্রকাশ করতে না দেবার কারণ ছিল উপন্যাসখানি পুনর্লেখনের অভিপ্রায়। অথচ এই বিষয়টি তাঁর ধ্যানে অন্তত দশ বারো বছর ছিল এবং বিষয়টি নিয়ে 'কীর্তিহাটের কড়চা' লেখার আগে আরও দুবার লিখেছিলেন। সে রচনাগুলিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

'কীর্তিহাটের কড়চা' প্রায় আড়াই বছর ধরে স্থূল কিস্তিতে প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছিল। সেও অনেক কাল আগের কথা। বহু পূর্বে লেখা এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি বলেই বিদগ্ধ রসিকজনেরাও স্বভাবতই এর সঙ্গে পরিচিত নন।

সেই কারণেই 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনাবলীতে প্রথম প্রকাশের সময় প্রকাশনের কর্তৃপক্ষ আমাকে এর পরিচয়-পর্বটুকু সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমার কাজ রচনাটিকে পাঠকের সঙ্গে শুধুমাত্র পরিচিত করে দেওয়া। এর সাহিত্য-বিচার আমার বিষয় নয়। তবে সেই প্রসঙ্গে রচনার পৃষ্ঠপট-সংক্রান্ত কিছু কথা পাঠকের কৌতুহল পরিতৃপ্ত করতে পারবে।

২

'কীর্তিহাটের কড়চা' তারাশঙ্করের পরিণত জীবনের শেষাংশের শ্রেষ্ঠতম রচনা বলেই আমার বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, এ উপন্যাস কলেবরে তারাশঙ্করের সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনের বৃহত্তম রচনা। 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনাবলীর মাপে কম বেশী এগারশো বারশো পৃষ্ঠার গ্রন্থ এবং এটি রচনাবলীতে ক্রমান্বয়ে এই খণ্ড থেকে পরবর্তী আরও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

উপন্যাসখানির কালসীমা কমবেশী দেড়শো বছর, ছেদহীন দেড়শো বছর। 'পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট' উপন্যাসখানির মেরুদণ্ড। উপন্যাসের মূল আখ্যানের আরম্ভ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরম্ভের সঙ্গে, সমাপ্তি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমাপ্তি ঘোষণা দিয়ে। তবে স্বাভাবিক আরম্ভেরও আরম্ভ আছে, সমাপ্তির পরও যে শেষ থাকে সেই সুশেষ আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ও পরে সেই অংশটুকুও সেই কারণেই আছে স্বাভাবিকভাবেই।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকক্ষ থেকে মেদিনীপুর জেলার 'কংসাবতী বারি-বিধৌততট বনছায়াশীতল' গ্রাম কীর্তিহাট পর্যন্ত এর কাহিনী প্রসারিত। কুড়ারাম ভট্টাচার্য ওরফে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য থেকে অধস্তন সপ্তম পুরুষ সুরেশ্বর রায় পর্যন্ত এর কাহিনী। সাত পুরুষের কাহিনী। যার আরম্ভ কীর্তিহাটে তার শেষ মধ্য কলকাতার জানবাজারে। সাতপুরুষে রায়বংশে মানুষ কম নয়। পুরুষ স্ত্রীলোক ধরে প্রায় পঞ্চাশজন। রায়বংশের সাতপুরুষের এই প্রায় পঞ্চাশজন মানুষকে ঘিরে এর কাহিনীর আবর্তন বিবর্তন। এঁরাই কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে। এঁদের মাঝখানে রেখে আরও অন্তত শতাধিক চরিত্র উপন্যাস ও কাহিনীর অংশ হয়ে উপন্যাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করছে। এরই সঙ্গে আরও অন্তত পঞ্চাশজন পুরুষ, যাঁরা ঐতিহাসিক মানুষ, সত্য মানুষ, যাঁদের আমরা জানি চিনি, তাঁরা একই সঙ্গে এই রচনার পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করেছেন।

এই দুশোর উপর সত্য ও কাল্পনিক, অলীক ও ঐতিহাসিক মানুষের সম্মেলনে ও সমবায়ে এ উপন্যাসের সৃষ্টি। সত্যের সঙ্গে কল্পনার, ইতিহাসের সঙ্গে অলীকের মিলনে যা সৃষ্টি হয়েছে তার ক্রিয়া বিচিত্র। এই মিলনের ক্রিয়ায় কল্পনাকে ও অলীককে আরও সত্য বলে মনে হয়। মনে হয়, যাদের কথা এখানে বলা হয়েছে তারা আমার আপনার মতই নিজের নিজের সত্য মূর্তিতেই বেঁচে ছিল। মনে হয়, এ উপন্যাস নয়, আমার অজানা কিছু মানুষের জীবন-কথা ও ইতিহাস। আমি নিজে আজও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি, যখন এ রচনাটি সাপ্তাহিক অমৃতে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন বাংলাদেশের একজন মহামান্য পুরুষ, যিনি একাধারে পণ্ডিত ও রসিক বলে খ্যাত এবং আজও জীবিত আছেন, তিনি তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এ রচনা প্রসঙ্গে—আপনি কোন্ জমিদার বাড়ির কথা লিখছেন ?

উপন্যাসের চরিত্রের সংখ্যাধিক্য, রচনার পৃথু কলেবর বা দীর্ঘকালের ব্যাপ্ত কোন উপন্যাসের পক্ষে একমাত্র প্রশংসার বিষয় নয়। উপন্যাসের প্রথম ও শেষ বিচার রসের বিচারে। যখন প্রকাশিত হয় তখন, এবং তারপরের এই দীর্ঘ কালে আমি উপন্যাসখানি একাধিকবার পাঠ করেছি। প্রতিবারেই মনে হয়েছে, সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমার অধিকার-বহির্ভূত বক্তব্য জেনেও নিবেদন করছি যে, এ রচনায় তারাশঙ্করের বহু-অভিজ্ঞ ও পরিণত শিল্পীমন পাকা রসের ভিয়েনে নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন, করতে পেরেছেন। তবে আমার রসবিচার করার প্রয়োজনই বা কি ? ব্যঞ্জনের পরিচয় তো তার আস্বাদেই। পাঠক নিজেই সে বিচার করতে পারবেন।

৩

তারাশঙ্কর সম্পর্কে একটি-দুটি তত্ত্ব প্রবাদের মত প্রচলিত হয়ে আসছে। প্রথম তিনি উপন্যাসকার হিসাবে আঞ্চলিক, দ্বিতীয় তিনি সামন্ততন্ত্র বা জমিদারীপ্রথা সম্পর্কে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ দুটি প্রচলিত থিয়োরি সম্পর্কে দু-একটি কথা এখানে এই 'কীর্তিহাটের কড়চা'কে অবলম্বন করে বলা প্রয়োজন। এই থিয়োরি দুটিকে স্বীকার বা অস্বীকার না করেই সে সম্পর্কে যা বলবার বলছি।

তারাশঙ্করের জন্ম বাংলাদেশের উত্তর রাঢ়ে এবং তাঁর শিল্পী-জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও উপকরণ সেই রাঢ়ভূমি থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। এবং তিনি মূলত সেখানকার মানুষের কথাই লিখেছেন। এ উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু তা থেকে যদি এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে রাঢ়ের কথাই

লিখেছেন তা হলে বোধহয় সে সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে আসল কথা যে মানুষ, সেই মানুষই বাদ পড়ে যাবে। তবে এ সিদ্ধান্ত যদি এই হয় যে, তারাশঙ্কর মানুষের কথাই লিখেছেন এবং সে মানুষ রাঢ়ভূমির, তা হলেই বোধহয় সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়।

কারণ কোন্ সার্থক ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক নন? যে পটভূমিতে কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী নিজেদের মানবলীলা প্রকটিত করে সে তো একটি বিশেষ ভূমিখণ্ড, বিশেষ অঞ্চল। যে শিল্পী নিজের উপন্যাসের পটভূমিকে যত স্পষ্ট, যত গাঢ়ভাবে জানবেন তাঁর রচনায় তো সেই বিশেষ পটভূমি ততখানি গাঢ় বর্ণে বর্ণিত হয়ে স্পষ্ট মূর্তিতে দেখা দেবেই। মানুষ তো স্থান-কালহীন প্রাণী নয়। স্থান ও কালে সংস্থিত মানুষকে নিয়েই তো শিল্প! না হলে সে তো নিরালম্ব বায়ুভুক মূর্তিতে দেখা দেবে! তারাশঙ্কর নিজের ভূমিকে ও নিজের কালকে ভাল করেই জানতেন। তা তাঁর কাছে প্রায় করতলামলকবৎ ছিল। এই কারণেই তাঁর রচনায় রাঢ়ভূমি সর্বদাই অতি স্পষ্ট রেখা ও বর্ণে চিত্রিত চালচিত্রের মত বড় স্পষ্ট মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই চালচিত্রকে পিছনে রেখে তিনি আপনার পাত্র-পাত্রীর প্রতিমাকে স্থাপন করেছেন।

কিন্তু 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় তিনি তাঁর রচনাকে তাঁর চির-পরিচিত ও অভ্যস্ত উত্তর রাঢ়-ভূমিতে অজয়, ময়ূরাক্ষী কি কোপাইয়ের তীরে স্থাপন করেন নি। তিনি রচনাকে এবার স্থাপন করেছেন কংসাবতী বারিবিধৌত কীর্তিহাটে, যাকে বর্ণনা করেছেন মেদিনীপুর বলে। আমি সঠিক জানি না, আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট এই অভিযোগ থেকে সহজে অব্যাহতি লাভের জন্যই তিনি এ কাজ করেছিলেন কি না! বরং পাঠক একটু যত্ন করে দেখলেই অনুভব করবেন, এ মানুষগুলি কি মূলত উত্তর রাঢ়ের, বীরভূমের? তারাশঙ্কর কি ছলনা করে তাদের মেদিনীপুরে বসিয়ে দিয়েছেন? না তারা আসলে মানুষই, বীরভূম মেদিনীপুর যেখানেই জন্মাক সেইখানেই তারা সত্য ও সঠিকভাবেই চেহারা পেয়েছে?

এবার দ্বিতীয় তত্ত্বটি সম্পর্কে আসা যাক।

তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে সহানুভূতিশীল এ কথাও প্রবাদবাক্যের মতই চলে আসছে। আমার নিজের ধারণা, এর হেতু তাঁর প্রথম জীবনের রচনা দুটি গল্প, 'রায়বাড়ী' ও 'জলসাঘর'। তারাশঙ্কর অন্তত ষাটের উপর উপন্যাস ও দুশোর কাছাকাছি ছোটগল্প রচনা করেছেন। তার মধ্যে ক'টিই বা জমিদারদের নিয়ে লেখা? 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'পদচিহ্ন' ও শেষ এই 'কীর্তিহাটের কড়চা' উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গল্পের মধ্যে 'রায়বাড়ী' ও 'জলসাঘর' ছাড়া পাঠককে এ প্রসঙ্গে 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে' ও 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' পড়ে দেখতে অনুরোধ করব এবং সবিনয়ে বিচার করে দেখতে বলব ওজনে জমিদারীর গুণাগুণ দেখানোর পাল্লাটা সমান হয়েছে কিনা!

:

এ সম্পর্কে বিচার করতে হলে, আমার ধারণা, আমাদের আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টিতে জমিদারতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতির কথাটা ধরে নিলেও বিচারে অসুবিধা হবে না। তবে তাঁর এ সহানুভূতিকে খণ্ডিত করে দেখলে হয়তো বিচারে ত্রুটি ঘটবে। আমরা যদি তারাশঙ্করের সহানুভূতির ক্ষেত্রটি বিচার করি তা হলে দেখতে পাব তাঁর সহানুভূতির ক্ষেত্র অতি সাধারণ ব্রাত্য মানুষের জীবন থেকে উদ্ভূত হয়ে তা ক্রমপ্রসারিত হতে হতে সমাজের

উচ্চ বর্ণ ও উচ্চ বিত্তের মানুষে গিয়ে শেষ হয়েছে। তিনি যে সংখ্যায় ও যে মমতায় উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের জমিদারকে এঁকেছেন তার থেকে বহুতর সংখ্যায় ও বহু পরিমাণ মমতা দিয়ে সমাজের অন্তেবাসীদের জীবনকে চিত্রিত করেছেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, সমাজের উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের মানুষও তাঁর সহানুভূতি, এবং ক্ষেত্রবিশেষে শ্রদ্ধায় বঞ্চিত হয় নি। তা যদি হত তা হলে তা কি শিল্পী তারাশঙ্করের পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় হত? শিল্পের একাংশ চোখের জলে ও বুকের মমতার রসে ভিজিয়ে, অপর এক অংশকে মমতা-বঞ্চিত করে আঁকলে তাতে, আর যাই হোক, শিল্পসৃষ্টিও হত না, শ্রদ্ধাবান শিল্পীর পক্ষে তাতে সমদর্শিতাও বজায় থাকত না।

কিন্তু এহ বাহ্য। শিল্পী তারাশঙ্করের যা ধাতুপ্রকৃতি তাতে মমতাহীন হয়ে আঁকা তার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। এ তাঁর শিল্পের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা যদি এই মমতার উৎস সন্ধান করি তা হলে একটি বিচিত্র সত্যের সন্ধান পাব। আমার ধারণা, এই মমতার মূল উৎস হল মাটি, দেশের মাটি। দেশের মাটিকে অবলম্বন ক'রে যারা তাঁর চোখের সামনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোর মধ্যে বেঁচে ছিল তাদের সকলকেই তিনি ভালবেসেছেন। সে জমির রায়তই হোক, আর জমিদারই হোক। যার গায়ে পুরু কি পাতলা মাটির প্রলেপ ও গন্ধ আছে তাকেই তিনি অপরিসীম মমতায় ভালবেসেছেন। সেই ভালবাসার সময় রায়ত কি জমিদার তিনি বিচারের অবকাশ পান নি।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে 'কীর্তিহাটের কড়চা' তাঁর অনন্য সৃষ্টি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোর মধ্যে ভূমিকে অবলম্বন করে যে যেখানে আছে দেশের মধ্যে সে-ই তাঁর ভালবাসার অংশভাগী হয়েছে। তবে ভালবাসতে গিয়েও, মমতা প্রকাশ করতে গিয়েও যে শাসন ও শোষণ করেছে তার সাধুবাদ করেন নি, আবার যে অত্যাচার পেয়েছে তাকে সহানুভূতি জানাতেও ভোলেন নি।

৪

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যজীবনের কাহিনী লিখতে গিয়ে 'জলসাঘর' প্রসঙ্গে একটি উক্তি করেছিলেন সেটি এখানে স্মরণ করি। তিনি 'জলসাঘর' গল্পটি লেখেন ১৩৪১ সনের বৈশাখ মাসে। সেই সময় থেকেই 'জলসাঘরে'র সূত্র ধরে তাঁর তিনটি গল্প লেখার পরিকল্পনা মাথায় আসে। একটি জমিদার বাড়ির উত্থান ও পতনের কাহিনী লিখবেন তিনটি ছোট গল্পে। প্রথম উত্থান, দ্বিতীয় রাজত্ব, তৃতীয় পতন। তৃতীয় গল্পটিই লেখেন সর্বপ্রথম। তারপর এর আড়াই কি পৌনে তিন বছর পর দ্বিতীয় গল্পটি লেখা হয়। নাম 'রায়বাড়ি'। এরপর 'জলসাঘর' বই হিসাবে প্রকাশিত হবার সময় প্রকাশক হিসাবে সজনীকান্ত দাস 'জলসাঘর' গল্প-সংগ্রহের প্রথম গল্প হিসাবে 'জলসাঘর' নামে চিহ্নিত করে তার অধীনে ওই দুটি গল্প সংকলিত করেন। তারাশঙ্করও এ পর্যায়ের প্রথম কাহিনীটি লেখা হবার জন্য আর অপেক্ষা করেন নি। আমার নিজের ধারণা ১৩৪১ সালে 'জলসাঘর' গল্পটি লিখবার সময় যে পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল তাই এর ত্রিশ বৎসর পরে মূর্তিলাভ করে 'কীর্তিহাটের কড়চা'য়।

কিন্তু মাঝখানের ত্রিশ বৎসর তিনি এই পরিকল্পনাটি নিয়ে কাজ করবার চেষ্টায় একাধিকবার কলম ধরেছেন। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। সময়টা, যতদূর মনে পড়ে, বাংলা বাহান্ন তিপান্ন সাল। সে সময় সে কালের একটি নাম-করা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল 'সচিত্র ভারত'। 'সচিত্র

ভারত'-এর কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁদের কাগজে লিখবার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও তারাশঙ্কর বহু-সংখ্যক উপন্যাস লিখেছেন তবু বহুপ্রসবের জন্য নিজেকে বার বার তিরস্কার করতেন। কিন্তু না লিখেও উপায় থাকত না। কাগজের চাহিদায় ও তাগিদে তাঁকে লিখতেই হত। তাই মধ্যপথ বেছে নিয়ে তিনি উপন্যাস না লিখে অন্য ধরনের লেখা লিখতেন। 'সচিত্র ভারত'-এর তাগাদায় তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন একটি নাটক। তার বিষয়বস্তু দু'পুরুষ জমিদারের সংঘাত। মাঝ-খানে এক তান্ত্রিক ঘটনাচক্রে নাটকের কাহিনীতে জড়িয়ে গিয়েছেন। সে নাটক প্রকাশিত হয়নি। আজও উঠে যাওয়া 'সচিত্র ভারত'-এর পৃষ্ঠায় সে রচনা মহানিদ্রায় নিদ্রিত।

এরপর আরও কয়েক বছর কাটল। ১৩৬৩।৬৪ সালে পূজা সংখ্যা 'উল্টোরথে' তিনি একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। নাম 'জবানবন্দী'। কাহিনী এক জমিদার পরিবারের কয়েক পুরুষের কাহিনী। এই রচনায় সেই নাটকের কাহিনীটি নূতন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। সে কাহিনী রচনা আমি নিজের চোখের সামনেই দেখেছি। যা দেখেছি তাতে শিল্পী তারাশঙ্করের এই উপ-ন্যাস লিখবার সময় যে শক্তিমত্তার প্রকাশ দেখেছিলাম তা বিস্ময়কর। তবে সে কাহিনী পৃথক এক কাহিনী। সে লেখার ক্ষেত্র কোনোদিন উপস্থিত হলে তখন বলার কথা বিবেচিত হবে।

'উল্টোরথে' প্রকাশিত 'জবানবন্দী'ও তারাশঙ্কর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নি। তা আজও অপ্রকাশিত। সে কাহিনী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপরূপ শিল্পসৃষ্টি। তাতে কয়েক পুরুষ জমিদার বংশ-পরম্পরা আবির্ভূত হয়েছেন। তার সঙ্গে এসেছে গোয়ানদের রঙদার চরিত্র। সেই সঙ্গে নাটকের সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী উজ্জ্বলতর মূর্তিতে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন আপনার পাগল-পাগল ভাবের মাতাল, দুর্দান্ত চেহারা নিয়ে। সে উপন্যাস আজকের বয়স্ক পাঠকদের অনেকেই সেদিনের পূজো সংখ্যা 'উল্টোরথে' পাঠ করেছেন। তার স্মৃতিও হয়তো তাঁদের অনেকের মন থেকে এখনও নিশ্চিহ্ন হয় নি।

তারপর আরও চার পাঁচ বছর কেটে গেল। 'জবানবন্দী' পড়ে রইল অপ্রকাশিত হয়ে। তিনি তখন 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সাপ্তাহিক অমৃতের অনুরোধে তিনি 'কীর্তিহাটের কড়চা' লিখতে আরম্ভ করলেন। লিখবার আগে অমৃতের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন নূতন উপন্যাস লেখা তার পক্ষে সহজ হবে না। তার পুরনো অপ্রকাশিত লেখা নূতন করে লিখে প্রকাশ করতে আপত্তি না হলে তিনি লিখতে পারেন। অমৃত কর্তৃপক্ষ সানন্দে সম্মতি জানালেন।

এরপর সাপ্তাহিক অমৃতে 'কীর্তিহাটের কড়চা' প্রকাশিত হতে আরম্ভ হল। 'জবানবন্দী' লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিষয় ও কাঠামো দুই-ই পেয়ে গিয়েছিলেন। মাঝ-খানের এই কয়েক বৎসরে সেই কাহিনী কল্পনার রসে ভিজেছে এবং সেই জারিত কল্পনার ভ্রূণ থেকে তখন স্বাভাবিকভাবেই হাজারটা জীবন্ত সূত্র তাঁর মনোলোক থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 'জবানবন্দী'র সেই পূর্ববর্তী তীরগতি সহজ কাহিনী তখন অসংখ্য চরিত্রের চঞ্চল মিশ্রণে ও আস্ফালনে বৃহৎ ও জটিল হয়ে উঠেছে। মূল কাহিনী ও 'থিমে'র গা থেকে আরও বহুতর ডালপালা গজিয়েছে। কাল্পনিক মানুষদের আশেপাশে তখন ইতিহাসের পাতা থেকে উজ্জ্বল ঐতিহাসিক পুরুষরা তাঁর কল্পনায় মূর্তি ধরে চলাফেরা করতে আরম্ভ করেছেন।

এই মানসিক পরিবেশে তারাশঙ্করের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনা আরম্ভ হল।

৫

এ উপন্যাসে বহু নায়ক-নায়িকা। তবু মূল নায়ক রায়বংশের সপ্তম পুরুষের অন্যতম প্রধান পুরুষ সুরেশ্বর রায়। বাংলা দেশের সমস্ত বড় জমিদারদের যে হাল হয়েছিল কীর্তিহাটের রায়বাড়ী তার থেকে কিছু আলাদা ছিল না। রায়বংশের তৃতীয় পুরুষ বীরেশ্বর রায়ের সময় থেকে রায় বাবুরা কলকাতামুখী হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পাকাপাকি বাস করতে লাগলেন জানবাজারে প্রাসাদোপম বাড়ি করে। সপ্তম পুরুষে সুরেশ্বর রায়ের জন্ম জানবাজারের অভিজাত ও ইংরেজী-ভাবাপন্ন মা-বাপের কোলে। বাপ ইংলিশম্যান কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ঝকঝকে ইংরেজী লিখতেন পাকা কলমে। সুরেশ্বর রায়ের ক্লাসিক্যাল গানে জন্মগত অধিকার। সে লেখাপড়া শিখলে আপন খেয়ালে। শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল চিত্রশিল্পী, আর্টিস্ট। সে তখন তখনকার উঠতি বোহেমিয়ানদের একজন।

এই অবস্থায় তার উপর সমন জারী হল কীর্তিহাটে যাবার, সেটেলমেণ্ট অফিসে হাজিরা দেবার। যেতে হল সুরেশ্বরকে। কলকাতায় জন্ম, আজন্মলালিত মহানগরীতে, সেই নাগরিক মন নিয়েই সে গেল কীর্তিহাট। তার পরের কাহিনীই কীর্তিহাটের কড়চার কাহিনী। শিল্পী সুরেশ্বর আস্তে আস্তে ভালবাসল কীর্তিহাটকে, তার বংশকে, সেখানকার মানুষকে, সেই সঙ্গে মাটিকে। এই বহুজাল-সমন্বিত কাহিনীর অন্তরালে আধুনিক ও উন্নাসিক নাগরিক সুরেশ্বর রায়ের এই ভালবাসার কাহিনীটিই এর গভীরতম বক্তব্য। তাই এই বৃহৎ উপন্যাসের সমাপ্তি অতি সহজ নম্রস্বরে। কোন নাটকীয়তা নেই, কোন ঝকমকানি নেই, সুরেশ্বর রায়ের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রের মাধ্যমে এ কাহিনীর পরিসমাপ্তি। একজন লোক ছিল, সে তার দেশের মানুষ ও মাটিকে ভালবেসেছিল, তারপর সে আর নেই। এসেছিল, ভালবেসেছিল, তারপর চলে গিয়েছে। এর মধ্যে কোন বিস্ময় নেই, চমক নেই, কিন্তু মানবসভ্যতার শেষ বেদনাটি হয়তো নিহিত আছে। সুরেশ্বর রায়ের সারা জীবনের নিঃশব্দ ও একক অন্বেষণ তাকে নম্র সহজ করে মাটির একান্ত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। দেশের মাটিতে সুরেশ্বরের মন ও দেহ যেন গড়াগড়ি দিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছে।

'কীর্তিহাটের কড়চা'র এই বোধ হয় শেষ ফলশ্রুতি।

৬

'কীর্তিহাটের কড়চা' রায়বাড়ীর জমিদারদের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যদি মানব ও মৃত্তিকার প্রেমের কাহিনী হয়, তা হলে তারাশঙ্করের 'মঞ্জরী অপেরা'র কাহিনীর কেন্দ্রে সংগোপনে আসন নিয়েছে কাম।

'কীর্তিহাটের কড়চা'র মত কলেবর না হলেও 'মঞ্জরী অপেরা'র গঠনে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। 'মঞ্জরী অপেরা'ও আয়তনে অতি বৃহৎ, এবং বহুসংখ্যক চরিত্রের আনাগোনা এতে। সেই কারণেই রচনাবলীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য এ খণ্ডে যেমন 'কীর্তিহাটের কড়চা'র প্রথম চতুর্থাংশ প্রকাশিত হল, তেমনি প্রকাশিত হল 'মঞ্জরী অপেরা'র অর্ধাংশ।

'মঞ্জরী অপেরা' 'কীর্তিহাটের কড়চা'র মত তাঁর পরিপক্ক শেষ বয়সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং

এর রচনাকাল 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনার সমসাময়িক।

রচনাটি ১৯৬৯ সনে পূজা সংখ্যা 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাটি লেখা হবার পূর্বের কাহিনীটি এখানে বললে পাঠকের কৌতুহল হয়তো কিছু পরিতৃপ্ত হবে।

তখন তারাশঙ্করের পারিবারিক জীবনে এক মহা বিপর্যয় আসন্ন। সেবার পূর্ব বৎসরের শেষ থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা পরিপূর্ণ যৌবনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরের ফেব্রুয়ারী মাসে জানা গেল তিনি পাকস্থলীতে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়েছেন। সেই মহা বিপর্যয়কে বুকে নিয়ে তখন তাঁর প্রতিদিনের দিনযাত্রা। সেই যন্ত্রণাকে বুকে নিয়েই তিনি প্রত্যহের কর্ম যাপন ক'রে চলেছেন। সাপ্তাহিক অমৃতে 'কীর্তিহাটের কড়চা' লিখছেন এবং পুজো সংখ্যাতে লিখবার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছেন।

তখন তিনি রাজ্যসভার সদস্য। সেটা বোধহয় জুলাই কি আগস্ট মাস। তিনি দিল্লী গিয়েছেন রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দিতে। এই সময় একদিন রাত্রে দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ককলে ডাকলেন। কণ্ঠস্বর বেশ উত্তেজিত। বললেন, ওহে একটা কাজ করো তো। তুমি বিশ্বরূপা থিয়েটারের রাসবিহারী বাবুকে আমার নাম করে বলে রেখো, যাত্রাদলের একজন পুরানো অ্যাক্‌টরকে ঠিক করে রাখেন ও আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

দেখা করার তারিখও তিনি আমাকে বলে দিলেন। তারপর বেশ উত্তেজিতভাবে বললেন—এবার যাত্রার দল নিয়ে লিখব হে!

তিনি কলকাতায় ফেরার পর দেখলাম তাঁর লেখার ডেস্কের সামনে, আমাদের দিকে পিছন ফিরে এক গিলে-করা-পাঞ্জাবি-পরা কাঁচা-পাকা চুল ভদ্রলোক বাবার কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে হৃদ্যভাবে কথা বলছেন। দেখলাম কথা চলল একদিন, দুদিন, তিনদিন। ঘর বন্ধ করে কথাবার্তা। তিনদিন কি চারদিনের পর একটা দুটো দিন বাদ দিয়ে তিনি লিখতে বসলেন। সে লেখা উপন্যাস 'মঞ্জরী অপেরা'।

সে লেখা যখন প্রথম 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত হয় তখন তার কলেবর অনেক হাল্কা ছিল। তবে চরিত্রগুলি প্রায় সবই ছিল। ওদিকে লেখার ডেস্কের ওপারে পারিবারিক জীবনে তিনি তখন জীবনের ভীষণতম বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

'মঞ্জরী অপেরা' 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত হবার পরই আবার ধরলেন পুনর্লেখনের জন্য। পুনর্লেখনের পর কলেবরে পৃথু চেহারা নিয়ে রসের খনি হয়ে প্রকাশিত হল।

রচনাটির সমালোচনা বা গুণগান করার আমার প্রয়োজন নেই। তবে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন, এবং আমার যতদূর জানা আছে তাতে এ জীবন সম্পর্কে তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। যা উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন তা পেয়েছিলেন রাসবিহারী সরকার মশাইয়ের পাঠানো যাত্রাদলের সেই পুরনো 'আসামী'র কাছ থেকে।

এ জীবন সমাজের সাধারণ ধরা-বাঁধা জীবন নয়। এর জাত আলাদা। বাউণ্ডুলে মানুষ এরা। তারাশঙ্করের ভাষাতেই এদের পরিচয় আছে। এরা যত সব আধপাগল মানুষ, কর্মে কুঁড়ে, অভিনয়-পাগলের দল। রাত্রে রয়াল ড্রেস পরে রাজা সাজে। দিনের বেলা ফকির, ছেঁড়া কাপড়জামা পরে চাটাই পেতে শুয়ে বিড়ি টানে। সেই বাউণ্ডুলের দলের কেউ বাজিয়ে, কেউ গাইয়ে, কেউ

অ্যাক্টর—এ ছাড়া সংসারে তারা কোন কাজ পারে কি না পারে তা কখনও পরখ করে দেখে নি এরা।

এ সংসারে এই অকেজো মানুষের দল কেরানীগিরি করতে পারলে না, কারখানায় কাজ করতে পারলে না, চাষ করতে পারলে না, অন্ন-বস্ত্রের অভাবপীড়িত সংসারে একটি বস্তুকণা সৃষ্টি করে একচুল সাহায্য করতে পারলে না। তাদের নিজেদেরও এর হিসেব নেই, হিসেব করার মনও নেই। তারা এ সব হিসেবের বাইরের মানুষ। তারা কেবল পারে নিজের ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড়ের উপর রঙচঙে পোশাক, পুঁতির মালা পরে, রঙ মেখে রেখাঙ্কিত মুখ পালিশ করে মিথ্যে হেসে, মিথ্যে কেঁদে নেচে গেয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে অনেক মানুষকে ছেলে-ভোলানোর মত ভুলিয়ে মাতিয়ে হিসেবের খাতায় অপব্যয়ের অঙ্কে বেঁচে থাকতে।

এই মানুষদের নিয়ে গল্প। নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আদিম আকর্ষণ এই উপন্যাসের কেন্দ্র-বস্তু। গোরাবাবু, মঞ্জরীর যাত্রাদলের চলমান জীবনযাত্রায় এসে দাঁড়াল অলকা বলে মেয়েটি, তাদের দুজনের জীবনে তৃতীয়জন হয়ে দাড়াল।

তারপর অনেক মানুষকে নিয়ে গল্পের বৃহৎ ব্যস্ত ধারা তীব্রবেগে ছুটে চলেছে এখানে ওখানে ঘূর্ণি তুলে। গল্পের গতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি; কোন তত্ত্ব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শুধু জীবনের কাহিনী রসের পাকে পাক করা। এ রচনায় এক ধরনের আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকতার প্রকাশ আছে, যা একে সম্পূর্ণ রসসামগ্রীতে রূপান্তরিত করেছে।

৭

'কীর্তিহাটের কড়চা' ও 'মঞ্জরী অপেরা'র সঙ্গে এ খণ্ডে আর একখানি উপন্যাস সংযোজিত করা হয়েছে। নাম 'বিপাশা'। অতি সুখপাঠ্য রচনা। ঝরঝরে রচনা এবং সুন্দর সুবিন্যস্ত গল্পের সামগ্রী। কিন্তু ওই দুই শিল্পের এ সগোত্র নয়। ওই দুটি রচনায় শিল্পীর যে আশ্চর্য উদ্দীপন লক্ষ্য করা যায়, যে তাপে শিল্পীর প্রাণের শ্রেষ্ঠ রসভাবনা গলে বেরিয়ে এসে কাহিনীতে মূর্তি নিয়েছে তা এ কাহিনীতে অনুপস্থিত। তবু একজন বড় শিল্পীকে জানতে ও বুঝতে গেলে তাঁর সর্বপ্রকার রচনাগুলির সঙ্গেই পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আর সে পরিচয়ে লোকসান নেই। কারণ গল্পের তীব্ররস আপনার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করে আছে।

৮

ত্রয়োদশ খণ্ডে যে সব রচনা সংগৃহীত হয়েছে সে সবই তাঁর ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের রচনা। এ সময় শিল্পশক্তি শিল্পীর সম্পূর্ণ আয়ত্ত দীর্ঘ কালের অভ্যাসের সিদ্ধি হিসেবে। কিন্তু বহু সৃষ্টির পর প্রথম বয়সের সেই অনায়াস কবিত্বশক্তি ও উদ্দীপন-ক্ষমতা সময় সময় অনুপস্থিত। যখন পরিণত বয়সের এই কালে সম্পূর্ণ-আয়ত্ত শিল্পশক্তির সঙ্গে শিল্পীর মানসিক উদ্দীপন যুক্ত হয় তখন সৃষ্টি হয় 'কীর্তিহাটের কড়চা' ও 'মঞ্জরী অপেরা'র। কিন্তু যখন বহু আকুল সন্ধানেও সেই উদ্দীপন ঘটে না, শিল্পীর নিগূঢ় মর্মলোকবাসী কবিত্বশক্তি জাগ্রত হয় না, তখন দীর্ঘকালের অভ্যাসে আয়ত্ত করা সিদ্ধির চিহ্নটুকু মাত্রই থাকে, আর কিছু থাকে না। 'বিপাশা'য় সেই 'আর কিছু'র সাক্ষাৎ পাবেন না, তবে দীর্ঘকালের অভ্যাসে আয়ত্ত শিল্পকর্মের আস্বাদ ঠিকই পাবেন।

—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কীর্তিহাটের কড়চা

প্রথম খণ্ড

আদি পর্ব

কথারম্ভ

মধ্য কলকাতায় জানবাজার। রাণী রাসমনির ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত বিরাট বাড়ীখানির অনতিদূরে আর একখানা বড় বাড়ী। পুরনোকালের বাড়ী। এখানে এ বাড়ীখানাও এককালে সুপরিচিত ছিল। নাম ছিল রায়কুঠী। গত আটাশ বৎসরে বাড়ীখানা গৌরব হারিয়েছে। পনের বৎসরে বাড়ীখানা স্বামী-পরিত্যক্তার মত ম্রিয়মাণ এবং যেন নিজের পরিচয় গোপন করে বেঁচে আছে।

এই বাড়ীর সামনের দিকে যে পুরনো কালের সওয়াশো ফুট লম্বা এবং পনের ফুট চওড়া দীর্ঘ বারান্দাটা ঘিরে বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে আধুনিককালের আমেজ এনে—ঘরে বা হলে পরিণত করা হয়েছে—সেই হলটায় উজ্জ্বল আলোর সারি জ্বলছিল। শীতকালের রাত্রি দশটায়—কাচের জানালাগুলো বন্ধ কিন্তু কাচে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে ঘোষণা করছিল—এতকাল পরে আমি জেগেছি সেজেছি।

ঘরটায় বা ওই হলটায় মুখোমুখি বসে ছিল সুরেশ্বর রায় আর সুলতা ঘোষ। সুলতা অবাক হয়ে হলটার দেওয়ালে টাঙ্গানো সারিবন্দী ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল। উজ্জ্বল আলোর ছটায় তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠা প্রশংসা এবং বিস্ময় গোপন ছিল না।

ছবিগুলি সুরেশ্বরেরই আঁকা। বাড়ীখানাও সুরেশ্বরের। শিল্পী হিসাবে সুরেশ্বর আঠারো বছর আগে খ্যাতি অর্জন করেছিল। শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও। তবে পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক বা অতি খেয়ালী বেপরোয়া বিদ্রোহী বলত লোকে; যার যেমন ইচ্ছে। আঠারো বছর আগে মানে—১৯৩৫ সাল। যুগটাই বিদ্রোহের। কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার সেই বিধাতার বুকে লাথি মারার আস্ফালন করা বিদ্রোহীদের একজন। সৃষ্টির মধ্যেও তার পরিচয় ছিল—ছবির দুর্বোধ্যতায়। আঠারো বছর আগে—সে সুলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল; সুলতা তখন বি-এ পরীক্ষা দেবে। এই সময়েই সুরেশ্বর হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে ডুব মেরেছিল; সুলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতায়, তার সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীজীবনে, কলকাতার স্বচ্ছন্দ এবং উত্তেজনাময় জীবনে সব কিছুতে ছেদ টেনে।

আঠারো বছর পরে আবার তাদের দেখা। এ-সম্পর্কে সুরেশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা উঠে—মিলিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ধ্বনি প্রতিহত হলেই প্রতিধ্বনি তোলে। না হলে ছড়িয়ে মিলিয়ে যায়। অপবাদের প্রতিবাদ না হলে পঙ্কতলের বায়ু-কণাগুলি বুদবুদ তুলে বাতাসে মিশে যায়—জলের তলায় পাঁক থিতিয়ে পড়ে। সুরেশ্বরের বেলায়ও তাই হয়েছে। লোকে বলেছে—সুলতাও বিশ্বাস করেছে, কীর্তিহাটের জমিদারপুত্রটি ও খেয়ালী শিল্পীটি—দুই সত্তাকে মিলিয়ে কীর্তিহাটের জমিদারীর পঙ্কপল্বলে—মহিষ ও বরাহ এই দুই জন্তুর মিশ্রণে একটি অভিনব জন্তুতে পরিণত হয়ে কণ্ঠ ডুবিয়ে পঙ্করস পান করছে এবং সেই পঙ্কে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সুলতা এখন অধ্যাপিকা। ছাত্রী হিসেবে সে কৃতী ছাত্রী ছিল। এম-এতে অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অধ্যাপিকা হিসেবে চাকরি নিয়ে তার সঙ্গে রাজনীতির মন্ত্রদীক্ষা

নিয়ে বেশ আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গেই কাল কাটাচ্ছিল।

হঠাৎ এতকাল পরে দেখা।

সারি সারি ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে সুলতা দেখছিল আর ভাবছিল—না, জমিদার-সন্তান সুরেশ্বর মহিষ বা বরাহ যাই হোক—তার ভিতরের শিল্পী তো মরে নি!

ছবিগুলি সুন্দর। সুন্দর ছবি! এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চোখ বুলালেই ধরা পড়ে—ছবি-গুলির ধারা এক নয়। বর্ণবিন্যাসে রেখার ভঙ্গিতে নানান বৈচিত্র্য। টেকনিকও এক নয়। কিন্তু ছবিগুলির বিষয়বস্তুতে একটা ধারাবাহিকতা আছে। পরিবেশ যেন এক। নদী বন গ্রাম। এক নদী এক বন এক গ্রাম। মানুষও আছে। তারাও যেন—অনেকে বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে। রঙ-এর বিন্যাস ভারী সুন্দর। চোখকে যেন ভরে দেয়।

সুরেশ্বরের দিকে সে আবার তাকালে। না, শিল্পী সুরেশ্বর তো মরে নি। এই এতো ছবি সে এঁকেছে! সেই গ্রামে বসে—জমিদারী করতে করতে। চোখে একটা পরিবর্তন পড়ছে। স্পষ্ট পরিবর্তন। সেই খেয়ালী ঝড়ের মত দুরন্ত লোক তো নয়। এ যেন শ্রান্ত। শান্ত।

হঠাৎ সুরেশ্বর একটা ছড়ি দিয়ে প্রথম ছবিখানার ফ্রেমে ঠেকিয়ে বললে—এই আমার প্রথম ছবি। কংসাবতী বারিবিধৌততট বনচ্ছায়াশীতল কীর্তিহাট নামক গ্রাম। সেই গ্রামের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের দৌলতে যিনি প্রথম জমিদার—তাঁর নাম সোমেশ্বর রায়। তিনি বিবাহ করে গ্রামে প্রবেশ করছেন।

ছবি একখানি গ্রাম্য পথের। তবে গোটা গ্রামের আভাস আছে। নদী আছে বন আছে —গ্রাম আছে পটভূমিতে—ছবির সম্মুখে গ্রাম্যপথ, সেই পথের উপর একখানা পাল্কী। পাল্কীর ভিতরে বর আর বধূ—বরের হাতে একখানা গুটানো কাগজ। পিছনে গ্রাম্য নরনারী!

সুরেশ্বর বললে—ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ—

সুলতা চমকাল এবার।—ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ? কি বলছে সুরেশ্বর? সুরেশ্বরের দৃষ্টিও কেমন কেমন হয়ে গেছে।—পাগল?

সুরেশ্বর সামলে নিলে নিজেকে। বললে—না, আমার ভুল হয়েছে। এখানে তো তুমি একা সুলতা—! কিন্তু আমার মনে হল কি জান? এই রকম হয়।—হ্যাঁ হয়।

শঙ্কিত হল সুলতা।

পরিচয়

সুরেশ্বরের পরিচয় মনে পড়ল সুলতার। কীর্তিহাটের কড়চার রেখাচিত্রশিল্পী সুরেশ্বরকে না জানলে ওর কথার মানে ধরা যাবে না, সুলতার মনের আশঙ্কারও স্বরূপ নির্ণয় হবে না। কীর্তিহাটের কড়চারও স্বাদ পাওয়া যাবে না।

এই যে কংসাবতী বারিবিধৌততট—বনচ্ছায়াশীতল কীর্তিহাট গ্রাম—ওই গ্রামেরই জমিদার-বংশের সন্তান। সেই কোম্পানীর আমলের পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের কাল থেকেই ওরা জমিদার। ওদের বংশে যিনি প্রথম জমিদারী অর্জন করেছিলেন তাঁর নাম ছিল সোমেশ্বর

রায়। তাঁর বয়স তখন ষোল। দশ বছর বয়সেই জমিদার হয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়। তাঁর বাপের নাম কুড়ারাম ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন গোমস্তা শ্রেণীর মানুষ। তবে যার তার গোমস্তা নয়—গোমস্তা ছিলেন কোম্পানীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের—খাস গোমস্তা মুহুরী। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সঙ্গে কাগজ নিয়ে কলকাতায় কোম্পানীর সেরেস্তাখানায় কাজ করেছেন, দেওয়ানের পিছনে পিছনে বুড়ো লর্ড কর্ণওয়ালিশের ঘরে গিয়েছেন—কাগজ এগিয়ে দিয়েছেন। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে বাংলা বিহার উড়িষ্যার পরগণা-লাট-মৌজার তালিকা করেছেন—তাতে নম্বর বসিয়েছেন; সে সব লাট-মৌজার রাজস্ব নির্ধারিত করেছেন।

দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধ বাংলাদেশে মহাসমারোহের শ্রাদ্ধ। বাংলাদেশের জমিদারেরা এসে তাঁর কান্দীর বাড়ীতে শুধু আতিথ্যস্বীকার ক'রে ধন্য হন নি—শ্রাদ্ধে তদ্বির-তদারক ক'রে নিজেদের মাথা বাঁচিয়েছেন। দেওয়ানজী সরষের তেল রাখবার জন্যে একটা ডোবা পুকুর কাটিয়ে তাতে তেল ঢেলে রেখেছিলেন। ঘিয়ের কারবার তখন টিনে নয়—বড় বড় হাঁড়ির প্রচলন ছিল—দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধে একটা ঘর ঘিয়ের বড় বড় জালায় ভর্তি ছিল। কুড়ারাম ভট্টাচার্য ছিলেন ঘিয়ের ভাঁড়ারে। সেখান থেকে দেওয়ান তাঁকে হঠাৎ তলব ক'রে বলেছিলেন—কুড়োরাম, ও ভার নিয়ে তোমার আটকে থাকা চলবে না। তোমাকে নিযুক্ত করলাম কৃষ্ণনগরের কুমার শিবচন্দ্র রায় আসছেন তাঁর পরিচর্যার জন্যে। সাবধান—পান থেকে চুন না খসে।—শোনা গিয়েছিল কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অসুস্থ বলে আসতে পারবেন না। তিনি মার্জনা চেয়ে পত্র লিখেছিলেন—"দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য—ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ।" কিন্তু তারপর কুমার হঠাৎ রাজী হয়ে এসেছিলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। দেওয়ানজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় কুড়ারাম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ানজী বলেছিলেন—কি কুমার, কেমন আয়োজন দেখছেন? কুমার শিবচন্দ্রের জিহ্বা ছিল প্রখর। ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—দেখলাম। প্রায় দক্ষযজ্ঞ!

অর্থাৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে পণ্ড হবে এই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু দেওয়ানজী তার উপরেও প্রখর—তিনি বলেছিলেন—ভুল হল কুমার। দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী!

ভ্রূকুঞ্চিত করে শিবচন্দ্র বলেছিলেন—বলেন কি দেওয়ানজী, দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী? অর্থাৎ ঔদ্ধত্য তো কম নয়! কিন্তু দেওয়ানজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন—নিশ্চয়। বিবেচনা আপনিই করুন কুমার; দক্ষযজ্ঞে শিব আসেন নি প্রথমে—আমার যজ্ঞে স্বয়ং শিব উপস্থিত—যজ্ঞের আদিতেই।

অর্থাৎ কুমার শিবচন্দ্র নিজে এসেছেন।—এসেছেন দেওয়ানজীকে মান্য করেই এটা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

আসেন নি শুধু বর্ধমানের মহারাজা। বলেছিলেন—কি, আমি ক্ষত্রিয় হয়ে লালা—অর্থাৎ কায়েতের বাড়ী যাব নিমন্ত্রণ রাখতে? তার শোধ দেওয়ানজী নিয়েছিলেন। অন্য জমিদারদের খাজনা ধার্য তিনি করেছিলেন এগার ভাগের দশ ভাগ। বর্ধমানের মহারাজার পাঁচ হাজার বর্গমাইল জমিদারী—তাঁর উপর খাজনা ধার্য হয়েছিল ষোল আনা—অর্থাৎ এগার ভাগের পুরো

এগার ভাগ। অঙ্ক নিজে বসিয়েছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য মশায়। বাহান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা।

কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এই শ্রাদ্ধে। হঁ্যা, তার আগে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দে মাতৃশ্রাদ্ধে ন লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের দেববিগ্রহদের নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন ব'লে দেব উপাধি পেয়েছিলেন। সে গৌরব ম্লান করে দিয়েছিলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। এ সমস্ত কিছুর মধ্যে কুড়ারাম ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর বিশ্বাসভাজন কর্মচারী। সেখান থেকেই তিনি প্রচুর উপার্জন করেছিলেন। পাকা বাড়ী করিয়েছিলেন; জমিজেরাত অনেক কিনেছিলেন। কিন্তু জমিদারী কেনেন নি। জমিদারী কিনেছিলেন শেষ জীবনে—পুত্র সোমেশ্বরের নামে। সেটা আঠারশো এক সাল। জমিদারী তখন কেনা গেলেও চালানো সহজ ছিল না। এগার ভাগ আদায়ের দশ ভাগ দিতে হ'ত কোম্পানীকে। কিস্তি ছিল বারো মাসে বারো কিস্তি।

প্রজা খাজনা বাকী ফেলত। ইস্তফার পত্র লিখে জমিদারী কাছারীতে দিয়ে যেত, জমিদার নিতে চাইত না—প্রজা ফেলে দিয়ে পালাত। তাছাড়া পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের পর কোম্পানী সরকার জমিদারদের প্রজার উপর জুলুমবাজীর অধিকার খর্ব ক'রে আইন তৈরী করায় জমিদারী কিনে খাজনা সুসারে আদায় করা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ফলে পুরনো জমিদারদের জমিদারী রাজস্ব বাকীর দায়ে সূর্যাস্ত আইনে নিলেম হয়ে গেল। বীরভূমের মুসলমান আমলের নবাবদের জমিদারী নিলেম হল। বর্ধমানের মহারাজার মণ্ডলঘাট পরগণা নিলেম হয়ে গেল। এক বর্ধমানের রাজার এস্টেট থেকে তিরিশ হাজার বাকী খাজনার নালিশ দায়ের হল। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ দেশে গিয়েছেন—লাটসাহেব হয়ে এসেছেন লর্ড ওয়েলেসলী। সব দেখেশুনে তিনি সপ্তম আইন—রেগুলেশন সেভেন তৈরী করে জমিদারদের ক্ষমতা দিলেন যে, বাকী খাজনার দায়ে জমিদার ক্ষেতের ফসল ক্রোক ক'রে নিলেম করাতে পারবে। সেটা ইংরিজী ১৭৯৯ সাল। সেই সময় কুড়ারাম ভট্টাচার্য একদিন দেওয়ানজীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দেওয়ান তাঁকে দেখে বলেছিলেন—কি খবর ভটচায্?

—অধীনের একটা আর্জি আছে।

—বল!

—হুজুরের মেহেরবাণীতে সবই হয়েছে অধীনের। শুধু একটি সাধ পূর্ণ হতে বাকী।

—কি সে সাধ? ব্যক্ত কর।

—হুজুর, ভেবেছি মায়ের সেবা প্রতিষ্ঠা করব—

—এ তো সাধু সংকল্প হে! করে ফেল। তোমার অর্থের অভাব আছে বললে তো আমার অবস্থাই ফকিরের অবস্থা দাঁড়ায় হে।

—আজ্ঞে—তা নয়। তবে মা কি আমার কারুর অধীনস্থ রায়ত হয়ে আসবেন মাথা হেঁট করে?

—বেশ তো, লাখরাজ করে দিচ্ছি তোমার সম্পত্তি।

—আজ্ঞে ওর সঙ্গে আর একটুকু চাই।

—সেটা কি?

—কিছু জমিদারী না হলে মায়ের মাথায় মুকুট পরাব কোন্ লজ্জায়? গ্রামের লোকের উপর তাঁর হুকুম কায়েম হবে কি করে?

—বেশ, বল কোন্ লাট কিনবে? ষোলশো বাট পরগণার হস্তবুদ কালেকটারী খাজনা তো তোমার কণ্ঠস্থ। টাকারও তোমার অভাব আমি রাখি নি।—বল!

—আজ্ঞে না হুজুর, সামান্য ব্যক্তি আমি, সাধ্য কম। তবে আমার গ্রাম কীর্তিহাট—লাট কীর্তিহাটের সামিল—ওই স্বগ্রামটুকু তার চারপাশে চারখানা গ্রাম—

বেশ, তা হবে। কীর্তিহাট এবার নীলামে উঠবে।

উঠতে বেগ বিশেষ পেতে হয়নি। কীর্তিহাটের জমিদারদের পাঠানো রাজস্ব সেবার পথেই লুঠ হয়েছিল। নিলাম ডেকে নিতেও প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে নি। নিলাম ডাক হয়েছিল কুড়ারামের নামে নয়। পুত্র সোমেশ্বরের নামে। এবং উপাধি তাঁর ভট্টাচার্য নয়, হয়েছিল রায়। লেখা হয়েছিল নিলাম ক্রেতা শ্রীসোমেশ্বর রায়—পিতা শ্রীকুড়ারাম রায় ওরফে ভট্টাচার্য। তাই সুরেশ্বরদের বংশের জমিদারী জীবনের ইতিহাসে আদি পুরুষ সোমেশ্বর রায়। তাঁর উপাধির ক্ষেত্রে ওরফে ভট্টাচার্যও আর লেখা হ'ত না। সোমেশ্বর তারপর বিস্তৃত জমিদারী কিনেছিলেন। সোমেশ্বরের পর বীরেশ্বর রায়, তারপর রত্নেশ্বর রায়—তাঁর তিন ছেলে—বড় দেবেশ্বর রায়। তাঁর দুই ছেলে—বড় যজ্ঞেশ্বর, ছোট যোগেশ্বর রায়। সুরেশ্বর যোগেশ্বর রায়ের একমাত্র সন্তান। সে আমলের বিচারে বেশী বয়সের ছেলে সুরেশ্বর, জন্মেছিল ৫ই মার্চ ১৯১০ সাল।

সুরেশ্বর পুরনো জমিদার বাড়ীর ছেলে হলেও জন্মকাল থেকেই ওর কোন সংস্রব ছিল না জমিদারীর সঙ্গে। সুরেশ্বরের বাবা যোগেশ্বর রায় জমিদারের ছেলে হয়েও পেশায় ছিলেন জার্নালিস্ট। তাঁরও জন্ম কলকাতায়। ছাত্রজীবনে তিনি উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাবা দেবেশ্বর রায়—রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র—জমিদারীতে ছ আনা অংশ পেয়েছিলেন, কিন্তু জমিদারী তাঁর ভাল লাগেনি। তিনিও ইংরিজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। হয়তো সম্পত্তির ক্ষেত্রে দেবতার সঙ্গে বাঁধা না থাকলে দেবেশ্বর ব্রাহ্মই হয়ে যেতেন। অনেকে বলে ক্রীশ্চান হতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু সম্পত্তি দেবত্র বলে তিনি তা পারেন নি। তিনি নামে জাত ও ধর্ম বজায় রেখে সম্পত্তির অধিকারই অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এবং ধর্মকর্ম ক্রিয়াকলাপের ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকবার জন্য কলকতাবাসী হয়েছিলেন যাতে তাঁর ইচ্ছামত আচরণ বিচরণের পথে কোন বাধা না-দাঁড়ায়। কলকাতায় তিনি ব'সে ব'সে ভোগ করেননি, কর্ম করেছিলেন। জমিদারীর সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবসা করেছিলেন। অবশ্য চাল ডালের গদী গুদাম নয়, বড় স্টোরস নয়। করেছিলেন কলিয়ারী কিনে কয়লার ব্যবসা। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তার আগে কারঠাকুর কম্পানী করেছিলেন। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর খনি ছিল। দেবেশ্বর তাঁর পরবর্তীকালের মানুষ, তাঁর সময়ে কয়লায় নতুন ফিল্ড বেরিয়েছে—ঝরিয়া ফিল্ড। সেই ঝরিয়া ফিল্ডে তিনি কলিয়ারী কিনে কুঠীতে সাহেব ম্যানেজার এবং কলকাতার আপিসে

সাহেব অফিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রেখে ব্যবসা চালাতেন। ব্যবসা ভালই করেছিলেন। এর সঙ্গে তাঁর ইচ্ছে ছিল তিনি একখানা খবরের কাগজ করবেন। ইংরিজী খবরের কাগজ। এ ইচ্ছে তাঁর উৎসাহিত হয়েছিল যোগেশ্বরের ছাত্র জীবনের কৃতিত্ব থেকে। যোগেশ্বর ইংরিজীতে এম-এ পরীক্ষায় বেশ ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। চেষ্টা করলে অনায়াসে ডেপুটি হতে পারতেন, কিন্তু তার বদলে দেবেশ্বর ছেলেকে নিয়ে গিয়ে অমৃতবাজারের শিশিরকুমারের হাতে দিয়েছিলেন। দেবেশ্বর রায় ছিলেন সে আমলের নামী লোক। ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়া লীগ প্রভৃতি সমিতির সভ্য এবং কলকাতার অভিজাত সমাজে সমাদৃত মানুষ ছিলেন।

রত্নেশ্বর রায় বড় ছেলের প্রকৃতি বুঝেই তাকে কলকাতার জানবাজারের বাড়ীখানাও দিয়েছিলেন। অন্য ছেলেদের জন্যে স্বতন্ত্র বাড়ী কিনে দিয়েছিলেন—অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ী। দেবেশ্বর ব্যবসায়ে ব্যর্থ হন নি, তিনি ব্যবসায় করে কয়েকটা কলিয়ারী এবং বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করেছিলেন। মৃত্যু হয়েছিল তাঁর অকস্মাৎ—কিন্তু দেবেশ্বর তার আগেই উইল ক'রে রেখেছিলেন, বড় ছেলেকে দিয়েছিলেন কলিয়ারী এবং ছোট যোগেশ্বরকে দিয়েছিলেন জানবাজারের বাড়ী এবং নগদ এক লক্ষ টাকা যা থেকে যোগেশ্বর একখানা ইংরেজী কাগজ বার করতে পারবে।

যোগেশ্বর তখন নবযুবক। কালের দিক থেকে তখন ঊনবিংশ শতাব্দী সবেমাত্র শেষ হয়েছে। বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারী ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিয়ে করেছেন—তাঁর চালচলন—রুচির সঙ্গে যোগেশ্বরের রুচির তফাৎ হয়ে গেছে, তিনি স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন; যোগেশ্বর অমৃতবাজার ছেড়ে ইংলিশম্যানে নিজের জায়গা করে নিয়ে দস্তুর মত সাহেব হয়ে উঠেছেন।

জানবাজারের বড় বাড়ীটায় প্রেস করবে যোগেশ্বর কল্পনা করেই দেবেশ্বর বাড়ীটা ওঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু যোগেশ্বর বাড়ীর সামনের যেটা পোষাকী মহল সেটা নিজের জন্যে রেখে বাকীটা ভাড়া দিয়েছিলেন—বেছে বেছে সম্পন্ন ফিরিঙ্গী টেনেন্ট দেখে। তাঁর নিজের বাড়ীতে তিনি নিজে চাকর বাবুর্চি নিয়ে থাকতেন। বিবাহ অনেক দিন পর্যন্ত করেন নি। অবশ্য সেকালের বিচারে অনেক দিন। নইলে একালে সাতাশ বছর বয়সকে কে বেশী বয়স বলবে। লোকে নানান কথা বলত। এমন কি তাঁর ভাই এবং জ্ঞাতিবর্গেরা প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করতেও শুরু করেছিল যে যোগেশ্বর ধর্মহীন বা জাতিচ্যুত হয়েছেন। যাতে তাঁদের দেবোত্তরের এজমালী সম্পত্তির সেবায়েত স্বত্ব থেকে আইন আদালত করে বঞ্চিত করা যায়। ঠিক এই সময়েই যোগেশ্বর বিয়ে করলেন—করলেন একেবারে ব্রাহ্মণের কন্যাকে—খাঁটি হিন্দুধর্ম মতে—টোপর চেলী প'রে বর সেজে নারায়ণ শিলা সম্মুখে রেখে।

১

একান্তভাবেই ঘটনাচক্রে ঘটল। নইলে যোগেশ্বর এ সব গ্রাহ্য করতেন না। জীবন-ধারণের পন্থায় তিনি সাহেব ছিলেন—মতামতে তিনি মডারেট ছিলেন। নিখুঁত সাহেবী

পোশাক পরে চুরুট মুখে সভায় পার্টিতে ঘুরতেন, রাত্রিকালে ফিটনে চেপে বেড়াতেন। হোটেলে মধ্যে মধ্যে খানা খেতেন। মদ্যপান ছিল নিয়মিত। এবং নামও তখন তাঁর ছড়িয়েছে। বিলেতের কাগজেও লেখা বের হয়। হঠাৎ বাঁধা পড়ে গেলেন সুরেশ্বরের মা হেমলতার কাছে। হেমলতার মামা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট, মাঝারি পশার, কিন্তু থাকতেন ব্যারিস্টারী চালে অর্থাৎ বিলেত-ফেরতের চালে। সেদিক দিয়ে যোগেশ্বরের সঙ্গে মিল ছিল। হেমলতার মা-বাপ দুই-ই ছেলেবয়সে মারা যাওয়ায় সে মামারই পোষ্য হয়ে ছিল, কিন্তু অবজ্ঞার পোষ্য নয়। মামা-মামী দুজনের কাছেই ছিল তার পরম সমাদর। মামী শুধু মামীই ছিলেন না, তিনি তার পিসীমাও ছিলেন—আপন পিসীমা। সুতরাং মামাও একাধারে মামা ও পিসেমশাই ছিলেন। হেমলতাকেই নিজের মেয়ের মত যত্নে মানুষ করেছিলেন। এবং বেশ বেশী বয়সে যখন তাঁদের সন্তান হল—তখন স্নেহ তার উপর পড়লেও হেমলতার উপর তাঁরা নির্দয় হননি। হেমলতা তখন এণ্ট্রান্স পাশ করে কলেজে পড়ছে। সেই সময় যেন ঠিক লগ্নটিতেই যোগেশ্বর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। হেমলতার বয়স তখন ষোল। যোগেশ্বর হেমলতাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই হেমলতার মামাকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি হেমলতাকে বিবাহ করতে চান, এবং পাত্র হিসাবে অযোগ্য নন। তাঁর আয় ব্যয় যা কিছু সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ দিয়ে লিখলেন—"হেমলতার মত নেবার ভার আপনার উপর। বিবাহ হিন্দুমতে হবে যখন, তখন এ পদ্ধতিটাও সেই মতানুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

মামা খুঁত্-খুঁত্ করেছিলেন বয়েসের জন্য এবং যোগেশ্বর সম্পর্কে গুজবের কথা শুনে। কিন্তু হেমলতা যোগেশ্বরকে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিল। সেকালে, এণ্ট্রান্স পাশ করা হেমলতা একালের এম-এ পাশ মেয়ের থেকেও প্রগতিশীলা। তার উপর বাড়ীর চালটাই ছিল বিলেত-ফেরত না হয়েও বিলেত-ফেরতদের মত। লোকে বলত,—সূর্যের তাপে বালি তাতে—তার চেয়েও বেশী তাতে উনোনের উপর আগুনের তাপে—খোলার বালি। কথাটা খুব রঙচড়ানো নয়। হেমলতা নিজেই মামীকে বা পিসীকে বলেছিল—বয়সের জন্য খুঁত্-খুঁত্ করতে বারণ করো পিসীমা। কি বয়েস ? ওর যদি তিরিশে বয়স হয়ে থাকে তবে আমিও ষোল, আমারও তো তা হলে প্রায় বুড়ী হওয়ার কাল হয়ে এসেছে গো। এ দেশে তো কুড়ি পেরোলেই বুড়ি। আর মদ-টদ—অন্য কথা। ও সব আমার ওপর ছেড়ে দাও।

তার প্রমাণও সে দেখিয়ে দিয়েছিল। একখানা চিঠি যোগেশ্বরকে লিখেছিল—আপনার প্রস্তাবে আমি মত দেব ভাবছি মামাকে। কিন্তু আপনি আমার মামার সামনে মদ খাবেন—এটা আমার কেমন লাগছে। মদ-টদ কিন্তু চলবে না। এটার প্রমাণ পেলেই আমার মত মামাকে জানাবো।

যোগেশ্বর এতে অরাজী হননি। হাজার হলেও বাঙালীর ছেলে—ভাল ভাতের সঙ্গে ছেলেবেলায় এইসব সুলভ সৌজন্য এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের আচরণগুলিতে অভ্যস্তও ছিলেন এবং এ-সবের একটা মিষ্টি-স্বাদ স্মৃতিতেও ছিল। তিনি প্রস্তাবটিকে রাবিশ বলেননি বা এতে তিনি নিজে খাটো হবেন একথাও তাঁর মনে হয়নি। সুতরাং সেদিন রাত্রেই সাড়ে আটটার পর কাগজের আপিস থেকে বেরিয়ে সটান হেমলতার মামার বাড়ীতে উঠে সিঁড়ির মুখেই চুরোটটা

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন। হেমলতার মামা সামনে হুইস্কির গ্লাস রেখে বসে ছিলেন। যোগেশ্বরকে দেখেই বেয়ারাকে ডেকেছিলেন, "বয়, গ্লাস লে আও।" যোগেশ্বর বলেছিল—নো থ্যাঙ্কস। পেগ নয়—বরং চা এক কাপ! হেসে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বলে-ছিলেন—আপনি গুরুজন—মামাশ্বশুর হবেন। ওটা আর আপনার সামনে চলতে পারে না। আমরা হরতন নই ইস্কাপন। ইস্কাপনী ধারাটাই ভাল। তার উপর বিয়ে হলে হবে খাঁটি হিন্দুমতে। রেজেস্ট্রীতে ডাইভোর্স আছে। বিধবা-বিবাহ আছে। জানেন—Spade is always a Spade—আপনাকে চিঠি লিখে অবধি রেজেস্ট্রী বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই বুকটা রি-রি করে উঠছে। তার ওপর আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক বড়, জ্ঞাতি-গুষ্টিরা শুনেছি খুঁত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রেজেস্ট্রী বিয়ে করলে তাল ঠুকে নালিশ ক'রে বসবে! তবে এটার চেয়ে ওটা বড়। ভারী ভাবতে ভাল লাগছে—আমি মরে গেলেও হেমলতা আমার ফটোয় মালা পরাচ্ছে চন্দন দিচ্ছে।

সুতরাং বিয়ে হতে আর বিন্দুমাত্র বাধা হয়নি। তবে ওই শেষ কথাটার জন্যে হেমলতা রাগ করেছিল, না-ও বলেছিল। যোগেশ্বর রাগ ভাঙিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ও কথাগুলো আমি উইথড্র করছি। তার বদলে বলছি—তুমি মরলে আমি কাঁদছি, সিঁথিতে সিঁদুর ঢেলে দিচ্ছি—পায়ে আলতা—আমি না—অন্যকে দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছি। বেনারসী কাপড় পরিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সমারোহ করে চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ করছি।—

হেমলতা হেসে ফেলেছিলেন—তুমি ইনকরিজিবল। থাম!

বিয়ে হয়েছিল ১৯০৯ সালে, মার্চে। সেদিক দিয়ে রোমান্টিক ছিলেন যোগেশ্বর। বসন্তকাল শুক্লপক্ষ দেখে দিন নির্বাচন করেছিলেন—যার কদিন পরেই হোলি। শোলার টোপর গরদের পাঞ্জাবী বেনারসী ধুতি-চাদর গোড়ের মালা চন্দনের তিলক-সজ্জা—বাকী কিছু রাখেননি। বিয়ের পর হোলির সময় দীর্ঘকাল পর কীর্তিহাটে গিয়ে এক সপ্তাহ থেকে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে এসে-ছিলেন। এবং সেবার হোলিতে নিজের খরচে রাজরাজেশ্বরের নাটমন্দিরে কলকাতা থেকে বাঈজীর নাচ করিয়েছিলেন।

এর প্রায় এক বছরের মধ্যেই জন্ম হয়েছিল সুরেশ্বরের। ফাল্গুনের শেষে ওই হোলির দিনই সুরেশ্বরের জন্ম। হেমলতা ওকে ডাকতেন সেই জন্য ফাল্গুনী বলে। এমন সুন্দর নামটা—ভাল নাম হতে বাধা হবার কথা নয়—কিন্তু কীর্তিহাটের কুড়ারাম ভট্টাচার্যের ছেলে সোমেশ্বর রায় নাম গ্রহণ করার পর থেকে ঈশ্বর পরিশেষে যুক্ত না করে নাম রাখবার নিয়ম নেই। যোগেশ্বর যে যোগেশ্বর তিনি ছদ্মনামে লিখবার জন্য যে নাম নিয়েছিলেন তাও ঈশ্বরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি—"ওমনি-পোটেন্ট" নামে লিখতেন। সেই কারণে ১৯১০ সালে বাংলাদেশের নেতা এবং সংবাদপত্র ক্ষেত্রে তখনকার সিংহ সুরেন্দ্রনাথের নামটাকেই অর্থাৎ সুর-ইন্দ্রকেই সুরেশ্বর করে নামকরণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগেশ্বরের প্রবল মত-পার্থক্য ছিল—বেঙ্গলী আর ইংলিশম্যানের মতপার্থক্য—তবু তিনি অর্থাৎ যোগেশ্বর তাঁকে বলতেন লায়ন অব বেঙ্গল।

চাকর দারোয়ান ডাকত 'লাল' বাবু বলে। আসলে ফাগুলাল কিন্তু হেমলতার ভয়ে

লালবাবু হয়েছিল।

লাল সত্যই রূপের অধিকারী ছিল, এবং বাপের দুলাল ছিল। মা শাসন করতে চাইতেন কিন্তু বাপ দিতেন না।

মধ্যে মধ্যে এ নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ হত স্বামী-স্ত্রীতে। হেমলতা বলতেন—দেখ সব বিষয়ে তুমি আমাকে দাবিয়ে রেখেছ, ছেলের ক্ষেত্রে তা চলবে না, আমি মানব না।

যোগেশ্বর কপালে হাত ঠেকিয়ে বলতেন—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।

—তার অর্থ?

—অতি সরল। তোমাকে আমি দাবিয়ে রেখেছি এ অপবাদও শুনতে হল—এবং হ'ল-হ'ল তোমার মুখ থেকেই হল?

—রাখনি দাবিয়ে? তুমি আমার কোন কথাটা রাখ?

বাধা দিয়ে যোগেশ্বর বলতেন—সে তুমি বললেও হবে না—আমি বললেও হবে না। সাক্ষী মান। বলুক তৃতীয় পক্ষ!

হেমলতা বলেছিলেন—তোমার চাকর-বাকর তো তোমাকে ভয় করে।

—বেশ তো ডাক না, এই বাড়ীর প্রায় সামনে শিককাবাবওলা আবদুল কি বলে—ডেকে জিজ্ঞেস কর!

—আবদুল? কি বলে আবদুল?

—আবদুল বলে—সাদী করকে রায়-সাহেব তো শের সে শিয়ার বন গয়া। সাদীকা পহেলে বারা-এক বাজেতক মায়দানমে ফিটনকে পর ঘুমতা, শেরকে মাফিক আওয়াজ দেতা। কনেষ্টবল লোক সেলাম দেতা। ঘরকে দরওয়াজা পর পৌঁহুছ কর শেরকে মাফিক ফুকারতা—কেয়া বানায়া রে আবদুল? আর সাদীকে বাদ দেখো—নও বাজতা আওর রায় সাহেব ঘর মে পৌঁহুছ যাতা—, আবদুলকো ফুকারতা নেহি—কাবাব ভি খাতা নেহি—ঘর ঘুষ যাতা। বারা বাজতা বাত্তি বুত যাতা। পহলে—দো-তিন তক বাত্তি জলতা, রায় সাহাবকো আওয়াজ মিলতা—বোয়! খানা টেবিলসে বর্ত্তন-উর্ত্তন ফেক দেতা—ঝন-ঝন-ঝন-ঝন—! বাস। আব বলো—ঠিক বোলা কি ঝুট বোলা! নেকড়ানি ফিরিঙ্গী ছোকরী লোক তো রোতি হ্যায় উনকো লিয়ে!

হেমলতা এ সবের একটাও অস্বীকার করতে পারতেন না—মুখ টিপে হেসে বলতেন—লোকটাকে আমি বকশিস করব, কিন্তু তার জন্যে আপশোস হয় না কি?

—একবারে হয় না বলতে পারিনে। তবে তার থেকে অনেক বেশী আনন্দ এবং আরাম তাতে সন্দেহ নেই। ছেলেবেলা কীর্তিহাটে চণ্ডী ভটচাজ ছিল তন্ত্রসাধক। দিন-রাত্রি মদ খেয়ে থাকত, টলত। তার ভায়ে অমর মুখুজ্জে গাঁজা খেতো। চণ্ডী ভটচাজ বলতেন—ওরে অমরা, আমি একদিন একছিলম গাঁজা খেয়েছিলাম—তিনদিন হুঁস ছিল না—সেই গাঁজা তুই ব্যাটা দিনে তিনবার টানিস! তা দেখ, বিয়েও আমার কাছে তাই। ওই একবার খেয়ে যে বুঁদ হয়ে গেছি সে বুঁদ নেশা আর কাটল না। রাত্রি নটা হ'তে না হ'তে সেই বিয়ের রাতের চাঁদ ওঠে মনের মধ্যে। কলায় কলায় বাড়তে থাকে মিনিটে মিনিটে! পূর্ণ চন্দ্র

দেখতে ছুটে এসে আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি ! তুমি ভেবো না, ব্যাটার ষোল বছর হতে-না-হতে বিয়ে দিয়ে দেব। আমি শেয়াল হয়েছি—ব্যাটা খরগোস হয়ে যাবে।

—কিন্তু তরিবৎ সহবৎ লেখাপড়া—এগুলো চাই না কি ?

—ডোণ্ট ওরি—ডার্লিং, তুমি মা, আমি বাপ, আমার বাপ দেবেশ্বর রায় এম-এ, তার বাপ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় বি-এ, তার বাপ বীরেশ্বর রায়,—তিনি নীলকরদের ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, পাদরী হিল সাহেবের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহী প্রভৃতির বিদ্যোৎসাহিনী সভায় তাঁর নেমন্তন্ন হত। রত্নেশ্বর মানুষ হয়েছিলেন পিসেমশাইয়ের কাছে। পিসেমশাই বিমলাকান্ত ছিলেন সংস্কৃতে ইংরিজিতে পণ্ডিত। সোমেশ্বর তাদের পূর্বপুরুষ—তিনি সংস্কৃত, পার্সী, উর্দু ভাল জানতেন। এ বংশের সুরেশ্বর তরিবৎ সহবৎ লেখাপড়া সব শিখবে।

যোগেশ্বরের অতিবাৎসল্যের আর একটু কারণ ছিল ; সুরেশ্বরের জন্মের দু বছর পর হেমলতা আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন এবং প্রসবের সময় মরণাপন্ন হন। বহু কষ্টে বহু অর্থব্যয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের অস্ত্রোপচারের ফলে মরা সন্তান কেটে বের করে দেওয়া হয়, এবং সেই সঙ্গে হেমলতারও আর সন্তান ধারণের শক্তি শেষ হয়।

যোগেশ্বর সেটা মনে পড়িয়ে দিতেন—আর তো হবে না। তাছাড়া আমরা যখন আমরা হয়েছি তখন ও-ও তাই হবে, মা ভৈঃ।

নিরস্ত হতে হ'ত হেমলতাকে। হয়তো স্বামী-গরবিণী অন্তরে অন্তরে পুলকিতও হতেন।

* * *

মা ভৈঃ বলতেন বটে যোগেশ্বর কিন্তু এগার বছর বয়সে তিনি ছেলেকে নিজেই ভয় পেলেন। তিনি যে চেয়ারটায় অনড় হয়ে বসেছিলেন ইংলিশম্যান আপিসে ১৯০৫ সাল থেকে, সেই চেয়ারটায় ধাক্কা দিয়ে তাঁকে চমকে দিল এগার বছরের ছেলে সুরেশ্বর। অবশ্য তিনি নিজেই যেন চঞ্চল হয়ে অন্যমনস্ক ছিলেন, ঠিক শক্তভাবে নিজের পুরো চাপ দিয়ে বসে কর্মনিমগ্ন ছিলেন না। সেটা উনিশশো একুশ সাল—অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। যোগেশ্বর বরাবর ইংরিজীর ভক্ত, ইংরেজ শাসন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। এর জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথকে তিনি মানেননি। বেঙ্গলীর এডিটোরিয়ালের জবাব লিখেছেন। ১৯০৫ সালে কোথায় এক টিন বিলিতী বিস্কুট ভেঙ্গে ছড়িয়ে গুঁড়ো করার জন্য তিনি একটা প্যারা লিখেছিলেন—"একটি আবিষ্কার"। তাতে লিখেছিলেন—"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলাম যে, ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যের স্বত্বের দলিল নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ বিস্কুটের টিনে প্যাক করে রেখে দিয়েছে। সেই সত্য আবিষ্কার করেছেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং তাঁর সহকর্মীরা। সম্প্রতি স্থানে স্থানে বিস্কুটের টিন পেলেই ভেঙে দেখা হচ্ছে দলিলখানা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কর্তারা বিস্কুটগুলো অপচয় করছেন কেন ? সেগুলো খেলে তো পেট ভরে।"

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সরকার থেকে তিনি মেসোপোটেমিয়া ফ্রণ্ট এবং ওদিকে ফ্রান্সে ভার্দুন পর্যন্ত ফ্রণ্ট দেখে এসেছিলেন।

গান্ধী যখন কলকাতায় এসে ভুপেন বোসের বাড়ী অতিথি হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে

দেখেছেন—আলাপ করেছেন। তাঁর ভাল লাগেনি। বাড়ীতে হেমলতার সঙ্গে আলোচনায় বিদ্রূপ করেছেন। বিদ্রূপ করেছেন তাঁর বেশভূষার জন্য, বিদ্রূপ করেছেন তাঁর ফল খেয়ে থাকার জন্য, তাঁর অদ্ভুত মতবাদের জন্য। এবং যেদিন রাউলাট বিলের প্রতিবাদে হরতাল ডেকে শেষ পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের মত মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটল সেদিন তাঁর যত ক্রোধ হয়েছিল ইংরেজের ওপর এমন কি সার মাইকেল ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারের উপর তার চেয়েও তাঁর ক্রোধ হয়েছিল গান্ধীর উপর। সেই—সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলেন ব্যক্তিটির ভারত চিত্ত অনুভবের শক্তি দেখে। এত তাপ এদেশের মাটির মত মানুষের মধ্যে সঞ্চিত ছিল? তারপর ধীরে ধীরে যে বিচিত্র পরিচয়ে এই খর্ব কৃশকায় ব্যক্তিটি নিজেকে উদ্ভাসিত করেছিলেন এবং যার প্রতিচ্ছটায় ইংরেজের নতুন চেহারা দেখিয়েছিলেন, তাতে তাঁর বিস্ময় জেগে উঠছিল। কলকাতার কংগ্রেসে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটিকে দেখছিলেন। স্তিমিত কৃশকায় ছোট একটি মানুষ! তেমনি বেশভূষা! অথচ—!

এ নিয়ে ইংলিশম্যানের সম্পাদকীয় বৈঠকে আলোচনা হত। প্রথমদিকে তিনি ছিলেন প্রখর বক্তা। তারপর যত দিন গেল তত তিনি হয়ে উঠলেন নীরব থেকে নীরবতর। ইংলিশ-ম্যানের খোদ সম্পাদক মশায় ছিলেন যোগেশ্বরের বন্ধু এবং গুণমুগ্ধ। সব থেকে ভাল লাগত তাঁর যোগেশ্বরের শ্লেষভরা উক্তি!

তিনি একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—মিস্টার রে—

যোগেশ্বর হেসে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন, কথা বলেন নি!

সম্পাদক বলেছিলেন—তুমি এমন নীরব চুপচাপ হয়ে যাচ্ছ কেন?

চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চেয়ারের পিছন দিকে হেলান দিয়ে বসে যোগেশ্বর বলছিলেন—হয়ে যাচ্ছি, না?

—কি হয়েছে?

—ঠিক জানি না। তবে দেখ, আমার বাড়ীতে একটা কুকুর ছিল, কিছু দুর্ঘটনা ঘটবার হলে সেটা কেমন গুড়িগুড়ি পাকিয়ে কোণ খুঁজে বেড়াত আর মধ্যে মধ্যে মৃদু শব্দ করত। আমারও মনে হচ্ছে ওই কুকুরটার ছোঁয়াচ লেগেছে। I am smelling something like that—একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—Something will happen. —আমি যেন কারুর footsteps শুনতে পাচ্ছি!

—Oh Ray—তুমি যে মিস্টিক হয়ে পড়ছ—

—Perhaps. বলে হেসেছিলেন যোগেশ্বর।

তারপরও নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীর নন-কোঅপারেশন নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। হাওড়া প্ল্যাটফর্মে সি আর দাশের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে আপিসে ফিরে খুব কড়া ভাষায় লিখেছিলেন সম্পাদকীয়। প্রবন্ধটা কড়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর যেটা বৈশিষ্ট্য—শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ সেটা ঠিক ছিল না তাতে। এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন কংগ্রেসের অধিবেশনে এই খর্বকায় কৃশতনু ব্যক্তিটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হবেন। কলকাতা কংগ্রেসে যে প্রস্তাব উপস্থিত হয়েছে তা নাগপুরে নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত হবে। সি আর দাশ তো সেজেই গেছেন ডেলিগেট নিয়ে।

কিন্তু আশ্চর্য! সি আর দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লজপত রায়, পণ্ডিত মালব্য, মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না, সভাপতি বিজয়রাঘব চারিয়া—সকলে এই ব্যক্তিটির প্রভাবে এক বাক্যে কলকাতায় গৃহীত প্রস্তাব কনফার্ম করে গ্রহণ করলে। যোগেশ্বরের বিস্ময়ের অবধি রইল না। যেদিন খবরটা আসে সেদিন তাঁকেই বলা হয়েছিল সম্পাদকীয় লিখবার জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে থেকে তিনি প্রধান সম্পাদককে স্লিপ পাঠিয়েছিলেন—আমার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে। আজকের লীডার তুমি নিজে লিখো। আমি বাড়ী যাচ্ছি। দীর্ঘক্ষণ তিনি গঙ্গার ধারে বসে থেকে বাড়ী ফিরেছিলেন। এবং সে রাত্রে যে মদ্যটুকু নিয়মিত খান তা খেয়ে উঠতে পারেননি—চিন্তার মধ্যে। এত ভুল হল তাঁর?

তারপর একুশ সালে আরম্ভ হল আন্দোলন। তিনি আপিসের রিভলভিং চেয়ারে বসে ঘুরতেন—এটা যেন নেশা হয়ে গেল তাঁর। তিনি মনে মনে ঘুরতেন চারিদিক। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটাকেও ঘোরাতেন।

একটা নতুন চেহারা। গোটা দেশটার একটা নতুন চেহারা। মদ্যপ মদ ছাড়ছে। চাকুরে চাকরী ছাড়ছে। ছাত্ররা পরীক্ষার হলের সিঁড়িতে শুয়েছে, নিজেরা পরীক্ষা দেবে না—অন্যদের দিতে দেবে না। শোভাযাত্রীর উপর লাঠিচার্জ হচ্ছে। তাদের অ্যারেস্ট করে জেলে পাঠানো হচ্ছে; কিন্তু একদল যাচ্ছে আর একদল তার স্থান পূরণ করছে। মেয়েরা জেলে যাচ্ছে। বাসন্তী দেবী জেলে গেলেন দাশ মশায়ের পিছন পিছন। এ হ'ল কি?

ইংরেজরা গাল দিচ্ছে।

সুরেন্দ্রনাথ পিছিয়েছেন। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি নিজে তাঁরও পিছনে অনেক পিছনে। তিনি ইংলিশম্যানে এডিটোরিয়াল লিখছেন। তাঁর পিতা দেবেশ্বর রায় বিপ্লবীদের সমর্থন করেছেন গোপনে - অর্থ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি? এমনিই অবস্থায় ওই ঘোরানো চেয়ারখানা কিসের ধাক্কায় যেন উল্টে যাই-যাই হল। টেলিফোন বেজে উঠল। তিনি রিসিভার তুলে ধরে বলেন—রয়!

ওদিক থেকে কথা ভেসে এল—আমি হেম বলছি!

—কি? কি খবর?

—তুমি বাড়ী এস। গাড়ী গেল।

—এই তো ঘণ্টাখানেক বাড়ী থেকে এসেছি—

—সুরেশ্বর ইস্কুল থেকে ফেরেনি। গাড়ী ফিরে এল—তাকে পায়নি।

—মানে?

—সে টিফিনে বেরিয়ে চলে গেছে। ক্লাসের বন্ধুরা বলেছে—সে বড়বাজার গেছে পিকেটিং করতে!

—পিকেটিং করতে?

—হ্যাঁ।

যোগেশ্বর তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে এসেছিলেন আপিস থেকে। সেই এসেছিলেন আর ঢোকেন নি।

রাত্রি হয়েছিল সুরেশ্বরকে বের ক'রে আনতে। সার্জেণ্টের হাতে সে মার খেয়েছিল। থানার লকআপ থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। তাতে সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয়নি, লজ্জিত হয়নি, সগৌরবে ঘোষণা করে বলেছিল—আমি ওঁকে ইঁট মারতে পারতুম কিন্তু মারতে মানা। অহিংসার মানে কি হয় বাবা?

যোগেশ্বর আগে হ'লে বলতেন—কাউয়ার্ডিস। ভীরুতা হল এর মানে। কিন্তু সেদিন তা বলতে পারেননি। বেটনের ঘায়ে সুরেশ্বরের পিঠে কয়েকটা দাগ উঠেছিল। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—

—মার খেয়ে তুমি বলেছিলে—আর করব না?

—না। সবেগে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে সে বলেছিল—আমি বন্দে মাতরম বলেছিলাম!

—তুমি এখন শুয়ে পড়। এখুনি ডাক্তার আসবেন।

এরপর একলা ঘরে পায়চারি করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলেন—He is the man. Yes, He is the man.

চাকর হুইস্কির বোতল গ্লাস সোডা দিয়ে গিয়েছিল, প্লেটে মাংসের বড়া—হেমলতার নিজের তৈরী, দিয়েছিল, তার সঙ্গে স্যালাড এবং একটা কাটলেট। যা তাঁর নিত্যকারের খাদ্য। কিন্তু ও-সবের আকর্ষণেও তিনি চেয়ারে এসে বসেননি। সেই ঘুরেই বেড়াচ্ছিলেন। ছেলেকে ডাক্তার দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে হেমলতা তাঁর ঘরে এসে ঢুকে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—একি? এখনও ঘুরপাক খাচ্ছ? ভয় নেই, বস, সুরো ঘুমিয়েছে, ডাক্তার দেখে বললে—হ্যাঁ—মার খেলেই দাগ ওঠে। নাথিং—সিরিয়াস। হাসপাতালে একে বলে মাইনর ইনজুরি।

—হুঁ। আর একটা পাক ঘুরে আসতে আসতেই হেমলতার কানে তাঁর ওই He is the man কথাটা গিয়েছিল। বলেছিলেন—কি বলছ?

—ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, বল তো এদেশের সব থেকে বড়লোক—আই মীন গ্রেটেস্ট মেনদের নাম। ফাইভ অর সিক্স।

—কেন রামমোহন রায়?

—তাঁর নাম—কীর্তিহাটের লোকে জানে? তাছাড়া উনি তো টাটকা—। পাঁচ হাজার বছর পর যাদের নাম থাকবে—ফাইভ—বল!

—তা হ'লে—। শ্রীরামচন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ—

—ওঁরা অবতার।

—তা হলে—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—

—দ্যাটস ইট। করেক্ট। এদেশে রাজা রাজপুত্র বীর—এরা নয়—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ দিজ সন্ন্যাসীজ—এরাই বড়। এরাই বেঁচে থাকে। এবং If I am not wrong, একটু ভেবে বলেছিলেন—no—I am not wrong,—this man—this Mr. Gandhi

—he is one of them. লোকটা ঘরে থাকবে না। নিশ্চয় চলে যাবে ঘর ছেড়ে। দেখো।

—তোমার হ'ল কি? বস, খাও। খাবার জুড়িয়ে গেল—

—যাক। বোতল গ্লাস সোডা নিয়ে যেতে বল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাও!

—না-না—পাগলামী করো না, এতদিনের অভ্যেস! বরং কমাতে পার।

—নো। মরদ কি বাত—হাতী কি দাঁত। আমি বন্য শূকর নই। শূকরেরও দাঁত থাকে—সে দাঁতে কোন কাজ হয় না!

খাননি মদ।

পরদিন সকালে উঠে চলে গিয়েছিলেন বাজারে, চীৎপুর বেণ্টিক স্ট্রীট অঞ্চলে। হেমলতা বলেছিলেন—কোথায় যাচ্ছ?

—আসছি। ব্যস্ত হয়ো না।

ঘণ্টা দেড়েক পরেই ফিরে এসেছিলেন এক সেতার এবং এক বেহালা নিয়ে।

হেমলতা সবিস্ময়ে বলেছিলেন—ও মা! এ কি হবে?

—বাজাবো।

—এই বুড়ো বয়সে সারেগামাপাধানিসা? কি খেয়াল তোমার?—হেমলতা তাঁর বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গীতানুরাগের কোন পরিচয় পান নি। যোগেশ্বর হেসে বলেছিলেন—ক্ষণেক অপেক্ষা কর!

ব'লে বেহালাখানা নিয়ে সুর বেঁধে বাজিয়েছিলেন কিছু। এবং অতি নিপুণ সুন্দরভাবে বাজিয়েছিলেন।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন হেমলতা। কথা বলতে পারেন নি। সুরেশ্বরও এসে দাঁড়িয়েছিল। যোগেশ্বর হেসে প্রশ্ন করেছিলেন—কি বাজালাম জান?—

সুরেশ্বর বলেছিল—আমি বলব বাবা?

—পার বলতে? হ্যাঁ তা পারবার কথা। বল—

—একি রূপ হেরি হরি ধরেছ যোগীর বেশ—। বাগেশ্রী!

—রাইট। তারপর হেমলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—গ্রামোফোনের সামনে ব'সে ওর গান শোনা এবং গলা মেলানো দেখ নি! কিন্তু গলা নেই। তবে সঙ্গীত রোখটা আমাদের রক্তে আছে বংশগত! শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষে একজন ছিলেন মস্ত বড় সাধক। আর গানে ছিলেন সিদ্ধহস্ত অর্থাৎ যন্ত্রী!

—কই, আমাকে তো কখনও বলনি?

—কি বলব? ছেলেবেলা কীর্তিহাটে ছিলাম ক' বছর। ঠাকুরদা তখন বেঁচে। তখন শিখেছিলাম। কিন্তু বাবা আমাকে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, ওটা তুমি শিখো না। তা হলে আর কিছু হবে না। বৃদ্ধ বয়সে ওটা নিয়ে বসো। তখন কল্যাণ হবে।

—সে বয়স এই চল্লিশ বছর বয়সেই হল?

—হ'ল বই কি! আজ থেকে বানপ্রস্থ।

এর অর্থটা ঠিক বুঝতে পারেন নি হেমলতা। মানে চেষ্টাই করেন নি। দুপুরবেলা খেয়ে শোবার সময় বলেছিলেন—দেখ আমাকে আজ আর ডেকে ঘুম ভাঙিয়ো না। মানে নট বিফোর ফোর। কোচম্যানকে বলে দিয়ো গাড়ী চাই না।

—আপিসে যাবে না?

—না, ওবেলাতেই চুকিয়ে দিয়েছি পাট!

—কি যে হেঁয়ালী কর—

—বলি নি তোমাকে, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছ? বিস্ময়ের অবধি ছিল না হেমলতার। কারণ জালিয়ানওয়ালাবাগের সময় থেকেই সে বহুবার অনুরোধ করেছে সায়েবদের ইংরিজী কাগজ ছাড়তে। কিন্তু যোগেশ্বর ছাড়েন নি। বলেছিলেন—হেম, সেন্টিমেণ্ট ইমোশন বড় সর্বনাশা। ওর একসেস যখন হয় তখন আত্মহত্যার ঝোঁক চাপে মানুষের। পাথরে মাথা ঠোকে মানুষ—মাথা রক্তাক্ত হয়। পাথর ভাঙে না—মানুষের মাথা ভাঙে। এই পাথরে কাঁচা মাথা ঠুকে মাথা ভেঙে আত্মহত্যার সেন্টিমেণ্টাল ইমোশনালিজ্‌ম থেকে জাতটাকে বাঁচানো আমার মিশন। অন্যে না বুঝুক, তুমি অবুঝ হয়ো না! বিশ্বাস রাখ আমি বুঝি। অনেক বুঝি। এই ইংরেজ জাত যত বড় তত নিষ্ঠুর! আজ সেই লোক চাকরী ছেড়ে দিয়েছে শুনে হেমলতা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন!

যোগেশ্বর বলেছিলেন—অবাক হয়ে গেছ?

—তা হয়েছি!

—দুঃখিত হয়েছ?

—না। খুশী হয়েছি।

—সত্য কথা?

—তার থেকেও বেশী কিছু! বোঝাতে পারব না তোমাকে!

—তাহ'লে—

—কি—

—তা হলে—গিভ মি এ—

—পাগল! উন্মাদ! এত বড় ছেলে পাশের ঘরে!

—তা বটে। জান ওই ওরই জন্যে—না ওর জন্যে নয়, ও আমার একটা দুরন্ত ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে। আই ওয়াজ এ কাওয়ার্ড! ভয়ে বলতাম ইংরেজ পাথর। ও মাথা ঠুকে অক্ষত মাথা নিয়ে ফিরে এসে আমাকে দেখিয়ে দিল যে না তা নয়।

—যাক। তুমি ঘুমোও। আমি সুরোকে ঘরে বন্ধ করেছি। তার কাছে যাই! বিকেলে কিন্তু খদ্দর কিনতে যাব। সুরোকে কথা দিয়েছি।

—শোন—আর একটা কথা।

—কি?

—আমাকে ঘুম পাড়িয়ে মা-বেটা দুজনেই যেন বেরিয়ে পড়ো না পিকেটিংয়ে।

—ঠাট্টা হচ্ছে ?

—মোটেই না। বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছি। সুন্দরী প্রগতিশীলা লেখাপড়া জানা মেয়ে তুমি। তবুও কোনদিন বুড়ো বয়সের ব্যাধি যেটা সেটাকে প্রশ্রয় দিই নি। মানে সন্দেহ-বাতিক। আজ ভয় হচ্ছে—ছেলের কাছে ঘায়েল হয়ে কাত হয়েছি। তুমি তাতে পুলকিত। আনন্দে আটখানা হয়ে খদ্দর কিনতে যাচ্ছ। দেখো, উৎসাহবশে দোকান থেকে বেরিয়েই পিকেটিংয়ে নেমো না মা বেটায় !—জেলে যাও, কষ্টেসৃষ্টে বিরহ সইতে পারব। কিন্তু উদ্বেগের সীমা থাকবে না, মনে মনে কোন পিকেটিংরণ নিপুণপ্রদীপ্ত পুরুষকে জয়মাল্য দিলে !

হেমলতা সেকালের আধুনিকা। কালটা একদিকে যেমন ক্ষোভ আর রোষের যুগ তেমনি রসের যুগ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসে গৌড়ভূমি ভেসে গেছে। হেমলতা রাগ করেন নি। তিনি হেসে বলেছিলেন—দেখ, তোমার এই রসবোধের জন্যই বয়সের বার তের বছর তফাত সত্ত্বেও আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তোমরা জমিদার, তুমি জার্নালিজমে নামী লোক, শৌখীন সাহেব মানুষ, তোমার ফ্রেঞ্চছাঁট দাড়ি আছে, সে জন্যে নয়। আজ এই চাকরী ছাড়লে মদ ছাড়লে এর জন্যে admiration—প্রায় ভক্তিবাদে এসে পৌঁচেছে। ভেবো না। ইন্দ্র হাতছানি দিয়ে শচীত্ব অফার করলেও আমি মরতে চাইব না। তোমাকে ফেলে ! বলে স্বামীর ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখেছিলেন।

যোগেশ্বর পরবর্তীকালে বলতেন—ওই দিনটি তাঁর জীবনে সর্বোত্তম সুখের দিন !

এর পর সেতার বেহালা নিয়ে পড়েছিলেন যোগেশ্বর। ওস্তাদ রেখেছিলেন। এবং শেখার সময় সুরেশ্বরকে কাছে রাখতেন। সুরেশ্বর জন্মাবধি যে সঙ্গীতবোধ নিয়ে জন্মেছিল—তাতে সে না-শিখেই বাঁয়া তবলা বাজাতে পারত। আর ছবি আঁকত যেখানে সেখানে।

সে বছর খানেক। এর মধ্যেই ক্রমে ভাঁটা পড়ে এল আন্দোলনে। জেলখানায় দেশবন্ধু দাশের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কথা হ'তে হ'তে বন্ধ হল। গান্ধী রাজী হলেন না। অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন যোগেশ্বর।

হঠাৎ গানবাজনা বন্ধ ক'রে পড়াশোনায় মাতলেন। সুরেশ্বরকে ইস্কুল তিনি তখনই ছাড়িয়েছিলেন। বাড়ীতে মাস্টার রেখে পড়াচ্ছিলেন। সুরেশ্বর যদৃচ্ছ পড়ত। তার কোন বাধানিষেধ ছিল না। তিনি নিজে পড়তে লাগলেন—গীতা চণ্ডী থেকে শুরু করে রামায়ণ মহাভারত—উপনিষদ পর্যন্ত।

হেমলতা শঙ্কিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—এ কি করছ তুমি ?

—একটা মীমাংসা খুঁজছি। An answer—

—কিসের ?

—বাঘ সাপের সামনে ননভায়োলেন্স—অহিংসার কিছু দাম আছে কিনা ? এবং মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বাঘ সাপের প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কিনা ? কথাটা বুঝেছিলেন হেমলতা। উত্তর দিতে পারার তাঁর কথা নয় কিন্তু তিনি বলতে পারতেন, কেন এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি ? স্বাভাবিক নিয়মে যা ঘটবার তা ঘটবেই ! বা এই ধরণের কোন কথা তিনি নিশ্চয় বলতে পারতেন কিন্তু তাও তিনি বলতে পারেন নি !

যোগেশ্বর বলেছিলেন—নর্থ পোল সাউথ পোলেও ছ মাস দিন—ছ মাস রাত্রি। ডার্কনেস অ্যাণ্ড লাইট। সমান অধিকার। সূর্যলোকে গেলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়! ছাট ইজ ডেথ। এ লোকটি ভুল করলে। গান্ধী! ইংরেজ নিজেকে ব্রিটিশ লায়ন বলে, কিন্তু আসলে সে বাঘ! এত বড় এম্পায়ার যে সে গড়েছে তাতে তার ক্যারেক্টারে সিংহের ক্যারেক্টারের স্ট্যাম্প নেই, আছে বাঘের। ব্রিটিশ জাস্টিস ততক্ষণ যতক্ষণ তার এম্পায়ার অনড় আছে। নতুন গড়া নতুন পাওয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর মধ্যে প্রজার উপর অত্যাচার হয়েছিল, কটা রাজা রাণী বেগমের ওপর অত্যাচার হয়েছিল ব'লে হেস্টিংসের ইম্পীচমেণ্ট হয়েছিল, বার্ক সেরিডনের কণ্ঠস্বর হেস্টিংসকে তিরস্কার করে পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিল; কিন্তু আর তা হবে না, নিশ্চিত থাক। অক্টারলোনী মনুমেণ্টটাকে আমি আওয়াজের ধাক্কায় কাঁপতে দেখি! দিস ম্যান—আশ্চর্য ক্ষমতা কিন্তু এক ভুলে সব মাটি করে দিলে। আমি চোখে দেখছি!

হেমলতা এবার বলেছিলেন—তুমি কাগজ বের কর। লেখ।

—কাগজ?

—হ্যাঁ।

—উহুঁ—ও আমার দ্বারা হবে না। লিখতে পারলেই কাগজ বের করা যায় না!

—কেন—তোমার তো টাকার অভাব নেই!

কথাটা মিথ্যে ছিল না। তাঁর বাপ তাঁকে এক লাখ টাকা নগদ দিয়েছিলেন—কাগজ বের করবার জন্যেই। বড়ছেলেকে কলিয়ারী দিয়েছিলেন, তাঁকে দেন নি—তার জন্যে। এ ছাড়া এত বড় বাড়ীটা দিয়েছিলেন—সেও এরই জন্যে। নিচের তলায় প্রেস হবে। উপরতলায় আপিস। একদিকে কিছুটা নিয়ে তিনি থাকবেন; প্রয়োজন হলে তেতলায় ঘর তুলে নেবেন। কিন্তু যোগেশ্বর তা না ক'রে কাগজের আপিসে চাকরীই করেছেন। বাড়ীর নিচের তলাটা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়া দিয়েছেন বড় বড় কোম্পানীকে। তারা গুদোম করেছে। চাল ডাল খাদ্যদ্রব্য যাতে ইঁদুর লাগে—তাদের দেন নি; পাটওয়ালাদের দেন নি আগুনের ভয়ে। দিয়েছেন হগ মার্কেটের, ধর্মতলার যারা স্টেশনারী জিনিস আমদানী করে তাদের। ভাড়ায় নিজের উপার্জনে শেয়ার ডিভিডেণ্ডে কীর্তিহাটের জমিদারীর অংশ বাবদ দেবখরচ বাদে উদ্বৃত্ত আয়ে তাঁর খরচ সংকুলান হয়েও বছর বছর অনেক সঞ্চয় হয়ে ওই এক লাখ টাকাকে স্ফীত করে প্রায় তিন লাখের কোঠায় নিয়ে গেছে। সুতরাং তিনি কাগজ বের করতে চাইলে অবশ্যই বের করতে পারেন।

যোগেশ্বর বললেন—টাকা—লেখা—বাড়ী এ তিনটে কাগজের পক্ষে বাইরে থেকে দেখতে খুব জরুরী। তার চেয়েও জরুরী হল ব্যবসার দিক। ওতে আমার মাথা খারাপ হয়।

—আমি দেখব!

—তুমি? হা-হা করে হেসেছিলেন যোগেশ্বর।

—তুমি হাসছ? আমি পারব না?

—পারবে না বলছি নে। কিন্তু আমার ভুল পলিসিতে কাগজ ডুবতে বসলে আমাকে নোটিস

দিতে পারবে ইওর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড বলে ?

শুধু হেমলতাই নয়। বন্ধুবান্ধব সকলেই বলেছিল। তারা সব বিশিষ্ট লোক। এবং সংবাদপত্র জগতের লোক অনেকে। দু-একটা কাগজ থেকে তাঁকে চাকরীও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি নেন নি।

দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি করে তাঁকে ডেকেছিলেন। দেশবন্ধু তাঁর থেকে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। অসীম শ্রদ্ধাও তিনি করতেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন—আমাকে নিয়ে আপনাদের চলবে না। আমি পারব না বনিয়ে চলতে !

—বেশ—তুমি লেখ।

—তা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি !

চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। বলেছিলেন—হচ্ছে না !

—হচ্ছে না মানে কি ? এত বড় নামী লেখক তুমি—পারছ না ?

—বল পারছি না।

—পারবে। আমি ব্যবস্থা করছি।

এই কথা বলে হেমলতা মদ আনিয়ে বলেছিলেন—এতকালের অভ্যেস ছেড়ে দিয়ে তুমি দুবল হয়ে গেছ। খেয়ে দেখ তো পার কি না ?

—খাব ?

—খাবে, আমি বলছি।

খেয়েছিলেন এবং মিনিট কয়েক পরে বলেছিলেন—ঠিক বলেছ।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক গ্লাস খেয়ে কিছুক্ষণ পর কাগজ কলম টেনে বসেছিলেন লিখতে। গান্ধীজীর অহিংসা মতবাদকে বিদ্রূপাত্মক যুক্তির ধারালো ছুরিতে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে নিজের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজের ইংরিজী কাগজে। খুব মোটা হেডলাইন দিয়ে সমাদর ক'রে তারা ছেপেছিল। এতদিন পরে এই প্রথম লেখাটাই চারিদিকে বেশ সোরগোল তুলেছিল—শুধু বাংলাদেশেই নয়—গোটা ভারতবর্ষে। মাদ্রাজের হিন্দু বম্বের টাইমস অব ইণ্ডিয়া দিল্লীর কাগজ সর্বত্রই এ নিয়ে আলোচনা চলেছিল। লণ্ডনের টাইমস পত্রিকাতেও কিছু মন্তব্য করেছিল তারা।

প্রশ্নটা ওই অহিংসা নিয়ে। বলেছিলেন—হয় গান্ধী বলুন এটা তাঁর নেহাতই বাঘের স্বরূপের উপর নামাবলী, ভবিষ্যতে একদা নামাবলীখানা ফেলে দিয়ে ব্যাঘ্র মূর্তিতে দাঁড়াবেন অথবা তিনি নিতান্তই সেই হিতোপদেশের গল্পের মূষিক ? যে মূষিককে এক ঋষির বরে কয়েকদিনের জন্য লোকচক্ষে বাঘ বলে মনে হত এবং পরে যে আবার মূষিকই হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় বছর দেড়েক যে টেলিফোনটা কদাচিৎ বাজত সেটা সেদিন থেকে আবার মুখর হয়ে ওঠে প্রবলভাবে।

হেমলতা খুব খুশী হয়েছিলেন।

সুরেশ্বর তখন বারো বছরের। ইংরেজী সে বাপের কাছে পড়ত। সে বলেছিল—এ তুমি

কেন লিখলে বাবা ?

যোগেশ্বর তাকে স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দেন নি, তিনি তাকে সাধ্যমত বুঝিয়েছিলেন। গল্প বলেছিলেন অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের, ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের, রাশিয়ান রেভল্যুশনের। সুরেশ্বর বয়সের তুলনায় পড়েছিল অনেক। গোগ্রাসে যাকে পড়া বলে। এবং তার খোরাক যুগিয়েছিলেন—যোগেশ্বর।

সেদিন গল্প বলতে বলতে তিনি সুরেশ্বরকেই বলেছিলেন—গেলাসে মদ ঢেলে দিতে। সুরেশ্বরই দিচ্ছিল। একসময় হেমলতা এসে বলেছিলেন—এ কি! ও কি হচ্ছে? তুমি কেন ঢালছ, সুরো?

—বাবা বললে যে।

—হ্যাঁ আমি বলেছি।

—খুব ভাল! এর থেকে ভাল আর কিছু হ'তে পারে না।

হেসে যোগেশ্বর বলেছিলেন—দেখ, ওর বয়স আঠারো পার হলে আজ আমি ওকে খেতে শেখাতুম। খেতে তো শিখবেই। যার তার কাছে শিখবে কেন? বলে হা-হা ক'রে হেসেছিলেন।

হেমলতা রাত্রে বলেছিলেন—না-না—এত বাড়াবাড়ি করো না। দেখছি আমিই অন্যায় করেছি তোমাকে আবার ধরিয়ে।

—খুব যে অহঙ্কার!

—মানে?

—তুমি না-দিলে, বোধহয় আমিই আনিয়ে শুরু করতাম! তুমি এলে মনের কথা নিয়ে মানসীর মত অথবা ডেস্টিনির মত।

তারপর কিছুদিন তিনি বিপুল উৎসাহে লিখলেন। প্রতিপন্ন করলেন—অন্তত তিনি তাই ভাবলেন, যে অহিংসার কল্পনা একটি রঙীন ফানুস ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এই ফানুস যখন ফাটে তখন তার যে গ্যাস বাতাসে ছড়ায় তাতে নিঃশ্বাস নেয় যে মানুষ তাদের একটা নেশা লাগে। বুদ্ধের পরে এই নেশায় গোটা দেশের মানুষ একটা ক্লীবের জাতিতে পরিণত হয়েছিল। দেশের বর্তমান এই যে ইংরিজী শিক্ষার প্রভাবে নতুন চেতনা—সে চেতনা সৎ কিন্তু বোকা। তুমি আর তোমার ধর্মের ধোঁয়া মেশানো অহিংসার নেশায় আবার নতুন করে ক্লীব ক'রে দিও না। ইংরেজের মত এত বড় একটা জাতের শিক্ষাদীক্ষা সব ব্যর্থ হবে। দুনিয়ার চাকা যখন স্টীম পাওয়ারে এবং ইলেকট্রিসিটিতে চলছে প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দে তখন তুমি সেই পুরানো চরকাকে বের করে ঘ্যানর ঘ্যানর করে বিশ্বজগতে একটি অট্টহাস্যের সম্মুখীন করো না এই হতভাগ্য জাতিকে।

মদের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল, বলাই বাহুল্য। হেমলতা আপত্তি করলেন। তিনি বললেন—নো। আর শুনব না।

মান-অভিমান কাঁদাকাটির পর একটা আপোস হল। এরই মধ্যে ঘটল আর এক ঘটনা। এখানেও ঘটালেন হেমলতা। তাঁর মামাতো ভাই তখন ব্যারিস্টার এবং বেশ পসারওয়ালা

ব্যারিস্টার। তার ছেলের জন্মদিনে বাড়ীতে ছিল পার্টি; সেখানে গিয়েছিলেন সুরেশ্বরকে নিয়ে; গান-বাজনার আসর ছিল, সেই আসরে বাজিয়ের অভাব হচ্ছিল, বসিয়ে দিলেন ছেলেকে বাঁয়া তবলা বাজাতে। সে চমৎকার বাজাল। চৌদ্দ বছরে সবে পা দিয়েছে—সুন্দর চেহারা; তারিফ সে পাওনার থেকে বলতে গেলে বেশীই পেলে। প্রশ্ন উঠল—ওমা, শিখলে কখন ?

পার্টিতে ছিলেন মামাতো ভাইয়ের বিশিষ্ট মক্কেলরা। তার মধ্যে ছিলেন ছোট নেটিভ স্টেটের (যে নেটিভ স্টেটের আয় বাংলার বড় জমিদারী থেকেও কম) রাজার এক বান্ধবী। সে আমলেও খাঁটি ইঙ্গ-বঙ্গের চেয়েও কড়া চাল তাঁর। বিলেতও ঘুরে এসেছেন একসময়। পরিচয় তাঁর তিনি রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাঁর সঙ্গে আলাপ হেমলতার পার্টির প্রারম্ভেই হয়েছিল। মিস্টার জে রয় এবং ওমনিপোটেন্টের নাম তিনি জানতেন। তিনি শুনে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—সত্যি মিসেস রয় ? না এটা তোমার স্বামী-প্রেমের সুন্দর স্বপ্ন ?

হেমলতা বলেছিলেন—অর্থাৎ তুমি বলছ বাজনা আমি জেগে শুনি নি, স্বপ্নে শুনেছি ! যেমন তোমার মহারাজার শিকারের ঘটনাগুলো ঘরে শুয়ে শুয়ে দেখেছ ?

হেসে উঠেছিলেন মহারাজার বান্ধবী। বলেছিলেন—মহারাজার গুলির চেয়েও তোমার কথার টার্গেট অব্যর্থ এবং মারাত্মক। বেশ তো, আমি মহারাজার গুলির তাগ দেখাতে রাজী আছি, তবে শিকারে যেতে হবে। তুমি মিস্টার রয়ের অপরূপ বাজনা আমাকে শুনিয়ে দাও। আমি গান-বাজনা বুঝি। ভাল লাগে।

হেমলতা বলেছিলেন—কাল আমার ওখানে চায়ের নেমন্তন্ন তোমার।

তিনি আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

হেমলতা বিশেষ কিছু জানান নি যোগেশ্বরকে, বলেছিলেন—একজন বান্ধবীকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছি।

যোগেশ্বর লিখছিলেন। বলেছিলেন—বেশ !

৩

পরের দিন এলেন—মিস চন্দ্রিকা মালহোত্রা। মিশ্রিত রক্তের যে লাবণ্য লাল কালোয় মেশানো পপি ফুলে থাকে সেই লাবণ্যে লাবণ্যময়ী। দীর্ঘাঙ্গী। বড় চোখ। পুরু ঠোঁট। বাপ ছিলেন আর্মিতে ডাক্তার—লেফটেনাণ্ট কর্নেল।

জীবন কেটেছে ভারতবর্ষের বাইরে প্রথম দিকটায়। চন্দ্রিকার মা ছিলেন আসামের খাসিয়া ক্রীশ্চান মেয়ে, ওঁর অধীনে নার্স ছিলেন হংকংয়ে। বিয়ে হয়েছিল সেখানে। তারপর ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। তখন চন্দ্রিকা এবং তার মা ছিল দেরাদুনে। চন্দ্রিকা পড়ত সেখানে। দেরাদুন থেকে পাস করে এসেছিল কলকাতায়। ওদিকে তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মালহোত্রার ইচ্ছে হয়েছিল হোমে বাস করবে। নিয়ে গিয়েছিল স্ত্রী কন্যাকে। চন্দ্রিকা বিলেতে গিয়েছিল ১৯১৯এ। বয়স তখন উনিশ কুড়ি।

কলকাতায় থাকতেই সে নিজের গায়ের রং বিচার ক'রে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছিল। এবং শাড়ী পরেই গিয়েছিল ইংল্যাণ্ড। সে শাড়ী-পরা সেখানে গিয়েও ছাড়ে নি। তার সঙ্গে চুল শ্যাম্পু করা—মুখ রঙ করার আর্টেও দক্ষ হয়ে মূর্তিমতী পূর্ব-পশ্চিমের মিশ্র সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। অন্ততঃ ওর ভক্তগণ বলতো তাই। তার মধ্যে ঔপনিবেশ-স্বপ্নাতুর ইংরেজ-সন্তানও ছিল।

ওদিকে ডাক্তার মালহোত্রা তখন শ্বেতপুষ্পে কালো ভ্রমরের মত মধুলোলুপ হয়ে উঠেছেন। এবং জুয়াতে মদে রেসের ঘোড়ার মত দৌড়াতে আরম্ভ করেছেন। তার ফলে একদা পড়লেন জালে জড়িয়ে। জুয়ার সঙ্গে জালিয়াতির এবং সুরার সঙ্গে নারীর সম্পর্ক আঙ্কিক হিসেবে নিবিড়। ওদেশে ডিম যেমন নিরামিষ—তেমন বিচারে ওদেশে এ দুটোর মধ্যেই এক ধরণের আধানিরিমিষ সত্তা আছে, সেটা এ-দেশী মালহোত্রার পক্ষে বজায় রাখা সম্ভবপর হয় নি, সুতরাং জালিয়াতির দায়ে এবং অ্যাডাল্‌ট্রির প্যাঁচে প্রায় একসঙ্গে পড়ে গেলেন। নিঃস্ব হয়েও যখন বাঁচবার সম্ভাবনা রইল না—তখন প্রায় পাগল হলেন। এই সময়েই এই ক্ষুদ্র করদরাজ্যের মহারাজটির সঙ্গে মালহোত্রা পরিবারের হল আলাপ। বয়স্ক ব্যক্তি। চন্দ্রিকার বাপ, কন্যাকে সামনে রেখে এই মহারাজাকে ধরেছিলেন পরিত্রাণের আশায়। তার ফল ভাল হয় নি; তার মা দাঁড়িয়েছিল পথরোধ ক'রে। পাগল আর্মি অফিসার, তাঁর পক্ষে এই পথের বাধা অপসারণে দিশেহারা হবার কথা নয়, পিস্তল বের করে স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন। এবং তারপরই মাথা ভাল হয়েছিল, তিনি নিজেও আত্মহত্যা করেছিলেন। চন্দ্রিকা একাকিনী। সে পথ খুঁজতে গিয়ে দেখেছিল, হয় হোটেলে বাসন ধুতে হয়, নয় ওয়েট্রেস হতে হয়, নয়—। কিন্তু সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিনী অনেক—যুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্মানী রাশিয়া থেকে অনেক মেয়ে ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বিয়ের বাজার থেকে পথে ঘাটে হোটেলে সর্বত্র দাম পড়ে গেছে মেয়েদের। সুতরাং মহারাজা যখন তাকে স্পেশ্যাল প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ দিলেন তখন সে নিতে দ্বিধা করে নি। সেই পদ নিয়ে সে মহারাজার সঙ্গে দেশে ফেরে। মহারাজা তার প্রতি অনুগ্রহে অকৃপণ। সে বিলিতী নাচ কিছু শিখেছিল—এখানে এসে তিনি তাকে গান বাজনা শিখিয়েছেন। বন্দুক ছুঁড়তেও শিখিয়েছেন। মহারাজার সঙ্গে গল্‌ফ খেলায় সে সঙ্গিনী। টেনিসেও তাকে দক্ষ করে তুলেছেন। মহারাজা এখন টেনিস খেলেন না, আগে ক্রিকেট টেনিসেও দড় না-হলেও তাঁর মহারাজত্বের গুরুত্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। তবে পোলোতে কখনও কখনও এখনও শখ যায়। গোটা কয়েক দেশী ভাষাতেও চন্দ্রিকাকে তালিম নিতে হয়েছিল—তার মধ্যে হিন্দী বাংলা ওড়িয়া অন্যতম। বাংলা সে কিছু আগে থেকেই বুঝত।

এই হল চন্দ্রিকা।

হেমলতা তাকে অভ্যর্থনা ক'রে এনে ঘরে বসিয়ে স্বামীকে ডেকেছিল।

—এস একবার। আমার বান্ধবী এসেছে।

—বান্ধবী? কালকের সেই মহারাজার নর্মসহচরী—বেগ ইওর পার্ডন, প্রাইভেট সেক্রেটারী, সুন্দরী!

বসে ছিলেন তিনি ঢিলেঢালা একটা আলখাল্লার মত জামা আর কোঁচানো ধুতি পরে। তাই প'রেই যাচ্ছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—ও কি ?

—কেন ?

—পোশাক বদল কর। ও কি ? ওই জামাটা—

—পোশাক ? কি বিপদ ! বলে পোশাক বদলের ঘরে গিয়ে নিজের হ্যাটে হাত দিয়ে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর আলনা থেকে হেমলতার একখানা বেনারসী শাড়ী টেনে নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

হেমলতা বলেছিলেন—ওকি ?

—কেন ? শোনাতে হবে বাজনা—এটা কি তার পক্ষে বেমানান হল ? খারাপ লাগছে ?

তা বলতে পারেন নি হেমলতা। বলতে কি চমৎকার দেখাচ্ছিল যোগেশ্বরকে। রায় বাড়ীর পুরুষদের চেহারার জন্য খ্যাতি আছে। লম্বা চেহারা, মাজা রঙ, টিকালো নাক, বড় চোখ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সুচলো করে পাকানো গোঁফ, তার সঙ্গে লুটিয়ে পড়া কোঁচানো ধুতির সঙ্গে ওই ঢিলেঢালা ধবধবে শাদা মখমলের আলখেল্লার মত জামায় চমৎকার মানায় যোগেশ্বরকে। শৌখীন মানুষটি এসব করেন খেয়াল বলে নয়, অনেক হিসেব করে মানিয়ে দেখে। এখন তার উপর বেনারসী চাদরটার দুটো প্রান্ত গলায় বেড় দিয়ে দুপাশে পা পর্যন্ত ঝুলে পড়তেই মনে হল—বাঃ—এই যোগেশ্বরই আসল যোগেশ্বর, যার পিতামহ প্রপিতামহ জরি মখমলের পোশাক এবং পাগড়ি পরে আর্টিস্টের সামনে বসে অয়েলপেন্টিংয়ের সিটিং দিয়েছিলেন।

হেমলতাকে নিরুত্তর দেখে যোগেশ্বর বলেছিলেন—কি চুপ করলে যে ?

হেমলতা হেসে বলেছিলেন—তোমাকে প্রণাম !

—কেন ?

—এতও আসে মগজে !

—ভাল লাগছে তো ?

—ওয়াণ্ডারফুল ! কালই বেনারসীর চাদর কিনে আনব !

—রঙীন এনো ! শাদা না ! চল !

শ্যাম্পুকরা চুল—রঙকরা মুখ—পালিশকরা নখ ; জর্জেট-পরা দীর্ঘাঙ্গী চন্দ্রিকা মালহোত্রা—সিগারেট খেতে-খেতে দেওয়ালের ছবি দেখছিল। ১৯২৪ সালের চৈত্র মাস। তখন অবনীন্দ্রনাথের পরে নন্দলাল অসিত হালদার এঁরা এসেছেন ; যামিনী রায় তখনও ঠিক আসেন নি। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল চন্দ্রিকা, হাতের আঙুলে সিগারেট পুড়ছিল !

—মিস মালহোত্রা—

ফিরে তাকিয়ে মিস মালহোত্রা সবিস্ময়ে চোখ বড় করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। একেবারে কোমর থেকে ভেঙে নুয়ে বাউ করেছিলেন যোগেশ্বর।—গুড আফ্‌টার-নুন !

হেমলতা বলেছিলেন—আমার স্বামী !

হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল চন্দ্রিকা এবং বলেছিল—ও! হাউ ওয়াণ্ডারফুল ইউ লুক! আমি ভেবেছিলাম—

—এ বাজাওলা উস্তাদ ফ্রম ইউ পি অর পাঞ্জাব—

খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল চন্দ্রিকা। বারবার বলেছিল—নো-নো-নো—আমি ভেবেছিলাম মুরশিদাবাদি নবাব-শাহীর কোন তনখা-পানেওলা আমীর—

—এই দাড়ির জন্যে? তা বলতে পার। কিন্তু আমরা হলাম পুরনো জমিদার! এই যে আলখেল্লাটা দেখছ এটা আমাদের বৈরাগীদের পোশাক। কোঁচানো ধুতি আর এই চাদর দিয়ে ভোগ এবং বৈরাগ্যের সমন্বয় হয়েছে।

—কি সুন্দর ব্যাখ্যা করলে তুমি! ওয়াণ্ডারফুল। ওয়াণ্ডারফুল। জান তোমার লেখার ভক্ত আমি। মহারাজাকে কাগজ পড়ে শোনাতে হয় আমাকে। কিন্তু লেখাতে তো তোমার এ পরিচয় নেই? সেখানে তো তুমি তলোয়ার খেল খাঁটি ইংরিজী ঢঙে।

হেমলতা বলেছিলেন—বসে কথা বললে ভাল হয় না?

—নিশ্চয়ই। আমি দুঃখিত—তোমাকে আমি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

বসে কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। সুরেশ্বর এসে বসেছিল। হেমলতা শুনছিলেন, কিন্তু সুরেশ্বর চুপ করে শোনে নি, সে মধ্যে মধ্যে কথার মধ্যে কথা বলেছিল। এবং বেমানানভাবে বলে নি, বেশ মানানসই করে বলেছিল।

মিস মালহোত্রা বারবার তারিফ করেছিলেন সুরেশ্বরের কথায়। সে যা বলেছে তা আবোল-তাবোল নয়, হয়তো বলার ভঙ্গিটা ছেলেমানুষের প্রকাশ-চেষ্টায় আবোল-তাবোল মত শুনিয়েছিল। ঈশ্বর নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। যে তর্ক জগতে সব থেকে বেশী হয় এবং যে তর্কে নেই বললেও হারে না আছে বললেও হারে না—তারই মাঝখানে হেমলতা এক সময় বলেছিলেন—কেন এ সব তর্ক করছ বল ত? সে থেকেও তোমাকে দিক করে না, না থাকলেও তোমার বৃদ্ধি হয় না, তাকে নিয়ে কেন চায়ের পেয়ালার তুফান তুলছ?

সুরেশ্বর বলে উঠেছিল—God is nothing but botheration.

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন সকলে। মিস মালহোত্রা বলেছিলেন—wonderful.

সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয় নি। বলেছিল—তার থেকে তুমি বেহালা বাজাও না বাবা, মা বলছিল তুমি আজ বাজাবে!

—আন, তাই আন! কিন্তু কি বাজাব? আপ ফরমাইয়ে!

—আমি? না-না না—যা খুশি তোমার!

—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, পুরবী বাজাও বাবা!

হেমলতা বলেছিলেন—না, তা হলে আর কিছু জমবে না এরপর।

ছড়ি টেনেছিলেন যোগেশ্বর। একটু বাজাতেই সুরেশ্বর বলেছিল—বসন্ত, না বাবা?

ছড়ি টানতে টানতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলেন যোগেশ্বর।

* * *

মিস মালহোত্রা চলে গেলে যোগেশ্বর বলেছিলেন—এদের কেন ডাক?

—কেন ?

—নাঃ। এরা হল আলাদা জাত—এদের হল আলাদা ধাত !

একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন হেমলতা। কিন্তু পরের দিনই মহারাজার পুরুষ সেক্রেটারী এসে যোগেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন লাউডন স্ট্রীটের বাড়ীতে। একলা নয়—স্ত্রী-পুত্র সমেত যোগেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন চায়ে। চায়ের নিমন্ত্রণ শেষ করতে প্রায় ডিনারটাইম হয়ে গিয়েছিল। আগের কথায় বংশ-পরিচয় থেকে শুরু করে খেলা-শিকার-সঙ্গীত থেকে পলিটিক্স পর্যন্ত। এরই মধ্যে মহারাজা হঠাৎ বলেছিলেন, মিস্টার রয়, তোমার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট কথা ছিল। যদি আপত্তি না থাকে তবে এস না, আমরা আধঘণ্টার জন্যে ওঘরে কথা বলে নিই। চন্দ্রিকা, তুমি মিসেস রয় এবং মাস্টার রয়কে দেখাও না সব।

ঘরে নিয়ে গিয়ে মহারাজা বলেছিলেন—দেখ রয়, তোমার লেখা আমি পড়ি। তা ছাড়া আমি চন্দ্রিকার কাছে তোমার কথা শুনে দু-চারজনের কাছে পরামর্শ নিয়েছি। তারা তোমার কলম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আমার স্টেট সম্পর্কে প্রজারা এই সব কংগ্রেসী লীডারদের উস্কানীতে সহায়তায় নানান নিন্দার কথা অশাসন-কুশাসনের কথা ভেণ্টিলেট করছে, দরখাস্ত পাঠাচ্ছে। পলিটিক্যাল এজেণ্ট এতে আমার উপর সুবিধে নিতে চাচ্ছে। আমি চাই আমি কি করেছি—সেই কথা প্রকাশ করতে। তুমি আমাকে হেল্প্ কর। কাজটার ভার নাও।

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন যোগেশ্বর। এ যোগেশ্বর জার্নালিস্ট যোগেশ্বর। যে যোগেশ্বর দেশের সুলভ মতামত উপেক্ষা করে দীর্ঘদিন ইংরেজ রাজত্বকে সমর্থন করে এসেছেন। যে যোগেশ্বর উনিশ শো একুশে চাকরী ছেড়েছেন। যে যোগেশ্বর নন-কোঅপারেশন মুভমেণ্টের ব্যর্থতায় হিন্দু শাস্ত্র সংহিতা পড়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন—"অহিংসা একটি মনোরম রোমাণ্টিক স্বপ্ন—প্রায় ঈশ্বরের মত। বাস্তবের সম্পূর্ণ বিরোধী। অবাস্তব বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। মানবসমাজ এবং সভ্যতাকে ক্ষীণবল করে এতকালে বহুকষ্টে অর্জিত মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটায় ক্লীবত্বে অর্থাৎ সভ্যতার বংশধারা বা স্রোতোধারায় ছেদ টেনে দেয়। এমন কি যদি সব দেশের সব মানুষ অহিংস হয়েই বসে, যুদ্ধও আর না হয়, তবে সেদিন দলবদ্ধভাবে বনের বাঘ সিংহ হিংস্র জন্তুরা মানুষকে আক্রমণ করে পরমানন্দে পশু-রাজত্বের সৃষ্টি করবে।"

এ লিখেও নিন্দাকে সমালোচনাকে ভয় করেন নি যে যোগেশ্বর সেই যোগেশ্বর। তিনি বলেছিলেন—মহারাজা, এ ভার নিচ্ছি এ কথা তো বলতে পারব না! যতক্ষণ সব না জেনেছি!

—বেশ, তোমাকে আমরা সব তথ্য দিচ্ছি। ফুল স্ট্যাটিস্টিক্স্ দিয়ে দেব আমি।

হেসে যোগেশ্বর বলেছিলেন—স্ট্যাটিস্টিক্স্ আর সত্য এক নয় মহারাজ।

—বেশ, তুমি এস আমার স্টেটে। দেখ সব!

—পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে দেখব সব ?

—নিশ্চয়!

—ভেবে বলব কাল !

—আমি তোমাকে বিলেতের কাগজে যে পেমেণ্ট করে, তাই করব। এবং সব খরচ আমি বহন করব। যদি মাইনে নিয়ে কাজ করতে চাও—

—না। ওদিকে আমি প্রথমটাতে রাজী ! তবে ভেবে দেখব !

—তুমি একবার স্টেটে এসে সব দেখ রয়। প্লিজ। ফার্স্ট ক্লাস বাংলো—মোটর—এভরিথিং। তুমি মিসেস রয়কে নিয়ে ছেলেকে নিয়ে চল, দেখ।

—কাল বলব মহারাজা !

পথে ভাবতে ভাবতে এসেছিলেন, কথাটা হেমলতাকেও বলেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—দেখ !

—কি ?

—কাল বলছিলে চন্দ্রিকার জন্যে যে ওকে কেন আনলে ?

—হুঁ। বলেছিলাম।

—এখন ?

—এখন ?

—হ্যাঁ এখন ?

—বলতে পারছি না ! ভেবে দেখি।

* * *

কাজ নিয়েছিলেন যোগেশ্বর। চন্দ্রিকা নিজে এসেছিল মত জানতে। মত তিনি দিয়েছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন—এবার বল !

—কি ?

—ডেকে ভাল করেছিলাম কি না ?

—কর্মের একটা চক্র আছে হেম !

হেসে হেমলতা বলেছিলেন—তবু বলবে না যে ভাল করেছিলাম।

—নিশ্চয় বলব। তা বলব। যা ঘটবার তাই যখন ঘটে তখন সেই ভাল। যা ঘটবার নয় তা ঘটাতে গেলে বা ঘটালে পৃথিবীতে যতিভঙ্গ হয়—সুর কাটে। আমার মত জার্নালিস্টের পক্ষে এইটেই ঘটবার। আমি জমিদারের বংশধর। জার্নালিস্ট হয়েছি। ওই কংগ্রেসী সুরে সুর মেলাতে গেলে বেসুর বলতাম। সংসারে যারা বেসুর বলে এ-যুগে তাদের বলে বিদ্রোহী। তারা জিতলে দেবতা হয় হারলে অসুর নাম পায় ইতিহাসে। সে রিস্ক আমি নিতে নারাজ !

এক বছর পর হেমলতাকে বম্বে থেকে যোগেশ্বর যে চিঠি লিখেছিলেন তার গোড়াতেই এই কথাটার উল্লেখ করেছিলেন—তিনি চন্দ্রিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ইউরোপ।

গোড়াতেই লিখেছিলেন—তোমাকে এই চন্দ্রিকা পর্বের গোড়াতেই বলেছিলাম তুমি ওকে কেন আনলে ? তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—কেন ? দোষ কি হল ? বলতে সেদিন পারি নি, আজ লিখে জানাচ্ছি—দোষ তোমার নয় দোষ আমার, আমি ওকে দেখে এক মুহূর্তে ক্লোরোফর্ম করা মানুষের মত চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওর রূপসজ্জা, ওর ভঙ্গি, ওর শ্যাম্পুকরা

চুলের গন্ধ সত্যিই যেন ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয়। তবু আমি প্রাণপণে লড়াই করে চেতনাকে জাগিয়ে রেখেছিলাম অনেকদিন। তুমি জান পরদিন চন্দ্রিকা এসেই আমার মত আদায় করে ছেড়েছিল। কি বলেছিল জান—বলেছিল—রয় প্লিজ, প্লিজ তুমি অমত করো না! প্লিজ! আমার চোখে নেশার ঘোর ছিল। সেই ঘোরের মধ্যেই বলেছিলাম, কেন? আমাকে নেবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? মহারাজাকে তুমি এত ভালবাস। সে বলেছিল—উল্টো! ঠিক উল্টো রয়। তুমি যদি স্টেটের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হও তবে আমি পরিত্রাণ পাই। আমার নিশ্চিত ধারণা আমি পরিত্রাণ পাব। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মানে কি বল তো? সে বলেছিল—রয়, আমাকে মহারাজা আসলে কিনেছে। আমার বাবা আমাকে বিক্রী করেছিল। আমি একটা সাংঘাতিক দলিলে সই করেছি। এক লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছি—আমার চাকরীর উপর! আমার এ থেকে পরিত্রাণ নেই। তুমি যদি এস রয়—আমি তোমাকে অনেক ফ্যাক্টস দেব প্রমাণ দেব, তার দাবীতে তখন হয়তো মুক্তি পেতে পারব। আমি বলেছিলাম—কিন্তু মহারাজা তো তোমাকে খুব সুখে রেখেছেন চন্দ্রিকা! চন্দ্রিকা বলেছিল—তার থেকে মৃত্যু ভাল। কিন্তু মরতে আমার ভয় করে। আমি নিজে উপরে দরখাস্ত করতে পারি না—আমাকে গুলী করে মেরে দেবে! তুমি এদের জান! তবু আমি বলেছিলাম, কিন্তু আর কি এখান থেকে মুক্তি নিয়ে সাধারণ জীবনে ফিতে যেতে পারবে? সে বলেছিল—রয়, আমি তখন সাধারণ মেয়ের মত সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে বিক্রী করেও বাঁচতে পারব। আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারি নি, বলেছিলাম—আমার ফার্স্ট অফার রইল। চন্দ্রিকা বলেছিল—আমি নিজেকে ইন অ্যাডভান্স তোমাকে দিয়ে রাখলাম। এনগেজমেণ্টও করে গিয়েছিল : সেটা একটা বড় হোটেলে। মহারাজার সেদিন ডিনারে নেমন্তন্ন ছিল গভর্ণমেণ্ট হাউসে।

থাক ওসব কথার বিশদ বিবরণে প্রয়োজনও নেই, আমার নিজেরও অপরাধবোধ মরে যায় নি। হেম, এ বোধহয় একটা ব্যাধি। এ বোধহয় নিয়ে জন্মেছিলাম। কারণ তার সংক্রমণের সূত্র আমি দেখতে পাচ্ছি আমার জন্মদাতার জীবন থেকে। তোমাকে বিবাহের পূর্বে এ ব্যাধি আমাকে প্রায় বাঁধা বন্য-জন্তুর মত বা জোতা-ঘোড়ার মত এই মুখে চালাচ্ছিল। চলতে তো আমার বাধা ছিল না। অর্থ ছিল। তার উপর সমাজের যেটা তাড়না বা ভয় তাতেও ছিলাম বেপরোয়া। কিন্তু বাবার একটা মেসেজ ছিল—আমার কাছে। দাদার কাছেও ছিল। সেটা শীলকরা কভারে তিনি দিয়েছিলেন—আমাদের অ্যাটর্নীকে। সেটা তাঁর উইলের সঙ্গে পেয়েছিলাম। লেখা ছিল—'পিতার যদি কোন অধিকার থাকে পুত্রকে উপদেশ দেবার তবে উপদেশ রইল নারী-বিলাস থেকে দূরে থেকো। যদি তা সম্বরণ করতে নাই পার, তবে বিবাহ করে সংসারী হয়ো না!' কারণটা অজানা ছিল না। আমার বাল্যকালে আমার এক মেম গভর্ণেস ছিল। তিনি তাঁর প্রেয়সী ছিলেন। আমাকে চড় মারার জন্য আমার দাদা তাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছিলেন! তারপর মেমসাহেব গেল চলে, বাবা তাকে অনুসরণ করে এসেছিলেন কলকাতায়। এটা প্রত্যক্ষভাবে জানতাম। তখন আমার পিতামহ বেঁচে। তখন থেকেই আমরা তাঁর থেকে স্বতন্ত্র বাস করেছিলাম। পিতামহের

মৃত্যুর পরও বাবা স্বতন্ত্র থেকেছিলেন কিছুদিন। তারপর তিনি অন্য মানুষ হ'তে চেয়েছিলেন। সে আত্মনির্যাতন আমি দেখেছি। এবং তখন আভাসও পেয়েছি—তাঁর প্রথম জীবনের উদ্দাম গতির বিচিত্র কথার। সেই কারণেই আমি দীর্ঘদিন বিবাহ করি নি—এবং উদ্দাম গতিতে ছুটতে গিয়েও ভয়ে নিজেকে সংযত রেখেছি। তারপর তুমি এলে জীবনে। তুমি দেখেছ প্রমাণ পেয়েছ আমি কি হয়েছিলাম বা হ'তে চেষ্টা করেছিলাম। ইদানীং ভাবতাম আমি সব সংকট পার হয়ে এসেছি। কিন্তু না।

পিতামহ ছিলেন পুণ্যবান পবিত্র চরিত্র মানুষ। অন্ততঃ চরিত্রের দিক থেকে। বিষয়ী হিসেবে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় চোখে দেখেছি। জীবনযাপনের ধারা দেখেছি। এ যুগে আমার শিক্ষানুযায়ী তাঁর জীবনকে বলব আত্মনির্যাতন। অর্থহীন আত্মনির্যাতন। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন—একটা কথা। শিখিয়েছিলেন সংসারে মানুষের জীবনে নারীর সঙ্গে সম্পর্ক দুটি। দুটি সম্পর্কের একটি ভেঙে আবার দুটি হয়েছে। এক পুরুষ আর প্রকৃতি। মানুষের জীবনে এই সম্পর্ক একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর। অন্যটি মাতা আর পুত্র। সেটা বয়স-ভেদে হয় কন্যা আর পিতা। এইটেই জগৎজোড়া। এর অন্যথায় তুমি স্বর্গ-নরক মানলে নরকে পড়বে, না-মানলে তোমাকে ফিরতে হবে জন্তুজীবনে। অথবা তাকে হতে হবে সেই পুরুষ যাকে পাপপুণ্য দেশ সমাজ কিছু স্পর্শ করতে পারবে না—তার নাগাল পাবে না।

কথাটা সত্য। চন্দ্রিকার সঙ্গে জীবনের গ্রন্থি লাগল। সেটা যদি মা বা কন্যার মন্ত্রে গ্রন্থি পড়ত! কিন্তু না, তা পড়ল না। আজ একটা বছর আমি নানান অজুহাতে মহারাজার স্টেটে কাটিয়েছি ঘুরেছি—সে কেবল চন্দ্রিকার জন্য। যখন চন্দ্রিকাকে জীবনে জড়িয়েছি তখন চেষ্টা করেছি ওই রকম পুরুষ হ'তে; পাপপুণ্যের দেশসমাজের ঊর্ধ্বের পুরুষ। কিন্তু তা পারি নি। সে সহজ নয়। সহজ সাধারণের মত অবস্থায় পড়লাম। ওদিকে মহারাজা, এদিকে তুমি এবং সুরেশ্বর। একদিকে ভয়, অন্যদিকে নিদারুণ অপরাধবোধ। মহারাজা জানতে পারলে গুলি ক'রে মারত! এদিকে তুমি জানলে কি হ'ত তা কল্পনাও করতে পারি নি। ফলে জন্তুর অধম চোরের মত তার সঙ্গে মিশেছি। আমার সম্পদ, আমার সহায়তা করেছে। বাঘের নখ আর দাঁতের মত মানুষের এই সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আর গোপন রইল না। মহারাজা জেনেছেন। সুতরাং শিকারীর বনভাঙার শব্দে ভীত জন্তুর মত চন্দ্রিকাকে নিয়ে বিদেশ পালানো ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। আজই জাহাজ ছাড়বে। বম্বে থেকে চলে যাচ্ছি চন্দ্রিকাকে নিয়ে। ব্যাঙ্কের পাস বইয়ে তিন লক্ষ টাকা মজুত আছে। তার দু লক্ষ আমি নিলাম। এক লক্ষ টাকার চেক কেটে বাড়ীঘর সম্পত্তির দলিল তোমাদের নামে করে দিয়ে—বম্বের অ্যাটর্নীকে দিলাম—তারা যথাসময়ে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবে। সম্পত্তি যা পৈতৃক তা সুরেশ্বরের রইল—এ অধিকার ওর জন্মগত। তবে শর্ত রাখলাম যতদিন তুমি বাঁচবে ততদিন সব কাজে তোমার মত নিতে হবে। তোমাকে দিলাম আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আর এক লাখ টাকার অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার নির্ব্যূঢ় স্বত্বে।

মার্জনা করতে বলব না। বলব অভিসম্পাতই দিয়ো। অন্য দেশের মত ডাইভোর্স নেই।

থাকলেও আমি বলতে পারতাম না। তোমাকে আমি আজও ভালবাসি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার কোন শক্তি আজ নেই, আমি ভেসে যাচ্ছি একটা দুর্দান্ত আকর্ষণে। কি মোহ এই মেয়েটার! ওঃ!

সুরেশ্বরকে বাঁচাতে চেষ্টা করো। কিন্তু তাকে বন্ধনেও বেঁধো না। মানুষ কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না হেম। মানুষ বাঁচে নিজে। তার বীজ থাকে তার চরিত্রে। সে চরিত্র আপনি গড়ে। অন্যে যেটা গড়ে দেয় সেটা খড়ের কাঠামোর উপর চাপানো মাটি আর রঙ। কালে ফাটে—জলে গলে।

ইতি—যোগেশ্বর রায়।

৪

সুরেশ্বরের বয়স তখন চোদ্দ পনের। উনিশ শো চব্বিশের শেষ, পঁচিশের আরম্ভ। ষোল আনা বুঝবার বয়স না হলেও বারো আনা বুঝবার বয়স হয়েছিল। হেমলতা প্রথম কথাটা চাপাই রেখেছিলেন; বলেছিলেন, যোগেশ্বর ইয়োরোপ বেড়াতে গেছেন। সারা ইয়োরোপ বেড়িয়ে তবে ফিরবেন। স্বামীকে দায়ী করেন নি এমন নয়, তবে যতখানি করা উচিত তা করেন নি। করেন নি নিজের দৈহিক অক্ষমতার জন্য। দ্বিতীয় সন্তান মৃতকন্যা প্রসব করার পর থেকে তিনি স্বামীর মনের সঙ্গিনী ছিলেন, গৃহের গৃহিণী ছিলেন, তাঁদের জীবনের ধর্ম যেটা ছিল সে ধর্মানুযায়ী সহধর্মিণীও ছিলেন, কিন্তু নারী হিসাবে তো তাঁর কোন মূল্য ছিল না স্বামীর কাছে। মানুষের জীবনের তৃষ্ণা স্বভাবধর্ম: সেই তৃষ্ণায় যে-জল জমে বরফ নয়—পাথর হয়ে গেল, তার কোন মূল্য থাকে তৃষ্ণার্তের জীবনে? যোগেশ্বর তৃষ্ণাকে যদি জয় করতে পারতেন, তবে তাঁর চেয়ে সৌভাগ্যবতী কেউ হ'ত না। জীবনের অশ্বমেধ যজ্ঞ রাম করেছিলেন স্বর্ণসীতা নিয়ে। তা যদি যোগেশ্বর নাই পেরে থাকেন, তবে তাঁকে কোন দোষে দোষী করবেন? একান্ত নীরবে অটল ধৈর্যের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ঘটনাটিকে। এবং সংসার ও বিষয় এবং সুরেশ্বর এই দুটি তটের মধ্য দিয়ে সাগরসঙ্গমের অদূরবর্তিনী নদীর মত অনুচ্ছ্বসিতভাবে প্রবাহিত রেখেছিলেন নিজেকে।

কোন কিছুর বদল করেন নি। অর্থাৎ জীবনযাত্রার প্রণালীর। আক্ষেপের মালা নিয়ে জপ করতে বসেন নি। ছেলের ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন করতে চান নি। কিন্তু ছেলে বদলেছিল।

কথাটা হেমলতা চেপে ছিলেন, কিন্তু বাইরের লোকেরা চাপে নি। তারা প্রকাশ করেই দিয়েছিল। পনের বছরের সুরেশ্বরের কানে সেটা পৌঁচেছিল। স্বাভাবিকভাবে অনিবার্য আঘাতে সে আহতও হয়েছিল। তার ফলে সে হঠাৎ হতে চেয়েছিল গোঁড়া হিন্দুর ছেলে। অর্থাৎ মনে মনে সে এর কারণ হিসেবে স্থির করেছিল যোগেশ্বরের অহিন্দু অভারতীয় মনই এ অনর্থের মূল। নতুন করে ধরেছিল খদ্দর, চরকাও কিছুদিন কেটেছিল। এবং মাকে তাগিদ দিয়ে উপনয়নের ব্যবস্থা করে উপবীতধারী হয়ে বছরখানেক সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছিল,

নিরামিষ খেয়েছিল, খালি পায়ে হেঁটেছিল, বাড়ীতে খালি গায়েও থেকেছিল। সংস্কৃতও পড়েছিল। বছর খানেকের পর অনুভব করেছিল সন্ধ্যা-আহ্নিকে সময় যায় অনেক—সুতরাং সন্ধ্যা-আহ্নিক ছেড়ে—শুধু গায়ত্রীমন্ত্র জপ করত। সেটার আরম্ভ হল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সময় থেকে। পরীক্ষা দিয়েছিল সে ষোল বছর বয়সে। কিন্তু পাস করতে পারে নি। ফেল হয়েছিল অঙ্কে। শুধু একবার নয়—পর পর দুবার ফেল ক'রে পড়া ছেড়েই দিল। এবং ছবি আঁকায় ঝুঁকল। চিত্রকর হবে সে। আদর্শ তার প্রথম নন্দলাল। তারপর যামিনী রায়। ভর্তি হল আর্ট স্কুলে। সেখানে বছর তিনেক পড়ে পরীক্ষা দিলে না—পড়া ছেড়ে দিলে এবং আবার ম্যাট্রিক দেবার জন্য পড়তে লাগল। অর্থের অভাব ছিল না। জমিদারীর আয়, কলকাতার বাড়ীভাড়া, এক লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ—এ সবের কল্যাণে তার বর্তমান জীবন কেন, আমরণ ভাবী জীবনের দিগন্তও কি করব এ নিয়ে একবিন্দু সমস্যা ও এক ফোঁটা কালো মেঘের ছিটে বা ছায়া বুলোতে বা ফেলতে পারে নি। তার মা হেমলতাও এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন নি কারণ তিনি এই কয়েক বছরে সম্পত্তি পরিচালনা ক'রে সম্পত্তিকে বাগিয়েই তুলেছিলেন, তার হানি করেন নি। তবে সে কেমন মানুষ হবে এ নিয়ে তাঁর চিন্তা ছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এমন কিছু কারণ ঘটেনি যাতে তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়।

এই বছরই খবর এসেছিল—ইউরোপে যোগেশ্বর মারা গেছেন। এতদিনের মধ্যে তিনি একখানা চিঠিও দেন নি। শেষ চিঠি এসেছিল—আমি হাসপাতালে। মরব কয়েকদিনের মধ্যে তাতে সন্দেহ নেই। একলা শুয়ে আছি। চন্দ্রিকা দেড় বছর আগে আমাকে ছেড়ে গেছে। আমি তাকে সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি তোমাকে ছেড়ে তাকে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। একের পর যখন দুইয়ের দিকে মন ছোটে তখন সে দুয়েই বা থাকবে কেন? সে দশক পার হয়ে শতকের দিকে ছোটে। তারপর ডিজিটের পর ডিজিট বাড়ে। কিন্তু মজা কি জান—এক ডিজিট দু ডিজিটে, দু ডিজিট তিন ডিজিটে পরিণত যখন হয় তখন শূন্য বসিয়ে তা হয়। তার মানে আজ বুঝছি—ওর মূল্যটাই হল শূন্য। পূর্ণ ওই একটি সংখ্যা ওই এক। আর একটা সত্য বুঝলাম। সেটা সবার জীবনের কি না তা জানি নে, আমার জীবনের বটে। সেটা হল এই আমার প্রাক্তন—নারী হতে সর্বনাশ। আমার জন্য শোক করো না। আমি নিজে এর জন্য দুঃখিত নই। আমার অভিযোগ নেই আমার লজ্জা নেই—সংকোচ নেই ভয়ও নেই। এর জন্যে এক বছরের মধ্যে প্রহার খেয়েছি, জরিমানা দিয়েছি, জেলও খেটেছি মাস দুয়েক। তবু মরবার সময় মনে যেটা হচ্ছে সেটা কি তা ঠিক বলতে পারব না—ফ্রাস্ট্রেশন বললে আপত্তি করব না, তবে আমি তা মানি না। মনে হচ্ছে বুক জুড়ে রয়েছে শুধু বিরহ—অনন্ত বিরহ। ভেবে দেখেছি, তুমি যদি পাশে থাকতে তবুও তাই মনে হত। আমার কেউ নেই, আমি কাউকে পাই নি।

অনুরোধ করব আমার শ্রাদ্ধ তোমরা করো। কি জানি কল্পনা করে আনন্দ পাচ্ছি।

হেমলতা এতদিনে ভেঙে পড়েছিলেন। ঝড়ে যে গাছ ভাঙেনি সে গাছ একটি দমকা হাওয়ায় যখন একেবারে শুয়ে পড়ল—তখন দেখা গেল গোড়াটি ভিতরে ভিতরে একেবারে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। মাটি বা মূলের সঙ্গে সংযোগ আর ছিল না।

আগের চিঠি পড়ে হেমলতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিলেন। তারপর বিছানায় শুয়ে মনে মনে ভেবে নিয়ে উঠে বলেছিলেন—হঠাৎ ইয়োরোপ রওনা হয়েছেন মহারাজার কাজে। জানতে পেরেছিল শুধু অ্যাটর্নীরা—যাদের হাত দিয়ে দলিল এসেছিল। পরে হয়তো সবটাই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু হেমলতা অস্বীকার করেছিলেন। সেই হেমলতা ওই চিঠি পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দিন তিনেক পর টেলিগ্রাম এসেছিল হাসপাতাল থেকে—যোগেশ্বর রায় মারা গেছেন······তারিখ। তখন দশদিনে শ্রাদ্ধ করতে হলে হাতে আছে চারদিন। সেদিন অজ্ঞান হন নি, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন মুখ গুঁজে। সুরেশ্বর ছিল বাড়ীতেই। তিনদিন আগে হেমলতা চিঠি পেয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে গেলেন তখনও সে বাড়ীতে ছিল। ঘরে বসে পড়ছিল সেকালের অতি-আধুনিক সাহিত্যের মাসিকপত্র; পরীক্ষা দিয়ে অবধি সে আধুনিক সাহিত্যের পাঠক হয়েছে। সময়টা চৈত্রের শেষ। তখনও পরীক্ষার খবর বের হয়নি।

যুগের হাওয়াটা তাকে কাঁচা সরল তরুণ বয়সের গাছের মত দোলা দিচ্ছে। তার চেহারায় এর ছাপ লেগেছে। তখন বিরোধ চলছিল সাহিত্য-ধর্ম ও সাহিত্যে অশ্লীল সত্যের সীমানা নিয়ে—যার পক্ষে শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্র বিপক্ষে শনিবারের চিঠির দ্বন্দ্ব চলছে। স্বয়ং কবিগুরু এতে মধ্যস্থতা করতে উদ্যত হয়েছেন। সে সময়টা একটা দারুণ উত্তেজনার কাল। সে উত্তেজনা তার রক্তেও সঞ্চারিত হয়েছে। ওই প্রবন্ধই পড়ছিল সে সেদিন। হঠাৎ ঝিয়ের চীৎকার শুনে ঘরে এসে মাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে সে চিঠিখানা তুলে নিয়েছিল। চিঠিখানা পড়ে রেখে সে ডাক্তার ডেকেছিল। এবং সেইদিন থেকেই সে এই টেলিগ্রামের প্রত্যাশা করছিল। সে কাতর খুব হয় নি। বাপের উপর ক্রোধ তার একদিন হয়েছিল—আহ্নিক করেছে, খদ্দর ধরেছে, খালি পায়ে ঘুরেছে, নিরামিষ খেয়েছে—কিন্তু এখন সে খদ্দর ছাড়ে নি বটে, তবে বাকীগুলো ছেড়েছে এবং বলতে গেলে আর একরকম হয়ে গেছে। মনে মনে বাপকে সমর্থন করার পথ খোঁজে।

হয়তো তাতে তার পরিচয়ের গৌরবটা বৃদ্ধি পাবে—প্রগ্রেসিভ বাপের প্রগ্রেসিভ ছেলে বলে এটাও কিছুটা কারণ হতে পারে, কিন্তু সবটা নয়। ওর মধ্যে ঝড় আছে—সেটা এলোমেলোই বয়—কিন্তু যখন যেদিকে বয় তখন সেইদিকেই তার সমান গতি।

সে যাক। হেমলতা বেশীক্ষণ মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠে বসে সুরেশ্বরকে ডেকেছিলেন—নায়েবকে ডেকেছিলেন।

নায়েব একজন আছেন, সে যোগেশ্বরের আমল থেকেই। একটা ছোট সেরেস্তাও আছে, কয়েকজন কর্মচারীও আছে। তাঁদের কলকাতায় বাড়ী ভাড়া—দেশের জমিদারীর হিসেব-আদায় তার ব্যবস্থা করতে হয়; মামলা-মকদ্দমাও আছে। সব থেকে জটিল হ'ল জমিদারীর ব্যাপার। ছ'পুরুষ আগে জমিদারীর পত্তন—তা তিন পুরুষ ধরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির মুখে চলেছিল এবং ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় নি। প্রথম পুরুষ কুড়োরাম ভটচাজের পুত্র সোমেশ্বর ভটচাজ—এফিডেবিট করে রায় খেতাব নিয়েছিলেন—তাঁর এক ছেলে বীরেশ্বর রায়; বীরেশ্বর ছিলেন নিঃসন্তান—তিনি আপনার ভাগ্নে কমলাকান্তকে পোষ্যপুত্র নিয়ে নাম রেখেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। রত্নেশ্বরের তিন ছেলে—দেবেশ্বর, শিবেশ্বর, রামেশ্বর। দেবেশ্বরের দুই ছেলে—যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর।

শিবেশ্বরের তিন বিবাহে সন্তান ষোলটি—তার মধ্যে জীবিত দ্বাদশটি। ছয়টি পুত্র ছয়টি কন্যা। রামেশ্বর ব্যারিস্টার, থাকেন এলাহাবাদে। তিনি বংশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছেন ব্রাহ্ম হয়ে। অবশ্য দেবোত্তরের নিজের অংশের সম্পত্তি তিনি অতি সামান্য মুনাফা রেখে পত্তনী দিয়ে হস্তান্তর করেছিলেন অপর দুই ভাইকে এবং নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রী করেছিলেন মেজভাই শিবেশ্বরকে। ভগবানের অংশ বিক্রী করেছিলেন বড়ভাইকে। এসব করার পর ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তিনি।

হেমলতা উঠে বলেছিলেন—এঁদের সকলকে খবর দিতে হবে। টেলিগ্রাম করুন।

নায়েব বলেছিল—তা দিচ্ছি। কিন্তু টেলিগ্রাম কেন? চিঠি দিলেই তো হয়। আজ লিখলে কাল পাবেন সব।

—না। টেলিগ্রাম করুন। সকলকে অশৌচান্তের কামানোর জন্য আসতেও লিখুন।

—বড়বাবুর (অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বরবাবুর) তো আসবার উপায় নেই—ইনসলভেন্সির কেস চলছে! তিনি ওয়ারেন্টের ভয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে হার্টের রোগী সেজে পড়ে আছেন। ছেলেরা—কি—

—আমাদের কর্তব্য করুন। মেজ খুড়শ্বশুর গোঁড়া হিন্দু, ধার্মিক লোক—তিনি তো আসবেন।

নায়েব বলেছিল—তার থেকে চলুন না আমরাই কীর্তিহাটে যাই। সেখানেই কামানো হবে। ঠাকুরবাড়ীতে হবে। মানে—তাতে—

চুপ করে গিয়েছিল নায়েব। হেমলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কথাটার শেষ শুনবার জন্য। নায়েবকে থামতে দেখে বলেছিলেন—বলুন।

—মানে, মেজকর্তা তো খুবই গোঁড়া। এখানে কামানো হলে না-আসতেও পারেন। পরে বলতে পারেন—অশৌচ আমরা নিই নি। ইউরোপে মরেছে—জাত গেছে—ক্রীশ্চান হয়ে গেছে এসব তো মাঝে মাঝে বলেন সেখানে—শুনতে পাই! উনি তো মামলাবাজ লোক। এর পর অশৌচ জ্ঞাতিরা নেয়নি সুতরাং দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্ব নিয়ে একটা কিছু বাধানো বিচিত্র নয়। ওখানে গেলে যা হয় মুখোমুখিই হয়ে যাবে। আর শ্রাদ্ধটা ঠাকুরবাড়ীতে বলে—উনি যাই করুন—টেঁকবে না!

হেমলতা অ্যাডভোকেট মামার কাছে মানুষ, কুড়ি বছর পর্যন্ত সেখানে মামলা মকদ্দমার কথা শুধু কানে এমনি শুনতেন না—চৌদ্দ বছর বয়স থেকে মামাকে তাঁর বরাত মত আইনের রেফারেন্সের বইও টেনে বের করে দিতেন। তারপর যোগেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে যোগেশ্বর তাঁকে জমিদারী আইন এবং বিশেষ করে তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির মূল গ্রন্থির যে দলিল তার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। যোগেশ্বরের বিদেশ চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি নিজেই সব চালিয়েছেন। সুতরাং কথাটা তাঁর বুঝতে কষ্ট হল না।

সুরেশ্বরও বুঝেছিল। বুঝবার বয়সও তার হয়েছে। আইনমতে সে এখন সাবালক। একুশে পা দিয়েছে। এতদিন নাবালকের গার্জেন ছিলেন মা হেমলতা। কারণ যোগেশ্বর ইউরোপে যাবার সময় সব ছেলেকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা হল হিন্দু দেবোত্তরের সেবায়েত অহিন্দু হয়ে গেলে থাকতে পারে না, তখন সে অংশ এসে বর্তায় অন্য অংশীদারদের বয়সে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁর কাছে। সে হিসেবে মেজকর্তা শিবেশ্বর রায়ের ব্যগ্র হয়ে ওঠারই কথা। শিবেশ্বর রায়ের তিন বিয়ে, ষোলটি সন্তান—তার বারোটি বেঁচে এবং তার ছয়টি পুত্র। এবং শিবেশ্বর ইতিমধ্যে আকণ্ঠ ঋণে আবদ্ধ। ঋণের দায়ে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির সবটুকুই চলে যাবে তা সকলেই বোঝে। দেবোত্তর বিক্রী হয় না তবে পত্তনীবিলি-বন্দোবস্ত হয়—তাও তাঁকে করতে হবে, কিছু করেছেনও। এই অভিনব ফন্দিটি রামেশ্বরের আবিষ্কার। আইনের সূচী-ছিদ্রপথে যে চালাতে পারে সে হাতীও পার করে নিয়ে যায়। রামেশ্বর বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার আগে এই ফাঁকটি আবিষ্কার করেছিলেন। দেবোত্তর জমিদারীর আয় ছিল বত্রিশ হাজার টাকা। এই দেবোত্তরে ছ-আনা রকমের মালিক ছিলেন দেবেশ্বর এবং শিবেশ্বর রামেশ্বর পাঁচ আনা হিসেবে অংশীদার ছিলেন। দেবোত্তরে দেবসেবা ইস্কুল টোল দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির খরচ বরাদ্দ ছিল বারো হাজার টাকা। বাকী কুড়ি হাজার টাকা সেবায়েৎ অর্থাৎ এই বংশের ছেলেদের পড়াশুনা খাওয়াপরা এবং চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা ছিল এবং শর্ত ছিল কোনপ্রকার অহিন্দুজনোচিত কর্মে বা ভোগে-বিলাসে ব্যয় করতে পারবেন না। দলিলকর্তা রত্নেশ্বর রায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন —ইচ্ছামত ব্যয়ের অধিকারী হলেও এ থেকে দান-ধ্যান করেন এই তাঁর কাম্য। একটা ফাঁক তিনি রেখেছিলেন—ইচ্ছা করেই শর্ত রেখেছিলেন—ঈশ্বর-না-করুন যদি কোন সেবায়েতের অবস্থাবিপর্যয় ঘটে তবে কন্যার বিবাহ পুত্রদের শিক্ষা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের কালে অভাব ঘটিলে দেবসেবা প্রভৃতির বরাদ্দ বারো হাজার টাকা বজায় রাখিয়া উদ্বৃত্ত লাভ—যাহা আমার বংশধরেরা সেবায়েত হিসাবে ভোগ করিবার হকদার রহিলেন—তাহা অর্থাৎ কুড়ি হাজারের মধ্যে আপন লভ্যাংশ—পত্তনী দরপত্তনী দরাদর পত্তনী বিলি করিতে পারিবেন। কোন কারণে বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

রামেশ্বর এই ফাঁক দিয়ে ফাঁকি দিয়েছিলেন স্বর্গত পিতা রত্নেশ্বর রায়ের অভিপ্রায়কে। তিনি বিয়ে করে বিলেত গিয়েছিলেন—বিলেতে থাকতেই সে স্ত্রী মারা যান। একটি মাত্র কন্যা ছিল তাঁর। সেই কন্যাটির রাজপুত্র দেখে বিবাহ দেওয়ার অজুহাতে দেবোত্তর সম্পত্তি পত্তনী-বিলি করে মুনাফা বিক্রী করেন। সে সম্পত্তি নিয়েছিলেন তখন দেবেশ্বর এবং শিবেশ্বর। রামেশ্বর দেবেশ্বরকে কথাটা গোপন করেননি,—বলেছিলেন—আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করব, অসবর্ণ, তারা অবশ্য ব্রাহ্ম। কিন্তু সে হলে তো মেজদা আমাকে দেবোত্তরের সেবাইত থাকতে দেবে না। সুতরাং আমি যেটা পাব সেটা আমি নিয়ে নিতে চাই।

দেবেশ্বর বিচিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। বলেছিলেন—কর তুমি বিক্রী, আমি বাধা দেব না। কারণ সম্পত্তির অধিকারের জন্য স্বাধীনতা যাবে—তার সমর্থন কখনই করব না। আমার কাছে ধর্মের চেয়ে জীবন বড়—দেবতার চেয়ে মানুষকে বেশী ভালবাসি। তুমি যদি মেয়েটিকে ভালবেসেই থাক তবে নিশ্চয় বিয়ে করবে এবং তোমার অংশের মুনাফা সবই তুমি পত্তনী দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিক্রী করে দিতে পার। আমি আপত্তি করব না—প্রকাশও করব না।

কিনেছিলেন দেবেশ্বর অগ্রণী হয়ে। সুতরাং শিবেশ্বর পিছিয়ে থাকেন নি। দেবেশ্বর

অর্ধেক পত্তনী নিয়েছিলেন—শিবেশ্বরও অর্ধেক নিয়েছিলেন।

তারপর এই দীর্ঘকালের মধ্যে শিবেশ্বর অনেক সম্পত্তি ওই পথেই পত্তনী দর-পত্তনী বিলি করে করে এখন শুধু দেবোত্তরের আয়টুকুর উপর নির্ভর করে আছেন।

খরচ অনেক। তিনটি বিয়ে—বারোটি সন্তান বেঁচে—ছয় কন্যার বিয়ে দিয়েছেন—অনেক মামলা করেছেন। অনেক যাগযজ্ঞ করেছেন। প্রথম প্রথম উৎসবে কলকাতার থিয়েটার আনিয়েছেন। কীর্তিহাটে মহাকালী এ্যামেচার থিয়েটার খুলেছিলেন, নিজে নায়কের পার্ট করতেন, ড্যান্সিং ট্রুপ পুষতেন মাইনে দিয়ে—তিনটি গাইয়ে সুদর্শন ছোকরা রেখেছিলেন ফিমেল পার্টের জন্যে।

এখন সে-সব নেই, এখন আছে ছয় ছেলের সংসারে ছেলে-বউয়ে এগারজন, তাদের ছেলে-মেয়ে সতেরোজন। ছোট ছেলে অতুলেশ্বরের তখনও বিয়ে হয় নি। ছেলেরা প্রথম আমলে বাবু ছিলেন; ঘোড়ায় চড়তেন, শিকার করতেন, মদ খেতেন। হাতীও একটা কিনেছিলেন শিবেশ্বরবাবু। এখন হাতী-ঘোড়া নেই। ছেলেরাও লেখাপড়া কেউ ভাল শেখে নি। ছয়জনের মধ্যে দুজন এণ্ট্রান্স পাশ করেছিল গ্রামের ইস্কুল থেকে। বাকীরা কেউ ফোর্থ ক্লাস—কেউ থার্ড ক্লাস—কেউ সেকেণ্ড ক্লাস অবধি, একজন ম্যাট্রিক ফেল।

নাতিরা কয়েকজন সুরেশ্বরের থেকে বড়, কয়েকজন সমবয়সী—বাকীরা ছোট। এরই মধ্যে সাতষট্টি বছর বয়সের শিবেশ্বর তৃতীয় পক্ষের ত্রিশ বছরের স্ত্রীকে নিয়ে ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞ করেন। স্বতন্ত্র থাকেন ছেলেদের সংসার থেকে। জমিদারীতে বসেছিলেন, মামলা-মকদ্দমা ভাল বোঝেন, বাকী খাজনার প্যাঁচে গরীব প্রজার অনেক রায়তী জোত ছেলেদের নামে কিনে দিয়ে তাদের আলাদা করেছেন। দেবোত্তরে যে অন্নভোগ হয়—তা তিনি কমান নি, সেই ভোগের অন্ন ছেলেরা নাতিরাই খায়। মা-কালী আছেন—মৎস্যভোগ হয় নিত্য। এ ছাড়া তারা সব কিছুটা ভাজাভুজি করে নিয়ে সেইগুলি নিয়ে চলে যায় নাটমন্দিরে। থাকে থাকে বা আলাদা আলাদা সারিতে বসে। গৃহিণী বধূরা দাঁড়িয়ে থেকে আপন আপন সংসারকে খাওয়ান। নিজের নিজের তরকারি পরিবেশন করে দেন।

রাত্রের আহারটা শুধু বাড়ীতে।

শিবেশ্বর কিন্তু বাড়ীতেই খান। তিনি ছেলেদের থেকে পৃথক। থাকেন পৃথক খান পৃথক। ওই প্রসাদ আসে—পায়সান্নের প্রসাদ। রাত্রে শীতলে লুচির সঙ্গে ক্ষীর মিষ্টের ব্যবস্থা আছে—সেইটে তাঁর জন্যে যায়। আর যায় সকালে বাল্যভোগের ছানা-মিষ্টান্ন।

শিবেশ্বর নিজে বৈষ্ণব। বাড়ীতে কালী আছেন—আর রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা আছেন—খোদ আদিকর্তা সোমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত। তারপর রত্নেশ্বর রায় যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বংশ হিসাবে শাক্তের বংশ। কিন্তু শিবেশ্বর বৈষ্ণবমন্ত্র চেয়ে নিয়েছিলেন। তবু বাড়ীতে মা-কালী আছেন বলে মাছ-মাংস খান। মদ খান না। গাঁজা খান।

প্রথম যখন গাঁজা ধরেন তখন গাঁজা তৈরী করবার লোক ছিল। গোলাপজলে ভিজানো গাঁজা অগুরু-চন্দনের তক্তি বা ছোট্ট পাটার উপর রেখে কাটা হত। রূপোর কল্কে ছিল—

সেই কল্কেতে গাঁজা সেজে পরিচারক হাতে ধরত এবং শিবেশ্বর টানতেন মুখ লাগিয়ে। গাঁজা হাতে ধরে খেলে হাতে গন্ধ ওঠে—সেই জন্যে ওই ব্যবস্থা ছিল। তারপর আতর মাখতেন, গায়ের গন্ধ ঢাকতে।

এখন সে সব দিন নেই, এখন নিজে সেজে নিজের হাতে ধরেই খেয়ে থাকেন। নিজে তিলক ফোঁটা কাটেন—গলায় কণ্ঠী আছে। স্ত্রীকেও কাটতে হয় ফোঁটা তিলক। গলায় তুলসীর কণ্ঠীও পরতে হয়।

এই শিবেশ্বর রায়। যোগেশ্বরের খুড়ো। তিনি এখন বেঁচে, বেশ শক্ত হয়েই বেঁচে আছেন। আজও নিত্য সকালে মামলা সেরেস্তা নিয়ে বসেন।

স্থতরাং হেমলতা একটু থমকে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—কিন্তু সে তো তাঁর বলতে গেলে নিজের এলাকা। সেখানে যদি গোলমাল করে সব পণ্ড করে দেন।

নায়েব বলেছিল—তা হোক মা তাঁর নিজের এলাকা। একটা কথা তাঁর এলাকাতেও সত্যি বলে সবাই জানে। সেটা হল তিনি ওখানকার লোকদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে রেখেছেন। ওখানে উনি ছাড়া আপনার আরও অনেক ক'ঘর দশরাত্রির জ্ঞাতি আছে। তাঁদের আপনাদের সঙ্গে বৈষয়িক শত্রুতা নেই। তাঁরা সব এসে কামান করবেন, খাবেন।

—আসবেন ?

—আসবেন। হেসে নায়েব বলেছিল—আমি ওখানকার লোক, ব্রাহ্মণ, আপনাদের জ্ঞাতি নই—তবে আপনাদের জ্ঞাতিরা সবই আত্মীয় বন্ধু। আমি তাদের জানি। তা ছাড়া এতকাল জমিদারি সেরেস্তা চালালাম, কলকাঠি কিসে কোন প্যাঁচে নড়েচড়ে তাও জানি। কোন ভয় নেই চলুন। ক্রিয়া করতে হবে ভাল করে। সমারোহ করে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিদায় করবেন মোটা করে। আর দরকার বুঝলে কোন কিছুতে একটা মোটা দান! বুঝলেন কালটা এখন আলাদা। এখন ঘোড়া হাতী পাল্কী পালঙ্ক দিয়ে দানসাগর থেকে কোন কিছুতে দান করলেই লোক খুশী। কিছুতে, ধরুন ইস্কুল কি ডিসপেন্সারি কি যাতে হোক হাজার পাঁচেক টাকা দান করুন—লোকে খুশী হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্রাহ্মণদের মোটা ভোজন-দক্ষিণা। ছাঁদা। আর কাঙ্গালী বিদায়। খুড়োমশায় যত খেলুন সে খেলা চলবে না।

স্থরেশ্বর বসে বসে অবাক হয়ে শুনছিল।

এই একুশ বছর বয়েসে তার চোখের উপর অনেক ওলোট-পালোট হল। ছেলেবেলা থেকে ইংরেজীনবীশ বাপের সঙ্গে ইংরেজীনবীশ হয়েই গড়ে উঠছিল। বাপ মদ খেয়েছে সে দেখেছে। মাকে নিয়ে খানা টেবিলে বসে খেয়েছে। বাপ তাকে গান-বাজনায় উৎসাহ দিয়েছেন। মন তার তৈরী হচ্ছিল—দেশী উনোনের উপর চড়ানো চাটুতে দেশী রুটির মত নয়, ইংরেজী অনুকরণে দেশী 'বেকারী'র তন্দুরিতে পাঁউরুটির মত। তারপর হঠাৎ একুশ সালে আধকাঁচা অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনের ওলোট-পালোটে চড়ে বসেছিল দেশী উনোনে চড়ানো চাটুর উপর। কিন্তু সেখানেও সে পুরো তৈরী হবার আগেই ইওরোপের

নতুন নতুন বাদের জোয়ারে দেশী উনোনের আগুন গেল নিভে। তবুও তার বাপের শেষ আচরণের জন্য কিছুকাল ওই গরম চাটুর উপরেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু চাটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে এবার আবার এসে ঢুকল খাস ইওরোপীয় বেকারীতে, যেখানে মানুষের হাতের ছোঁয়াচও নিষিদ্ধ—সবই মেসিনে হয়। যাকে বলে মেসিন মেড ব্রেড।

তবুও বলতে কি, কীর্তিহাটের পিতৃপুরুষের রাজরাজেশ্বর এবং রাধাগোবিন্দের ভোগের জন্য যে পদ্মপাতার মত পাতলা এবং ওই আকারের রুটি তৈরী হয় তার প্রতি একটা গোপন প্রশংসা তার মনে মনে ছিল। ধর্ম ভগবান এ নিয়ে একটা সপ্রশংস কিন্তু উৎসাহহীন আকর্ষণ তাকে টানত। মেজ ঠাকুর্দার ধর্মজীবন সম্পর্কে সে অনেক কথা শুনেছে। ভাল লাগত। কিন্তু মেজ ঠাকুর্দার তিনটি বিয়ে তার ভাল লাগত না। মামলা মকর্দমার কথাও শুনত। সে খানিকটা মন্দ লাগত, খানিকটা আবার ভালও লাগত। বিশেষ করে মামলাবাজ জোতদার প্রজাদের সঙ্গে এবং বর্ধিষ্ণুপত্তনীদের এবং প্রতিবেশী জমিদারদের সঙ্গে কঠিন জেদে মামলা করে জেতার গল্পগুলি খুব ভাল লাগত। কিন্তু সেদিন নায়েবের মুখের কথাগুলি তার কপালে প্রশ্নের কয়েকটি কুঞ্চন-রেখা তুলে দিল। সেগুলি কীর্তিহাটে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্রক-রেখার মত দাগ টেনে স্থায়ী হয়ে গেল।

৫

কীর্তিহাটের বাড়ী ছিল রায়দের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এবং তার এগার আনা অংশ ছিল দেবেশ্বর রায়ের ছেলেদের অর্থাৎ সুরেশ্বরের বাপ-জেঠার। ছোট ভাই রামেশ্বর সবই বিক্রী করেছিলেন ভাইদের কাছে। দেবেশ্বর তাঁকে সম্পত্তি পত্তনী-বিলি করতে সহজ অনুমতি দিয়েছিলেন, শিবেশ্বরের অনুমতি ছিল শর্তসাপেক্ষ। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন সম্পত্তি পত্তনী বিলি করতে হলে ভাইদের করতে হবে। বাড়ী বিক্রী করতে পারবেন না। কিন্তু দেবেশ্বর রামেশ্বরের জন্য শিবেশ্বরের বিরোধিতা করেই একলাই বাড়ীর অংশ কিনেছিলেন। তাতে শিবেশ্বর আপত্তি করেন নি। তিনি জানতেন—রামেশ্বর বা দেবেশ্বর বা তাঁদের ছেলেরা কেউ এখানে বাস করতে আসবেন না। তাই ভাইদের যাঁরই হোক সবটাই তিনি ইচ্ছে মত ভোগদখল করতে পারবেন। বাড়ীটার নিজের নিজের অংশ এঁরা মেরামত করতেন—তালা বন্ধও করে যেতেন—শিবেশ্বর সে তালা খুলে, প্রয়োজন হ'লে ভেঙে ব্যবহার করতেন, না-করে তাঁর উপায়ও ছিল না। কারণ পুত্র তাঁর ছয়টি, কন্যা ছয়টি—তাদের সন্তানসন্ততি ছেলেদের তরফে সতেরো জন। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতে থাকে—যখন আসে তখন কোলাহল সম্পর্কে নিজেই শিবেশ্বর বলেন—ওঃ, বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহসম উথলিছে সমুদ্রের মত। এবং গালাগাল করতেন ছেলেদের এত সন্তান-সন্ততির জন্য। কথাবার্তায় তাঁর আবেগ রণরণ করত। ওটা যেন তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাঁর থিয়েটারি অভ্যাস। প্রথম যৌবন থেকে তাঁর থিয়েটারে ছিল প্রবল আসক্তি। থিয়েটারে পার্ট ভাল করতেন। নায়ক সাজতেন। তাতেও আবেগের পার্ট হলে তিনি প্রায় মদমত্ত হস্তীর মত হয়ে উঠতেন।

সেই পারঙ্গমতা এবং স্বভাবগত আবেগবশে তিনি বলতে গেলে গোটা জীবনটাকেই নাটকের নায়কের ভূমিকা করে নিয়েছিলেন। ওই যে বলতেন—ওঃ বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহসম উথলিছে সমুদ্রের মত।—ঠিক নাটকের ঢঙে বলতেন। নাটকীয় ভঙ্গি এবং ঢঙেই তিনি সুরেশ্বর এবং হেমলতাকে অভ্যর্থনা করলেন, যখন তাঁরা যোগেশ্বরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটে পৌছুলেন। নায়েব টেলিগ্রাম করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না—নিজে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে কীর্তিহাটে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে কীর্তিহাট খুব বেশী দূর নয়; ট্রেনে পাঁচ ঘণ্টা লাগত তখন। শিবেশ্বরকে যোগেশ্বরের মৃত্যু-সংবাদ এবং সুরেশ্বর ও হেমলতা শ্রাদ্ধের জন্য এখানে আসছেন—সংবাদটা দিয়েই নায়েব আর উত্তরের অপেক্ষা করেনি—বেরিয়ে এসে দেবোত্তরের নায়েবের সঙ্গে গুটি কয়েক কথা বলে বেরিয়ে পড়েছিল গ্রামে। রায়বংশের দশরাত্রির জ্ঞাতি সাতপুরুষ উর্ধ্বে—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের সহোদরদের বংশধর ভট্টাচার্যদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলে এসেছিল। ফিরে এসে আবার গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল শিবেশ্বর রায়ের সামনে।

শিবেশ্বর বসে ছিলেন—একখানা মোটা দলিলের উপর হাত রেখে নিরাসক্ত মুক্ত পুরুষের মত। নায়েব গলার সাড়া দিয়ে ভিতরে এসে তক্তাপোশের একপ্রান্তে বসে বলেছিলেন—তা হ'লে—

—কিছু বলছ? যেন চমক ভেঙে প্রশ্ন করেছিলেন শিবেশ্বর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকেই তো মা আসছেন, সুরেশ্বরবাবুকে নিয়ে—

বাধা দিয়ে শিবেশ্বর বলেছিলেন, টেলিগ্রাম করে দাও আসতে নিষেধ করে।

—নিষেধ করে দেব?

—হ্যাঁ।

—এমন আদেশ কেন করছেন?

—আদেশ আমার নয়, আদেশ এবংশের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর রায়ের। এই তাঁর উইল—তারপর এটা হল স্বর্গীয় পিতা রত্নেশ্বর রায়ের। যারা স্বধর্মচ্যুত—বা ধর্মত্যাগী তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রায়বাড়ীর নাই। তুমি তো জান!

সুরেশ্বরের নায়েব বলেছিল—তা আমাদের স্বর্গীয় বাবু তো ধর্মত্যাগ করেননি।

—আর ধর্মত্যাগ কাকে বলে?

—কাকে বলে—তা জানি না। তবে তিনি কোনদিন ধর্মত্যাগ করেননি।

—আমার মতে ও বিচারে করেছিলেন। আমি এ অশৌচ নেব না।

—তা নেবেন না।

—নিশ্চয়, ধর্মই সনাতন, তাকে ত্যাগ আমি করতে পারি না।

আলোচনাটা কতদূর অগ্রসর হ'ত কেউ বলতে পারে না, তবে এইখানেই হাত নড়ে গিয়ে বাক্যের মাঝখানেই একটা দাঁড়ি পড়ে যাওয়ার মত রায়বংশের উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষের জ্ঞাতি ভট্টাচার্যবংশের দুজন মাতব্বর ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, একটা দাঁড়ি নয় দুটো দাঁড়ির মত। শিবেশ্বরেরই সমবয়সী।

—মধ্যম কন্যা রয়েছেন।

—কে ? ও আপনারা ! তা বেশ বেশ, এসেছেন ভালই হয়েছে। শুনেছেন তো যোগেশ্বর জার্মানীতে মারা গেছে। হাসপাতালে। জানেন তো সব, স্ত্রী-পুত্র ফেলে একটা ক্রীশ্চান মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছিল ইয়োরোপ।

বার দুয়েক আক্ষেপের ভাব ও ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ। পরিণাম দেখুন !

সঙ্গে সঙ্গে মুখ-চোখের ভাব পাল্টে গেল, দীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন—আমার পুত্র হলেও আমি এমন পুত্রের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করতাম না, অশৌচ গ্রহণ করতাম না ! তাই বলছিলাম—হরচন্দ্রকে। হরচন্দ্র, কি বলে তুমি এলে বলতে যে সেই ধর্মত্যাগী যোগেশ্বরের কামান-শ্রাদ্ধ এখানে হবে ? এখনও চন্দ্র, সূর্য উদিত হচ্ছে, হরচন্দ্র। এখনও ধর্মের অন্তত একপাদও অবশিষ্ট।

তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে গোটা ঘরটা পায়চারি করে চিন্তিতভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে পিছন দিকে কোমরের কাছে হাত দুটি মুঠিতে আবদ্ধ ক'রে মধ্যে মধ্যে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন—হয় না, হয় না। এ হতে পারে না…অসম্ভব !

হঠাৎ নাটকের নাটকীয় গতিকে রূঢ় ভাবে ভেঙে দিয়ে শিবেশ্বরের জ্ঞাতি কাকা মহেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছিলেন—আমরা কিন্তু অশৌচ গ্রহণ করব শিবেশ্বর।

শিবেশ্বর থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন—এবং নির্বাক হয়ে সবিস্ময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হয়নি।

মহেন্দ্রের সঙ্গী জগবন্ধু মহেন্দ্রের ভাইপো, সুতরাং শিবেশ্বরের জ্ঞাতিভাই। তিনি বলেছিলেন —এমন কথা আপনি বলবেন আমরা ভাবিনি।

—ভেবে দেখুন !

—দেখবার কিছু নাই বাপু শিবেশ্বর। ও সব আলোচনা না করাই ভাল। দেখ, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে। থাক। আমরা সংবাদটা শুনে এসেছিলাম তোমার কাছে—আসতে হয়—তত্ত্ব-তল্লাস সামাজিক নিয়ম। আর—আর—নিয়মানুযায়ী অশৌচকালের মধ্যে যেমন আমাদের রাজ-রাজেশ্বরের অন্নপ্রসাদ বিধি আছে, তার ব্যবস্থামত এখনও সংবাদ পেলাম না কেন সেইটে জানতে। দেবোত্তরের নায়েবকে বলে এলাম। সে বললে—এখনও তো কর্তার হুকুম পাইনি, তবে আয়োজন আমি করছি—কিছুক্ষণ পরই কেউ গিয়ে ঘর ঘর বলে আসবে !

সোমেশ্বর রায় তাঁর দেবোত্তরের উইলে এই একটি ব্যবস্থা করে গেছেন। সেটা হল—তাঁর রায়বংশে এবং তাঁর পিতৃব্য দুজনের বংশের কারও মৃত্যু ঘটলে অশৌচের দশদিন তাঁরা রাজ-রাজেশ্বরের প্রসাদ পাবেন। অবশ্য যাঁরা ইচ্ছা করবেন। বলা বাহুল্য, এ ইচ্ছা এক যাদের বাড়ী বা পরিবারে মৃত্যু ঘটে তারা ছাড়া সকলেরই হয়। বাকী সকলেই এ প্রসাদ গ্রহণ করে থাকেন। কারণ অ-তৈল অ-সম্বরাব্যঞ্জন বা হবিষ্যান্নের পরিবর্তে দেবতার প্রসাদ বলে ঘৃত-তৈলসিক্ত ব্যঞ্জন কে না খেতে চায় ? সুতরাং এটা প্রচলিত আছে। শিবেশ্বর

দেবোত্তরের ট্রাস্টি হিসেবে বেছে বেছে সাত পুরুষের বাইরে যারা তাদের বাদ দিয়েছেন। কিন্তু সাত পুরুষ পর্যন্ত এখনও ব্যবস্থা আছে। সেই নিয়মের কথা উল্লেখ করলেন মহেন্দ্র ভট্টাচার্য।

শিবেশ্বর তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। তিনি এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যোগেশ্বরের নায়েব বা ম্যানেজার হরচন্দ্রের দিকে।

হঠাৎ নিচে লোকজনের সাড়া উঠতেই হরচন্দ্র উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে বললে—ও।

শিবেশ্বর তখনও তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হরচন্দ্র বললে—ঘরদোর পরিষ্কারের জন্য লোক পাঠাতে বলেছিলাম ঘোষালকে। এসে গিয়েছে দেখছি।

ঘোষাল এখানে দেবোত্তরের নায়েব।

শিবেশ্বর বললেন—হুঁ! তারপর বললেন—ঘরদোর পরিষ্কার করাবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁরা তো এখানে সন্ধ্যেতেই পৌছুচ্ছেন!

আবার শিবেশ্বর বললেন—হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তাঁর। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার লোক তিনি নন, তাই পড়ল কথাটাই প্রযোজ্য।

হরচন্দ্র বললে—ওঁরা তো কলকাতার বাসিন্দে, ধরণ-ধারণ একটু পরিষ্কার-মরিষ্কার! ময়লা-টয়লা দেখতে পারেন না। তা ছাড়া রোগটোগকে ভয় করেন। গঙ্গাজলে ফিনাইল দিয়ে ধোবার হুকুম আছে।

কথাগুলি সাধারণ অর্থের অন্তরালে অনেক অর্থ ব্যক্ত করেছিল ইঙ্গিতে। সে ইঙ্গিত হল, যোগেশ্বরের তরফের যে ঘরগুলি শিবেশ্বরের পুত্রেরা দখল ক'রে বাস করছেন সেগুলি খালি ক'রে দিতে হবে। তারই একখানা ঘরেই কথা হচ্ছিল—শিবেশ্বর এই ঘরেই বৈঠকখানা করেন। তাঁর খাস বৈঠকখানা। এবং পাশের ঘর দুখানায় তাঁর কনিষ্ঠা গৃহিণী থাকেন।

যোগেশ্বর থেকে তাঁর বড় ভাই যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারীর ব্যবসায়ে বেশী অর্থের মালিক হয়েছিলেন একসময়, তিনি কলকাতায়, কাশীতে, পুরীতে, দার্জিলিং-এ, শিমুলতলায় বাড়ী করেছিলেন, এখানকার বাড়ীও মেরামত তিনি করিয়ে রাখেন। কিন্তু যোগেশ্বর সায়েবী রুচির লোক ছিলেন, তিনি যেখানে গেছেন হোটেলে থেকেছেন, বাড়ী কোথাও করেননি। কিন্তু কলকাতার বাড়ী এবং কীর্তিহাটের বাড়ী মেরামত করিয়েছিলেন নিজের রুচি অনুযায়ী যথেষ্ট খরচ ক'রে। হেমলতাকে বিয়ে করবার ঠিক আগেই প্রথমবার। তখন তাঁর ইচ্ছে ছিল কীর্তিহাটে হানিমুন করবেন এবং তার পরেও মধ্যে মধ্যে আসবেন এখানে বিশ্রাম করবার জন্যে। কিন্তু তা কাজে পরিণত হয়নি। তবে কীর্তিহাটের বাড়ীর নূতন ঢঙ এবং রুচিকে তিনি বজায় রেখে এসেছিলেন নিয়মিত মেরামতে। এই যে-ঘর তিনখানা শিবেশ্বর এখন দখল ক'রে আছেন এ তিনখানা, যোগেশ্বর যতদিন দেশে ছিলেন অর্থাৎ চন্দ্রিকাকে নিয়ে ইয়োরোপ চলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত, বন্ধই থাকত, শিবেশ্বরও জবর-দখল করতে সাহস পাননি। তিনি ইয়োরোপ চলে যাবার পর থেকে তিনি দখলে এনেছেন। নায়েব হরচন্দ্র নীচের লোকজনের সাড়ার দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁকে ইঙ্গিতে জানালো, ঘরগুলোকে হিন্দু মতে

গঙ্গাজলের সঙ্গে সায়েবী বা বিজ্ঞানসম্মত মতে ফিনাইল মিশিয়ে শুদ্ধ এবং ডিসইনফেকট ক'রে নিতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়েই ছিলেন শিবেশ্বর। তাঁর মুখখানা একবার রূঢ় কঠোর হচ্ছিল, তারপরেই আবার অসহায়ভাবে করুণ হয়ে উঠছিল। সব থেকে লজ্জা পাচ্ছিলেন জ্ঞাতিখুড়ো মহেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ভাই জগবন্ধু ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে।

হরচন্দ্র জানালার কাছে গিয়ে বললে—দাঁড়া দাঁড়া যাচ্ছি। তারপর শিবেশ্বরের দিকে তাকালে। তার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট।

শিবেশ্বর মহেন্দ্র ভট্টাচার্যদের দিকে এবার ফিরে তাকিয়ে বললেন—নায়েব ঘোষাল যখন আয়োজন করব, লোক পাঠাব বলেছে তখন লোক যাবে মহেন্দ্রকাকা। আর এ তো জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কারুর মৃত্যুতে অশৌচ নয়, এ যোগেশ্বর—রায়বংশের তিন শরিকের এক শরিক। তার মৃত্যুতে অশৌচ—এ বলতে হবে কেন?

মহেন্দ্র বললেন—হ্যাঁ। সেই তো কথা। কিন্তু পুকুরে দেখলাম জাল পড়ছে। মাছ ধরছে তোমাদের বাড়ীর জন্যে। তোমার নাতিরা কজন বসে আছে। বলে—

—কি বলে? কেড়ে নিলেন কথাটা শিবেশ্বর। তারপর বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়লেন—হ্যাঁ, বড় ছেলে আমার ধুয়ো তুলেছে বটে। দাদা তো একটা ক্রীশ্চান মেয়ে নিয়ে ইউরোপ গিয়ে ক্রীশ্চান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অশৌচ কেন নেব আমরা? এ দলিলপত্র সে-ই তো বের করে দেখতে চাইলে! আমি দেখছিলাম। কিন্তু মাছ ধরাচ্ছে খাবে বলে এ তো জানিনে! অপগণ্ড আর কাকে বলে? মদ্য পান ক'রে সিঁদুরের ফোঁটা কপালে এঁকে তান্ত্রিক! তুমি যাও মহেন্দ্রকাকা, ম্যানেজার ঘোষালকে একবার পাঠিয়ে দিয়ে যাও!

মহেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং জগবন্ধু ভট্টাচার্য চলে গেলেন।

শিবেশ্বর বললেন—হরচন্দ্র!

—আজ্ঞে বলুন বাবু।

—আমি হেরে গেলাম।

—আজ্ঞে না বাবু! আপনি হারতে পারেন, না, আপনাকে কেউ হারাতে পারে? আপনি জিতলেন। আপনার ভাইপো—।

কথাতে কানই দিলেন না শিবেশ্বর, বললেন—দেখ, কথায় আছে পরভাতি হই সেও ভাল তবু পরঘরি না হই। ওঃ! ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। অর্থাৎ নিজের অংশের বাড়ী মেরামত না করিয়ে ভাইপোদের বাড়ী দখল করে থেকে।

হরচন্দ্র অকারণে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে—আমি যাই বাবু। ওই বিবি-মহলটা বরং সাফ করিয়ে নিই। ওখানেই ওঁরা উঠবেন। বেশ নিরিবিলি থাকবেন। পাঁচজনের গোলমাল থাকবে না। সেই ভাল হবে।

রায়দের বাড়ী প্রকাণ্ড। ইমারত অনেক। প্রথম পুরুষ সোমেশ্বরকে সামনে রেখে তাঁর বাপ কুড়ারাম ভট্টাচার্য প্রথম একখানা চকমিলান দালান তৈরী করিয়েছিলেন। তারপর তার সামনে তৈরী করিয়েছিলেন কালীবাড়ী, নাট-মন্দির, কাছারী। তারপর সোমেশ্বর তৈরী করিয়েছিলেন

পিছন দিকে আর এক মহল, সেটা করেছিলেন তাঁর কন্যা-জামাতার জন্যে। তাঁর পুত্র বীরেশ্বর। তিনি করিয়েছিলেন মূল বাড়ী থেকে পৃথক করে একটু সরে এসে একেবারে কংসাবতীর ধারে, কিনারায় পোস্তা বেঁধে ছোট একটি সুন্দর বাড়ী। কিছুটা দোতলা কিছুটা একতলা। এই বাড়ীতে তিনি বিবাহের পর বাস করতেন স্ত্রীকে নিয়ে। তিনি ছিলেন সাহেবী মেজাজের লোক। তারপর স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বাস করতেন এক কলকাতার বাঈকে নিয়ে। লোকে বলত বিবি। সেই নামে বাড়ীটারও নাম হয়ে গিয়েছিল বিবি-মহল। তারপর তার পরবর্তী পুরুষ রত্নেশ্বর—বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে এবং পোষ্যপুত্র—তিনি করিয়েছিলেন অন্দরের দু'মহলের সঙ্গে যোগ করে আর এক মহল। তাঁর তিন ছেলে, তিন ছেলের জন্য হিসেব করে তিন মহল সম্পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর আমলে বিবি-মহলই হয়েছিল সাহেব-মহল—তারপর নাম হয়েছিল গেস্ট-হাউস। পরবর্তীকালে দেবেশ্বর কিনেছিলেন এ বাড়ী দুই ভাইয়ের কাছ থেকে।

মহলটার দুর্নাম ছিল। মহলটায় নাকি দুর্ভাগ্যের বোঝা অদৃশ্যভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সুতরাং ইংরেজী উনিশশো সাল পড়ি-পড়ি সময়টায় শিবেশ্বরের মত লোক সানন্দেই বিক্রী করেছিলেন এবং রামেশ্বর ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার সময় ওটার অংশ দাদাকে বেচে-ছিলেন অর্থের জন্য। দেবেশ্বরের বড় ছেলে যজ্ঞেশ্বর কলিয়ারী নিয়েছিলেন এবং দেবতা ধর্ম—এর প্রতি আসক্তি এবং বিশ্বাস যতই যুগধর্মে দুর্বল হোক ব্যবসার লাভ লোকসানের খাতিরে গ্রহ মানতেন—প্রবাল, গোমেদ, নীলাতে যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়াও কোন সম্পত্তি বা কোন জিনিসের পয়-অপয় মানতেন। ইংরেজীনবীশ যোগেশ্বর সেটা মানতেন না। তাই মূল বাড়ীর অংশ কম নিয়ে তিনি এই বিবি-মহল নিতে আপত্তি করেননি। এই বিবি-মহলেই দেবেশ্বরের মৃত্যুর কারণ ঘটেছিল। কারণটা কি তা কেউ সঠিক জানে না, তবে দেবেশ্বর অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর জ্ঞান হয়ে তিনি নিজেই প্রায় উন্মত্ত বিভ্রান্তের মত ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পড়েছিলেন ঠাকুরবাড়ীতে। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আরও কিছু অপ্রিয় ঘটনার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত।

যোগেশ্বর যখন হেমলতাকে নিয়ে এখানে প্রথম আসেন তখন ইচ্ছা ছিল এই বাড়ীতে উঠবেন। কিন্তু স্টেশনে নেমে কেমন পরিবর্তন ঘটেছিল যোগেশ্বরের। তিনি ভিতর-বাড়ীতে এই ঘর কখানাতেই বাস করেছিলেন কয়েক দিন।

তিন মহল রায়বাড়ীতে উপরে-নীচে প্রত্যেক মহলে বারোখানা হিসেবে ছত্রিশখানা ঘর। দেবেশ্বর ছোট ভাই রামেশ্বরের অংশ কিনেছিলেন বলে তাঁর অংশে ছিল চব্বিশখানা ঘর দুটো মহলে মিলিয়ে। প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগের তৈরী বাড়ী—তার নীচের তলাগুলি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে। সে মেরামত সত্ত্বেও হয়েছে। এবং আগের আমলে এগুলিতে ছিল লক্ষ্মীর ঘর, ভাঁড়ার। তাছাড়া তরকারীর ঘর, পান সাজার ঘর, কাপড়-চোপড়ের ঘর, সূতিকাগৃহ, খাবার ঘর, চাকর-ঝিদের বাসের ঘর। শুধু লক্ষ্মীর ঘরের সামনে বড় দরদালানটি ছিল দিনের ভাগে অন্দরবাসিনীদের ব্যবহারের স্থান। সুতরাং এখন শিবেশ্বরকে যোগেশ্বরের অন্দর-মহলের শ্রেষ্ঠ ঘর তিনখানি ছেড়ে দিয়ে ওই বিবি-মহল ছাড়া

থাকবার যোগ্য স্থান আর ছিল না। অন্ততঃ এমন আরামদায়ক আর কোন ঘর যোগেশ্বরের অংশে ছিল না।

হরচন্দ্র সেই বিবি-মহলেই সুরেশ্বর এবং হেমলতার বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল। সেইখানেই উঠেছিল সুরেশ্বর হেমলতার সঙ্গে।

৬

বিবি-মহলের দুর্নাম যাই থাক সে তার অবস্থান-গুণে গঠন-সৌন্দর্যে, কিন্তু বিবির মতই মনোহারিণী ছিল। এদেশে ইংরেজদের প্রথম আমলের কুঠীবাড়ীর মত সামনে গোল থাম-ওয়ালা বারান্দা ঘেরা দোতলা বাড়ী। তারও সামনে প্রশস্ত গাড়ীবারান্দার উপর ছিল বসবার বা আসর পাতবার জায়গা। চারিদিকে আলসেয় ঘেরা। তার মধ্যে মধ্যে জোড়া গোল থাম। থামের উপর দিকে শৌখীন কাঠের ঝিলিমিলি, তার উপর পাকা ছাদ। গাড়ী-বারান্দার পরই গোল থাম ঘেরা বারান্দা। তারপরই বড় হল। এই হলকে ঘিরে তিন দিকে তিনখানা ঘর। পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। এর ফলে প্রতি ঘরেই তিন দিক ছিল অবারিত। শুধু কোলে কোলে টানা বারান্দা ছিল লোহার রেলিং ঘেরা। তাতে আলো-বাতাস বা সামনের দিগন্ত অবরোধ করেনি। গোটা বাড়ীখানা ছিল পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, দক্ষিণ গায়ে কংসাবতী নদী। কংসাবতীর কিনারায় পোস্তা বাঁধিয়ে বাড়ীখানা তৈরী করা হয়েছিল। সদরে ওই গাড়ীবারান্দার দক্ষিণ গায়ে বাঁধানো ঘাট। আগে ওইখানে প্রকাণ্ড একটা দহ ছিল। পশ্চিম দিকে কংসাবতীর কূলে ঘন জঙ্গল একেবারে বাড়ীর প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে। কংসাবতীর ওপারেও জঙ্গল।

সুরেশ্বর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এখানে এসে।

সব থেকে ভাল লেগেছিল দক্ষিণ দিক। নিচেই কংসাবতী নদী, তার ওপারে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলের মধ্যে ছিল এক সিদ্ধ শক্তিপীঠ। একটা বিশাল শিমুল গাছ সকলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তারই খানিকটা দূরে ওই কংসাবতীর বন্যার সীমা-রেখার ঠিক প্রান্তেই একখানি বিচিত্র গ্রাম। যেদিন রাত্রে সে এসেছিল সেদিন ছিল শুক্ল পক্ষের নবমী বা দশমী। জ্যোৎস্নার আবছা আলোর মধ্যে সে শিমুল গাছটার পত্রহীন শাখাগুলিকে আকাশের গায়ে ছবির মত দেখতে পেয়েছিল। নীল পটভূমিতে কালো রঙে এঁকে রেখেছে কোন শিল্পী। আর দেখতে পেয়েছিল ওই গ্রামখানায় এখানে-ওখানে জ্বলন্ত আলোকবিন্দু। বাড়ীর নীচেই চৈত্রের কংসাবতীর স্বল্প জলস্রোতে চাঁদের প্রতিবিম্ব, জ্যোৎস্নার ছটা বহুদূর পর্যন্ত একটা গলিত রূপোর স্রোতের মত মনে হচ্ছিল, তারপর সেটা কালো কৃষ্ণাভায় ঢাকা পড়ে গেছে।

এসেছিলেন অনেকে দেখা করতে। জ্ঞাতি ভট্টাচার্যেরা, দেবোত্তরের কর্মচারীরা, ইস্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামের লোক অনেকে এসেছিলেন. রায়বাড়ীর জ্ঞাতিদের মধ্যে এখানে সকলেই শিবেশ্বরের বংশাবলী। তাদের মধ্যে শিবেশ্বরের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অর্থাৎ

ছোটগুলি—কমলেশ্বর, বিমলেশ্বর, অতুলেশ্বর এসেছিল, তার সঙ্গে ছিল ধনেশ্বরের বড় ছেলে। সে সুরেশ্বরের থেকে বয়সে বড়। বেশ শৌখীন লোক। চেহারাটি ভাল। নাম ব্রজেশ্বর। সুরেশ্বরের সঙ্গে ঠিকাদারী করে। খোঁয়াড় ডাকে। তারা তরুণ। কমল, বিমল সুরেশ্বরের সমবয়সী, অতুলেশ্বর বয়সে ছোট। আরও এসেছিল পরবর্তী পুরুষের প্রায় সকলেই। ছোটদের মধ্যে রায়বংশের কোন ছাপ জ্যোৎস্নার মধ্যে সে দেখতে পায়নি। পোশাক-পরিচ্ছদ শুধু অপর্যাপ্তই নয়, অপরিচ্ছন্নও বটে। কয়েকটা পাঁচ-ছ বছরের ছেলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসছিল। ওই হাসি দেখে তার এত কুৎসিত মনে হয়েছিল যে সে কোন মতেই ভাবতে পারেনি যে এরা তারই নিকট জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই। মন তার ছোটই হোক আর বড়ই হোক, মন বিদ্রোহ করে বলেছিল, না, এদের আত্মীয় আপনজন-একরক্ত এ স্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছে, ঘৃণা হচ্ছে।

এরই মধ্যে হ্যারিকেন হাতে একটি ব্রাত্যশ্রেণীর মেয়ের পিছনে পরিচ্ছন্ন লালপাড় শাড়ীপরা এক অল্পবয়সী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভিড়ের ওপাশে।

ঝিটা বলেছিল—পথ দাও ক্যানে গো! মেজ-মা এয়েছেন। দেখছ না?

সকলে সম্ভ্রমভরে পথ করে দিয়েছিল।

মহিলাটি ভিতরে চলে গিয়েছিলেন তার মা হেমলতার কাছে। কিছুক্ষণ পরই সুরেশ্বরের কলকাতার চাকর রঘুয়া এসে তাকে ডেকেছিল—মা ডাকছেন ভিতরে।

নায়েব সুরেশ্বরের কাছেই ছিল, সে বলেছিল—যাও, মেজ-মা এসেছেন, তিনিই ডাকছেন। কথা তাই বটে; সুরেশ্বর ভিতরে গিয়ে দেখেছিল তার মায়ের পাশেই তাদেরই একখানা রাগ-জাতীয় কম্বলের উপর সেই লালপাড় শাড়ী-পরা মেয়েটি বসে আছেন।

হ্যাজাকের বাতি জ্বলছিল। উজ্জ্বল আলো। মহিলাটির মাথায় চুলের সামান্য অংশ বের করে ঘোমটাটি তোলা, লাল পাড়ের বেড়ের মধ্যে মুখখানি আশ্চর্য শান্ত, প্রসন্ন এবং মিষ্টি। বয়স তাঁর হেমলতার থেকে পাঁচ-সাত বছর কমই হবে। টকটকে রঙ, সুন্দর দুটি চোখ, নাকটি একটু খাটো কিন্তু তাতেই তাঁর রূপ যেন বেড়ে গেছে।

মা বলেছিলেন—মেজ-খুড়ীমা। তোকে দেখতে চাচ্ছিলেন।

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, এই তার মেজ-ঠাকুর্দার স্ত্রী! মেজ-ঠাকুর্দার বয়স তো সত্তরের কাছে!

তিনি বলেছিলেন—বস ভাই নাতি, বস। আমি তোমার ঠাকুমা, তুমি নাতি। সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি প্রণাম করতে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তার হাতখানা ধরে ফেলে বলেছিলেন—না ভাই, অশৌচের সময় প্রণাম করতে নেই। বস। বস, এই কাছে বস। তোমাকে দেখি। তুমি বড় সুন্দর হে! বলে তার চিবুকে হাত দিলেন।

লজ্জা সুরেশ্বর পায় না। সে সুন্দর ঐ কথাটা সে নিজেই জানে। তার উপর লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি এ কথা তাকে নীরবে বার বার জানায়। কিন্তু এই অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েটি তার চিবুক ধরে এমন করে বলায় সে লজ্জা পেয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—তা হবে না কেন? ভাশুরপো যোগেশ্বর যেমন সুপুরুষ ছিলেন, বউমার

তেমনি রূপ, তাদের গোপালের এমন রূপ হবে না তো হবে কার ?

হেমলতা একটু বিষণ্ণ হেসেছিলেন। হয়তো তাঁর রূপের ব্যর্থতার কথাই তার মনে হয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—দুঃখ পেলে বউমা ? তা এ বাড়ীর বউ হলেই তাকে দুঃখু পেতে হয়। বলে আশ্চর্য হাসি হেসেছিলেন।

হেমলতা বললেন—না খুড়ীমা, দোষ আমি এ বংশকে দেব না। তাকে আমার থেকে ভাল কেউ জানে না। এমন কি এখান থেকে চলে গিয়ে দুখানা চিঠি তিনি লিখেছিলেন, তাতে তিনি একটি কথা গোপন করেননি। যা করেছেন তা তিনি অন্যায় করেছেন তাও আমি বলতে পারব না। দোষ আমার ভাগ্যের। একেবারে আমার ভাগ্যের। সুরোর পর ছেলে হয়ে মরতেই বসেছিলাম, মরাই ভাল ছিল, কিন্তু বাঁচলাম। সে ওই নামেই বাঁচলাম।

—শুনেছি বউমা। থাক ওসব কথা। এখন আমি যার জন্যে এসেছি, তাই কর। সুরেশ্বরকে আমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দাও। মেজ কর্তার কাছে ওর এসে-এসে যাওয়াই ভাল, খুঁত যেন ধরতে না পারেন। তোমার নায়েবের খুব বুদ্ধি, প্রথম প্যাঁচেই কর্তাকে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও উনি বড় ছেলের সঙ্গে গজগজ করেছেন। তার উপর শুনলাম মেজ তরফের নিচের তলা থেকে সব কাল ঝাড়াই-মোছাই হবে। মানে দরকার হলে ওই বাড়ীতেই চলে যাবেন তোমাদের অংশ খালি করে দিয়ে। মতলব ভাল নয়। সুরেশ্বরের এখুনি যাওয়াই ভাল।

একটু—মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত - চুপ করে থেকে আবার বললেন—দেখ, মানুষটার মধ্যে এখনও একটা ভালমানুষ আছে। আমি তো দেখছি। হয়তো আসলে মানুষটা ভালই। বড় বাপের ছেলে, আমার শ্বশুর শুনেছি দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। ধার্মিক চরিত্রবান। লোকে এখনও বলে আগুনে কালি আছে, তাঁর মধ্যে কালি ছিল না। ইনিও লেখাপড়া শিখে-ছিলেন, এফ-এ পাশ। প্রথম জীবন থেকে গোঁড়া ধার্মিক। গীতা ভাগবত কণ্ঠস্থ। আজও পড়েন। কিন্তু মা, বড়লোকের ছেলে জমিদারী জেদে মামলা করা ছাড়তে পারলেন না আর। একটু হেসে বললেন—সুরেশ্বর রয়েছে, বলতে লজ্জা করছে, ওই পরিবার বাতিক। মা, আমার বিয়ে হয়েছে তের বছর। এই তের বছরে একবার আমার বাবার মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধে গিয়েছিলাম। বাস, আর যাইনি। শুনেছি আমার বড় সতীন—ওঁর প্রথম পরিবার—পনের বছর বেঁচে ছিলেন, দশটি সন্তান হয়েছিল, সাতটি বেঁচেছে তিনটি মরেছে। তিনি মারা যাওয়ার এক মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয় সতীন কুড়ি বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়েতে ছটি, তার পাঁচটি বেঁচে। তিনি গেলেন, ওঁর তখন চুয়ান্ন বছর বয়স। সেই বয়সে টোপর চেলি পরে আমাকে বেনারসী চাদরে গলায় বেঁধে এনে ঘর বাঁধলেন। আমার একটা ভাগ্য আছে মা, ভগবানকে প্রণাম করি আর বলি, রক্ষে করেছ তুমি আমাকে। বাঁচিয়েছ। আমাকে সন্তান দাওনি। এতেই দুই পরিবারের ছেলেমেয়েতে বারোটি, ছয় মেয়ে ছয় ছেলে। এর উপর আমার গণ্ডাখানেক হলে ধোলকলায় পুন্নিমে হত

মা। নাতি-নাতনীতে সতেরোটা। ওদের পেট ভরাতে বিষয় যেতে যেতে অভাবে স্বভাব মন্দ যাকে বলে তাই হ'ল। মধ্যে মধ্যে আপশোষ করেন। ভালোমানুষটা জাগে। কিন্তু কি করবেন? বড় বড় নাতিগুলো থেকে ছেলেরা একধার থেকে দায়ী করে ওঁকে। বলে—; সে জঘন্য কথা মা। সুরেশ্বরের সামনে বলতে বাধছে।

সুরেশ্বর উঠে গিয়েছিল। যেতে যেতেই শুনতে পেয়েছিল, মেজঠাকুমা বলছেন—বড় ছেলে বলে কি জান? বলে—ছয় পুত্র সন্তান থাকতে বিয়ে করেছিলেন, কেন করেছিলেন? যদি বিয়ে না করে না থাকতেই পেরেছিলেন তবে একটা রক্ষিতা রাখলেই পারতেন। একটা দুটো যটা ইচ্ছে। তবে সত্যি কথা বলব মা, ওই মামলা-মকদ্দমার নেশা, ও ওঁর গাঁজার নেশার চেয়েও বেশী। জরজারি হলে গাঁজা খান না, ভাল লাগে না, কিন্তু মামলা-মকদ্দমার খোঁজ তার মধ্যেও না করে পারেন না। ওটা তো হিংসের কাজ, এ তো অস্বীকার করলে চলবে না! আর নারী ধ্যান-জ্ঞান এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, এই বা অস্বীকার করি কি করে?

হেমলতা বেশ বিস্ময়ের সঙ্গেই শুনছিলেন এই গ্রাম্য মেয়েটির কথা। মেয়েটি রায়বংশের বৃদ্ধের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়েছে নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশে। খুবই দরিদ্রের মেয়ে, সম্ভবতঃ এমন দরিদ্র যে কন্যার বিবাহে সামান্য কিছু খরচ করবারও সঙ্গতি ছিল না, থাকলে এমন রূপসী মেয়ের বিয়ে একটা হয়ে যেতো। হয়তো বা জমিতে-জেরাতে কিছু পরোক্ষ মূল্য নিয়ে বিক্রীই করেছে। সেই মেয়ে এমন কথাবার্তা কইছে, সেটা তাঁকে কিছুখানি বিস্মিত করছে বইকি। সব থেকে আশ্চর্য লাগছে কথাগুলির মধ্যে ক্ষোভ নেই, বেদনা কিছুটা আছে, কিন্তু অপ্রসন্ন নয়। এবং বিচার আছে। এবং একটি ন্যায়বোধও রয়েছে।

মেজগিন্নীর হঠাৎ চোখে পড়ল হেমলতার বিস্মিত দৃষ্টি। তিনি কথা বলছিলেন হেমলতার চোখে চোখ রেখে বা মুখের দিকে তাকিয়েও নয়। তাঁর দৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই তিনি নিবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁর কোলের উপর পড়ে থাকা নিজের হাত দুখানির উপর। নিটোল দুখানি গৌর-বর্ণ হাতে শুধু দুগাছি শুভ্রবর্ণ শাখা ছাড়া কোন অলঙ্কার ছিল না। দু-একবার চোখ তুলে অনেকটা অন্যমনস্কের মত খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের রাত্রির বায়ুমণ্ডল বা আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে সেই দিকেই তাকিয়ে থেকেছেন। এতক্ষণে হেমলতার চোখে চোখ পড়তেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বললেন—আমি তো মুখ্যু মেয়ে, গরীবের মেয়ে, যা মনে হয় তাই বললাম। কিন্তু কিছু অন্যায় বললাম মা?

হেমলতা বললেন—না খুড়ীমা। সেই তো আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম মা।

মেজগিন্নী বলেছিলেন—গরীব ঘরের মেয়ে, বাপ ছিলেন এঁদের বাড়ীর পুজুরী। চালকলা বাঁধা বামুন। কিন্তু ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে এ বিয়ে হ'ত না। বাবা মারা গেলেন, নিজের মা ছিল না। দেড় বছরের রেখে মা মরেছিলেন। সৎমা বিধবা হলেন, তখন বয়স আমার চৌদ্দ। গাঁয়ে ঘরে বিয়ের কাল পেরিয়েছে, গলায় কাঁটা লাগার মত লেগেছি। মেজকর্তা লোক পাঠালেন। পাঁচ বিঘে জমি দেবেন ভাইদের। বিয়ে হয়ে গেল। আমিও বাঁচলাম। লোকে বললে শিবের মত স্বামী হল। আমিও তাই ভাবলাম। বাপের কাছে শেখা পাপপুণ্য বোধ

ছিল। মেজকর্তাও তখন এমন ছিলেন না। তখনও থিয়েটার করতেন। ঘরে নাটক পড়তেন। তাঁর থেকে অনেক শিখলাম মা। কিন্তু যাঁর কাছে শিখলাম, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে সে-ই সব ভুলে গেল।

হেমলতা বললেন—ভারী ভাল লাগল মা আপনাকে!

খুশী হয়ে মেজগিন্নী বলেন—জান মা, কাল খবর পেয়ে অবধি কতবার মনে মনে বলেছি যোগেশ্বর ভাশুরপো না গিয়ে যদি ইনি যেতেন! আমি যদি বিধবা হতাম! কত দাম তার জীবনের, কত নাম! আর ইনিও দারিদ্র্য-দুঃখ থেকে রেহাই পেতেন!

—ও কথা বলে না খুড়ীমা। উনি বাঁচুন, অনেকদিন বেঁচে থাকুন। ওঁর দুঃখ ঘুচুক? ছেলেরা কাজ-কর্ম করুক—

—ছেলেরা? মা, বড় সতীনের ছেলেরাও তো বুড়ো হয়ে এল বলতে গেলে। বড় ধনেশ্বরের বয়স যোগেশ্বর ভাশুরপোর প্রায় সমান। ছেলেরাই সব উপযুক্ত। বড় ছেলে ব্রজেশ্বর, সুরেশ্বরের থেকে বড়। ধনেশ্বর সিঁদুরের ফোঁটা পরে, কালীমন্দিরে কালী-কালী করে, মদ খায়। লোককে শাসন করে বেড়ায়। ভাবে সেই আমলই বুঝি আছে। ধর্মের ষাঁড়কেও যে আজ-কালকার আইনে খোঁয়াড়ে দেওয়া যায় তা ভুলে যায়। সেজছেলে সুখেশ্বর একটু উপযুক্ত। এখানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। দু-চার টাকা এদিক-ওদিক থেকে রোজগার করে, তা নিজের কুলোয় না বাপ-ভাইকে কি দেবে? কত আর বলব মা, সব ছেলেই অপগণ্ড। দ্বিতীয় পক্ষের বড় ছেলে কমল—কমলেশ্বর বাপকে নেশার পয়সার জন্যে মধ্যে মধ্যে বলে—নেশার পয়সা দিতে পার না বাপ হয়েছিলে কেন? জন্ম দিয়েছিলে কেন? গাঁজা খায়। ছোট ছেলেটা অতুলেশ্বর একটু ভাল। লেখাপড়া করছে। তাও স্বদেশী বাতিক। বন্দেমাতরম করে বেড়ায়। নাতিগুলোও তাই! ওঁর কষ্ট দেখি আর ভাবি আরও কত কষ্ট উনি পাবেন! মধ্যে মধ্যে এমন কাণ্ড ঘটে বড় ছেলের বড়ছেলে আর অতুলের বড় বিমলকে নিয়ে, আর মেজ ছেলে জগদীশ্বরকে নিয়ে যে উনিও বলেন—হে গোবিন্দ, মৃত্যু দাও! পরিত্রাণ কর! অথচ মৃত্যুকে ওঁর বড় ভয়।

—কেন? কি করে? ওঁকে মারেটারে নাকি?

—না-না। সে সাধ্যি নাই। সে ভয় করে। উনি এখনও সব নিজের হাতে রেখেছেন তো! বন্ধ করে দেবেন সব! যা করে সে কেলেঙ্কারী। এখানে ছোটজাতের মেয়েদের নিয়ে—বিশেষ করে ওই নদীর ওপারে গোয়ানপাড়া ব'লে একটা ক্রিশ্চানপাড়া আছে, তাদের মেয়েগুলো খারাপও বটে, তাদের নিয়ে কেলেঙ্কারী করে। ওদের পুরুষ জাতটা আবার আমাদের ছোটজাতের মত নয়—তারা সব চোথোল-মুখোল, বদমাস, গুণ্ডা, তারা আসে মারমুখী হয়ে! ওঁকে তার ঝাপটা সইতে হয়। এক-একদিন বলেন—মেজবউ, আমার অজান্তে আমার ক্ষীর কি সন্দেশে বিষ মিশিয়ে দিতে পার? আর বাঁচতে আমি পারছিনে, চাইনে। কিন্তু জেনে, নিজে উদ্যুগ করে মরবার মত সাহস আমার নেই। মরণকে আমার বড় ভয়। জান, বি-এ পরীক্ষার সময় কলকাতায় প্লেগের হুজুগ হয়েছিল, কলকাতায় প্লেগ এসেছে। আমি পালিয়ে এসেছিলাম পরীক্ষা না দিয়ে। বাড়ীতে কেউ পাঁচবার দাস্ত করলে গাঁজা খাই। ঘর বন্ধ করে বসে থাকি।

কিন্তু এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হচ্ছে না।

আবার কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—আগে শুনেছি দয়া ছিল মায়া ছিল। কেউ মারা গেলে হাউহাউ ক'রে কাঁদতেন—বটঠাকুর মানে তোমার শ্বশুর, ঠাকুরপো মানে ওঁর ছোট ভাই, বন্দুকে পাখী মারতেন, উনি কাঁদতেন। মিথ্যে কথা বলতেন না। সেই মানুষ ওই দুটো দোষে কি হয়ে গিয়েছে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তিনিও ফেললেন, হেমলতাও ফেললেন। হেমলতা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কি উত্তর দেবেন? একটু নিস্তব্ধ হয়ে রইল ঘরখানা। তারপরই মেজগিন্নী বললেন—তাহ'লে উঠি বউমা। তুমি সুরেশ্বরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। ও একবার কাছে বসে মিষ্টি ক'রে বলুক, ঠাকুর্দা, আমার তো অভিভাবক আপনি। আপনার থেকে বড় অভিভাবক তো কেউ নেই। জ্যাঠামশাই তো সেই দূরে। আমি ছেলেমানুষ, আমাকে যেন আপনি দেখবেন। হয়তো···হয়তো কাজ কিছু হবে না। তবু বলা! বিষণ্নভাবে হাসলেন মেজগিন্নী।

হেমলতা সচেতন হয়ে উঠলেন, তিনি যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—এই তাঁর চেয়েও কমবয়সী তাঁর শাশুড়ীটির জন্যে। সচেতন হয়ে উঠে বললেন—যাবে বৈকি সুরেশ্বর। যাওয়া উচিত ছিল। সুরো! সুরেশ্বর! রঘু, সুরো বোধহয় বাইরে—

সুরেশ্বর বাইরে যায়নি। পাশের ঘরেই ছিল। বাইরের ওই জঙ্গলের ও কংসাবতীর দিকের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার ফুটফুটে রাত্রির আকাশ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিল। জঙ্গলে কোথায় দুটো কোকিল পাল্লা দিয়ে ডেকেই চলেছে। 'চোখ গেল' পাখীর ডাকও সে শুনেছে, পাপিয়া ওর নাম, জানবাজারে পাশের একটা বাড়ীতে কেউ পুষেছিল—ডাকত। আর একটা পাখী ডাকছে ভারী চমৎকার সুরেলা ডাক। নাম জানে না। ওই ডাকও শুনেছিল সে, আবার কথাও শুনছিল মেজঠাকুমার। সম্ভবতঃ মনটা মেজঠাকুমার কথার দিকেই আকৃষ্ট ছিল বেশী। পাখীর ডাক এবং গান কানের পাশ দিয়ে বেজে চলেছিল বাতাসের প্রবাহের মত, বৃষ্টির শব্দের মত, দুরান্তের কোলাহলের মত। ধ্বনিতেই তার পরিবেশন শেষ—কোন ব্যঞ্জনার স্বাদ নেই, কোন অর্থবোধের ঔৎসুক্য নেই।

মায়ের ডাকে সুরেশ্বরের যেটুকু মন বাইরে ছড়িয়েছিল, যেটুকু কথার মধ্যে মগ্ন ছিল সব একত্রিত হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। সে সাড়া দিয়ে বললে—আমায় ডাকছ?

বলে সে এসে ঘরে ঢুকল।

—পাশের ঘরেই ছিলি বুঝি? বাইরে সব বসে রয়েছেন—

মেজগিন্নী বললেন—ভালই করেছে মা। ওর বাইরে গিয়ে গাঁয়ের লোকের কচ্‌কচি না শোনাই ভাল। এখানে খবর আসা অবধি এদের ছয় ভাইয়ের তো মুখের বিরাম নেই। নানান গল্পগুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে। বড় ছেলে তো সকাল থেকে মদ খেয়ে চাৎকার করছে। মেজকর্তার মন্দস্বভাবে সেটা ভাল লাগছে। তবে মধ্যে মধ্যে বলছেন, না—না। এ বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। যাক্, আজ উঠি—

—আপনি কিন্তু আসবেন খুড়ীমা। যে যা বলুক করুক আপনি যেন পরিত্যাগ করবেন না।

—আসব। আমার পথ কেউ আটকাতে পারবে না বউমা। তোমার শ্বশুর আমাকে ভয় করে। হাজার হলেও তৃতীয়পক্ষ তো।

বলে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—কিন্তু একটি শর্তে।

—বলুন।

—শর্ত হল, তুমি মা আমাকে আপনি আজ্ঞে করো না। আমি তোমাকে তুমি বলছি, তুমিও আমাকে তুমি বলবে।

—সেকথা কেমন ক'রে বলব খুড়ীমা—তাই কি পারি?

—মা, এখানে ছেলেরা মাকে তুই বলে। রাগলে বাপকেও বলে। সেকথা থাক্। তোমার সুরেশ্বর তোমাকে তো তুমি বলে। তুমিও আমাকে তুমি বলবে। কেমন লাগে মা। চাকর-বাকর ছাড়া কেউ তো আপনি বলে না। তাছাড়া বয়সে আমি তোমার থেকে ছোটই হব।

হেসে হেমলতা বললেন—বেশ, তাই বলব।

মেজগিন্নী বললেন—এস ভাই নাতি। চল, ঘুরে আসবে। দেখে আসবে ঠাকুরদাকে।

হেমলতা বললেন—ম্যানেজারবাবুকে বলে সঙ্গে লোক আর আলো নিয়ে যা।

নায়েব বা ম্যানেজার হরচন্দ্র একটু খুঁতখুঁত করলেন। কিন্তু যোগেশ্বরের এখানকার পুরানো কর্মচারী গোবিন্দ ঘোষ বললে—মেজমায়ের সঙ্গে যাচ্ছেন, কোন খুঁতখুঁত করবেন না। বলে তিনি ডেকে বলেন—ওরে ডিকু, তুই যা আলো নিয়ে।

একটি অদ্ভুত মূর্তি—অন্তত তাই মনে হল সুরেশ্বরের—আলো এবং লাঠি হাতে সেলাম করে দাঁড়াল। লোকটার গালপাট্টা আছে, পাকানো গোঁফ আছে, পরনে পাজামা আছে, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট আছে। বাঙালী তো নয়ই—হিন্দুস্তানী বলেও মনে হয় না, কিন্তু মুসলমানের সঙ্গেও মেলে না।

মেজঠাকুমা বললেন—ডিকু!

—হাঁ মাইজী!

—বহাল হলি বুঝি?

—হাঁ মা। হলদির কাছে আদমী গিয়েছিল তিন আদমীর জন্যে—বুড়ী আমাকে রোজাকে ভেজেছে, কাল আর কোইকে ভেজবে। আচ্ছা আদমী ছাড়া তো দিবে না! হামারা তো নোকরী ঢুঁড়ে ঘুরছি মা, মিলছে না। আর নতুন হুজুর আইলেন, নোকরী মিলল!

সুরেশ্বর বললে—কি নাম তোমার?

—গোবিন্দ ডিক্রুরুজ! হামি লোক গোয়ান আছি হুজুর! হারমাদ ছিলাম হামরা! হুজুরেরা হামাদের এনে এখানে জমিন দিয়ে ঘর দিয়ে বৈঠালেন।

মনে পড়ল সুরেশ্বরের। পূর্বপুরুষ বীরেশ্বর রায়ের আমলে এরা এখানে এসে বাস করেছিল।

বাস করিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে। গোয়ানীজ পোর্টুগীজদের বংশধর। মনে পড়ল মেজঠাকুমা যাকে বলছিলেন গোয়ানপাড়ার মেয়েদের কথা। কিন্তু সেকথা নিয়ে কৌতূহল জাগবার মত তার মনের অবস্থা ছিল না। সে একটু শঙ্কিত হয়েই চলেছিল বিচিত্র মেজঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে। তার বাবাকে সে দেখেছে রায়বংশের প্রাসাদের একটি শ্বেতশুভ্র গম্বুজের মত মহিমায়। তাতে আকাশ থেকে অন্ধকারের কালি ঝরে কালো হয়ে যেতেও দেখেছে। তার চূড়ার কলসে কলঙ্ক ধরতেও দেখেছে। এখন চলেছে দেখতে আরও পুরনো এক গম্বুজ বা মিনারকে—যেটা ভূমিকম্পে ফেটে গেছে; ফাটলে ফাটলে সরীসৃপের বাস; যেটার তলায় দাঁড়ালে যে-কোন মুহূর্তে খানিকটা ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা, যেটার রং বিবর্ণ হয়ে কদর্য—হয়তো বা ভয়ঙ্কর—হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে গেল।

মেজঠাকুরমা বললেন—দাঁড়ালে ভাই?

ঠিক পথের ধারেই একটা গাছে যেন মাথার উপরেই সেই অজানা সুরেলা শিস্ দেওয়া পাখীটার ডাক শোনা যাচ্ছে। অত্যন্ত কাছে ঠিক মাথার উপরে বলেই মনটা যেন ছেলে-মানুষের মত ওরই কাছে ছুটে চলে গেছে। সে বললে—ওই পাখীটা! অনেকক্ষণ থেকে ডাক শুনছিলাম নদীর ওপারের জঙ্গলে। এখানে বোধহয় এই গাছটাতেই ডাকছে।

পাখীটা আবার ডেকে উঠল। মেজগিন্নী হেসে উঠলেন—বললেন—ওটা তোমার মেজঠাকুর্দা পাখী ভাই।

—মানে?

—বুঝতে পারলে না? ওকে বলে 'বউ কথা কও' পাখী।

—মেজঠাকুমা পাখীগুলো তাহ'লে কি বলে মেজঠাকুমা?

—হরি হরি হরি! তাও জান না! তারা ডাকেই না। পাখীদের মেয়েগুলো ডাকে না গো! যদি ডাকে—তবে নাতি কথা কও বলে!

তারপরই বললেন—এসে পড়েছি আমরা। দেখো, একটু সহ্য করে যেয়ো ভাই। বয়স সোত্তোরের কাছে, কিন্তু অভাবে অভাবে, আর স্বভাবেও বটে, মেজাজ মন বাহাত্তুরের অধম হয়েছে!

এতক্ষণে বাঁদিকের গাছটা থেকে ডানদিকে চোখ ফেরালে সুরেশ্বর। জ্যোৎস্নার মিষ্টি সাদা আলোয় শেওলাপড়া কালচে রঙের প্রকাণ্ড একটা ফটক। দুপাশে দুটো যেন কি? জানোয়ারের মূর্তি। দুটো সিংহ। ফটক দুটো কাঠের—ভাঙা-ভগ্ন। ওপাশে একরাশ কালো জমাট পাথরের মত বাড়ীখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ঢুকে মেজঠাকুমা বললেন—এটা ঠাকুরবাড়ী। প্রণাম করে যাবে ভেতরে।

প্রকাণ্ড নাটমন্দির। মোটা গোল থামের উপর ছাদ—চারপাশে ঢালু চারখানা আলাদা

টিনের চাল। উত্তরদিকে কালীমন্দির। প্রশস্ত চৌকো ঘরই একখানি—সামনে ঠিক মাঝখানে আলসের উপর তিনকোণা বা ত্রিভুজের মত একটি অলঙ্করণ। তার দু'পাশে দুটি হাতীর মাথা, তারা শুঁড় তুলে রয়েছে। মাঝখানে একটি পদ্ম—তার মধ্যে লেখা ওঁ। বারান্দা ঘর সব মার্বেল দেওয়া।

বারান্দায় গিয়ে সুরেশ্বর উঠল মেজঠাকুমার পিছন পিছন। কেউ একজন আসনে বসে নাক টিপে করগণনা করে জপ করছিল। সামনে মদের বোতল, পাশে নারকেলমালার পাত্র, একখানা শালপাতায় কিছু মুড়ি এবং আরও কিছু ভাজাভুজি উপকরণ। পিছন দিক থেকে লোকটিকে দেখে শুধু এইটুকু বুঝলে সুরেশ্বর যে লোকটি প্রৌঢ় এবং দেহখানা যেন ভাঙাভগ্ন, তবে লোকটি দীর্ঘাকৃতি; মাথায় টাক পড়েছে।

ভিতরে শ্বেতপাথরের গড়া বড় একটি সিংহাসন, যার মাথাতেও ছত্রি, সামনে সরু গোল ছোট থাম বা ডাণ্ডা, তার মধ্যে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি। মূর্তির রং ঠিক ঝকঝক করছে না, খসখসে মনে হল; এবং বুঝতেও পারলে যে মার্জনা বিশেষ হয় না।

মেজগিন্নী নিজে প্রণাম করলেন। সুরেশ্বর দাঁড়িয়েই রইল। মেজগিন্নী উঠে বললেন—প্রণাম কর।

প্রণাম করতে ঠিক অন্তরের ইচ্ছে ছিল কি না-ছিল তা সুরেশ্বর নিজেই ঠিক জানত না। সে মেজঠাকুমার কথায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রণাম করল। বাপের শ্রাদ্ধের জন্য এখানে আসার পিছনে তাদের যে মন রয়েছে সেটাও তাকে বোধহয় নির্দেশ দিলে—প্রণাম কর। তবে যুক্তির দিক থেকে তার বর্তমান মনের যুক্তিতে এতে সায় থাকবার কথা নয়, কিন্তু সংস্কারের প্রভাব একেবারে মুছে যায়নি।

মেজঠাকুমা পূজককে বললেন—চরণোদক দাও ঠাকুর সুরেশ্বরবাবুকে। পূজকঠাকুর তামার চরণোদকের পাত্র নিয়ে বেরিয়ে এল। মেজঠাকুমা বললেন, হাত পাত' ভাই।

ঠিক এই সময়েই উপাসক ব্যক্তিটির ধ্যানভঙ্গ হল—কালী কালী জয় কালী। কালী কলুষ-নাশিনী, কালী আনন্দময়ী—বলতে বলতে ফিরে তাকালে পিছন দিকে। সুরেশ্বরকে দেখে গম্ভীর-কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কে?

মেজগিন্নী বললেন—এই সুরেশ্বর, যোগেশ্বর ভাশুরপোর ছেলে! সুরেশ্বর, ইনি তোমার বড়কাকা—তোমার মেজঠাকুর্দার ছেলে ধনেশ্বর।

—অ—! সুরে-শ্বর। সুরের ঈশ্বর! তা চেহারাখানা তো বেশ! উঁ!

সুরেশ্বর বিব্রতবোধ করলে। কি করবে—কি বলবে ভেবে পেল না। হঠাৎ জুগিয়ে গেল, সে বললে—অশৌচে তো প্রণাম করতে নেই বলছিলেন মেজঠাকুমা।

—না, তা নেই।

মেজঠাকুমা বললেন, বিবিমহলে মনমরা হয়ে বসে ছিল। ওর মা—বউমা বলছিলেন এই বয়সে পিতৃহীন হয়ে বড় ভেঙে পড়েছে বেচারা। অভিভাবক নেই সাহস দেবার, ভয় নেই বলবার কেউ নেই। তা আমি বললাম, সে কি? ওর মেজঠাকুরদা বেঁচে, ওর শূর-বীরের মত কাকারা, ধনেশ্বর, সুখেশ্বর রয়েছে, অভিভাবক নেই সে কি কথা! চল, এখুনি চল। দেখবে

কাকারা বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলবে—কি ভয়, কিসের ভয় !

সে প্রায় উদাত্তকণ্ঠ যাকে বলে—সেই উদাত্তকণ্ঠে ধনেশ্বর বলে উঠল—নি-শ্চ-য় ! বলে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত মেলে বললে—পুত্রের অধিক। যোগেশদার এক পুত্র সে আমার শতপুত্রের অধিক ! ওঃ !

প্রচুর মদ্যপানে তার পা ঠিক থাকছিল না—টলছিল। এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে দেশী মদের তীব্র গন্ধ নির্গত হচ্ছিল। টলতে টলতে এসে সুরেশ্বরকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধনেশ্বর কেঁদে ফেললে। ওঃ, কি মানুষই ছিল যোগেশদা ! ওঃ ! তুই তার ছেলে !

সুরেশ্বরের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ক'রে উঠল। তার মনে হল যেন পৃথিবীর কুৎসিততম দুর্গন্ধ-যুক্ত একটা জন্তুতে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। কি করবে সে তা ভেবে পেলে না ! বহুকষ্টে আত্ম-সম্বরণ করেও একটা হাত দিয়ে ধনেশ্বরের বাহু বেষ্টনীতে একটু ঠেলা দিয়ে বললে—ছাড়ুন ! আমাকে ছাড়ুন !

মেজগিন্নী বুঝেছিলেন, তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও বাবা ধনেশ্বর। তাছাড়া তুমি করলে কি ? সন্ধ্যা শেষ না করেই আসন ছেড়ে উঠলে ?

সুরেশ্বরকে ছেড়ে দিল ধনেশ্বর। তারপর বললে—তাই তো, অন্যায় হয়ে গেল ! ফের গোড়া থেকে করতে হবে। তা তুমি ভেবো না বাবা ! কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক করে দেব আমি। বিলকুল ঠিক করে দেব। সিধে ঠিক করে দেব !

বলেই আসনে বসে পড়ে গাঢ় প্রমত্ত-কণ্ঠে বলে উঠল—কালী কালী বল মন। কালী কালী কালী। কালী কল্যাণী। কালী করুণাময়ী।

মেজগিন্নী সুরেশ্বরকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে একটি দরজায় ঢুকে পড়লেন। বললেন—এ চত্বরটি রাজরাজেশ্বরের আর রাধাশ্যামের চত্বর। চত্বরটি স্বতন্ত্র ; পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বলতে গেলে শাক্ত এবং বৈষ্ণবতন্ত্রের ক্ষেত্র দুটিকে তফাৎ ক'রে আলাদা ক'রে দেওয়া হয়েছে। শক্তি-মন্দিরের মদ্য এবং মাংসের গন্ধ যেন ওদিকে না যায়।

ওদিকে কালীমন্দিরের বারান্দায় বসে উচ্চ জড়িতকণ্ঠে ধনেশ্বর চীৎকার করছিল—কলকাতার বাবু, যোগেশ্বর ব্যাটা, ক্রীশ্চান-সাহেবের গোলাম—এঁটো-চাটার পুত্র। দেশী কুত্তার গায়ে খুসবু সাবান মাখায় সাহেবরা। তাই সাহেবের দেশী-কুকুর গাঁয়ের বাঘা কুকুরকে ঘেন্না করে ! বাঘা কুকুর শ্মশানে ফেরে মশানে ফেরে। তার জাত আছে। জয়কালী জয়কালী। কেরেস্তান-দেবোত্তরের দায়ে শ্রাদ্ধ করতে এসেছে। আমি দেখছি—

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সুরেশ্বর।

তখনও বলে চলেছে ধনেশ্বর—হারামজাদা—শূয়ার কি বাচ্চা—তোর বাপ মদ খেত না ? কেরেস্তান—! এ-ই ঠাকুর মন্দিরের বারান্দা গঙ্গাপানিসে নাথাল দেও। কেরেস্তান উঠেছিল। করাচ্ছি, তোমাকে শ্রাদ্ধ করাচ্ছি।

মেজগিন্নী এসে সুরেশ্বরের হাত ধরলেন—এস, ওসব শোনে না। ঠাকুরকে প্রণাম কর। করে চল মেজঠাকুরদাকে বলে চলে যাবে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুরেশ্বর।

—নাতি!

—আমি ফিরে যাই ঠাকুমা!

—না। যেতে নেই। দেখ ভাই, তর্পণ যখন করবে তখন দেখবে—অবন্ধু,—শত্রু, বন্ধু, অন্যজন্মের বন্ধু সকলকে জল দিতে হয়। যাদের সন্তান নেই, যারা অপঘাতে মরেছে, তাদের জল দিতে হয়। শ্রাদ্ধে তাদেরও পিণ্ড দিতে হয়। এখন তোমার রাগ করতে নেই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—আপনি সংস্কৃত পড়েছেন ঠাকুমা?

—না ভাই। কে শেখাবে? বাবা পূজারী বামুন ছিলেন, বলতেন, শুনে শিখেছি। তোমার ঠাকুরদা তর্পণ করেন, শুনেছি। বুঝি। হাজার হলেও বামুনের মেয়ে বামুনের বউ তো!

—চলুন। ঠাকুরদাকে দেখে আসি চলুন।

* * *

রায়বংশের পুরুষেরাই দীর্ঘকায়। মেজঠাকুরদার মধ্যে একটু পার্থক্য সে দেখলে। মেজ ঠাকুরদা ঈষৎ স্থূলকায়, বেশ একটি ভুঁড়ি আছে।

দোতলার বারান্দায় আসর পেতে বসে ছিলেন শিবেশ্বর। একদল তিলকধারী খোল নিয়ে বসে ছিল। আরও দুজন বৈষ্ণবও ছিল। শিবেশ্বর সবে গাঁজার কল্কেটি হাতে ধরেছেন। মেজ-গিন্নী সুরেশ্বরকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঠিক বারান্দার প্রান্তদেশে দাঁড়ালেন। এবং একটু থমকে গেলেন। গাঁজা শিবেশ্বর খান এ কথা তিনি হেমলতাকে বলেছেন, না-বলবার কারণও ছিল না, কারণ শিবেশ্বর অতি প্রকাশ্যভাবেই গাঁজা খেয়ে থাকেন। এবং সুরেশ্বর বিবি-মহলে পাশের ঘরে থেকে এ সব শুনেছে তাও তিনি জানেন, তবুও যেন একটু লজ্জিত হলেন।

শিবেশ্বর গ্রাহ্য করলেন না। গাঁজার কল্কে মুখের কাছে ধরে টানতে লাগলেন। মেজগিন্নী বললেন—সুরেশ্বর এসেছে।

গাঁজার ধোঁয়া ছেড়ে একটু দাবা গলায় শিবেশ্বর প্রশ্ন করলেন—কে এসেছে?

—সুরেশ্বর। তোমার কাছে এসেছে, তোমাকে দেখবে—দেখা করবে!

যোগেশ্বরের ছেলে?

—হ্যাঁ।

—এস। এস। ভাই এস।

সুরেশ্বর এগিয়ে গেল। শিবেশ্বর কল্কেটা খোল-বাজিয়ের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুরেশ্বর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালে। আলো উজ্জ্বল নয়—হ্যারিকেন জ্বলছে। তবু তার মনে হল, ঠিক সাধারণ নেশাখোর মানুষ তো নন। মুখে এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে।

সে বললে—মেজঠাকুমা বলেছিলেন, অশৌচের মধ্যে প্রণাম করতে নেই।

—না। নেই। কিন্তু প্রণামেরই বা দরকার কি ভাই? যারা বুকে চড়ে মলমূত্র ত্যাগ করলে চন্দন লেপনের আনন্দ পায় মানুষ, তাদের কাছে প্রণাম কি প্রয়োজন? বস।

অভিভূত হয়ে গেল সুরেশ্বর। নূতন কালের মানুষ সে। সবুজপত্রের যুগ সন্ত শেষ হয়েছে বা সবুজপত্র সন্ত উঠে গেছে; পেঁচিয়ে কথা বলে বক্তব্যটিকে বক্র ও তীক্ষ্ণ করে বলার রেওয়াজ উঠেছে; ভারের চেয়ে ধারের দাম বেশী হয়েছে; তাতে উল্লাস এবং কৌতুক দুইই আছে। এ কথা সে জাতের নয়—সে মেজাজের নয়; এ কথা সোজা কথা এবং হয়তো কিছুটা ভাবালুতা আছে, তবু সে অনুভব করলে, তার মন আনন্দে এবং আবেগে যেন ভরপুর হয়ে গেল।

শিবেশ্বর তাকে ধনেশ্বরের মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন না, হাতে ধরে বললেন, বস। তোমার কম্বলের আসন কই? আনো নি? মেজবউ, আসন দাও। গালিচার আসন পেতে দাও!

তারপর হঠাৎ আলোটা তুলে নিয়ে তার মুখের সামনে ধরে তাকে দেখলেন। আবার আলোটা নামিয়ে চশমা বের করে চোখে দিয়ে দেখে বললেন—তাই তো ভাই। তুমি তো দেখি অপরূপ হে! রায়বংশে শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন তোমার পিতামহ। আমার জ্যেষ্ঠ দেবেশ্বর রায়। তাঁর অয়েলপেন্টিং নিশ্চয় দেখেছ। সে অবশ্য পরিণত বয়সের। প্রথম যৌবনের সে ছবি আমার মনে ভাসছে। তুমি হয়তো তাঁর থেকেও সুপুরুষ। প্রেমে পড়বার মত রূপ হে! আমি যে চিন্তিত হলাম ভাই! তুমি যে সাক্ষাৎ মদন হে!

লজ্জা পেয়েছিল সুরেশ্বর; সে লজ্জাকে জয় করে সে একটু পুলকিত কৌতুকেই বললে—কেন? এ যুগে আর তো শিবের তপোভঙ্গ করতে হবে না! চিন্তা করছেন কেন?

—ভাই! গম্ভীরভাবে বললেন শিবেশ্বর, ভাই, আমার যে তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী এবং সুন্দরী গৃহিণী! বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

—না ঠাকুরদা, আপনার গৃহিণী রতি নন—উনি সতী—না, সতী বলব না,—উনি গৌরী, উমা।

—বহুৎ আচ্ছা! সাধু-সাধু-সাধু! দীর্ঘায়ু হও। তার তুল্য খ্যাতিমান হও! চমৎকার বলেছ হে! ঠাকুরদাকে ঠকিয়ে দিয়েছ। এবং—। একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন—লজ্জিতও করেছ আমাকে। তুমি আমার সঙ্গে নিজে থেকে দেখা করতে এসেছ। যাওয়া তো আমারই উচিত ছিল। তুমি পিতৃহীন হয়েছ; আমি পিতামহ; তুমি পৌত্র—ভ্রাতুষ্পৌত্র, আমারই তো গিয়ে বলা উচিত ছিল—এস ভাই, কোন ভয় নেই তোমার, আমি যতক্ষণ আছি। তা আমি করিনি!

—কর নি, এবার কর! মেজগিন্নী সুযোগ পেয়ে মাঝখানে ঢুকে দিলেন।

—হুঁ। শুধু একটি হুঁ বলে শিবেশ্বর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

সংসারে বোধহয় অবস্থার আনুকূল্যে প্রসন্নতায় মানুষ মুখর হয়ে ওঠে—আবার প্রতিকূলতায় ক্ষোভে বিষণ্ণতায় কথা হারিয়ে ফেলে—বা কোনক্রমে দমন করে রাখে নিজেকে। সুরেশ্বরের মনে এবং মুখে কথা আপনি এসে গেল, সে বললে—আমাদের উপর কি রাগ করে আছেন আপনি?

—না। রাগ তো নয় ভাই। রাগ নয়। দেখ, আমি ধর্মে একটু গোঁড়া। সেই

কারণে সেই প্রথম যৌবন থেকে তোমার ঠাকুরদা'র মত কলকাতায় যাই নি, রামেশ্বরের মত বিলেত যাই নি। তিনবার বিবাহ করেছি—তবু পরদার করি নি। আজ বলতে গেলে নিঃস্ব হয়েছি। সেই ধর্ম। মানে তোমার বাবা—। থাক সে সব কথা। আমি ভাবছি। এখনও ভাবছি। ভাবছি বলেই এখনও দূরে দূরেই রয়েছি। তা ছাড়া আমিও তো বলতে গেলে ঠিক স্বাধীন নই। আমার ছেলেরা অপোগণ্ড, মূর্খ, মাতাল—তা ছাড়া অন্য দোষও তাদের আছে। তারা অমত করছে। তারা বিষয়ের জন্যে করছে। সে বলতে হবে। তবে কি জানো, আমার বিচারে তো তোমার বাপের সঙ্গে এদের তফাৎ খুব নেই। দুইই পচেছে। তাই হয়, বড় বড় বংশে তাই ঘটে। তোমার বাপ ইংরিজী মতে পচেছে, এরা দেশী মতে পচেছে। দেখ, আমার কাছে তোমার বাপের পচাটাই বেশী পচা। কারণ ইংরেজী মতে পচা মানেই জাত দিয়ে পচা। আমার ছেলেরা জাতটা রেখেছে। আমি ভাবছি!

সুরেশ্বর বললে—ভেবে দেখুন তা হলে। আমি আজ যাই!

—এস। কাল আমি যাব। বউমার সঙ্গে দেখা করে আসব। ওঁকে সেই বিয়ের সময় আর বিয়ের পরই সাতদিনের জন্য এখানে এসেছিলেন, তখন দেখেছি, আর দেখি নি। দেখে আসব। ইতিমধ্যে ভেবে দেখি। ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শও করি।

পরদিন সকালে শিবেশ্বর সঙ্গে সেজছেলে সুখেশ্বরকে নিয়ে নিজে এলেন। সুখেশ্বরের বয়স বছর চল্লিশেক। মেজ জগদীশ্বরের থেকে বেশ কয়েক বছরের ছোট। সুখেশ্বর বেশ ভদ্র। ম্যাট্রিক পাস। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। কিছু ঠিকাদারি ব্যবসাও আছে। লোকে বলে—ইউনিয়ন বোর্ডের ইন্দারা, রাস্তার সাঁকো এ-সব বেনামীতে সুখেশ্বরই করে থাকে। ইউনিয়ন কোর্টেরও হাকিম। তাতেও নাকি কিছু কিছু আয় হয়। চেহারায় রায়বংশের ছাপ আছে, তবে রঙটা কালো।

শিবেশ্বর হেমলতাকে ডেকে অনেক সান্ত্বনা, অনেক উপদেশ দিলেন। পরিশেষে বললেন—কাল আমি সুরেশ্বরকে সব বলেছি মা। দেখ মা, আমার কাছে ধর্ম সবার উপরে। বুঝেছ! তা আমি আমার গুরুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, এ অনুমতির কাজ নয়। বিচারের কাজ। যা তোমার বিচারে হবে তাই কর। সে বিচার আমি করছি। হ্যাঁ, করছি। মনে হয় দুপুর নাগাদ একটা সিদ্ধান্ত করতে পারব।

হেমলতা চুপ করে রইলেন।

শিবেশ্বর বললেন—হরচন্দ্র কাল সকালে গিয়েছিল, বলছিল, তোমাদের ইচ্ছে ছিল বসত-বাড়ীতে উঠবে। ইচ্ছেটা স্বাভাবিক বটে। বসত-বাড়ী—পৈতৃক ভদ্রাসন। আর ওগুলি দেবত্রও নয়—সবই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মেরামতও করাও—

হেমলতা বললেন—না-না-না। এই তো আমরা এখানে বেশ রয়েছি।

—হ্যাঁ। এ বাড়ী ওখান থেকে অনেক আরামের। তবে ভদ্রাসন। তা—যদি প্রয়োজন হয় তা হলে আমি আজই খালি করে দেব। আমার বাড়ীটা জীর্ণ হয়েছে। তা হোক, পরিষ্কার এ বেলাতেই হয়ে যাবে। বিকেল চারটে নাগাদ খালি হয়ে যাবে! যদি চাও!

সুখেশ্বর এতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় চুপ করেই বসে ছিল, সে এবার বললে—এ সময় কথাটা বলা হয়তো অন্যায় হচ্ছে আমার। একটা ব্যাপার হয়ে আছে—সেটা আমি বলে রাখতে চাই বউদি!

—কি বলুন?

—আমাকে বলুন বলছেন কেন? আমি যোগেশদার চেয়ে দশ বছরের ছোট। হেসে মাথার ঘোমটাটা টেনে দিলেন হেমলতা।

সুখেশ্বর বললে—যোগেশদা তখন কলকাতায় ছিলেন, সে সময় আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম দেবোত্তরের একশো বিঘে ধানজমির একটা প্লট, আমরা আট ভাই বাবার অংশ রায়তী স্বত্বে বন্দোবস্ত নিয়েছিলাম। যোগেশদাকে বলেছিলাম, দাদা, তোমার তো অনেক আছে, কোন অভাব নেই, এটা বাবা যখন আমাদের খাজনা করে দিলেন তখন তুমিও আমাদের দাও। তা উনি বলেছিলেন—দিলাম! আমি ভুল করে দলিলটা নিয়ে যাই নি—তাই সই হয়নি। এই তারপরই উনি নেটিভ স্টেটে চলে গেলেন। উনি যখন বিলেত চলে গেলেন, তখন হরচন্দ্র সেটা অস্বীকার করলেন, বললেন—তা কি করে হবে? কই, আমরা তো কিছু জানি না! সেই তখন থেকে একটা গাঁট লেগে রয়েছে। সেটা, এদিকটা যখন মিটেই যাবে, তখন মিটে গেলে ভাল হয় না?

শিবেশ্বর বললেন—এ কি সুখেশ্বর! এ সময়ে ওকথা কেন?—এ কি?

হরচন্দ্র নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এবার হেমলতা কিছু বলবার আগেই বললে—না-না কত্তা। উনি ঠিক বলেছেন। সব গাঁট খুলে যাওয়াই ভাল।

তা—নিশ্চয়। স্বর্গীয় বাবু যখন বলে গেছেন, তখন দলিল আনবেন, সই করে দেবো।

৮

এরপরই মিটে গিয়েছিল সব। তবে শ্রাদ্ধে আসে নি বা অশৌচান্তে কামায় নি কেবল ধনেশ্বর।

সে বলেছিল—না।

সে না-কে হাঁ করানো যায় নি। তবে কোন গণ্ডগোলও করে নি। শিবেশ্বর তাকে কঠিন শাসন করেছিলেন। আর একজন কামায়নি—কামায়নি নয়—তাকে পাওয়া যায় নি সে সময়। সে ধনেশ্বরের তৃতীয় ছেলে গোপেশ্বর। সে নাকি একটু অসুস্থমস্তিষ্ক। দৈত্যের মত চেহারা। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে মনে হয় আঠারো বছরের জোয়ান। আপন খেয়ালে চলে। মধ্যে মধ্যে চলে যায়, দুদিন-তিনদিন পর ফেরে।

কীর্তিহাটে এক মাসের উপর থেকে প্রথম মাসিক শ্রাদ্ধ সেরে কলকাতায় ফিরেছিল এবং ষষ্ঠ মাসে গিয়ে সপিণ্ডীকরণ শেষ করে সমারোহ করে শ্রাদ্ধ করে এসেছিল। তার সঙ্গে সে বিচিত্র মন নিয়ে এসেছিল।

গ্রামের মানুষদের দেখে দুঃখ হয়েছিল, ঘৃণাও হয়েছিল।

এদের দুঃখ দারিদ্র্য যত, নীচতা হীনতাও তত। অথবা তার থেকেও বেশী। একবিন্দু প্রেম বা এতটুকু শ্রদ্ধা বা ভালবাসার মত এক কণা পরিমিত সম্বলও সে পায় নি। কি লোভ! কি গোগ্রাসে আহার! সব থেকে বেশী খেয়েছিল রায়বংশের ছেলে ওই গোপেশ্বর। এবার সুরেশ্বর তাকে দেখেছিল। কথায় জড়তা। প্রকাণ্ড দেহ, ফর্সা রং। কটা চুল। কটা চোখ। অসুস্থ দৃষ্টি। ছেলেটি খেতে বসে দানবের মত খেয়েছিল। তারপর আর গোপেশ্বরকে দেখেনি। শুনেছিল তার মাথা গরম হয়েছে বলে তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। গভীর রাত্রে সে বীভৎস চীৎকার করত। সে চীৎকার সে শুনেছিল।

এখানকার ব্রাহ্মণেরাও চুরি করে; তার পিতৃশ্রাদ্ধে তারা লুচি মিষ্টি চুরি করলে; সে দেখলে। এবং পরস্পরের মধ্যে কুৎসিত কলহ করলে। সব থেকে খারাপ লাগল তার মেজ-ঠাকুমা পর্যন্ত বালতিতে ভরে মিষ্টি নিয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে চোখে পড়ল তারই। মেজ-ঠাকুমা অপ্রতিভ হলেন না, হেসে বললেন, নিয়ে যাচ্ছি ভাই। কলকাতার কাঁচা সন্দেশ তোমার ঠাকুরদা খেতে ভালবাসেন। চোখে পড়ল কাঙ্গালী বিদায়ে ব্রাত্য দরিদ্রেরা এল দলে দলে, এখানকার রায়বাড়ির ছেলেরা থেকে অন্য ভদ্রবাড়ীর ছেলেরা এমন কি ওদেরই স্তরের যারা পাইক পেয়াদার কাজ করে তারা তাদের যুবতী মেয়েগুলোকে নিয়ে সামান্য স্বাদু খাদ্য-মূল্যে ছিনিমিনি খেললে। নদীর ওপারে গোয়ানপাড়া—ওই ডিকুরুজদের বাড়ী—তারা লুঙ্গি পরে, পাজামা পরে, মেয়েরা সেমিজের মত ঢিলে জামা পরে বেড়ায়—তারা কাঙ্গালী খেতে আসেনি। কিন্তু এই দাঁড়িয়ে দেখলে আর ফিক-ফিক করে হাসলে। মেয়েগুলোকে দেখেই যেন মনে হয়-এরা স্বৈরিণী। এখানকার মুসলমানরাও আসেনি। এদের দুই সম্প্রদায়কে সিধে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তার মা।

এখানকার ইস্কুলের হেডমাস্টার এসে তার কাছে হেঁট হয়ে নমস্কার করে ভিক্ষুকের মত কথা বললেন। তার কারণ ইস্কুলে পাঁচ হাজার টাকা দান করা হয়েছিল। তিনি হাতজোড় করে বললেন তার মাকে, স্কুলের ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে যে প্রথম হবে তাকে এক বৎসরের জন্য মাসিক একটা বৃত্তি বাবার নামে দেবার জন্য।

চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার এলেন ডাক্তারখানা মেরামতের জন্য ভিক্ষা করতে। তিনি আক্ষেপ ক'রে বললেন—এই ডাক্তারখানার যে সব যন্ত্রপাতি ছিল সে সব দেখে মিস্টার গাম্বোর্ণ বলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উনিশশো আট সালে লিখেছিলেন এসব ইকুইপমেণ্ট সাবডিভি-শনাল হাসপাতালেও নেই। তার আর কিছু নেই। ডাক্তার এখানে থাকে না। কারণ বিনা ফিয়ে গোটা মেজ তরফকে দেখতে হয়। ডাক্তারখানা থেকে তাদের ওষুধ আগে আসে। ভাল ওষুধ অন্য পেশেণ্টদের দিতে নিষেধ আছে সুখেশ্বরবাবুর।

সুরেশ্বর ছিল নীরব শ্রোতা। তার অন্তরলোকে এসবের প্রতিটি বিচিত্র সংবাদ জলন্ত অঙ্গার-স্তূপে দাহ্যবস্তুর মত নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

ফলে সে ফিরে এল জলতে জলতে।

শুধু রায় বংশ নয়, গোটা গ্রাম—হয়তো গোটা দেশের উপর অবজ্ঞা এবং ঘৃণা নিয়ে।

কলকাতায় তখন সে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে। ম্যাট্রিক পাস

সে সেবার করেছিল। কীর্তিহাট থেকে ফিরে সে আর কলেজে যায়নি—গিয়ে উঠেছিল প্রভি-ন্সিয়াল কংগ্রেস আপিসে। এ রাজত্ব এ দেশ এ সমাজে বিপ্লবের আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিতে হবে। তখন ১৯৩০ সাল এসে পড়েছে।

মা বাধা দিয়েছিলেন। সে শোনে নি। একদিন মাকে না বলেই চলে গিয়েছিল মেদিনীপুর লবণ সত্যাগ্রহে। সেখান থেকে খবর এসেছিল—তার এক বছর জেল হয়েছে। কিন্তু এখানেও সে শান্তি বা স্বস্তি পায় নি। তখন জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের ভিতর জটিল দলাদলির ফলে কুৎসিত ষড়যন্ত্র চলছে। তাছাড়া সাধারণ সত্যাগ্রহীদের সে যেন এক অসহনশীল উন্মত্ততা চলছে। এ দল ও-দলের লোককে বলে স্পাই। ও-দল বলে এ-দলের লোককে।

রাত্রে সারারাত্রি জলের ড্রাম আর থালাবাটি পিটে ব্যাণ্ড বাজায়, বিশ-পঁচিশ্ জনে মিলে চীৎকার ক'রে বেসুরে অসুরের মত গান করার নামে তাণ্ডব করে। তার বিছানার পাশের দেওয়ালটায় চারজন নস্য নিয়ে নাক ঝেড়ে ময়লা করে। সে প্রতিবাদ করায় তার নামে রটে গেল—সে স্পাই। তার সহ্য হল না। সে সেইদিনই জেলারের কাছে এসে জানালে যে সে সুপা-রের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সুপারের সঙ্গে দেখা হল এবং সে তাঁকে বললে—যে সে সত্যাগ্রহ করে এখন অনুতপ্ত। সে আর করবে না এই বণ্ড দিয়ে মুক্তি পেতে চায়। তখন তার এক বছর মেয়াদের মধ্যে ন-মাস গেছে। জেল নিয়মে রেমিশন পেয়ে মেয়াদ প্রায় এক মাস কম হয়ে যাবে। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিস্মিত হলেন। বললেন—ভাল ক'রে ভেবে দেখেছেন ?

—দেখেছি।

—আরও দুদিন ভাবুন।

—না। তারপর বলেছিল—আর না হয় দয়া করে আমাকে সেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দিন, না-হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—বেশ, লিখুন।

দরখাস্ত লিখে সে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে দিয়ে চলে আসছিল। সুপার ডেকে বলে-ছিলেন—শুনুন।

—কি বলুন ?

—আপনি বসুন। এখন থেকেই আপনি সেলে থাকবেন। আমি অর্ডার করে দিচ্ছি।

সে যেন বেঁচে গিয়েছিল।

তাইই ছিল। এবং বাকী মেয়াদের কালটা সেলের একটা দেওয়াল কয়লা দিয়ে ছবি এঁকে ভরিয়ে দিয়েছিল। এবং মাস দেড়েক পর খালাস পেয়ে জেল-গেট থেকে বেরিয়ে এসে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। কিন্তু এর জন্যে তার স্পাই অপবাদ এমন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যে সেটা জেলের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল না, বাইরেও ছড়িয়েছিল।

ছিল মফস্বলে—মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় বাড়ী পৌঁছে দেখেছিল, মা বিছানায় শুয়েছেন। তাঁর অসুখ হয়েছে মাসখানেক। নায়েব ম্যানেজার খবর দিতে চেয়েছিল, কিন্তু হেমলতা খবর দিতে দেন নি। ডাক্তার বলেছেন—হার্ট উইক হয়েছে।

তার জেলে যাওয়ার অনুশোচনা যেন বেড়ে গিয়েছিল। সেইদিনই সে স্টেটসম্যান আপিসে গিয়ে পিতৃপরিচয় দিয়ে এডিটার ওয়াটসাহেবের সঙ্গে দেখা করে একখানি চিঠি দিয়েছিল ছাপতে। নাম দিয়েছিল—বিদায় সত্যাগ্রহ! তাতে সে লিখেছিল—সে অনুতপ্ত। চিঠিখানা সারা দেশে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

তার মা দুঃখ পেয়েছিলেন সে জেলে যাওয়ায়, কিন্তু এই পত্রের জন্য তার চেয়েও বেশী দুঃখ পেলেন। বললেন—তুই এ কি লিখলি? তোর লজ্জা হল না?

সে বললে—না।

শঙ্কিত হলেন হেমলতা। মনে হল যেন ওর পিছন থেকে যোগেশ্বর ওকে প্রম্পট করেছেন।

সে বললে, পরাধীনতা আমার নিজের পক্ষে অসহ্য বলেই দেশকে স্বাধীন করতে চাই। আমার যে মাথা অন্যের কাছে নিচু হয়ে আছে—সে মাথাকে তাদের সঙ্গে সমান উঁচু করবার জন্যেই আমি লড়াই করি। কিন্তু সেই লড়াই ক'রে যদি আমার থেকে নিচু যারা তাদের কাছে মাথা নিচু করতে হয় তা হ'লে সে লড়াই যে আমার মাথায় পাথর মারার সমান হয় মা। দেশের জন্যে আত্মবলিদান আত্মার মুক্তির জন্য, তার অপমান অসম্মানের জন্য নয়। আমার নামে অপবাদ রটনা করেছিল—আমি স্পাই। আমার সহ্য হ'ল না।

মা কিছু আর বলেন নি। পাশ ফিরে শুয়েছিলেন।

সুরেশ্বর কিছুদিন ছবি আঁকা নিয়ে পড়েছিল। নন্দলালের রেখা—যামিনী রায়ের পটপদ্ধতি সব ছেড়ে সে নিজের খুশিমত ছবি আঁকতে লাগল। তার সঙ্গে এস্রাজ বেহালা। যেগুলো তার বাবা কিনেছিলেন। সেগুলো নিয়ে নিজেই বাজাতে আরম্ভ করলে। এ না-করে তার উপায় ছিল না। সে তখন চিহ্নিত হয়ে গেছে ইংরেজের কাগজের অনুগত সাংবাদিক যোগেশ্বর রায়ের পুত্র হিসেবে। লোকে বলছে—জে রায়ের ছেলে তো সে, ঘরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে ছবি আঁকতে আঁকতেও সে বুঝতে পারলে, সে শুধু সাধারণের কাছেই নয়, নিজের কাছেও অপরাধী হয়ে গেছে। এমনটা হবে সে ঠিক বুঝতে পারে নি। অর্থাৎ জেলে সেলে থাকা এবং বেরিয়ে এসে এই পত্র ছাপার ফল এমন হবে। বার বার সে চেষ্টা করলে শক্ত হবার, মনকে কঠিন করে মাথা উঁচু করে বাইরে বের হবার, কিন্তু সে তা পারলে না।

তখন বাংলাদেশে যেন একটা আগুন নিয়ে খেলার যুগ এসেছে। একটার পর একটা বিস্ফোরণ হচ্ছে। চট্টগ্রামে যে খেলার শুরু হয়েছিল তা যেন শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। দেশব্যাপী হয়ে জ্বলে উঠবার মত উত্তাপকে নেভাতে ইংরেজের সমস্ত শক্তি যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পারবে না।

সে ঘরে ব'সে গ্রামোফোন রেকর্ড চাপিয়ে এস্রাজে ছড়ি টেনে সুরে সুর মেলাচ্ছিল। সন্ধে হয়ে আসছে। হঠাৎ কাগজের স্পেশাল নিয়ে হকার চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। —লাটসাহেবকে গুলি। লাটসাহেবকে গুলি। মেয়েছেলে গুলি করলে—

সে স্পেশালের হাঁক শুনে বারান্দায় বেরিয়েছিল। খবরটা শুনে চমকে উঠল। বুকখানা যেন ধড়াস করে লাফিয়ে উঠে থেমে যেতে চাইল। কিন্তু থামল না—মাথা কুটে চলল।

উনিশশো বত্রিশ সাল—৬ই ফেব্রুয়ারী। সেনেট হলে কনভোকেশনের আসরে—বীণা

দাস গভর্নর জ্যাকসনকে রিভলভার দিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। গভর্নর মাথা সরিয়ে নিয়ে বেঁচেছেন। কর্নেল সুরাবর্দী বীণা দাসকে গলা টিপে ধ'রে অ্যারেস্ট করেছেন।

এরপর একের পর এক।

স্টেটসম্যানের সম্পাদক ওয়াটসনের উপর দুবার আক্রমণ হল। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার পাহাড়তলীর ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে মরণ-খেলা খেলে নিজে পটাসিয়াম সাইনাইড খেলেন। ডালহৌসি স্কোয়ার বম কেস হল। টেগার্ট বাঁচল। কিন্তু এদেশে থাকতে সাহস তার আর হল না। সে চলে গেল, পালাল। ওয়াটসন সাহেবও পালাল। ১৯৩৩ সালে ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের প্রাণপুরুষ সূর্য সেনের ফাঁসি হয়ে গেল।

সুরেশ্বর নিঃসঙ্গ হয়ে দীর্ঘদিন ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ছবিও আঁকলে না। শুধু বাজনাটাই বাজাত। আর ভাবত—সে অপরাধ করেছে? ভুল করেছে?

একে অস্বীকার করে মাথা সে তুলতে পারত না।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

তাতেই যেন জীবনের সব লজ্জা ভাসিয়ে দিয়ে নির্লজ্জের মত মুখ তুলে বক্রহাস্য করলে। না। নির্লজ্জের মত ঠিক নয়। কঠিন ক্রোধে সে ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্তকে উপেক্ষা ক'রে দিলে একমুহূর্তে। অহিংস আন্দোলন সত্যাগ্রহের নামে অট্টহাস্য করতে ইচ্ছে হল তার। আর এই সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মদান—? এ মহৎ না ব'লে উপায় নেই তার। কিন্তু এর ফলে যারা একদিন এদেশে আধিপত্য বিস্তার করবে—তারা? তারাও কি আজকের এদের মতন থাকবে? সে তাকালে তার পূর্বপুরুষ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ছবির দিকে। তারপর তাকালে আয়নার দিকে। যেখানে তার নিজের ছবি ফুটে উঠেছিল। এই হয়। হাসলে সে আবার। মনে যেন জোর পেয়েছে।

হঠাৎ একদিন কীর্তিহাট থেকে সংবাদ এল—একদিনে কীর্তিহাটের মেজতরফে বিপর্যয় ঘটে গেছে। শিবেশ্বর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। তার আগে তাঁর সেজছেলে সুখেশ্বর খুন হয়েছে। খুন করেছে ধনেশ্বরের তৃতীয় ছেলে গোপেশ্বর।

মনে পড়ল গোপেশ্বরকে। গভীর রাত্রে কিন্তু তার চিৎকার শুনেছিল সুরেশ্বর, ক্রুদ্ধ জন্তুর মত চিৎকার। তাকে বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল তার অভিভাবকেরা। সেই গোপেশ্বর খুন করেছে সুখেশ্বরকে।

হেমলতা ম্যানেজার হরচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। সুরেশ্বরকে যেতে বলেছিলেন, সে বলেছিল —না। হরচন্দ্র ফিরে এসে যে বিবরণ দিয়েছিলেন তাতে হেমলতা শিউরে উঠেছিলেন। সুরেশ্বর প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর তার মুখে ফুটে উঠেছিল একটি বাঁকা রেখায় অতি তিক্ত হাসি। সে হাসি তিক্ততার, সে হাসি ঘৃণার।

বিবরণ শুনে যে কোন লোকের মুখেই এই হাসি ফুটবে সন্দেহ এতে নেই। ওই গোপেশ্বর ছেলেটি তার বাল্যকাল থেকেই দানবের মত অতিকায়। তার চরিত্রের দানবিক প্রকৃতির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল আহারে। পরিমাণে তো প্রচুর খেতোই তার উপর ছিল তার কেড়ে খাওয়া স্বভাব। চুরি করে খাওয়া স্বভাব। ক্ষুধায় সে জন্তুর মত ক্রুদ্ধ চিৎকার করত।

অন্যের পাত্র থেকে কেড়ে খেয়ে নিতো। রায়বাড়ীর দেবতার ভোগের উপরেও মধ্যে মধ্যে ডাকাতের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ত।

বাপ ধনেশ্বর কালীসাধক—তার বিশ্বাস ছিল ছেলে সিদ্ধপুরুষ হবে। সিদ্ধপুরুষ সাধকদের বাল্য আচরণ শোনা যায়—তার সঙ্গে নাকি মিল দেখতে পেতো। ক্রমে কৈশোরে আর এক চেহারা দেখা দিল। সে বলির পাঁঠার সদ্যছিন্ন কণ্ঠ থেকে ফিনকি দিয়ে ঝরা রক্ত অঞ্জলি ভরে নিয়ে চুমুক দিত। রায়বাড়ীর আলসের ফাঁকে ফাঁকে বাস ছিল পাঁচ সাতশো পায়রার। এই পায়রা ধরে সে পুড়িয়ে মহানন্দে বিনা লবণেই খেতো। মধ্যে মধ্যে চলে যেতো চাষীদের তরমুজ ফুটির ক্ষেতে। সেখানে তাই গোগ্রাসে খেয়ে গাছতলাতেই পড়ে থাকত। তারপর আজ বছরখানেক থেকে তার নতুন ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। কামার্ততার ব্যাধি। প্রথম সে পশুর পিছনে ফিরেছে, তারপর নারীর স্বাদ পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এরপর আর ধনেশ্বরেরও পুত্রকে সাধক বলে ধারণা করবার সুযোগের সূচীছিদ্রও রইল না। তারা—বলতে গেলে ধনেশ্বর আর সুখেশ্বর—বংশের মর্যাদা ঘরের মর্যাদা রাখবার জন্য তাকে শাসন শুরু করেছিল। সে শাসন নির্মম এবং নিষ্ঠুর। তাকে বেঁধে ছড়ি বা চাবুক দিয়ে প্রহার করত। সে চিৎকারও করত কিন্তু সে যন্ত্রণায় বা ভয়ে নয়—রাগে গর্জন করত। ঘটনার দিন সে দোতলার ঘরে বন্ধ ছিল। দাঁড়িয়ে ছিল একটা জানলায়। সেখান থেকেই সে দেখতে পেয়েছিল বাড়ীর পিছন দিকে একটা জোয়ান মেয়ে কাঁধে একটা ঝুড়ি নিয়ে গোবর কাঠ-কুটো কুড়োচ্ছে। বাড়ীর পিছন দিকটা নির্জন। মুহূর্তে সে এই নির্জনতার সুযোগ ও অবকাশের মধ্যে নারীদেহের প্রলোভনে বাঘের মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। পাগল সে, কিন্তু উন্মত্ত পাগল ছিল না। সে বন্ধ দরজায় পদাঘাতে নিজের উন্মত্ত লালসাকে ব্যক্ত করেনি। সে চেষ্টা করেছিল জানালার গরাদেটাকে ভাঙতে। সতেরশো পঁচানব্বই্যে জমিদারী কেনার আগে কুড়োরাম ভটচাজ এই অংশটা তৈরী করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীও তার পরের ইমারত। বলতে গেলে এই অংশটাই বড় সব মহলের চেয়ে। এবং মাঝের মহল। জানলা-গুলো স্বাভাবিকভাবেই জীর্ণ হয়েছিল তা বুঝতে গোপেশ্বরের কষ্ট হয়নি। দানবের মত দেহ—দানবের মত শক্তিও ছিল তার। জানালার গরাদে ছাড়িয়ে ফেলতে খুব বেগ তাকে পেতে হয়নি। দু-তিনটে গরাদে ছাড়িয়ে ফেলে সে সেই ফাঁক দিয়ে গলে দোতলা থেকে বাড়ীর বাইরে বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আঘাত পায়নি নয়, আঘাত পেয়েছিল হাঁটুতে হাতে—রক্তপাতও হয়েছিল। কিন্তু জীবনের আদিম আকর্ষণে সে তখন জ্ঞানশূন্য। বিশ্বজগৎ তখন তার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে উঠে আসা পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের আড়ালে ঢেকে যাওয়া আকাশের এবং সূর্যের মত। সে গাছের আড়ালে আড়ালে চতুর বাঘের মত চতুরতার সঙ্গে এগিয়ে এসে মেয়েটাকে আক্রমণ করেছিল। এসব মেয়েগুলি সম্পর্কে নানান অপবাদ আছে। এরা হয়তো নিশাচরী, এরা হয়তো স্বৈরিণী, হয়তো রাক্ষসীও বটে, কিন্তু গোপেশ্বর তার চেয়েও ভয়ঙ্কর—তাছাড়া নারী যাই হোক, যেমন চরিত্রেরই হোক, এ ধরণের আক্রমণে সে আত্মসমর্পণ করে না। সে গোয়ান মেয়ে, সে বাধা দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে চিৎকারও করেছিল। কিন্তু তাতে গোপেশ্বরের বিঘ্ন হয়নি। সে বাঘের

মতই তার বুকের উপর চেপে বসেছিল। মেয়েটা চিৎকার করেই চলেছিল। সেই চিৎকারে সর্বপ্রথম ছুটে এসেছিল কাকা সুখেশ্বর। এসে সে টেনেছিল গোপেশ্বরকে। কিন্তু তাকে টেনে ছাড়ানো ছিল তার সাধ্যের অতীত। প্রহার করেছিল হাত দিয়ে। সে গোপেশ্বর গ্রাহ্য করেনি। তখন সে একটা ভাঙা ডাল দিয়ে তাকে প্রহার করতে শুরু করেছিল।

এই প্রহারই গোপেশ্বরের অসহ্য হয়েছিল এবং মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে উন্মত্ত ক্রোধে সুখেশ্বরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে বসে বাঘের মত হাতের থাবায় তার গলা টিপে ধরেছিল। তারপর লোকজন এসে তাকে ধরে টেনে তোলে, কিন্তু তখন শ্বাসরোধে সুখেশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে। ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সারা রায়বাড়ী লজ্জায় দুঃখে বোবা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পালিয়েছিল। এই স্তব্ধতার মধ্যে অকস্মাৎ শিবেশ্বর দোতলার ছাদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিচে কতকগুলো ভাঙা ইটের স্তূপের উপর। মাথা নিচু করে পড়েছিলেন, খুলিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, ঘাড় ভেঙে গেছে। বিবরণ এই!

এ শুনে কার না ঘৃণা হবে, কার না লজ্জা হবে, কার না ক্রোধ হবে! সুরেশ্বরের কিন্তু ক্রোধ হয়নি। সে বক্র হাসি হেসে মনে মনে বলেছিল—রায়েরা সব পারে। ওই হাসিটুকু হেসেই সে নিজের ঘরে ঢুকেছিল। বসেছিল রঙ তুলি নিয়ে।

আঁকতে চেয়েছিল বীভৎস একটা কিছু। কিন্তু তা পারেনি। যত এবং যেমন বীভৎস সে আঁকতে চায় তা কি করে কোন্ কল্পনায় কোন্ রেখায় কোন্ রঙে ঠিক ফুটবে তা তার ধারণায় আসেনি।

আইভরি ব্ল্যাকের একটা বড় টিউব মোটা তুলি দিয়ে একখানা ক্যানভাসে লেপেছিল। কিন্তু তা মনে হয়েছিল যেন নিদ্রানিথর একটি শান্ত অমাবস্যার রাত্রি। সে তো বীভৎস নয়।

* * * *

ভেবেছিল অনেক! রায়বংশ এমন হল কেন?

অনেক ভেবে সে দায়ী করেছিল ধর্মকে এবং সম্পদকে। রায়বাড়ীর এই পরিণাম এই দুটোর জন্যে। শুধু শিবেশ্বর-ধনেশ্বর এবং গোপেশ্বরকেই তার মনে পড়েনি—তার বাবাকেও মনে পড়েছিল। তার জ্যেঠামশাই, জ্যাঠতুত ভাইদেরও মনে পড়েছে। জ্যাঠামশাই এখন প্রায় সর্বস্বান্ত। মদ্যপান করেন দিনরাত্রি। থাকেন কাশীতে। সম্বলের মধ্যে কাশীর বাড়ী। আর কিছু লুকনো অর্থ। জ্যাঠতুত ভাইরা কলকাতায় এসেছে। তারা দুই ভাই চেষ্টা করছে নূতন কিছু করবার। তাদের ইচ্ছে তারা কীর্তিহাটের দেবোত্তর পত্তনী দেওয়ার নামে বিক্রী করে, কিন্তু জ্যাঠামশায়ের অনিচ্ছায় তা পারে না। দিনের বেলা কয়লার আপিস মহলে ঘোরে, আর রাত্রে দুই ভাই এক সঙ্গে খোলার বস্তিতে রাত কাটায়। মধ্যে মধ্যে গাড়ী কেনে। মাঝে মাঝে খবর পায়--পাওনাদারেরা রাস্তার মধ্যে গাড়ী আটকে তাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী দখল করে নিয়ে চলে গিয়েছে।

নায়েবই এদের কথা মনে করিয়ে দিল সুরেশ্বরের। বললে—এই বিপদের মধ্যে বিপদ, বড়বাবুর কীর্তিহাটের বাড়ীর অংশ—যা মানে দেবোত্তর নয়,—তা মাড়োয়ারীরা ক্রোক

করেছে। নিলেমে তুলবে।

হেমলতা বললেন—না। তা তো হতে দিতে পারব না।!

সুরেশ্বর উঠে চলে গিয়েছিল।

৯

সুরেশ্বরের জীবনকে কিন্তু এতে আর বিষণ্ন বা বিমর্ষ করতে পারেনি। পাগলামি কিছুটা তারও আছে। সেটাই যেন বেড়ে গেল। পাগলামি বটে কিনা সেটা পাগল-বিশেষজ্ঞ-বলতে পারেন। সুরেশ্বর তা ভাবে না, কারণ মধ্যে মধ্যে নিজেরই যে মনে হয় সে একটু পাগল। পাগল সে ততক্ষণ হতেই পারে না, যতক্ষণ পাগলামিকে পাগলামি বলে নিজের সন্দেহ হয়। সে সন্দেহ তার হতো। শুধু সন্দেহ নয়—ভয়ও হতো। তাদের রক্তে যে পাগলামির মত, একটা দুরন্ত ব্যাধির মত কিছু আছে তাতে তার সন্দেহ ছিল না। সেগুলো মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পেতো নিজের অজ্ঞাতসারেই। এবার তাতে জোর ধরল। সব থেকে বেশী প্রকাশ পেতে লাগল সেটা তার বেশভূষা এবং স্টাইলের মধ্যে। হঠাৎ চুল-দাড়ি দুই রেখে ফেললে সে।

একেবারে প্রথমে সে তখন পাঁচ-ছ'দিন কামায়নি। মা তাকে দেখে বললেন—ও কি, কামাস নি কেন?

দাড়ির খোঁচায় হাত বুলিয়ে বললে—ও একটা ঝঞ্ঝাট।

—ঝঞ্ঝাট? কামানো?

—হ্যাঁ।

—তাই বলে কামাবিনে?

—দাড়ি রাখলে ভাল লাগবে না?

—বাপের মত?

—না। ফ্রেঞ্চকাট-টাট নয়। আদি ও অকৃত্রিম ইণ্ডিয়ান স্টাইল।

—না। দাড়ি রাখতে হবে না।

সুরেশ্বর বলেছিল—আমার সেল্‌ফ-পোর্ট্রেটে আমি দাড়ি-গোঁফ এঁকে দেখেছি আমাকে খুব ভাল মানাবে মা!

মা তবুও বলেছিলেন—না না! কামিয়ে ফেল!

—দোহাই মা। এই তো কিছুদিন হল সাবালক হয়েছি বলে একগাদা কাগজপত্রে সই করলাম। কিন্তু বিষয়কর্ম তোমার হাতে রয়েছে, থাকবে। ওখানে আমি নাবালকই থাকব। এই একটা জায়গায় আমাকে সাবালক হতে দাও।

—এ উদ্ভট খেয়াল তোর হল কেন বল তো?

—ওই যে মা, অশৌচ পালন করতে ক'দিন কামাইনি, দাঁড়ি-গোফ বেরিয়েছিল, তা থেকেই বুঝলাম, খুব ভাল মানাবে আমাকে দাড়ি-গোঁফে। তারপর পোর্ট্রেটে এঁকে দেখলাম। আর বিশ্বসুদ্ধ লোক দাড়ি কামাচ্ছে যখন, তখন এটা একটা অসাধারণ কিছু হবে।

মা কিছু আর বলেন নি। ছেলের সম্পর্কে রায়বংশের বংশধর বলে তাঁর মনে একটা আশঙ্কা আছে। ছেলে যা কিছু উদ্ভট-উৎকট করে, তাই দেখে তিনি শঙ্কিত হন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভয়ঙ্কর পথে পা না বাড়ায়, ততক্ষণ তিনি বলতে গিয়েও বলতে পারেন না।

তিনি শুধু একটা জায়গায় সতর্ক হয়ে আছেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত থাকতে চান। সেটা বিষয় ও অর্থের অধিকার। এটাই সব তা তিনি স্বীকার করেন না। তবে এটা যে অনেকখানি, তা তিনি উকিলের ভাগ্নী এবং জমিদারের বধূ হয়ে স্পষ্ট বোঝেন, তাঁর জীবন তাঁকে মর্মে মর্মে বুঝিয়েছে। একটা কথা যোগেশ্বর বলতেন তাঁকে। হেমলতা যখন তাঁকে কাগজ বের করতে বলেন, তখন বলেছিলেন; তারপরও বলতেন। বলতেন—দেখ, কাগজ শুধু কাগজ নয়, ব্যবসায়ও বটে। তাই বা কেন, আগে ওটা ব্যবসা, পরে ওটা কাগজ বা কাগজের মতবাদ—দেশের কল্যাণ। ব্যবসা করে টাকা আসে। এবং সেইটেই বড় হয়ে দাঁড়ায় ক্রমে। তখন বাজনার তালে গায়কদের নিয়ে যাওয়া যায় না, গায়করা বেতালা গাইলেও তার সঙ্গেই তাল মানিয়ে চলতে হয়! তা টাকার তো প্রয়োজন নেই আমার। টাকা তো রয়েছে। অর্থ পুঞ্জীভূত হলেই অনর্থ এবং বিষয় বিপুল হলেই বিষ।

তাই বিষয় অর্থ তিনি ধরে রেখেছেন এই রোগশয্যায় শুয়েও। মধ্যে মধ্যে ভাবেন—ওই তিন লক্ষ টাকা সেদিন যদি যোগেশ্বরের নিজের হাতে না থাকত! একখানা চেক কেটে যদি ফরেন এক্সচেঞ্জে পরিণত করতে না পারতেন, তবে কি তিনি তিন-চারদিনের মধ্যে চন্দ্রিকাকে নিয়ে জাহাজে চড়তে পারতেন? তবে পাগলের মত দেশেই পালিয়ে বেড়ানো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাতে কি চন্দ্রিকাই রাজী হত? হত না বলেই তাঁর ধারণা!

তাই ছেলে ছবি আর গান-বাজনা নিয়ে ঘরের মধ্যে মেতে আছে, তাতে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এবং ছেলে দাড়ি-গোঁফ রাখছে—তা রাখুক। আপত্তি করেননি।

সুরেশ্বর বাড়ী থেকে বের হত না। ওই আর্ট এক্‌জিবিশন দেখতে যাওয়া, কখনও যামিনী রায়ের বাড়ী, কখনও হঠাৎ শান্তিনিকেতন যাওয়া, যাওয়ার গণ্ডীটা এর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে দেখেছে। কাছে যায়নি। একান্তভাবে যাত্রীর মতই যেত—চলে আসত। নিজেকে আর্টিস্ট বলেও কোথাও জাহির করত না। মধ্যে মধ্যে পায়ে হেঁটে বেড়াত গঙ্গার ধার থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত। আর যেতো সে সাহিত্য-সম্মেলনে, যেখানে আধুনিক সাহিত্যিকরা সমবেত হতেন। পরিচয় গ্রুপের সুধীন দত্ত, নীরেন রায় এঁদের দেখেছে। অতুল গুপ্তকে দেখেছে। শরৎচন্দ্রের বাড়ী দেখে এসেছে। কখনও কখনও নব্যপন্থী কাগজের আপিসের সামনে দিয়ে ঘুরেও আসত। আর যেতো ভাদুড়ীমশায়ের থিয়েটারে নাটক দেখতে। আর্ট থিয়েটার তখন উঠে গেছে, রঙমহল হয়েছে, নাট্যনিকেতন হয়েছে, সেখানেও যেত। দক্ষিণ কলকাতায় আশুতোষ কলেজে কিছুদিন আগে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্সে সে সামনের সারিতে আসন সংগ্রহ করে সব বক্তৃতা মন দিয়ে শুনে এসেছে। বিবাহের চেয়ে বড় এবং প্রাচীর ও প্রান্তর বইখানার নাম তার খুব ভাল লেগেছে। এমনি মন তখন তার। হয়তো এর কারণ এই যুগের ছেলে, এই যুগের নিঃশ্বাস নেয়—তাও বটে; গণবিপ্লবের ভূমিকা উনিশ শো তিরিশে—তার জেলের অভিজ্ঞতা ও তার কৃতকর্মও

বটে। তা ছাড়াও হয়তো গভীর অন্তস্তলে আরও কিছু আছে। নিজের বংশের ধারাকে সমর্থনও বটে আবার তার প্রতি বিদ্বেষও বটে। কারণ যাই হোক, ব্যাপারটা বলতে গেলে এককালের ল্যাংড়া গাছের মিষ্টি আম, স্বাদে টক হয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার। কথাটা সুরেশ্বরের নিজের কথা। সে বলেছিল তার মামাতো ভাইবোনেদের। অর্থাৎ হেমলতার মামাতো ভাই ব্যারিস্টার প্রবীর চ্যাটার্জির ছেলে-মেয়েদের। মেলামেশা অর্থাৎ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাসূচক মেলা-মেশা এদের সঙ্গেই ছিল তার।

বাইরের অনেকে তাকে চিনত, সেও তাদের চিনত—সে শুধু চেনা-জানাই। সকলের দৃষ্টিই তার প্রতি নিবদ্ধ হত তার চেহারার জন্যে। সুপুরুষ দীর্ঘাকৃতি যুবক—চলায়ফেরায়, কথায়-বার্তায়, দৃঢ়তা এবং শীলতা, তার উপর বেশভূষার বৈচিত্র্য—এসব দেখে তাকে লোকে চিনতে চাইত এবং চিনে রাখতও। কিন্তু আলাপ সে ঘনিষ্ঠভাবে করতে চাইত না। তার কারণ ছিল—কীর্তিহাটের রায়বংশের নাম, আধুনিকদের কাছে খুব পরিচিত না হলেও, যোগেশ্বরের নাম অনেকে জানত এবং দেশদ্রোহিতার অপবাদে সে-নাম খুব প্রীতিপদ ছিল না। সে যখন জেল থেকে বণ্ড দিয়ে চলে আসতে চেয়েছিল, তখন সকলেই বলেছিল—জে রয়ের ছেলে যে! তাছাড়া তার বাপের চন্দ্রিকাকে নিয়ে ইয়োরোপ চলে যাওয়ার কথাটাও গোপন নেই। সুতরাং ঘনিষ্ঠ হতে সে চাইত না। তাতে সুবিধে এই যে, ভদ্রতার ঢালের আড়াল দিয়ে চলা যায় এবং তাতেও যদি কেউ ভদ্রনীতি উপেক্ষা করে আঘাত করে, তবে সেখানে তীরের বদলে ভল্ল নিক্ষেপে বাধা হয় না। সে-ক্ষমতা সে রাখে।

মেলামেশা তাই অতি নিকট-আত্মীয়তার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মামাতো বোন দুটি—একটির বয়স সতেরো, অন্যটি পনেরো, ভাইটি ছোট। সীমা-অসীমা-প্রদীপ। সীমা তাকে বলেছিল—তুমি কি হচ্ছ সুরোদা?

—আমি আমি হচ্ছি! যেমন তুমি তুমি হচ্ছ।

—হেঁয়ালি করছ!

—খেয়ালী মানুষের খেয়াল অনেক সময় হেঁয়ালী বলে সন্দেহ হয়।

—কথায় প্যাঁচ কষো না। দিন দিন কুনো হয়ে যাচ্ছ না?

—বন থেকে কোন নিরাপদ স্থান, আরামদায়কও বটে। আমি বন্য নই তো!

—বাবার কাছে একজন মক্কেল এসেছিল তোমার জাঠতুতো দাদাদের নামে নালিশ করতে। তারা বলছিল—রায়েরা আগাগোড়া হাড়ে হাড়ে টক হয়ে গেছে। তোমার নামও করছিল। আমিও তা সমর্থন করছি—কি বলার আছে তোমার?

সুরেশ্বর বলেছিল ওই কথা—ল্যাংড়া আম কালে স্বাদ বদলে টক হয়ে যায় নজীর আছে। হয়তো হয়েছি। কিন্তু তার উপায় কি? ওই লোকটি এসেছিল, আমার জ্যাঠামশায়ের শ্যালক। জ্যাঠাইমার সহোদর, এক মারোয়াড়ীর সঙ্গে কয়লার ব্যবসা করেন। তিনি দুবার এর আগে ইনসলভেন্সী নিয়েছেন। তাতে বেশ পোস্টাই হয়েছে। এবার জ্যাঠামশাই ইনসলভেন্সী নিয়েছেন। তাঁর টাকা ডুবেছে। তাই তিনি আমাদের কীর্তিহাটের ভদ্রাসন ক্রোক করে-

ছিলেন। কিন্তু আমার মা-র তা সয়নি। তিনি বাড়িটায় জ্যাঠামশাইয়ের অংশ কিনে বাঁচিয়েছেন। আমার কাছেও তিনি এসেছিলেন। সুতরাং আমাদের অম্লত্বের স্বাদ তিনি প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করেছেন। তবে কি জান সীমা, স্বাদের ব্যাপারটা জিহ্বার উপর নির্ভর করে। কেউ বলে হাড়টক। কেউ বলে অম্লমধুর।

—ওরে, বাপরে! আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ! তা ঘরে বসে আমার সামনে করলে কি হবে? বাইরে বেরিয়ে কর! তবে তো বুঝি! ছবি আঁকবে কাউকে দেখাবে না। গান গাইবে, বাজারে কাউকে শোনাবে না! এত অহংকার কেন তোমার?

—সে তো তোমার কাছে নেই। চল নতুন ছবি দেখাই। তারপর গান শোনাব। তবে বাইরের লোকের কাছে অহংকার আমার বেঁচে থাক—তাতে তোমার সঙ্গে কোঁদল করবার পথটা দিন দিন প্রশস্ত হবে।

সীমা আবদার করে তার হাত ধরে বলত—না, তোমার কথা কিছুতেই শুনব না। আমাদের বাড়ীতে, না আমাদের বাড়াতে হলে তোমার ছবি দেখানো হবে না, এই বাড়াতেই আমার বন্ধুদের একদিন নিমন্ত্রণ করব। তোমাকে ছবি দেখাতে হবে, গান শোনাতে হবে। হবেই হবে। আমার এক নাকউঁচু বান্ধবা আছে, সুলতা ঘোষ, তাকে একবার সব দেখাতে চাই।

—সুবিধে হবে না। আমি বৃক্ষটি ঠিক যাকে সহকার বলে তা নই। বলতে পার শাল্মলা বৃক্ষ। অর্থাৎ শিমুল গাছ।

—ওঃ, সুলতা নাম শুনেই ধরে নিলে আমি তোমাকে তার সহকার করে, তাকে কাঁধে চড়িয়ে দিতে চাই?—সে লতা হলে যাকে বলে কণ্টকলতা তাই। বেতসলতা মশাই, তারও কাঁটা আছে। এবং তা দিয়ে যে আঘাত তাকে বলে বেত্রাঘাত!

—অথবা নিতান্ত মাঠে যে কুমড়ো খেঁড়োর লতা হয় তাই!

—বাবাঃ! হার মানলাম।

—আমি খুশী হলাম। চল আগে বাজনা শোন।

এইভাবেই সে গড়ে উঠেছিল আপনার আবেষ্টনীর মধ্যে—সে লোহার জাফরীঘেরা গাছের মতই হোক আর একান্তে একেবারে উন্মুক্ত প্রান্তরে একক একটি গাছের মতই হোক, মোটামুটি সোজা সিধে হয়েই উঠে চলেছিল।

এরই বছরখানেকের মধ্যে অর্থাৎ উনিশ শো চৌত্রিশ সালে হঠাৎ হেমলতার হার্টের অসুখ বেড়ে উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

একটা কারণ ঘটেছিল। সুরেশ্বর বাড়ী ছিল না, সে গিয়েছিল একজন জাপানী আর্টিস্ট এসেছেন তাকে দেখতে। ইতিমধ্যে এসেছিল একটি মহিলা, সে সটান এসে বাড়ীর ভিতর অতি পরিচিতের মত একেবারে হেমলতার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। হেমলতা তাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন ভূত দেখার মত। যে এসেছিল সে চন্দ্রিকা। সে ভারতবর্ষে ফিরেছে। সে ক্ষমা চাইতে এসেছিল হেমলতার কাছে। তার কাছে সে বিশ্বাসঘাতিনা। হেমলতাই সমাদর করে তাকে নিমন্ত্রণ দিয়ে বাড়াতে এনে যোগেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

*

সে যোগেশ্বরকে প্রলুব্ধ করে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। কথা এইটুকু। তার মূল্য চন্দ্রিকার গ্লানি থেকে মুক্তি কিন্তু হেমলতার কাছে তার মূল্য আরও অনেক। তার জন্য তার জীবন দিতেও আক্ষেপ হয়নি। চন্দ্রিকা বলে গেছে—দেখ, তোমাকে সিস্টারই যদি বলি, তবে ঘৃণা করে না বলো না। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি তাকে সুখী করতে। বিলিভ মী। কিন্তু সে সুখী হয় নি। একদিনের জন্যও না। সে বলত কি জান? বলত—হেমলতা was my life, and you চন্দ্রিকা তুমি আত্মহত্যার মৃত্যু, তুমি অতি সুন্দরী, তুমি মনোহারিণী, আত্মহত্যার মত মনোহারিণী। মৃত্যুতে মানুষ শান্তি পায়, আত্মহত্যার মৃত্যুতে পায় না। If there is a life after death তবে, আত্মহত্যার মৃত্যুতে শান্তি পায় না—এটা শাস্ত্রের সত্য নয়, লজিকের সত্য। বেশী মদ খেলে কাঁদত। আমাকে মারত। আমি বলতে এসেছি—আমি তাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারিনি। ডাকাতি করেও পারিনি। শান্তি আমি পেয়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

এবং দিয়ে গিয়েছে কিছু কাগজপত্র। যেটা যোগেশ্বরের মৃত্যুর পর তার হাতে পড়েছিল। তাই সে দিয়ে গেছে। হেমলতা শুনেছিলেন আর কেঁদেছিলেন। চন্দ্রিকা চলে যাবার পরও পড়ে পড়ে কাঁদছিলেন, এরই মধ্যে উঠেছিল হার্টের রোগ।

রোগের এই আক্রমণেই হেমলতার মৃত্যু হল। পনের দিন অতি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। দিনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকটা সময় কিছুটা সুস্থ থাকতেন, তাও একনাগাড় একটানা অর্ধেক দিন নয়। কিছুক্ষণ একটু ভাল, তারপরই আবার বুকের যন্ত্রণা উঠত।

চিকিৎসার ব্যবস্থার ত্রুটি তো ছিলই না—আতিশয্যই হয়েছিল বলতে হবে। ডাক্তার-নার্স বলতে গেলে মোতায়েন ছিল। বড় কনসাল্টিং ফিজিসিয়ান দিনে একবার নিয়মিত আসতেন। একজন অল্পবয়সী ডাক্তার প্রায় অর্ধেক দিনেরও বেশী থাকতেন। দিনে আসতেন দুবার। এবং রাত্রে ন'টার পর এসে এখানেই শুতেন। নার্স দুবেলা দুজন। রাত্রে একজন, দিনে একজন। সুরেশ্বর মায়ের পাশের ঘরেই শুতো। সে এসে বসে থাকত জানালার ধারে একটা চেয়ারে।

মা মধ্যে মধ্যে কাছে ডেকে বলতেন—যা, শুগে যা। এখন ভাল বোধ করছি।

বললেই সে চলে যেত। কিন্তু আধঘণ্টা বা একঘণ্টা পরই সামান্য শব্দ শুনলেই নিঃশব্দে মায়ের দরজাটি খুলে সেখানে দাঁড়াত। বিশেষ কিছু না হলে ফিরে যেত, না হলে ধীরে ধীরে এসে ওই চেয়ারখানিতে বসত।

এরই মধ্যে পনের দিনের দিন হেমলতা চলে গেলেন। বুঝতে তিনি পেরেছিলেন। ছেলেকে ডেকে কাছে বসিয়ে বলেছিলেন—আমাকে যেতে হবে রে। ভেঙে পড়িসনে যেন!

সুরেশ্বর আত্মসম্বরণ করেও করতে পারেনি। কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না, তা সে ভেঙে পড়বে না। কিন্তু চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল দুটি ধারায়।

হেমলতা বলেছিলেন—কাঁদছিস?

সে মাটির মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল। হেমলতা বলেছিলেন—চোখ মোছ।

একবার সে মুছেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ধারা নেমে এসেছিল; চোখ-মুখ মুছেও

তো আর উৎসমুখ বন্ধ করা যায় না !

হেমলতা বলেছিলেন—কোন কিছু বারণ আমি করে যাব না তোকে। শুধু একটি কথা—তোর নিজের বিচারে যা অন্যায় তা করিসনে !

ঘাড় নেড়েছিল সুরেশ্বর—হ্যাঁ।

হেমলতা আর বলেছিলেন—তোকে না বলে একটা কাজ করেছি, বলে যাই তোকে। আমাকে উনি যা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা থেকে আমি কীর্তিহাটে তোর জ্যাঠামশাইয়ের সবই কিনেছি। দেবোত্তর পত্তনী নিয়েছি, বাড়ী কিনেছি। ওখানকার খরচ যেন কমাসনে। আর মেজতরফ যেমন খেতে পায় তেমনি যেন পায়। মেজখুড়ীমাকে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠানো হয়। বন্ধ করিসনে। আমি জানি দেবতায় তোর বিশ্বাস নেই। কিন্তু ওটা পূর্বপুরুষের কীর্তি।

মৃত্যুর একদিন আগের কথা। পরের দিন সকাল নটায় তিনি আধবসা হয়ে বসে থাকতে থাকতেই প্রায় নিঃশব্দে চলে গেলেন। কেউ বুঝতেও পারলে না।

সুরেশ্বর দুবার শুধু ডাকলে—মা ! মা !

মা স্থির নিথর। সে গায়ে হাত দিলে। নার্স ডাক্তারকে ডাকলে। সে পাশের ঘরেই ছিল—ইনজেকশন তৈরী করছিল। সে এসে দেখে বললে—একস্‌পায়ার্ড !

সুরেশ্বর সেই চুপ করে মায়ের গায়ে হাত দিয়ে মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

সেইদিন সন্ধ্যায় যখন সে ফিরল, তখন সে ভাঙা মানুষ। মায়ের শবদেহ যতক্ষণ ছিল তখনও পর্যন্ত সে যেন ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি। মায়ের দেহ চিতায় চাপাতেই সে কল্পনায় কি হবে তা বুঝে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। সৎকারে এসেছিল ব্যারিস্টার মামা এবং তার দুই জ্যেঠতুতো ভাই। আর তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে এসেছিল ধনেশ্বরের বড় ছেলে ব্রজেশ্বর। সে নাকি এখন এক কোটীপতি শেঠের বাড়ী চাকরি করে।

ব্যারিস্টার মামা প্রবীর চ্যাটার্জি রুমালে চোখ মুছে তাকে ধরে বললেন—এ কি, এ কি, তুমি এমন করে কাঁদবে ! না-না-না ! আমি তো তোমাকে খুব স্ট্রং নার্ভ শক্ত মানুষ বলে জানতাম ! ও-নো। ডোনট ক্রিয়েট এ সিন ! লোকে বলবে কি ? দেখ রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ যখন মারা যান। তখন তাঁর কথা তুমি জান। মা কি কারুর চিরকাল থাকে ! ছি ! চল এখন সরে গিয়ে দূরে বসবে চল !

—না। চোখ মুছে সে প্রায় নিষ্পলক দৃষ্টিতে মায়ের দেহ পুড়ে ছাই হতে দেখেছিল শেষ পর্যন্ত !

পাশে এসে বসেছিল খুড়তুতো ভাই ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর তার থেকে বয়সে বছর তিনেকের বড়। ধনেশ্বর যোগেশ্বরের থেকে বয়সে বছর দুয়েকের ছোট হলেও বিবাহ করেছিল প্রায় পাঁচ বছর আগে।

ব্রজেশ্বর প্রিয়দর্শন। কিন্তু দেহে দুর্বল। সম্ভবতঃ অভাব তার কারণ। বেশ ছিমছাম ফিট-ফাট। সে এসে সুরেশ্বরের পাশে চুপ করে বসেছিল। প্রগল্‌ভতা করেনি। তাকে বোঝাতে চায়নি। শুধু বসেই ছিল। মধ্যে মধ্যে সিগারেট খাচ্ছিল।

হঠাৎ সে এক সময় গুন গুন ক'রে সুর ভেঁজে ক্রমে ক্রমে কণ্ঠস্বর উচ্চ করে গান গেয়ে উঠেছিল—"ছাড়িয়ে সংসার কোথা চলে যাও দীনহীন বেশ ধরিয়ে—।"

কণ্ঠস্বর তার সত্যকারের সুস্বর। গানটিও এই ক্ষেত্রের উপযোগী। "তখনকার কালে এ গানটির চল ছিল। সংসারের সব পিছনে ফেলে দীনহীনের বেশে কপালে তিলক নিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? একবার পিছন ফিরে তাকাও। বলে যাও, কোথায় যাবে আপনার ব'লে যাদের বুকে ধরেছিলে এতদিন তাদের ফেলে!"

শ্মশানে গান সহজবুদ্ধি যাদের তারা হয় তো গায় না কিন্তু কীর্তিহাটের ধনেশ্বর রায়ের ছেলে ব্রজেশ্বর রায়ের পক্ষে সে কথা খাটে না। তাছাড়া গানটি এমন কালোপযোগী এবং এমন বেদনা দিয়ে সে গাইলে যে আবার সুরেশ্বরের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আবার তার চোখ দিয়ে দরদরধারে জল গড়াতে লাগল।

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উত্‌রে গিয়েছিল; নিম মুখে দিয়ে মিষ্টিজল খেয়ে সকলে চলে গেল; জ্যেঠতুতো ভাইরা চলে গেল, ব্রজেশ্বর শুধু বললে—বল তো আমি রাত্রিটা থেকে যাই ভাই সুরেশ্বর। একলা থাকবে?

সে বলেছিল—বেশ তো! থাকুন। বলেই উপরে চলে গিয়ে সে মায়ের ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল কম্বল পেড়ে।

নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্র প্রাচীন, বহুদর্শী কর্মক্ষম বিশ্বস্ত লোক, সে যথাবিধি ব্যবস্থার খুঁত থাকতে দেয় নি। সুরেশ্বর বলেছিল—দেখবেন, যেন মায়ের অশৌচে শ্রাদ্ধে কোন খুঁত বা ত্রুটি আমার না হয়।

হরচন্দ্র বলেছিল—সে তুমি ভেবো না। সে কোন খুঁতই হবে না। ভাবছি হবিষ্যির জন্যে। কে রান্না করে দেবে?

—আমি নিজেই করে নেব। না-পারার মত কিছু নেই।

পরদিন সকালে উঠে চাও সে খায় নি। অপেক্ষা করেছিল পুরোহিতের জন্য, যার কাছে সব জেনে নেবে। এই সময় উপরে উঠেছিল ব্রজেশ্বর। বললে—তা হ'লে আমি চলি ভাইরাজা!

সুরেশ্বর সবিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালে। ভাইরাজা সম্বোধন শুনে সে বিস্মিত হয়েছে।

ব্রজেশ্বর হেসে বললে—খোসামোদ ক'রে বলি নি ভাই। ওটা স্বপ্ন হয় নি। তবে কাল তোমার যা মায়ের উপর টান ভক্তি দেখলাম—মনটির পরিচয় পেলাম—তাতে তুমি রাজা। তা ছাড়া চেহারাতেও তাই। পয়সার কথা বলব না,—জ্ঞাতিতে বললে হিংসে হয়। অন্যে বললে ভিক্ষে চাইবে মনে হয়। রাজা তুমি রূপে-গুণে মনে মেজাজে! তা ছাড়া ছোট তুমি, আশীর্বাদও করছি!

ব্রজেশ্বরের জিহ্বা এবং কণ্ঠস্বরে মধু আছে। ভাল লাগল সুরেশ্বরের। সে বললে—আসবেন আবার!

—নিশ্চয় আসব রাজা! বলতে গেলে কাল সব বুঝে তো বিনা খাজনার প্রজা হয়ে গিয়েছি। সেলাম দিতে নিশ্চয় আসব! এত দিন আছি আসি নি। পরিচয়টা ঠিক হয়

নি, তোমাকে ঠিক বুঝি নি, তাই আসি নি। ভেবেছিলাম কি জানি কাঁটায় ছড়ে যাবে কাছে গেলে। এ যে জুড়িয়ে গেল রাজা। শ্রাদ্ধ এখানেই করবে? না যোগেশ্বর জ্যাঠার শ্রাদ্ধের মত কীর্তিহাটে যাবে?

—না। এখানেই হবে!

—সেই ভাল! অনর্থক রাশি রাশি টাকা খরচ করে কতকগুলো লোভী বামুন খাইয়ে আর—। এইখানেই কর।

১০

মাতৃশ্রাদ্ধ তাকে যেন হঠাৎ একটা নতুন জীবনে নতুন রাজ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। অতি সাধারণ এবং ভাবসর্বস্ব মানুষ হ'লে সে নিশ্চয়ই ভাবত—তার মা মরজগতের ওপার থেকেই পরম স্নেহে তাকে হাত ধরে এনে এই জীবনে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন। দুঃখ ভুলিয়ে দিতেই করলেন এটা। কিন্তু সুরেশ্বর তা ভাবলে না। এটা হবেই সে এটা জানত, দুদিন আগে আর দুদিন পরে। এবং এর কারণ তার কাছে স্পষ্ট।

মায়ের শ্রাদ্ধ সে কলকাতাতেই করলে এবং সংক্ষেপে করতে গিয়ে করতে পারলে না শেষ পর্যন্ত। মনটা কেমন খচ খচ করতে লাগল।

নায়েব তাকে প্রথম দিনই তার আর্থিক এবং বৈষয়িক সম্পত্তির একটা পরিষ্কার হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছিল। কীর্তিহাটের সাড়ে আট আনা দেবোত্তর এখন তার হাতে এসেছে। তার পিতামহ ছোট ভাইয়ের পাঁচ আনা অংশের মহাল অর্ধেক পত্তনী নিয়েছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গেলে মূল স্বত্বেরও অর্ধেক তাঁতে বর্তেছিল। তাতে হয়েছিল তাঁর সাড়ে আট আনা! এর অর্ধেক চার আনা পাঁচ গণ্ডা ছিল তার জ্যেঠা মশায়ের। বৎসরখানেক পূর্বে তার মা হেমলতা দেবী ভাসুরের দেবোত্তরের মুনাফা পত্তনীর সামিল করে বন্দোবস্ত নেওয়ায় বলতে গেলে সাড়ে আট আনাই তার হয়েছে। বার্ষিক দেবখরচ বরাদ্দ বারো হাজার বাদে কুড়ি হাজার মুনাফার সাড়ে আট আনা এখন তার। এ ছাড়া কলকাতার বাড়ীভাড়া মাসিক তিন শো টাকা হিসাবে ছত্রিশ শো টাকা এবং কেনা শেয়ারের ডিভিডেণ্ড থেকে বার্ষিক চার পাঁচ হাজার আসে। নগদ টাকা তার অংশের পঞ্চাশ হাজার বেড়ে এখন পঁয়ষট্টি হাজারে পৌঁচেছে। তার মায়ের টাকা সামান্যই মজুদ আছে, হাজার আষ্টেক, বাকী টাকা অর্থাৎ ভাসুরের সম্পত্তি এবং বাড়ী তিনি কিনবার জন্য তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

হরচন্দ্র বলেছিল—বাবা, আয় এখন তোমার বিশ হাজার টাকা। এ যদি তুমি হিসেব করে চলতে পার তবে তোমার পর আর দুপুরুষ পর্যন্ত সুখে চলে যাবে। তোমার বাবা তাঁর নিজের জীবন নিয়ে বেহিসেবি চালে চলেছেন। সম্পত্তিতে বেহিসেব করেন নি। দু লাখ টাকা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজে জীবনে কোনদিন বসে খান নি। দু হাতে রোজগার করেছেন! তোমার মা ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তাঁর টাকা থেকে বড় কর্তার

ওই সম্পত্তি কিনে যে কাজ করে গিয়েছেন, তার তুলনা হয় না।

সুরেশ্বর বলেছিল—মায়ের টাকাটা দিয়ে আমি কীর্তিহাটে মেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুল করে দিতে চাই। ম্যাট্রিক ওখানে চলবে না—এম-ই স্কুল এবং ওটা ফ্রি হবে। মায়ের সম্পত্তি থেকে খরচ চলবে।

হরচন্দ্র বলেছিলেন—খুব ভাল কথা। তিনি পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তোমার মা। তাঁর জন্যে করবে এ তো খুব ভাল কথা। আর শ্রাদ্ধ? সে কি রকম করবে? আজ খবর আমি দিলাম। অবশ্য কীর্তিহাটেই সকলে। এক বড়বাবু আর বড়মা, তাঁরা তো কাল ছেলেদের কাছে শুনলাম এখানে আসছেন। কি একটা গোলমাল করেছে ছেলেরা তাই মেটাতে আসবেন। তা ওখানেও টেলিগ্রাম করে দিলাম। আমাদের কর্তব্য করতে হবে তো! কীর্তিহাটে করতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট, আমি বলি এখানেই কর। এখানকার মত ক'রে কর। কাল থেকে ভেবেছি। ছোটবাবু সায়েবী মেজাজের লোক ছিলেন। সামাজিক খুব ছিলেন না। এবাড়ীর সঙ্গে আগে কলকাতার বড় বড় বাড়ীর যোগাযোগ ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা, ওঁরা বলতে গেলে এ বাড়ীর মূল পত্তন ক'রে দিয়েছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন সিংজী রায়রাঁয়া, তিনিই লাট কীর্তিহাট কিনিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁরা আসতেন। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী, মহারাজার দেওয়ানবাড়ী এঁরা ছিলেন এক রকম অভিভাবক। বড়ই স্নেহ করতেন। রাণাঘাটের পালচৌধুরীরা আছেন ওঁরা খুব ভক্তি করতেন কর্তাদের। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পত্রাপত্র ছিল প্রায় সব রাজারাজড়াদের সঙ্গে। শুনেছি তোমার পিতামহ স্বর্গীয় দেবেশ্বর রায় মহাশয়ের বিবাহে দুটো বউভাত হয়েছিল। একটা কলকাতায় একটা কীর্তিহাটে। সব এসেছিলেন, এবং একটা ঘর ভরে গিয়েছিল জিনিসপত্রে। মূল্যবান মূল্যবান জিনিস দিয়েছিলেন। তারপর তোমার পিতামহ তো এখানে মহানামী মহামানী লোক ছিলেন। বড়বাবুর মানে তোমার জ্যাঠামশায়ের বিবাহেও এঁরা এসেছেন, তা ছাড়া বড় বড় সাহেব-সুবো এসেছেন। ছোটবাবু তোমার বাবাই এসব একরকম তুলে দিয়েছিলেন। কাগজে লিখতেন, কারুর খাতির করতেন না, যেতেন না বড় একটা কোথাও, ওই পার্টিটার্টি। তাতে তো সামাজিকতা বজায় থাকে নি। তা তুমি এবার সেটা কর। মায়ের শ্রাদ্ধে পুরনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নাও। কত খরচ হবে? শ্রাদ্ধে দশ হাজার টাকা খরচ করলে প্রচুর হবে। একবার কেবল নিজে যাওয়া। সে তো ভাল হবে, পরিচয় হয়ে যাবে!

•

সত্যই সে যেন এক নতুন জগতে এসে পড়ল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক তিরিশ সালে পার হয়েছে। আইন অমান্য আন্দোলন পার হয়ে গেছে। আন্দোলন সফল হয় নি এ কথা সত্য কিন্তু বছরের মধ্যে যেমন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু গাছের ফুল ফোটা শেষ হয়ে ফুলগুলি ঝরে, নতুন গাছে ফুল ধরে, নতুন ফসল ওঠে। মানুষের পরিচ্ছদ পাল্টায়, মন পাল্টায়, তেমনিভাবে আগেকার কাল, যে কালে এই সব বড় বড় বাড়ীর দিকে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে থাকত, সে কাল এখন বিগত ঋতুর মত; এই সব বাড়ী এই সব মানুষ

এখন শুকিয়ে আসা ফুলের মত আকর্ষণহীন। এদের সম্পর্কে সুরেশ্বরের নিজের মনোভাবও সুপ্রসন্ন নয়। তার কারণ সে জন্মাবধি তার সাহেবমনোভাবসম্পন্ন বাপের প্রভাবে প্রভাবান্বিত; তিনি সাংবাদিক হিসাবে ইংরেজকে সমর্থন করলেও এই সব দেশীয় জমিদার ধনীদের সমর্থক ঠিক ছিলেন না। এদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যা ছিল নিজের বংশাবলী থেকে তার সঙ্গে পরিচয়ও সুরেশ্বরের প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছে কীর্তিহাটে গিয়ে। তা ছাড়া এই নতুন কালের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া নতুন মানুষ সে। জমিদার বংশধর হয়েও—জমিদারীর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকার জন্য তার মন জোর পেয়েছিল—মনে মনে অনুভব করত এর জন্যে কোন কালি কোন গ্লানিই তাকে স্পর্শ করে নি। বাপের জোর ছিল, তিনি খেটে খেতেন। এই মনের জোরে সে এদের থেকে নিজেকে আলাদা ভেবেছে—আলাদা থেকেছে এবং মনে মনে অবজ্ঞা ঘৃণাও করেছে। কিন্তু নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে সে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হল।

মুগ্ধ করলে তাকে তাদের সৌজন্য, তাদের শীলতা। বিস্মিত হল সে এই দেখে যে, তারাও তার চেয়ে কম আধুনিক নয়। ভাল লাগল তাদের রুচি। চমকে গেল সে এই দেখে যে এদের অবস্থার চারিদিকটা পুরনো আমলের ভারী অলঙ্কারের গড়নের মত বেমানান এবং স্থূল হয়ে গেলেও—জহরতের ছটায় ও শোভায় জৌলুসের মত একটা জৌলুস এখনও বুকে ধরে রেখেছে।

কিছু কিছু এ-সব মানুষের ধারা-ধরন চাল-চলনে দম্ভ আছে, বিলাসের উগ্রতাও আছে; অনেকের ব্যভিচার মদ্যপানের প্রকাশ্য অখ্যাতিও আছে, কিন্তু এদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা ধারালো ছুরির মত বুদ্ধিদীপ্ত। বিদ্যানুরাগী। এটা হল তার প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রথম আত্মীয়বাড়ী নিমন্ত্রণ সেরেই সর্বাগ্রে সে গেল পাইকপাড়ার রাজবাড়ী। রাজা বিগত। তাঁর মা আছেন তিনি মানুষ করেছেন তিন পৌত্রকে। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, কুমার অমরেশচন্দ্র সিংহ, কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। কুমার বিমলচন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা হল। তার থেকে কম বয়স। সদ্য ম্যাট্রিক পাস করে প্রেসিডেন্সীতে পড়ছেন। কাঁচা সোনার মত দেহবর্ণ। বুদ্ধিবিদ্যা-দীপ্ত মন। এই বয়সেই সুরসিক ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। কিছুদিন আগেই এ বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথকে এনেছিলেন—তাঁর সঙ্গে বসে ফটো তুলিয়েছিলেন—সেই ফটোটা সামনেই টাঙানো রয়েছে। যামিনী রায় নন্দলালের ছবি দেওয়ালে ঝুলছে।

মিষ্টভাষী মানুষটির মুখে হাসি লেগেই আছে। অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করলেন তিনি। বললেন—নিশ্চয় যাব। আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো অতিনিকট এবং খুব প্রীতির। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দুর্নাম দেশের লোক যাই করুক—সেদিন তিনি পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় এগার ভাগের দশ ভাগ রেভেন্যু করেছিলেন বলেই আজও গভর্ণমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে। এবং যদি কোন দিন জমিদারী উচ্ছেদ হয় তবে সেদিন কম্পেনশেসন দেবার সময় এর উপকারিতা বোঝা যাবে। হেস্টিংস সাহেব যাবার সময় বলেছিলেন—**The regret which I cannot but feel, in relinquishing the service of my honourable employers, would be much embittered, were**

it accompanied by the reflection that I have neglected the merits of a man who deserves no less of them than of myself Gangagobinda Singh.

মস্ত বড় প্যাসেজ একটা। তা দেওয়ানজী রায়রাঁয়া বলতেন—হেস্টিংস সাহেব আমার জন্যে যা বলেছে আমাকে তাই বলতে হবে—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের জন্যে।

আরও কয়েকজনের কাছেই সে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিল। আবার বেশ কয়েকটি বাড়ীতে প্রাচীনত্বের কড়াকড়ি এবং মনের স্থূলতা দেখে তিক্ত হয়েছিল মনে মনে। দু-একজন বলেছিলেন—তাই তো হে—তোমার বাবা তো সাহেব বলে আমাদের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে নামকাটা সেপাই হয়েছিল। আমাদের গাল দিয়েই তো করে খেয়েছে বলতে গেলে। তা তুমি আমাদের খাতায় আবার নাম লেখাতে যাচ্ছ যে? তা বেশ বেশ!

এ ছাড়া সে তার কয়েকজন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রকেও নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিল। শিল্পী যামিনী রায়, অতুল বোস এবং তার বাপের বন্ধু কয়েকজন নামজাদা সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, তুষারকান্তি ঘোষ, সত্যেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও নিমন্ত্রণ করেছিল। শিল্পী যামিনী রায় তাকে স্নেহ করতেন। শিল্পরসিক তরুণ ছেলেটিকে ভাল লাগত তাঁর। অতুলবাবুও ভালবাসতেন।

এই যোগাযোগ বিচিত্রভাবে তাকে যেন অকস্মাৎ ফ্লাশলাইটের আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে সুপরিচিত করে দিলে, খ্যাতিমান করে তুললে। সে ভাবে নি এমন ঘটবে।

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে। সভামণ্ডপে দুখানি অয়েল পেন্টিং কলকাতার আধুনিক রীতি অনুযায়ী মালা দিয়ে সাজিয়ে দুখানি কাঠের চৌকির উপর রাখা হয়েছিল। তার মায়ের এবং তার বাপের।

সুরেশ্বর মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধে বসেছিল—অভ্যর্থনা করছিলেন তার মামা। প্রায় প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ওই ছবি দু'খানির দিকে। ছবি দু'খানির বৈশিষ্ট্য হল—যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। প্রতিজনেই বললেন—বাঃ, ছবি দু'খানি তো সুন্দর হয়েছে! সুন্দর ছবি!

মামা প্রবীর চ্যাটার্জি প্রত্যেককেই বললেন—ও সুরেশ্বরের নিজের আঁকা।

অতুল বোস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বললেন—খুব চমৎকার হয়েছে। মিস্টার রয়কে আমি দেখেছি। ছবি শুধু জীবন্ত নয়—তার সঙ্গে ক্যারেক্টার এসেছে। ওই যে হাসিটুকুতে ঠোঁট দুখানা অল্প একটু বাঁকা করে দিয়েছে একদিকে এবং চোখের তারা দুটোকে একটু করে একপেশে করে দিয়েছে তাতেই বলে দিচ্ছে What was he, ওর মাকে দেখিনি। বলতে পারব না—কিন্তু জীবন্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে অসাধারণ ছিলেন তিনি। And তাই ছিলেন তিনি! কিন্তু সুরেশ্বর ছবি আঁকে নাকি? কই একদিনও তো বলে নি!

তারিফ সকলেই করলেন। এবং একটু করে মিষ্টমুখ করাতে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রবীরবাবু বললেন—দেওয়ালে ছবিগুলোর অধিকাংশই ওর আঁকা!

যামিনীবাবু আসেন নি, তিনি ধ্যানী মানুষ এবং বেশী লোকসমাগমের মধ্যে তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তা ছাড়া সেটা উনিশ শো চৌত্রিশ সালের শেষ—তখনও তাঁর সাধনার খ্যাতি বিস্তৃত হয় নি। জীবনের সঙ্গে তিনি যুদ্ধই করেছেন।

অতুলবাবু বললেন—যামিনীদাকে তো বলতে হবে!

কুমার বিমল সিংহ বললেন—একদিন এসে তো ভাল করে দেখতে হবে সব!

* * *

এরপর বেশীদিন লাগল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার শিল্পী বলে খ্যাতি রটে গেল। যে আড়াল তার ছিল তার মা, তাঁর মৃত্যুর পর যেন শেষ আশীর্বাদে তাকে ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন। সে বিখ্যাত হয়ে গেল তার মায়ের ছবি থেকেই। এতকাল ধরে মায়ের বিষণ্ণ বেদনাময় জীবনের আবেষ্টনীর মধ্যে বাবার শেষজীবনের কৃতকর্মের গ্লানির জন্যে সে যে পলাতকের বা আত্মগোপনকারীর জীবন যাপন করছিল সেটা থেকে তার নিজের খ্যাতির আকর্ষণে বেরিয়ে প্রশংসার প্রসন্নদীপ্ত আলোকে এসে দাঁড়িয়ে উল্লসিত এবং কিছুটা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল।

মাস দুয়েকের মধ্যেই সে নিজের ছবির এক্‌জিবিশন করলে। উদ্বোধন করলেন যামিনী রায়। এবারে তিনি এলেন এবং প্রশংসা করে গেলেন। তিনি বক্তা নন তবে অকপটে সাদাসিধে কথায় বললেন—আমার ভাল লেগেছে। বেশ ভাল লেগেছে।

কাগজে প্রশংসা বের হল। কয়েকখানা ছবির ব্লক ছাপা হল। ভিড়ও হল। আলাপ হল নবীন শিল্পীদের সঙ্গে। কয়েকজন সাহিত্যিক এলেন, তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হল। প্রবাসীর কেদার চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন অমল হোম। কেদারবাবু দুখানা ছবি প্রবাসীতে ছাপতে চাইলেন।

সেইদিনই; সকলে চলে গেলেন আর সদলে এসে তাকে আমন্ত্রণ করলে সীমা এবং অসীমা। সদল মানে সঙ্গে কয়েকজন বান্ধবী!

—কি মহাশয়?

হেসে একটি সিগারেট ধরিয়ে সুরেশ্বর বললে—এস। সুস্বাগতম। কিন্তু প্রশ্নটা কি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে অসীমা বললে—সে প্রশ্ন যাই হোক আপাততঃ থাক। কিন্তু এটা কি? আঙুল দেখিয়ে মুখের সিগারেটটাকে দেখিয়ে দিল!

—ওটা সিগারেট। বেশ মূল্যবান সিগারেট। ফাইভ ফিফটি ফাইভ। গেস্টদের জন্য আনানো ছিল। তাঁরা খেলেন, আমার নাকে ধোঁয়াটা গেল, প্রশংসার মদ্যের নেশায় চিত্ত তৃষিত হল বস্তুটার জন্য। মনে হল নেশা জমবে বেশ! তাই আরম্ভ করলাম।

—ভাল! মাকে বলে দেব। সুরোদা, পিসীমার মৃত্যুর দু মাস না যেতেই সিগারেট ধরেছে!

—আর এক মাস পরে বলো। তখন কামানো দাড়ি আরও ঘন এবং চাপ বেঁধে বেরুবে এবং আমাকে একজন ঋষি বলে মনে হবে। সুতরাং বলবেন—না, এ ছেলে মহাপুরুষ ছেলে, একে কিছু বলা উচিত নয়। এর বদলে ঘুষ চাও তো খুব ভালো জর্দা অথবা বিলিতী দামী

লিপস্টিক যা চাও এনে দিতে প্রস্তুত আছি।

বলাবাহুল্য অসীমার মুখে পান ছিল—খুব সুবাসিত জর্দার গন্ধও উঠছিল এবং একটি বান্ধবীর ঠোঁটে লিপস্টিকের অনুরঞ্জনও ছিল।

লিপস্টিকমাখা মেয়েটি বললে—আপনার ছবি যত দুর্বোধ্য—আপনি কিন্তু তত সহজ এবং অকপট!

—আপনি সত্য বলেছেন। আপনার দৃষ্টি প্রখর।

—মিলিয়ে যাচ্ছি যে। আপনি সত্যই শাল্মলী তরু!

—হ্যাঁ। ভাগীরথীতটে কীর্তিহাট নামক গ্রামে বিশাল শাল্মলী তরু আছে একটি। আমি তারই চারা গাছ। কিন্তু আপনি মনে হচ্ছে বেত্রবতীতটের বেতসলতার সেই লতাটি যাকে স্থলতা বলা চলে। যার আঘাতে শুধু কাঁটাই ফোটে না দাগও বসে! কালসিটে পড়ে কেটে রক্তও পড়তে পারে।

সীমা খিলখিল করে হেসে উঠল গরবিনীর মত। তার দাদার ঠিক মনে আছে, ঠিক ধরেছে এবং ওই একটি কথার উত্তরে দশটি কথা শুনিয়েছে! জয়টা তার। স্থলতা উত্তর খুঁজছে, পাচ্ছে না।

স্থলতা লাল হয়ে উঠেছিল। সে আধুনিকা। বি এ পড়ে। অতি আধুনিক মনের ব্যারিস্টারের মেয়ে। পোশাকে তার ছাপ আছে। পরনে তার খদ্দরের শাড়ী। ঠোঁটে তার লিপস্টিক, পায়ে স্যাণ্ডাল। মাথায় রুখু চুলে বেণী। গোপনে রাজনীতি করে বলে রটনা আছে। ছাত্র-আন্দোলন সবে যেটা তখন শুরু হয়েছে তাতে সে প্রকাশ্যে পাণ্ডা।

স্থলতা বললে—ছবিতে আপনার ট্র্যাডিশন ভাঙার চেষ্টা সুস্পষ্ট কিন্তু সোশ্যাল কনসাসনেস নেই কেন?

—দুরূহ প্রশ্ন। সম্ভবতঃ আমার নিজের নেই বলে। না হলে ধরুন আর্টিস্ট হিসেবে আমি মনে করি ওটা ছবিতে না আসাই ভাল।

স্থলতা তর্কোদ্যত হয়ে উঠেছিল। কেন?

কিন্তু কথায় বাধা পড়েছিল। একজন চাকর এসে বলেছিল—দুটি মেয়েলোক এসেছে, বলছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে?

—ইডিয়ট। মেয়েলোক কিরে? মহিলা বলতে হয়। তা ডাক না এখানে।

—তারা বলছে একটু নিরিবিলি কথা বলবে।

—নিরিবিলি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে?

সীমা বললে—আমরা বসি। তোমার বাজনা না শুনে যাব না। তুমি শুনে এস কে কি বলছে! কারা—মেয়েছেলে আবার কে?

—কি করে এখান থেকে বলব?

—যাও তা হলে শুনে এস! আমরা ছবি দেখছি, চা খাচ্ছি। যাও।

সুরেশ্বর বাইরে বসবার ঘরে এসে অবাক হয়ে গেল! একটা প্রৌঢ়া, একটা যুবতী। সুন্দরী। পোশাক-পরিচ্ছদে চেহারার মার্জনায় এমনি একটা ছাঁদ তাদের মধ্যে রয়েছে যে ঠিক তার এতকালের জানা-চেনা কারুর সঙ্গে মেলে না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। না মেলে সামাদের সঙ্গে না মেলে কীর্তিহাটের বাড়ীর সঙ্গে, না মেলে সচরাচর কলকাতার পথে-ঘাটে রেলস্টেশনে যে সব বাঙালী মেয়েকে দেখা যায় তাদের সঙ্গে। এদের চেহারায় কোথায় প্রগল্‌ভতা আছে, মালিন্যের মত একটা কিছু আছে। প্রৌঢ়ার বিধবার সাজ কিন্তু হাতে সামান্য গহনা আছে। ফিতেপাড় কাপড় পরনে। গালে পানের একটা পুঁটলি, ঠোঁট দুটো কালো। মাথার চুলে আছে সে আমলের পাতা-কাটা! সুন্দরী যুবতী মেয়েটির পোশাক-পরিচ্ছদ এমন যে যৌবন রূপ সবকিছু একটা অত্যুগ্রতায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। না চিনলেও একটা আভাস যেন মিলছে, সবকিছু মিলিয়ে বলে দিচ্ছে দেহ এবং রূপ নিয়েই এদের কারবার।

তার ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে বললে—কি বলুন! কি চাই আপনাদের?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে তারা একটু বিহ্বল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—আমরা বাবুর সঙ্গে মানে সুরেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি আমাদের চেনেন।

—আমার নামই সুরেশ্বর রায়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তারা। প্রৌঢ়া আবার বললে—এ বাড়ীর মালিক।

—আমিই এ বাড়ীর মালিক।

—কিন্তু আপনি তো তিনি নন।

—তাহলে?

প্রৌঢ়া আবার বললে— নং জানবাজার সুরেশ্বর রায়। দেশ হল কীর্তিহাট।

—সে সব আমার পরিচয়!

—তাই তো বাবু! তবে কি জোচ্চুরি করে গেল কেউ?

যুবতীটি বললে—না-না জোচ্চোর সে নয়।

—হ্যাঁ। সুন্দর চেহারা। আপনার মত এমন সুন্দর নয়। তবে সুন্দর। একটু বয়স বেশী। তিরিশ বত্রিশ। গান-বাজনা জানে, সুন্দর কথাবার্তা—

সুরেশ্বর বললে—আপনারা কে?

—আমরা। আমরা বাবু—। একটু ভেবে নিয়ে বললে—বাবু, আমরা গান-বাজনা করে খাই। এ আমার মেয়ে। মিনার্ভা থিয়েটারে নাচত! আমরা থাকতাম বাবু রামবাগানে সেখানে এই বাবু থিয়েটারে একে দেখে বাড়ীতে এসেছিল। তারপর মাসখানেক খুব খরচপত্র করলে; আমোদ-আহ্লাদ করলে। নাম বললে সুরেশ্বর রায়। বাড়ী বললে এই ঠিকানা। আমরা অবিশ্বাস করি নি। তারপর হঠাৎ বললে—শেফিকে বাঁধা রাখবে। বাড়ী ভাড়া করবে। এখানে আসতে লজ্জা করে। বড়ঘরের ছেলে। বলে ভদ্রপাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে মেয়েকে চাকরী ছাড়িয়ে রাখবে। তারপরে হঠাৎ আজ পনের দিন একেবারে

নি-পাত্তা! খোঁজ নেই খবর নেই। মেয়েটা অধীর হয়েছে। ওদিকে বাড়ীওলা ভাড়ার তাগিদ দিচ্ছে। আমাদের হাতেও পয়সা নেই। অগত্যা এসেছিলাম বাড়ীতে তার খোঁজ করতে। ভাবনাও হচ্ছিল। অসুখ-বিসুখ কিছু হল কিনা? তা আপনি তো—।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সুরেশ্বর।

মেয়েটি বললে—তাহলে আমরা যাই বাবু, কিছু মনে করবেন না। আমরা তো জানতাম না।

কি বলবে সুরেশ্বর ভেবে পেলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা দুজনে উঠে দরজার কাছে গেল। মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে বললে—মা!

—কি?

দরজার পাশে টাঙানো সুরেশ্বরের মায়ের শ্মশানে চিতায় তুলবার আগের একটা গ্রুপ ফটো টাঙানো ছিল। সেই ফটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বললে—এই যে মা! এই দেখ! সে!

প্রৌঢ়া ঝুঁকে দেখে বললে—হ্যাঁ এই তো!

সুরেশ্বর এগিয়ে গেল।

তরুণীটি বললে—এই—এই! এই সে! সে আঙুল দেখালে।

সুরেশ্বর দেখলে। সে ব্রজেশ্বর, ধনেশ্বরের বড় ছেলে। সেই তাকে যে রাজা বলে তার প্রজাত্ব স্বীকার করেছে অত্যন্ত সহজ হাসিমুখে। যাকে তার মিষ্ট মনে হয়েছে। যার স্নেহ-প্রীতির মধ্যে এক বিন্দু কপটতা আছে সন্দেহ করে নি। যাকে সে মধ্যে মধ্যে আসতে বলেছে।

১১

ব্রজেশ্বর এসেছেও। অশৌচের সময় নিত্যই এসেছে। তার মায়ের শ্রাদ্ধে খেটেছে। এতটুকু কীর্তিহাটের প্রকৃতির পরিচয় পায় নি। কীর্তিহাটের বাড়ীর জ্ঞাতিদের ভার তার উপরেই ছিল। মেজঠাকুমা এসেছিলেন। তিন বছরে তিনি ম্লান হয়েছেন। চার বছর আগে দেখেছিল সে। তখন যে অপরূপ লাবণ্যটি ছিল সেটি ঝরে গেছে। একটু বিষণ্ণ হয়েছেন। ছেলেরা তাঁকে খেতে দেয় না। কোন খোঁজই করে না। এখান থেকে পঞ্চাশ টাকা মা পাঠাতেন, তাই তাঁর সম্বল। আর অন্ন, তাও এক বেলা মাত্র প্রয়োজন তাঁর—সে আসে রাজ-রাজেশ্বরেরও গোবিন্দজীর প্রসাদ থেকে। তিনি ব্রজেশ্বরের জন্য বলে গিয়েছিলেন—হ্যাঁ ভাই, ব্রজেশ্বর দেখি তোমাকে খুব রাজা রাজা করে, কি ব্যাপার?

সে বলেছিল—ব্রজেশ্বর-দা মোটের উপর লোক ভাল ঠাকুমা। কথাগুলি ভারী মিষ্টি, অন্তরটিও ভাল। আমাকে রাজা বলেন।

—হ্যাঁ। লোকের মন নিতে জানে। কিন্তু ভাই, মেলামেশা বন্ধুত্ব ওর সঙ্গে না হওয়াই ভাল।

একটু দুঃখিত হয়েছিল সে মনে মনে। মনে হয়েছিল, ঠাকুমা যেন সতীনের ছেলে নাতিদের প্রতি স্বাভাবিক ঈর্ষাবশে কথা বলছেন। তার কাছে বেশী আপন হতে চাচ্ছেন। সে বলেছিল— না। বন্ধুত্ব ঠিক ওঁর সঙ্গে আমার হতে পারে না ঠাকুমা। উনি চাকরী করেন, মারোয়াড়ী ধনীর বাড়ী তৈরী হচ্ছে তার তদ্বির তদারক করেন, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ। আলাপ আমার সঙ্গে মায়ের মৃত্যুর পর। আসেন, কিছুক্ষণ বসেন, চলে যান। টাকা কি কোন জিনিস তা চান নি। চাইলেও আমি দেব না। তবে চোর-টোর নন তো?

—না, তা নয়। তা বলতে পারব না।

—বেশ, তা হ'লেই হল। না-হলে নিকট-আত্মীয়, আপনারই নাতি, বারণ করব কি করে?

আর কোন কথা মেজঠাকুমা বলেন নি।

মেজঠাকুমা চলে গেছেন। যাওয়ার সময় তার মনে হয়েছিল, যেন অবিচার অন্যায় হল। তাঁর সঙ্গে কীর্তিহাটের সেই পরম আপনার জনটির মত ব্যবহার করা হল না। কীর্তিহাটের জ্ঞাতিদের সম্পর্কে সে শঙ্কিত ছিল, হয়তো এসে যেতে চাইবে না। কিন্তু ব্রজেশ্বরই তাদের ঠেলা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজে তাদের স্টেশনে নিয়ে গিয়ে টিকিট করে চাপিয়ে দিয়ে এসেছে। সুরেশ্বর মেজঠাকুমাকে যাবার সময় বলেছিল—ঠাকুমা, কাজকর্মের ভিড়ে একবার কাছে বসতে পেলাম না, সুবিধে অসুবিধে অনেক হয়েছে, কিছু যেন মনে করবেন না।

মেজঠাকুমা তার চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন—না ভাই, পরম সমাদরে থেকেছি। এখানকার ঐশ্বর্য এ আরাম এ তো কখনও জীবনে পাই নি। তোমাদের এতবড় কীর্তিহাটের বাড়ীতেও তো বোধ হয় কোনকালে ছিল না। আমি কাঙালের মেয়ে, দুদিন বুড়ো স্বামীর দৌলতে রাণী হয়েছিলাম। মান্য খাতির পেতাম। তাও শেষ হয়ে এখন আবার কাঙাল হয়েছি। আমাকে এমন ক'রে বলে না। তোমার মা পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাতো, তাতেই আজও স্বামী-শ্বশুর বংশের বউ সেজে বেঁচে আছি!

—টাকা আপনার ঠিক সময়ে যাবে যেমন যেত।

—যাবে বইকি। না গেলে চাইব। লিখব নাতিহুজুর, অধীনার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করতে হুকুম হোক। টাকা পাঠাও।

হেসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, দুটি জলের ধারাও নেমে এসেছিল চোখ থেকে। তার চোখও সজল হয়ে উঠেছিল। তিনি চলে গেলে মনে হয়েছিল ঠাকুমাকে থাকতে বললে হ'ত। এখানে থাকলে মায়ের অভাব পূর্ণ করতে না পারুন যত্ন করতে পারতেন। কিন্তু পরক্ষণেই শ্রাদ্ধের মধ্যে সদ্য খ্যাতি ও গৌরবের স্বাদ-পাওয়া, তরুণ আধুনিক মন বলে উঠেছিল—তুমি আর্টিস্ট, ছবি আর ফ্রেম এ দুটোর নিকটসম্পর্ক ভুলো না। এ ফ্রেমে ও ছবি কি মানায় না খাপ খায়। ডোণ্ট বি সিলি!—

তবু মন খারাপ করেই বসে ছিল। ব্রজেশ্বর স্টেশন থেকে ফিরে এসে বসে বলেছিল—বাপস! রাজা, তোমার ধৈর্য বটে! ওঃ! ঠাকুমার সঙ্গে যে ভাবে কথা কইলে তুমি! এবং এদের যে অত্যাচার এ ক'দিন ধরে সহ্য করলে! আমার তো নিজের গুষ্টি! আমি যে

এই ক'দিনে কতবার ওদের খ্যাঁক ঝ্যাঁক করেছি। আজ তুমি আমায় লজ্জা দিচ্ছ। ওঃ! তোমাকে সেলাম। এখন প্রজার জন্যে একটু চা হুকুম কর। আর কিছুদিন ওরা থাকলে তোমাকে পাগল করে দিত।

চা খেয়ে সে আর থাকে নি। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল, সে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। বলেছিল—আজ শনিবার ভাই, মিনার্ভা থিয়েটারে নেমন্তন্ন আছে—ওদের সঙ্গে খুব খাতির আছে। যাই। দু হপ্তা থিয়েটার দেখি নি।—হ্যাঁ—জগদীশ্বরকাকার ছেলেমেয়েদের গরম কাপড়-জামার জন্যে যে একশো টাকা দিয়েছিলে তুমি—তার ফেরত আছে পাঁচ টাকা ক' আনা। সেটা ভাই রাজা, রাখলাম আমি। আমার হ্যাণ্ড বড্ড টাইট। মাইনের টাকা পাই নি।

হেসেছিল সে।

সুরেশ্বর বলেছিল—টাকার দরকার আছে তোমার?

খুব হেসেছিল ব্রজেশ্বর, বলেছিল—এই না হলে রাজা? প্রজার চব্বিশ ঘণ্টাই টাকা চাই টাকা চাই টাকা চাই। আর রাজার তাতে বিস্ময়! কেন? না, টাকা সে কি করবে ভেবে পায় না।

পরিশ্রমের ঋণ শোধ করবার জন্যই সে তাকে কিছু দিতে চেয়েছিল, বলেছিল—কত চাই তোমার?

—যত দেবে রাজা। প্রজা ইজ অলওয়েজ পুয়োর। তার হাঁড়িটা শতছিদ্র। সে কলঙ্কিনী রাধা। তাকে ওই শতছিদ্র কুম্ভে জল এনে জালা ভরতে হয়! তা দাও না ভাই রাজা, একশোটা টাকা। বেশী দিলেও আপত্তি করব না। জামা কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে। তা ছাড়া কীর্তিহাটের রায়দের মেজ তরফের বড় ছেলের বড় ছেলে। সুদিন দেখেছি, সমাদর বলতে গেলে তোমার মতই ছিল। খুব ভাল জামা কাপড় একসময় পরেছি হে! প্রথম ষোল বছর পর্যন্ত ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি ছাড়া পরি নি। কিছু করিয়ে নিই।

নায়েবের কাছে টাকা চাইতে সুরেশ্বরের সঙ্কোচ হয়েছিল। নায়েব জানতে চাইবেনই এবং একটু আপত্তিও করবেন। তা ছাড়া রায়বাড়ীর তারই জ্ঞাতির অপমান হবে সেটাও তার মনে লেগেছিল। তার নিজের কাছে দেড়শো টাকা ছিল, তাই বের ক'রে সে তাকে দিয়েছিল।

এরপর কয়েকদিনই ব্রজেশ্বর আসেনি। তারপর এসেছিল সে চমৎকার সাজসজ্জা করে। ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, চকচকে সেলিম স্যু প'রে এসেছিল। গায়ে সেন্টের গন্ধ। হেসে বলেছিল—জয় হোক রাজা! প্রজা তব হইয়াছে সুখী! এই তো রাজার ধর্ম! প্রজানুরঞ্জন! সেদিন গানবাজনা ক'রে, অনেকক্ষণ থেকে, রাত্রি আটটায় সে গিয়েছিল।

তার এগজিবিশনে সাজানোর কাজেও সে যথেষ্ট খেটে গেছে। পরশু পর্যন্ত এসেছিল। তারপর কাল আজ সে আসে নি। তার অভাব সে অনুভব করেছে। সেই ব্রজেশ্বর, এই করেছে। করেছে, মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে—যায় আসে, তার বিরুদ্ধে বলার তার কিছু নেই। কিন্তু তার নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে। একসঙ্গে সুরেশ্বরের মুখে অতি সূক্ষ্ম

একটি বক্র তিক্ত হাস্য দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কপাল কুঁচকে উঠল !

মেয়ে দুটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বললে—ওর নাম সুরেশ্বর নয়, ওর নাম ব্রজেশ্বর। আমার জ্ঞাতি বটে। চিনি তাকে।

—কোথায় থাকে সে বাবু ?

—তা আমি জানি না। কোন দিন জিজ্ঞাসা করি নি।

—বাবু !

—বল !

—সে তো আপনার নিজের লোক—। আমাদের যে বড় বিপদ বাবু ! ধারে মদ খেয়ে গেছে। আমরা আনিয়ে দিয়েছি। ভাড়া বাকী। আজ না দিলে কাল সকালে জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেবে। তা আপনি দিয়ে—যদি তার কাছে—

—না। অত্যন্ত রূঢ়স্বরে সুরেশ্বর বললে।

সে কণ্ঠস্বরে তারা চমকে উঠল ভয়ে।

—চল মা চল !

—দাঁড়াও। তোমাদের ঠিকানা দিয়ে যাও। সে যদি এখানে আসে তবে লোক দিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

—মেয়ের নাম শেফালি বাবু। ঠিকানা—নতুন রাস্তা, সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু আর বিডন স্ট্রীটের ধারে। ৫-নম্বর রাম ঘোষের গলি। ওই মনোমোহন থিয়েটারের পেছনে। তখনও সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু শ্যামবাজার পর্যন্ত আসে নি—ওই বিডন স্ট্রীটে মনোমোহন থিয়েটারের সামনে পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছিল। বুঝতে দেরী হল না তার। ব্রজেশ্বরও কাছাকাছি কোথাও থাকে। বিডন স্ট্রীটেই কোথায় যেন মারোয়াড়ীটির বাড়া তৈরী হচ্ছে। সে এবার ডাকলে—রঘু !

রঘু দরজার পাশেই ছিল। সে ভিতরে এল, সুরেশ্বর বললে—এদের নিচে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দে।

তারা চলে গেলেও সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সীমা অসীমা সুলতা ঘরে বসে আছে।

ফিরে আসতেই সীমা বললে—বাবাঃ ! ওরা কে ?

—প্রশ্ন করো না। উত্তর দিতে আবার কষ্ট হবে। সম্ভবতঃ দিতে পারব না !

—ওরা ভদ্রঘরের মেয়ে ?

—উঁকি মেরে দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কথা শোন নি ?

—শুনে বুঝতে পারি নি।

—তা হ'লে থাক।

—বাঃ—অভদ্র মেয়েরা তোমার বাড়ী আসবে। জিজ্ঞাসা করব না?

—না করাই উচিত। জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমিও ওদের চিনি না—ওরাও আমাকে চেনে না।

—তবে এল কেন?

—এল, আমার না হলেও আমার বংশের কারুর দায় আছে।

এতক্ষণে সুলতা বললে—ওদের কিছু সাহায্য করলে পারতেন আপনি। মুখ দেখে বড় বিব্রত মনে হল!

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে সুরেশ্বর তাকিয়ে রইল। মুগ্ধ হয়ে গেল সে। মুখের দিকে অসঙ্কোচে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে থেকেই বললে—ঠিক বলেছেন। কিন্তু—!

—কিন্তু কি?

—আপনি অদ্ভুত!

লাল হয়ে উঠল সুলতা।

সুরেশ্বর বললে—আমি শাল্মলী বৃক্ষের চারা কিন্তু আপনি বেত নন। অত্যন্ত নরম লতা। মালতী বললে রাগ করবেন।

—এখন আপনার বাজনা শোনান!

বাজনা সে শুনিয়েছিল। এবং সারাটা দিন সুলতার কথাই ভেবেছিল। ওর কথার টানে ওই মেয়ে দুটির কথাও এসে পড়েছিল বারবার ঘুরে ঘুরে।

ওদের কিছু দেওয়া উচিত ছিল। সুলতা বললে—ওদের মুখ দেখে মনে হল ওরা খুব বিব্রত।

মুখের দিকে বার দুই তাকিয়েছিল সে। মেয়েটির রূপ আছে। কিন্তু বেশভূষাতে সে রূপে বেশী চড়া রঙের শেড দিয়ে ফেলেছে। ভালগার হয়েছে তাতে। তাই জন্যে তাকাতে পারেনি। সুলতার মুখেও রঙ ছিল। ঠোঁটে লিপস্টিক ছিল। চুল রুখু ছিল। দুটোতে আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে।

ব্রজেশ্বরের উপর রাগ হয়েছিল। রাস্কেলের কি শয়তানি বুদ্ধি! তার নাম ব্যবহার করেছে। কেন? মনে হয়েছিল, তাকে বিপন্ন করবার জন্যে? কিন্তু তাই বা কি ক'রে করবে? তবে? তা হলে একটু বড়লোকী আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার জন্য? তা হয়তো হবে। ব্রজেশ্বরের কথাবার্তা মনে পড়েছিল। মিষ্টিমুখ, চতুর। ধনেশ্বর রায়ের ছেলে। ওর পক্ষে এ আর বিচিত্র কি? একটু হাসিও পেয়েছিল।

সারাটা দিন কথাগুলো ঘুরছিল মনের মধ্যে। তারই মধ্যে সন্ধ্যার পর মনে হয়েছিল, কাল সকালেই ওদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে মেয়ে দুটিকে পথে বের ক'রে দেবে। ভাড়া বাকী আছে, ধার পড়ে আছে। অস্বস্তি অনুভব করতে করতে হঠাৎ সে একসময় উঠে পড়েছিল ইজিচেয়ার থেকে। কিন্তু—।

টাকা? নায়েব ম্যানেজারকে সুরেশ্বর শুধু সঙ্কোচই করে না—অভিভাবকের মত ভয়ও করে। হঠাৎ মনে পড়েছিল আজ চারখানা ছবি দেড়শো টাকায় বিক্রী হয়েছে—সেটা তার আলমারিতে আছে এবং তার হাতখরচের টাকাও আছে। সে দুশো টাকা বের ক'রে নিয়ে

একটা জামা টেনে মাথায় গলিয়ে প'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ডাকলে—রঘু!

—বাবু!

—আমি একটু বেরুচ্ছি। হঠাৎ কৈফিয়তের প্রয়োজন অনুভব করলে, বললে—একজনের সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার, ভুলে গিছলাম। বুঝলি!

—গাড়ী বলব?

বাড়ীতে একখানা ব্রুহাম গাড়ী আছে। সে সেই তার বাবার আমল থেকে। সেটা হেমলতা ঘোচান নি। আবার মোটরের যুগ উঠেছে, মোটরও কেনে নি। সুরেশ্বর বললে—গাড়ী? তারপর বললে—না। বলে বেরিয়ে চলে গেল। জানবাজার থেকে হেঁটে চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। একটা ভুল হয়ে গেছে। মনে ছিল না এটা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ। শীতটা ক'দিন গাঢ় হয়ে পড়েছে। শুধু আলখাল্লার মত একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গায়ের আলোয়ানটার প্রয়োজন অনুভব করলে। হ'লে অন্তত ভাল হত। থাক। সে চৌরিঙ্গী পার হয়ে এসে আবার একটু দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি নিলে একখানা। ট্রামে সে বড় একটা চড়ে না। হয় হেঁটে, নয় বাড়ীর ব্রুহামে, নয় ট্যাক্সিতে চড়ে। দিনের ভাগে প্রায়ই চরণবাবুর জুড়ি। মানে হেঁটে।

ট্যাক্সিতে চড়ে বললে—চলিয়ে বিডন স্ট্রীট আর সেন্ট্রাল এ্যাভেনু জংশন।

১৯৩৪।৩৫ সালের কলকাতা; কলকাতায় লোকসংখ্যা হয়তো দশ পনের লক্ষ। গাড়ীই বেশী, মোটর কম—বাস হয়নি। ট্রামে ভিড় নেই। বেলা বারোটা থেকে ট্রাম ফাঁকা ছোটে। রাত্রি আটটার পরও তাই। ট্যাক্সিখানা প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছিল। বাইরে কনকনে হাওয়া গাড়ীর ভিতর ঢুকে তাকে শীত ধরিয়ে দিল। সে কাচ বন্ধ করে দিয়ে বসল। হঠাৎ বললে—রোখিয়ে তো সর্দারজী! বাঁয়া তরফ।

গাড়ী রুখলে সে। গাড়ী থেকে নেমে এক বাক্স গোল্ডফ্লেক সিগারেট দেশলাই কিনে নিলো, যেন একটা উত্তেজক কিছুর দরকার ছিল। ঠাণ্ডায় যে শীত তার থেকে আলাদা একটা কিছুর তাড়না তার বুকের স্পন্দনকে দ্রুততর করে যেন একটু কাঁপুনির সৃষ্টি করেছিল। গাড়ীর ভিতর বসে সিগারেট ধরিয়ে সে একটু আরাম পেলে।

বিডন স্ট্রীটে এসে নেমে তার ভাবনা হল—এই বাড়ী কোথায় পাবে? কি ভাবে বের করবে, কি বলে ঢুকবে? ব্যাপারটা এবার তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। অভিজ্ঞতা নেই। বলতে গেলে এ অঞ্চলে কয়েকবার থিয়েটার দেখতে আসা ছাড়া এমনি কখনও আসে নি! কিন্তু পড়ে-শুনে একটা ধারণা আছে—তবে সেটা বেশ সহজ সরল নয়।

সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলে ফিরে যাই। পিছনে একটা পানের দোকান। সেখানে হিন্দুস্থানী পানওয়ালা পান বেচছে। সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বেশ পাঞ্জাবি পরা, পাকানো গোঁফ, তেল-চকচকে চুলে বাহারে টেরী হিন্দুস্থানী হাসছে গল্প করছে। মধ্যে মধ্যে রিক্সা করে বাবু চলছে মালা গলায়। রজনীগন্ধার মালা। গোড়ের মালা এখন নেই। একজন একটা খড়-জড়ানো কাঠে-গোঁজা গোলাপ ফুলের কুঁড়ি এবং ফুল বিক্রী করছে। হাঁকছে—চাই ফুল!

হঠাৎ একজন হিন্দুস্থানী এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে—বহুৎ আচ্ছা বিবি, বাবু সাহেব!

দেখিয়ে গা ?

সুরেশ্বর নার্ভাস হল। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে নার্ভাসনেসের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিল। এ-প্রশ্নে সে বেশ একটু দমে গেল। উত্তর দিল না।

—বাবুসাহেব!

—না!

—তব ইখেনে দাঁড়িয়ে কেনো ?

এবার সে সাহস সঞ্চয় করে বললে—একটা বাড়ী খুঁজছি, বাতলে দিতে পার ?

—হ্যাঁ। বাতাইয়ে।

ঠিকানাটা বললে সে। এবং বললে—ওখানে শেফালি বলে একটি মেয়ে থাকে, তার বাড়ী।

—হাঁ-হাঁ। জরুর জানি। উ তো মিনার্বার সখী ছিলো। আব এক বাবু উসকে রাখিয়েসে। আসেন। লেকিন বকশিস লিবো হামি!

—চল!

সে একটা সংকীর্ণ গলিপথ। দুধারের বাড়ীর দরজায় আলো জ্বেলে বসে দাঁড়িয়ে নানান সাজে সাজা মেয়ের দল। নানান বাড়ী থেকে গান ভেসে আসছে। শিউরে উঠল সে। শীত তার বেশী ধরে গেল। প্রায় প্রতি ঘরের দরজা থেকেই ইঙ্গিতে আহ্বান করছিল তারা। সরব আহ্বানেও ডাকছিল—আসুন না! অ বাবু!

হিন্দুস্থানীটা বললে—বাবু শেফালির কামরামে যাবেন। মিনার্বার শেফালি।

—আমি শেফালির চেয়ে ভাল। তাকিয়ে দেখুন। বলে হেসে উঠল মেয়েটা।

সে মাটির দিকে চেয়েই পথ চলছিল। আর সিগারেট টানছিল।

মনে হচ্ছিল পা থেকে মাথার দিকে সন্-সন্ করে একটা কিছুর স্রোত বইছে। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে। হাত ঘামছে। মনে অনুতাপ হচ্ছিল। নিজের উপর রাগ, তার চেয়েও বেশী রাগ হচ্ছিল ব্রজেশ্বরের উপর। তাকে পেলে সে তার পায়ের জুতো খুলে মারতে পারত।

—এহি বাড়ী বাবুজী!

বাড়ীর দরজায় দু-তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে। এখানটায় এত ভিড় নেই। যে-মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিল, তার মধ্যে শেফালি নেই। সুরেশ্বর বললে—জিজ্ঞেস কর তো শেফালি আছে কিনা! হয়তো লাঞ্ছনার ভয়ে আগেই বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে থাকতে পারে।

একটি মেয়ে বললে—কাকে খুঁজছেন ? শেফালিকে ?

—হ্যাঁ।

—তার ঘরে হুজ্জুত চলছে। ভাড়া বাকি, বাড়ীওলী পা লাগিয়ে বসেছে। টাকা দেওয়ার কথা ছিল, দিতে পারে নি। তার বাবু ভেগেছে। সেখানে সুবিধে হবে না। হেসে উঠল সে—তা আমার ঘরে আসতে পারেন।

—আমাকে ভিতরে যেতে পথ দিন।

—হামার বকশিশ বাবু!

—কত ?

—সেলাম, খুশীসে দো-চার রূপেয়া দেদিজিয়ে !

চারটে টাকাই তার হাতে দিয়ে দিলে সে। বললে—চল ভিতরে গিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দেবে।

—জরুর ! বলেই সে সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াল। মেয়ে দুটি তাকে পথ দিল সরে গিয়ে। তাকে ডাকলে—আইয়ে হুজুর !

ঘুপচি কুয়োর মত একটা উঠোন। তার চারিপাশে ঘর। সব ঘরেই দরজা প্রায় ভেজানো। ভিতরে আলো জ্বলছে। কোন ঘরে হাসি-উল্লাস, কোন ঘরে গান, কোন ঘর প্রায় স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে কথা ভেসে আসছে। তারই মধ্যে একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে লোকটা ডাকলে—শেকাইলি বিবি !

সামনেই ওপাশে একখানা ঘরের দরজা খোলা। দরজায় বসে আছে একটি স্থূলাঙ্গী মেয়ে। নীচ হাত খালি—উপর হাতে তাগা আলোর ছটায় ঝক-ঝক করছে। তার ওদিকে ঘরের মধ্যে শেফালিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মাথা হেঁট করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। বেশ নেই, ভূষা নেই, হেট-করা মাথা থেকে খোলা চুল কিছু সামনে এসে পড়েছে। ডাক শুনে সে মাথা তুললে। আলোর ছটা মুখে পড়ল। স্বরেশ্বর দেখতে পেলে, মেয়েট কাঁদছিল। এবার স্বরেশ্বর সহজ হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে হিন্দুস্থানীটিকে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে গেল শেফালি।

স্বরেশ্বর বললে—তোমার মা কই ?

—সেই বাবু মা। বিহ্বলকণ্ঠে বললে শেফালি। ঘরের কোণ থেকে এবার উঠে এল তার মা। শেফালিও উঠে দাঁড়াল। তার মায়ের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে স্বরেশ্বরের ঐশ্বর্য দেখে এসেছে। এবং আরও দেখে এসেছে আজ তার বাড়ীতে বড় বড় লোকের ভিড়। তারা যখন গিয়েছিল, তখন ওই ভিড় দেখে বাড়ীতে ঢুকতে সাহস করেনি। অন্য লোককেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করছিল একটু দূরের এক ভুজাওলাকে—ও-বাড়ীতে কি হচ্ছে ? তারা বলেছিল—এগজিবিশন ! তসবীরের এগজিবিশন ! ছবির গো ছবির। ওহি বাড়ীর মালিক বহুত লায়েক আদমী। বহুত নাম। উনি তসবীর আঁকিয়েছেন, ওহি দেখনে লিয়ে বড়াবড়া আমীর, বড়াবড়া ভারী-ভারী আদমী আসিয়েছেন !

ওরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিল। শেফালির গৌরব-গর্বের অন্ত ছিল না, তার বাবুর এত ঐশ্বর্য, এত গৌরব। তারপর সকলে চলে গেলে ভিতরে ঢুকে ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিল। তারপর যখন স্বরেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। স্বরেশ্বরের ব্যক্তিত্ব, তার আকার অবয়ব দেখে নিতান্ত ছোট হয়ে পড়েছিল। কথায়বার্তায় ভয় পেয়েছিল। স্বরেশ্বর একবার রূঢ়কণ্ঠে 'না' বলেছিল, তাতে চমকে উঠেছিল দুজনেই। সেই মানুষ তাদের এই কদর্য পঙ্কপল্বলে নিজের পা-দুখানাকে হাঁটু পর্যন্ত কর্দমাক্ত করে এখানে এসেছেন। বুঝতে পারছিল না তারা। কিন্তু ওরা দেহব্যবসায়িনী, ওরা

দুনিয়ায় দেহের চাহিদার বিচিত্র তত্ত্ব নিপুণভাবে বোঝে। মা মেয়ে দুজনের মুখ-চোখই পরমুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল। মা বললে—আসুন, বাবা আসুন।

তারপরই দরজায় বসে-থাকা স্থূলাঙ্গীকে বললে—এখন যাও দিদি। পাবে বইকি। দেব বইকি। উনি দাঁড়িয়ে আছেন। মস্ত-বড়লোক, রাজার ছেলে, তার চেয়েও বড়। এখন যাও—

সুরেশ্বর বললে—উনি ভাড়া পাবেন?

স্থূলাঙ্গী বললে—হ্যাঁ বাবু, আমি দু'মাসের ভাড়া পাব। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ঘর ভাডা করে তারপর—

—কত পাবেন?

—দু'মাসের ভাড়া ষাট টাকা। বাড়ীর সব থেকে ভাল ঘর বাবু। আলাদা কল, আলাদা সব।

একখানি একশো টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললে সুরেশ্বর—তিন মাসের ভাডা মানে আগামী মাসের ভাড়াও নিয়ে রাখুন। বাকি টাকাটা—। কি যেন মদের ধার আছে বলেছিলে তুমি? কার কাছে?

—সেও আমার কাছে। সেও কুড়ি টাকা।

আর একখানা একশো টাকার নোট সে শেফালির মায়ের হাতে দিয়ে বললে—ওকে দশ টাকা দিয়ে বাকি টাকাটা তোমরা রাখো। এক মাসের মধ্যে তোমরা যা হয় কাজ দেখে নিয়ো। বুঝলে! আমি চললাম।

—চললেন?

—হ্যাঁ। সে ফিরল।

—বাবু! বাবু! আপনার পায়ে ধরছি! বাবু!

এক্ষেত্রে বোধহয় নাটক করার লোভ সম্বরণ কেউ করতে পারে না। সুরেশ্বরও সম্বরণ করতে পারলে না। সে ফিরল না—সে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। যে-নাটকটি হয়ে গেল উপরে, সে নাটকটির বেগ এবং গতি এত প্রবল এবং তীক্ষ্ণ যে, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সে নামতে নামতেই নিচে এসে গিয়েছিল। ফলে দরজা ফাঁক করে তাকে সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে দেখলে। দরজায় যে-দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা দরজা থেকে সরে এসে তখন উঠোনে দাঁড়িয়েছে। সে আবার থমকে দাঁড়াল। তার এখন সাহস হয়েছে। অন্তর শুধু তৃপ্তি নয়, তার সঙ্গে অহঙ্কারেও পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

তারা প্রগল্‌ভতা করলে না। একজন বললে—কি?

—কত উপার্জন কর তোমরা?

অবাক হয়ে গেল তারা। উত্তর কি দেবে বুঝতে পারলে না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—এই শীতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। এই তো ফিনফিনে পোশাক। শীত করে না? কষ্ট হয় না?

করুণভাবে একটি মেয়ে বললে—খাব কি বাবু?

পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বের করে তাদের দুজনের হাতে দিয়ে বললে—আজকের দিনটে আর কষ্ট করো না। রাত্রি বোধহয় দশটা বাজে!

বলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এল। তার পিছন পিছন আসছিল সেই হিন্দুস্থানীটি। সে-ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেছে। এইসন শরীফ-আমীর সে তার জিন্দগীতে দেখেনি। কানেও শোনে নি। হ্যাঁ শুনেছে বটে—বাদশাহী জমানাতে। এ-জমানাতে নয়!

সে তাকে কিছু বলতেও সাহস করলে না। সুরেশ্বর এসে আবার দাঁড়াল। সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যুর মোড়ে। একটা ট্যাক্সি চাই।

লোকটা এসে শুধু বললে—হুজুর!

—একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পার?

—ট্যাক্সি মিলবে না হুজুর, ঘোড়ারগাড়ী ডেকে দিই।

—আচ্ছা। ওই তো আড্ডা। আমি নিয়ে নিচ্ছি। দীর্ঘ পদক্ষেপে এসে সে একখানা গাড়ীতে চেপে বসে বললে—জানবাজার।

মনে মনে একটা নেশা লেগেছিল। আশ্চর্য একটা নেশার ঘোরের মত। ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে এই সদ্য সমাপ্ত দৃশ্যটার টুকরো টুকরো ছবি মনে ভেসে উঠছিল এবং গভীর তৃপ্তি অনুভব করছিল। গাড়ীর পিছনের সিটটায় বসে সামনের সিটের কোণের দিকে চেয়ে যেন ছবিগুলো দেখছিল। ঘুরে ঘুরে শেফালির একটা ছবি মনের সামনে আসছিল। প্রথম তাকে যেমন দেখেছিল—সেই ছবি। সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল মেয়েটি, মুখ আধখানা দেখা যাচ্ছিল উপরের দিকটা। ভুরুর নিচে চোখ পর্যন্ত। কতকগুলো রুখু চুল কপালে এসে পড়েছিল। অত্যন্ত সকরুণ। গাড়ীর ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে সেই স্মৃতির ছবিটা যেন সে স্পষ্ট দেখছিল। সিগারেট টানাও সে ভুলে গিয়েছিল এবং সিগারেটটা পুড়েই যাচ্ছিল ধোঁয়ার একটি আঁকাবাঁকা রেখা তুলে। অনুভব করছিল নিঃশ্বাস দিয়ে। তার শিল্পী-মন আপসোস করছিল। একখানি সুন্দর ছবি হত। অতি সুন্দর ছবি হতে পারত। হঠাৎ হাতের আঙুলে গরম লাগায় আঙুল সরিয়ে নিয়ে আগুনের ছেঁকা খেলে। সচেতন হয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে সে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ফিরে গেলে হয় না?

খানিকটা নড়েচড়ে বসে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললে। আঁকবার কোন সরঞ্জাম নেই, গিয়ে কি হবে? তাছাড়া সে-মুহূর্ত তো আর ফিরবে না!

গাড়ীটা ততক্ষণে ধর্মতলায় পৌঁচেছে। বাইরে ব্রিস্টল হোটেল—একটু দূরে মেট্রোতে এবং অন্য দোকানগুলোতে আলো ঝলমল করছিল। সায়েব-মেমের ভিড় চলেছে। ফিরিঙ্গী এবং দেশী ক্রীশ্চান মেম-সায়েবগুলো এদিকে-ওদিকে ঘুরঘুর করছে।

সব ভেসে যাওয়া ছবি যেন। গাড়ীটা কর্পোরেশন স্ট্রীটে ঘুরল। কর্পোরেশন স্ট্রীটের নতুন নাম হয়েছে—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড।

গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় লাগল। নামল সে। ভাড়া দিয়ে সে উপরে উঠে গেল। বসল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে গিয়ে ক্যানভাসের উপর কয়লার স্টিক দিয়ে ওই ছবিটা আঁকতে

চেষ্টা করলে। কিন্তু হল না।

শুধু একটা উত্তেজিত অস্থিরতায় পায়চারি করলে ঘরের ভিতর। হঠাৎ একবার মনে হল ছবির সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে যাবে সে ?

নাঃ। তবে কি করবে সে ? একটা কিছু করার যেন প্রয়োজন। ওই মেয়েটার সেই মুখচ্ছবি ভাসছে। রাস্তার ধারে দরজায় দাঁড়ানো মেয়েগুলোর সেই শীতে কষ্ট পাওয়ার ছবি মনে পড়ছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে চিঠির কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসল সুলতাকে। হঠাৎ সুলতাকে মনে পড়েছে। সেই তাকে বলেছিল—মুখ দেখে মনে হল বড় বিব্রত। কিছু দিলে পারতেন।

১১

ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লিখলে সুলতাকে। লিখলে—আপনাকে ধন্যবাদ, শত-সহস্র ধন্যবাদ না জানিয়ে মন তৃপ্তি পাচ্ছে না। আমার দৃষ্টিতে আপনি অস্ত্রোপচার করেছেন আজ। আমি দেখতে পাই নি—আপনি দেখতে পেয়েছিলেন, সকালের ওই মেয়ে দুটির মুখের মধ্যে বিব্রত বিপন্ন হওয়ার লক্ষণ। গাছের মাথায় ঝড়ের আগে ছায়া নামা আমি দেখেছি। ঝড় ওঠবার লক্ষণ দেখা দিলে আমি ছাদে উঠে দেখেছি পশ্চিমদিকে ময়দানের গাছগুলোর মাথায় ছায়া পড়ে। ছায়াই শুধু পড়ে না। গাছগুলোও নিঝুম হয়ে নেতিয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের মুখে ওটা দেখতে পাই নি। আপনি পেয়েছিলেন, আমাকে বলেছিলেন, কিছু দিলে পারতেন। সারাটা দিন কথাটা আমার মনে ঘুরেছিল। সন্ধ্যার পর মনে হয়েছিল—ওরা বলেছিল, কাল সকালেই ওদের বিপদ ঘটবে। সব কেড়ে নিয়ে বের করে দেবে পথে। তাই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছিলাম। এবং সব সংকোচ জয় করে যখন ওদের আস্তানায় উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম, ঝড়ের ঝাপটা নেমেছে। সেই ঝাপটায় মেয়েটিকে দেখলাম, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাথা নিচু করে কাঁদছে, মাথার চুল কপালে নেমে ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক ঝড়ে বিধ্বস্ত লতার পল্লবের মত। আমি টাকা দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে এসেছি। এবং যে কৃতজ্ঞ-দৃষ্টির অভিষেক নিয়ে এসেছি, তা আমার জীবনের সব অপবাদের পঙ্কলেপনের মাঝখানে একটি চন্দনতিলক পরিয়ে দিয়েছে। আমি এই মুহূর্তেও অনুভব করছি—আমি দেবকুমার হয়ে গেছি।

মানুষের পাপপুণ্য, নিন্দা-প্রশংসার সব খোলস খসে পড়েছে। আপনার মন আশ্চর্য মন। পরশ-পাথরের মত। সে-মনের স্পর্শ পেয়ে আমার মন সোনা হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। ফিরে এসেই পত্র লিখছি আপনাকে। ইতি—সুরেশ্বর রায়।

এই খুশী-মনের জের তার আর ঘোচে নি বা মোছে নি। পরদিন সকালে উঠেও সে অনুভব করেছিল যে গ্লানি তার জীবনটাকে ভার করে রেখেছিল—তা যেন সব ঘুচে গেছে। সকালে

উঠেই সে ছাদের উপর উঠেছিল অকারণেই। তখন জানুয়ারী মাসের শীত। তারই মধ্যেই সে ছাদে উঠে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিচে নেমে এসে বাজনা নিয়ে বসে ছিল।

রঘু চা-টোস্ট-ডিম নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—আজও আবার সব লোকজন আসবে তো ?

—নিশ্চয়ই ! রঘুপতি রাঘব রাজারাম—তুমি ভাব কি ? একজিবিশন এখন সাতদিন খোলা থাকবে। দশটা থেকে বারোটা। আবার চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা।

—খাবার-দাবারও আনতে হবে তো ?

—তাও আনতে হবে। তবে কালকের মত নয়। অল্প পরিমাণে। সিগারেট আনবে। আর একখানা চিঠি ফেলতে হবে। না—থাক। আমি নিজে ডাকে দিয়ে আসব। এক্ষুনি বেরুব।

চিঠিখানা আজই পৌছুনো চাই সুলতার কাছে। সকালে জি-পি-ও-তে ফেললে বিকেলে পাবেই। চিঠি পেয়ে সুলতা বিস্মিত হয়ে আসতেও পারে ! বেরিয়ে গেল সে চা খেয়েই। হেঁটেই গেল। জানবাজার থেকে জি-পি-ও কাছেই।

বিকেলে কিন্তু সুলতা আসেনি। তবে সে-কথা নিয়ে ব্যস্ত হবার বা ভাববার সময় পায় নি। কারণ, একদল তরুণ শিল্পী এসেছিলেন · কেউ কিউবিস্ট্, কেউ ফিউচারিস্ট।—কেউ বা অন্য কিছু। তাঁরা খুশী হলেন। এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ হৃদ্যপরিচয়ে পরিচিত হয়ে গেলেন। তাঁদের দল আছে। বললেন—আমাদের দলে আসুন।

সে চৌবাচ্চায় বন্দী মাছের ওপরে জলস্রোতের শব্দ এবং ইসারায় আহ্বান পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরিচয় এমনই গাঢ় হল যে, সেইদিনই সে তাদের বাজনাও শুনিয়ে দিলে—এস্রাজ-বেহালা।

এর মধ্যে সময় যে কেমন করে উড়ে গেল তা দলের কারুরই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একজন বললে—ওরে সর্বনাশ ! আটটা যে বাজে বাজে ! আমি উঠলাম। তখন নতুন করে কফি এবং খাবারের কথা বলেছে সুরেশ্বর। সে বললে—সে কি ?

ভদ্রলোক বললেন—না ! আটটার পর কফি—না স্যার ! আবার আসব। নিয়ে যাব আপনাকে। আজ ছুটি !

অন্য একজন বললেন—উনি ড্রিংক করেন।

সুরেশ্বর বলে উঠল—বেশ তো। তাই আনাচ্ছি। বসুন।

—খুব ভাল হবে। আপনার স্বাস্থ্যপান ক'রে উন্নতি কামনা করে ফাংশন হবে আমাদের।

তারপর উৎসাহ এবং উল্লাসের মধ্যে সে তাদের গেলাসের সঙ্গে গেলাস ঠেকিয়ে মদও খেলে।

আসর যখন ভাঙল, তখন ন'টা বেজে গেছে !

সকলে চলে গেলে সে আবার গিয়ে ছাদে উঠল। চৌরিঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার মধ্যে মদের প্রভাব চঞ্চল উত্তেজনা জাগিয়েছে—মনের মধ্যে প্রশংসা প্রতিষ্ঠার এবং শিল্পীদের প্রীতির স্মৃতি চৌরিঙ্গীর আলোর মতই ঝলমল করছে। পৃথিবী যেন তাকে ডাকছে

মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল কালকের রাত্রের কথা। বের হবে আজকে আবার? এই শীতের রাত্রে যারা স্তি জামা আর রঙীন কাপড়ে ও রঙে-পাউডারে সেজে সামান্য টাকার জন্যে হাসির মুখোশ পরে বসে আছে পথের দিকে তাকিয়ে, তাদের সকলের হাতে পাঁচটা করে টাকা দিয়ে বলে আসবে—যাও ঘরে যাও। এই তো কিছু পেলে—এ থেকেই চালিয়ে নিয়ো। দাঁড়িয়ে শীতে কষ্ট ক'রো না, যাও।

আবার আজ একবার সে দেবতা হয়ে পূজো প্রণাম কুড়িয়ে ফিরে আসবে। ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল তার। কিন্তু—। একটা নয় অনেক, কিন্তু! সব থেকে বড় হয়ে উঠল একটা কিন্তু। সে মদ খেয়েছে। কি ভাববে সেই রামদীন—তাকে তো সঙ্গে নিতেই হবে। কি ভাববে যাদের হাতে টাকা দেবে তারা? ভাববে না এটা মাতালের খেয়াল?

নিজেকে সম্বরণ করলে সে। বাবার কথা মনে হল।

না! সে যাবে না! চন্দ্রিকাতে বাবা সহজ অবস্থায় মুগ্ধ হন নি। তার প্রথম দিনের কথা বেশ মনে আছে। বাবা বেহালা বাজিয়েছিলেন—সে তবলা বাজিয়েছিল। সে গন্ধ পেয়েছিল বাবার কাছ থেকে।

না—সে যাবে না।

পরদিন সকালটা এর তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে ছিল। সে তৃপ্তি উপচে পড়েছিল একখানা চিঠি পেয়ে। সুলতার চিঠি; ছোট্ট চিঠি।

ভারী ভাল লাগল চিঠিখানি। তবে একটা কথার প্রতিবাদ করছি। মনে হয় অতি বিনয়ে লিখেছেন বা আবেগের আতিশয্যে লিখেছেন। সংসারে পরশপাথর অলীক বস্তু। কিন্তু সোনা বাস্তব। আপনার মনই সোনা দিয়ে গড়া। কিছুর ছোঁয়াতে সোনা সে হয় নি। আমার কাছ থেকে হয়তো খানিকটা উত্তাপ পেয়েছিলেন যাতে সোনার কাঠিন্য কিছু নরম হয়েছিল।

আপনি খাঁটি শিল্পী, বিচিত্র মানুষ—যাদের বিধাতা ছাঁচে তৈরী করেন না। নিজের হাতে তৈরী করেন পরমানন্দের মধ্যে।

ইতি—সুলতা ঘোষ।

সেদিন সন্ধ্যায় সে মদ খায় নি। সময় থাকতে ম্যানেজারের কাছে টাকা চেয়ে নিয়ে রেখেছিল। এবং সন্ধ্যার পর বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বিডন স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু জংশনে নেমে রামদীনকে ডেকেছিল। রামদীন দাঁড়িয়েই ছিল। সে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বলেছিল—হুজুর!

—আসবে একবার আমার সঙ্গে?

—শেফালি বিবিকে হুঁয়া?

—নেহি! এদের মধ্যে সব থেকে গরীব যারা, তাদের কিছু করে দিতে চাই।

রামদীন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ তার মন আর একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছিল। বলেছিল—না। আমি ঘুরে আসছি। এগারটা নাগাদ আসব। বুঝেছ। তুমি থেকো।

ট্যাক্সিটা তখনও যায় নি। মোড় নেবার উপক্রম করছিল মাত্র। সে ট্যাক্সিতে চড়ে বলেছিল—চল। এখন নটা বাজে। দু ঘণ্টা ঘোরাও। তারপর ফের আসবে এখানে। এগারটায় এসে রামদীনকে সঙ্গে নিয়ে সেই গলিটা থেকেই শুরু করেছিল। যারা তখনও সেই শীতের মধ্যে ক্লিষ্ট মুখে, উৎকণ্ঠিত চোখে পথের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে ছিল তাদের হাতে সে এক একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বলেছিল—ঘরে যাও। রাত্রি অনেক হয়েছে। সে দাঁড়ায়নি কোথাও এক মুহূর্ত। এ-মোড়ে ঢুকে ও মোড়ে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চেঁপে বলেছিল—চল।

ট্যাক্সিটা সে দাঁড় করিয়েই রেখেছিল।

রাত্রে গিয়ে সুলতাকে পত্র লিখেছিল। পরদিন সকালে জি-পি-ও-তে ফেলে এসেছিল নিজেই। সেদিন সন্ধ্যার সময় সুলতা নিজেই এসেছিল।

বলেছিল—আপনি কি পাগল নাকি?

—কেন?

—এসব কি আরম্ভ করেছেন?

—এদের দুঃখ জানেন?

—জানা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করতে পারি। কিন্তু দুঃখ যতই থাক তার প্রতিকার কেউ কি এইভাবে করতে পারে?

—যতটুকু পারি!

—আপনি পৃথিবীর বুর্জোয়াদের একজন খাঁটি বুর্জোয়া।

হেসে উঠেছিল সে, বলেছিল—না—আমি আর্টিস্ট!

—না বুর্জোয়া। ন্যাশনাল মুভমেণ্ট নিয়ে সে চিঠি এই কারণেই আপনার পক্ষে লেখা সম্ভব-পর হয়েছিল।

চুপ করে গিয়েছিল সুরেশ্বর। মনে আঘাত পেয়েছিল।

সুলতা বলেছিল—এ সব ছাড়ুন। মানি আর্টিস্টদের খেয়াল থাকে। তারা কিছুটা অদ্ভুত হয়ে থাকে। যে কাজ করেছেন তাতে তাদের এককণা উপকারও হয়েছে—একটা দিনের খোরাক হয়েও কিছু বেঁচেছে হয়তো! সব মেনেও বলব এটা পথ নয়! শুধু যারা বড়লোক তাদেরই এমন দয়ার অহঙ্কার থাকে। এটা ভাল নয়, ছাড়ুন!

বলে সে চলে গিয়েছিল।

* * * *

বিচিত্র মানুষের মন। সেই বৈচিত্র্য বশেই বোধ করি এই মতের পার্থক্য সত্ত্বেও কিছু দিনের মধ্যেই সুলতা এবং সুরেশ্বর খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছিল। দেখার চেয়ে বেশী চিঠি লেখার মধ্যেই হয়েছিল এটা। মাস কয়েকের মধ্যেই তারা চিঠি লিখতে শুরু করত "সু" বলে এবং

শেষে সই করত "সু" ব'লে। সুলতাও তাই লিখত। আরম্ভে "সু"—শেষেও "সু"। ওরই মধ্যে বোধহয় জ্যামিতিক নিয়মে দুটি ত্রিভুজের মিলে যাওয়ার মত দুজনের চিঠিতেই সু শব্দের মিলের মধ্যে মনের মিল হওয়া বা মিলে যাওয়ার ইঙ্গিত ছিল। দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য—তা সামান্য ছিল না—ছিল অনেক। সেটা মতের এবং পথের। মতে ও পথে সুলতা ছিল ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুরেশ্বর সেদিক থেকে দাগী। কিন্তু ইদানীং তার ওই বিচিত্র ছবির অঙ্কনপদ্ধতির জন্য বিপ্লবী দলের প্রশংসা পেয়েছিল। তাঁরা হয়তো তাকে এই জন্যেই মার্জনা করেছেন যে, যারা সংসারে শিল্পী হয় তারা এ ধরনের ভ্রম এবং ভুল ক'রে ফেলে আবেগ বশে। তাহলেও মতের কথায় তাদের মিলত না। তবুও কিছু-দিনের মধ্যেই সুরেশ্বর লিখলে—দেখ পুরুষে নারীতে মিলন হয় বাহুবন্ধনের মধ্যে। এবং মনে মনে। যে মন মতের তোয়াক্কা করে না, তার রাজত্বের বাইরে তার বাস। সেখানে তোমার আমার মন—"সু" শব্দের মতই মিলে গেছে। এরপর রেশ্বর এবং লতায় যদি নাই হয় মিল—সেক্ষেত্রে কি যায় আসে' আমার মত হল—মিলনটা বিবাহের চেয়েও বড়। সেটা আমি জানি তোমারও। কিন্তু বিবাহের চেয়ে বড় যে মিলন—তার দিন আসে নি। এবং অন্যদিকে মিলনটাই যখন হয়ে গেছে মনে মনে তখন ছোট ব্যাপার বিবাহটাই বা হবে না কেন?

সুলতা লিখেছিল—তুমি পাগল। এক কথার বিয়ে।

সুরেশ্বর লিখেছিল—একশো বার। সুস্থ মানুষকে ঠেকানো যায়। পাগলকে ঠেকানো যায় না।

সুলতা লিখেছিল—যায়। রাঁচী পাঠালে।

সুরেশ্বর লিখলে—তার থেকে তুমি শেকল দিয়ে বাঁধো না!

সুলতা লিখলে—অবুঝের সঙ্গে সংকেতে আলাপ চলে না। আগেরকালে যাঁরা বলেছেন—অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করতে নেই তাঁদের কথাটা পাল্টে বলতে চাই বোকা বা পাগলকে বুদ্ধিমানের মত কথা বলো না এবং একেবারে রূঢ় যুক্তি ছাড়া বোঝাতে চেয়ো না। তোমার সঙ্গে এ মিলন হয় না। বাবা ব্যারিস্টার। তাঁর মেয়ে আমি কিন্তু আমি পাগল নই, আর্টিস্টও নই। তুমি জমিদারের ছেলে হয়ে খেয়াল নেই যে আমাকে বিয়ে করলে তোমার সমূহ ক্ষতি হবে। দেবোত্তরের সেবায়েৎ স্বত্ব চলে যাবে। ওসব ভুলে যাও। আমি তোমার সু হয়েই থাকব, কুয়ের কারণ হতে পারব না।

সুরেশ্বর এবার টেলিফোন ধরলে। কারণ চিঠি যাবে আসবে এ বিলম্ব তার সহ্য হল না। সে বললে—সু। আমি সু বলছি। তুমি যদি আমার কুয়ের কারণই হও, দেবোত্তরের সেবায়েত পদ যদি যায়ই তবে আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হব—মুক্তি পেয়ে যাব। আমি এ যুগের মানুষ। রায়বংশের গৌরবে কোন শ্রদ্ধা নেই আমার। যেটুকু শ্রদ্ধা আজ আমার জুটেছে সে আমার তুলির জোরে, আমার মনের জোরে। দেবতাতেও আমার বিশ্বাস নেই। তবে এইটুকু বলছি—রায়বংশের সেবায়েতরা দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি পত্তনী দরপত্তনী দিয়েছেন, তার মোটা অংশ আমার ঠাকুরদা—তারপর আমার মা কিনে গেছেন। সুতরাং আর্থিক কষ্টে

পড়ারও আশঙ্কা নেই। যদি তাও থাকত তবে আমি তাতেও পিছপাও হ'তাম না। এখন কি বলছ বল ?

স্থলতা চুপ করে ছিল।

স্থরেশ্বর প্রশ্ন করেছিল—উত্তর দাও।

—উত্তর ?

—হ্যাঁ।

এবারও নীরব থেকেছিল স্থলতা।

স্থরেশ্বর বলেছিল—মৌন থাকলে সম্মতি আছে ধরে নিতে হয়। তা হলে কাল আমি তোমার বাবার কাছে যাব।

এবার স্থলতা বলেছিল—এখনও ভাবছি।

—এর মধ্যে ভাবনার কি আছে ?

—আছে।

—না—নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মত নিয়ে কখনও কোনও ঝগড়া আমি করব না। তারপর হেসে বলেছিল—আমি ছবির একজিবিশন করব, তুমি বলো কিছু হয় নি, আমি রাগব না। তুমি ইলেকশনে দাঁড়িয়ো। আমি কথা দিচ্ছি তোমার পোস্টার তৈরী করে দেব। আমার জমিদারীতে বলে দেব।

—কিন্তু তবুও যদি না বনে ?

—তখন ডাইভোর্স করে নেব।

—হুঁ।

—তার মানে ?

—তার মানে তা হলে আমাকে পরীক্ষাটা আগে পাস করতে হবে। তারপর বিয়ে। তখন তুমি বাবাকে এসে বলবে।

—তা হ'লে আবার তখন কেন ?

—তখন এই জন্যে যে, রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করে যদি ডাইভোর্স করতে হয় তখন আমি কি করব ? জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা না-থাকলে নতুন স্বামী খুঁজে বেড়াতে হবে। নয়তো কোন সাবান গন্ধতেল স্নোওয়ালাদের মাল নিয়ে বাড়ী-বাড়ী বেচে বেড়াতে হবে কমিশনের জন্য। নেহাত ভাগ্য হলে টেলিফোনে চাকরী পেতে পারি। তা হবে না।

—তুমি ঠাট্টা করছ ?

—বুঝলে এতক্ষণে ? ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু তোমায় হাতজোড় করে মিনতি করছি, আমাকে পাসটা করতে দাও। বিয়ে হলে আর হবে না পাস করা। তুমি যা মানুষ !

ওই পরীক্ষার জন্যেই বিয়েটা ঠেকে ছিল। এবং সেটা দুজনের প্রতিশ্রুতিক্রমে খুব গোপনেও ছিল। তার কারণ স্থরেশ্বরেরই দেবোত্তর। এদিকে তার মামা এবং ম্যানেজার ওদিকে স্থলতার বাবা দুপক্ষেই হয়তো আপত্তি তুলবেন।

সুলতার পরীক্ষা ছিল মাস দেড়েক পর। ছাত্রী হিসাবে ভালই ছিল। এবং রেজাল্ট ভাল করবার নেশাও ছিল। তবু মধ্যে মধ্যে আসত সে সুরেশ্বরের দাবী মত। দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে যেত—ইডেন গার্ডেন বা গঙ্গার ধার দিয়ে। সপ্তাহে একদিন হয়তো।

এরই মধ্যে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

হঠাৎ কীর্তিহাটের দেবোত্তরের নায়েব সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প-আদালতের এক সমন হাতে এসে হাজির হন। তার সঙ্গে মেজঠাকুমাও এসে হাজির হলেন কীর্তিহাট থেকে। সমনখানা তাঁরাই হাতে ক'রে এনেছেন। দেশে গভর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্ট হচ্ছে। তার ব্যাপার অর্থাৎ আইন কানুন প্রায় সামরিক আইনের ধাঁচে তৈরী। মাঠের মধ্যে তাবু খাটিয়ে তাঁরা তেতে পুড়ে থাকেন—তাঁদের তাঁবুর দরজায় বিত্তবান মালিকদের হাতজোড় ক'রে না দাঁড়ালে অঙ্গ শীতল হয় না—মেজাজ ঠাণ্ডা হয় না। কীর্তিহাটের কর্মচারীরা যা কাগজপত্র দেখিয়েছে তাতে তাদের সমস্যা মেটে নি। উল্টে মেজতরফ অর্থাৎ শিবেশ্বরের ছেলেরা নানান রকমে গোল বাধিয়েছে। যা কাগজ দেখিয়েছে তাতেই তারা আপত্তি দিয়েছে, বলেছে দেবোত্তর। আবার বহু দেবোত্তর সম্পত্তিও তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে রেকর্ড করিয়েছে। জাল-জালিয়াতি করতে তাদের দ্বিধা হয় নি। বরং তারা গৌরববোধ করেছে তাদের নিজেদের বিষয়বোধের জন্য। এতে মুখপাত্র হয়েছে সুখেশ্বরের ছেলে দুজন। দুজনেই চতুর এবং কিছু লেখাপড়াও শিখেছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ধনেশ্বর এবং জগদীশ্বর। জগদীশ্বর গাঁজা খায়, মদ খায়, ধনেশ্বর থেকেও উগ্র। সে বাঘ মেরে একটা বন্দুক পেয়েছে। সেই বন্দুক ঘাড়ে বেড়ায়। এবং কথায় কথায় মারপিট করে। সাধারণ গরীব প্রজারাও ভয় করে তার প্রহারকে এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ভয় করে তাকে কুকথার জন্য। সরকারী কর্মচারী বিশেষ ক'রে হাকিমের কাছে তারা অত্যন্ত বিনীত এবং অনুগত। সুতরাং দেবোত্তরের কর্মচারীরা হয়ে পড়েছে অসহায়। হাকিম তাদের ঠিক বিশ্বাস করেন না। এবং তাদের ভরসায় সাধারণ প্রজা গরীব ও মধ্যবিত্ত কেউই সাক্ষী দিতে অগ্রসর হয় না। সুতরাং দেবোত্তরের নায়েবরাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে মিথ্যাবাদী জালিয়াত কুচক্রী। তাছাড়াও সেটেলমেণ্ট হাকিম হয়েছেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। কারণ আজও পর্যন্ত এই সম্পত্তির মোটা অংশের মালিক শ্রীসুরেশ্বর রায় তাঁদের ক্যাম্পে হাজিরা দেয়নি। সুতরাং তাঁরা হুকুম জারী করেছেন সুরেশ্বর রায়কে সশরীরে ক্যাম্প-আদালতে হাজির হতে হবে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ। অন্যথায় বডি ওয়ারেণ্ট জারী করে তাকে গ্রেপ্তার করে হাজির করা হবে।

সমন নিয়ে ছুটে এসেছে দেবোত্তরের নায়েব। সঙ্গে এসেছেন মেজঠাকুমা। মেজঠাকুমা বললেন—ভাই, বলতে গেলে ওরা আমারই বংশ। কিন্তু কি ক'রে দেখব যে তারাই ভগবানের সব সম্পত্তি আত্মসাৎ করছে। আর তোমাকে ঠকাচ্ছে। মেজকর্তা গিয়ে অবধি ওরা তো আমার দিকে ফিরে তাকায় না। ভগবানের প্রসাদের বরাদ্দ করে গেছেন শ্বশুর। আজকাল প্রসাদ বলতে করকরে আতপের ভাত আর সামান্য ব্যঞ্জন, তা মুখে দেওয়া যায় না। তাই খেয়ে পেটটা ভরে। আর তোমার মা বরাদ্দ ক'রে গেছেন পঞ্চাশ টাকা

মাসিক। তাতেই বস্ত্র তাতেই তেল তাতেই ধর্ম ব্রত-পার্বণ সব। ভাই, ভগবানের বাল্যভোগ শুধু মণ্ডায় ঠেকিয়েছে। আমি একটু করে ছানা কিনে দি ওই টাকা থেকে। তোমাদের বলব কোন্ মুখে? কিন্তু আজ যখন তারা ঠাকুরকে তোমাকে সবাইকে ঠকাবে তখন আমিও ঠকব। লজ্জার দায়ে ছুটে এসেছি—পেটের দায়ে ছুটে এসেছি। শ্বশুর বংশের মান সম্ভ্রম কীর্তি সব ডুববে বলে ভয়ে ছুটে এসেছি। তুমি চল ভাই। একবার গিয়ে দাঁড়াও!

এখানকার নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্র তখন কদিন থেকে অসুস্থ। তিনি ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন। না-হলে তাঁর নামে আম-মোক্তারনামা পাওয়ার অব এ্যাটর্নী দেওয়া আছে, তাঁকে পাঠালে চলত। দিন পরশু।

পরের দিন সুলতার সঙ্গে সে একটা এনগেজমেণ্ট করেছিল। ওই টেলিফোনে• কথাবার্তার পর তারা দু-তিন দিন দেখা করেছে, বেড়িয়েছে একসঙ্গে। কথা ছিল ইডেন গার্ডেনে দুপুরবেলা গিয়ে সে তার ছবি আঁকবে।

সে ফোন করলে সুলতাকে।—বিপদ ঘটেছে সু।

—কি বিপদ?

সে বললে বিপদের কথা। বললে—এ রাজত্ব ইংরেজের রাজত্ব, অভিসম্পাত করছি, এই পাপেই ধ্বংস হোক। এবং হবেও তুমি দেখো। আমি নায়েবকে বললাম—আমি যদি সম্পত্তি না চাই। হেসে ম্যানেজার বললেন—তাও গিয়ে হাজির হয়ে বলে আসতে হবে। এবং হাজির না-হলে এরা কোমরে বেঁধে নিয়ে যাবে। এর আর জামীন নেই। আপীল নেই। কি করি বল তো!

হেসে সুলতা বলেছিল, আমার সামনে পরীক্ষা না থাকলে তুমি অ্যাব্‌স্কণ্ড করতে, আমি তোমাকে শেল্টার দিতাম। তাতে আমার যা হবার হ'ত। কিন্তু যাও না ঘুরেই এস না।

—যেতে বলছ?

—বলছি।

ছেড়ে দিয়েছিল ফোন সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পরে আবার সুলতা ফোন ক'রে বলেছিল—দেখ, বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম। বাবা বললেন—যেতেই হবে সুরেশ্বরকে। হি মাস্ট গো।

—মাস্ট গো!

—হ্যাঁ। বলছেন না-গেলে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে তিনি বুঝতে পারছেন।

বৃদ্ধ হরচন্দ্র বিকেলে সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই এসেছিলেন—যাওয়ার কি ব্যবস্থা হ'ল দেখতে। সঙ্গে এখানকার পুরনো আমলাকে দিলেন, যে দীর্ঘকাল—প্রায় তিরিশ বছর—যোগেশ্বরের জমিদারী সেরেস্তায় আছে।

রওনা হতে হ'ল সেই রাত্রেই। না হলে সকালে পৌঁছুনো যাবে না। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে সময় দেওয়া আছে—বেলা দশটা!

সেই গেল সুরেশ্বর। ১৯৩৪ সাল শেষ হয়েছে, ১৯৩৫ সালের মার্চের ৩১শে রাত্রে। দিন ছিল ১লা এপ্রিল!

সেই গেল। তারপর বিচিত্রচরিত্র এই খেয়ালী বা অর্ধপাগল সুরেশ্বর কীর্তিহাটেই থেকে গিয়েছিল। কলকাতায় মধ্যে মাঝে দুচার দিনের জন্য বা এক দুদিনের জন্য এসেছে, আবার ফিরে গিয়েছে কিন্তু সুলতার সঙ্গে আর দেখা করে নি। চিঠির মধ্য দিয়ে যে ঘনিষ্ঠতার শুরু হয়েছিল, চিঠির মধ্য দিয়েই তাতে ছেদ টেনে শেষ ক'রে দিয়েছে। শুধু সুলতার সঙ্গেই নয়, কলকাতার জীবনের সঙ্গে, শিল্পী-জীবন না-হলেও শিল্পী-সমাজের সঙ্গে, সভ্য সমাজের সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে। একবার নাকি বিলেত ঘুরে এসেছে—সেটা প্রথম দিকেই। তারপর সব শেষ। লোকে নানান কথা বলেছে। ক্রমে সে কথা চাপা পড়েছে। সুরেশ্বর সকলের মন থেকে মুছে গেছে।

সুলতা নীরবেই সব সহ্য করেছে। তার অন্তরের কথা সেই জানে। তবে সে বিয়ে করে নি। বি-এ পাশ করে সে দ্বিগুণ উৎসাহে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। এম-এ পাস করে কলেজে অধ্যাপিকার কাজ নিয়ে সেই রাজনীতি নিয়েই একরকম মেতে আছে। বামপন্থী রাজনীতি। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি নয়! সোস্যালিস্ট সে। আজ ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর। এই আঠারো বছর পরে সেই সুরেশ্বর এবং সেই সুলতা জানবাজারের বাড়ীতে আকস্মিক ভাবে মিলিত হয়ে সামনাসামনি বসেছে। সামনের দেওয়ালে সুরেশ্বরের আঁকা সারি সারি ছবি। বিভিন্ন ভঙ্গী বিচিত্র বর্ণবিন্যাস। উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল্ করছে। তার প্রথম ছবিখানার উপর ছড়ি ঠেকিয়ে সুরেশ্বর বললে—এই আমার প্রথম ছবি। পুণ্যবারিবিধৌত তট-বটচ্ছায়া-শীতল কীর্তিহাট গ্রাম। ১৮০১ সাল।

সুলতা ছবিখানার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ভারী ভাল হয়েছে ছবিখানা। রেখায় বর্ণে সুন্দর লাগছে।

না। শিল্পে সুরেশ্বর বেঁচে আছে!

সুরেশ্বর বললে—লেডীজ এ্যাণ্ড জেন্টেলমেন।

চকিত হয়ে উঠল সুলতা—লেডীজ এ্যাণ্ড জেন্টেলমেন!

সুরেশ্বর সংশোধন করে নিলে—না। এখানে তো তুমি একা সুলতা। হাসলে। তারপর বললে—দেখ, কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম, তুমি নিজেও জান—একটা পাগলামি আমাদের বংশে আছে। খেয়াল ততক্ষণই খেয়াল, যতক্ষণ মাত্রা না ছাড়ায়। আমার মাত্রা অনেকদিন ছাড়িয়েছে। তারপর কীর্তিহাটে গিয়ে সেটা আমার মন আমার বুদ্ধি আমার বাসনা কামনাকে এমনভাবে অভিভূত করেছে সুলতা যে আমার ঠিক থাকে না। অবশ্য মদ্যপান আমি প্রচুর করতাম। ওটা তাকে বাড়িয়ে তুলতে। আমি কল্পনায় নানান ছবি দেখি অন্ধকার রাত্রে। দেওয়ালের গায়ে, ছাদে চটে যাওয়া পলেস্তারার মধ্যে দেখতে পাই নানান ছবি। কখনও কখনও জীবন্ত হয়ে ওঠে তারা, কথা বলে। আজও আমার মনে হচ্ছিল, এই যে ছবিগুলোর মানুষ, হয় তারাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নয়তো অনেক অশরীরী আত্মা এখানে বসেছে। তারা দেখতে এসেছে ছবিতে কীর্তিহাটের কড়চা। শুনতে এসেছে সুরেশ্বরের জবানবন্দী।

চোখ দেখে সুলতার মনে হল, সুরেশ্বর কত দূরে—অনেক দূরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব

সুরেশ্বর বললে সুলতাকে—আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে সুলতা, তোমাকে এই আজকের দিনটিতে পেয়ে সে কি বলব! আজ ১৯৪৩ সালের ২৫শে নভেম্বর হয়তো বা বিধাতাই ধার্য করে রেখেছিলেন যে দীর্ঘ পনের বছর পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতেই হবে!

সুলতা হাসলে। বললে—কেন, বিধাতার কি দায় পড়েছিল। দেখা তো তুমি এর আগে করলেই পারতে। তোমার কোন লজ্জার বালাই আছে বলে তো বিশ্বাস করি নে। তুমি কলকাতায় এসেছ। আমি জানি মাসে একবার তো এসেছই—কোন মাসে দুবারও এসেছ। আমি খোঁজ পেয়ে ফোন করেছি—তুমি ফোন ধরতে না, চাকরে ধরত, তুমি বলতে—বল বাড়ী নেই বাবু। কথাটা ক্ষীণভাবে হলেও ফোনের মারফত শুনেছি। চাকর তোমার রিসিভারের সাউণ্ডপিসে হাত চাপা দিতে জানত না, তুমিও শেখাও নি। তাছাড়া দুবার তুমি আমাকে দেখেও সরে গেছ—মানে গা ঢাকা দিয়েছ। একবার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে, একবার ধর্মতলায় —জি সি লাহার রঙের দোকানের সামনে। বোধহয় রঙ তুলি কিনে বেরুচ্ছিলে। আমি ওপারে মসজিদটার কাছে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে। তুমি হনহন করে চলে গেলে। কি—মিথ্যে বলছি আমি?

সুরেশ্বর বললে—না। মিথ্যে বল নি। সত্য কথা। অস্বীকারই বা আমি করব কেন? আমি আর যাই হই মিথ্যেবাদী নই। মানে যাকে কাপুরুষ মিথ্যেবাদী বলে। নইলে কৌতুক করে অনেক মিথ্যে বলি। রায়বংশের ছেলেরা বেশীর ভাগই সাহসী মিথ্যেবাদী। যেমন ধর, চাকরকে বললাম—বল বাড়ী নেই বাবু অথচ রিসিভারের মুখটা চাপা দিতে বললাম না। ও তথ্যটা আমি জানি না তা তো নয়। জানি। ওটা যাতে তুমি শুনতে পাও—তাই জন্যেই বলেছি এবং বেশ উঁচুগলায় বলেছি, যাতে কথাটা তুমি শুনতে পাও।

—সামনাসামনি বলতে পারতে তো!

—পারতাম না, চক্ষুলজ্জা হত!

—সেটা আজ ঘুচল কেন? আর চোখের লজ্জা তোমার আছে বলেও তো জানতাম না।

হেসে সুরেশ্বর বললে—আমিও জানতাম না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ওটা যে কেমন করে গজাতো তা আমি নিজেও জানি না।

—সেই তো। আজ সেটা গেল কি করে তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

একটু ভেবে সুরেশ্বর সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—দেখ—আজকের দিনটা এমন একটা দিন, যে দিনটা পঞ্জিকার অর্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান বা মেয়েদের অনন্ত ব্রত, সাবিত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠা এবং উদ্‌যাপন করবার দিনের মত। ধর, আমি সংকল্প করেই ব্রত করেছিলাম যে, আজকের দিনটি যতদিন না আসবে, ততদিন আমি জগতে সমাজে নিতান্তভাবে নগণ্য এবং জঘন্যের মত থাকব। আজ সেই দিনটি এল। পঞ্জিকার নয়—ইতিহাসের। ১৯৫৩ সাল ২৫শে নভেম্বর; লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে ব্রতকথা শুনে এলাম। বেরিয়ে আসছি, তোমার

সঙ্গে দেখা হল। বুঝলাম, আমার ব্রত ঠিক পালন করা হয়েছে। তোমাকে এবার বললেই আমার ব্রতের সমাপ্তি।

—হুঁ। সুলতা বুঝলে এবার ; জমিদারী প্রথা রদ করে বিল পাশ হয়েছে এবং সুরেশ্বর তাতে আজ ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত হয়ে নির্লজ্জ উদ্ভ্রান্তের মত কথা বলতে শুরু করেছে। ক্ষোভে হৃদয়াবেগের বাঁধ ভেঙেছে।

ছবিগুলোর দিকে তাকালে সে। সারি-সারি বর্ণাঢ্য ছবি। বিচিত্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে আঁকা। প্রথম ছবিখানা যেন সেই কোম্পানীর আমলে কোন ইংরেজ চিত্রকরের আঁকা স্কেচের ঢঙে আঁকা ছবি। তবে কালো সাদা রেখাতে নয়—রঙ—তেলরঙে আঁকা। তার-পরের ছবিখানা একটি মন্দিরের মধ্যে কালীমূর্তি। মনে হচ্ছে পুরনো আমলের দেশী চিত্রকরের আঁকা ছবি।

লম্বা একটা বারান্দা-ঘেরা ঘর—দৈর্ঘ্যে বোধ হয় একশো পঁচিশ ফুটের কম নয়। ছবিও কম নয়। দু' সারিতে একটু উঁচু-নিচু করে অনেক ছবির সঙ্কুলান হয়েছে। অন্তত একশোর কম নয়। তা ছাড়াও বারান্দার দুটো প্রান্তের দুটো দেওয়াল আছে। তাতেও কুড়ি পঁচিশখানা ক'রে চল্লিশ পঞ্চাশখানা।

সুরেশ্বর বলেছে—এটা সে ছবি দিয়ে 'কীর্তিহাটের কড়চা' তৈরী করেছে। অর্থাৎ তাদের কীর্তিহাটের রায়বংশের ইতিহাস!

খুব গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাগুলিকে এঁকেছে।

একটু হাসি ফুটে উঠল সুলতার মুখে।

১৯৪৩ সালের ২৫শে নভেম্বর, আজ বাংলার বিধানসভায় জমিদারী প্রথা রহিত করে বিল পাশ হল। সুলতা অ্যাসেম্বলীর নিচের তলায় দেওয়ালের ধারে যে সরু একটা ফালিতে কিছু দর্শকদের বসবার জায়গা আছে—সেখানেই বসে ছিল। উপর-নিচে সমস্ত গ্যালারী দর্শকে পূর্ণ ছিল। উপরে গভর্ণরের গ্যালারীতে ক'জন রাজা-জমিদার বসে ছিলেন, যাঁদের সুলতা চিনত। বর্ধমানের মহারাজার টুপিটা সে খুঁজেছিল কিন্তু নজরে পড়েনি। ওই টুপিটা চেনার কথা তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। এই অ্যাসেম্বলী হাউসের বাগানেই একটা বড় টি-পার্টি হয়েছিল। তাতে এসেছিলেন ইয়োরোপের এক বড় রাজনীতিবিদ্। তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। সম্বর্ধনা শেষে যখন সে বেরিয়ে আসছিল তখন ঘটনাচক্রে সামনেই আসছিলেন প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মশায়। তিনি তাকে দেখে বলেছিলেন—আরে সুলতা!

সে বলেছিল—ভাল আছেন? প্রণাম করতে গিয়েছিল। কিন্তু ভূপতিদা বলেছিলেন—না-না-না। অ্যাসেম্বলী হাউসের সীমানা গণতন্ত্রের কাশীক্ষেত্র, এখানে প্রণাম নিষিদ্ধ। সে বাবাকেও প্রণাম করতে নেই ছেলের। অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের বিধানে ভোটাধিকার এখানে আঠারো বছর হলেই আপনি পায়। ইনহেরিটেন্স নেই এবং বাপের বিরুদ্ধে ছেলের ইলেকশনে দাঁড়াতে নিষেধ নেই। প্রণাম এখানে অচল। অধম এখানে কেউ নেই।

বলতে বলতেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। পার্টির আসরের একেবারে একপ্রান্তে একান্তে একখানি লম্বা আসনে একটি দম্পতি বসে ছিলেন। স্বামীর মাথায় ছিল একটি টুপি, গড়নটা বিচিত্রও বটে চেনাও বটে। যেন ছবিতে সে দেখেছে। অনেকবার দেখেছে। পরনে শেরওয়ানী চুস্ত পাজামা। কিন্তু কে ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। ভূপতিদা থমকে দাঁড়িয়ে হেসে বলেছিলেন—হ্যালো বার্ডওয়ান !

তখন তার মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, বর্ধমানের মহারাজার টুপিই তো বটে !

এ মহারাজাকে সে দেখেনি কিন্তু মহারাজ বিজয়চাঁদকে সে দেখেছে। ইউনিভারসিটির কনভোকেশনে দেখেছে। এবং সে কালে তাঁর এই টুপি মাথায় ছবি অনেকবার কাগজে ছাপা হয়েছে মনে পড়ছে তার।

ভূপতিদা বলেছিলেন—আপনি এখানে একপাশে ?

মহারাজ বর্ধমান হেসেছিলেন। সে হাসির অর্থ স্পষ্ট।

থাক সে কথা। আজও সেই টুপি সে খুঁজেছিল ওইখানে জমিদারদের মধ্যে। পায়নি। পেয়েছিল পাইকপাড়ার বা কান্দীর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহকে। তিনি সেবার ইলেকশনে হেরেছিলেন। আগের বারে তিনিও মন্ত্রী ছিলেন ভূপতিবাবুর সঙ্গে। তিনি বসে ছিলেন স্পীকার'স গ্যালারীতে, একেবারে প্রথমেই। তিনি অতি সুপরিচিত ব্যক্তি—কি রাজনৈতিক মহলে কি পণ্ডিত সাহিত্যিক রসিক মহলে। চেহারাতেও এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে একবার দেখলেই চেনা হয়ে যায়।

আরও একজনকে সে খুঁজেছিল। খুঁজেছিল কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উত্তরাধিকারীকে। হ্যাঁ, ওই একজন সন্ন্যাসী জমিদার। প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁকে যেন দেখেছিল। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী। তিনি ছিলেন উপরে। জমিদার কজনের মধ্যে।

সুরেশ্বরকে ঠিক তার মনেই পড়েনি। তাকে খোঁজেওনি। সে এখানে উপস্থিত থাকবার সম্ভাবনার কথা তার মনের মধ্যে উঁকিই মারেনি। সুরেশ্বরকে সে মনের দিক থেকেও মুছেই ফেলেছে। হ্যাঁ, মুছেই ফেলেছে। যখন সুরেশ্বর ওখানে গেল, তখন প্রথম প্রথম বেশ সকৌতুকে ওখানকার সব কিছুকে ব্যঙ্গ করে চিঠি লিখত। লিখেছিল, মনে আছে, এখানকার সেটেলমেণ্ট হাকিম হরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমারই বয়সী। একেবারে নতুন হাকিম। সুপুরুষ চেহারা। চোখে চশমা আছে, চশমার পাওয়ার শুধু দুর্বল দৃষ্টিকে সবল করেনি, দিব্য-দৃষ্টি দিয়েছে। সাপের পাঁচটা করে পা আছে তা তিনি দেখতে পান। সারাদিন দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন ক্যাম্পের আদালতের মাঠে। সেটা ইচ্ছাপূর্বক তা গোপন করেননি ভদ্রলোক। আমার কেস নম্বরটা উঠলেও সেটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিলেন। তখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছিল তিনি সাপের তিনটে পা দেখেছেন। বেলা বারোটার সময় (আমি গিয়েছিলাম বেলা দশটায়) দেখলা এক প্রবীণ প্রৌঢ় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সত্যিই কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এল থানার কনেস্টবলসহ ওঁর লোকেরা। তখন বুঝলাম পাঁচ পা-ই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁকেও বসিয়ে রাখলেন। সব শেষে আমাদের কেস হল। কাগজপত্র দেখালে কর্মচারীরা, আমি শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম। তাতেই হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য লিখে নিলেন। ফাইনাল

* * *

বিচার হবে এখন নয় ; এরপরে ; সে হবে মাস দুয়েক পর। তখন দোসরা হাকিম আসবেন। এঁর উপরের লোক। আমাকে বললেন—নোটিশ করলে আপনি আসেন না কেন ? বললাম—আমি তো এখানে থাকি নে, কলকাতায় থাকি। সংক্ষেপে বললেন—তা হলে কিছুদিন থাকুন এখানে। জমিদারী ভোগ করবেন কলকাতায় বসে বার মাস, তা অন্ততঃ সেটেলমেণ্ট যতদিন চলছে হবে না। পেশকারকে বললেন—ওঁর সমনগুলো দাও। পেশকার বললে—দাঁড়ান। তারপরই সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ডাক হল। হরিদাস মুখার্জি হাজির হো! কনেস্টবল দড়ি ধরে এনে হাজির করলে। হাকিম বললেন—কি ? উনি (অর্থাৎ আমি) কলকাতায় থাকেন, আপনি তো থাকেন না। এখানেই থাকেন শুনেছি, কাজের মধ্যে নেশা-ভাঙ। তা নোটিশ সমন পেয়েও আসেন না কেন ? সাপের পাঁচটা পা গজায়, আপনার কটা গজিয়েছে—দশটা না বিশটা ? এবার আমার প্রচণ্ড ক্রোধ হয়েছিল। আমি সমনগুলো হাতে-হাতে না নিয়ে চলে এসেছি। পেশকার হাঁকলে, সমন নিয়ে যান। বললাম—যথারীতি বাড়ীতে দিয়ে আসবার নিয়ম অনুযায়ী পাঠিয়ে দেবেন। দেখছি কিছুদিন থাকতে হবে। দেখি! কলকাতায় রঙ-তুলি আনবার জন্য লোক পাঠাচ্ছি। ইতি—

তার কদিন পরেই চিঠি পেয়েছিল—সু, তুমি চিঠির উত্তর দাওনি। খুব পড়ছ বোধহয়। তা পড়। আমি ছবি আঁকছি। এখানে ল্যাণ্ডস্কেপ খুব ভাল। এবং ছবির দৌলতে অকস্মাৎ সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প কোর্ট পর্যন্ত রঙ ধরে গেছে। মজা হয়ে গেছে। সেদিন কাঁসাইয়ের ধারে বসে ছবি আঁকছি একমনে। হঠাৎ পিছন থেকে কে বললে—বাঃ! আপনি তো চমৎকার ছবি আঁকেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম সেই হাকিম হরেন ঘোষ। তখন সাহেব নয়। শৌখীন বাঙালীর ছেলে—পাঞ্জাবি, ফিনফিনে মিলের ধুতি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা! মনের রাগ দমন করার অভ্যেস আছে। উঠে হেসে নমস্কার করে বললাম—আপনি! বললেন—হ্যাঁ, বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। দূর থেকে দেখলাম আপনি বসে কি করছেন। কৌতূহল হল। এলাম। আপনি তো চমৎকার আঁকেন! বিনয় করলাম না। বললাম—খুশী হলাম। উনি সিগারেট দিলেন, নিজে ধরালেন। তারপর বললেন—শুনেছিলাম আপনাদের ধনেশ্বরবাবুর কাছে, কল্যাণেশ্বর বলে ইয়ংম্যানটির কাছে যে আপনি কলকাতায় থাকেন, টাকা আছে বাপের তাই ওড়ান আর থিয়েটার দেখেন, ফুর্তি করেন। আপনি আর্টিস্ট তা তো বলেননি। হঠাৎ খুব হৃদ্য হয়ে বললেন—তাই শুনেই তো রাগ হয়ে গেল মশাই! বললাম—বটে! তাই সমন জারী করেছিলাম! বললাম—তাতে কি হয়েছে ? আপনার সমনের টানে এসে কতকগুলো ভালো ল্যাণ্ডস্কেপ হয়ে যাবে আমার। বললেন—না মশাই, মনটা খচখচ করছে। আপনি গুণীলোক! তবে মনে এটাও হচ্ছে যে ভালোই করেছি। আপনাকে তো পেলাম। এখানে মাঠের মধ্যে যা কষ্ট, সারাটা দিন শুধু প্লট নম্বর, বাটা দাগ, রায়তী স্থিতিবান, মোকররী আর এমন এখানকার লোক যে সব তাতেই সকলের আপত্তি। কর রেকর্ড। দেখ কাগজ। এতে আর মাথার ঠিক থাকে! আপনার সমস্ত খতিয়ানে আপত্তি দিয়েছে আপনার জ্ঞাতিরা। সে হিসেবে আপনার উপকার করেছি আমি। আমার উপকার করার লাভও হয়েছে

দেখছি। এখানে মিশবার লোক পাইনে। আপনাদের ইস্কুল-লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে পড়ি। যত পুরনো বই। দিন কাটে না।

মানুষের মন সু, ভারী আশ্চর্য। বুঝলে এখুনি যে লোকটা মন্দ বললে মনে হয় এত বড় পাষণ্ড এবং এত বড় শত্রু আর নেই জগতে, সেই লোকটাই যদি কিছুক্ষণ পর বা তক্ষুনি কথাটা ঘুরিয়ে মিষ্টি কথা বলে প্রশংসা করে তা হলে সব ভুলে মনে হবে লোকটা ভারী ভাল। জান, সত্যটা উপলব্ধি করে খুব আশ্বাস পেলাম। কারণ তোমার আমার মধ্যে তো এরপর মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হবেই। আমার তখন নিশ্চয় মনে হবে আজই পালাব, ফকিরী নেব; আর তুমি ভাববে—কি ভাববে? ডাইভোর্স করবে ভাবতে ভাল লাগে না, ভাল লাগে তুমি ভাবছ বিষটিষ খাবে। তখন আমি হয়তো তোমার মুখের দিকে তাকাব, তুমি জলভরা চোখ ফিরিয়ে নেবে। অমনি আমি গিয়ে বলব—আমারই অন্যায়, আমাকে মাফ কর সু! তুমি ফিক করে হেসে ফেলবে। ইতি—

এরপরও খান তিনেক চিঠি লিখেছিল। শেষখানা মনে আছে, তাতে খুব সরস রসিকতা বা বাক্যের ছটা বিস্তার করেনি। লিখেছিল—একেবারে সময় নেই সু। বড় জালের মধ্যে জড়িয়েছি। ধনেশ্বর কাকা আর সুখেশ্বর কাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর যে ব্যাপারটা করেছিল তা খুব কঠিন ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আমার বড় জ্যাঠামশায়ের দুই ছেলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এমনই কুটিল ব্যাপার করে তুলেছেন যে আমাকে বিপদগ্রস্ত করেছেন। আমাকে পত্তনী বিলি করা সব সম্পত্তিই কেড়ে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি প্রাচীন কাগজপত্র হাতড়াচ্ছি। কাগজের ধুলো পেটে গিয়ে গিয়ে পাকা জমিদারী সেরেস্তানবীশ হয়ে উঠছি। রঙ খুব কালো হয়েছে বলছিল গোয়ানপাড়ার হলদী বুড়ী। ইতি—

পুঃ দিয়ে লিখেছিল—সেটেলমেণ্ট হাকিমের সঙ্গে প্রেম আবার বিগড়েছে। তার কারণ আমার চেয়ে আমার জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে ওর জমেছে বেশী। —ইতি সু।

তারপর নীরব হয়ে গিয়েছিল সুরেশ্বর। একেবারে নীরব। পুরো একমাস কোন চিঠি পায়নি।

অসীমার কাছে খবর নিয়ে জেনেছিল, সুরেশ্বরের এখানকার নায়েব ম্যানেজার হরচন্দ্রের পক্ষাঘাত হয়েছে। ওখানে যে কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে সুরেশ্বর গিয়েছিল তাকে এখানে পাঠিয়ে সুরেশ্বর ওখানকার কর্মচারীদের নিয়ে মামলা-মকদ্দমায় প্রায় ডুবে গেছে।

আরও মাসখানেক পর হঠাৎ চিঠি পেয়েছিল সুরেশ্বরের—সেই সাংঘাতিক চিঠি।

সুলতা, বিদায়। বিদায় নিচ্ছি চিরজীবনের মত। সব ভুলে যাও—ভগবানকে ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ যে বিয়েটা ঘটেনি, তুমিই পরীক্ষার আপত্তি তুলে বিয়েতে রাজী হওনি। হলে আজ আর আক্ষেপের শেষ থাকত না। তুমি আত্মহত্যা করতে। আমার—আমি যা হয়েছি তাই হতাম। অর্ধ পাগল ছিলাম। পুরো পাগল হতে চলেছি। প্রচুর মদ খাচ্ছি। খাটি দেশীমতে গোয়ানীজদের তৈরী মদ! আমাকে ভুলে যাও। আমাকে ফেরাবার চেষ্টা করো না, তা হলে আমাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে। ইতি—

সুরেশ্বর।

কষ্ট সুলতার নিশ্চয় হয়েছিল। তার মা-বাপ কেউই তার এবং সুরেশ্বরের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতার কথা জানতেন না। সে রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে সারারাত্রি কেঁদেছিল। একবার ভেবে-ছিল সে নিজে কীর্তিহাট যাবে, দেখা করে মুখোমুখি প্রশ্ন করবে—বল কি ব্যাপার! কেন এ চিঠি লিখেছ? কেন? কিন্তু ভাবলেও তা কাজে করতে পারেনি। মনে হয়েছিল, তার থেকে বোধহয় মেয়ের পক্ষে মৃত্যু ভাল। নিজে যাবে সে উপযাচিকা হয়ে তাকে সাধতে! ছি-ছি-ছি! ওদিকে ভাগ্যক্রমে ওদের স্টুডেন্টস মহলে ছাত্র-আন্দোলন উঠেছিল জমে। তারই মধ্যে পড়ে-ছিল সে ঝাঁপ দিয়ে। তারপর বের হল পরীক্ষার খবর। এই খবরটাই তাকে শুধু বাঁচিয়ে দিলে না, উৎসাহে তার মাথাটা উঁচু করে দিয়ে বললে—বেঁচে গেছ। চল, সামনে চল। বি-এ পরীক্ষায় ইকনমিক্সের অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। প্রবল উৎসাহে সে এম-এ পড়তে শুরু করলে। যেদিন এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয় সেইদিনই সে দাঁড়িয়ে ছিল ধর্মতলার মসজিদটার কাছে, ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর, অপেক্ষা করছিল ট্রামের জন্য। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখা চোখি হয়ে গেল সুরেশ্বরের সঙ্গে।

সুরেশ্বরের গৌরবর্ণ রঙের উপর একটা পোড়া দাগের মত ছোপ ধরেছে। পরনে তার সেই বিচিত্র অদ্ভুত সাজ আরও অদ্ভুত হয়েছে। গেরুয়া রঙের সিল্কের একটা আলখাল্লা গোছের জামা। পরনে কোঁচানো ধুতি। মুখে একমুখ দাড়ি-গোঁফ, বাবরী চুল, চোখে—স্বপ্নাতুরই হোক আর উদ্ভ্রান্তই হোক—একটা বিচিত্র দৃষ্টি, সে বেরুচ্ছে লাহাদের দোকান থেকে। তার পিছনে একটা লোকের মাথায় একগাদা জিনিস—সম্ভবত ছবির জন্য তৈরী ক্যানভাস। লোকটার হাতেও একটা কাঠের বাক্স, তাতে বোধহয় তার্পিন—বার্নিশ রঙের টিন ছিল। সুরেশ্বরের নিজের হাতে একটা প্যাকেট। সম্ভবতঃ রঙ-তুলি। ভাগ্যক্রমে বেরুবামাত্র দুজনেই দুজনকে দেখতে পেয়েছিল, চোখোচোখি হয়েছিল। সুলতার চোখ বিস্ফারিত দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেও মুহূর্ত দুয়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল, সুলতার চোখের সঙ্গে মিলিত হওয়া তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু ওই দুই মুহূর্ত পরেই সে মুখ ফিরিয়ে হনহন করে চলতে শুরু করেছিল পশ্চিম মুখে এগিয়ে। ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল একখানা ট্রাম। দাঁড়িয়ে-ছিল দু ফুটপাথের মাঝখানে আড়াল করে। সে ট্রামে সুলতা চড়েনি। ট্রামখানা চলে গেলে সে তাকিয়ে তাকে খুঁজেছিল। তখন সুরেশ্বর আর নেই। পরের ট্রামে সে ইউনিভার্সিটি এসেছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় তাকে ফোন করেছিল। ধরেছিল চাকর। সে নাম বলেছিল, বলে-ছিল—বল বাবুকে সুলতা ঘোষ ডাকছেন। সে শুনতে পেয়েছিল সুরেশ্বর বলছে—বল বাবু বাড়ী নেই। উত্তরটা সে আর চাকরের মুখে শোনার জন্য প্রতীক্ষা করেনি। রিসিভারটা রেখে দিয়েছিল। ঘৃণা হয়েছিল তার।

কারণটা জানতে তার দেরী হয়নি।

অসীমা তাকে বলেছিল—সুরোদার খবর শুনেছিস?

—কি?

—সেখানে প্রবল প্রতাপে জমিদার হয়ে বসেছে। মদ খাচ্ছে। দেশী মদ। বাবা বল-ছিলেন—ভাল উপমা দিয়ে বললেন—বুনো মোষ যেমন পাবজলে গলা ডুবিয়ে বসে, তেমনি

ভাবে ডুবেছে শুনছি।

সুলতা বলেছিল—ওর চেয়েও ভাল উপমা আছে অসীমা। বন্য শূকরের উপমা। তারা শুধু গা ডোবায় না। দাঁতশুদ্ধ মুখ ডুবিয়ে পাঁক আর গেঁড়ো তুলে খায়।

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল অসীমা। কিন্তু সুলতা চলে গিয়েছিল। বলেছিল—কি করব শুনে অসীমা। আজ আমার ক্লাসের পর ক্লাস। তারপর ইউনিয়নের মিটিং।

এম-এ পরীক্ষার সময় সে শুনেছিল সেবার ফাইন আর্ট এগজিবিশনে সুরেশ্বর রায় একখানা ছবির জন্য ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। ছবিখানার নাম মা-যশোদা। একটি শ্যামাঙ্গী তরুণী মায়ের কোলে ছেলে আর আকাশের চাঁদ। ছবিতে এক সময় আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে আগ্রহ তার বোধ করি বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল সেবার।

অসীমা গিয়েছিল সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে। অসীমার সেবার ফিফথ ইয়ার। ফিরে এসে সুলতাকে ফোন করেছিল—সুরোদা বিলেত যাচ্ছে সুলতা।

—বিলেত ? তা ভাল। ওই কীর্তিহাটের জমিদারী থেকে ভাল। কিন্তু খবরটা আমাকে কেন ?

—এমনি। তোকে একটা জিনিস দিয়েছে দিতে।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ। একখানা ছবি। খুব সুন্দর একটা ল্যাণ্ডস্কেপ !

—ধন্যবাদ জানাস। কিন্তু আমার ঘরে ছবি টাঙাবার জায়গা নেই। ফিরিয়ে দিস।

—ফিরিয়ে দেব ?

—হ্যাঁ। বলে সে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল। তারপর পড়ায় মন দিয়েছিল। যেন এই ছোট্ট ঘটনাটা তার পড়ার ঝোঁকে বেশ খানিকটা জোর জুগিয়েছিল দু-চার দিনের জন্য।

সেবার এম-এ পরীক্ষায় সুলতা হয়েছিল ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বাবা-মা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, মেয়েকে সংসারী দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা, কোন বাবা-মা তা না চায়, কিন্তু তার ছাত্রী-জীবনের এই সাফল্য এখানেও তাকে তার স্বাধীন মতে চলবার পাশপোর্ট দিয়েছিল। সে চাকরী পেয়েছিল, ভাল চাকরী, গভর্ণমেণ্ট ডেকে তাকে শিক্ষা বিভাগে বেথুন কলেজে ইকনমিক্সের লেকচারার করে নিয়েছিল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হবে এ আশ্বাসও ছিল। নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিয়েছিল পরমোৎসাহে। নিজেকে বিচার করে সুলতা দেখেছে। তাতে বুঝেছে সুরেশ্বরের প্রতি অনুরাগ এর হেতু নয়। আজকালকার নারী-স্বাধীনতার যুগেও মনের অ্যাডোলেসেন্সের একটা কাল আছে ; সে কালের মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবে কিছু তরুণ বন্ধু কিছু কিছু স্বপ্নসঞ্চার করে, কিন্তু সে স্বপ্নই। স্বপ্ন দুভাবে মিলোয়—এক, কিছুক্ষণ বেশ গল্পের মত বাস্তবের ধারাবাহিকতা রেখে চলে কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, তুলির হিজিবিজি দাগ টেনে আঁকা ছবি মিটিয়ে দুর্বোধ্য করে দেওয়ার মত। অথবা কোন রচনার অংশবিশেষের উপর কলমের দাগ টেনে কেটে দেওয়ার মত। আর একভাবে শেষ হয়, ঘুম ভেঙে গিয়ে স্বপ্ন-স্বপ্ন অর্থাৎ মিথ্যে বলে ব্যঙ্গ করে মিলিয়ে যায়। সে স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত

হিজিবিজি হয়ে বা অবান্তর অবাস্তব হয়ে স্বপ্নের মধ্যেই অর্থহীন হয়, তাতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকে না, শুধু হাসি পায়। কিন্তু যে স্বপ্ন ধারাবাহিকতায় বাস্তবের পথে চলতে চলতে ঘুম ভেঙে থেমে যায় ভেঙে যায় সেই স্বপ্নই স্বপ্নকে মুখ ভেঙচায়, এবং স্বপ্ন যে দেখে তাকেও ভেঙচায় এই বলে যে কেমন ঠকেছ! তাতেই হয় খেদ, তাতেই স্বপ্নকে ব্যঙ্গের বিষয় করে তোলে। সুরেশ্বরের সঙ্গে তার জীবনের এই ঘটনাটুকু পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও ধারাবাহিকতায় এবং ঘটনা-বিন্যাসে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তব ছিল, সেটা এইভাবে হঠাৎ ভেঙে গেল, ঘুম ভেঙে স্বপ্ন অসমাপ্ত হয়ে শেষ হওয়ার মত। যার ফলে যে কোন অন্য পুরুষের প্রতি এবং প্রেমের প্রতিও তাকে বিমুখ করে তুললে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বদলে সে চাকরী এবং ঘরকন্নার বদলে চাকরীর সঙ্গে রাজনীতির বৃহত্তর জীবন ও জগতের রঙ্গমঞ্চে বেশ বড় পার্ট পেয়ে গেল। তাতেই মেতে উঠল। তখন ১৯৩৯ সাল। পৃথিবী এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বলতে গেলে পুরনো অঙ্ক শেষ হয়ে নতুন অঙ্ক শুরু হচ্ছে। যার গতি যার আবেগ—নাটকের ভাষায় টেম্পো—একেবারে গোমুখীতে গঙ্গাবতরণের মত। স্বর্গের মন্দাকিনী পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে তার জলে ধুলো, মাটি, খড়-কুটো সবকিছু স্বীকার করে কলস্বরে ঘোষণা করছেন—গঙ্গা হলেও আমি জল, গতি আমার নিম্নগামিনী, বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা হয়েও আমি মাটিকে ভালবাসি, আবিলতাকে স্বীকার করি! এই সত্য এই বাস্তব।

ইয়োরোপে তখন যুদ্ধ বাধে-বাধে অবস্থা। চীন জাপান যুদ্ধে নেমে গেছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বামপন্থা প্রবল হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা সোস্যালিজম কম্যুনিজম নিয়ে প্ল্যান করছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন শুদ্ধ সুভাষচন্দ্র—ভারতের বিদ্রোহী আত্মার নব-যৌবনের প্রতীক; তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের দৃষ্টি এবং পদক্ষেপের মন্থরতার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি এবং পদক্ষেপ মিলছে না। সেই কালে পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রেরণায় সুলতা কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় নেত্রীস্থানীয় হয়ে উঠল। বাংলার নবীনা নেত্রী যাঁরা—কমলা দাশগুপ্তা, বীণা দাশ, মায়া ঘোষ প্রভৃতি মন্দিরা কাগজকে কেন্দ্র ক'রে সমবেত হন—সে দলে সে ঠাঁই ক'রে নিলো। এরই মধ্যে একদিন দেখা হয়ে গেল সুরেশ্বরের সঙ্গে। দেখা হল না—সেও তাকে দেখলে—সুলতাও তাকে দেখলে। হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেল ছাড়ছিল—সন্ধ্যেবেলা—সুলতা গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে, তার বান্ধবীকে তুলে দিতে অন্য একটা গাড়ীতে। হঠাৎ সে দেখলে কুলীর মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে নিঁখুত সাহেবী পোশাক-পরা সুরেশ্বর চলেছে। মুখোমুখি প্রায়; দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দুটি কথা হয়েছিল। সুরেশ্বর বলেছিল—বিলেতে যাচ্ছি। সুলতা বলেছিল—গুড লাক! বলে সে-ই আগে পাশ কাটিয়ে অন্য প্ল্যাটফর্ম-মুখে চলে গিয়েছিল। সুরেশ্বর কি করেছিল ফিরে তাকিয়েও দেখেনি, তবে সে যে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি এটা সে অনুমান করেছিল। সে হয়তো মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে মেলের রিজার্ভকরা ফার্স্ট ক্লাস বার্থে গিয়ে চেপে বসেছিল।

কাগজে দেখেছিল—হঠাৎ নজরে পড়েছিল—বিলেতে তার একখানা ছবির খুব প্রশংসা হয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান ম্যাডোনা'। কাগজে লিখেছিল—এই ছবিখানাই কলকাতার প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মান এবং প্রশংসা পেয়েছিল।

তাতেও তার অর্থাৎ স্থলতার জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দগতি কোন বেদনাদায়ক স্বপ্নের দ্বারা বিঘ্নিত হয় নি। সহজভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে সেও কাগজখানা পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে বিক্রী ক'রে দিয়ে এগিয়ে চলেছিল আপন পথে—কলেজে, কাগজের আপিসে। পার্টি আপিসে অবশ্য সে যেত না; সেটা সরকারী চাকরির বাধা-নিষেধের জন্য।

* * *

তারপর, গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে—এ কথাটাও 'যৎকিঞ্চিৎ' হয়ে গেছে ব্যঞ্জনা হিসেবে। ভাগীরথীর মুখেই চড়া পড়েছে, এতদিনে সত্য ক'রে গঙ্গার ধারা দুটো হয়ে গেছে দুটো দেশে। ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ যখন দেশ ত্যাগ করল, তখন ভাগীরথীর বুকে জাহাজ ভাসিয়ে ডায়মণ্ড-হারবার হয়ে যেভাবে বাংলা দেশে এসে কলকাতার পত্তন করেছিল—কুঠী গেড়েছিল, সেভাবে এদেশ ত্যাগ করেনি। ভাগীরথীর মুখেও চড়া পড়েছে। তারা দলে দলে ১৯৪৭-৪৮ সালে দমদম এরোড্রোম থেকে প্লেনে উড়ে চলে গেছে; ইংরেজ পল্টনেরা গেছে বম্বেতে ইণ্ডিয়া গেটের ভিতর দিয়ে বম্বে ডকে জাহাজে চেপে।

বাংলাদেশে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তখন রাজনৈতিক ক্যারমবোর্ডে দলাদলির স্ট্রাইকারের ধাক্কায় কর্মীরা বিভিন্ন দলের পকেটে ঘাঁটি গাড়ছে।

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে স্থলতার মিল ১৯৪২ সাল থেকেই নেই। অর্থাৎ জনযুদ্ধের আমল এবং অ্যান্টিফ্যাসিস্ট লেখক-শিল্পীদের আন্দোলনের আমল থেকে। সে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি-বিজ্ঞানের দৃষ্টি পেয়েছে। সে এসবের তত্ত্ব এবং মর্ম বুঝত। গোড়া থেকে সে সোস্যালিস্ট। তখনও পর্যন্ত, সোস্যালিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যেই ছিল—সেও ছিল—তবে একই বোর্ডের চারটে পকেট হওয়ায় একটা পকেটেই স্থান করে নিয়েছিল। তারপর প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন। ডাঃ বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। প্রদেশ কংগ্রেসেও ওলোটপালোট হল। অতুল্য ঘোষ প্রেসিডেণ্ট হলেন। মহাত্মাকে হত্যা করলে গডসে দিল্লীর বিড়লা ভবনে। তারপর ঐক্যের বন্ধন দেখতে দেখতে ছিন্ন হয়ে গেল। সোস্যালিস্টরা পৃথক হল। তার সঙ্গে সঙ্গে স্থলতাও তারপর একান্ন সালে ইলেকশনের আগে কৃষক-প্রজা-পার্টি হল। প্রফুল্ল ঘোষ তার বাংলাদেশের নেতা—সর্বভারতীয় প্রধান হলেন আচার্য কৃপালনী। ইলেকশন হয়ে গেল। সোস্যালিস্ট-কৃষক-প্রজা এক হয়ে পি-এস-পি হল।

দেশকে দেশের মানুষকে তীব্র আক্রমণ না করে পারলে না স্থলতা। মানুষগুলো অদ্ভুত বোকা। এরা ধরতেও পারলে না কংগ্রেসের পরিবর্তন। তার ধাপ্পাবাজি! তারা ভোট দিলে কংগ্রেসকেই। কংগ্রেসকে এই সাবাস স্থলতা দেয় যে, কংগ্রেস এই বোকা মানুষগুলোকে ঠিক চিনেছে। তারা যেখানে যেমন সেখানে তেমন খেলা খেললে। যেখানে জমিদারকে দাঁড় করালে ভোট পাবে, সেখানে জমিদারকে দাঁড় করালে। যেখানে শেঠকে দাঁড় করালে টাকার জোরে জিতে যাবে, সেখানে তাই করল। যেখানে কর্মী দিতে হবে, সেখানে কর্মীই দিল। এবং এই কৌশলে অধিকাংশ পল্লী অঞ্চলেই জিতে গেল। দু-চার জায়গায় হার হল না তা নয়—তবুও তারা সংখ্যায় এমন মেজরিটি হল যে, সব দলগুলি তাদের মতবাদ এবং নিজেদের সততা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট গৌরব এবং বিশ্বাস পোষণ করেও মানুষের কাছে গৃহীত হ'ল

না। তবে এটা ঠিক কথা যে—অন্ততঃ স্থলতাদের তাই বিশ্বাস—এই যাত্রাদলের রাজার সাজ —যা প'রে কংগ্রেসওয়ালারা আসর জমাচ্ছে—সে আসর ভাঙবেই। জীবনের আসর চিরদিনের, সত্যের কদর চিরদিনের, কিন্তু জীবনের নামে অভিনয়ের আসর যতই অভিনয়গুণে জীবন্ত হোক, অভিনয় শেষ করতেই হয়। তখন পালাটা আর সত্য থাকে না এবং পালার বীরগুলো তখন একান্তভাবে নট বলে ধরা পড়ে। তখন সত্য এবং সত্যকারের মানুষের কাল আসে; তাদের তখন চেনে মানুষ—তাদের ডেকে এনে বসায় জীবনের আসরে। কথাটা আরও জোর দিয়ে বললে সে—পঞ্চাশ সালটা গোটা বিলেত এবং ইউরোপ ঘুরে এসে। স্টেট থেকেই স্কলারশিপ পেয়েছিল সে।

১৯৫৩ সালের নভেম্বর সেসনে কংগ্রেস দল নাটুকে ভাঁওতা দিলে দেশের মানুষকে জমিদারী উচ্ছেদ বিল এনে। জমিদারী উচ্ছেদ বিল নয়, এস্টেট্স্ এ্যাকুইজিশন বিল। শুধু দেশের মন্ত্রিত্ব নিয়ে তৃপ্তি হচ্ছে না এদের—জমিদারদের জমিদারী কিনে প্রকারান্তরে তারা জমিদারই সেজে বসবে। প্রজার খাজনায় এক পয়সা মকুব হবে না, ষোল আনা লাভ সমেত আয়বৃদ্ধি হবে। পতিত জমি—যা জমিদারদের খাস—তা আসবে তাদের হাতে—তারা বিলি করবে ইচ্ছামত। বিনিময়ে ভোগের স্থবিধে হবে বটে।

বিল যেদিন থেকে বিধানসভায় এসেছে সেদিন থেকেই সে প্রায় নিয়মিত আসছে—শুনছে বক্তৃতা। অভিনয় দেখছে। কিন্তু একদিনও সে স্থরেশ্বরকে দেখে নি। এবং এমনই ভাবে সে তার মন থেকে স'রে বা মুছে গেছে যে, তার দেখা এখানে পেতে পারে এমন কথা তার মনে হয় নি। এর অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সেটা এই যে, স্থরেশ্বর দেশে ফিরে—সে সেই ৪১ সালে—আবার সেই কীর্তিহাটেই ফিরে গেছে। সে তার খোঁজও করে নি কোনদিন এবং কোন সংবাদও সে পায় নি—যাতে তাকে মনে করবার হেতু হতে পারে। না শিল্পী হিসাবে না মানুষ হিসাবে। অসীমা-সীমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারা ঘরণী গৃহিণী —অবশ্য ভাল ঘরেরই। তারাও তাকে ভুলেছে—সেও তাদের ভুলেছে। দেখাও হয় না। চিঠি লেখালিখিও নেই। তা ছাড়া আর একটা পার্থক্য হয়েছে সেটা সীমা-অসীমার ভাইকে নিয়ে। প্রদীপ যৌবনে পা দিয়েই বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ গিয়ে পড়েছিল অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স্-আর্টিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনে। সেখান থেকে একেবারে কম্যুনিস্ট পার্টিতে। দীর্ঘদিন স্টুডেন্টস ফ্রন্টে স্টুডেন্ট লীডার হয়ে ছাত্রজীবনের জের টেনে অবশেষে এ্যাডভোকেট হয়েছে হাইকোর্টে। পার্টির মেম্বারও সে বটে। কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৪৯।৫০ সালে বে-আইনী ঘোষিত হলে অনেকদিন জেলেও ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে সে হাইকোর্ট যাচ্ছে আসছে। এর মধ্যে রাশিয়া-চীন দুটো দেশেই ঘুরে এসেছে। তার সঙ্গে চীনে গিয়েছিল অসীমা আর তার স্বামী—রাশিয়া গিয়েছিল সীমা এবং তার বর। তারা দুই বোনেই বিলাসিনী ধনী গৃহিণী হয়েও এবং পার্টি মেম্বার না হয়েও খুব কড়া রকমের কম্যুনিস্ট মতবাদ পোষণ করে। স্থতরাং তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়া দূরের কথা—পথে দেখা হলেও এদিকে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গগলসটা অকারণে দুহাত দিয়ে নাকের উপর টিপে বসায়। অর্থাৎ স্থরেশ্বরের সংবাদ কোন একটি স্থচীছিদ্র সরু পথেও কোন স্থত্রে আসে নি, আসতে পায় নি। স্থতরাং

এস্টেট্‌স্ এ্যাকুইজিশন বিলের শেষদিনে সে যখন পরম কৌতূহলভরে উপর নিচে জমিদারদের মধ্যে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহকে দেখে, তারপর বর্ধমানের মহারাজার টুপি খুঁজে দেখতে গিয়ে পেল না, তখন আর কাউকে খোঁজে নি—সুরেশ্বরকে মনেও পড়ে নি। শুধু একটা কৌতুককর কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আজ যদি ভূমিরাজস্বমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জায়গায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ থাকতেন তো বড় ভাল হত। তাহলে অপোজিশনের কেউ না কেউ তাঁর কৌতুক-কথাটা নিশ্চয় বলত। অন্ততঃ সে শ্রীসুধীর রায়-চৌধুরীকে, দাশরথি তা'কে বলে দিয়ে আসত বলতে। বলত—দেড় শো বছর পরে আবার হেস্টিংস আর তাঁর দেওয়ান বার রাঁইয়া নতুন খেলা খেলতে এসেছেন।

গালাগাল, তীব্র সমালোচনা, কঠিন উক্তি, গোলমাল করে বিপক্ষ দলের বক্তৃতায় বাধা দেওয়া, বক্তৃতা ঢেকে দেওয়া হয়ে গেছে। আজ শেষদিনে এই হলে ঢুকে ওই কথাটা মনে করেও সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেল। মনের মধ্যে একটা গম্ভীর ভারী থমথমে কিছু জুড়ে বসল। এ দেশের ইতিহাস স্মরণ ক'রে মনে হ'ল—যাই গলদ থাক নতুন আইনে, আজ এর গুরুত্ব এর মহত্ত্ব এর বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। মনের মধ্যে তার হঠাৎ মনে হল—একটা দেড়শো বছরের পাকা ইমারতের তলায় ডিনামাইট চার্জ করা হয়েছে—যে মুহূর্তে স্পীকার বলবেন—It is now agreed to and passed—; সেই মুহূর্তে বিপুল বিস্ফোরণ শব্দের সঙ্গে বিরাট ইমারত টলতে টলতে চারিপাশে ফেটে চৌচির হয়ে বিপুলতর শব্দ করে মাটিতে আছড়ে পড়বে। বিরাট একটা ধূলির পুঞ্জ উঠবে আকাশে, ঢেকে দেবে চারিদিক। হয়তো চাপা পড়ে মানুষ কাতরাবে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে। শুনতে হবে দাঁড়িয়ে। চোখে জল এলেও মুছে ফেলতে হবে। যারা ওই ঘর আঁকড়ে পড়ে ছিল মৃত্যুই তাদের নিয়তি। মরতে দাও তাদের। তারা মরুক। খেদ কিসের? তাকাও, দৃষ্টি আরও প্রসারিত করে তাকাও; স্মরণ কর; এই তো কিছুদিন আগেই গোটা করদ রাজ্যগুলি অসহায়ভাবে এমন করেই ভেঙে পড়েছে! মনে পড়ছে না হায়দ্রাবাদে নিজামের নিজামত্বের সব থেকে উঁচু মিনারটা ভেঙে পড়ে যাওয়ার ছবি? কেঁদো না।

ভাবছিল সে। এরই মধ্যে কারুর মোটা' ভারী গলার শব্দে সে চমকে উঠল। ডাঃ রায়ের গলা। তিনি তাঁর শেষ বক্তৃতা দিতে উঠেছেন। সম্ভ্রম ভরেই সে তাঁর দিকে তাকালে। অস্পষ্ট গোটা হাউসে কোথাও অসম্ভ্রম ছিল না। সকলে ডাঃ রায়ের গুরুত্ব পূর্ণ স্বীকার করে গম্ভীর-ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ডাঃ রায় আরম্ভ করলেন—

"Sir, the curtain is about to be rung down on the scene with which —we in Bengal have been familiar for the last 150 years."

হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। বেশ বলেছেন। যবনিকা নেমে আসছে। জমিদারদের নাটমন্দিরে, জলসাঘরে, উৎসব-সমারোহের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যের শেষে যবনিকাপাত হচ্ছে! জমিদারেরা এবার মুখের রঙ তুলে জরির পোশাক ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াবেন। এতক্ষণে হঠাৎ মনে পড়েছিল সুরেশ্বরকে। কীর্তিহাটের বাড়ী চাপা পড়বে সে? না—বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়াবে?—

সে চিন্তা বেশিক্ষণ থাকেনি। ডাঃ রায়ের গম্ভীর কণ্ঠের বক্তব্য স্তব্ধ বিধানসভার গম্বুজের

গোল ছাদে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, একটানা তিনি বলে চলেছিলেন—একটিবারের জন্য কোন কথা কেউ বলেনি—অন্য কোন শব্দও হয় নি।

"I am glad to say that my Party has been able to put before the country to-day a scheme which, I hope, will lead to better understanding between the raiyats and the landlords, between different clasess of society in this country and I hope that this will lead to the establishment of what we earnestly desire namely a welfare state in Bengal."

শেষ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস তরফ থেকে শুরু হয়ে সারা সভায় সঞ্চারিত হয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল টেবিল চাপড়ানোর শব্দ—যা করতালি ধ্বনি বলে গণ্য। বেশ লাগল। হাসি মুখেই উঠে দাঁড়াল সুলতা। শুধু দুটি শব্দে তার আপত্তি আছে। My Party. —কেন? শুধু My Party. কেন? জমিদারী প্রথা উঠবে এতে কার আপত্তি ছিল—কে না চেয়েছিল? এ যে বাংলাদেশের মাটির ভেতর থেকে বাংলাদেশ চেয়েছিল।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সে লবীতে দাঁড়াল। দলে দলে এম-এল-এরা এখনও বিতর্ক করছেন। কিছু কিছু প্রবীন সভ্যেরা বেরিয়ে যাচ্ছেন। নিচে গাড়ী এসে দাঁড়াচ্ছে। নিজের নিজের গাড়ীতে উঠে চলে যাচ্ছেন। ওদিকে ওপর থেকে সিঁড়ি ভেঙে দর্শকেরা নামছেন। চিনি-চিনি করেও যেন কয়েকজনকে চেনা গেল না। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী নামলেন। বামপন্থীরা তাঁর দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করলেন। কয়েকজন নমস্কার করলেন—শ্রীশ নন্দীও মৃদু হেসে নমস্কার করলেন।

একজন খবরের কাগজের রিপোর্টার তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম স্যার।

—বলুন।

—এই বিল সম্বন্ধে আপনার মত!

—নিশ্চয়ই খুব ভাল! ডিটেলস নিয়ে হয়তো একটু-আধটু পার্থক্য থাকতে পারে।

—একটু বেশী করে—

—ওই খুব বেশী যথেষ্ট। খুব ভাল। দেশের লোক যখন চেয়েছে। এবং জমিদারেরাও বাঁচল। ওদিকে পিছন থেকে সরস কণ্ঠে কেউ বললে—অন্তত: গালাগালের হাত থেকে। তিনি আর কেউ নন—তিনি কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ। তাঁর কণ্ঠস্বর সুপরিচিত।

শ্রীশচন্দ্র নন্দী নেমে গেলেন—তাঁর গাড়ী এসে লেগেছে। বাইরে কম্পাউণ্ডে গাড়ীর হর্নে রাত্রি চকিত হয়ে উঠেছে—হেডলাইটের আলোগুলো বাগানের গাছের মাথায় মাথায় ঘুরছে বাঁক নেবার সময়।

কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ একজন বামপন্থী নেতাকে বললেন—আপনার স্পীচ যাকে বলে টাইগারি স্পীচ হয়েছে। ওয়াণ্ডারফুল। সন্দেহ হচ্ছিল নিজের চরিত্রে। খুব বলেছেন লাম্পট্য টাম্পট্য লাগিয়ে—! হেসে উঠলেন। বেড়ে বলেছেন। তা চলুন না, চা খেয়ে গল্প ক'রে যাবেন বাড়ী।

—আজ না !

—বেশ, তা হলে কবিয়াল গোমানী আর লম্বোদরকে ডেকে আসর পাতাই একদিন। একজন জমিদার একজন লেফটিস্ট লীডার—আপনার স্পীচের জবাব সেখানে পেয়ে যাবেন। কি বলেন।

—মোস্ট গ্ল্যাডলি ! তবে কান্দীর মিষ্টি খাব। মনোহরা।

—তার সঙ্গে লবণাক্ত কিছু ? আপত্তি হবে না তো ?

ভদ্রলোক বললেন—নিশ্চয় না। জমিদারদের গাল দিয়েও আপনার গুণ গাইব।

ঠিক এই সময়টিতেই এসে সামনে দাঁড়াল দীর্ঘকায় একটি লোক। প্রথমে চিনতে পারেনি সুলতা। চোখে নীল চশমাটার জন্যে আর ওকে এখানে দেখতে পাবার সম্পর্কে সচেতনতা না-থাকার জন্যই চিনতে পারেনি। তবে রোগাও হয়ে গেছে সে। শীর্ণ দেখাচ্ছে। দাড়ি গোঁফ না থাকাটাও একটা কারণ বটে। গায়ে ঢিলেঢালা আলখাল্লা গেরুয়া সিল্কের। পরনে পাজামা। সুরেশ্বর তার সামনে থমকে দাঁড়াল। সুলতা তখনও তাকিয়ে ছিল তার নীল চশমাটার দিকে কারণ চশমাটা যেন তার মুখেই নিবদ্ধ। কে ? ভাবছিল সুলতা।

চোখের চশমাটা খুলে সুরেশ্বর বললে—চিনতে পারছ না ?

সুলতা সবিস্ময়ে বলে উঠল—তুমি ? তার বিস্ময় তাকে উষ্ণ হয়ে উঠবারও অবকাশ দিলে না।

হেসে সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ।

সকৌতুকে এবার সুলতা বললে—জমিদারীর উপর যবনিকাপাত দেখতে এসেছিলে ?

সুরেশ্বর হাসলে, বললে—হ্যাঁ।

সুলতা বললে—তা যবনিকাপাতের সঙ্গে পাল চাপা পড়েনি। কংগ্রেস সুবিধে দিয়েছে, গ্রীনরুমে গিয়ে কম্পেনসেশনের টাকায় মেক-আপ বদলে এবার নতুন সাজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে পারবে। এবার কি হবে ? কংগ্রেসী, না বিজনেস ম্যাগনেট ? তা ছাড়া তোমাদের তো আরও সুবিধে, দেবোত্তর। এবার আর নায়েব গোমস্তা পাইক রেখে প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করতে হবে না। খোদ সরকার এবার অ্যানুয়িটি পৌঁছে দেবেন !

সুরেশ্বরের হাসি এতেও মিলিয়ে গেল না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদিক থেকে কুমার বিমলচন্দ্র সিং সুরেশ্বরকে দেখে বললেন—কি মশাই, আপনি কীর্তিহাটের সুরেশ্বর রায় নয় ? শিল্পী সুরেশ্বর রায় ?

সুরেশ্বর নমস্কার ক'রে বললে—হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ, তা আছি। উপায় কি ভালো না থেকে ? তারপর আপনার খবর কি ? বিলেতে গিয়ে নাম কিনে দেশে এলেন। তারপর সব নীরব। তবে শুনি না কি দেশে বসে দেদার ছবি আঁকেন। তা আমাদের দেখান !

—দেখাব !

—হ্যাঁ। এগজিবিশন করুন।

—এগজিবিশন নয়। কয়েকজন রসিক এবং আপনজনকে দেখাব।

—বেশ। আমাকে বাদ দেবেন না।

—নিশ্চয়ই না!

—আচ্ছা চলি।

তাঁর গাড়ী এসে লেগেছে। তিনি চলে গেলেন।

সুলতা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বললে—আমাকে দেখাবে না?

—ছবি?

—হ্যাঁ!

—যদি বলি আজই চল। তোমাকেই সর্বাগ্রে দেখাবার বাসনা আমার ছিল। এখানে না-পেলে আমি তোমার বাড়ী যেতাম! কারণ ছবি ঠিক এগজিবিশন নয়। ছবির মধ্যে দিয়ে আমার জবানবন্দী।

বিস্মিত হয়ে সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। এদিকে লবী জনবিরল হয়ে এসেছে। যাঁরাও আছেন তাঁরা নেমে গিয়ে বাগানে গিয়ে কে কার গাড়ীতে যেতে পারেন দেখছেন। কিছু কিছু দল বেঁধে হেঁটে বেরিয়ে পড়ছেন। এসপ্ল্যানেডে বা হাইকোর্টের ওদিকে গিয়ে ট্রাম ধরবেন। সুলতা এবং সুরেশ্বর ছাড়া মাত্র জন পাঁচ ছয় লোক ছিল। তার মধ্যে তিনজন হাউসের কর্মচারী।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতার মনে হচ্ছিল—এ যেন আর একজন—সে নয়। সে ছিল উল্লসিত উদ্ভাসিত বেপরোয়া একজন। এ যেন ক্লান্ত প্রশান্ত মানুষ একজন। সুরেশ্বর বললে—চল!

—আজ? তুমি পাগল?

—সে তো চিরকালের। পাগলামি আমার আছে সেটা জানি বলেই উন্মাদ নই। তবে যে-কোন মুহূর্তে পাগল হতে পারি। উঠতে পারে পাগলামি। বলেই সে খপ করে তার হাত ধ'রে বললে—চল!

চমকে উঠল সুলতা। কিন্তু রুষ্ট হতে পারলে না। কারণ এ হাতধরা জোর করে হাতধরা নয়, এ হাতধরার মধ্যে মিনতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

সে বললে—ছাড়।

ছেড়ে দিলে হাত সুরেশ্বর। বললে—জোর নেই তোমার ওপর। কিন্তু গেলে আমি খুশী হতাম। ছবি দেখে কে কি বুঝবে জানিনে। বোঝাবার গরজও নেই আমার। ছবির ভেতর জবানবন্দী—ছবির রঙে হারিয়ে যাবার ভয় আছে। তাতে শিল্পী সুরেশ্বর জিতবে। কিন্তু মানুষ সুরেশ্বর বোবা আসামীই থেকে যাবে। তোমাকে পেলে তোমার কাছে সে বাঙ্ময় হতে পারত। বাচালও হয়তো হতো। এখানে যে নাটকের যবনিকাপাতের জন্য উল্লাস করছ সেখানে গেলে নাটকটার ম্যানাস্ক্রিপ্টটা দেখতে পেতে। আচ্ছা—

বলে সে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে।

সুলতার ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। মনের মধ্যে যেন দ্বিধা জেগেছে একটা। ওই

লোকটার সম্পর্কে ধারণা তার যত খারাপ হোক তবু কি জানি কেন যেন একটা করুণা জাগছে। হাতের ঘড়িটার দিকে একবার সে চেয়ে দেখলে। নটা বেজে চার মিনিট। জানবাজার কাছেই। একবার ওর ওখান হয়ে গেলে কি হয়? বড়জোর দশটা, সওয়া দশটাই বাজবে। তাতে খুব দেরী হবে না। সে ডাকলে—দাঁড়াও। শুনছ!

সুরেশ্বর তখন ফটকে। সে ফিরে দাঁড়াল। —কিছু বলছ?

—হ্যাঁ। কাছে এসে বললে—চল, কিন্তু আধঘণ্টার বেশী না।

—তা হলে একটা ট্যাক্সি নিই।

—সেই ভাল।

একটু এগিয়ে এসে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই ট্যাক্সি একটা মিলল, তাতে চড়ে বসে এসে সেই জানবাজারের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। বাড়ীটা চেনা যায় না। দীর্ঘদিন এ পথে সুলতা হাঁটেনি। সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার একটা আধুনিক বহিঃসজ্জা। রেলিংদেওয়া জোড়া জোড়া গোল থামওয়ালা সেই এক-শো সওয়াশো ফুট লম্বা বারান্দাটা বন্ধ করে আধুনিক প্যাটার্নের একটা চেহারা দেওয়া হয়েছে।

সুলতা দাঁড়িয়ে দেখলে বাড়ীটাকে। তারপর বললে—এটা কি করেছ বল তো?

—বারান্দাটাকে ঘেরার কথা বলছ?

—হ্যাঁ। হঠাৎ হেসে বললে—তবে তোমার মনটা ফুটে উঠেছে। বা তুমি ফুটে উঠেছ এর মধ্যে।

হাসলে সুরেশ্বর, বললে—বলতে পার। তবে কি জান, এসব কথা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। প্রথম যখন দাড়ি গোঁফ চুল রেখে আলখাল্লা পরতাম তখনও শুনেছি। এখনও শুনি। আর অল্পবিস্তর সকলের চেহারাই তো এই। সে রাজার ছেলে গৌতম সিদ্ধার্থের চাঁচর চুল কেটে চীরবস্ত্র পরে বনে যখন তপস্যায় গেলেন তখন দেবদত্তরা এই ধরণের কথা বললে তো মিথ্যে বলে নি। অন্ততঃ প্রথম প্রথম যে দেখেছে সেই বলেছে—মানায় নি। ব্যারিস্টার গান্ধী যখন প্রথম গান্ধীর সাজ পরেছিলেন তখনও কি এমন ভাবে নি লোকে? তারপর ধর তোমার কথা। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন ঠোঁটে তোমার লিপস্টিক ছিল, মনে পড়েছে আমি একটু বাঁকা কথা বলেছিলাম। আজ তুমি এমনই সেজেছ বা হয়েছ যে সেই লিপস্টিকের কথা তুললে এই ধরণেরই কথা হবে।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। ভুরু তার কুঁচকে উঠেছিল। কিন্তু সুরেশ্বরের মুখ সেই তেমনি বিষণ্ণ প্রশান্ত হয়ে আছে। যুদ্ধ করার বা ঝগড়া করার মনের কোন প্রকাশ ফুটে ওঠেনি সেখানে। কণ্ঠস্বরেও উত্তাপ নেই।

সুরেশ্বর বুঝেছিল, সে হেসে বললে—না, ঝগড়া আমি করিনি। বলছি কি জান, বলছি পরিবর্তন কালের নিয়ম। সেটা যেমন মানুষের হয় তেমনি মানুষের বিচরণক্ষেত্রে সর্বত্রই হয়। পুরনো বাড়ীতে নোনা ধরে। ফাট ধরে। তখন ভেঙে-চুরে মেরামত করতে হয়। আবার বংশও বাড়ে। তখন পাঁচিল ওঠে। জানালা ফুটিয়ে দরজা করতে হয়। বারান্দা

ঘিরে ঘর বাড়াতে হয়।

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে সুলতা বললে—বিয়ে করেছ? ছেলেপিলে বুঝি অনেকগুলো হয়েছে এর মধ্যে। মুখে হাসি এবং দৃষ্টিতে কৌতুক ফুটিয়ে সুলতা তার দিকে তাকালে।

সুরেশ্বর বললে—দেখ, প্রথমটা স্থির করেছিলাম বাড়ীটায় দুর্ভাগিনী মেয়েদের জন্যে একটা হোম-টোম বা আশ্রম-টাশ্রম করব। তখনই এই বারান্দা ঘেরার ব্যবস্থা হয়।

—সেই শেফালি কেমন আছে? যাকে করুণা করতে আমিই বলেছিলাম। তারপর তা থেকেই বুঝি তোমার করুণার স্রোত একেবারে ঝরঝর করে ঝরল—যার তোড়ে ঐরাবত ভেসে গেল!

—জানিনে ঠিক। তার খবর আর রাখিনি। ছেড়ে দাও ওকথা। তারপর মত বদলে ভেবেছিলাম অনাথ আশ্রম করব। বারান্দাটায় ক্লাস বসবে। কিন্তু তাও হয়নি। বারান্দা ঘেরার ইতিহাসটা এই, তবে ওর মধ্যে যেটা আধুনিক মেট্রো প্যাটার্ন চাপানো হয়েছে সেটা নেহাতই ইঞ্জিনীয়ার আর রাজমিস্ত্রীর কেরামতি। এখন ভিতরে এস। বাইরে ঝলমলে আলো পড়েছে, তার মধ্যে আমরা দুজনে পথে দাঁড়িয়ে বাগবিস্তার করছি, এতে জনসাধারণ কৌতুহলী হয়ে উঠেছে।

কথাটা ঠিক। রাস্তার সামনের দোকানে বেশ জটলা জমেছে। রাণী রাসমণির বাড়ীর নিচে বাইরের দিকটায় অসংখ্য দোকান। মশলাপাতি বিশেষ করে সুপুরীর পাইকারী দোকান অজস্র। তারই মধ্যে ছোট্ট তেলেভাজার দোকান থেকে নানান দোকান রয়েছে। দোকান-আইন মেনেও তারা ঝাঁপ আধখানা বন্ধ করে হিসেব-নিকেশ মেলাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে কৌতুহলী হয়ে তাদের দিকেই তাকাচ্ছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে মোড় ফিরে ফিরিঙ্গী মেয়েরা যাচ্ছে, কেউ হেঁটে কেউ রিক্সায়, পিছনে তাকাচ্ছে শিকার অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা মাছের মত পিছনে আসছে কিনা? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং হাওয়াই শার্ট প্যান্ট পরা দেশী বাবুসাহেবরাও যাচ্ছে। সকলেই ওই আলোঝলমল স্থানটায় এসে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছে। বাড়ীটা প্রায় বারো মাস অন্ধকার থাকে—হঠাৎ সেটার হল কি যে এমন আলোর জৌলুস ফুটিয়ে রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে প্রধানা অভিনেত্রীর মত কোন এক বিশেষ রজনী উপলক্ষে রাজরাণীর পোশাকে মুখে পেন্ট মেখে দাঁড়াল? তারপরই চোখে পড়েছে ওদের দুজনের দিকে।

সুলতা বললে—চল।

* * * *

ভিতরে এসে ওই বারান্দাঘেরা হলটায় নিয়ে এল তাকে সুরেশ্বর। এবং যে আলোগুলো নিভোনো ছিল তাও জ্বেলে দিলে। ঘরখানা ঝলমল করে উঠল শুধু আলোয় নয় ছবির রঙের উপর পড়া আলোর প্রতিচ্ছটাতেও বটে। রঙের আভাও ফুটে উঠল আলোর সঙ্গে।

সবিস্ময় দৃষ্টিতে সে তাকালে ছবিগুলোর দিকে। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখছিল। এতো ছবি!

এতো ছবি এঁকেছে সে এই এতদিন অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন করে ? ফিরে সে তাকালে সুরেশ্বরের দিকে। তারপর বললে—এতো ছবি এঁকেছ ?

—এর তিন-চার গুণ ছবি এঁকেছি ! কিন্তু এখানে সব ধরবার কথা নয়। আর সেগুলো যা আমি বলতে চেয়েছি ছবির মধ্যে তার সঙ্গে হয়তো সম্পর্ক ক্ষীণ বা মাত্রা ছাড়িয়ে বলা হয় বলে টাঙাই নি।

ছবিগুলোর দিকে আবার তাকালে সুলতা। দেখতে দেখতেই বললে—ছবির মধ্যে কিছু বলতে চেয়েছ নাকি ?

—তাই জন্যেই তোমায় আমার আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল দেখাবার। এবং সর্বাগ্রে দেখবার এ তো ছবির প্রদর্শনী নয়, কীর্তিহাটের কড়চা—সুরেশ্বরের জবানবন্দী। ছবি থেকে যাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁদের নমস্কার। তাঁরা রসিক এবং রসিকের চেয়েও বেশী কিছু। কিন্তু কি বলতে চেয়েছি তা যাদের কাছে বলতে পারি তার মধ্যে তুমি প্রথম এবং প্রধান।

হাসলে সুলতা। মনে মনে বলতে গিয়ে মুখে বেরিয়ে এল কথাটা। বললে—বড্ড দেরী হয়ে গেছে সুরেশ্বর। আমি অনেক দূরে বাস করি। নিউ আলিপুরে।

—তা জানি। তবে একটা কথা বলি। আজ নানান জমিদারের বাড়ীতে আসর পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে বর্ধমানের মহারাজা সম্ভবতঃ গোলাপবাগের প্রাসাদ থেকে প্যালেস পর্যন্ত ঘুরছেন ছবি দেখে দেখে। মন চলে গেছে ১৭৯৯ পার হয়ে ১৭৫৭-তে। তা পার হয়ে আরও পিছনে, শোভা সিং যখন কৃষ্ণকুমারীর ছুরিতে মরেছিলেন সে আমলে। ওঁকে দেখছি, ইমোশনাল লোক। হয়তো ভাবছেন ডিনামাইট দিয়ে এই রাত্রেই সব চুরমার করে দেবেন। তারপর হয়তো ভাবছেন, না সব তিনি গভর্ণমেণ্টকে দান করে দেবেন। কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ হয়তো দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ছবির তলায় দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছেন। বলছেন—তোমার প্রবর্তন-করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যারা আজ নাকচ করলে তাদের মধ্যে আমিও একজন। কোন জমিদার হয়তো একা বসে কাগজের উপর হিসেব করে দেখছেন কম্পেনসেশন কত পাবেন। কেউ কেউ গাল দিচ্ছেন যারা এটা করলে তাদের। এমন লোকও হয়তো এক-আধজন আছেন যাঁরা প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করছেন। কেউ যদি বাঈজী-বাড়ী গিয়ে শেষ উৎসব করেন তবে তাঁকে আমার সেলাম রইল। আমি এই ছবির আসর পেতেছি। ভেবেছিলাম সারা রাত একলাই এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরব ! ভাগ্যক্রমে এমন জনকে পেলাম যাকে আমি চেয়েছি মনে মনে ছবিগুলো আঁকবার সময় থেকে টাঙাবার সময় পর্যন্ত।

হঠাৎ একটা লম্বা ছবি, যেটা টেবিলের উপর রাখা ছিল সেটা তুলে নিয়ে প্রথম ছবিটার ফ্রেমে ঠেকিয়ে বললে—এই আমার প্রথম ছবি সুলতা। কংসাবতীবারি-বিধৌত তট—বনচ্ছায়া-শীতল কীর্তিহাট নামক গ্রাম। ১৮০১ সাল।

প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি। অয়েলে আঁকা। চার ফুট তিন ফুট বা তার চেয়েও বড়। সুন্দর ছবি। যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি বিচিত্র টেকনিকে আঁকা। যেমন আমাদের দেশের

মন্দিরের ভিতর দিকে পোড়ামাটির কাজের মধ্যে কৃষ্ণলীলা রামলীলা ফোটানো হয় তেমনি ঢঙে আঁকা। গ্রাম নদী বন সব আছে পটভূমিতে। গ্রামের খড়ের চাল ঘরের চালগুলিতে সোনালী হলুদ রঙ চমৎকার লাগছিল, তারই মধ্যে সাদা একখানা পাকা বাড়ী। এও পটভূমির কোলে দ্বিতীয় পটভূমি। ছবিটার কেন্দ্র-বিন্দু পথ—পথের উপর পাল্কি চলছে। তার মধ্যে টোপর মাথায় মুকুট মাথায় বালক-বালিকা বর-কনে। বরের হাতে একখানা কাগজ।

তার পিছনে নরনারী। বাদ্যভাণ্ড। আসাসোঁটা হাতে বরকন্দাজ পাইক।

দেখছিল সুলতা।

সুরেশ্বর বললে—রায়বংশের প্রথম জমিদার সোমেশ্বর রায় ১৮০১ সালে দশ বৎসর বয়সে জমিদার হয়েছিলেন। বিয়ে করে তিনি গ্রামে প্রবেশ করছেন।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, বললে—ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

চকিত হয়ে উঠল সুলতা। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ?

সুরেশ্বর সেই মুহূর্তেই বললে—না, আমার ভুল হয়েছে। এখানে তো তুমি একা রয়েছ সুলতা! আর তো কেউ নেই!

তারপর হেসে বললে—আমার হঠাৎ মনে হয় ঘরখানা নরনারীতে ভরে গেছে! এমন ভুল আমার হয় মধ্যে মধ্যে। একটু আগে বলছিলাম, তুমিও জান, একটা পাগলামি আমাদের বংশে আছে। প্রথমে খেয়াল বলে চলে যায়, কিন্তু খেয়াল ততক্ষণই খেয়াল যতক্ষণ মাত্রা না ছাড়ায়। মাত্রা ছাড়ালেই হয় পাগলামি। আমার মাত্রা অনেক দিন ছাড়িয়েছে। তারপর কীর্তিহাটে গিয়ে সেটা আমার মন বুদ্ধি আমার বাসনা কামনাকে এমনভাবে অভিভূত করলে যে আমার সব বেঠিক হয়ে গেল। তার উপর প্রচুর মদ্যপান করতাম। সেটা তাকে বাড়িয়ে তুলত। আমি কল্পনায় নানান ছবি, নানা মানুষ দেখি অন্ধকার রাত্রে। দিনে দেওয়ালের গায়ে ছাদে চটে-যাওয়া পলেস্তারার মধ্যে দেখতে পাই নানান ছবি, নানান মানুষ। কখনও কখনও জীবন্ত হয়ে তারা কথা বলে। আজও আমার হঠাৎ মনে হল ছবির মানুষগুলো ছবি থেকে নেমে এসে ঘর ভরে বসেছে! এরা যে ঐতিহাসিক সুলতা, কাল্পনিক তো নয়। এদের অশরীরী আত্মা এসে বসেছে মনে হল। তারাও দেখতে এসেছে ছবিতে 'কীর্তিহাটের কড়চা'। শুনতে এসেছে সুরেশ্বরের জবানবন্দী!

সুলতার মনে হল সুরেশ্বর যেন কত দূরে—অনেক দূরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

২

একজন চাকর এসে ঢুকল হাতে ট্রে নিয়ে। নামিয়ে দিল সামনের টেবিলে। বুড়ো চাকর। সে সুলতাকে দেখে নমস্কার করে বললে—ভালো আসেন দিদিমণি?

সুলতা তাকে এবার চিনলে। এ তো সেই রঘু। রঘু বুড়ো হয়ে গেছে, চুল গোঁফ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। সে বললে—তুমি তো রঘু!

—হ্যাঁ। হমি রঘু। রঘুর বাংলায় এখনও হিন্দী টান যায়নি!

—এখনও আছো বাবুর কাছে? ভাল আছ?

—হ্যাঁ। ই বাবুকে ছোটা উমরসে মানুষ করলাম। কাঁহা যাই আর কেমন করে যাই ছোড়কে?

সুরেশ্বর কোন সাড়াই দিলে না। সে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। রঘু ট্রেতে চা এবং কিছু কেক মিষ্টি এনে নামিয়ে দিয়েছে। সে চায়ের কাপটা তুলে নিলে। চায়ের তৃষ্ণা এবং ক্ষিদেও তার পেয়েছিল। সুরেশ্বরকে জানে, সে হয়তো নাও বলবেই না। সেই বরং সুরেশ্বরকে বললে—চা নাও।

তেমনি ভাবে অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—না। তারপর বলেই গেল—সুলতা, ভেবেছিলাম—১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করব। সে ছবিও আমার আঁকা আছে। কিন্তু দেখলাম তাহলে ১৯৪৭ সালে কড়চা শেষ করতে হয়। এবং তাতে রায়বংশের ভূমিকা ছোট হয়ে যায়। যাকে বলে সাইড ক্যারেক্টার তাই দাঁড়ায়। তারপর ভেবেছিলাম—ইম্পীচমেণ্ট অব হেস্টিংস ছবি দিয়ে শুরু করব। সে ছবিও আঁকা আছে। হাউস অব লর্ডসে ইম্পীচমেণ্টের পালা শেষে হেস্টিংস বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু মনে হল, তা হলে শেষ করতে হবে অন্ততঃ আরও একখানা বা দুখানা ছবি এঁকে। হেস্টিংস জবান-বন্দী করেনি নিজে। সুরেশ্বর জবানবন্দী করছে, যাদের সামনে করছে, তাদের মধ্যে তুমি আছ, সে ছবি না-হলে শেষ হয় না। সে ছবি মনে কল্পনায় ছিল কিন্তু আঁকা হয়নি। তাই শুরু করেছি একেবারে বর-বেশী দশ বছরের সোমেশ্বর রায় জমিদার হয়ে কীর্তিহাটে ঢুকছেন সেখান থেকে। ১৮০১ সাল সেটা।

সতরো শো সাতান্নতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলা হেরে গিয়ে নিমকহারামের দেউড়িতে মীরনের হুকুমে মহম্মদী বেগের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তারপর মীরজাফর, তারপর মীরকাশেম নবাব কাশেম আলি খাঁ। উধুয়ানালা-ঘিরিয়া থেকে বকসারে শেষ। আবার মীরজাফর। এবার কোম্পানী দেওয়ানী পেলে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ। বাংলা ১১৭১-৭২ সাল। কোম্পানীর হাতে সব এল। মায় দেশরক্ষা পর্যন্ত।

পটভূমিটা তোমায় বোঝাচ্ছি সুলতা। ইতিহাসে তুমি পড়েছ। কিন্তু ইতিহাস ঘটনা বলে যায়, অবস্থার ভিতরটা বোঝায় না। এ বোঝানো বড় শক্ত!

আমি একখানা পুরনো পাচালীর পুঁথি পেয়েছি। সেখানা সোমেশ্বর রায়ের বাবা কুড়ারাম ভট্টাচার্যের লেখা।

ওগো মা শিবজায়া গো,
অধম সন্তানে কর দয়া গো
অন্তিমেতে অভয়া গো—
কুড়ারামে দিয়ো পদছায়া গো
হরজায়া গো!

মস্ত পাচালী। তার মধ্যে আছে সুলতা, সেদিন লোকে ইংরেজকে পরিত্রাতা ভেবেছিল।

* * *

মুসলমান আমলে বর্গী হাঙ্গামায় যে অত্যাচার করেছিল বর্গীরা তা তো জান। তবু সেকালে এক কবি মহারাস্ট্র পুরাণ লিখেছিল, তাতে আছে, পাপে সব পূর্ণ হয়ে গেছে দেখে স্বর্গ থেকে দেবতারা এসে বর্গী পেশোয়া থেকে নানান সেনাপতির মধ্যে তাঁদের শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, দেশময় পাপীদের শাস্তি দিতে। এতেও তাই আছে—নবাবের সঙ্গে নবাবী আমল শেষ হতে অন্তত হিন্দু সমাজের সাধারণ লোক ইংরেজের উপর কৃতজ্ঞ হয়েছিল।

অত্যাচার তো কম হয় নি।

ওই পাঁচালীর গোড়াটা আমার মুখস্থ আছে। বলে সুরেশ্বর আবৃত্তি করে গেল—

কালে কালে পাপের ভারা পূর্ণ হইলে কাঁপে ধরা
ব্রহ্মা বিষ্ণু দিশেহারা যাচে তোমার দয়া গো।
হরজায়া গো।
তখন তোমার তা থৈ নাচে পাপী মরে পুণ্যাত্মা বাঁচে
পতি তোমার পদ যাচে শবরূপী হয়্যা গো
হরজায়া গো!
পলাশী ঘিরিয়া উধুয়ানালা হইল এমেতে নৃত্যশালা
ফুরালো নবাবী পালা সাহেবানে কৈলে দয়া গো।
হরজায়া গো!
রাঙা চুল লাল মুখ দেখিলে মা কাঁপে বুক
তবু মনে ভাবি সুখ সুবিচার প্যায়া গো।
হরজায়া গো!
সে পাঁচালী রচিতে সাধ হয়েছে দীনের চিতে
শিবরাম মম পিতে কুড়ারাম বাছা
কীর্তিহাটে আদি বাস বর্গী আইল মহাত্রাস
নবাবের সৈন্য নাশ, পালায় খুলে কাছা।
তারা পালাবার কালে গ্রামে গ্রামে অগ্নি জ্বালে
লুঠ করে মেরে ফ্যালে দরিদ্র প্রজারে
পিতা শিবরাম মরে অগ্নি জ্বলে বাস্তুঘরে
জননীর হাত ধরে বনে ও বাদাড়ে
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা দ্বারে দ্বারে, অন্ন ভিক্ষা
তুমি কালী সর্বরক্ষা দিলে স্নেহছায়া গো
হরজায়া গো!
সে দয়াতে কুড়ারাম ফিরিল আপন গ্রাম
ভট্ট নয় রায় নাম কোম্পানীর কাছে পায়া গো
হরজায়া গো!
বর্ণিব সে সব কথা কোথায় জল মরে কোথা

ভিক্ষুকের রুখু মাথায় দিলে পাগ পরায়া গো।
হরজায়া গো!
তোমার মন্দির ক'রে তোমারে বসাই ঘরে
মাগি মাগো জোড় করে থাক অচলা হয়া গো।
হরজায়া গো!

অবাক হয়ে সুলতা শুনছিল। সুরেশ্বর চুপ করলে সে বললে—ওয়াণ্ডারফুল! সেটা আছে তোমার কাছে?

—আছে। জাল নয়। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর সেরেস্তাখানা খুঁজতে খুঁজতে পেলাম এটা। সেটেলমেণ্টের জন্য কাগজ দেখতে গিয়ে রায়বংশের স্বরূপের কিছু ছবি' তখন পেয়েছি। তার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছি যাতে আমি আমার বংশকে আমার রক্তকে চিনে যেমন শিউরে উঠেছি, তেমনি নেশাগ্রস্ত হয়েছি। তখনই পেলাম এটা।

এতে অনেক কিছু আছে সুলতা। সেদিনের বাংলাকে চেনা যায় জানা যায়। বোঝা যায়। সে বাংলা দেশ এ দেশ নয়! প্রথম ছবিখানিকে ভাল করে দেখ। বুঝতে পারবে। নতুন খড়েছাওয়া ছোট-ছোট ঘর, কোঠাবাড়ীও তখন সারা গ্রামে দুখানা বা একখানা। কীর্তিহাটে ১৮০১ সালের দশ বছর আগে প্রথম কুড়ারাম যে বাড়ী করেন সেখানাই গ্রামের প্রথম কোঠাঘর। পাচালীতেই আছে। তখন কুড়ারাম ভটচাজ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের দেওয়ান। ১৭৯১ সাল। ১৬৬০ পরগণার রাজস্ব স্থির করছেন, দশশালা বন্দোবস্ত হব। মেদিনীপুরের ময়নার পুরনো রাজবংশের তখন সম্পত্তি গেছে, সে সম্পত্তি গোয়ালপাড়া সরকারের ভুক্তান হয়ে কাশিজোড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাশিজোড়াও তখন যাই-যাই করছে। ইতিমধ্যে কিছু লাট বের করে নিয়ে কোম্পানী বিলি করেছে, ছোট ছোট তালুকদারেরা নিয়েছে। কুড়ারাম তখন কলকাতার বাসিন্দে দেওয়ানজীর সঙ্গে। ঘর ছেড়েছিলেন বাপের মৃত্যুর পর আর ফেরেন নি! পাচালীতে আছে—

পরগণা ষোলশো ষাট কত মৌজা কত লাট
কত জল কত মাঠ কষি দিন রাত
তারই মাঝে চোখে পড়ে ময়না মেদনীপুরে
কাঁসাই নদীর পাড়ে তারই সাথে সাথ
কীর্তিহাট বাস্তুভিটা কি মাটি আঠালো চিটা
লাল চাল কত মিঠা—কাঁসাইয়ের পাড়ে ঘন বন
বামুন কায়েথ বদ্যি সদ্গোপ মাহিষ্য ছত্রি
চুয়াড় চামার মধ্যি আপনার জন।
রাত্রিকালে স্বপ্ন পাই, কীর্তিহাটে ফিরে যাই
খুঁজে ফিরি ভিটি তাই পাই বহু দুঃখে
হয়েছে জঙ্গল ঘোর শিয়াল চেঁচায় রাত্রিভোর
বহু হল কষ্ট মোর স্বপ্ন মাঝে বুকে।

সে হেতু বানালাম কোঠা মাটির দেওয়াল মোটা
শাল কাঠ দিয়ে গোটা মজবুদ চাল
শত তঙ্কা পুরাপুরি খোলা হাতে খরচ করি
হইলাম খুশী ভারী বাদে এতকাল !

সুলতা বললে—তুমি নিজে তৈরী কর নি তো ?

সুরেশ্বর বললে—অবিশ্বাস কর—কি বলব ? বাদপ্রতিবাদ করব না। প্রমাণ-প্রয়োগ হাজির করে ইতিহাস নিয়ে লড়াই করব না। শুধু বিশ্বাস করতেই বলব। পাণ্ডুলিপিতে বানান অনেক ভুল আছে। শব্দ দু-চারটে দুর্বোধ্য আছে। সে আমি পূরণ করেছি, হয়তো ভাষা কিছু আমার একালের জিহ্বায় একালের হয়ে গেছে। তবে তার কাহিনীটা শুনে যাও। ওই ছবিতে যে-পাকাঘরটা দেখা যাচ্ছে সেখানা সতেরো শো নিরানব্বইয়ে আরম্ভ হয়ে আঠারো শো সালে শেষ হয়েছে। মানুষেরা তখন আটহাতি ধুতি, কাঁধে গামছা ফেলে বেড়াত। খালি পা। ওই দেখ কজন ভট্টাচার্য রয়েছেন। তাঁদের পরনে দশ হাত ধুতি, তাও চল্লিশ ইঞ্চি, কাঁধে উড়ুনি। পায়ে তালতলার চটি। তাও শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন বলে। শুধু কুড়োরাম যাচ্ছেন ওই দেখ—পরনে লম্বা ধুতি গায়ে চাপকান তার উপর চাদর। মাথায় একজন ছাতা ধরে রয়েছে। তিনি জমিদার রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের ডান হাত। পাল্কিতে সোমেশ্বরের হাতে যে কাগজখানা সেখানা জমিদারী নীলামে কিনেছেন তারই কাগজ !

কিছু কৌশল—বলতে গেলে চুরি, তাই বা কেন, ডাকাতি করে কিনেছেন লাট কীর্তিহাট। টাকা তিনি অনেক উপার্জন করেছিলেন। ঘুষ বল ঘুষ, উপরি বল উপরি। যা বলবে তাই মানব আমি।

তাইতো বলছিলাম—নিজের বংশের স্বরূপ দেখে আমার আমাকে যেন আমারই ভয় হয়েছিল সেদিন। শিউরে উঠেছিলাম। কিন্তু কুড়ারামকে দোষ দিই নি। কৃতী পুরুষ হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। হয়তো তোমার মতের সঙ্গে মিলবে না। তা না মিলুক। তা নিয়ে এ কৈফিয়তও দেব না যে, যারাই সংসারে বড় হয়, অন্তত বিষয়ের সংসারে, তারা কর আবওয়াব আদায় করে থাকেন। জোর করে যারা বাহুবলে রাজ্যজয় করে, অন্য দেশ লুঠ করে, তাদের কথা বাদ দিলাম সুলতা। কারণ তারা কারুর মতামতের ধার ধারে না। গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যাঁরা তা না করেন, মানুষের প্রচলিত পথে বড় হন, তাঁরাও কিছুটা কর আদায় করেন। প্রভুত্ব অর্জন করলেই মানুষের আনুগত্যটা জমিদারী সেরেস্তার খাজনার উপর চাঁদার মত লোককে দিতেই হয়। না দিলে যাঁর যেমন প্রভুত্ব তেমনি পেনালটি আদায় না করে ছাড়েন না। মন্ত্রীদের কথা ভাবো না। মানে—স্বাধীনতার পরের মন্ত্রীদের কথা। এই তো স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত গুলি তো কয়েকবার চলল। লাঠিচার্জ তো বাদই দিচ্ছি। এবং এই পদ অর্জনের জন্য ভোট-ভোট করে পরস্পরের সমালোচনার নামে যে তত্ত্ব—সত্য মিথ্যা প্রকাশ পেলে তাই থেকে বিচার কর না। দেখ না, কত স্থানে কত প্রতিশ্রুতি। কতরকম প্রতিশ্রুতি। কোন দল বললে—সব জমিগুলো ওদের কাছ থেকে

কেড়ে নিয়ে তাদের দেব। কেউ বললে—তোমাদের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে দেব। তার উপর তোমরা সত্যিকারের স্বাধীন থাকবে। তারপর এগাঁয়ে কুয়ো, ওগাঁয়ে ইস্কুল, ওগাঁয়ের রাস্তা—এসব খুচরো প্রতিশ্রুতি বা ঘুষ যাই বল না কেন—দেওয়ার তো হিসেব নেই। এর ছেলের চাকরী, ওর এটা, তার সেটা এ-সবের ফিরিস্তি নাই তুললাম। সুতরাং এ-ধরণের ব্যাপার চিরকাল আছে। ব্যাপারের ঢং পাল্টেছে। কিন্তু যাঁরা লোকনায়ক হলেন, তাঁদের অস্বীকার করব কি করে? কুড়ারাম ভট্টাচার্যকে তাই আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলাম সেদিন।

কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাঁচালী আমাকে খুব বেশী আকর্ষণ করত না বা এত মূল্য তাকে দিতাম না সুলতা যদি আমি আর একটা বিচিত্র এবং নিষ্ঠুর তথ্য আবিষ্কার না করতাম। তাতে তুমি জড়ানো সুলতা। অন্ততঃ তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরঙ্গ বন্ধন হবার কথা—প্রতিশ্রুতি দিয়েছি একরকম—তার মাঝখানে এই তথ্যটা এসে দাঁড়িয়ে আমাকে শিউরে দিয়েছিল। আমি সেই তথ্যটার অন্তরালে সত্য কি তাই আবিষ্কার করতে পুরনো কাগজ ঘাঁটকে দেখেছি সারাদিন—সেই ধুলা সর্বাঙ্গে মেখে ভূত হয়ে সন্ধ্যায় স্নান করে বিবি-মহলের ছত্রি-দেওয়া রেলিংঘেরা বারান্দায় বসে ভেবেছি।

সুলতা ভুরু কুঁচকে বিরক্তিভরেই বললে—কি বলছ পাগলের মত? আমার সঙ্গে কোথায় সম্পর্ক আবিষ্কার করলে?

—তোমার চারপুরুষের নাম জান সুলতা?

—কেন?

—বল! চারপুরুষ আগে তোমার পূর্ব-পুরুষের কারুর নাম ছিল ঠাকুরদাস পাল।

—ঠাকুরদাস! হ্যাঁ, ঠাকুরদাস ঘোষ।

—হ্যাঁ। তখন তিনি পাল ছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল জগন্নাথ পাল! তিনি ঘোষ হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে নরেশ ঘোষ কলকাতায় অ্যাডভোকেট হয়েছিলেন। তিনিই ব্রাহ্ম হন। তাঁর ছেলে তোমার বাবা আর সি ঘোষ, রমেশচন্দ্র ঘোষ ব্যারিস্টার।

অবাক হয়ে সুলতা তাকিয়ে রইল সুরেশ্বরের মুখের দিকে।

সুরেশ্বর বললে—ঠাকুরদাস ছিলেন' আমার প্রপিতামহের বড়ভাইয়ের মত, ভক্তের মত। তাঁর বাড়ী ছিল কীর্তিহাট থেকে পনের-বিশ ক্রোশ দূরে, হুগলী জেলায়, গঙ্গার ধারে শ্যামনগরে। আমার প্রপিতামহের বিবাদ হয়েছিল তাঁর মামা বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে। বীরেশ্বর রায় দুর্দান্ত পুরুষ। সেই বিবাদে,আমার প্রপিতামহকে ঠাকুরদাস পাল জীবন বিপন্ন করে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তার জন্যে তাঁর প্রথম পক্ষের সংসার স্ত্রী-পুত্র সব পুড়ে মারা গিয়েছিল। আমার প্রপিতামহই আবার তাঁর বিবাহ দেন। সেই ঠাকুরদাস পাল, সুলতা, খুন হয়েছিলেন। কাগজ দেখতে দেখতে সন্দেহ হল—সে খুন করিয়ে ছিলেন আমার প্রপিতামহ। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। শরীরের রক্ত যেন বিষ হয়ে গেল সুলতা। মাথার খেয়াল যাদের থাকে, মস্তিষ্কের উগ্রতা তাদের স্বাভাবিক। সেই উগ্রতা চিন্তায় চিন্তায় এমন উত্তপ্ত হল যে, আমি পাগলই হয়ে গেলাম। আমার এই উদ্ভট মন যাকে লোকে খেয়ালী

বলে পাগল বলে, তার পাগলামি জাগল—আমি সুলতার পাশে দাঁড়াব কি বলে ?

সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

ক্লক-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দশটা বেজে গেল। সুলতা বললে—বল। থামলে কেন ?

* * * *

সুরেশ্বর বললে—খুন তিনিই করিয়েছিলেন। আমার প্রপিতামহ, তোমার পূর্ব-পুরুষকে।

—কেন ? জমিদারীর ব্যাপারে ?

—সে সুদীর্ঘ কথা সুলতা। সেই তো কীর্তিহাটের কড়চা। সেই তো আমার জবানবন্দী। গোটা রায়বংশ তার সঙ্গে জড়ানো। জমিদারীর দায়ে তিনি খুন করাননি। জমিদার ছিলেন বলেই খুন করিয়েছিলেন। করাতে পেরেছিলেন। সংসারে বংশ-গৌরব, জন্ম-গৌরবের মূল্য সব মানুষেরই আছে। অনেক বিদগ্ধ মানুষের কাছে শুনবে—পাঁচপুরুষ সাতপুরুষ আগে হয় পূর্বপুরুষ রাজা ছিল—নয় সিদ্ধপুরুষ ছিল, নয় কোন অবিস্মরণীয় মানুষ ছিল। কিন্তু এই বংশগৌরব যখন সম্পদের আর বিষয়ের সঙ্গে একসঙ্গে হয়, তখন সে হয় যত দীপ্ত তত উত্তপ্ত! দীপ্তি যখন কেউ ম্লান করে দিতে চায়, তখন তাকে উত্তাপ দিয়ে পুড়িয়ে মারে। সম্পদ যার না থাকে, তাদেরও এতে উন্মত্ত হবারই কথা। কিন্তু এখানে সম্পদবিষয়ও ছিল জড়ানো। বিষয়—মাতৃকুল-পিতৃকুল, মাতামহ-পিতামহ, পিতা-মাতা রত্নেশ্বর নিজে সকলে এতে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু কলঙ্কই বল আর অগৌরবই বল, সবটাই ভ্রান্তিবশে একটি অকিঞ্চিৎকর সত্যকে গোপন করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন নিজেরাই! তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন নি, সেই সত্যকে প্রকাশ করে জবানবন্দী দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাই।

হাসলে সুরেশ্বর। তারপর সে ঠাণ্ডা চায়ের কাপটা তুলে নিলে।

সুলতা বললে—ওটা জল হয়ে গেছে।

রেখে দিলে সুরেশ্বর।

সুলতা ডাকলে—রঘু!

রঘু ঘরের দরজার ওপাশেই বোধহয় বসে বসে ঢুলছিল। এ অভ্যাস তার আছে। সুরেশ্বরের প্রতি তার মমতা আসক্তি—উদরান্নের দায়ে নয়—এর মধ্যে একটা নেশা আছে। খেয়ালী সুরেশ্বরকে মানুষ করে তার রূপ-গুণ-দোষ-ত্রুটি সবের নেশায় পড়েছে; সব থেকে বেশী সুরেশ্বরের খেয়ালীপনার অত্যাচারের নেশা। সে তাকে ছাড়তে পারে না। সুরেশ্বর ছবি আঁকে, সে দাঁড়িয়ে তুলি-রঙ এগিয়ে দেয়—ধরে। সুরেশ্বর বাজনা বাজায়, সে দরজার পাশে বসে শোনে। সুরেশ্বর মদ্য পান করে, সে উপকরণ তৈরী করে সন্ধ্যা থেকে। সুরেশ্বর রাত্রি জেগে বসে ভাবে, নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়, কিন্তু সামান্য শব্দে জেগে ওঠে!

রঘু এসে সামনে দাঁড়াল।

সুলতা বললে—একবার চা কর রঘু। তোমার লালবাবু চা খান নি, জুড়িয়ে গেছে।

রঘু বললে—চা খাবে এতো রাতে ? উটা খাবে না ?

—না।

সুলতা বললে—কি ? ব্র্যাণ্ডি-হুইস্কি ? আমি তো জানি তুমি খাও। তা খাও না !

—না সুলতা। আজ আমি এমন একটা কথাও বলতে চাইনে, যার উপর কোন মাদকের একবিন্দু প্রভাব পড়ে। চা নিয়ে আয় রঘু।

—তাই আন তাহলে। এক কাজ কর। বেশী করে তৈরী করে ফ্লাস্কে পুরে দাও। দরকার মত আমরা ঢেলে নেব। আর চল. আমি একটা ফোন করব।

সুলতা, রঘু চলে গেল। সুরেশ্বর এসে কাচের জানালায় দাঁড়াল রাস্তার দিকে চেয়ে। সামনে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট।

রাস্তাটা নির্জন হয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে রিক্সা যাচ্ছে—আর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দু-চার জন ফিরিঙ্গী এবং লুঙ্গীপরা মুসলমান। এ রাস্তাটায় এদের বাসই বেশী। রাণী রাসমণির শ্বশুর প্রীতিরাম মাঢ়ের কাছে জমি সংগ্রহ করেছিলেন কুড়ারাম ভট্টাচার্য। এক বিঘা জমি ব্রাহ্মণকে দিয়েছিলেন তাঁরা।

কুড়ারাম অর্থ উপার্জন করে জমিদারী কিনেও তাঁর বাল্যকালের অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। প্রথম জীবনটা গেছে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে। বাপের মৃত্যুর পর মায়ের হাত ধরে পথে পথে বেড়িয়েছেন ভিক্ষা করে। মা বেশী দিন বাঁচেননি। ঘর থেকে বেরিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই আত্মহত্যা করেছিলেন। কাল হয়েছিল তাঁর রূপ। ভট্টাচার্য-বংশে রূপ আছে অনেকদিন থেকে। গৌরবর্ণ রঙ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতি চেহারা। এটার অবশেষ কীর্তিহাটের বিশ-ত্রিশ ঘর ভট্টাচার্যের বাড়ীতে আজও আছে। কুড়ারামের মা রূপের সে প্রদীপশিখাকে আরও উস্কেই শুধু দেন নি, সে প্রদীপে কিছু ঘৃতসিঞ্চনও করেছিলেন। তাঁর রূপ ছিল প্রতিমার মত।

হেরে পালালো—হিজলীর নবাবের সৈন্যরা ঘর জ্বালিয়ে লুঠে শিবরামকে হত্যা করে যেদিন রাত্রে, সে রাত্রে প্রথমেই ছেলের হাত ধরিয়ে স্ত্রীকে শিবরাম জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজে ছিলেন কিছু ঘুষ দিয়ে ঘরটাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তারা সব লুঠে ঘর জ্বালিয়ে তাঁকে হত্যা করে চলে গিয়েছিল। কুড়ারামের মা গ্রামে পরদিন ফিরে স্বামীর সৎকার করে আশ্রয়ের জন্য গ্রামের লোকের সঙ্গেই পথে বেরিয়েছিলেন—গোধা গ্রাম পুড়ে গেছে। সবাই নিরাশ্রয়। তার উপর বর্গীর ভয়। কিন্তু বর্গীরা এদিকে আসে নি, তারা চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর দিগনগর খিরপাই হয়ে চলে গিয়েছিল বর্ধমানের দিকে। পাঁচালীতে আছে—

"তবে কোন কোন্ গ্রাম বর্গী
দিল পুড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন
মন দিয়া।
চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগনগর খিরপাই পোড়ায়ে যায় বর্ধমান শহর।

লোকে ভাগীরথী পার হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল নানান স্থানে। হুগলী জেলায় গিয়ে

উঠেছিলেন কুড়ারামের মা ছেলের হাত ধরে। কটা ছেলে মরে হয়েছিল কুড়ারাম—কয়েকটি সন্তানের জননী কুড়ারামের মা, কিন্তু রূপ তাঁর যথেষ্ট ছিল। ছেলেও রূপবান। তাঁদের দেখে মমতা করে আশ্রয় দিয়েছিলেন একটি বর্ধিষ্ণু ঘরের প্রবীণা মহিলা। রান্নার কাজ দিয়েছিলেন। কুড়ারামকে দিয়েছিলেন পূজার ফুল তোলার কাজ।

মাস ছয়েক পর মা তার একদিন রাত্রে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।

কুড়ারাম জানত—তার মাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল ওই বংশের একটি ছেলে। সে বুঝতে পারত। প্রথমটা নিরাপদেই ছিল—ওই বৃদ্ধা গৃহিণীর কৃপায়। তিনি তার মাকে আপনার ঘরে নিয়ে শুতেন। তিনি মারা গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধ শান্তি চুকতেই একদিন রাত্রে মা চীৎকার করে উঠলেন। সে ঘুমিয়ে ছিল। ঘরের একটা দরজা খোলাই শুধু দেখেছিল—আর কিছু সে দেখে নি—মা উদ্‌ভ্রান্তের মত হাঁপাতে হাঁপাতে দরজাটায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজাটার খিল ছিল না। তারপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে দেখেছিল তার মা ঘরে নেই। বাইরে অনেক গোলমাল। ওই বাড়ীরই খিড়কীর পাড়ের একটা গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মা ঝুলছেন। কুড়ারাম মায়ের সৎকারও করে নি। ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপর ভিক্ষা করত। রাত্রে কোন গ্রামে কারুর দাওয়ায় কিম্বা গাছতলায় খুঁজে নিত আশ্রয়। একান্ত অনাহূতের মত। এরই মধ্যে আবার একটা আশ্রয় তার মিলল। সেও তার রূপের জন্য। সে এসে পড়েছিল হুগলী শহরে।

তখন মস্ত শহর হুগলী। হুগলীতে নবাবের ফৌজদার থাকেন। রাজা তখনও হন নি—বাবু নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার। হুগলীতে তখন ইংরেজদের কুঠী। তখন সুতানটিতে তারা নতুন শহর পত্তন করে কুঠী তৈরী করে কলকাতা নাম দিয়েছে বটে, কিন্তু হুগলীর তখনও খুব জম-জমাট। পাশেই চুঁচড়োতে ওলন্দাজদের কুঠী ও আড্ডা। চন্দননগরে ফরাসীরা রয়েছে। দিনেমাররা শ্রীরামপুরে। এর সঙ্গে আরমানী মুসলমান ব্যবসাদাররা আছে। এ এক নতুন রাজ্যে এসে পড়েছিলেন কুড়ারাম। ব্রাহ্মণের ছেলে, ছেলেমানুষ, একটা ভয় তাঁর ছিল। এই ম্লেচ্ছের শহরে এসে কোথায় জাত চলে যাবে। সেই ভয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন দেবস্থলে। চুঁচড়োর ষাঁড়েশ্বরতলায়। এই রূপবান খুদে বামুনের ছেলেটিকে যাত্রীরা সমাদর করত। মেয়েরা বামুন করে খাওয়াতো, কিছু দক্ষিণে দিত। ওখানেই কিছু মন্ত্রতন্ত্র শিখেছিলেন। সেই শেখার দায়ে লেখাপড়াও, কিছুটা বাংলা, কিছু মুখস্থ করে সংস্কৃত পড়ে এই জীবনের গোড়া-পত্তন করে নিয়েছিলেন।

সময়টা তখন কিন্তু মানুষের সুখে-শান্তিতে বাঁচার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। বর্গী গিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকেই এই সব সাহেবান লোক, এই শান্ত নিরীহ দেশের বুকে নিদারুণ দাপাদাপি শুরু করলে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। নবাবের সঙ্গে ঝগড়া এসব লাগিয়েই রাখলে। আজ ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের ঝগড়া হয়, ইংরেজরা চন্দননগরে গিয়ে কামান দাগে, কাল ফরাসীরা হামলা করে।

এরই মধ্যে খবর রটল—নবাব আলীবর্দী খাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, তাঁর নাতি সিরাজুদ্দৌলা

নবাব হয়েছেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের ওপর চটা। ফরাসীদের সঙ্গে আঁতাত বেশী। সুতরাং হুগলী অঞ্চলের অনেক লোক মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। তখন কুড়ারাম ভট্টাচার্যের বয়স পনের-ষোল। তিনি ঠাকুরের স্থান ছাড়েননি বটে কিন্তু এ এলাকা ছাড়িয়ে অন্য এলাকাতে আসা-যাওয়া শুরু করেছেন। এদেশে তখন অনেক ছোটখাটো বিদেশী ব্যবসাদার ব্যবসা করে যারা লিখতে পড়তে জানে না। এদের মধ্যে মুসলমান বেশী। আফগানিস্থান, পারস্য, আরব দেশ থেকে এদেশে এসে কাঁধে করে মাল বয়ে ব্যবসা শুরু করে ; খাতা একটা রাখে, তাতে ধারে মাল যাদের দেয়, তাদের নাম লিখিয়ে নেয় অন্যকে দিয়ে। এবং এ থেকেই তারা কেউ কেউ হয়েছে ইতিহাস-বিখ্যাত মীরহাবিবের মত রাজনীতি ক্ষেত্রের ধুরন্ধর। ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় গদী ফেঁদে বসে ধনী হয়েছে এমন লোকও অনেক আছে। বাংলাদেশে কাবুলীরা এখনও আছে। সুরেশ্বর যখন কীর্তিহাটে প্রথম যায় পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে, তখন কাবুলীওয়ালাদের টাকা আদায়ের সময়। সে তাদের লাঠি এবং খাতা হাতে ঘুরতে দেখেছে। সে-খাতা বাংলায় লেখা!

সে আমলে এ ধরণের ব্যবসাদার ছিল প্রচুর। এই কুড়ারাম ভট্টাচার্য তাদের খাতা লিখে দিতেন। এই কর্মযোগেই তিনি চেষ্টা করে পারসী লিখতে-পড়তে শিখেছিলেন।

কুড়ারামের রূপ শুধু দেহেই ছিল না তাঁর হাতের লেখাতেও রূপ ছিল। লেখা ছিল গোটা গোটা ছাপার হরপের মত। ফলে দেবমন্দিরের যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের দান ও দক্ষিণার এলাকা ছেড়ে সামনে এই শহরগঞ্জের মুনাফার প্রশস্ত ক্ষেত্র তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকে অনায়াস প্রবেশাধিকার দিয়েছিল। তিনি ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর গদীতে মুন্সী নিযুক্ত হয়েছিলেন মাসিক পাঁচ সিকা তঙ্কা বেতনে। এখানে তিনি পাকা হিসাবনবীশ হয়ে ওঠেন। তখনও বয়স বিশ হয় নি। সেই সময়ে খবর রটল নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলকাতা দখল করে কেল্লা উড়িয়ে দিয়েছেন। ইংরেজরা পালিয়েছে ফলতার ওদিকে। হুগলীতেও কি-হয় কি-হয় অবস্থা। বহুজন কারবার বন্ধ করে পালাচ্ছে। হাঙ্গামা মিটলে আসবে, খুলবে।

কুড়ারামও সরে এসেছিলেন হুগলী থেকে। গঙ্গার স্রোত এবং বাদশাহী শড়ক এই দুটো পথ থেকে যে যতদূর যেতে পারে, সে তত নিরাপদ। লোকে তাই পালাচ্ছিল। কুড়ারামও হুগলী থেকে সরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারকেশ্বরে। আবার ধরেছিলেন দেবতাকে। এখানে থাকতেই খবর পেয়েছিলেন, পলাশীতে নবাবের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর লড়াই হয়ে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেছে। নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা হেরেছেন। শুধু তাই নয়, হেরে তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর বেগমকে নিয়ে কিন্তু ভগবানগোলা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনে, নতুন নবাব সিজাজুদ্দৌলার সিপাহসালার মীরজাফর আলী খাঁয়ের ছেলে মীরন তাঁকে খুন করিয়েছে। সুতরাং এখন মোটামুটি আর লড়াইটড়াই হবে না। এবং ইংরেজ কোম্পানীরই এখন পাশার দানের পোওয়া বারো। যে যেখানকার সে সেখানে ফিরল। হুগলীতে বরং বেশী লোক ফিরল। কিন্তু কুড়ারাম ফিরলেন না। তখন তাঁর জীবনে যৌবনের নেশা লেগেছে। তিনি তারকেশ্বর মন্দিরে পূজক-পুরোহিতদের আশ্রয়েই ছিলেন। পুজোয় সাহায্য করতেন। লোকরঞ্জনে ক্ষমতা ছিল। উপার্জন বলতে গেলে সামান্য। কিন্তু ওই তারকেশ্বরে আসত এক

সম্পন্ন ঘরের কিশোরী কন্যা। তার মানত ছিল। আসত সে সপ্তাহে দু'দিন করে। রূপবতী কিশোরী। কোষ্ঠীতে আছে চৌদ্দ বছরে বৈধব্যযোগ। এইজন্যই তারকেশ্বরে নিয়মিত অর্চনার সংকল্প ব্রতের মত পালন করে। প্রাচীন জমিদার বংশ। কিন্তু সম্পদ এখন যাবার পালা। তাতেও অবশ্য কম কিছু নেই। বাড়ীতে হাতী আছে। পাল্কি আছে। চাকরানভোগী বেহারা আছে। ঘোড়া তো আছেই। ও অঞ্চলে নামডাক যথেষ্ট। লোকে রাজাই বলত। তাঁর ওই একটি কন্যা। কুড়ারাম এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হলেন এবং নিজের রূপ এবং ব্রাহ্মণবংশের বৈশিষ্ট্য-গৌরবে মনেও করলেন না যে, ব্রাহ্মণ-পুত্র হলেও তিনি রাখাল এবং সে রাজকন্যা।

মেয়েটিও মুগ্ধ হয়েছিল।

পাঁচালীতে তাই বলেছেন কুড়ারাম।

দুরু দুরু কম্পে বুক হস্ত কম্পে শুষ্ক মুখ
বাক্যবদ্ধ হইনু মূক আশীর্বাদী দিতে
মিটি মিটি কন্যা হাসে কপট রোষের ভাসে
বোবা ঠাকুরের পাশে পুষ্প নারি নিতে।
চোখের পলক ঠারি জানাইয়া দেয় কুমারী
মন সমর্পণ করি দিয়াছি তোমাকে।
আমি পাগল হইলাম তারকেশ্বরে ধেয়াইলাম
পূর্ণ কর মনস্কাম পাওয়াও কন্যাকে।

কিন্তু তারকেশ্বর সে মনস্কামনা পূর্ণ করেন নি। বরং কপালে লিখেছিলেন লাঞ্ছনা। গাস-চারেক মধ্যে কথাটা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে আসতেন বৃদ্ধা ঠাকুমা, দাসী, পাইক, গোমস্তা। ঠাকুমাই নাতনীকে নিয়ে পূজার্চনা করাতেন, দাসীও থাকত অবশ্য একটু দূরে। ক্রমে ক্রমে ইসারা-ইঙ্গিত থেকে কথাবার্তাও হয়েছিল। বুড়ী ঠাকুমা এই রূপবান যুবককে দেখে ভুলেওছিলেন। তাঁর ক্রমে ক্রমে ধারণা হচ্ছিল—বাবা তারকনাথই এই কুড়ারামের ছদ্মবেশে বা কুড়ারাম হয়ে জন্মে তাঁর নাতনীর বর হতে এসেছেন। পাঁচালীতে তার বর্ণনা আছে।

ইসারা-ইঙ্গিত হইতে হাতে হাতে ছুঁতে ছুঁতে
দোঁহে যায় মজি দুঁহুতে ঠাকুমাও বোঝে।

এই ঠাকুমাই বলেছিলেন ছেলেকে—দেখ, এই ছেলেই বুঝি বর। এরই সঙ্গে বিয়ে দে। একে-বারে সাক্ষাৎ শিব রে, সাক্ষাৎ শিব!

কিন্তু ছেলে তাতে তুষ্ট তো হন-ই নি—রুষ্ট হয়েছিলেন প্রচণ্ডভাবে। একটা পুজুরী বামুন—ওই পাণ্ডাশ্রেণীরও চাকর, সে হবে তাঁর জামাতা! তিনি মুখে কিছু বলেন নি মাকে। কিন্তু কন্যা ও মায়ের পরের আসবার নির্দিষ্ট দিনের আগেই হাতী চড়ে এসেছিলেন এবং মোহন্তের সঙ্গে কথা বলে গিয়েছিলেন। মহান্ত তারকেশ্বরের মহান্ত, তিনি কুড়ারামকে ডেকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে অপমান ও লাঞ্ছনার শেষ রাখেন নি। দেবতার পূজা সেবা করতে গিয়ে যাত্রী কুমারী কন্যার উপর পাপদৃষ্টি দাও তুমি পাষণ্ড! তুম বদমাস শয়তান, পাপী হো। তারপর

হুকুম দিয়েছিলেন—সেইদিনই সূর্যাস্তের পূর্বে সে যেন তারকেশ্বর ছেলে চড়ে যায়। না গেলে দুনিয়াতে সে আর থাকবে না। তাতেই ক্ষান্ত হন নি ; পাইক সঙ্গে দিয়ে হুগলী পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে রেখে আসবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হুগলী এসে তিনি কয়েকদিন মুহ্যমান হয়ে পড়ে আবার মহোদ্যম নিয়ে অর্থোপার্জনের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়ে ওই কন্যাকে তিনি বিবাহ করবেন। ব্যবসা তিনি পারবেন না তা জানতেন। তিনি চেয়েছিলেন চাকরী। এমন চাকরী যাতে মাইনেটা কিছু নয়, তার থেকে অনেক বেশী পাওয়া যায় ঘুষ। ঘুষকে তখন ঘুষ বলত না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ছিল। পাইকের উপরি—তলবানা। গোমস্তার উপরি—তহুরী! নায়েবের—নায়েব সেলামী। আমলাদের—পার্বণী। দালালের-দালালীর উপরেও দস্তুরী। সাহেবের—ভেট। ডালি। কুড়ারাম বেছে বেছে জমিদারী সেরেস্তা পছন্দ করেছিলেন এবার এবং এসে উঠেছিলেন প্রাচীন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ জমিদারী বাড়ী বাঁশবেড়ের কাছে। দাতার বংশ —নিত্য প্রভাতে উঠে ব্রাহ্মণকে নিষ্কর দিতেন কিছু। বাঁশবেড়ে জমিদারদের রাজা খেতাব আজও লোকসমাজে বহাল আছে। সকলে রাজার কাছে দর্শনপ্রার্থী হলে রাজা বলেছিলেন—তাই তো ঠাকুর, সাক্ষাৎ দেবতার মত তোমার রূপ, তা বিলম্বে এলে! এক্ষুনি যে নিয়মমত দান একজন নিয়ে গেল বাবা। তুমি কাল এস।

কুড়ারাম বলেছিলেন—হুজুরের কাছে নিষ্কর দানপ্রার্থী হয়ে আসি নি আমি। আমি একটি কর্মপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

—কর্ম? তা দেবকর্ম লোকজন তো যথাযথ রয়েছে এখন। তা—

হাতজোড় করে কুড়ারাম বলেছিল—দেবকর্ম আমি জানি হুজুর। কিন্তু তার প্রার্থনায় আসি নি ঠিক। এসেছি হুজুরের সেরেস্তাখানায় কোন কর্মের জন্য। আমি পার্সী জানি, বাংলা জানি, হিসাবনিকাশ রাখতে পারি।

—বল কি! কই তোমার হস্তাক্ষর দেখি!

হাতের লেখা দেখে খুব খুশী হয়ে কাজ দিয়েছিলেন তিনি। এখানে বছরখানেক কাজ করে পাকা জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ার হয়ে উঠেছিলেন। আমীনের কাজ তাও শিখেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে খবর তিনি পেয়েছিলেন যে, সেই কন্যার বিবাহ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। শুনে প্রথম ভেবেছিলেন, কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। কিন্তু কয়েকদিন পর মদ্যপানে দীক্ষা নিয়ে এই বিরহ ভুলেছিলেন। পাঁচালীতে লিখেছেন—

ভুলিতে বিরহ জ্বালা লইনু জপের মালা
ভরিয়া নারিকেল মালা খাইনু কারণ
পাইনু সান্ত্বনা তাতে জননী চরণ প্রসাদে
কর্ম করি সাথে সাথে হয় উপার্জন।

সুরেশ্বর হাসলে। এই ধরণের শক্ত বস্তুনিষ্ঠ মানুষ না হলে কুড়ারাম ভটচায বাংলার জমিদারী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা কীর্তিমান ব্যক্তি হতে পারতেন না। রায়বংশ

প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। তবে তাঁর এই পথে কঠিন পরিশ্রমে দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়ার কারণটা বোধ হয় ছিল এই কন্যাটির পিতৃবংশের সর্বনাশ। সেটা তিনি সচেতন মনে জানতেন না বোধ হয় তবে অচেতন মনের গভীরে ছিল এই বাসনা। না হলে তিন বছর পর যখন খবর রটল নবাব জাফর আলিকে নবাবী গদী থেকে নামিয়ে কোম্পানী তাঁর জামাই মীর্ মহম্মদ কাসেম খাঁকে তক্তে বসাচ্ছেন এবং কাসেম খাঁ খুব কাজের লোক তখন বাঁশবেড়ের চাকরী ছেড়ে তিনি মুরশিদাবাদ রওনা দিতেন না। বাঁশবেড়ের কর্তাই তাঁকে সুপারিশপত্র লিখে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন কান্দীর উত্তররাঢ়ী কায়স্থবংশের সন্তান নবাব সরকারের কানুনগো (তখন নাম ছিল বঙ্গাধিপ) প্রাণগোবিন্দ সিংহের কাছে। কুড়ারামের হাতে তখন পাঁচ হাজার টাকা জমেছে। তখনকার দিন, পথ নিরাপদ ছিল না। তারপর নবাব বদলের কাল। কুড়ারাম হুগলীতে গিয়ে কোম্পানীর কুঠীতে টাকাটা জমা দিয়ে বরাত নিয়েছিলেন কাসিমবাজারের কুঠীর উপর।

মুরশিদাবাদে এসে পড়েছিলেন মরসুমের সময়। নবাব কাসেম আলি খাঁ তখন শ্বশুর মীরজাফরের আমলের যত বিশ্বস্ত কর্মচারী তাদের প্রত্যেককে হিসাবনিকাশের দায়ে ফেলে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছেন। জাফর আলীর রাজস্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন কিনুরাম এবং মণিলাল। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষান্ত হলেন না, তাদের প্রাণ-দণ্ড দিলেন। ছ বহন হরকরা জাফর আলীর পেয়ারের হরকরা ছিল। তারও দশা হল তাই। এমন কি হারেমের দাসীবাদীরাও দায়ে পড়ল। রাত্রে কান্না শোনা যেত। তামাম অবস্থাপন্ন কর্মচারীর তখন হিসাব হচ্ছে, সুমার হচ্ছে পরগনাওয়ারি। নতুন বিচক্ষণ পাটোয়ারের প্রয়োজন হয়েছে নবাব সরকারে। প্রাণগোবিন্দ সিংহের নির্দেশমত নবাবের প্রিয়পাত্র মুৎসুদ্দিদের প্রধান আলি ইব্রাহিম খাঁর বিশ্বাসভাজন মুন্সীর হাতে এক হাজার টাকা নজরানা দিয়ে কানুন-গোদের অধীনে কর্ম পেলেন কুড়ারাম। পেলেন প্রাণগোবিন্দ সিংহের অধীনে নয় তাঁর ভাই কানুনগো গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অধীনে।

শুধু কর্মই পান নি। জীবনে প্রথম সঙ্গিনীও জুটে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যার পর কানুনগো গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যাচ্ছিলেন কান্দী মোকাম। খাগড়া ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠবেন পাল্কিতে। পাল্কিবেহারা সিপাহী পাইক সেখানে হাজির থাকবে। গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত তিনি সিংহজীকে নৌকায় তুলে দিতে গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। লালবাগ মুরশিদাবাদের পর বাকী সবই তখন পল্লীগ্রাম্। অন্ধকার পথ। গঙ্গার ধারে সিদ্ধির জঙ্গল। বড় বড় আমবাগান। পথের দুধারেও জঙ্গল। তিনি সন্তর্পণে আসছিলেন একলাই। জীবনের প্রথম থেকে পথে পথে ঘুরে গাছতলায় রাত্রি কাটিয়েছেন তিনি, দুঃসাহস তাঁকে যেন আশ্রয় করেছিল ভাগ্যফল হিসাবে। হাতে ছিল এক গাছি গুপ্তি লাঠি। লাঠি হিসাবেও মজবুদ। একেবারে ডগায় পরানো ছিল লোহার বোলো। হঠাৎ এক সময় কে যেন ছায়া-মূর্তির মত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে একেবারে তাঁর উপরেই আছড়ে পড়েছিল। ধাক্কাটা আচম্বিতে অতর্কিতে। পাশের একটা বাগান থেকে বেরিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ওপরের জঙ্গলে ঢুকবার মতলব ছিল তার। কিন্তু কুড়ারামের উপর আছড়ে পড়ল। কুড়ারাম পড়ে

গেলেন, সেও পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য হলেন কুড়ারাম, যার ধাক্কা খেয়েছেন সে অত্যন্ত হাল্কা মানুষ, হাল্কাও বটে কোমলও বটে, হয় বালক না হয় স্ত্রীলোক। আঘাত তিনি পান নি, পড়েই গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে তিনি তাঁর গুপ্তিটা কুড়িয়ে নিয়ে ডান হাতের মুঠোয় ধরে বললেন—কৌন হো তুম?

উত্তর পান নি। দেহটা প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। তখন হেঁট হয়ে তার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে বুঝেছিলেন সে স্ত্রীলোক। গন্ধেও বুঝেছিলেন। চুলের গন্ধ পেয়েছিলেন। আবার নেড়ে দেখেছিলেন তার মুখ, নাকের কাছে হাত দিয়েছিলেন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কিনা দেখবার জন্য। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছিল। তার সঙ্গে হাতে ঠেকেছিল বেসর। নাকের বেসর। মুসলমানী?

এবার পোশাক নেড়ে দেখছিলেন। হ্যাঁ, গায়ে কাঁচুলি ওড়না রয়েছে। কি করবেন ভেবে পান নি। ফেলে চলে যাবেন? যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু দুঃসাহসী নব-যুবক কুড়ারাম এই রাত্রে নির্জনে এমন একটি বিচিত্র রোমান্স ত্যাগ করে যেতে পারেন নি। তাকে ধরে তুলতে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে সে কাতরে বলে উঠেছিল—ছোড় দো মুঝে ছোড় দো। খোদা কসম কুছ্ নেহি মেরি পাস।

কুড়ারাম বলেছিলেন—লেঃ বাবাঃ! যা ভেবেছি। প্যাঁজ রসুনের গন্ধ বাবা! উঃ!

সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছিল খাঁটি বাংলায়—তোমার পায়ে পড়ি। তোমার পায়ে পড়ি।

কুড়ারামের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বলেছিলেন—কে তুমি?

—তুমি কে?

—একজন রাহী!

—নবাবের লোক নও? সিপাহী নও?

—চাকরী করি নবাব সেরেস্তায়, সিপাহী নই। তুমি কে?

—নবাবমহলের বাঁদী। বুড়ো নবাবের ছেলে মীরন আলীর বাঁদী। হিন্দু বামুনের মেয়ে ছিলাম, আমাকে ধরে এনেছিল। নবাবজাদা মরে গেল, বাঁদীদের কতক দিয়ে দিয়েছিল একে-ওকে, আমি মণিবেগমের কাছে ছিলাম। নতুন নবাব সব বাঁদীদের খোজা দিয়ে মারপিট করাচ্ছে ছেঁকা দিচ্ছে, বলছে—নবাবী টাকা জহরত কার কাছে কি আছে নিকাল। যা ছিল দিয়েছি। তবু রেহাই নেই। একটা হীরের আংটি ছিল সেটা ঘুষ দিয়ে আমি পালিয়েছি। পালাব আমি। আমাকে ছেড়ে দাও। কিছু নেই আমার।

সুরেশ্বরের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। একটা মানুষের ব্যস্তত্রস্ত উচ্চ পদক্ষেপের শব্দে। জুতো পায়ে দেওয়া বিংশ শতাব্দীর মানুষ। ছুটে চলেছে।

কর্পোরেশন স্ট্রীট থেকে মোড় ফিরে একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। তার পিছনে তিনজন যেন তাকে ধরবার জন্যই ছুটছে। হয়তো একটু পরই শোনা যাবে কোলাহল। কেউ কাউকে ছুরি মেরেছে অথবা দুজনেই দুজনকে মেরেছে। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট এখান থেকে খানিকটা দক্ষিণে গিয়েই। এখনও সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ—যখন ইংরেজের জীবন উদ্দাম হয়ে উঠে ফিরিঙ্গী সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল—সেই সভ্যতার রাজ্য বা সাম্রাজ্য। তার সঙ্গে আছে

মুসলমান আমলের ওই কালের জের যে-কালে কুড়ারাম ভটচাজ ওই মেয়েটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

মেয়েটিকে কুড়ারাম ছেড়ে দেন নি। ঘরে এনেছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন। মীরজাফরের ছেলে মীরন বজ্রাঘাতে মারা গেছে তখন—বছর খানেক আগে। লোকে বলছে ঢাকার পথে নৌকোতে নির্বাসনে যাচ্ছিলেন সিরাজজননী আমিনা বেগম আর সিরাজের প্রধান শত্রু তাঁর মাসী ঘেসেটী বেগম। ঘেসেটী বেগম বলতে গেলে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জাফর আলি খাঁয়ের চেয়েও বড় ছিলেন। এঁর চরিত্র নিয়ে কুৎসিত কথা এবং গল্পের আর অন্ত নেই। তবুও তো নারী। আলিবর্দীর কন্যা। ঢাকায় পাঠানো হচ্ছিল যেন আর কোন গণ্ডগোল না হয়। মীরন ছিল প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু তার আসল মতলব ছিল অন্য। সিরাজের বেগম যারা ছিল তাদের এক লুৎফুন্নিসা বেগম আর উমদৎউন্নিসা বেগম ছাড়া বাকীদের সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিল মীরন আমীর-ওমরাহদের মধ্যে। ক্লাইভ সাহেবের সাঙ্গোপাঙ্গরাও নাকি সব থেকে খুবসুরতি যারা তাদের বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই কয় বেগমকে নিয়ে ছিল সমস্যা। লোকের ভয়ে লুৎফুন্নিসা আর উমদৎকে বিলি করতে পারে নি বা নিজেও নিতে পারে নি মীরন। লুৎফুন্নিসাকে নাকি বলা হয়েছিল কাকে পছন্দ কর তুমি বল!

লুৎফুন্নিসা বলেছিল—হায় মেরী নসীব। হায় সরম কি বাত্!—

—কেন?

—কেন? হাতীর উপর যার চড়া অভ্যাস বা হাতীতে যে চড়েছে তাকে কতকগুলো গিধ্ধড় দেখিয়ে বলছে—বল কোন গিধ্ধড় তোমার পসন্দ্!

উমদৎউন্নিসা ছিল সিরাজের বিয়ে-করা বেগম। তাকে কিছু বলতে সাহসই করে নি। কিন্তু যতদিন আমিনা ঘেসেটী বেঁচে আছে ততদিন বিপদ কাটবে না। নবাব আলিবর্দী খাঁর বেটী যদি কোন রকমে বেরিয়ে একটা আশ্রয় পায় এবং সিপাহীদের সামনে দাঁড়ায় তো কি হবে কেউ বলতে পারে না। মীরন তাঁদের ঢাকা পাঠাবার নাম করে নৌকোয় চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পদ্মার বুকে নৌকোটা ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। কেউ জানবে না কেউ দেখবে না, পদ্মার বুকের উপর কোন সাক্ষী থাকবে না। তাই ডুবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমিনা ঘেসেটী নৌকো যখন ডুবছে তখন তার উপর দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে বলেছিল—আরে বেইমান, বিজলী গিরে রে তেরা শিরপর, বিজলী গিরে রে মীরন, তেরা শিরপর বিজলী গিরে। তারপর ডেকেছিল আল্লাহতায়লাকে। ডাকতে ডাকতেই ডুবেছিল নৌকো। এবং এই চিৎকার-অভিশাপ গঙ্গার ধারের অনেক লোক শুনেছিল, তাই আর গোপন থাকে নি। মিথ্যে হয় নি বেগমদের অভিশাপ। সুরেশ্বর জানে এটা কাকতালীয়। অভিশাপ ফলে না। কিন্তু মীরন মরেছিল বজ্রাঘাতে। কুড়ারাম ভট্টাচার্য সে কালের লোক, তিনি অভিশাপ মানতেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এতে।

"বেগমদের অভিশাপে মীরন মরে বজ্রাঘাতে সাতটি ছিদ্র ছিল মাথে দেখেছে সকলে।"

পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছিলেন মীরন শাহজাদা। সঙ্গে কোম্পানীর পল্টন-কাপ্তেন। মীরনের সঙ্গে বাঈ ছিল, হাত-পা টেপার খানসামা, কাহিনী বলার লোক—এরাও

ছিল সেদিন তাঁবুতে। আকাশে মেঘ উঠতেই মীরন ভয় পেয়ে আসর মজলিস সব ফেলে বড় তাঁবু ছেড়ে ছোট্ট একটা তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকেছিল, যেমনভাবে লোকে চোরকুঠীতে লুকোয়। কিন্তু হঠাৎ আকাশ ঝলসে উঠল বিদ্যুতে—কড় কড় কড়াৎ শব্দে চারিদিকটা থরথর করে কাঁপিয়ে ডেকে উঠল মেঘ। বাজ পড়ল মীরনের সেই ছোট তাঁবুতেই। তার মাথায় সাতটা ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল, মুখখানা ঝলসে গিয়েছিল। সেই সঙ্গেই ছিল এই মেয়ে। অন্য তাঁবুতে। নাম ছিল ফয়জান। ফয়জান তখন মাসছয়েক এসেছে। গঙ্গার ঘাটে স্নানে এসেছিল, মীরন নৌকো থেকে হুকুম দিয়েছিল—লে আও উয়ো ছোকরী কে। সিপাহীরা তুলে এনেছিল। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে। সত্যকার সুন্দরী মেয়ে। মীরনের সঙ্গে বাঈজী বেগম চাকর নফর এরা ফিরল মুরশিদাবাদ। মীরন শাহজাদা হেরে গিয়ে মরে নি, তাহলে তার তাঁবুর হীরা-জহরৎ টাকা লুটের সঙ্গে এরাও লুট হত। কিন্তু মীরন তখন শাহজাদা মীরন। বাপ জাফর আলি মুর্শিদাবাদের তক্তে বসে আছেন। সুতরাং খুব ইজ্জত সম্ভ্রমের সঙ্গেই মীরনের তাবুর সব এসে ঢুকেছিল মুরশিদাবাদ হারেমে।

মণিবেগম এককালে সিরাজের বিয়ের সময় বাঈজী হিসেবে নাচতে এসেছিল। সে আর বব্বু। দুই বাঈজীকেই নিকা করে ঘরে ঢুকিয়েছিলেন জাফর আলি খাঁ। মণিবেগম হয়ে উঠেছিল প্রধান বেগম। মণিবেগম রূপসী মেয়েটাকে দেখে নিজে নিয়েছিলেন বাঁদী করে। হয় জাফর আলি খাঁর হাত বাড়ানো বন্ধ করতে কিম্বা হয়তো জাফর আলির নজর তার দিক থেকে সরে অন্যদিকে ফিরতে চেষ্টা করলে এই মেয়েটাকে দিয়ে সেই নজর বন্ধ করতে। কোনটা ঠিক জানতেন এক মণিবেগম।

মেয়েটাকে ঘরে এনে তুলেছিলেন কুড়ারাম। রূপ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বেশ একটু বিশদ বর্ণনা। এ যুগেও রীতিমত অশ্লীল। কাজী নজরুলের বসন্ত কবিতাটি নিয়ে এ যুগের একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক নিষ্ঠুর কথা বলেছিলেন। সে কবিতা এর কাছে কিছুই নয় সেদিক দিয়ে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর জাতের। ভারতচন্দ্রের কাব্যগুণ এতে নেই। তারপর কুড়ারাম মেয়েটাকে বলেছিলেন—দেখ, মুসলমান থাকতে তোকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারব না। বাজারে বাঈজী হলে সেখানে তুই আমার কথা ভুলবি। আর নবাবের নজর ফের পড়বে। তখন আবার পাকড়াও হবি। তা হলে কি করি বল তো।

মেয়েটা কি বলবে? সে বলেছিল—তুমি যা বলবে।

সেও মুগ্ধ হয়েছিল কুড়ারামকে দেখে তাতে সন্দেহ নেই। কুড়ারাম একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল—পথ আছে। হয়েছে।

—কোন পথ?

—তার আগে বল—পিয়াজ রসুন গোস্ত ছাড়া ভাত রুচবে তো তোর?

মেয়েটা বলেছিল—আমি তো হিন্দু ঘরের বিধবা। তাই তো খেতাম।

কুড়ারাম বলেছিল—সেইজন্যেই তো বলছি। হিন্দু বিধবা একবার ও সব খেতে ধরলে

ছাড়তে পারে না। সলমানীর চেয়ে বেশী খায়।

মেয়েটা বলেছিল, পারব। তুমি দেখ।

কুড়ারাম বলেছিল—তাহলে তোকে বোষ্টমী হতে হবে। মহাপ্রভুর ধর্ম, ওতে বাধা নেই। চল্ তোকে জিয়াগঞ্জের হরিদাস বাবাজীর কাছে নিয়ে গিয়ে ভেক দিয়ে নিয়ে আসি। ভাল হবে। ফোঁটা তিলক কাটলে চুড়ো করে চুল বাঁধলে কার সাধ্যি ধরবে তুই নবাব হারেমে বেগম সাহেবের বাঁদী ছিলি। তোর নাম ছিল ফয়জান।

কথা হচ্ছিল কুড়ারামের বাড়ীতে বসে। কুড়ারাম হিসাবের দিক থেকে অত্যন্ত পাকা এবং সে দিকে বুদ্ধিবিচার তীক্ষ্ণ ছিল। নিজে লিখেছেন—

যাহা করি রোজগার তিন ভাগ করি তার
এক ভাগে ব্যয়ভার নিজের পেটের
এক ভাগ পুঁতে রাখি পিত্তলের ঘটি ঢাকি
অন্য ভাগ লগ্নী রাখি বিশ্বাসী শেঠের।

হিসাবী লোকটি মুরশিদাবাদে পাঁচ হাজার টাকার বরাত হুণ্ডী নিয়ে এসে টাকা ভাঙিয়ে হাজার টাকা নজরানা দিয়েছিলেন চাকরীর জন্য। বাকী চার হাজারের কিছু টাকা হাতে রেখে একটা সামান্য বাড়ী কিনেছিলেন খাগড়ার প্রান্তে। নবাবী শহরের ধার ঘেঁষে। সামান্য দু কুঠরী দালান। নবাবের কাছে যারা সাজা পেয়েছিল পূর্বতন নবাব-প্রীতির জন্য তাদেরই একজনের বাড়ী। বাকী টাকাটা ওই বাড়ীর মেঝেতেই পুঁতে রেখেছিলেন। কথা হচ্ছিল সে বাড়ীতে। বেশ খিল কপাট বন্ধ করে।

মেয়েটা আবারও বলেছিল—যা বলবে তুমি, তাই করব। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। প্রাণের ভয়ে যা ছিল সব দিয়ে কোন রকমে বেরিয়ে জঙ্গল ভেঙে বাগানের পাশ দিয়ে পড়ো বাগানের তলা দিয়ে কোথা পালাচ্ছিলাম জানি না। হয়তো সাপে খেতো নয়তো কোথাও খানাখন্দে পড়ে জান যেতো—

—উঁহু উঁহু। জান নয় জীবন বল! জানে পেঁয়াজের গন্ধ ছাড়ে।

মেয়েটা হেসেছিল, বলেছিল—অভ্যেস হয়ে গিয়েছে এমন—

—ছাড়তে হবে।

—ছাড়ব।

হঠাৎ কুড়ারাম বলেছিল—এক কাজ কর।

—কি ?

—দাঁড়া। বলে একটা ধারালো দা দিয়ে বলেছিলেন—ওই লম্বা বেণীটা আগে কাট। ওই চুল বাধা। চুল একেবারে কামাতে হবে। নইলে ওই বাহারে চুল আর সিঁথির ঢং যাবে না। কাট!

মেয়েটা তাই কেটেছিল। অনেক কষ্টে অবশ্য। চোখ দিয়ে জল পড়েছিল একদিকে, অন্যদিকে হাসছিল; এ যেন এক কৌতুক। নিজে কাটতে পারে নি, বলেছিল—তুমি কেটে দাও।

—চেঁচাস নে।

—না।

জোরে খড় কাটার মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটেছিলেন কুড়ারাম। তারপর বলেছিলেন—আর এক কাজ কর।

—বল।

বাইরে বেরিয়ে খানিকটা গোবর এনে তাকে দিয়ে বলেছিলেন—খা। খেয়ে শুদ্ধ হ। বামুনের মেয়ে তো, বুঝিস না ? নে।

বেশ খানিকটা গোবর নিয়ে সে কোঁত করে গিলেছিল অম্লান মুখে।

কুড়ারাম বলেছিলেন—হ্যাঁ, তুই বামুনের মেয়ে বটিস।

তারপর কলসীতে গঙ্গাজল ছিল, এনে খানিকটা খেতে দিয়েছিলেন, বাকীটা হুড় হুড় করে তার মাথায় ঢেলেছিলেন, তারপর বলেছিলেন—যা শুদ্ধ। বল দশবার—কি বলবি বল দেখি ?

মেয়েটা বলেছিল, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি, শ্রীহরি শ্রীহরি।

—বাস শুদ্ধ। এবার ওই ঘাঘরা-মাগরা ছেড়ে আমার কাপড় পর একখানা। কাল শাড়ী কিনে এনে দেব !

কুড়ারাম জীবনে বহুবার শাস্ত্রকে নিজে নিজের মনোমত করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। অন্যের ব্যাখ্যার ধার ধারেন নি, কিন্তু কখনও শাস্ত্র মানি না বলে ফেলে দেন নি। বলতেন—শাস্তর হলো বৈতরণী পারের নৌকো, বাইব আমি নিজে। ওপারে পৌছুলেই হল।

বৈতরণী পার হতে হইলে শাস্ত্র তরী ভূমণ্ডলে
আমি নিজ বাহুবলে বাহিব ওপার।

মোট কথা এই ভাবেই ব্রাহ্মণ বালবিধবা শ্যামা দাসীকে মীরন ধরে এনে ঘাঘরা কাচুলি ওড়না পরিয়ে নাম দিয়েছিল ফয়জান, কুড়ারাম তাকে ঘরে এনে মাথা নেড়িয়ে গোবর খাইয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে তিলক ফোঁটা রসকলি কাটিয়ে নাম দিয়েছিল ললিতা বৈষ্ণবী। চুল যখন আবার নতুন করে গজিয়ে এক পিঠ হয়েছিল তখন তাকে বৈষ্ণবীর চেহারায় ফয়জান থেকেও ভাল লেগেছিল। প্রথম প্রথম ঘরে বন্ধ করে যেতেন সেরেস্তাখানায়। এসে ঘর খুলবার আগেই গলার সাড়া দিতেন, অমনি জানালাটা খুলে ললিতা মুখ বাড়িয়ে হাসত।

ললিতার পয় ছিল। এবং ললিতা নতুন জীবনে সত্যই কুড়ারামগতপ্রাণ ছিল। ঘর করেছিলেন পনের বছর। এর মধ্যে যত উন্নতি হয়েছিল কুড়ারামের তত তিনি সুখী হয়েছিলেন ললিতাকে পেয়ে। এবং বিশ্বাস এমনি গাঢ় হয়েছিল যে, তাঁর টাকা কোথায় মাটিতে পোতা আছে তাও কুড়ারাম ললিতাকে দেখিয়েছিলেন। সৌভাগ্য কুড়ারামের যে, তাঁদের সন্তান হয় নি।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জানতেন কুড়ারাম বিবাহিত। ললিতাই তাঁর স্ত্রী। তিনিই তাঁকে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের বর্ষার সময় সাবধান করে দিয়েছিলেন—ভটচাজ, তুমি একা নও, শুনেছি

পরিবার নিয়ে বাস কর, লোকে বলে স্ত্রী সুন্দরী। সেইজন্তে সাবধান করছি হে, সময় থেকে অন্তত পরিবারকে ঘরে রেখে এস। কোম্পানীর সঙ্গে কাশেম আলীর বনছে না!

কুড়ারাম সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হয়েছিলেন। নবাব কাশেম আলী রাজধানী সরিয়েছেন মুঙ্গেরে; কোম্পানীর কেল্লা কলকাতা থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। সুতরাং কুড়ারাম ভুল করলেন না, তিনি কলকাতার দিকেই এগিয়ে এলেন। মারামারি রক্তারক্তি যা হবার মুরশিদাবাদ থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত হবে। বলতে গেলে মুরশিদাবাদকে একরকম খালিই করছেন নবাব। তিনি কৃষ্ণনগরে এসে এক আস্তানা গেড়ে রাখলেন। দরকার হলেই ওখানে এসে উঠবেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন মীরকাশেমের কোপ থেকে রেহাই পেয়ে কৃষ্ণনগরে ফিরেছেন। মহারাজ তাঁকে জানতেন। জানবার কারণ, নবাব তখন আয় বাড়াচ্ছেন; পরগণায় পরগণায় রাজস্ব বৃদ্ধি করছেন, আবওয়াব চাপাচ্ছেন। সে সব যাদের কলমে হচ্ছে তাদের মধ্যে কুড়ারাম ভট্টাচার্য অন্যতম। কুড়ারামের হিসাব অনুযায়ী দিনাজপুরের রাজার রাজস্ব আগের থেকে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার বেড়েছে। নাটোরের বেড়েছে আট লক্ষ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সে অনুপাতে কমই বেড়েছে, ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। সুতরাং আশ্রয় পেয়েছিলেন। সহজেই। সেখানে ছোটখাটো আস্তানা তৈরী করে রেখেছিলেন। দরকার হলেই সরবেন। নগদ টাকাটা জিম্মা দিয়েছিলেন তাঁর মালিকের মত উপরওয়ালা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হাতে। তার পরিমাণ তখন প্রায় দশ হাজার।

গঙ্গাগোবিন্দ প্রশ্নও করেন নি—এত টাকা কোথা পেলে?

টাকা আরও বেশী হলেও জিজ্ঞাসা করতেন না। করবেন কেন? ব্যাপারটা তো বলতে গেলে প্রকাশ্য। নবাব কোম্পানী জমিদার সকলেই আয় করছেন। নবাব কাশেম আলী নবাবী নেবার সময় পনেরো লক্ষ টাকা দিয়েছেন কোম্পানীর সাহেবদের। ভান্সিটার্ট সাহেবই নিয়েছে পাঁচ লাখ, হলওয়েল দু লাখ সতেরো হাজার। তা ছাড়া কোম্পানীর আলাদা। মীরজাফর আলি দিয়েছিলেন ষাট লাখ টাকা। একা ক্লাইভকেই দিতে হয়েছিল কুড়ি লাখ।

নবাবেরা দিয়ে সেটা প্রজার ঘাড়ে না তুললে পাবে কোথায়? সে দিক থেকে নবাব কাশেম আলী জবরদস্ত। রাজস্ব বাড়িয়ে পূর্বের আয় থেকে এক কোটি দশ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে পাকা আয় করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় জমিদারদের কাছে খেলাতই হোক আর জরিমানাই হোক আদায় করেছিলেন কোটি দরুণে। তার সঙ্গে সেরেস্তার কর্মচারীরা পাবে না এ কি কথা! অন্ততঃ সে আমলে কুড়ারামেরও মনে হয় নি, ঘুষের টাকা উপরওয়ালাকে দেখালে তিনি তাকে ধরবেন এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও তা ধরেন নি, বেশ সহজভাবেই নিয়ে রেখে স্মরণার্থ একটা রসিদ দিয়েছিলেন। মানুষের শরীর, তিনি যদি নাই থাকেন তবে পুত্র পৌত্র যে থাকুক তিনিই দেবেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই লড়াই বাধল। এক কাটোয়াতেই যা মুরশিদাবাদের আগে যুদ্ধ হল, নইলে কুড়ারামের কথাই হল সত্য। যুদ্ধ হল ঘিরিয়ার উধুয়ানালায়—মুরশিদাবাদের উত্তর-পশ্চিমে। কুড়ারাম আগেই সরে গেলেন গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিম তীর ধরে নবদ্বীপ পর্যন্ত,

তারপর গঙ্গা থেকে জলঙ্গী ধরে কৃষ্ণনগর।

কাশেম আলী গেলেন, আবার বুড়ো নবাব এলেন। এবার আর কুড়ারাম ফিরলেন না। ওই কৃষ্ণনগরে রাজার সেরেস্তাতেই কাজ নিয়েছিলেন। ঠিক ভাল লাগে নি ঝঞ্ঝাট। সে সময় ললিতাকে নিয়ে সুখে থাকবার একটা মোহ তাঁকে পেয়েছিল। কিন্তু বছর খানেক পর বুড়ো নবাব মারা গেলেন। ছেলে নজুমউদ্দৌলা নবাব হল। মণিবেগম তার অভিভাবিকা। তখন ললিতা বললে—ফিরে চল মুরশিদাবাদ। বেগম আমাকে খুব ভালবাসতেন।

কুড়ারাম ভেবে-চিন্তে ফিরেছিলেন।

ললিতা মণিবেগমের কাছে কিছু বকশিসও পেয়েছিল। বেগম সব শুনে খুশী হয়ে কিছু অলঙ্কার দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন একখানা কুঠী। কুড়ারামের মিলেছিল চাকরী নবাব-দপ্তরে। নবাবদপ্তরের রস আর বিশেষ ছিল না। নতুন কুঠীতে একটু ভালভাবেই সংসার পেতেছিলেন তিনি।

দেওয়ানী তখন কোম্পানীর হাতে গিয়েছে। আদায় তহশীল সব। নবাববাড়ীতে নবাব থেকে বেগম এবং নবাবজাদা নবাবজাদীরা সব কোম্পানীর তনখাভোগী। শুধু আশে-পাশে কিছু কিছু সম্পত্তির আদায় আছে এই পর্যন্ত। পাওনা-গণ্ডা বিশেষ নেই। কোম্পানীর দেওয়ানী সেরেস্তায় ঢোকা সহজ নয়। তার মুরুব্বি সব কলকাতায়। কিন্তু কলকাতায় নোনা লাগে, বাঘ আসে, ডোরা বাঘ ; তা ছাড়া মুরব্বিরা অচেনা, কলকাতা তার থেকেও বেশী অজানা। কিন্তু কুড়ারাম লিখেছেন—

ভাগ্যে যার থাকে বল শুষ্ক বৃক্ষে ধরায় ফল
মরুভূমি মিলায় জল—বর্ষে বিনা মেঘে।

ব্যাপারটা ঠিক তাই। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হঠাৎ পড়ে গেলেন হেস্টিংস সাহেবের সুনজরে। ঘটনাটা অদ্ভুত। নবাব সিরাজুদ্দৌলা যখন কাশিমবাজার কুঠীর উপর চড়াও হয়ে হামলা করেন, তখন হেস্টিংস সাহেব পালিয়ে গিয়ে এক মুদীর দোকানে আশ্রয় চেয়েছিল। মুদীও দিয়েছিল। তাকে রন্ধনঘরে একটা জালায় পুরে তার মুখটা ঢেকে রেখেছিল। তাতে প্রাণে বেঁচেছিলেন তিনি। তিনি গভর্নর হয়েছেন এখন। তিনি খুঁজছিলেন কান্ত মুদীকে। কিন্তু সঠিক কান্ত মুদী কিনা নিঃসংশয় হতে পারছিলেন না। জনকতক লোকই কান্ত মুদী বলে এলেও তিনি ঠিক চিনতে পারছিলেন না, কিন্তু ঠকবার লোক তিনি নন। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের। এদেশের লোকের কাছে সাদা মানুষেরা যেমন সব একরকম দেখতে, সাদা মানুষের কাছে কালো মানুষেরাও প্রায় সেই রকম। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বুদ্ধিমান লোক, হেস্টিংস সাহেব কি জন্যে কান্ত মুদীকে চান তা খানিকটা বুঝে খোঁজ করে ঠিক কান্ত মুদীকে নিয়ে গিয়েছিলেন হেস্টিংস সাহেবের কাছে। এবং বলেছিলেন—মি লাড, আপ উসকে এইসা কোই বাত পুছিয়ে যো বাত আপ জানতে হেঁ আউর ই জানতে হে। আউর কোই নো নট।

সাহেব বলেছিলেন—ঠিক বাত। দ্যাটস রাইট! আচ্ছা উসকো পুছো—কোই সাহেব কো উসকে সাথ কাশিমবাজার কুঠী লুট হোনেকা বক্তমে মোলাকাৎ হুয়া ?

কান্ত মুদী বলেছিল—এক সাহেব প্রাণের ভয়ে আমার কাছে এসেছিল, আমি আমার

মুদিখানায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।

—হ্যাঁ। কিস্ কায়দসে উসকো ছিপাকে রাখা ?

—জালার ভেতর পুরে মুখে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম।

সাহেব বলেছিলেন—ক্যা বোলতা ? জালাকে অন্দর রাখ্যা—মু বন্ধ্ করকে। উ তো মর যাগা !

—না হুজুর, আমি জালাতে বাতাসের জন্যে ফুটো করে দিয়েছিলাম।

—হাঁ। হোনে সেকৃতা হ্যায়। লেকিন খানে ক্যা দিয়া ? রোটী—গোস ?

—না হুজুর—পান্তা ভাত আর আমানি দিয়েছিলাম।

—আচ্ছা। আচ্ছা। বহুত আচ্ছা। লেকিন তুমি উ সাবকে পহ্ছানতে পারে ?

—না হুজুর।

—হম হ্যায়। উ হম হ্যায় কান্তবাবু। আজসে তুম বাবু বন গেয়া। তুম হামারা জান বাঁচায়া, হম তুমকো বাবু বানায়েগা, রাজা বানায়েগা।—

আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে বলেছিলেন—আচ্ছা কামদার হুঁসিয়ার আদমী হো তুম সিংবাবু। তুম হামারা কোম্পানীকে দেওয়ানী সিরাস্তামে কাম করো। আই এ্যাম ভেরী প্লিজড উইথ ইউ। বহুত খুস হুয়া হম।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কাজ পেয়েই লোক পাঠালেন মুরশিদাবাদ। আপনার অনুগত লোকদের ডেকে আনলেন। তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন কুড়ারাম।

৩

পাঁচালীতে আছে—

দেবী সিংহ রেজা খান হইলেন হতমান
বন্দী হয়্যা শেষে যান কোম্পানীর ফাটকে।

মহম্মদ রেজা খাঁ—রাজা দেবী সিং তখন কোম্পানীর রেভেন্যু বোর্ডের সর্বেসর্বা। তারা নিদারুণ অত্যাচারে খাজনা আদায় করে দেশ উৎসন্ন দিলে। তবু কোম্পানীর খাঁই মিটল না। বিলেতে কোম্পানীর অংশীদাররা শতকরা সাড়ে বারো টাকা লাভ পেলে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট বছরে চল্লিশ লক্ষ টাকা ট্যাক্স আদায় করলে কোম্পানীর কাছে। জগৎশেঠের দেনা শোধ হল না। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর হল। রেজা খাঁ, দেবী সিং গেল। রেজা খাঁ ফাটকে গেল। নন্দকুমারের ফাঁসি হল। রায়রাঁইয়া অর্থাৎ কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান হলেন রাজা দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভ। ডেপুটি দেওয়ান হলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিং। তারপর দেওয়ান! ফ্রান্সিস সাহেবের সঙ্গে হেস্টিংসের পিস্তল লড়াই হল। জখম হলেন ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস সাহেবের দলের একজন সায়েব মারা গেলেন। হেস্টিংসের হল জয়জয়কার, তার সঙ্গে দেওয়ানজীর। তার সঙ্গে কুড়ারামের।

দেওয়ানজীকে কতজনে কত বললে। দেওয়ানজী ছিলেন পাহাড়ী। তিনি নড়েননি।

তাঁর আড়ালে কুড়ারাম ঢিপি হলেও উইঢিপি ছিলেন না—একটা পাথরের ডাঁই ছিলেন। দেওয়ানজীকে দেওয়ানী থেকে একবার নামালে। কিন্তু দেওয়ানজী আবার উঠলেন। বললেন—নিজের কাম করে যাও কুড়ারাম। যার জন্যে আছ, সে কাজ তুমি করো। কেউ তোমাকে নামাতে পারবে না। আজ নামালে কাল উঠবে। বুঝেছ? আমাকে কোম্পানী রেখেছে কোম্পানীর আয় দেখতে বাড়াতে; আদায় করতে। আমাকে করতেই হবে। না করলে নিশ্চয় অধর্ম হবে আমার। রাজা সেপাই রাখে সান্ত্রী রাখে বদমাসকে দুষমনকে মারতে। সে তার কাম। দয়া সেখানে তুমি করবার কৌন-হো? কৌই নেহি হো। সে কাম না করলেই হবে বেইমান। নিমকহারাম। কি করব? দেখো ভটচায, দুনিয়া যে বানিয়েছে সেই বানিয়েছে বাঘ—সেই বানিয়েছে হরিণ। সেই বানিয়েছে ঘাস লতাপাতা। হরিণ ঘাস খায়, বাঘ হরিণ খায়। মানুষ বাঘ মারে। মানুষও মরে। ওসব বিচার আমার নয়। তোমার নয়। আপনা কাম। যে সাধু সে জপ করুক। যে ভিখিরী সে ভিখ মাঙুক। তুমি তোমার কাম কর।

হেস্টিংস চলে গেলেন দেশে। সেখানে পার্লামেন্টে ঝড় উঠল। হেস্টিংস সাহেবের পর ভান্সিটার্ট সাহেব এল—তারপর এল বুড়ো লর্ড কর্নওয়ালিস। দেওয়ানজীর চাকরী থাকবে এ কেউ ভাবে নি। কিন্তু দেওয়ানজী তবু রইলেন। দেওয়ান থেকে খারিজ হয়ে জমা বাকী সেরেস্তার ভার পেলেন। কুড়ারাম তাঁর দপ্তরেই এলেন। এই সময়ে মারা গেল ললিতা। তখন থাকতেন দেওয়ানজীর সঙ্গে বেলুড়ে। দেওয়ানজীদের পাইকপাড়ার বাড়ী তখনও হয় নি। বেলুড়েই মারা গেল ললিতা। দেওয়ানজী বললেন—এবার বিয়ে করে সংসার কর ভটচায। যা হয়ে গেছে গেছে, শেয়াল চাঁদে খেয়েছে। এবার ফের নতুন করে আরম্ভ কর।

কুড়ারাম চমকে উঠেছিলেন। দেওয়ানজী বলেছিলেন, হেসেই বলেছিলেন—আমি সব জেনেছি ভটচায, লজ্জা পেয়ো না।

রায় ভটচাজের পাঁচালীতে আছে—

দেওয়ানজীর রাজবুদ্ধি ডেকে কন শোন যুক্তি
বংশ বিনে নাহি মুক্তি নরক রৌরবে।
অতএব বিভা কর মিছা কেন কাল হর
স্থাপ বংশ বংশধর মায়াময় ভবে।
ললিতার এন্তাকালে স্নান করি গঙ্গাজলে
দাড়ি গোঁপ চেঁছে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করি।
দর্পণে দেখিনু মুখ হইল আশ্চর্য সুখ—
যৌবন রয়েছে অটুট হরি হরি হরি।
দেখিলাম বক্ষপাটা ঢিলা নয় আঁটাসাঁটা
এ যেন জীবন গোটা সব আছে পড়ি।

অতএব রায় ভটচাজ বিয়ে করবার অভিলাষী হলেন। কিন্তু বয়স্কা কন্যা চাই। সুন্দরী কন্যা চাই। এবং বংশও উচ্চ চাই। পেতেও বিলম্ব হ'ল না। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের

প্রিয়পাত্র, কোম্পানীর দেওয়ানী দপ্তরে বিচক্ষণ কর্মচারী, শক্ত সমর্থ রূপবান মানুষ, লোকে বলে অর্থ তাঁর অনেক, তাঁর কি আর কন্যার অভাব হয়? বিবাহ করলেন পছন্দ করে; কালীঘাট গ্রামে, তখন কালীঘাটকে তার বাসিন্দারাই বলত গ্রাম। সুন্দরী বয়স্কা কন্যা; কিন্তু বংশের খুঁত ছিল। লোকে বলত ফিরিঙ্গী সংস্পর্শে দোষ। সেই কারণেই এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয় নি, কিন্তু কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য, যিনি মুসলমান হয়ে যাওয়া বামুনের মেয়েকে গোবর খাইয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে ললিতা করতে পেরেছিলেন তাঁর পক্ষে এ বাধা বাধাই হয় নি। বিয়ে ক'রে নবদ্বীপে গিয়ে পোড়া-মা-তলায় আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যের বংশধরদের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে পাকা ভিত গেড়ে সংসার শুরু করেছিলেন। কলকাতায় তখন জানবাজারে রাণী রাসমণির কাছে জমি পেয়েছেন। বাড়ী করলেন ছোটখাটো. এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন নিজের গ্রাম নিজের ভিটেকে। দৃষ্টি স্বপ্নের মধ্যেই হোক আর গভীর চিন্তার মধ্যেই হোক, কীর্তিহাট ছাড়িয়ে কাঁসাই নদীতে তরী ভাসিয়ে হলদীতে পড়ে চলে গেছে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'নিমক-মহল' পর্যন্ত। অর্থাৎ যেখানে নুন তৈরী হ'ত সে সব অঞ্চল—হিজলী তমলুক কাঁথি পর্যন্ত।

কোম্পানী হেস্টিংস সাহেবের আমল থেকে নুনের কারবার একচেটে করেছে। খালারি বা নুন তৈরীর খালগুলি কোম্পানীর খাস, সেখানে জমিদারের দাপট চলে না। কোম্পানী দাদন দেয়, ঠিকাদারদের নুন কেনে। ওদিকে দক্ষিণে মারাঠা এলাকার নুন আমদানি বন্ধ হয়েছে। দেশে নুনের দর চড়েছে, নিমক মহলের ইজারার এলাকায় এখন পূর্ণিমা অমাবস্যার জোয়ারের মধ্যে মা লক্ষ্মীর মল বা নূপুরের ঝম ঝম শব্দ শোনা যায়। মা লক্ষ্মী এখানে লক্ষ্মী মেয়ের মত আস্তে হাঁটেন না, চঞ্চলা চপলা দুরন্ত মেয়ের মত দৌড়ে আসেন।

নুনের দেওয়ানীর পদ তখন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার থেকেও ইজারাদারির উপর নজর ছিল বেশী। কীর্তিহাটে পোক্ত আরামদায়ক মাটির কোঠাবাড়ী করিয়ে ওখানেই কারবার শুরু করবার বাসনা করেছিলেন। হঠাৎ বাধল বিপর্যয়। মেদিনীপুরে হল চুয়াড় হাঙ্গামা। প্রথম কোম্পানীর সঙ্গে রাজস্ব নিয়ে লেগেছিল ওখানকার জমিদারদের। লড়াইও দু'চারজন জমিদার করেছিল। সে লড়াই কলকাতার ময়দানে মনুমেণ্টের তলায় সন্ধ্যার পর হিন্দুস্থানীদের কপাটী খেলার মত লড়াই। লড়াইয়ে হেরে জমিদারেরা বাগ মানলে, কিন্তু চুয়াড় পাইকেরা পাইকান জমি বাজেয়াপ্তির জন্যে হাঙ্গামা বাধালে। চুরি ডাকাতি খুনখারাপি দিয়ে শুরু, ক্রমে পাঁচশো সাতশো হাজার দেড়হাজার চুয়াড় পাইক জবরদস্তি ক'রে কোম্পানীর নতুন জমিদারদের কাছারী লুঠ করতে আরম্ভ করেছে, রায়তদের ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, বাজার হাট গঞ্জ লুঠ করে খুনখারাপি করতে শুরু করেছে। তখন ১৭৯৮-৯৯ সাল।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং তখনও কাজে রয়েছেন। লর্ড কর্নওয়ালিস দেশে চলে গেছেন। দেওয়ানজীও কাজ ছাড়বার কথা ভাবছেন। কুড়ারামও তাই ভাবছেন—আর কেন? এই-বার কাজ ছেড়ে স্বাধীন হবেন। অনেক ব্রহ্মত্র করেছেন দেশে। কলকাতায় নানান কাজ এখন। টাকা তাঁর আছে, সেই টাকা সায়েবদের ধার দিয়ে বা তাদের কারবারে দিয়ে মুচ্ছুদ্দীর কাজ করলে প্রচুর উপার্জন হতে পারবে। স্ত্রী তার আগেই পাঁচ বছরের সোমেশ্বরকে

রেখে মারা গেছেন। বিবাহের কথা তাঁর মনে হয় নি—তবে অন্য লোকে বলেছিল। কিন্তু তাতে তাঁর মন সায় দেয় নি। মনে কেমন একটা বৈরাগ্য এসেছে। মন গেছে ইষ্টের দিকে। এখন সাধ মায়ের মন্দির ক'রে তাঁর আশ্রয়ে সোমেশ্বরকে নিয়ে একটি সুখের সংসার করেন। আর তার সঙ্গে নুনের খালারির ইজারাদারি। নইলে থাকবেন কি নিয়ে? শুধু জপে কি কাল কাটে? আর আট-নয় বছর পার হলেই সোমেশ্বর ষোল বছরের হবে। সোমেশ্বরকে মানুষ করবার জন্য একটি ব্রাহ্মণ বিধবা এবং একটি শূদ্র ঝি রেখে দিয়েছেন। লোকে হাসতো। বলত —ভটচাজ রাম কিপ্পন! এত টাকা, তাই রাখবি রাখবি একটা ভাল বাঈজী রাখ। দুটো কসবী আনকী রাঁড় রাখ। তা না—দুটো ঝি। কিন্তু কুড়ারাম পাঁচালীতে এই বামুনের মেয়েকে মা বলেছেন—আর শূদ্র ঝিটিকে বলেছেন কন্যা।

হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল দেওয়ানজীর কাছে। দেওয়ানজী বললেন, মেদিনীপুর কালেক্টরীতে যেতে হবে তোমাকে। তোমার নিজের এলাকা। ওখানে হাঙ্গামা বেধেছে জান তো? এখন কোম্পানীর ফৌজ গিয়েছে। রাজারা ওই দু চারদিন কেল্লা বন্ধ ক'রে থেকে এবার কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করছে। ওখানকার হস্তবুদ ঠিক করে কালেক্টরী ধার্য করবে। আর মারাঠী আমলে ওদের যে.পাইকান জমি ছিল, যে জমি পাইকরা ভোগ করত মাইনের বদলে তা বাজেয়াপ্ত ক'রে বিলি ক'রে দেবে। এই সব নিয়ে রেভেন্যু হবে। বুঝলে? রাজাদের তো আর পাইক পুষবার দরকার নেই। আর বর্গী আসছে না। এলে খোদ কোম্পানীর সরকার তার সমঝোতা করবে লড়াই দেবে। আর নিজের জেলায় যাচ্ছ—ব্রহ্মত্র মাল জমি—

—সে আপনাকে জানাব, হুজুর, তারপর।

—এইজন্যেই তোমাকে ভালবাসি, ভটচাজ।

কুড়ারাম মেদিনীপুরে যেদিন পৌঁছুলেন, সেইদিনই পাইকদের সর্দার নষ্টগুড়ের খাজা গোবর্ধন দলপতির ফাঁসি হয়ে গেল। লোকটা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল অঞ্চলটাকে। মেদিনীপুরের রাণী শিরোমণি তখন কোম্পানীর একরকম নজরবন্দী।

রেভেন্যু ধার্য করলেন কুড়ারাম। ধর্ম তাকিয়ে কোম্পানীর স্বার্থ ষোল আনার জায়গায় দু আনা বেশী ক'রেছিলেন—

ধর্মকে মাথায় রাখি কোম্পানীর স্বার্থ দেখি
কুড়ারামে দিতে ফাঁকি কেহ নাহি পারে—
যেখানে দু পয়সা পাই নুন খেয়ে গুণ গাই
দিই কিছু সুবিধাই মনিবে না মেরে।

সে সময়ের কালটা সকলে জানে। মেদিনীপুর বাঁকুড়ায় জমিদার-বিদ্রোহ সে সামান্য হলেও পাইক চুয়াড় বিদ্রোহ বাংলার শেষ বিদ্রোহ। কোম্পানীর শক্তিকে ঝড়ের মত বইতে হয়েছিল—শালবন তালবন সমৃদ্ধ মেদিনীপুরের বনস্পতিগুলির মাথা নোয়াতে। পাঠান মোগল আমল থেকে যে সব রাজা উপাধিধারী সামন্তেরা বংশের কুর্শীনামা অক্ষুণ্ন রেখে প্রাচীন বৃক্ষের মত মাটির গভীরতম প্রদেশে শিকড় চালিয়ে বসে ছিল—তারা এই ঝড়ের মুখে ভগ্নশাখা

হয়েছিল সবগুলিই। কিছু কিছু মধ্যকাণ্ডে দুমড়ে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছিল—কিছু কিছু একেবারে মূল ছিঁড়ে উল্টে পড়েছিল মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে। পাইকানের গোভানির কেন্দ্রে বসে কুড়ারাম এই লীলা দেখেছিলেন আর মনে মনে ভেবেছিলেন—ওই ভাঙাগাছের খালি জমির উপর বংশের চারা গাছটি পুত্‌লে হয় না? হঠাৎ চোখে পড়ল বাকী জায়ের তালিকায় দেনদার ময়নার রাজার নাম। উপরি উপরি খাজনা বাকী পড়েছে রাজার। এবার রাজার রক্ষা থাকবে না—রাজা যাবে। ময়নার মধ্যেই কীর্তিহাট!

যদি—।

ময়নার রাজা—সেই ধর্মরাজের আশ্রিত হাজার দু হাজার বছরের পুরনো লাউসেনের বংশধরদের কাছ থেকে মারাঠাদের আশ্রয় নিয়ে রাজ্য কেড়ে নিয়ে রাজা হয়ে থাকলে যদি তাদের দোষ না হয়ে থাকে, তা হ'লে এদের এই বাকী খাজনার দায়ের সময় একটু উপ্তে-আপ্তে দিয়ে ওদের ঠেলে ফেলেই যদি কেউ দেয়, তবে তাতে আর অপরাধ কোথায়?

ময়নার রাজার জমিদারী থাকবে না, এ নিশ্চিত।

ওই তো ময়না পরগণার ওপাশে কাঁসাইয়ের উত্তরে মহিষাদল। মহিষাদল ছিল মহাপাত্রদের, কল্যাণ রায় মহাপাত্রদের শেষ পুরুষ; জনার্দন উপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেছিলেন, সে তাকে পথে বসিয়ে নিয়ে নিয়েছিল মহিষাদল। উপাধ্যায়দের শেষ রাণী জানকী। রাণী পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। সে অন্ধ হল। মহিষাদল এল গর্গ বাহাদুরের হাতে। লক্ষ্মী ভূমি কখন যে কার বাড়ী ঢোকেন কেউ বলতে পারে না।

ভাবনাটা মনের মধ্যেই ঘুরছিল। মনে মনে কুড়ারাম মাকে ডাকছিল—বল মা, তুমি বল!

এরই মধ্যে এল কোম্পানীর পরওয়ানা।

আসছে কলকাতা থেকে। রেভেন্যু বোর্ডের হুকুমে যেতে হবে তাকে বাঁকুড়া।

বৈশাখ মাস, ঝড়বৃষ্টির সময়। কিন্তু উপায় ছিল না। কাজ জরুরী।

* * * *

হঠাৎ সুলতার কণ্ঠস্বরে সুরেশ্বর ১১৭৮ সালের কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাঁচালী থেকে এসে পড়ল ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বরে। সামনে দেওয়ালে ছবিগুলি ঝুলছে। এতক্ষণ এরাই যেন সজীব হয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। সুলতার গলার সাড়ায় ছবির মধ্যে ছবি হয়ে মিশে গেল।

* * * *

—কি, তুমি ধ্যানস্থ হয়ে গেছ মনে হচ্ছে!

ছবিগুলো বাস্তব হয়ে উঠেছিল। সুলতার গলার সাড়ায় তারা যেন ছবি হয়ে ছবির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সুরেশ্বর বর্তমানে ফিরে এসে সুলতার দিকে তাকালে।

সুলতা বললে—আমি দু'বার এসে ফিরে গেছি। ধ্যানভঙ্গ করিনি—হাতে কাজ ছিল বলে! কি এত ভাবছিলে? সেকাল?

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ। সেকাল। তবে ঠিক এই মুহূর্তটিতে টাকার অঙ্কে এসে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুড়ারাম ভট্টাচার্য—রায় ভট্টাচার্য নামক ব্যক্তিটি যেদিন দশ এগার বছরের ছেলের বিয়ে দিয়ে জমিদারী কিনে বরকনে নিয়ে কীর্তিহাট গ্রামে প্রবেশ করলেন—যেটা আমার প্রথম ছবির বিষয়বস্তু—সেদিন তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। তখন জমিদারী কেনার টাকা দেওয়া হয়ে গেছে—কালী প্রতিষ্ঠা, তাঁর মন্দির, পাকা বাড়ী এসব খরচ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ওসব বাদ দিয়েও পাঁচ লক্ষ টাকা। অথচ মাইনে ছিল যৎসামান্য। শতের কোঠায় পৌঁছে আর বেশী দিন চাকরী করেন নি।

সুলতা বললে—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? সে রাজত্বটাই তো লুঠের রাজত্ব। ঘুষ আর কোম্পানীর সাহেবদের লাথি এ দুটো এত সস্তা ছিল যে ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরে মানুষের প্রাণ এত সস্তা হয়নি এবং কুলীনের ছেলেদের বিয়ে এত সস্তা হয়নি। তবে একটা কথা বলতে পার যে কুড়ারামেরা ঘুষ নিয়ে দশ বিশ লাখ আটকে বা পুঁতে রেখেছিলেন বলেই দেশে থেকেছিল, নইলে সবই চলে যেত বিলেতে।

হাসলে সুরেশ্বর। ঘুষ তুমি বল আমি আপত্তি করব না। তবে কুড়ারাম রায় ভট্‌চাজ সামনে থাকলে তিনি প্রতিবাদ করতেন। ঘুষ? আমার ন্যায্য পাওনা। সাক্ষী মানতেন ধর্মকে, সেকালের ধর্মরাজকে। তিনি এসে তাঁর স্বপক্ষে সাক্ষী দিতেন হলফ করে বলতে পারি। মিনিস্টার হলে আজকাল নমস্কার পায়, মিনিস্টারী গেলে পায় না। সুতরাং মিনিস্টার থাকা-কালীন পাওয়া নমস্কারটা ন্যায্য পাওনা নয় বললে তো চলবে না। কিন্তু ও-কথা থাক। এতক্ষণ করছিলে কি?

সুলতা বললে—বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে ফিরে আসবার সময় দেখলাম—রঘু ময়দা মাখছে। আমি ভাবলাম আমার জন্যে করছে। বললাম—এসব কেন করছ? দরকার নেই। রঘু বললে—তা বলো না দিদিমণি। তুমি খাও, তা হলে সঙ্গে লালবাবুরও খাওয়া হবে। আজ সারাটা দিন বলতে গেলে কিছু খায়নি। কেন, খাওনি কেন? জমিদারী যাওয়ার শোকে?

—যেটা থাকে সেটার বিয়োগেই শোক। বলতে পার। কিন্তু ঠিক তা নয়। কীর্তিহাটে গিয়ে খাওয়ার পর পিতৃপুরুষের দিবানিদ্রাটা অভ্যেস করেছি। এবং ওর আমেজ এমন যে খাওয়ার পর ঘুমুবার ব্যবস্থার অভাব হলে খাওয়াটাই তাকে তুলে দিতে হয়। কিংবা বমি হয়ে উঠে যায়। আজ সকাল থেকে ছবি টাঙিয়েছি। তিনটের পর অ্যাসেম্বলীতে গিয়েছি। সুতরাং ঘুমুবার সময় কোথায়? তাই খাই নি।

—এসেও তো কিছু খাওনি!

—ঠিক খেয়াল হয় নি। তোমাকে ছবি দেখাবার ব্যগ্রতাটাই সব থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। তুমি সময় দিয়েছিলে একঘণ্টা। তার মধ্যে ছবিই বা কখন দেখাই, খাইই বা কখন। ছবি দেখাবার তাড়ায় মনে ছিল না। কিন্তু তুমি রঘুর সঙ্গে হাত লাগালে নাকি? কেন?

—তা একটু লাগালাম। লুচি বেলে দিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইণ্টারেস্টিং কিছু পেলাম,

পড়ছিলাম—পড়া হয়ে গেল।

—কেন যে এসব করতে গেল? ছি-ছি-ছি!

—তাতে কি হয়েছে? উদর নামক যন্ত্রটি তো আমারও আছে। সেখানে খাদ্যরসের মোবিল না পড়লে যে যন্ত্রটি জ্বলে যাবার সম্ভাবনা আছে। হলামই বা অনার্ড গেস্ট, একটু হাত লাগালাম। তুমি ক্ষিদে ভোল—তুমি শিল্পী। কিন্তু আমি মাটির জীব।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তার ওপর তুমি সোসালিস্ট। গান্ধীজী যে গান্ধীজী তিনি ছিলেন স্পিরিচুয়াল সোসালিস্ট। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—দেশ এখন একটিমাত্র কবিতা চায়—সেটির নাম অন্ন। তুমি তার থেকে বড়ো নিশ্চয়, যদি প্রশ্ন করি খাওয়ার জন্যে বাঁচা—না বাঁচার জন্যে বাঁচা তা হলে কি উত্তর দেবে হলপ ক'রে বলতে পারি না।

—এ তকরার খেতে খেতে হবে। তাও না। তকরার একেবারে বাদই থাক। তুমি তোমার কড়চার কাহিনী বল। তার আগে তোমাকে বলে নিই। তোমার আদিপুরুষের নামাঙ্কিত একটা পাঁচালী, অবশ্য সেটা তোমার হাতে নকল করা, সেটা তোমার টেবিলের উপর পড়ে আছে। বলছিলাম না, ময়দা মাখতে মাখতে ইণ্টারেস্টিং কিছু পড়ছিলাম—সেটা ওইটেই। খুব ভাল ক'রে পড়েছি বলব না। তবে মোটামুটি পড়েছি। সমাজে সেকালে যারা বংশপ্রতিষ্ঠা করেছে, তারা এমনি না-হলে হয় না।

রঘু এসে দাঁড়াল।

সুলতাই বললে—কি? খাবার দিয়েছ?

রঘু বললে—হাঁ দিলম।

সুলতা বললে—এস। খেয়ে নাও আগে। এবং খেতে খেতেই বল। তোমার কথা তো অনেক। আমাদের আসরের পরমায়ু এই রাত্রিটুকু। দশটা বেজে গেছে। বসো।

তারা রঘুর পিছনে পিছনে খাবার ঘরে ঢুকল। বসল সামনা-সামনি। রঘু খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। আয়োজন দেখে সুরেশ্বর বললে—এত করতে গেলি কেন? লুচি বেগুন-ভাজা আলু-ছেঁচকি—মাংসটা তো না হয় খাবোই। এ যে অনেক।

সুলতা হেসে বললে—আমি বলেছি।

—কেন এত ঝঞ্চাট করলে?

সুলতা বললে—আজ না-হয় আমি অতিথি, আমি আমার অনারেই করেছি। অবশ্য তোমার মান রাখতে। কারণ, বলতে তো পারি সুরেশ্বর গল্প শোনাবার ছবি দেখাবার জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে সারারাত্রি উপোস করিয়েছিল।

সুরেশ্বর অপ্রতিভ হয়ে গেল এবার। বললে—দেখ, আমার কমন সেন্স যেন কমে যাচ্ছে! সত্যিই তো!

সুলতা বললে—সারাদিন তুমি খাওনি। ক্ষিদের খুব বোধ রয়েছে বলেও মনে হল না। রঘু বলছিল—দিদিমণি, আমার সেই লালবাবু যে কি রকম হয়ে গেলো! খায় না। খেতে দিলে পড়ে থাকে। কীর্তিহাটে মেঝলা ঠাকুর-মাই ছিলেন, উনহি উনকে খাওইতেন। লালবাবু বিলায়েৎ চলে গেলেন, ঠাকুর-মাই গেলেন বৃন্দাবন। আর আইলেন না। উসকে

বাদসে এহি হাল। আজ সাত আট বরিষ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, এমন হল কেন? বললে—হামি নোকর, হামি কি কহিয়ে বলি। উনকে পুছিয়ে—উ বলবে। উ ঝুট তো বোলে না!

সুরেশ্বর সুলতার আগেই খেতে শুরু করেছিল। সুলতা বললে—কত ক্ষিদে পেয়েছিল বল তো?

—কেন?

—না-হলে আমি খেতে শুরু করলাম কি না তা লক্ষ্য না করেই খেতে শুরু করেছ তুমি!

—ওই দেখ। ছত্রিশ সাল থেকে তেপ্পান্ন সাল—সতের বছর কীর্তিহাটে একলা থেকেছি,, ভেবেছি, নানান দেশ ঘুরেছি, তার মধ্যে এইরকম হয়ে গেছি। প্রথম মেজঠাকুমাকে পেয়েছিলাম সেখানে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—মেজঠাকুমা আমার মেজদি, আমার জীবনের পরম সম্পদ। একাধারে মা ছিলেন আবার ঠিক বড়দিদি ছিলেন। হয়তো বা রায়বংশের প্রতিষ্ঠা করা যে যুগলবিগ্রহ আছে তারই মূর্তিমতী রাধা ছিলেন। আমার জন্যে কলঙ্কের ভারও মাথায় নিয়েছেন তিনি।

—কলঙ্ক? কি কলঙ্ক?

—কলঙ্ক সংসারে নারীর একটিই সুলতা। ভালবাসার কলঙ্ক! রায়বংশ এমন পচে গেছে যে নিজের বংশের শ্রেষ্ঠ পুণ্যের আশ্রয় মেয়েটিকে কলঙ্কিনী বললে তারাই!

—থাক সুরেশ্বর, ওসব তোমার ঘরের কথা। তার থেকে তুমি বল—তোমার কড়চার কথা বল! আমার পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস পাল খুন হয়েছিলেন। বাবাকে আমি টেলিফোন করলাম, বললাম—আজ ফিরব না বাবা। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাসের কি পাল উপাধি ছিল? বললেন—হ্যাঁ, তখন তাই ছিল। কিন্তু আসল উপাধি আমাদের ঘোষ! জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি কি খুন হয়েছিলেন? বললেন—শুনেছি তাই। একজন দেশী ক্রীশ্চান গুণ্ডা তাঁকে খুন করেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘটনাটা কি জান? বললেন—সে তো আমারও তিন পুরুষ আগে। তাছাড়া ওই উনি খুন হলে আমার পিতামহ কলকাতায় এসে ব্রাহ্ম হন, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায়। তারপর তিনিও আমার বাবাকে ছেলেমানুষ রেখে মারা যান। আমি মামার বাড়ীতে থেকে পড়েছি, বিলেত গেছি। ওসব পিছনের খবর আমাদের ঠিক জানা নেই। জানিনে। বাবা কারণ জানতে চাইলেন, বললাম—কাল বলব। তোমার পূর্বপুরুষ কি ওই ক্রীশ্চান গুণ্ডাটাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন বলছ? কি করে জানলে তুমি? কে বললে তোমাকে?

—বলেনি কেউ, আমি খাতা থেকে পেয়েছি।

—খাতা থেকে?

—হ্যাঁ, প্রথম পেলাম জমাখরচের খাতা থেকে।

অবাক হয়ে গেল সুলতা। জমাখরচের খাতা থেকে? তার হাতে ধরা লুচি আলু-

ছেঁচকি সে ধরেই রইল।

*　　*　　*　　*

সুরেশ্বর বললে—রায়-বংশের সাত পুরুষের পাপপুণ্য ভালোমন্দ সব-কিছুর ফিরিস্তি বুঝি বিধাতার ইচ্ছায় গচ্ছিত ছিল আমার ওই মেজঠাকুমা—মেজদির কাছে। মেজদিকে কলঙ্কিনী অপবাদ না দিলে হয়তো এ ফিরিস্তি তিনি আমাকে দিতেন না! তাই সেই কথাই বলছিলাম তোমাকে। এবং তার সঙ্গে আমার জবানবন্দী যেটা তোমার কাছে প্রথম দেবার আছে সেটাও দেওয়া হয়ে যাবে।

সুলতা বললে—বল।

সুরেশ্বর বললে—মেজঠাকুমাকে ওরা কলঙ্ক দিলে। সেই বৃত্তান্ত থেকেই বলি। মেজঠাকুরদার মৃত্যুর পর থেকে মা ওঁর পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করেছিলেন। মা মারা গেলেও সেটা আমি বন্ধ করি নি। আমার সঙ্গে একটি স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বাবার শ্রাদ্ধের সময়। সেটেলমেন্টের সময় মেজতরফ আমাকে ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে বুঝতে পেরে উনিই ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়, আমার ওখানকার নিজস্ব নায়েবকে নিয়ে। আমি তোমাকে জানালাম। তুমি তাড়া দিয়ে বললে—যেতে হবে বইকি। যাও। ঠাকুমা-নায়েবের সঙ্গে রঘু চাকরকে পাঠিয়ে দিলাম আগে, পরের দিন আমি কীর্তিহাটে পৌঁছুলাম এগারটার সময়; শেষ চৈত্র তখন। ওখানে গ্রীষ্ম, কীর্তিহাটে বলে 'খরা', তখন প্রখর হয়ে উঠেছে। মেদিনীপুরে নেমে জীপ ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম—ফলে সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল।

মেজঠাকুমা বিবিমহলের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। নায়েব ছিল, ভিকু, রোজা, ওরা চাকরী করত, সেই বাবার শ্রাদ্ধের সময় থেকে তারা ছিল; কিন্তু অভ্যর্থনা করলেন মেজঠাকুমা। রায়বংশের যেটুকু স্নেহ আমার প্রাপ্য সেটা যেন ওঁর কাছে জমা ছিল সুলতা। অপরাধ বোধহয় তাঁর এইখানেই।

সব মনে পড়ছে আমার। ছবিতেও এঁকে রেখেছি। সে ছবি অবশ্য অনেক পরে আসবে, কিন্তু তখন আর আমাকে বলে দিতে হবে না সুলতা যে এইটে মেজঠাকুমার ছবি, তিনি সুরেশ্বরকে হাত ধরে বলছেন—

—এস ভাই আমার সোনার নাতি এস।

আমি প্রণাম ক'রে বলেছিলাম—তাইতো ঠাকুমা, নিজের সম্বন্ধে তো তাহলে এবার সাবধান হ'তে হবে। চোরে ডাকাতে না লুঠে নিয়ে যায়!

মেজঠাকুমা হেসে বলেছিলেন—ভয় কি ভাই! আমি তোমাকে ভক্তি করে বুকে ঝুলিয়ে রাখব। নাত-বউ এলে তাকে পরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

*　　*　　*　　*

কথার জবাব খুঁজে পায়নি সুরেশ্বর। মেজঠাকুমা বলেছিলেন—নাও, মুখ হাত ধোও। চায়ের জল চড়ানো আছে। রঘু চা দিক। চা খেয়ে স্নান করে ফেল। আমি তরকারী রেঁধে ফেলেছি। ভাতটা বাকী। চড়িয়ে দি। স্নান ক'রে ঠাকুরবাড়ী প্রণাম করে এসে

খেয়ে নাও। তারপর জিরিয়ে নাও।

—এসব—মানে এত কষ্ট আপনি কেন করলেন ঠাকুমা? রঘু যা হয় করতো।

—কেন? আমি থাকতে রঘু কেন? তুমি আমার নাতি। ছেলে টাকা, নাতি সুদ। টাকার মুখ দেখিনি, ভাগ্যি আমার ভগবান আমাকে সুদ পাবার হকদার করেছেন। ভাতের উপর মিষ্টান্ন। তোমার মেজঠাকুরদা-র ধুলোয় ফেলে-দেওয়া পোটলাটা তুমি মাথায় তুলে নিয়েছ। আমি থাকতে রঘু কেন?

দুফোঁটা চোখের জলও পড়েছিল তাঁর।

খাওয়ার সময় কাছে বসে খাইয়েছিলেন। সুন্দর রান্না মেজঠাকুমায়ের। মেজঠাকুমা বলেছিলেন—আমি জানি তুমি মাংস খাও। কিন্তু তোমার মেজঠাকুরদার বৈষ্ণব মন্ত্র, আমারও তাই। ওটা আমি ছোঁব না। ওই গোয়ানদের বললে ওরা গুলতিতে পাখী মেরে দেবে। ওইটে বরং রঘু রেঁধে দেবে তোমাকে।

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সুরেশ্বর। তিনি তাঁর কাছে মাসোহারা পান বলে তোষামোদ করছেন এ ধারণা তার একেবারে মুছে গিয়েছিল।

এই সময়ে বাইরে কাঁসাইয়ের ধারের জঙ্গলে সেই বউ-কথা-কও পাখী ডেকে উঠেছিল। চৈত্র মাস। এটা ওদের পাগল হয়ে ডাকারই মাস।

কথার ধারাটাকে ঘোরাবার জন্যেই সুরেশ্বর বলেছিল—সেই পাখী ডাকছে, না ঠাকুমা?

সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দিয়ে মেজঠাকুমা বলেছিলেন—ও-মা! তাই তো!

অবাক হয়ে সুরেশ্বর তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—এতদিন ছিল না ভাই পোড়ারমুখো পাখী। অন্ততঃ আমার কানে আসেনি। তাই তো ও-মা বলে গালে হাত দিচ্ছি! মনে হচ্ছে তোমার মেজঠাকুরদা পাখীটা তুমি হয়ে ফিরে এলে তাহলে!

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেছিলেন।

সেই স্নেহশীলা মায়ের মত মেয়েটি যে এমন যত্ন করে খাওয়াচ্ছিল, সে যেন মুহূর্তে পরিহাস-মুখরা সখী হয়ে উঠেছে।

সুরেশ্বরের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেই দিন রাত্রেই মেজঠাকুমা তাকে বলেছিল—আজ থেকে আমি তোমার মেজবউদি। ঠাকুমা বললে, কেমন বুড়ী হয়েছি বলে লজ্জা করে! কেমন?

সুরেশ্বর বলেছিল—না।

—কেন?

—একটু খাটিয়ে নেব।

—কি মেজ বউ? হেসে উঠেছিলেন তিনি।

—না মেজদিদি!

—বাঃ, সে খুব ভাল। আর একালে কি বলে—মডার্ন না কি তাও হবে। তাহলে কিন্তু তুমি বলো, আপনি নয়!

—বলব।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—এইবার চলি, তুমি ঘুমোও একটু। আমার অনেক কাজ। গোপালকৃষ্ণের ভোগ হল, এইবার মন্দিরে যাই, সেখানে আমার নাগরকৃষ্ণের ভোগ আছে। তারপর পোড়া পেটের পিণ্ডি আছে। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের চরণোদক-তুলসীমায়ের বেলপাতা নিয়ে আসব।

এই ভূমিকা স্থলতা।

ওই সর্ববঞ্চিতা বিধবা যুবতী ঠাকুমাটি তাঁর সব স্নেহরসভরা জীবনকুম্ভটি আমার মাথার উপর ঢেলে দিলেন।

সন্ধ্যেতেও তিনি এলেন কিন্তু কথাবার্তার সুযোগ হল না। সেরেস্তার আসর পড়েছিল। আমার নায়েব দেবোত্তরের নায়েব সকলে এসেছিলেন; কথাবার্তা হচ্ছিল। সেটেলমেণ্টে স্বত্বের সমস্যা তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন আমাকে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

দেবোত্তরের নায়েব বললেন—মেজতরফ বলছেন—বাড়ী—সবই দেবোত্তর। অন্দর, বিবিমহল সব।

—কিন্তু পার্টিশন দলিলে তো সই করেছেন!

—করেছেন। সে করেছেন শিবেশ্বর রায়। তিনি মৃত। ছেলেরা দেবোত্তরের সেবায়েত হিসেবে আপত্তি করছে এরকম পার্টিশন অসিদ্ধ। বাড়ী সব দেবোত্তর।

—তারই বা প্রমাণ কি?

—প্রমাণ? হেসে দেবোত্তরের নায়েব বললে—আমি ওঁদের নায়েব, আপনারও নায়েব। আমি ওঁদের বলেছি—কাগজ যা বলবে, আমার কাছে যা আছে বের করে দেব। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। প্রমাণ ওঁরা জানেন। আমাদের ঘোষালও জানেন। বল না ঘোষাল।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার নায়েব এবার বললে, ব্যাপারটা গোলমেলে বটে। ওঁরা সোমেশ্বরের ট্রাস্ট ডিড, রত্নেশ্বর রায়ের ট্রাস্ট ডিড বের করছেন, তার নকল আমাদেরও আছে। তাতে আছে কীর্তিহাটের যাবতীয় জমিদারীপত্তনী সম্পত্তি দেবত্রীকৃত হইল। এবং এই আয় হইতে যে সকল সম্পত্তি অর্জিত হইবে, তাহাও দেবত্র বলিয়া গণ্য হইবে। ওঁরা বলছেন—বাড়ীগুলি দেবত্রের আয় থেকে তৈরী, সুতরাং এও দেবত্র। বিভাজ্য নয়। তবে যে যেমন দখল করছেন, দখল করবেন। দান-বিক্রয় চলে না।

দেবোত্তরের নায়েব বলেছিলেন এবার—ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বড়তরফ এতে যোগ দিয়েছেন; আপনার জ্যেঠতাতের বড় ছেলে প্রণবেশ্বরবাবু আসছেন, তিনি এতে যোগ দিয়েছেন। তিনিই বোধহয় বুদ্ধি যোগাচ্ছেন কলকাতা থেকে। এবং সে বুদ্ধি হাইকোর্টের উকিল-ব্যারিস্টারের। তাঁদের জন্যে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়েছে, আপত্তির দাবী আরও মজবুত হয়েছে। ধরুন, তিনি আপনাদের

বড়তরফের অর্ধেকের শরিক। বড়তরফই বিবিমহল পেয়েছে। বড়তরফই ছোটতরফ অর্থাৎ রামেশ্বর রায়ের বাড়ীর অংশ কিনেছে। ওঁদেরই বাপ তাঁর অংশ আপনাদের বিক্রী করেছেন। তাঁরা আপত্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার দোষ হয়ে যাচ্ছে যে, দেবেশ্বর রায় যে পার্টিশনের সময় বিবিমহল নিয়েছিলেন টাকা দিয়ে, সে অসিদ্ধ, আবার রামেশ্বরের অংশ খরিদ অসিদ্ধ, আবার যজ্ঞেশ্বর রায়ের বিক্রী অসিদ্ধ।

বিরক্তিভরে আমি বলেছিলাম সুলতা, বেশ তো, বাড়ীর একটা ভাগ তো আমার যাবে না। সেটা তো থাকবে। নিন, ওরা বাড়ীর ভাগ নিয়েই যদি তুষ্ট হন তো হোন।

এবার বেরিয়ে এসেছিলেন মেজঠাকুমা। তিনি যে এখনও পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন, তা জানতাম না। এসে বলেছিলেন—কেন নায়েববাবু, সে আমলের কর্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের এস্টেটের খাতাপত্র আছে। তা থেকে বের হবে।

তারপর আমাকে বললেন—তুমি ওসব কথা কখনও মুখে আনবে না নাতি। নিয়ে সুখী হয় হোক—এ কথা বলা মানে হার মানা।

দেবোত্তরের নায়েব বললে—খাতা যে সব নেই মা। কোথায় গেল তা কেউ জানে না। সে কি ছোটবাবুর নায়েবকে আমি খুঁজে দেখতে বলিনি? খাতা তো মেজকর্তার আমল থেকে কোথায় কি গেল কেউ বলতেও পারে না। কি ঘোষাল, বলুন না!

ঘোষাল বললে—খাতা নেই।

আমি হেসে মেজঠাকুমার মুখের দিকে তাকালাম।

মেজঠাকুমা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমি গিয়ে সাক্ষী দিলে হয় না?

—সে স্বত্বের মকর্দমার সময় দেওয়ানী আদালতে দিতে পারেন, বলতে পারেন—এই শুনেছেন, শুনে আসছেন। তার দাম কতখানি হবে, কাগজপত্রের ওপরে, তা হাকিমের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেটেলমেণ্ট কোর্টে ও শুনবেই না তারা।

মেজঠাকুমা আমার দুঃখে দুঃখ পেয়েই চলে গিয়েছিলেন।

* * * *

পরের দিন সকালে সেটেলমেণ্ট আদালতের দুর্ভোগ যা হয়েছিল, তা তোমাকে পত্রে আমি লিখেছিলাম। চারটে পর্যন্ত বসে থাকা, হাকিম হরেন ঘোষের সঙ্গে আলাপ। এসব তুমি জান। একটা কথা লিখিনি। দুপুরবেলা গাছতলায় বসে জমিদার হওয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য আপশোস করছি, ক্ষিদে পেয়েছে, ঠিক সেই সময়টিতে রঘু তোয়ালে ঢেকে খাবার নিয়ে গিয়েছিল, মেজঠাকুমা পাঠিয়েছেন।

এরপর আমায় ছবি আঁকতে দেখে হরেন ঘোষ হাকিমের মুগ্ধ বিস্ময়ের কথাও লিখেছি। ঘোষ আমার বন্ধুত্বের জন্য কিছু কিছু মূল্য দিয়েছিলেন। কয়েকটা ব্যাপারে আপত্তির ক্ষেত্রে তিনি ওদের ধমক দিয়েছেন। কাগজ দেখাতে বলেছেন। সে-সব ছোটখাটো ব্যাপার।

মূল বাড়ী নিয়ে ব্যাপারটার তখনও দেরী আছে। আমিও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য কিছু করেছি। কলকাতা থেকে বই আনিয়েছি, শরৎবাবুর সব বই। কিছু আধুনিক লেখকদের

বই, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, প্রবোধকুমার—এই সব, আর খানকয়েক মাসিকপত্রও নিয়েছি। সবই হাকিমের জন্য বলতে গেলে। তবে দোহাই ধর্ম, এটাকে তুমি ঘুষ দেওয়া বলো না। ওঁর জন্যে একখানা বাড়ীও দেখে দিয়েছি, ওঁর স্ত্রী আসবেন। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। কথা দিয়েছি—মেয়েদের জন্যে যে ইস্কুলটা করছি আমি মায়ের নামে, সে বাড়ীটা তাড়াতাড়ি করিয়ে ওঁকে দেব, যতদিন উনি থাকবেন। সুখেশ্বরকাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর তার ঠিকেদার, তাকেও বলে দিয়েছি। হাকিমের জন্যে সেও প্রাণপণে খাটছে।

এদিকে খাতাপত্র সন্ধান করে পাওয়া যায়নি। আমি ছেড়েই দিয়েছি সব আশা!

মেজঠাকুমা কেমন হয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে বলেন—তোকে আমি মিছেই নিয়ে এলাম ভাই। লজ্জায়, দুঃখে যে মরে যাচ্ছি রে।

—কেন ঠাক্‌মা? এতে তোমার লজ্জা কি?

—ওরে তোর মেজঠাকুরদা যে এর হেতু!

—তা আর তুমি কি করবে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন—বুঝতে পারছি না রে! মনকে বোঝাতে পারছি না।

আমার করুণা হত।

এই সময় হঠাৎ মেজঠাকুমাকে ওরা কলঙ্কিনী বললে!

কিছুদিন পর। দিন বিশেক পর। সেদিন রবিবার, বিকেলে গিয়েছিলাম হরেন ঘোষের ওখানে। ওঁর স্ত্রী এসেছেন। দেখা করতে গিয়েছিলাম। রবিবারের সকালটা জমে উঠেছিল। ১৯৩৬ সালের আধামডার্ণ অর্থাৎ ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে। যে মেয়ে অন্তত: হাকিম-গৃহিণীর মর্যাদা রাখতে পারে। অর্থাৎ আবদার করতে পারে। বেশ লাগল, চা খাওয়ালেন। প্রথমেই বললেন স্বামীকে—ওই ওঁকে বল। তোমায় দিয়ে হবে না।

আমি বললাম—কি?

—একটা ছুতোর মিস্টার রায়। এই ফার্নিচারগুলো একটু ঠুকেঠেকে দেবে।

হরেন ঘোষ বললেন—দেবেন মশায়। নইলে মান আমার আর থাকে না।

—মান তোমার উনি পাঠিয়ে দিলেও থাকবে না। কারণ, উনি তো আমারও বন্ধু। তোমার এতগুলো পিওন, এতগুলো ক্লার্ক, এত ক্ষমতা, তার দামটা তাহলে কি?

আমি বললাম—দেব। নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। এর জন্য নতুন পাতা ঘরে অশান্তি করবেন না।

হাকিম-গৃহিণী বললেন—আর সেই কথাটা বললে না? বললেন স্বামীকে।

হরেন ঘোষ বললেন—তুমি বল না, তোমারও তো বন্ধু।

—বলতাম নিশ্চয়। কিন্তু এ-কথাটা তোমার বলা উচিত।

বললাম—কি? বলুন?

—ছবি মশাই। একখানা ছবি ওঁর এঁকে দিতে হবে।

—দেব। খুশী হয়েই বললাম—দেব।

—আমার কলকাতা যাবার আগে দেবেন কিন্তু। সেখানে দেখাব আমি।

—কখন কলকাতা যাবেন ? এই তো এলেন।

—মাস তিনেক পর।

—তাহলে কথা দিলাম।

বলে চলে আসছিলাম। বোশেখ মাস পড়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তবু এখনও প্রচণ্ড উত্তাপ। বাড়ী ফিরতে কষ্ট হল। মেজাজও খারাপ হল। এর উপর ঠাকুরবাড়ীর কাছে এসে ধনেশ্বরকাকার গর্জন শুনে ভুরু কুঁচকে উঠল আমার। এরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমার নীরবতা এবং ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে। আজ যেন গর্জনটা বেশী, তবু চলে এলাম। বিবিমহলের সামনে রোজারিওকে পেলাম, বললাম—ওরে, একটা ছুতোর ডেকে হাকিমের বাসায় কাল নিয়ে যাবি তো। মজুরী আমরা দেব। আর—। বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, ধনেশ্বরকাকাকে বলে আসুক বাবু জিজ্ঞেস করছেন, এত চেঁচাচ্ছেন কেন ? কিন্তু না থাক। শুধু ছুতোরের বরাত করেই ক্ষান্ত হলাম।

রোজা বললে—যাব হুজুর !

হন হন করে উঠে গেলাম। ভাবছিলাম, একবার তোমাকে আসতে লিখলে কি হয় ! হরেন ঘোষের বউয়ের সঙ্গে আলাপ করে যাবে। মন্দ লাগছিল না আইডিয়াটা। উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, মেজঠাকুমা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন শোকাতুরার মত, অতি ক্লান্তের মত। দু চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। তিনি কাঁদছেন।

সেদিন মেজদিকে ঘরে বসে এমন করে কাঁদতে দেখে সে আঘাত পেয়েছিল। একটু চিন্তিত হয়েই প্রশ্ন করেছিল—কি হল মেজদি ? কাঁদছ কেন ?

মেজঠাকুমা মেজদি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি থেকে তুমি হয়েছিলেন।

মেজঠাকুমা চোখ মুছে চোখের জল গোপন করতে পারেনি, আরও বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। যেন ভেঙে পড়ে গিয়ে বলেছিলেন—সুরেশ্বর, আমাকে তুই বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই ! নয়তো নবদ্বীপ। যা দিস তুই তার বেশী আমার লাগবে না। আমাকে শুধু পাঠিয়ে দে।

মেজঠাকুরদার বড় ছেলে, মেজদির বড় সতীনপো এবং তার মেজ ছেলে তাঁকে কুৎসিত কথা বলেছে। চরমতম কুৎসিত কথা। এর থেকে বড় অপমান আর কিছু হতে পারত না মেজদির। শুধু মেজদিরই নয়, তারও।

সুরেশ্বর বললে—আমি লজ্জায় মরে গেলাম সুলতা। তার সঙ্গে কি যে দুরন্ত ক্রোধ আমার হল, তা বলতে পারব না। মনে হল, ওই ভাঙাভগ্ন দেহ, ফাটলধরা মানুষটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষাক্ত কীট সরীসৃপে ভরা। রায়বংশের ধ্বংসবীজ বিষাক্ত বাষ্প ওর মধ্যে জমাট বেঁধে আছে। ওটাকে আমার ধ্বংস করা উচিত। এখুনি ছুটে গিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে আসি ! তিরিশ সালে জেলে যখন গিছলাম, তখন পুলিশ আমাদের বন্দুক-রিভলবার বাজেয়াপ্ত করে

নিয়েছিল। আমি স্টেটসম্যানে অনুতাপ করে চিঠি লিখে স্পাই নাম কিনেছিলাম। কিন্তু বন্দুকটন্দুক নিইনি আর। কলকাতায় নায়েব হরচন্দ্র ঘোষাল বলেছিলেন। তাতে মা-আমি দুজনেই না করেছিলাম। বন্দুক থাকলে সেটা নিশ্চয় আমি কীর্তিহাট নিয়ে যেতাম এবং সেই-দিনই আমি খুন করে বসতাম এবং নিজেও হতাম।

উপলক্ষ্য একখানা সাবান। দামী ল্যাভেণ্ডার সোপ ব্যবহার করত সুরেশ্বর। মেজদি একদিন বলেছিলেন—বাহারের খুসবু ভাই নাতি। একে কি সাবান বলে?

—ল্যাভেণ্ডার সোপ বলে মেজদি!

—খুব দামী বুঝি?

—তা দামী বই কি। খাস বিলিতী জিনিস। এক-একখানা আড়াই টাকা।

—ওরে বাপরে! তাই। তারপর হঠাৎ হেসে বলেছিলেন—জানিস ভাই, আমার দাদাশ্বশুর, তোর ঠাকুরদারও বাবার মামা—বুঝতে পারলি?

—হ্যাঁ, বীরেশ্বর রায়।

—হ্যা তিনি। খুব জাঁদরেল লোক ছিলেন। নীলকুঠীর সাহেবদের তখন কুঠী ছিল। তাদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন। তাদের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন। একজন পাদরী-সাহেব ছিল, সে পড়াতো। সে নাকি ডাল-ভাত আর কড়াইবাটা খেতে খুব ভালবাসত। তা আমার দাদাশ্বশুর হয়ে উঠলেন সায়েবী মেজাজের লোক। বন্দুক দিয়ে বাঘ মারতেন, কুমীর মারতেন। ঘরে নাকি, এই বিবিমহলে, খাঁচায় করে বাঘ পুষেছিলেন। তাঁর কুকুর ছিল। এই বড় বড় কুকুর—ডালকুত্তা। কুকুর মণ্ডা খেত। ঘিয়ের মিষ্টি খেলে রোঁয়া উঠবে —তাই খাস মণ্ডার বরাদ্দ ছিল। তিনি মহলে যেতেন, কুকুর সঙ্গে যেত, যেত পাল্কিতে। এ-গাঁয়ে তখন সরকারদের বাড়িতে স্বর্নপিসী ছিল গাঁয়ের পিসী। তা স্বর্নপিসী বলত—মরে এবার ফিরেশ্বরের কুকুর হব। তাই ভাই আমারও বলতে ইচ্ছে করছে—এবার মরে তোর বেটী হয়ে জন্মাব, নইলে নাতনী হয়ে।

হেসে সুরেশ্বর এক বাক্স সাবান তাঁকে দিয়ে বলেছিল—তার জন্যে মরতে হবে জন্মাতে হবে এত ঝঞ্ঝাট করতে হবে কেন? যার নাতি এমন সাবান মাখে, সে কি নিজে এ-সাবান মাখতে পারে না?

লজ্জিত হয়ে মেজঠাকুমা বলেছিলেন—না-না-না সুরেশ্বর। আমাকে কি সাবান মাখতে আছে? তা আবার ওই সাবান!

—আছে ঠাকুমা। কে বললে নেই?

—তুই পাগল!

—না। পাগল নই। এ তোমাকে নিতেই হবে। মাখতেও হবে। না মাখলে আমার দিব্যি রইল।

—এই দেখ্! কি করলি বল তো?

বলে তিনি নিয়েছিলেন সাবানের বাক্সটি।

সুরেশ্বর বললে—আমার মায়ের থেকে মেজদি বয়সে ছোট ছিল। আমার থেকে আট-দশ বছরের বড়। তখন তাঁর বয়স ছত্রিশের বেশী নয়। সন্তান-সন্ততি হয়নি। রূপ ছিল, যৌবনও ছিল। দেখতে যুবতী মেয়ে মনে হত। মনে মনেও তাই ছিলেন, একটি সরস কৌতুক, দুর্লভ নির্মল জলের জোয়ার তাঁর জীবনকে ভরে রেখেছিল। তার সঙ্গে ছিল সাধ-আহ্লাদ: এ-সাধ বোধহয় বুড়ো-বুড়ীরও থাকে। তাঁর অপরাধ তিনি যুবতী, সুন্দরী। তার উপরেও অপরাধ ছিল—আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং বিষয়ের ঝগড়ায় আমার দিকে তাঁর পক্ষপাত। ফলে—

দুর্নাম রটল কয়েক দিনের মধ্যেই।

ওই সাবান মাখতেন মেজদি। প্রথম ক'দিন ঘরে সকলের অগোচরে মুখে মাখতেন। তারপর একদিন ঘাটে গিয়ে স্নানের সময় গায়ে মেখেছিলেন। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে ঘাট ভরে গিয়েছিল। তাঁর গায়েও সে-গন্ধ লেগে ছিল।

সে-খবরটা রটিয়েছিল প্রথম ধনেশ্বরের মেজছেলে, ব্রজেশ্বরের ভাই। তারপর ধনেশ্বর রুদ্র-মূর্তিতে সৎমায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

—সাবান মাখছ? খুসবু সাবান? সুরেশ্বর দিয়েছে? লম্পটের পুত্র ওই সুরেশ্বর দিয়েছে তোমাকে খুসবু সাবান?

হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন মেজগিন্নী!

ধনেশ্বর এবার অ্যাক্‌টিংয়ের ভঙ্গিতে চীৎকার করে উঠেছিল, তুই ভ্রষ্টা, তুই পাপিষ্ঠা। তুই কলঙ্কিনী!—কলঙ্কিনী, ও যে তোর পৌত্র! ছি-ছি-ছি!

বলতে বলতে চলে এসে ঠাকুরবাড়ীতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে শুরু করেছিল, তিরস্কার করতে শুরু করেছিল মরা বাপ শিবেশ্বর রায়কে—

—নরকস্থ হও। অনন্তকালের জন্য নরকস্থ হও তুমি। তুমি শিবেশ্বর রায়—তুমি কামার্ত পশু ছিলে, ফলভোগ কর তার। কর ফলভোগ। রত্নেশ্বর রায়, তোমার স্বর্গসিংহাসন নড়েছে। পড়ছে—পড়ছে নরক মুখে। কাঁদছ, তুমি কাঁদছ? তারপর অট্টহাস্য করে উঠেছিল—হা-হা-হা-হা! ধনেশ্বরের পিতৃদত্ত শিক্ষার মধ্যে নাটুকেপনা একটি বড় সম্পদ।

লোক জমেছিল চারিদিকে। পঙ্ক-পল্বলে ঝাঁকবন্দী খেয়ো মাছির মত।

মেজদি ভয়ার্ত হয়ে ঘরে খিল দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। মরবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু ভয় হয়েছিল। নিদারুণ ভয়। তবে কি করবেন? তবে কি করবেন? ওদিকে গোটা মেজতরফের কুৎসিত কথাগুলি গোটা বাড়ীটার খিলানে খিলানে যেন বেজে বেড়াচ্ছিল। মেজদি থাকতেন সুরেশ্বরের অংশের বাড়ীতে। যে-ঘরে মেজকর্তা থাকতেন, সেখানেই থাকেন। বাকী ঘরগুলিও ওদের দখলে। সেখান থেকেও ভেসে আসছে কুৎসিত বিস্ময় প্রকাশের শব্দ ও ধ্বনি। শিউরে-ওঠা, একটি লম্বা টানা ও শব্দ।—ও মাঃ! কোথায় যাব গো! কি লজ্জা, কি ঘেন্না! ঘাটে সুগন্ধি সাবান মাখা! এমন গন্ধ যে, গায়ের পাশে

মৌমাছি উড়ছে! ছি-ছি-ছি! তা-ও আবার কে দিয়েছে? না—নাতি! আপন ভাশুরপোর ছেলে! ছি-ছি-মা! ও যে ছেলের বয়সী গো! সেকালে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়েছে। কি রুচি, কি প্রবৃত্তি! আর ওই ছেলে, ওই কুলাঙ্গার!

মেজদির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড যেন মাথা কুটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় উন্মাদিনীর মত ছুটে এসে উঠেছিলেন বিবিমহলে।

—সুরেশ্বর! সুরেশ্বর! দাদু-ভাই! ওরে!

সুরেশ্বর তখন বাইরে বেরিয়েছিল। তখন থেকে তিনি এখানেই ভয়ার্ত হরিণীর মত লুকিয়ে বসে আছেন।* কাঁদছেন।

সুরেশ্বর ফিরে এসে তাঁকে কাঁদতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—কি হল মেজদি? কাঁদছ কেন?

মেজদি হু-হু করে কেঁদে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—সুরেশ্বর, আমাকে দয়া করে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দে ভাই। নয়তো নবদ্বীপ। ওরে, যা দিস তুই তার বেশী লাগবে না। আমাকে শুধু পাঠিয়ে দে। ওরে, জগদীশ্বর সেই খুনে পাষণ্ড নেই, সে এলে আমার লাঞ্ছনার বাকি থাকবে না।

*   *   *   *

বহু কষ্টেই কি হয়েছে তা মেজদি বলেছিলেন। সুরেশ্বরের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল। হাতের কাছে বন্দুক থাকলে বা রিভলবার থাকলে সে আজ নির্বংশ করে আসত রায়বংশকে। শেষ গুলিতে নিজে মরত।

কিছু করবার জন্য সে অধীর হয়ে উঠেছিল। ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছিল শুধু হাতেই। ইচ্ছে হচ্ছিল ধনেশ্বরের তৃতীয় পুত্র, সেই অতিকায় দানব যেমন সুখেশ্বরের বুকে চেপে বসে গলা টিপে তাকে হত্যা করেছিল, তেমনিভাবেই সেও গিয়ে ওই ধনেশ্বরের বুকের উপর চেপে বসে গলা টিপে হত্যা করে তাকে, তার কলুষিত কণ্ঠটাকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেয়।

মেজঠাকুমা বললেন—আমাকে ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকতে দেবে না বলেছে। আমি তিনবেলা গোবিন্দের কাছে যাই, সন্ধ্যায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি, মালা গেঁথে দিয়ে আসি, ভয়ে যেতে পারিনি সুরেশ্বর। মরবার আমি সাহস পাচ্ছিনে, নইলে মরতাম রে। কিন্তু আমি গ্রামে মুখ দেখাব কি করে?

একটা অজুহাত পেয়ে সুরেশ্বর চমকে সজাগ হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে মেজঠাকুমাকে বললে—ওঠ। এস আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—ঠাকুরবাড়ী। এস। দেখি। যা হবার হয়ে যাক। এস।

—না সুরেশ্বর। তুই ওদের জানিসনে। ওরে—

—ওদের আমি জানি মেজদি—তুমি আমাকে জান না। এস। দেখি কার সাহস বড়,

তোমাকে কি বলে ?

—না-রে। ওরে আমার কলঙ্ক মাথায় করে আমি মরব, তুই ওদের—

বাধা দিয়ে স্থরেশ্বর বলেছিল—তোমার কলঙ্ক তুমি সইবে, কিন্তু আমি সইব না। এস। যদি না এস, তবে—

—বেশ, তোর কাছে আর আসব না।

—না। চীৎকার করে উঠেছিল স্থরেশ্বর।

এবং মেজদির হাতখানা চেপে ধরে আকর্ষণ করেছিল।—এস। ওঠ। তারপর ডেকেছিল—রঘু!

রঘু পাশের ঘরেই উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছিল। সে এসে দাঁড়াতেই বলেছিল—রোজা, ডিকু এরা আছে ?

—রোজা আছে। ডিকু আজ সনঝা বেলাসে ছুটি নিয়েছে।

—বেশ, তুই স্থদ্ধ আয়।

৪

মদে মাতাল হয় মানুষ। বিষয় নিয়ে তেমনি বিবাদ করে মানুষ। না ক'রে উপায় নেই। স্থলতা, রায়বংশের সেরেস্তাখানায় দুটো ঘর আছে, মামলার নথিতে বোঝাই। রায়-বংশের একটা বিখ্যাত মামলা—রত্নেশ্বর রায় আর তাঁর বোন সর্বাণী দেবীতে। রত্নেশ্বর নাকি পোষ্যপুত্র। কিন্তু তাঁকে পোষ্য নেবার পর ওই কন্যা হয়েছিল। কন্যাকে টাকা—দু'লক্ষ টাকা—দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, সম্পত্তি দেননি। বাপের মৃত্যুর পর সর্বাণী দেবী মামলা করেন। রত্নেশ্বর হাতজোড় করে আরও টাকা—অনেক টাকা দিয়ে সে মামলা মিটিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলেরা মামলা অনেক করেছে। আমি দূরে থেকে এর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে ছিলাম; মেজঠাকুরদার মামলা করার কথা শুনে প্রশ্ন করতাম নিজেকে; কেন? কেন করেন? দু'-চারটে মামলা তিনি করতেন জেদের বশে, কুটিল উদ্ধত জোতদারদের সঙ্গে, তাতে তারিফ করতাম। দু'-একটা মামলা হত অন্য জমিদারের সঙ্গে, তাতেও মন সায় দিত। বাকীর জন্য আমি নিন্দাই করতাম। যাই হোক, মোট কথা বিবাদ-কলহে রুচি আমার ছিল একথা বলে অপবাদ আমাকে কেউ দেবে না। আমি গেলাম মেজঠাকুমাকে নিয়ে। রোজা আর রঘু আমার সঙ্গে গেল, রঘু চাকরখানসামার কাজ করলেও হিন্দুস্থানী। তখন—মানে সতেরো বছর আগে ওর বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশী ছিল না। সেও লাঠি নিয়ে লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে এল।

হঠাৎ একটু থেমে স্থরেশ্বর বললে—স্থলতা, অসাধারণ শক্তিশালী বলে অহঙ্কার আমার কোনকালে নেই। তবে রায়বংশের বংশানুক্রমে আমরা লম্বা-চওড়া কাঠামোর অধিকারী, হাড় আমাদের মোটা শক্ত। বাবা-মা যেভাবে মানুষ করেছিলেন তাতে পুষ্টির অভাবও ছিল না। সেটা ছত্রিশ সাল, আমার বয়স ছাব্বিশ। তবে সাহস আমার ছিল। জেদ আমার ছিল। ভয় কিছুকে করি নি। সেটা তুমি জান। স্টেটসম্যানে যে চিঠিটা আমি ছেপেছিলাম,

সেটা ন্যায় হোক অন্যায় হোক, অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা যাই হোক, আমার যেটা বিশ্বাস সেটা ছাপতে ভয় আমি পাই নি। এবং তারপর সহজ পদক্ষেপে সমাজে এসেছি। এসেই তোমাকে চিঠি লিখেছি। সুতরাং সবচেয়ে বড় বল ছিল আমার দুঃসাহস। বল ত বটে এবং সেইটেই বোধহয় ছিল ইলেকট্রিক পাওয়ারের মত একটা শক্তি, যাতে দুর্দান্ত রাগের সুইচ অন করে আমাকে একটা ক্রাশিং মেশিনের মত চালু করে দিলে। তার ফলে আমার থামবার উপায় ছিল না। দুর্দান্ত ক্রোধে সাহসে আমি চলেছিলাম। হয় ওদের পিষে দেব, নয় আমিই অক্ষম হয়ে ফিউজ হয়ে থেমে যাব। কিংবা গোটা যন্ত্রটা ভেঙে যাওয়ার মতই ভেঙে যাব।

ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকে ডাকলাম—ঠাকুরমশায়!

ঠাকুরবাড়ীতে হেজাক বাতি জ্বলছিল মন্দিরের বারান্দায়। কালীমন্দিরে একটা, গোবিন্দ-মন্দিরে একটা। আমিই দিয়েছিলাম কিনে। মেজঠাকুমাই আদায় করেছিলেন।

গমগম করে উঠল গোটা ঠাকুরবাড়ীটা। আমি আমার কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠলাম। এমন করে তো কখনও কাউকে ডাকি নি! সন্দেহ হল—এ আমার কণ্ঠস্বর?

মেজঠাকুমা সভয়ে বললেন—সুরেশ্বর!

তখন আমি খুশী হয়ে উঠেছি। হ্যাঁ, এই তো রায়বংশের কণ্ঠস্বর!

বাধা কেউ দেয় নি। ধনেশ্বর ব'সে আহ্নিক করছিলেন। তাঁর দুই ছেলে দ্বিতীয় আর চতুর্থ, ভূপেশ্বর এবং রাজেশ্বর, তারা বসে ছিল ঠাকুরবাড়ীর ওপাশে কাছারীবাড়ীর বারান্দায়। কথা বলছিল সুরেশ্বরের আপন জ্যাঠতুতভাই প্রণবেশ্বরের সঙ্গে। প্রণবেশ্বর সেইদিন সকালেই এসেছে। এসেছে এই সেটেলমেণ্টে নিজের স্বত্ব লেখাতে। নিজেদের স্বত্ব সবই বিক্রী করেছে; করেছেন তার বাপ যজ্ঞেশ্বর, কিনেছিলেন সুরেশ্বরের মা। থাকবার মধ্যে আছে মুনাফা বা লাভশূন্য দেবোত্তরের সেবায়েত স্বত্ব। তার জন্যে আসে নি, এসেছে ধনেশ্বদের সঙ্গে যোগ দিতে। যা পারা যায়, যেমন ক'রে পারা যায় কিছুটা খামচে নিতে। খবরটা সুরেশ্বরকে নায়েবরাই দিয়েছিল। প্রণবেশ্বর এসে সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করে নি। এবং নিজের যে বাড়ী সুরেশ্বরদের বিক্রী করেছে, যে বাড়ীতে এখন ধনেশ্বর ও সুখেশ্বরের ছেলেরা বাস করছে সেখানেও যায় নি। দেবোত্তরের সামিল কাছারীবাড়ীর একখানা ঘরে এসে উঠেছে। আগে এমন ক'খানাই ঘর ছিল যেখানে বিশিষ্ট প্রজা, পত্তনীদার, উকীল, মোক্তার এলে বাসা দেওয়া হত।

সুরেশ্বরের হাঁকে ঠাকুর বেরিয়ে এসে দাঁড়াল—আজ্ঞে!

সুরেশ্বর বললে—মেজঠাকুমা এসেছেন।

কোন দিক থেকে কোন কথা উঠল না। শুধু একটু চাঞ্চল্য ছাড়া। ধনেশ্বর একবার ফিরে দেখে ডেকে উঠলেন—কালী করুণাময়ী! আর কত সহ্য করবি মা?

ওদিকে তাঁর ছেলেরা খানিকটা ফিসফাস ক'রে চুপ হয়ে গেল। শুধু একবার উঁকি মেরে দেখেই প্রণবেশ্বর ঘরে ঢুকে গেলেন।

নির্বিবাদে কালীমন্দিরে প্রণাম ক'রে, রাজরাজেশ্বর এবং গোবিন্দমন্দিরে প্রণাম ক'রে

চরণোদক নিয়ে বেরিয়ে এলেন মেজঠাকুমা। সুরেশ্বর সেদিন বোধহয় একটা ঝোঁকের মাথায় ঠাকুমার সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছিল। সে ঘরে ঢুকে প্রণাম করে উঠে চারিদিক তাকিয়ে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। ঘরের কোণে একটা বড় আয়রন-চেস্ট। আলমারী নয়—সিন্দুক। আকারে প্রকাণ্ড। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—এখানে ওটা? আয়রন-চেস্ট?

পূজুরী জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ!

—কি থাকে ওতে?

—তা তো জানি না বাবু! আমি তো খোলা দেখি নি!

মেজঠাকুমা বললেন—ওতে গোবিন্দের গহনা থাকত। এখন কতকগুলো পুরনো কাগজ আছে।

—চাবি কার কাছে?

মেজঠাকুমা উত্তর দিলেন না। ঠাকুর বললে—তা তো বলতে পারব না। সিন্দুক তো খোলা হয় না কখনও। আমি দেখি নাই বাবু।

—হুঁ! গহনা আছে, না—নেই? ঠাকুরকে পরানো হয় না?

—না।

মেজঠাকুমা হেসে বললেন—গহনা নেই সুরেশ্বর।

—নেই?

মেজঠাকুমা বললেন—এখন ওসব কথা থাক সুরেশ্বর। পরে যা হয় করবে। রাত্রি হয়েছে, গোবিন্দের শয়নের সময় হয়েছে, চল।

সুরেশ্বর বললে—চল।

তার মনটা খুশী হয়ে উঠেছে। সে আঁচ একটা পেয়েছে। একটা নিষ্ঠুর কলহের সূত্র পেয়েছে সে!

বেরিয়ে এসে সে ডাকলে—নায়েববাবু!

বৃদ্ধ নায়েব বেরিয়ে এল—আজ্ঞে!

—খুব জরুরী দরকার আছে আমার। একবার আসুন আমার ওখানে।

—কাল। কাল আসতে বল্ ভাই। আজ নয়। আজ মেজাজ তোর ভাল নেই। আমার কথা শোন।

সুরেশ্বর একটু চুপ করে ভাবলে। ইতিমধ্যে মেজঠাকুমা মৃদুস্বরে বললেন—আমার কথা-গুলো শুনে নে ভাই আগে।

সুরেশ্বর বললে—থাক। কাল সকালেই আসবেন।

তার নিজের নায়েবকেও ডেকে বললে—কাল সকালে আপনি ওঁকে তাগিদ দিয়ে নিয়ে আসবেন।

আজ সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বরে ভঙ্গিমায় অলঙ্ঘনীয় একটি প্রভুত্বের ভার এবং ধার দুইই ছিল।

এতক্ষণে প্রণবেশ্বর বেরিয়ে এসে বললে—কেমন আছ?

—ভাল। আপনি কখন এলেন?

হেসে প্রণবেশ্বর বললে—এই সকালে।

—এখানে উঠেছেন ?

—হ্যাঁ। নইলে আর উঠব কোথায় ! বাবা তো সবই বেচে—।

—বেচলেও তো সেটা বাইরে যায় নি ! ঘর তো ঘরেই আছে।

—তা আছে। কিন্তু বিষয়-ব্যাপার নিয়ে ঘরে-ঘরেই তো বিবাদ আগে লাগে।

হেসে স্বরেশ্বর বললে—তা লাগে !

—স্বতরাং—

—বুঝেছি বড়দা। থাক।

—কাল একবার যাব তোমার কাছে।

—আসবেন।

বেরিয়ে এসে পথে প্রথমেই মেজঠাকুমা বললেন—তুই ভাই ঘোষাল ম্যানেজারকে আনা। এরা কুরুক্ষেত্র বাধাতে জোট বেঁধেছে !

স্বরেশ্বর বলেছিল—তাঁর যে স্ট্রোক হয়ে প্যারালিসিস হয়েছে ঠাকুমা ! সেরেছেন তবে আসা যে অসম্ভব। তা ছাড়া স্মৃতিও ভ্রংশ হয়েছে।

—তা হলে !

—ভেবো না তুমি ঠাকুমা। এ যদি সব চলেও যায় তবু আমি ফকীর হব না। আর তাই বা হব কেন ? মিথ্যের জাল, ও টিকবে না। লড়ব, দরকার হলে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ব।

তারপর নীরবে পথ হেঁটেছিলেন দুজনে। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে মেজঠাকুমা বলেছিলেন —ঠাকুরের গহনা তোর মেজঠাকুরদা সব বিক্রী করেছেন স্বরেশ্বর।

চুপ ক'রে রইল স্বরেশ্বর।

—সিন্দুকের চাবি তাঁর কাছেই ছিল। তিনি তো বিষয়বুদ্ধিতে পাকা ছিলেন। তিনি গহনা গালিয়ে, সোনার পরিমাণ কম ক'রে লিখে জমা করে, নিজের বিষয় কিছু—তাও বাজে বিষয়— দেবোত্তরে কেনা হল বলে খরচ লিখেছিলেন। ধরবার তো কেউ ছিল না !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে স্বরেশ্বর। কি বলবে ? এঁই মেজঠাকুমার স্বামী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি এঁর ভালবাসার কথা সে জানে। আশ্চর্য লাগে। সমস্ত দোষত্রুটি সব অকপটেই বলেন—তবু তাঁর প্রতি এই মেয়েটির ভালবাসা তো কম নয় ! কি দিয়ে গেছেন তিনি ? কিছু না। বলতে গেলে—পথেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তবুও—। আশ্চর্য লাগে স্বরেশ্বরের।

মেজঠাকুমা আবার বললেন—কি যে সে বুদ্ধি কি বলব তোকে ! তাঁর বাপ—আমার শ্বশুর —রায় বাহাদুরের আমলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। রাজরাজেশ্বর প্রথম থেকেই আছেন। সে আমার বড় শ্বশুরের, ফোমেশ্বর রায়, তোদের যিনি জমিদার প্রথম পুরুষ তাঁর আমলের। মা-কালী প্রতিষ্ঠার অনেক ক' বছর পরের কথা। এক সন্ন্যাসীর কাছে পেয়েছিলেন। তোর মেজ-ঠাকুরদা যখন গহনা বিক্রী করেন, তখন এই দুই আমলের যেসব জমাখরচের খাতায় এই গহনা তৈরীর খরচ আছে তা বেছে বের ক'রে এনে নিজের কাছে রেখেছিলেন। ছেলেদেরও বলেন

নি। তারা গহনা বিক্রীর কথা জানে—খাতার কথা জানে না। গহনা কম ছিল না ভাই। শুধু গহনা নয় অনেক আসবাব—সোনার ফরসী পর্যন্ত।

সুরেশ্বর ব্যগ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—সে সব খাতা তো নষ্ট করে দিয়ে গেছেন তিনি ?

হেসে মেজঠাকুমা বললেন—না। তা করেন নি। বলতে আজ লজ্জা পাচ্ছি ভাই, আমি বলেছিলাম—দেখ, করলেই যদি চুরির পাপ, তবে আর ওগুলো রাখছ কেন? কিন্তু তিনি বলেছিলেন—উহুঁ। কোন মকদ্দমায় কখন লাগে! তুই আমলের খাতাতেই অনেক সম্পত্তি কেনার জমাখরচ আছে। অনেক নমুদ আছে। ও থাক। যখন আমার সব যাবে তখন পুড়িয়ে দেব। সেগুলোকে একটা ভাঙা সিন্দুকে কতকগুলো বাজে কাগজের গাদায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।

—সেগুলো আছে ঠাকুমা ?

—আছে। সেগুলো তুই নিয়ে যা ভাই। আজ তো আর আমার কোন লজ্জাই রইল না। এই যে তোর সঙ্গে ওরা বিষয়ে নানান প্যাঁচ ক'সে তোকে সম্পত্তি বিক্রী করেও বঞ্চিত করতে চাচ্ছে, এর জন্যে আগেই বের করে দেওয়া উচিত ছিল। ওতে অনেক নজীর পাবি। পূজুরী বামুনের মেয়ে—বুড়ো জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—শিখেছি অনেক, জানি অনেক। দেওয়া উচিত ছিল, তুই আমার ছেলের অধিক, সহোদরের অধিক। তুই খেতে দিস তাই খেতে পাই। তোকে আমিই আনতে গিয়েছিলাম সেটেলমেণ্টের জন্যে। তবু পারি নি দিতে বা বলতে। আজ লজ্জা ঘুচে গিয়েছে—

বলে হেসে উঠলেন, বোধ করি সেদিন সেই প্রথম হাসলেন, বললেন—নাতি, তুই শেষে ল্যাভেণ্ডার সাবান দিয়ে আমার লজ্জাটজ্জা সব ধুয়েমুছে শেষ ক'রে দিলি! সিন্দুকের চাবিও আমার কাছে আছে, সেও তুই নিয়ে যা। ওরে, সব আজ রাত্রেই নিয়ে যা।

সে অনেক কাগজ অনেক খাতা। মোটা মোটা রোকড় খাতা খেরোতে বাঁধানো—শক্ত সুতো পাকানো দড়িতে বাঁধা, প্রায় এক একটার ওজন আড়াই সের, সংখ্যায় পঁচিশ খানা। ওজনে দেড় মণের উপর। আর কাগজ, সে স্তূপীকৃত। তার মধ্যে তারের ফাইলে গাঁথা চিঠি। সে ফাইলও অনেক। আরও কতকগুলো ছোট ছোট দপ্তর। তার সঙ্গে বের করে দিয়েছিলেন একটা সুন্দর বাক্স। এক বারে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি রোজা এবং রঘুর পক্ষে। দুবারে নিয়ে যেতে হল। বিবিমহল মূল বাড়ী থেকে কম রাস্তা নয়। বেশ খানিকটা। সবশেষে মেজঠাকুমা দুটো চাবি দিয়েছিলেন। ওই লোহার সিন্দুকটার দুটো চাবি। মেজকর্তার মৃত্যুর পর ও দুটোরও কেউ খোঁজ করেনি। কারণ ওটার গজভুক্ত কপিত্থের মত অবস্থার কথা মেজ-তরফের কারুর কাছেই অজ্ঞাত ছিল না। মেজকর্তা যতই তৈরী করা হিসেবের আড়াল দিয়ে থাকুন, আসল সত্যটা চাপা থাকবার কথা নয় কোন লোকের কাছেই। ধনেশ্বর প্রভৃতির মনে মনে সেই বোধটা ছিল। চাবি যার কাছে থাকবে সেই দায়ে পড়তে পারে এই কারণেই কেউ চাবির খোঁজ করে নি। চাবি দুটোর একটা বলতে গেলে অতিকায় ইঞ্চি পাঁচ ছয় লম্বা, তেমনি মোটা; ওজনে হয়তো পোয়া খানেক। আর একটা সেকালের কামারের তৈরী গা-তালার চাবি, সেটাও বেশ বড়।

মেজঠাকুমা দিয়ে বললেন—আমার পুরনো কর্তা সিন্দুকটা ফাঁক করে গেছেন, নতুন কর্তাকে দিচ্ছি, তুই ওটাকে ভ'রে দিস ভাই।

চাবি দুটো এবং ওই বাক্সটা সুরেশ্বর নিজে নিয়ে এসেছিল। বাক্সটা থেকে চন্দনের গন্ধ উঠেছিল।

প্রথমেই সুরেশ্বর খুলেছিল ওই বাক্সটা। হাতীর দাঁতের কাজকরা চন্দন কাঠের বাক্স। তারই মধ্যে ছিল প্রাচীনকালের পুঁথির আকারের একখানি খাতা। প্রাচীনকালের কাগজ। চন্দনের গন্ধ উঠছিল। পাতাগুলোর কোণ দুমড়ে গেছে। সন্তর্পণে সেখানা বের করেছিল সুরেশ্বর, ভেবেছিল কোন পুরনো দলিল জাতীয় কিছু হবে। কিন্তু উপরের মোড়ক কাগজখানা খুলে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। খাতা বা পুঁথিখানার উপরে সেকালের শর বা লটের কলমে কষের কালিতে লেখা—

ওঁ কালী চরণ ভরসা।

কালিকা মঙ্গল—তথা, পাঁচালী রায়বংশস্য, রচিতং কুড়ারামেণ রায়বংশস্থ
স্থাপয়িতা। বসতি কীর্তিহাট গ্রাম—পরগণা ময়না অন্তর্গত। সরকার—
গোয়ানপাড়াভুক্ত ; জেলায়াৎ মেদিনীপুরে। রাজত্ব কোম্পানী বাহাদুরস্য,
বর্গী নবাব নিসূদন। শকাব্দ ১৭২৮। বঙ্গ-সাল ১২১৩। আংরেজী ১৮০৭।

কবি কালিদাস যদি বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহে রাজ্যখণ্ড পেয়ে রাজা কালিদাস হতেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকত না, বর্ধমানের রাজার সেরেস্তায় রামপ্রসাদ সেন রোকড়ের খাতায় হিসেবের বদলে শ্যামা-সঙ্গীত লিখে ধরা পড়ে রাজার কৃপায় ব্রহ্মত্র পেয়ে সাধক হয়েছিলেন এমন নজীর অনেক আছে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য কালিদাসের মত হতে কোনদিন চাননি—চাইলে হতে পারতেন না। বর্ধমানের রাজাও রামপ্রসাদ হতে পারতেন না। সেই নজীরে সুরেশ্বরের কাছে কুড়ারামের এই পাঁচালী রচনার নিদর্শন এক মহাবিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। তাঁর একসঙ্গে জমিদার আর পাঁচালীকার হওয়া তার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল। সারারাত জেগে সে সেদিন এই পাঁচালী পড়েছিল।

* * * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমার ভাল লেগেছিল। আশ্চর্য লেগেছিল। শুধু রচনা নয়, কাহিনী এবং এই লোকটিকে আমার আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। যদি বল নিজের বংশের আদি-পুরুষ বলে ভাল লেগেছে, তাও অস্বীকার করব না। যদি বল আমার মধ্যে সেদিন জমিদার জেগেছিল বলে ভাল লেগেছে, আমি রি-অ্যাকশনারী, তাতেও তকরার করব না। কোন ভান নেই, কোন ধর্মের বা ইজমের দোহাই নেই—আশ্চর্য অকপট মানুষ।

শেষের লাইনগুলো পড়েছ? মন দিয়ে পড়েছ কিনা জানিনে, আমি বলছি, তুমি আবার শোন—

পাপপুণ্য নাহি জানি, যাহা করিয়াছি আমি
সবার মালিক তুমি, জয় কালী-করালী।

ছিলাম দরিদ্র সুত   ন ভবিষ্য নাহি ভূত
বর্তমানে দুঃখ কত তুই মা দেওয়ালি।
সেই দুঃখ পার করিলি,   তুই সেই শক্তি দিলি
শেষে জমিদারী দিলি, মোর ঘরে এলি।
ছত্রি জমিদারের টাকা   চুয়াড়েরা ডাকাবুকা
লুঠে দিল গাত্র ঢাকা, সে তুই লুঠালি।
থাক মা অচলা হয়ে,   বিপদ আপদ জয়ে
সোমেশ্বরে ভাগ্য দিয়ে, দিয়ে বংশাবলী।
দিয়ো মাগো অতঃপর   লক্ষ্মী-সরস্বতী বর
রায়কুল বংশধর ভরিয়া অঞ্জলি।
কোম্পানীকে দিয়ো জয়   তাদের অনুগ্রহ যেন রয়
রায়বংশ হয়ে অক্ষয় মা তোর কৃপায়।
তোমাতে দেবত্র করি,   বিষয় আদি জমিদারী
আমি মা ভাসাই তরী, রাখো রাঙা পায়।

আবৃত্তি শেষ ক'রে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, মায়ের যদি চরণ থাকে আর যদি রাঙা টুকটুকেই হয় তবে তা কুড়ারাম পেয়েছিলেন। আর মা না থাকলে কথাই নেই, চরণ নেই, কুড়ারাম চোখ বুজে ফুরিয়ে গেছেন, তিনি মা-হারানো ছেলের মত খুঁজেও বেড়াচ্ছেন না। তবে আজ যদি কুড়ারাম জন্মাতেন, তবে একজন দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতা হতেন তাতে সন্দেহ নেই।

সুলতা হাসলে। হেসে বললে—অ্যাসেমব্লীতে সুবোধ বাঁড়ুজ্জের এবং আর সবদের গালাগালি তোমাকে আঘাত দিয়েছে, তুমি ভুলতে পারছ না।

—না। সে গালাগালির জন্যে দুঃখ নেই—মনে কোন ক্ষতও নেই। আমি বলছি সুলতা, এত ক'রে এমন ক'রে বলছি এই জন্যে যে, আমি যেন তাঁকে অবিচার না করি।

—না। সে অবিচার তুমি করনি। আমিও করছি না। আমি অ্যাসেমব্লীর মেম্বর হলে হয়তো এমনি গালাগালিই করতাম। আর তার জন্যে দোষও তুমি দিতে পারতে না। কারণ আজ এইটেই মানুষের বিশ্বাস। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় লোকে কর্নওয়ালিশকে আশীর্বাদ করেছিল। আমি কালই চণ্ডীচরণের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং পড়ছিলাম। সে কথা থাক। ও নিয়ে মীমাংসার জন্যে আমি বসে নেই সুরেশ্বর। আজ আমি যার জন্যে এই রাত্রেও তোমার এখানে রয়ে গেলাম, বসে রয়েছি, সেই কথা বল। তোমার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষকে খুন করেছিলেন বা করিয়েছিলেন, যার জন্যে তুমি আর ফিরে এলে না কীর্তিহাট থেকে। আমার সঙ্গে জীবনে পাক বাঁধবার জন্যে আঁচলের যে খুঁটটা ধরে ছিলে সেটা ছেড়ে দিয়ে লিখলে—এ গ্রন্থি বাঁধা চলে না। ওখানে বিধাতা ছুরি উদ্যত করে রেখেছেন, বাঁধতে গেলে কেটে খানখান হয়ে যাবে। আমি সেই কথাটা শুনতে চাই। তুমি তাই বল। কীর্তিহাটের কড়চা তুমি দশজনকে ডেকে দেখিয়ো। তার থেকে তোমার জবানবন্দীতে

আমার গরজ বেশী।

সুরেশ্বর বললে—একটার সঙ্গে আর একটা এমন ভাবে বাঁধা সুলতা, যে বিধাতার ছুরিও তাকে কেটে আলাদা করতে পারবে না।

—কুড়ারামের পাঁচালীতে রায়বংশের খামখেয়ালী প্রকৃতি, ক্ষেত্রবিশেষে উন্মত্ত আচরণের একটা বীজ আছে। হেরিডিটি সায়েন্সে আছে, লুন্যাসি আর প্রতিভা, যদি তাকে পাপপ্রবৃত্তি পুণ্যপ্রবৃত্তি বলি, তবে তর্ক করো না। মেনে নাও, ও দুটো বংশে নানা মিশ্রণের মধ্যে একসময় ঢুকে বসলে সে থেকেই যায় এবং তার খেলা আর থামে না, চলে। এই খেয়ালীপনা পাগলামির বীজ রায়বংশে ঢুকিয়েছিলেন কুড়ারাম রায়। তুমি তাঁর পাঁচালীটা পড়ে এলে। কিন্তু সন্ধানটা ধরতে পারনি।

সুলতা সবিস্ময়ে বললে—কোনটা বল তো? কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাগলামী বীজ? তিনি ভাল না মন্দ সে বিচার না করে একটা কথায় নিশ্চয় তুমি বিস্মিত হবে না যে, তিনি দুই আর দুইয়ে চারের ছিলেন। মনুষ্য বলব না, ও শব্দটি ব্যঙ্গ করে ব্যবহার করি আমরা। পাগলামির একবিন্দু অপবাদ তাঁকে দিয়ে রেহাইয়ের কোন অজুহাত কেউ তৈরী করতে পারবে না। তা তাঁর ছিল না।

—কিন্তু আমার মধ্যে আছে। আমার বাবার মধ্যে ছিল। বাবার দুর্দান্ত খেয়ালীপনা বা যা তিনি করেছিলেন—যথেষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও—সেটা যে পাগলামির সামিল তা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুলতা বললে—না, তা করব না। কারণ, যারা তোমার আমার কথা জানত, তারা তুমি ডুব মারলে এই কথাই বলেছে। বলেছে ওই বাপেরই ছেলে তো! তবে আমি বলি, তা ঠিক নয়। ওটা তাঁরও এসেছিল, তোমারও এসেছে—অনেক টাকা থেকে। অনেক টাকা থাকলেই মানুষ মদ খেয়ে ব্যভিচার করে। সেটা অভ্যাসে দাঁড়ায়। ও থেকে দেহে মনে দুদিক থেকেই বিষ ঢোকে।

সুরেশ্বর বললে—অস্বীকার অবশ্যই করব না। সে বললে—সবার মধ্যেই ও বীজ আছে। কারণ আদিম কালে ওইটেই ছিল জীবন-ধর্ম, জীব-ধর্ম তো বটেই। কিন্তু তার থেকেও প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে, সেই কথা বলছি। কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পাঁচালীতে আছে তিনি সোমেশ্বরের বিয়ে দিয়েছিলেন—

সুলতা বললে—হ্যাঁ, বিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর তারকেশ্বরে যে মেয়েটির সঙ্গে ভালবাসা হয়েছিল তার মেয়ের সঙ্গে। ওটা একটা অতৃপ্ত ভালবাসার তৃপ্তিসাধনের একটা সস্তা পথ বটে।

সুরেশ্বর বললে—সস্তা বা সুগম পথ ছেড়ে বাঁকা পথ বা সূক্ষ্ম পথ ধরবার লোক তো ছিলেন না কুড়ারাম। ভালোবেসে ভালোবাসার জনকে, তুমি চন্দ্রলোকে থাকবে আমি পৃথিবীতে বা শুক্রগ্রহে থেকে ভালোবেসে যাব অনন্তকাল, এ ধাঁচের মানুষই তিনি ছিলেন না। যাক গে। মানুষ কথাটা এখানে আমিই ব্যবহার করলাম। সে কথা থাক। মোটকথা শোন। এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল এক মুসলমান আমলের জমিদারের ছেলের

সঙ্গে। কুড়ারাম সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু সে ছিল বামুনে সুপুরুষ। এ একেবারে রাজোয়াড়ী সুপুরুষ। বর্ণনায় রাত্রি কাটাব না, ওটা কল্পনা করে নাও। তাঁর ছবি এখন মনে হচ্ছে আমার আঁকা উচিত ছিল: কিন্তু আঁকিনি। বাড়ী বাঁকুড়া এবং হুগলীর বর্ডারে। সেই বাড়ীতে কুড়ারাম রায় হঠাৎ গিয়ে পড়লেন বা উঠলেন একান্ত আকস্মিকভাবে। ইচ্ছে করে নয়। তিনি যাচ্ছিলেন কোম্পানীর কাজে বাঁকড়ো জেলা। পথে হঠাৎ এল জল ঝড় দুর্যোগ। পাইক সওয়ার বেহারারা প্রথম একখানা গাঁয়ের ধারে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। কুড়ারাম ছিলেন পাল্কিতে। জল ঝড়ে গাছতলা মন্দের ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে দু-একটা বজ্রপাত হলে গাছতলা সাপের গর্ত কি বাঘের দেখার সমান বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

পাঁচালীতে আছে—

শিয়রেতে সর্পরন্ধ্র অরণ্যে ব্যাঘ্রের গন্ধ
এ থেকেও আরও মন্দ বজ্রপাতে বৃক্ষ।
সুতরাং উঠায়ে পাল্কী
হাঁকায়ে চলিনু জলদি
সওয়ার বেহারা লগ্দী গ্রাম গৃহ লক্ষ্য।

গ্রাম সামনেই ছিল, এবং বড় একখানা শ্যাওলা-ধরা পাকাবাড়ীর মাথাও দেখা যাচ্ছিল। সেই গ্রামে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সওয়ার-বরকন্দাজদের তগ্‌মা দেখে গৃহস্বামী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কোম্পানীর কানুনগো, খোদ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ডানহাত কুড়ারাম ভটচাজের নাম শুনে গৃহস্বামী তটস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কুড়ারামও গৃহস্বামীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওই রাজোয়াড়ী চেহারা। সর্বাঙ্গে দুঃখ দৈন্যের ক্লেশের ছাপ, কিন্তু মাথাটা উঁচু সোজা। মিষ্ট কথা। কিন্তু লোকটি বোকা-বোকা।

বলেছিলেন—তাই তো ভাঙা ঘর। ছাদ ভেঙেছে। খড়ের চাল করেছি, তাতেও জল পড়ে, এখানে আপনাকে কি করে কোথায় বসাই! কি খাওয়াই! আমি তো বলতে গেলে সর্বস্বান্ত!

বাড়ীর ভিতর থেকে হুকুম এসেছিল, উনি বাড়ীর ভেতর দোতলায় থাকবেন। হুকুম এনেছিল একটি আশ্চর্য রূপসী সাত বছরের মেয়ে। পরনে ফিরানী। যা নাকি চাষা-ভুষাদের মেয়েরা পরে। কুড়ারাম বলেছিল—বাঃ বাঃ বাঃ, এ তো অপরূপ মেয়ে!

বাপ বোকার মত হে-হে করে হেসেছিলেন। বাপকে মেয়ে বলেছিল—মা তুমাকে ডাকছে বাবা। বললে ধরে নিয়ে আসবি! এস!

তখনও কুড়ারামের মনে হয়নি এই মেয়ের সঙ্গে সোমেশ্বরের বিবাহ দেবার। তিনি চারিদিক তাকিয়ে দেখছিলেন। বৈঠকখানার ছাদ নেই। ধসে পড়েছে। খড়ের চাল তুলেছে। সামনে পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। এদিকে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাট, তারও দু পাশের রানা দুটো কাত হয়ে পড়েছে। এসবের ইতিবৃত্ত কুড়ারামের অজানা নয়। বাংলাদেশের জমিদারদের বাড়ীর নাড়ীর খবর তাঁর নখ-দর্পণে। এ সব বাড়ীকে তিনি ভয়

করেন। ভাঙা বড় বাড়ী আর পূর্ববঙ্গের কীর্তিনাশা রাক্ষসী নদী, ও দুইয়ে কোন তফাৎ নেই। বরং কীর্তিনাশার চেয়েও ভাঙা বাড়ী ভয়ঙ্কর। কীর্তিনাশা একূল ভাঙলে ওকূল গড়ে। বড় বাড়ী যখন ভেঙে পড়ে তখন সব চেপে পিষে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ধুলো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

রাজহাটের রায়বাড়ী, মুসলমান আমলের রাজা উপাধিধারী। নিজেরাই রাজা উপাধি নিত। বড়রাজা মেজরাজা সেজরাজা। রাজা অনেক। অনেকেই দেশ ত্যাগ করেছে। অনেক মরেছে। যেমন পলুপোকার মধ্যে রোগ হলে ঝাঁকে ঝাঁকে মরে। তাদের সম্পত্তি দু-চার বিঘে বা দশ বিঘে জমি দৌহিত্র বংশে গেছে। এখন এই পুরনো বাড়ীতে আছে এই একা মানুষটি আর তার স্ত্রী এবং এই একটি মাত্র কন্যা। লোকে বলে পাগল। পাগলামি রাজাগিরি। পাগলামি নিশ্চয়, নইলে সামান্য হাজার কয়েক টাকা আয় নিয়ে কোম্পানীর প্রথম আমলে মেদিনীপুর বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম বিষ্টুপুর প্রভৃতির রাজারা যখন কোম্পানীর সঙ্গে রাজস্বের নতুন চুক্তি করতে অস্বীকার করলে, তখন তাদের দেখাদেখি শিবনারায়ণ দেবরায় সেও বললে—খাজনা দেব না। কোম্পানী কে খাজনা বাড়াবার? ফলে মেদিনীপুর থেকে ফার্গুসন সাহেব একজন সার্জেন্টের অধীনে ষোলজন বন্দুকধারী সিপাহী পাঠিয়ে দিলেন। রাজার চাকরানভোগী পাইক ছিল জন চল্লিশেক। তারা বন্দুকের শব্দ শুনে পালাল। রাজা ঘরে গিয়ে খিল বন্ধ করলেন। কোম্পানীর সিপাহীরা বন্দুকের গুলিতে দরজা ঝাঁঝরা করে দিলে। তখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল সাদা কাপড়ের ফালি আর একখানা গয়না-পরা আশ্চর্য সুন্দর হাত। রাজাকে নিয়ে রাণী বেরিয়ে এসে সার্জেন্টের কাছে হার মেনে চুক্তি সই করলে। লোকে বলে সেটা রাজার জন্যে নয়, সেটা সেই আশ্চর্য সুন্দর হাতের অধিকারিণী রাণীর জন্য। কোম্পানীকে খেশারত দেবার জন্য রাণীই দিলেন তাঁর অলঙ্কার খুলে। তখন সব রক্ষা হল বটে, কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই সূর্যাস্ত নীলাম আইনে সব জমিদারীই চলে গেল। রয়েছে এখন এই গ্রামখানি। তাও আজ যায় কাল যায়। রাজাকে বার-দুই ধরেও নিয়ে গিয়েছিল হুগলীর কালেক্টরীর পেয়াদা এসে। এসব বিবরণ সব জানতেন কুড়ারাম ভটচাজ। কিন্তু এই বাড়ীতে সেই তারকেশ্বরের হৃদয়হারিণীর বিয়ে হয়েছে এ কথাটা তিনি ঠিক স্মরণ করতে পারেন নি। তাই বাড়ীর ভিতর যখন তাকে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন রাজা, তখন অন্দরের প্রবেশপথে তাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে গেলেন।

রাণী নমস্কার করে বললেন—আসুন। আজ আমাদের বাড়ী ধন্য হল। রাজকর্মচারী অনেক আসে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্মচারী তো আসে না। তা ছাড়া আপনার হাত তো শুধু কলমে ধন্য নয়। বাবা তারকেশ্বরের পূজায় ধন্য, মা হংসেশ্বরীর পূজায় ধন্য। আসুন। আসুন।

রাজা হে-হে করে হেসেছিলেন।

রাত্রিতে তাঁর খাওয়ার সামনে পাখা হাতে বসে রাণী খাওয়াচ্ছিলেন তাঁকে। রাজা

তখন আফিঙের মৌজে নিজের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছেন।

রাণী বলেছিলেন—অদৃষ্টই সব থেকে বলবান, নয় কানুনগো সাহেব?

কুড়ারাম বলেছিলেন—দৃষ্ট হলে সেদিন তার সঙ্গে লড়তাম। আজও যদি পাই সেই মরে নয় আমি মরি!

রাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—তারপর বিয়ে-টিয়ে হয়েছে? ছেলে-পিলে কি? নাতিপুতি?

কুড়ারাম বলেছিলেন—বিয়ে অনেক কালই করিনি। তবে ললিতা বলে একটি মেয়ে সেবাটেবা করত।

ফিক করে হেসে ফেললেন রাণী। বললেন—ও তো পুরুষের ভূষণ। তারপর?

—সে মারা যাবার পর বিয়ে করেছিলাম কালীঘাটে। সে একটি সন্তান হবার পরই মারা গেল। বিবাহ করিনি। করবও না।

—কটি সেবাদাসী? হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—থাক গে। নিজের গরজ গজিয়ে উঠেছে কথা শুনে। ছেলেটি কত বড় হল?

—দশ বছরের।

পাথাখানি নামিয়ে রেখে রাণী বলেছিলেন—তাহলে অদৃষ্টের মুখে একটু চুনকালি দিয়ে দাও না। তুমি তো পুরুষসিংহ।

একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কুড়ারাম।

হেসে রাণী বলেছিলেন—আমাদের যা হবার তা তো হয়েছে। আমার ওই একটি মেয়ে। সাতটা ছেলে-মেয়ে আঁতুড়ে মরেছে তা ছাড়া। তা আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমাদের বিয়ে না হতে দেওয়ার ঠাট্টার শোধটা নাও না অদৃষ্টের উপর। তোমার তো আজ টাকার অভাব নেই। আমার মেয়েকে দেখেছো। আমার থেকেও সুন্দরী হবে!

পাচালীতে আছে—

রাণী মোরে কয় হেসে বেহান হইব শেষে
মধু সাথে অম্ল মিশে মিষ্ট হবে আরও
সাথে তার চোখে পানি কাতরে কহিল রাণী
কন্যাদায়ে দিবাযামী নিদ্রা নাহি মোরও ॥

কুড়ারাম বলেছিলেন—কেঁদো না তুমি। নিলাম, তোমার কন্যা আমি নিলাম। তোমার কন্যা আমার পুত্রবধূ হল। তোমার মেয়ে রাজবংশের মেয়ে, ওই রক্তে আমার বংশও ধন্য হবে!

মানুষ ভাবে না সুলতা—মানুষের শুদ্ধ রক্ত আর রাজবংশের রক্ত এক নয়! ওইখানে মিশল!

তারপর ভট্টাচার্য উপাধি রায় উপাধির তলায় চাপা দিয়ে জমিদারী কিনে কুড়ারাম ছেলের

বিবাহ দিয়ে ঘরে আনলেন সর্বস্বান্ত রাজার রাজকন্যা। তার সঙ্গে রাজরক্ত। ভট্টাচার্য রায় হল।

তার কারণ আছে সুলতা। রাণী তাঁর কন্যাকে কুড়ারামের পুত্রের হাতে দিতে চাইলেও মেয়ের বাপ মুঘল আমলের রাজা খেতাবধারী নিঃস্বপ্রায় ব্যক্তিটি কানুনগো চাকুরীজীবী এবং ভট্টাচার্য উপাধিধারী বাপের ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে.চান নি। তিনি কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরেছেন। তার গোলামি করেন নি।

লোকটির মস্তিষ্ক ছিল না কিন্তু আশ্চর্য একটি সহনশীল জেদ ছিল। তাঁর কাছে কুড়ারাম যখন প্রস্তাব করলেন এই বিবাহের, তখন তিনি ঘাড় নেড়ে একটু হেসেই বললেন—তা কি করে হবে? আমাদের রাজবংশ! আমাদের মেয়ে ভট্টাচার্যবাড়ীতেও যায় না। ও জোতদার কি কানুনগোর ঘরেও যায় না।

হেসে সবিনয়ে বলেছিলেন—আমরা ধরুন নদীর মাছ, পুকুরের জল আমাদের সইবে ক্যানো গো মশায়! ও হয় না!

স্ত্রী অন্তরালে ছিলেন। বেরিয়ে এসে এবার বলেছিলেন—পাগলামি করো না।

—পাগলামি কি হল?

—হল না? রাজা। রাজার ঐশ্বর্য তো ষোল আনা। বাড়ী ভেঙে হাঁ করে আছে, ভেঙে পড়ে কোন দিন চাপা দেবে। রাজার থাকবার মধ্যে তো বাড়ী পুকুর ব্রহ্মত্র, রাণী কাঁখে কলসা করে জল আনে। ঘাটে চান করে। রাজা নিজে হাতে সেজে তামাক খায়। বাকী খাজনার দায়ে কোম্পানী মধ্যে মধ্যে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে রাখে—

চোখ লাল হয়ে উঠেছিল কন্যার পিতার। এবার তিনি ভাঙা পাঁচিল দিয়ে গাছপালা শূন্য বাগানটায় ঢোকা একটা গরুকে তাড়া দিয়ে প্রায় একটা ব্যাঘ্রগর্জন করে উঠেছিলেন।

কুড়ারামেরও মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল।

রাজার গৃহিণী রাণী সারদা দেবী থমথমে মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও প্রাচীন জমিদার ঘরের মেয়ে। তাঁর বিয়েও ঠিক এই কারণেই তাঁর বাবা কুড়ারামের সঙ্গে দেন নি। সে ক্ষোভ তাঁর অন্তরেও ছিল, প্রবলভাবেই ছিল। এবং তিনি এই অক্ষম অপদার্থ শিমুল ফুলের মত মানুষটার হাতে পড়ে যে দুঃখ জীবনে পেয়েছেন তা তাঁর জীবনে তুষানলের মতই জ্বলছে অহরহ। তাঁর বাপ বিবাহে তাঁকে অলঙ্কারে অর্থে কম কিছু দেন নি। কিন্তু সেসব গিয়েছে। গিয়েছে এই মূর্খ জেদসর্বস্ব ব্যক্তিটির জন্য।

তিনি কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন, মেয়েকে ভাসিয়ে দিতে আমি দেব না।

রাজা গ্রাহ্য করেন নি, পাগলের মতই নেমে গিয়েছিলেন এবং গরুটাকে একটা লাঠি দিয়ে পিটতে আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার।

কুড়ারাম রাণীর দিকে ফিরে বলেছিলেন—ঠিক আছে সারদা, হবে। সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি নিশ্চিত থাক। শুধু দুটো বছর সময়। দুটো বছর!

দু বছরও লাগে নি, দেড় বছরের মধ্যেই সব হয়ে গিয়েছিল। জমিদারী কেনা, সরকারী

আদালতে—একেবারে সুপ্রীম কোর্টে—দরখাস্ত করে ভট্টাচার্যকে রায়ভট্টাচার্য করে নিয়ে, ঘটক এবং একজন কর্মচারী পাঠিয়েছিলেন কুড়ারাম রায়।

ঘটক পরিচয় দিলে বোকা মনুষ্য রাজা দেবরায় বলেছিলেন—এ তো সেই ভটচাজ!

সারদা দেবী বলেছিলেন—না রায়ভটচাজ। ভটচাজ বাদ যাবে।

—তা কি করে যাবে?

—কেন, তোমরা কি ছিলে? গুরুগিরি করতে না ছত্রি রাজাদের? চক্রবর্তী নও তোমরা?

—হুঁ, বটে। তা সে অনেকদিনের কথা!

—তাই জন্যে তো সব গিয়েছে। ঘরে আজ পাঁচটা টাকা নেই যে ঘটককে দেব।

রাজা চুপ ক'রে ছিলেন।

পরদিন সকালে ঘটকের সঙ্গে কথাবার্তা হবার কথা। কিন্তু বাধা পড়েছিল। এসেছিল কোম্পানী কালেকটারীর চাপরাশী। সঙ্গে পরোয়ানা। নীলেম-হয়ে-যাওয়া জমিদারীর বাকী অনাদায়ী টাকার জন্যে ক্রোক। না দিলে রাজাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

সেকালের আইনের প্যাঁচ। মবলকে এগার হাজার সিক্কা টাকা দশ আনা সাড়ে বারো গণ্ডা রাজস্ব পাওয়ার জন্য লাট নম্বর বারোশত তিয়াত্তর নিলাম হয় দশ হাজার টাকায়। সে টাকা কোম্পানীর কালেকটারী ভুক্তান হওয়ার পর এক হাজার সিক্কা দশ আনা সাড়ে বারো গণ্ডা কোম্পানীর প্রাপ্য দরুণ এই পরোয়ানা জারী হইতেছে।

রাজা শিবনারায়ণ কোম্পানীর চাপরাশী দেখে অত্যন্ত ভয় পেতেন। তিনি যে সেই রাজস্ব দেব না ঘোষণা ক'রে লড়তে গিয়ে কোম্পানীর ষোল ষোলটা বন্দুকের পাঁচবার আওয়াজে আশিটা বিস্ফোরণ শব্দ শুনেছিলেন এবং এমন পুরনো মোটা কাঠের দরজা জোড়াকে ফেটে যেতে দেখেছিলেন সে স্মৃতি তিনি কিছুতেই মুছতে পারেন না। তাঁর আফিঙের নেশা, সোজা নেশা নয়, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় প্রায় ছ মটর কলাই ভোর আফিঙের নেশা। চোখ দুটো শিবের মতই বড় এবং ওই নেশায় শিবের চোখের মতই বারো আনা বুজে থাকত। সে চোখও পুরো খুলে বিস্ফারিত হয়ে উঠত কোম্পানীর চাপরাশী দেখলে। সুতরাং তিনি বাইরে বেরিয়ে চাপরাশী দেখেই দ্রুত ফিরে অন্দরে গিয়ে ঢুকে ঘরে খিল দিয়েছিলেন।

রাণী সারদা দেবী ডেকে বলেছিলেন—দরজা খোল ভয় নেই। ফিরে গিয়েছে।

রাজা শিবনারায়ণ ঘরের মধ্যে একটা শালগ্রাম হাতে ক'রে বসেছিলেন। শালগ্রাম নয়, তাঁর সঞ্চয়ের আফিঙ। সেটা গিলবেন কি ক'রে সেইটে সমস্যা হয়েছিল তাঁর। তিনি রাণীকে বলেছিলেন—মিছে কথা বলছ। আমাকে তুমি ধরিয়ে দেবে।

—না। না। না।

রাণীর কথা শেষ হতেই মেয়ে কাত্যায়নী বলেছিল—না বাবা, সত্যিই হারামজাদ কুত্তারা চলে গেল। সেলাম করে চলে গেল বাবা।

তখন দরজা খুলেছিলেন শিবনারায়ণ। মেয়ে কাত্যায়নী বলেছিল—ওই ঘটকবুড়োর সঙ্গে যে নায়েব বেটা না গোমস্তা বেটা এসেছে সে জামিন হয়ে সই করে দিলে। জমিদারবাবু

সোমেশ্বর রায়বাহাদুরের বকলমে সই দিলে। কুস্তারা লেজ গুটিয়ে সেলাম ক'রে চলে গেল!

কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য সদর হুগলীতে বসে নিজে কালেকটারীর আমলাদের নিয়ে ব্যাপারটা করেছিলেন।

শিবনারায়ণ রায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। এবং কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন বাবু জমিদার সোমেশ্বর রায়ের উপর। সুতরাং তারপর আর বিবাহের পথে একটি কণ্টকও মাথা তুলে ওঠেনি।

আট বছরের কনে কাত্যায়নী কীর্তিহাটে এসেছিলেন, সঙ্গে এসেছিল ওঁদের বাড়ীর একমাত্র ঝি বুড়ী কুন্তী। কুন্তী ওদেশের মেয়ে—বাপ ছিল দেবরায়দের ছত্রি চাপরাশী, মা ছিল কাহার বা কূর্মী। আজীবনই এদের বাড়ী আছে। প্রথম জীবনে শিবনারায়ণের ঝি ছিল, বিয়ে কখনও হয়নি। কাত্যায়নীকে মানুষ করেছিল সেই। সে আগলে আগলে রেখেছিল কাত্যায়নীকে। কিন্তু তবু কাত্যায়নী প্রথম দিন থেকেই শ্বশুরবাড়ীতে চাকরদের ঝিদের দু-চার-বার শাসন ক'রে ডেকেছিল—এই হারামজাদা! শুনতে পাস না? এই হারামজাদী—কানে তোর ক'ভরি সোনা আছে?

কুন্তী তাদের বলেছিল—কিছু মনে করো না। লেড়কী মেয়ে—বাচ্চা। তবে ও তো রাজার বেটী! বেতরিবৎ ওর সয় না!

শুনে কিন্তু কুড়ারাম রায় ভটচাজ খুশী হয়েছিলেন। খুব খুশী!

হাঁ। এইবার বাড়ীতে সত্যিই জমিদারী মহিমা এসেছে।

রাজকুমারী কাত্যায়নী কীর্তিহাটের কড়চায় রায়দের বংশধারায় বইয়ে দিলেন এদেশের পাঁচশো বছরের আমীরশাহী চাল-চলন, ধারা-ধরণ, হাঁটা, কথা বলা, রীতিনীতি সব। ঝি-চাকরেরা তাঁকে ভয় করতো বাঘের মত। রাগ হলে হাতের কাছে যা থাকত তাই ছুঁড়ে মারতেন। আবার বকশিশ দিতেন। দেবতায় ছিল অচলা ভক্তি। ব্রতে উপবাসে তাঁর মত নিষ্ঠা বিরল। দেবসেবায় যে কত নতুন নতুন ধারা তিনি প্রচলন করেছিলেন তার হিসেব কাগজে পাওয়া যায়। হাঁটতেন তিনি আস্তে কিন্তু পা ফেলতেন তাতে শব্দ হ'ত। ছিপছিপে পাতলা অসাধারণ রূপসী ছিলেন, ওজন বেশী ছিল না কিন্তু তিনি নড়লেই কীর্তিহাটের বাড়ীর মেঝে সাড়া দিয়ে জানাতো যে রাজকুমারী বধূ কাত্যায়নী সচলা হয়েছেন। আবার অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব সজ্জনের কাছে তাঁর মত অনুগ্রহপরায়ণা কেউ ছিল না। মধ্যে মধ্যে পাগল হতেন। বাপের রোগটা পেয়েছিলেন। শুধু বাপের নয় দেবরায়দের বংশে এখানে ওখানে যারা ছড়িয়ে ছিল, যাদের কথা জানত লোকে. তাদের মধ্যে দশ পনের জন আধপাগলের নাম আমি পেয়েছি সুলতা। রাজকুমারী কাত্যায়নীর এসব বিবরণ কুড়ারাম রায় ভটচাজের পাঁচালীতে নেই। পাঁচালী তো তুমি সদ্য পড়েছ। তবে তাড়াতাড়ি পড়েছ। আমি বিশদ করে বলে গেলাম। এ বিবরণ আমি শুনেছি।

কিছু শুনেছি রায়বাড়ীতে মেজঠাকুমার কাছে। তিনি এসব শুনেছিলেন মেজঠাকুরদার কাছে। কিছু কিছু এখনও গ্রামে চলিত আছে। বাড়ীতে বাড়ীতে পুরুষ পরম্পরায়—

অবশ্য মেয়েদের মধ্যে—চলে আসছে।

রায়বাড়ীর পিছন দিকে দুধসায়র পুকুর আছে। বাঁধানো ঘাট। আগে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। কুড়ারাম রায় কাটিয়েছিলেন পুকুর রাজকুমারী বউমার স্নানের জন্য। পুকুরে জল ভ'রে একশো ঘড়া দুধ ঢেলেছিলেন, প্রথম যেদিন বউমা পুকুরে স্নান করেন সেই দিন। পুকুরটা এখনও আছে, মজে এসেছে, পাঁচিল পড়ে গেছে। এখন বাড়ীতে কুয়ো হয়েছে। ওটায় এখন বাসন মাজা হয়। কিন্তু সেদিন ও পুকুরে রায়বাড়ীর ছেলে বউ ছাড়া কেউ স্নান করত না। দুধপুকুরে স্নান করলে রঙ ফরসা হত। রাজকুমারী বউ কাত্যায়নী নিজেই ছিলেন রূপের ঝর্ণা।

রায়বংশে আমীরশাহী চাল—পাগলামি ব্যাধির সঙ্গে আর একটি জিনিস তিনি এনেছিলেন সেটি রূপ। কুড়ারাম রায় রূপবান ছিলেন কিন্তু বলেছি তো সেটা বামুনে রূপ। যে রূপ কপালে চন্দনে তিলকে খোলে। এ রূপের জাত আলাদা। এ রূপ প্রসাধন ভূষণ ভূষা ছাড়া খোলে না।

নূরজাহান, পদ্মিনী এ তো সহজ পথে আসে নি স্থূলতা। অনেক ঐশ্বর্য অনেক শক্তির উপর সাধনপীঠ বানিয়ে তার উপর আলপনা পেতে বাছাইকরা দশ বিশটা রূপের বাটি থেকে রক্ত মিশিয়ে মিশিয়ে তবে এসেছে। গালে গোলাপ কোন দেশের কোন মৌলিক রূপেই ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। ওটা হয়েছে অনেক সাধনায়। রাজকুমারী কাত্যায়নী তাই এনে দিয়ে গেছেন রায়বংশে। কুড়ারাম ভট্টাচার্য তাতে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করতেন। বলতেন—সম্পদ সৌভাগ্য এ আমার ছিল। কিন্তু বউমা আমার যে শ্রী নিয়ে এসেছে তাতে সম্পদ সৌভাগ্য উজ্জ্বল হল।

এইখানেই কুড়ারাম রায়ের পাঁচালী ইতি। দুটো কথা আছে। তিনি কিন্তু ছেলে-বউ নিয়ে কীর্তিহাটে থাকেন নি। থেকেছিলেন কলকাতায়। থেকেছিলেন ছেলেকে গড়ে তোলবার জন্য। তখন দেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কর্ণওয়ালিশ সাহেবের পর লর্ড ওয়েলেসলী এসেছেন। নতুন লাটপ্রাসাদ তৈরী হয়েছে। বিশাল সিঁড়ির দুধারে তকমা আচকান জড়িজড়ানো পাগড়ী পরা খানসামা বেয়ারা আর্দালী চোপদার দাঁড়িয়ে থাকে। নতুন গাড়ী ঘোড়া আসছে, বিলেত থেকে সাহেব ব্যবসাদার আসছে, রাইটার আসছে, বড়াটাকি লালদীঘির উত্তর পাড়ে লম্বা রাইটার্স বিল্ডিং সেরেস্তাখানা পড়েছে। ব্যবসাদার আসছে, নতুন উকীল অ্যাটর্নী আসছে, ডাক্তার আসছে। জেনারেল কাপ্তেন আসছে। মেমসাহেব আসছে এখানে বেশ্যাবৃত্তি করতে। সায়েবী সরাইখানা কাফিখানা হচ্ছে। পাদ্রীরা আসছে। তারা এখানে গির্জে করছে। ইস্কুল করছে। কিরিশ্চান করছে। লেখাপড়া শেখাচ্ছে। ক'জন সাহেব এখানে ইস্কুল করেছে—শেরবোর্ন সাহেব ড্রামণ্ড সাহেব আরও কত সাহেব।

ওদিকে হিন্দুস্থানে—ভারতবর্ষে গোলমাল। সেই গোলমাল তামাম মুলুক ভরই কোম্পানীর সঙ্গে। সাহেবানরা পাকাপোক্ত ভাবে বলেছে। এখন সরকারী সেরেস্তায় চাকরী বড় ব্যবসা বড় জমিদারী যা কর—ইংরিজী না শিখলে হবে না। ইংরিজী তরিবৎ না হলে

বড় সমাজে ঠাঁই পাবে না। রামমোহন রায় পথ খুলেছেন। কলকাতার কায়স্থরা সুবর্ণবণিকেরা ঠেঙেভেঙ্গো ইংরিজী শিখে মুৎসুদ্দি দালালী কাজ করছিল, তাদেরও ইংরিজী শেখার তাড়া পড়েছে। কুড়ারাম নিজে কোনরকমে কাজ চালান। মুখে মুখে শিখে নিয়েছেন। কিন্তু ছেলেকে ভালরকম ইংরিজী, তাঁর সঙ্গে সহবৎ তরিবৎ না শেখালে তার জীবনের সাধ অঙ্কুরেই মরে যাবে এ তিনি জানতেন বলেই সোমেশ্বর এবং পুত্রবধূ রাজকুমারী কাত্যায়নীকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। সোমেশ্বর ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলার ইস্কুলে ভর্তি হল।

বেয়ান সারদা দেবী এবং বেয়াইকে কালীঘাটে মাতৃদর্শন করতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রে দিয়েছিলেন। নইলে পৌত্র না হলে মেয়ের মা-বাপকে জামাইঘরের ভাত খেতে নেই। কিছুদিন তাঁদের এখানে রেখে কাত্যায়নীসহ পাঠিয়ে দিলেন স্বগ্রামে। ইতিমধ্যে ওখানকার বাড়ী মেরামত করিয়ে দিয়েছিলেন; কারণ সবই তাঁর সোমেশ্বর পাবে। এই সময়ের মধ্যে বেয়ানের সঙ্গে অনেক গল্প অনেক রহস্যরসিকতায় পরম আনন্দে কেটেছে তাঁর। বেয়াই আফিঙ খেতেন। বিলিতী মদও খাওয়াতেন কুড়ারাম। তিনিও খুব খুশী ছিলেন। কুড়ারাম মাসে মাসে যেতেন কীর্তিহাট। চাঁদপাল ঘাটে বড় বজরা বাঁধা থাকত তাঁর। নাম ছিল—ললিতা। সেই বজরায় যেতেন। হলদী নদীতে ঢুকে জোয়ার এলাকা পর্যন্ত গিয়ে নামতেন। সেখানে থাকত তাঁর হাতী। হাতীর নাম ছিল জংবাহাদুর।

লোকে অনেক কথা বলত,—বেয়ান সম্পর্ক নিয়ে।

কিন্তু তিনি কড়চায় লিখেছেন—

ছেলে বউ সাথে আনি বেয়ান সারদা রাণী
সর্বসুখী মনে মানি কাটে দিন কয়।
কত হাসি কত কথা আগামী জন্মের তথা
কল্পনা পুরাবে মাতা জানিনু নিশ্চয়॥

তারপর সেই কটা লাইন—আগে বলেছি—

পাপপুণ্য নাহি মানি যাহা করিয়াছি আমি
সবার মালিক তুমি জয় কালী করালী।

তার শেষ লাইন—

তোমাতে দেবত্র করি বিষয় আদি জমিদারী
আমি মা ভাসাই তরী রাখো বাঙালায়।

মায়ের চরণেই তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। একবার কীর্তিহাট গিয়ে অসুখে পড়লেন। ছেলে সোমেশ্বরকে লোক পাঠিয়ে আনালেন। লিখলেন, "অবিলম্বে আসিবা।" সোমেশ্বরের বয়স তখন কুড়ি। বধূ কাত্যায়নীর বয়স সতের। তখন তার তিনটি সন্তান হয়ে মারা গেছে। এই এক খেদ নিয়ে তিনি গেলেন। ওই দেখ তাঁর দেহত্যাগের ছবি। এর মধ্যে তারা খেয়ে উঠে এসে সেই ছবি টাঙানো বারান্দায় ঢুকল। সুরেশ্বর

ছবিখানা দেখালে। একটা প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে পড়েছে। গাছটার কাণ্ডটায় একটা মানুষের দেহের আভাস।

প্রচুর ধুমধাম ক'রে শ্রাদ্ধ করেছিলেন সোমেশ্বর। টাকা খরচ হয়েছিল চল্লিশ হাজার। চাল খরচ হয়েছিল চল্লিশ মণ। ময়দা খরচ হয়েছিল দশ মণ।

শ্রাদ্ধের পর ও-অঞ্চলে কলেরা হয়েছিল। সোমেশ্বর সস্ত্রীক কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

* * *

সুরেশ্বর পরের ছবিখানা দেখালে। আশ্চর্য একটি রূপসী মেয়ে। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার। চোখে প্রদীপ্ত দৃষ্টি। সুরেশ্বর বললে—পরের ছবি দেখ সুলতা। এরও চার বছর পরের। সোমেশ্বরের বয়স তখন চব্বিশ। ইংরাজী ১৮১৫ সাল। রাজকুমারী বধূ কাত্যায়নীর বয়স একুশ।

তাঁর কোল শূন্য। রাজরক্তের সঙ্গে উন্মত্ততা উগ্রতার সঙ্গে আর একটি ব্যাধি তিনি নিয়ে এসেছিলেন, সেটি তাঁর মৃতবৎসা দোষ।

হয়তো এ যুগ হলে রক্ত পরীক্ষা ক'রে কোন ব্যাধির বীজ বের হত এবং তার প্রতিষেধকও পাওয়া যেত। কিন্তু সে যুগে ইংরেজ ডাক্তারও তার প্রতিকার করতে পারে নি। কুড়ারামের মৃত্যুর পূর্বে তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন। তারপর আরও দুটি মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। মধ্যে মধ্যে উন্মাদ হয়েছেন।

অন্তর্বত্নী হলেই তাঁর মস্তিষ্ক অসুস্থ হ'ত। প্রথম হত মেজাজ খারাপ। উগ্র মেজাজ উগ্রতর হত। পাঁচ ছ মাসে তিনি বোবা হয়ে যেতেন। অনবরত ঘুরতেন ঘরের মধ্যে। তারপর প্রায় উন্মাদ। প্রলাপ অসংলগ্ন কথা বলতেন। চাকর-বাকরের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকত না। সব থেকে বিপদ হ'ত সোমেশ্বরের। স্বামীকে দেখলে ক্রোধ আক্রোশের আর সীমা থাকত না।

বলতেন—ইচ্ছে করে তোমার বুকে বসে গলাটা টিপে ধরে শেষ ক'রে দি।

দু তিনবার ধারালো দা নিয়ে তাঁকে কাটতে গিয়েছিলেন। তাকে আটকেছিলেন তাঁর মা বা সারদা দেবী। সোমেশ্বর পালিয়ে বেঁচেছিলেন। অনেকে বিবাহ করতে পরামর্শ দিয়েছিল তাঁকে কিন্তু তা তিনি করেন নি। কারণ ছিল—কুড়ারাম মৃত্যুর সময় ছেলেকে প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছিলেন—কাত্যায়ানী বদ্ধ উন্মাদ হলেও সে যেন বিবাহ না করে। তাঁর শিয়রে তখন ও-দিকে বসেছিলেন কাত্যায়নীর মা তাঁর বেয়ান রাণী সারদা দেবী।

সারদা দেবী তখন বিধবা। তিনি কন্যার এই সময় আসতেন, কাছে থাকতেন। তিনিই কন্যাকে বলে রাজী করিয়ে তাকে অর্থাৎ কাত্যায়নীকে দিয়েই সোমেশ্বরকে বলিয়েছিলেন, তখন অবশ্য কাত্যায়নীর সুস্থ অবস্থা; বলিয়েছিলেন—দেখ আমার তো এই অবস্থা। তুমি বাড়ীতে তোমার সেবার জন্যে দুটো ভালো ঝি রাখো। মন ভাল রাখতে গানটান শুনবার জন্যে একজন বাঈজী রাখো। নইলে তুমিও যে পাগল হয়ে যাবে!

সোমেশ্বর ঠিক জমিদার বাচ্চা জমিদার ছিলেন না। হতে পারেন নি। তিনি কৌশলী মানুষ ছিলেন, তার সঙ্গে সাহসীও ছিলেন। কিন্তু বেপরোয়া মানুষ ছিলেন না। নইলে

নিজেই এসব ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য বাঈজী তাঁর ছিল। তবে বাঁধা ছিল না। এখানে ওখানে বাগানে বজরায় আমোদ-আহ্লাদ করতেন।

দু চারটে খরচ পেয়েছি খাতায়—এসব খাতা সোমেশ্বরের খাস খাতা। তিনি কলকাতায় যে ব্যবসা করতেন অর্থাৎ সাহেবদের মুৎসুদ্দির কাজ করতেন, টাকা লগ্নী করতেন তার জমাখরচের খাতা। সোমেশ্বর একজন সাহেব অ্যাটর্নীর টণ্ডি ছিলেন, তাঁকে টাকা ধার দিয়ে তাঁর কেসগুলির থেকে কমিশন পেতেন। তাছাড়া টাকা লগ্নী করেছিলেন নুনের ব্যবসায়ে। মেদিনীপুর কাঁথী অঞ্চলে 'খালারি' ইজারা নিয়ে নুন তৈরী করাতেন। নুনের ব্যবসা একচেটে কোম্পানীর, কোম্পানী নুন কিনত। এ ছাড়া রবিনসন সাহেব বলে একজন সাহেব তাঁদের অঞ্চলে নীলের কুঠী করেছিল, সেই কুঠীতেও তাঁর অনেক টাকা খাটত। জীবনে স্ত্রীকে নিয়ে সুখশান্তির যতই অভাব হোক না কেন, তিনি বাইরের ব্যবসায়ে কাজে মেতে থাকতেন দিনে, সন্ধ্যায় যেতেন বাঈজীবাড়ী। রাত্রে বাড়ী ফিরে ওই ঝিদের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে যেতেন। উঠতেন বেলা এক প্রহরের সময়। মধ্যে মধ্যে দু'চারদিন দরজায় আঘাত পড়ত। করাঘাত করতেন কাত্যায়নী দেবী। তাঁকে ধরে নিয়ে যেতেন তাঁর মা রাণী সারদা দেবী। কাত্যায়নীর একটা সুস্থ অবস্থাও ছিল। সেটা প্রসবের পর আসত। মৃত সন্তান প্রসব করার পর তিনি কাঁদতে শুরু করতেন এবং পনের বিশ দিনের মধ্যে অনেক কান্না কেঁদে বিষণ্ণ প্রতিমার মত থাকতেন কয়েকদিন, তারপরই হতেন আর এক মানুষ। স্বামীর ঘরে তাঁর বিছানা হ'ত। ঝি দুটিকে হয় তাড়াতেন, নয় তারা সরে যেত এই বাড়ীর দূরতম প্রান্তের একতলার ঘরে। তখন গোটা সংসারটা চলত তাঁর অঙ্গুলিহেলনে। তিনি বাসনের ঘরের বাসনগুলি গুনতেন, কতগুলি হারিয়েছে হিসেব করতেন। আসবাবপত্রও এইভাবে হিসেব করতেন। যা হারাত সেগুলি তৎক্ষণাৎ পূরণ করেও সোমেশ্বরের নিষ্কৃতি ছিল না, কাত্যায়নী তাঁকে দিয়েই চাকর-বাকর, সরকার, নায়েব সকলকে তিরস্কার করিয়ে ছাড়তেন। এবং ডাক্তার-বদ্যি ইত্যাদি ডাকিয়ে সমারোহ জুড়ে দিতেন। মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখতেন—কোন দেবস্থলের স্বপ্ন। সেখানে যাওয়ার সাড়া পড়ত।

•

তারপর একখানা শুধু কালো ছবি। তার মধ্যে সোমেশ্বরের আভাস মাত্র রেখায় ফুটে আছে। কিন্তু ওই দেখ সুলতা—কতকগুলো বাইরের ঘটনা আঁকা আছে ওই যে ছবিটার প্যানেলে। সোমেশ্বর নিজের জীবনের কোন ঘটনায় মনের কোন ছায়া রেখে যান নি। চিঠি যা পেয়েছি তা ব্যবসায় সংক্রান্ত। যেমন নুনের দেওয়ান দ্বারকনাথ ঠাকুরের চিঠি; পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের ছেলে—তিনি তখন কোম্পানীর কানুনগো রয়েছেন, তাঁর চিঠি। রবিনসন সাহেবের চিঠি। কীর্তিহাটের প্রধান নায়েবের চিঠি, কালীমাতার পূজকের চিঠি,—তা ছাড়া দু'চারজন প্রজা সজ্জনের চিঠি—

মহামহিম মহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সোমেশ্বর রায় জমিদার মহাশয় অশেষ প্রতাপান্বিতেষু।

হুজুর বরাবর অধীন প্রজার দরখাস্ত এই যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দরখাস্ত তার ঘরের জন্য জোতের মধ্যে একটি তাল গাছ কি শাল গাছ কি তার পুত্রকন্যার বিবাহে পোড়া কাষ্ঠের জন্য একটি বটবৃক্ষের ডাল বা মাতৃশ্রাদ্ধে একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষ কাটবার অনুমতি প্রার্থনা। অথবা একটি ছোট পুষ্করিণী খননের অনুমতি প্রার্থনা। তখন কোম্পানীর সঙ্গে জমিদারের চুক্তি অনুযায়ী জমিদার জমিদারীর জলকর ফলকর বনকর, লাহা-মহল, পাতা-মহল, কাষ্ঠকয়লা-মহল এমন কি উর্ধ্ব-অধঃ—সমস্ত কিছুর একছত্র অধিপতি। কন্যার বিবাহে জমিদার প্রণামী পান —তার নাম মারোচা। পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে জলদানের পাত্র, ঘড়ি বা ঘটি কাছারীতে পৌছে দিতে হয়।

এর মধ্যে কাত্যায়নী সম্পর্কে কোন কথা নেই। কাউকে সোমেশ্বর রায় লেখেন-নি। একবার পোষ্যপুত্র নেওয়ার কথা তুলে—কাত্যায়নীর হাতের কঙ্কণের আঘাতে কপাল কেটে ছিলেন—সে কথা শুনেছি, মেজঠাকুমার কাছে। আর তাঁর ছবিতে দেখছি একটা লম্বা কাটা দাগ। অন্য যারা প্রবীণ তাঁদের কাছেও শুনেছি। কিন্তু কোন নমুদ পাইনি।

জমাখরচের খাতায় মধ্যে মধ্যে পেয়েছি—বিদায়-বকশিশ খাতে খরচ ২৫০৲ টাকা। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সাহেব হুজুর বাহাদুরের খাস ঝিকে বিদায় উপলক্ষ্যে—নগদ বকশিশ—। ২৫০৲ টাকাই উচ্চতম বকশিশ নয়। নিম্নতর। উচ্চতম বকশিশ ১০০০ টাকাও আছে। কাত্যায়নী দেবী সুস্থ হলে যে সব খাস ঝিদের বিদায় করা হত—এ বকশিশ তারা পেয়েছে।

দেখ প্যানেলটা দেখ, দেখতে পাবে, পুঁটলি বগলে ক'টি মেয়ে চলে যাচ্ছে।

তারপরই দেখ এই ছবিটা। সে আমলের চৌরঙ্গীর পথে সোমেশ্বর চলেছেন স্ত্রীকে নিয়ে কালীঘাটে! এ ঘটনার গল্প রায় বংশে সুপ্রচলিত এবং সুপ্রসিদ্ধ। রায়-বংশের গল্প উঠলেই স্মৃতিপথে এসে যায়। রায়-বংশের ছেলেমেয়ে—সে আধুনিকই হোক আর প্রতিক্রিয়াশীলই হোক—শুনেছে, জানে এবং মানেও। ঘটনার যে শেকল একটার সঙ্গে একটাকে গেঁথে কার্য এবং কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা টেনে নিয়ে যায় তার মাঝখানে এক একটা ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে। যেন হঠাৎ একটা বাইরের আংটা কোন এক অদৃশ্য চুম্বকের টানে ছুটে এসে শেকলটার প্রান্তে জুড়ে যায়। এও তাই।

বহুশ্রুত ঘটনাটি এই। কালীঘাট সোমেশ্বরের মামার বাড়ী। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য তাঁর আমলে এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারটিকে সাহায্য করে নানান সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিয়ে তাদের বর্ধিষ্ণু করে তুলেছিলেন। তাঁরা অনুগত ছিলেন এবং সত্যকার হিতৈষী ছিলেন। সোমেশ্বরও বাল্যকালে কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকতেন যখন কুড়ারাম বিদেশে বা মফস্বলে যেতেন তখন। সোমেশ্বরও ভালবাসতেন তাঁদের।

একদিন তাঁর মামাতো-ভাই এসে খবর দিয়ে গেল, কালীঘাটে এক তান্ত্রিক এসেছে। ক'দিন আগে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। তান্ত্রিক আধ পাগলা—।

মামাতো-ভাই হরিপ্রসাদ চাটুজ্জে বলেছিল—তান্ত্রিকরা আধ পাগলা হয়। মুখ খারাপ হয়। অনেকে গাইয়েও হয়। লোকটা আশ্চর্য গাইয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ে—সব যন্ত্র বাজাতে পারে; প্রথম যখন কালীঘাটের শ্মশানে আসে তখন একটু সুস্থ ছিল—মধ্যে মধ্যে গান-

বাজনার আসর বসলে জয় কালী বলে এসে ঢুকে বসত। বলত—আমাকে একটু বাজাতে দেবে? কখনও বলত—গাইতে দেবে? দিত, সবাই—সে অদ্ভুত ব্যাপার। লোকে একটু ভালটাল বাসত। মধ্যে মধ্যে মার খেতো। লোকে মারত। বলত—মেয়েদের দিকে নাকি ড্যাব-ড্যাব্ করে তাকায়। পলক পড়ে না। এক একজনের কাছে এসে তার মুখের কাছে মুখ এনে বলে—তুমি সেই বট?—বেশ কয়েকদিন মার খেয়েছে। কিন্তু এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু ভাই এই দশদিন আগে জোয়ারে একটা যুবতী মেয়ের দেহ ভেসে এসেছিল। একাদশীর জোয়ার। সেদিন জোয়ারটা বেশী। মাঝখানে দেহটা ভেসে চলছিল—একবার ডুবছিল একবার উঠছিল। চোখে পড়েছিল সবারই কিন্তু তান্ত্রিক জয় কালী বলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তুফান-জোয়ার—তারই মধ্যে থেকে সে দেহটা টেনে এনে তুললে। টাটকা মড়া। রূপসী একেবারে বোধ হয় ষোড়শী মেয়ে। সকলে জিজ্ঞেস করলে—কি করবে! বললে—আসন করে সাধন করব। সামনে পরশু চতুর্দশী, পরের দিন অমাবস্যে। তারপর তাই চলে গেল নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। লোকে ভেবেছিল বাঘে খাবে। নয়ত মড়ার লোভে শেয়াল এসে শুকে সুদ্ধ ছিঁড়বে! তিনদিন কেউ দেখেনি। চারদিনের দিন নৌকোর মাঝিরা দেখতে পেয়েছিল। পাড় থেকে গড়িয়ে ভাঁটার কাদার ওপর পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। তুলে এনে মন্দিরের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছিল। জ্ঞান হয়ে লোকটা ক'দিন হয়ে গিয়েছিল ঘোর উন্মাদ। কেবল চেঁচাতো—ফেলে দিলি! ফেলে দিলি! দে—! আর খিস্তি গালাগালি। এখন শান্ত হয়েছে। লোকে বলছে সিদ্ধ হয়ে গেছে লোকটা। তা ছাড়া এখন শুনছি লোকটা অনেকজনকে অনেক ওষুধ—মানে জঙ্গল থেকে লতাপাতা ছিঁড়ে এনে হাতে দলে দেয়, ভাল হয়ে যায়। কটি বাঁজা মেয়েরও সন্তান হবে শুনেছি ওর ওষুধে। যাবে একবার বউমাকে নিয়ে?

সেই চলেছেন সোমেশ্বর ওই দেখ।

৫

পশ্চিম দিকে সেকালের কলকাতার ময়দানে উলুখাগড়ার জঙ্গল, দু-চারটে জলা, গঙ্গার ধারে বড় বড় অশথের গাছ। জাহাজ বজরার মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। চৌরঙ্গীর পূব পাশে সেকেলে বাড়ী। তখন হোয়াইটওয়ে লেডল তৈরী হয়নি, গ্র্যাণ্ড ফিরপোর বাড়ী তৈরী হয়নি। বাতা-ওয়ালা ছোট বাড়ী, গোল থাম, কাঠের রেলিং।

ব্রুহাম গাড়ী চলছে, সহিসেরা সামনে ছুটছে, পাল্কী চলছে। তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে রাহী চলছে। ঘোড়ায় চলছে সওয়ার। গরুর গাড়ী চলছে।

ওই দেখ, পাল্কীতে কাত্যায়নী।

ব্রুহামে সোমেশ্বর। চোগা চাপকান পরেন নি, পরেছেন পাটের কাপড়-চাদর। কাত্যায়নীর পরনে বালুচরের বুটীদার রেশমী শাড়ী।

* * * *

সোমেশ্বর রায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন তান্ত্রিককে দেখে। আরে!

—কি? জিজ্ঞাসা করলেন মামাতো-ভাই হরিহর।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সোমেশ্বর তান্ত্রিককে বললেন, কি বাবা চিনতে পারছেন আমাকে?

তান্ত্রিক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, হাহা-হা! রায়বাবু? হাহা-হা! পারি বৈকি চিনতে। কেন পারব নি! হাহা-হা!

—এ পথে কত দিন বাবা?

—তা তিন জন্ম হল গো। এ জন্মে বছর পাঁচেক হয়ে গেল গো। হাহা-হা! আমি ভাবছিলাম গো তোমার কথা। হাহা-হা!

অবাক হয়ে গেলেন সোমেশ্বর। তাঁর কথাই ভাবছিলেন? তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কে বললে আমি আসব?

—হাহা-হা। আমার মন বললে গো! তোমাকে আমার দরকার আছে যে! হাহা-হা!

আশ্চর্য! এ লোককে তিনি চেনেন। শ্যামনগরের ভটচাজবাড়ীর জামাই, পেশাদার কুলীনের ছেলে। ওর শ্বশুর খুব নামজাদা গৃহীতান্ত্রিক ছিলেন। শ্মশানে কালীপূজা করতেন। শ্মশানে জপতপ করতেন। তন্ত্রমতে স্বস্ত্যয়ন করতেন। কুলীনের ছেলে শ্যামকান্ত চাটুজ্জে—ভটচাজের কন্যাকে বিয়ে করে ঘরজামাই ছিলেন। প্রথম প্রথম বেড়াতেন গান-বাজনা করে। গান-বাজনার শিষ্য ছিল। নিজেও বড় বড় বাড়ীতে খেরুয়ার খোলে পোরা তানপুরা কাঁধে নিয়ে গান শোনাতে আসতেন। অসাধারণ গাইয়ে বলেছে মামাতো-ভাই, তা এক বিন্দু বাড়িয়ে বলে নি। যেমন সঙ্গীতে জ্ঞান তেমনি কণ্ঠস্বর। তন্ত্রের ঝোঁকও ছিল। পাঁচ টাকা পার্বণী করে দিয়েছিলেন, কালীপুজোর পর এসে গান শুনিয়ে নিয়ে যেতেন। আজ বছর পাঁচেকই হবে আর আসেন নি। পাঁচ বছরে শ্যামাচরণ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছেন। ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা কথা, হাহা-হা, হাহা-হা, যেন একটা উল্লাস উথলে উঠছে ওই শব্দের গমক মেরে। চাউনিও বদলেছে, চোখ দুটো বড়, সে চোখ লাল হয়ে আছে। চোখের তারা কখনও স্থির, কখনও অস্থির। কিন্তু যেন জ্বলছে জ্বলন্ত আঙরার মত।

তিনি বললেন—তা আমার বাঞ্ছা যে পূর্ণ করতে হবে।

—হাহা-হা। তোমার আবার বাঞ্ছা কিগো বাবু, জমিদারি, বাড়ী-টাকাকড়ি, হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর,—আবার বাঞ্ছা? বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

—আমার সন্তান নাই বাবা! সন্তান হয়, সব মরা সন্তান। অনেক প্রার্থনা করেছি—মায়ের কাছে—

—কার কাছে? ওই ন্যাংটা মাগীর কাছে! শ্মশানে ওটা ন্যাংটা হাহা-হা! সংসারে ওটা ভিখিরী! হাহা-হা। ওই দেখ না কালীমন্দিরের আশে-পাশে ওই টেনা-পরা দুধো দুধো কুমারী মেয়ে একটা পয়সা দাও, একটা পয়সা দাও বলে বেড়াচ্ছে, ওর মধ্যে সেটাও আছে। চোখ থাকলেই দেখবে। সেদিন আবার ঢং করে ভেসে এসেছিল মড়া হয়ে।

হাহা-হা। ফেলে দিলে। তা ওই করবে তোমার বাঞ্ছাপূরণ? ধূর-ধূর-ধূর! মন্দিরে যেটা আছে সেটার মুখ চোখ জিভ সব তো তৈরী করা! হাহা-হা!

লোক জমে গিয়েছিল অনেক। জনকতক লোক কালীর নিন্দে করার জন্তে রেগে উঠেছিল। তান্ত্রিক হাহা-হা করে হেসেছিলেন। সে হাসি আর থামে না। সোমেশ্বরের রোমাঞ্চ হয়েছিল সে হাসিতে। তিনি তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন।—বাবা!

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তান্ত্রিক। তিনিও হাত চেপে ধরেছিলেন সোমেশ্বরের। সোমেশ্বর শিউরে উঠেছিলেন। তান্ত্রিকের হাতে যেন আগুনের মত উত্তাপ। চোখ দুটো ঝকমক করে উঠেছিল।

তান্ত্রিক বলেছিলেন, হবে। হবে। বাঁচবে ছেলে হেহে-হে! নিশ্চয় বাঁচবে। কিন্তু যজ্ঞ করতে হবে। করব আমি। আর ওষুধ দোব। খেতে হবে। হ্যাঁ।

—তাই করুন।

—হেহে-হে। সে এখানে নয়। বুঝেছ। এখান থেকে আমার ঘাড়ধাক্কা হয়ে গিয়েছে হেহে-হে। আমি তাতেই মনে মনে তোমাকে ডাকছিলাম, হেহে-হে! কীর্তিহাটে যেতে হবে। বুঝেছ! ওখানে সিদ্ধেশ্বরীর আসন আছে। ওখানে বসে সাধন করব। হেহে-হে। হবে।

—তার সঙ্গে আমার স্ত্রীর মাথার দোষ হয় মধ্যে মধ্যে, তা-ও ভাল করে দিতে হবে।

—সব হবে, সব হবে, হেহে-হে! কি মজা, হেহে-হে। দেখ দেখ, যোগটা দেখ—হেহে-হে!

তারপর হঠাৎ একেবারে যেন উন্মাদ হয়ে গেলেন—জলন্ত দৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে গালাগাল শুরু করলেন—হারামজাদী বেহায়া ন্যাংটা মাগী! এবার তোর একদিন কি আমার একদিন!

সোমেশ্বর তাঁর দৃষ্টি দেখে শিউরে উঠেছিলেন। কাত্যায়নীর মাথার ঘোমটা খুলে গিয়েছিল।

সুলতা, অলৌকিক শক্তিটক্তির কথা আমি তোমার মনে বা কারুর মনেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিনে—চাইও না। কিন্তু পাগলের মত মানুষ যখন কিছু খোঁজে, ক্ষ্যাপা যখন পরশপাথর খুঁজে খুঁজে ফেরে, তখন এমনি দৃষ্টি চোখে ফোটে। আয়নায় আমিও মধ্যে মধ্যে আমার চোখে এমনি দৃষ্টি দেখেছি।

সুলতা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এবং সে কিছু যে ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক, তার আভাসও ফুটে উঠেছিল তার দৃষ্টিতে এবং ঠোঁট দুটির ভঙ্গিমার মধ্যে চাপা হাসিতে।

বাধা দিয়ে সুরেশ্বর বললে, থাম সুলতা, ব্যঙ্গ-শ্লেষ আমাকে. আজ বিঁধতে পারবে না। আমার মনে একটি বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য বর্ম আমাকে ঢেকে রেখেছে। বহু সন্ধানে যা আমি পেয়েছি, তাই আমি বলছি। এই মুহূর্তে আমার চোখের দিকে—ঠিক ওইরকম না হলেও, অনেকটা ওইরকম দৃষ্টি দেখতে পাবে। ওতে আমি বিশ্বাস করেছি। কারণ, সোমেশ্বরের

স্ত্রীর এর পরের সন্তানটিই জীবন্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং বেঁচেও ছিল। সেটি কন্যা। তার তিন বছর পর হয়েছিল পুত্র। এবং কাত্যায়নী দেবীর মাথার গোলমাল ভাল হয়ে গিয়েছিল। তান্ত্রিক যজ্ঞ করেছিলেন, ওষুধও খাইয়েছিলেন। এবং এখনও আমাদের ওখানে বায়েনরা আছে, যারা ওই তান্ত্রিককে যথাসর্বস্ব দিয়ে সেবা করেছিল, তাদের তিনি বন্ধ্যাত্বের ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন। আরও দুটি ওষুধ দিয়েছিলেন—একটি দু'দিন অন্তর পালাজ্বরের ওষুধ। একটি পয়সা একটি সুপুরী নিয়ে তারা ওষুধ আজও দেয়, শিকড় এবং কোন উদ্ভিদের পাতা, তারা দলে পিষে দেয়, লোকে চিনতে পারে না, তাতে লোকে সারে। আমি দেখেছি। তোমরা বিশ্বাস কর বা না-কর, রাসপুটিনের ইতিহাস রাশিয়ার কম্যুনিস্ট ইতিহাস থেকেও মোছে নি!

সুলতা তাকিয়েছিল ছবিটার দিকে।

সোমেশ্বরের হাত ধরে তান্ত্রিক দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘকায় সোমেশ্বরের হাত ধরে একটি সোজা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তাকে সুরেশ্বর সোমেশ্বরের থেকেও উঁচু করে এঁকেছে। বুকের মোটা মোটা হাড়গুলি প্রকট হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য রকমে সজীব হয়ে উঠেছে এই তান্ত্রিকটি। তার চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে। বড় বড় চোখের সাদা ক্ষেতে লালের আভা ফুটিয়েছে; প্রকট পঞ্জরাস্থিগুলির অন্তরালে রুক্ষ কঠোর বা ক্ষুধার্ত হৃদয়ের স্পন্দনের পর্যাপ্ত আভাস মিলছে। একটা রহস্যময় হাসি তার মুখে, ধূসর কালো গোঁফ-দাঁড়ির মধ্যে সাদা সুগঠিত দাঁতের সারি। বিদ্রূপ ব্যঙ্গের বাঁকা রেখায় সে-হাসি ধারালো তীক্ষ্ণ। হয়তো খানিকটা হিংস্র কিম্বা সেটার অর্থ ক্রুদ্ধ প্রভুত্ব! গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে গেরুয়া কাপড়, পায়ে খড়ম।

সুলতাকে ছবিটা আকর্ষণ করলে। সে উঠে কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। সুরেশ্বর বললে—ব্যাকরণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে রূপ হয়তো থাকবে কিন্তু রূপের অন্তরালের রূপসী বা মোহিনী যিনি, তিনি মুখ ফেরাবেন নতুন বউয়ের মত। লজ্জা না বলি, সরম যাকে বলি, তা যার মধ্যে বেশী আছে, তিনি হয়তো এই মর্ডান যুগেও চোখ বুজে ফেলবেন। ছবি একটু দূর থেকেই দেখো, তাতে রূপসী অসঙ্কোচে রূপের রঙ-রেখার বাতায়নে মুখ রেখে চেয়ে থাকবেন। ছবিটার বৈশিষ্ট্য আছে। আশেপাশে যে বনচ্ছায়ার আভাস তার মাঝখানে তান্ত্রিক—কাছ থেকে একরকম, দূর থেকে দেখলে মনে হবে আঁধার ভেদ করে বেরুচ্ছে।

সুলতা হেসে পিছিয়ে এসে ছবিখানাকে দেখতে দেখতে বললে—সত্যিই ছবিটা বড় ভাল হয়েছে, সুরেশ্বর। তান্ত্রিক যেন কাছে টেনে নিয়ে যায়।

সুরেশ্বর জানলা দিয়ে বাইরে রাত্রির আকাশের সন্ধানে চোখ ফিরিয়ে বললে—ছবিটাকে বারকয়েক আমি এঁকেছি। বাস্তবের সত্যকে ফোটাতে চেয়েছি। রায়বাড়ীর কুলজী আর কীর্তিহাটের কড়চার উপকরণ খুঁজতে খুঁজতে একটা সত্য আমি আবিষ্কার করেছি, সেটা হল এই যে, একটা দুর্নিবার আকর্ষণে কিছু যেন টানে। আমি ওখানে গিয়ে তারই টানে যেন পড়ে গিয়েছিলাম। যত হাতড়াই, যত ভাবি এই পেয়েছি, ততই দেখি আরও গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। আর যত অন্ধকার গাঢ় হল, ততই মনে হল, এর চেয়ে সত্য

আর কিছু নেই।

বিচিত্র হেসে সুরেশ্বর বললে—গল্প শুনে ভেবেছিলাম, এর পর নিশ্চয় তান্ত্রিক ধরা পড়বে বুজরুক বলে। ক্রনোলজি ভেঙে একটা গল্প বলি—সেটা ঘটেছিল আমার পিতামহের অর্থাৎ রায়বংশের বিদগ্ধ শিরোমণি দেবেশ্বর রায়ের আমলে। এক তান্ত্রিক এসেছিলেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষ, দাড়ি-গোঁফে-চুলে বেশ ঘোরালো চেহারার মানুষ। এসে রায়বাড়ীতে ওঠেন নি, বসেছিলেন রায়বাড়ীর বিমলদিঘির বাঁধা ঘাটে। তারপর পথচারীদের অতি পরিচিতের মত নাম ধরে ডেকে কাছে এনে কিছু কিছু গোপন কথা বলে বিমূঢ় করে দিয়েছিলেন। কিছু-ক্ষণের মধ্যে রটে গেল—ত্রিকালদর্শী পুরুষ এসেছেন। সব থেকে বিস্ময়কর কথা কিছু কানে কানে বলেছিলেন দেবেশ্বরকে। চমকে উঠেছিলেন তিনি। মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর তখন প্রচুর খেয়ে খেয়ে ডিসপেপসিয়া ধরিয়েছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন—বাবা, আপনার পাকস্থলীতে তিনটি অপাচ্য অন্ন রয়েছে। একটির বর্ণ লাল, একটির কালো, আর একটি নীলাভ। কোন বন্ধুরূপী শত্রুর বাড়ীতে সমাদরের নিমন্ত্রণের মধ্যে আপনাকে খাইয়েছে তারা। তার থেকেই এর সৃষ্টি। এবং এই অন্নই হয়তো—। অন্তত আপনার জীবনে সকল অন্নকেই বিষাক্ত করে দেবে। আর তার ছেলে ধনেশ্বরকে দেখে বলেছিলেন—এর সাংঘাতিক ফাঁড়া আছে। রায়-বাহাদুর তখন বেঁচে কিন্তু তিনি তখন তীর্থে। অবশ্য তিনি থাকলেও প্রভাবমুক্ত রাখতে পারতেন না নিজেকে। সে-কথা যাক। এর পর প্রতিকারের জন্য শ্মশানে কালীপূজার ব্যবস্থা হল। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ থেকে শুরু করে আয়োজন উপকরণ অনেক।

লোকটা বুজরুক। খেলাটা শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে তুলতে পারেন নি। মহানিশায় শ্মশানে কালীকে একাকিনী অবস্থায় ফেলে দিয়ে মূল্যবান দ্রব্যগুলি পোঁটলা বেঁধে নিয়ে পালিয়ে ছিলেন। মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে সব থেকে মূল্যবান ছিল একটি নীলা আর একটি পান্না। শনি এবং রাহুর দশা বলে নীলা ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতা থেকে নীলা এসেছিল, সে আমলে দুটি রত্নের দাম নিয়েছিল সাতশো টাকা। দেবোত্তরের খাতায় খরচ পড়ে আছে।

এদের আপসোস হয়নি। এঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এই কারণে যে, লোকটা যেহেতু বুজরুক ভণ্ড, সেইহেতু তার সব কথাই মিথ্যা হতে বাধ্য।

এসব গল্প মুখরোচক। ওই গুণে শুধু বেঁচেই নেই, হাত পা ছড়িয়ে বেঁচে আছে। আমারও শোনা ছিল। সুতরাং সোমেশ্বর তান্ত্রিককে নিয়ে এসে কীর্তিহাটে যজ্ঞ করিয়েছিলেন শুনে ভেবেছিলাম এমনি কিছু একটা সত্য প্রকাশ পাবে। যেটা কীর্তিহাটের বক্তাদের কাছে দুর্বোধ্য এবং দুর্ভেদ্য হলেও আমার মত বিদগ্ধ শ্রোতার কাছে ধরা পড়বে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা তা পড়ে নি। শুধু তাই নয়—আজও সেই তান্ত্রিকের ওষুধ ওখানে অনেক জনের মধ্যে সফল হচ্ছে। আমার দু'দিন অন্তর জ্বর হয়েছিল, ডাক্তারি ওষুধে, কুইনিন-ইনজেকশনে বন্ধ হয় নি। আমি ভাল হয়েছি ওই ওষুধে। খেতেও হয় নি। একটা পয়সা আর একটা সুপুরী নিয়ে ওখানকার বামেনরা একটা জলজ উদ্ভিদ দলে পিষে হলুদমাখা ন্যাকড়ায় বেঁধে শুঁকতে দিয়েছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুঁক জলে ফেলে দিতে হয়। এও সেই তান্ত্রিকের ওষুধ।

সেই তান্ত্রিকের ওষুধে আর যজ্ঞের ফলে রায়বাড়ীর বধূ রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবী বৎসর খানেক পরেই জীবন্ত-কন্যা প্রসব করলেন। এ প্রত্যাশা সকলেই করেছিলেন, কারণ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি আগে দু'মাস থেকেই বিষণ্ণ হতেন, তিন-চার মাসে ঘরে ঢুকতেন, বোবার মত হয়ে যেতেন। পাঁচ-ছ' মাস থেকে আগুনের মত উগ্র হয়ে উঠে সমস্ত সংসারটাকে দাহন করতেন। এবার তার কিছুই হয়নি।

তান্ত্রিক বলেছিলেন—পুত্র হোক, কন্যা হোক—ব অক্ষর আদিতে রেখে নামকরণ করো।

তান্ত্রিক তখন গত হয়েছেন। কংসাবতীর জলে নৌকাডুবিতে ভেসে গেছেন। সোমেশ্বরের আর আপসোসের সীমা ছিল না। তিনি তান্ত্রিককে কীর্তিহাটে এনে এখানেই বাস করিয়েছিলেন। তান্ত্রিকের প্রায় ক্রীতদাস হয়ে পড়েছিলেন। উগ্র তান্ত্রিক উপদ্রবের শেষ রাখতেন না। কালী-মায়ের পূজক তাঁর ভয়ে পালিয়েছিল। পূজা করতেন তান্ত্রিক নিজেই। বিচিত্র লোক। তাঁর নিজের কাছে ছিল এক শালগ্রাম শিলা—তাঁর পূজা আর কালীর পূজা করতেন একসঙ্গে। শিউরে উঠত সকলে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করত না। কারণ, কাত্যায়নী তখন অন্তঃসত্ত্বা হয়েও সুস্থ স্বাভাবিক আছেন। ওদিকে কলকাতায় একটা প্রকাণ্ড মামলায় জয়ী হয়েছেন সোমেশ্বর।

তান্ত্রিক খবর শুনে হেসে বলেছিলেন, হাহা—হাঃ। হাহা—হাঃ। হবে না। হাহা—হাঃ—সৌভাগ্য-শিলা রাজরাজেশ্বর—হাহা—হাঃ!

এরই কিছুদিন পর।

তান্ত্রিক তখন যেন অতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। কাঁসাইয়ের ওপারে যে জঙ্গলটার কথা এবং যে শিমুলগাছটার কথা আমি বার বার বলেছি, যেখানটাকে তান্ত্রিক চিনেছিলেন এক সিদ্ধাসন বলে, লোকে যেটাকে বলত সিদ্ধেশ্বরীতলা, সেখানে তিনি পঞ্চপর্বের রাত্রে যেতেন সাধনা করতে। রাত্রে যেতেন নৌকা করে, সঙ্গে যেতেন সোমেশ্বর, তাঁকে উত্তর সাধক হবার প্রতিশ্রুতি তিনি করিয়ে নিয়েছিলেন। আর বায়েনদের একজন খুঁজে খুঁজে তাঁকে শব এনে দিত। সেদিন ছিল চতুর্দশীর রাত্রি।

ভাদ্র মাস। কাঁসাই তখন দুকূলপ্লাবিনী। সোমেশ্বর, তান্ত্রিক আর সোমেশ্বরের অতি অনুগত দু'জন—তারা হাড়ি এবং শিবে বাগ্দী, এরা যেত নৌকা নিয়ে। তারা হাড়ি আর শিবে বাগ্দীকে বলা চলে তাল আর বেতাল, যদি সোমেশ্বরকে বলা যায় বিক্রমাদিত্য। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ছাড়াও এরা বন্যায়, অগ্নিদাহে, শত্রুহননে সর্ববিধ কর্মেই সোমেশ্বরের সঙ্গী। এদের হাতে নৌকাখানা কংসাবতীর প্রলয়ঙ্করী উন্মাদনাকে মথিত করে ঠিক ওই জঙ্গলে গাছের গোড়ায় গিয়ে লাগত। এঁরা দুজনে সব উপকরণ নিয়ে গিয়ে উঠতেন শিমুলতলায়। উপকরণ সব সাজিয়ে নিয়ে তান্ত্রিক বলতেন সোমেশ্বরকে —যাঃ।

চলে আসতেন সোমেশ্বর। ফিরে এসে নৌকায় বসতেন। যতক্ষণ না সাড়া দিতেন তান্ত্রিক ততক্ষণ যাবার হুকুম ছিল না। ওদিকে জঙ্গলে থাকত ভরু বায়েন। তার কর্ম ছিল ওই শবটিকে বেশ ভাল ক'রে তালপাতার চ্যাটাইয়ে জড়িয়ে গাছের উপরে বেঁধে রাখা। ভোর-

বেলা উঠে আসতেন তান্ত্রিক। ধরে নিয়ে আসত ভক্ত, তারপর ধরতেন সোমেশ্বর। এনে নৌকায় চাপাতেন। এপারে এসে সেই শেষ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তারা এবং শিবে তাঁকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিত তাঁর ঘরে। সোমেশ্বর স্নান করে চলে যেতেন অন্দরে।

এরই মধ্যে সেদিন ওপার থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ নৌকোখানা গেল উল্টে। ভরা কাঁসাই। তার উপর আকাশে ছিল মেঘ-ঝড়। সমুদ্র খুব দূরে নয়। তুফান এখানে বেশী হয়। নৌকা উল্টে সকলে ডুবল জলে। সোমেশ্বর, শিবে, তারা তিনজনে কোনক্রমে সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠলেন কিন্তু সারারাত্রির সাধনার পর মদ্যপান এবং সাধন-ক্লান্তিতে বিবশচৈতন্য এবং অবশ-দেহ তান্ত্রিক গেল ভেসে। এঁরা কাদা মেখে ঘরে ফিরলেন। তান্ত্রিকের আর সন্ধান মিলল না। হয়তো এখানে তাঁর সাধনা সিদ্ধ হবার নয়, সিদ্ধি অপেক্ষা করছিল গঙ্গাসাগর সঙ্গমে। কাঁসাই হয়ে হলদী। হলদী হয়ে ভাগীরথী। তারপর হিজলীর পাশ দিয়ে ওপাশে কাকদ্বীপকে রেখে রসুলপুরের মোহনা পার হয়ে সাগরদ্বীপে সাগরসঙ্গমের আবর্তের মধ্যে সিদ্ধি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।

সোমেশ্বর লজ্জায় ভয়ে মুহ্যমান হয়ে গেলেন। খোঁজ তিনি করালেন অনেক। কিন্তু পেলেন না। লজ্জা এই জন্যে যে, নিজে বাঁচলেন অথচ তান্ত্রিক শ্যামাকান্তকে বাঁচাতে পারলেন না। ভয়, এরপর যদি বিঘ্ন ঘটে, যদি কাত্যায়নীর উন্মত্ততা দেখা দেয়। কিন্তু তা দেয় নি। তবু তিনি আতঙ্কিত হয়ে বজরায় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কাত্যায়নীকে নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। কীর্তিহাটে যেন আতঙ্ক দেখছিলেন। কলকাতায় জন্ম হল তাঁর প্রথম জীবিত সন্তান—কন্যার। নাম হল বিমলা।

বিমলার অন্নপ্রাশন হল কীর্তিহাটে। শুধু অন্নপ্রাশন নয়—সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকের শালগ্রাম, সৌভাগ্য-শিলা রাজরাজেশ্বরের প্রতিষ্ঠা হল।

খরচ হয়েছিল কুড়ি হাজার টাকা।

রাজরাজেশ্বরের স্বতন্ত্র চত্বর এবং মন্দির—দশ হাজার টাকা। রাজরাজেশ্বরের এক মুকুট তৈরী হয়েছিল সাহেব জুয়েলারদের বাড়ীতে। হীরে বসানো ছিল পাঁচখানা। মিহি মুক্তোর ঝালর ছিল। দাম এক হাজার টাকা।

বাকীটা উৎসব, ভোজন, দান।

যে মামলাটায় জিতেছিলেন, তাতে সোমেশ্বর পেয়েছিলেন এক লক্ষ টাকার ডিক্রী। বাকী আশী হাজার টাকায় কিনেছিলেন নতুন জমিদারী। সেরেস্তা বড় হল। ম্যানেজার বহাল হল নায়েবের বদলে। বরকন্দাজ বহাল হল পশ্চিমদেশী; ভোজপুরী জোয়ান। শিবে-তারার মধ্যে তারা থাকত কলকাতায় সোমেশ্বরের কাছে। শিবে মরেছে বাঘের হাতে। হলদীর মোহনার কাছে গিয়ে আর ফেরেনি।

নতুন ম্যানেজার পাকা লোক ছিলেন, মহিষাদলের রাজা গর্গবাহাদুরদের স্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। দেওয়ানদের নতুন নাম হয়েছে ম্যানেজার। গিরীন্দ্র আচার্য। গর্গবাহাদুরদের কুনজরে পড়েছিলেন। তাঁকে আশ্রয় দিলেন সোমেশ্বর, বসবাস করালেন।

আর আনলেন নবদ্বীপ থেকে রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থকে। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য দীক্ষা

নিয়েছিলেন নবদ্বীপে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের এক বংশধরের কাছে। তিনি গত হয়েছেন, আছেন গুরু-মা। সোমেশ্বর দীক্ষা নিয়েছেন গুরু-মার কাছে। সেই গুরু-মাই দিলেন এই তরুণ ছেলেটিকে, বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স, নিষ্ঠাবান ধার্মিক এবং পণ্ডিত ছেলে, ওঁদেরই জ্ঞাতি। মায়ের পূজায় বা প্রভু রাজরাজেশ্বরের সেবার কোন ত্রুটি হবে না, হতে পারে না।

এ ব্যবস্থা সোমেশ্বরের নয়, এ-ব্যবস্থা কাত্যায়নী দেবীর। তাঁর মস্তিষ্ক এখন সুস্থ। কন্যাকে কোলে নিয়ে বর্ষার পৃথিবীর মত শান্ত শীতলা। তবে মধ্যে মধ্যে ঝড় উঠলে সেটা ছোটখাটো সাইক্লোন হয়ে দাঁড়ায়। দেবসেবায় ত্রুটি হলে তাঁর কন্যার অমঙ্গল হবে। সুতরাং সে-ব্যবস্থা তিনি করলেন। শুধু এখানের নয়, তাঁর পিত্রালয়েরও। এরপর থেকে রায়বংশে কাত্যায়নী দেবী এক দীপ্তিময়ী দেবী।

সমস্ত রায়বংশ, কীর্তিহাট কাত্যায়নী দেবীর ভয়ে কাঁপত।

তিন বছর পর ভূমিষ্ঠ হল পুত্র।

ব দিয়ে নাম। নাম হল বীরেশ্বর রায়। বীরেশ্বরের জন্ম কলকাতায়। সোমেশ্বর রায় তখন কলকাতায় খুব কর্মব্যস্ত। তাঁর অভ্যুদয় হচ্ছে, অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয়। ইংরেজ এ্যাটর্নীর কাছে টণ্ডির কাজ করে আইনে তাঁর খ্যাতি হয়েছে। অনেক বড়ঘরের ল-এজেন্ট হয়েছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার কাছে যান। তিনি পছন্দ করেন। দ্বারকানাথ তখন নুনের দেওয়ানের চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে নানান ব্যবসা করছেন। তাঁর মধ্যে আইনের পরামর্শদাতা হিসেবে নাম তাঁর খুব। তিনি ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি স্থাপন করেছেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর সহকারী ; সোমেশ্বর প্রসন্নকুমারের সহকারী বা সহযোগী। এই সময়টা তখন জমিদারদের একটা দুঃসময়। কোম্পানী নতুন আইন করে লাখেরাজ ব্রহ্মত্র নানকার প্রভৃতির উপর কর ধার্য করতে চেষ্টা করছেন। ওদিকে লিমিটেশন এ্যাক্ট ক'রে লর্ড ওয়েলেসলী জমিদারদের একটা বড় ঘা দিয়ে গেছেন। প্রজার চার বছর খাজনা বাকী হলেই বৎসরান্তে শেষ বছরের খাজনা তামাদি বলে গণ্য হবে। অবশ্য চার বছর খাজনা বাকী হলে শতকরা ২৫ টাকা সুদ জমিদার পাবে। এদেশে সুদ ছিল মহাজনীতে খাজনায় জমিদার সুদও নিতেন না এবং প্রজার খাজনা যত কালেরই বাকী থাক, দিতে সে অস্বীকার করত না। ছ আইন সাত আইন উঠে গেছে। প্রজাকে বেঁধে রেখে খাজনা আদায় করা যায় না। জমিতে গাছ ধান ক্রোক করে টাকা আদায় নিষিদ্ধ হয়েছে। এর উপর এই লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বা তার উপর খাজনা ধার্য হলে জমিদার এবং তার সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছেন রাণী কাত্যায়নী, পাইকপাড়ার রাণী, কান্দীর রাণী। দ্বারকানাথ তাঁর এস্টেটে আইনের পরামর্শদাতা। সোমেশ্বর তাঁর সহকারী। এ-বাড়ী রায়-বংশের স্থাপয়িতা কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের মনিব-বংশ বলতে গেলে। তারপর লালাবাবু এ-বংশের সব অপরাধ মুছে দিয়ে পুণ্যবংশে পরিণত করেছেন। এ-সব লাখেরাজ রাজস্বমুক্ত সম্পত্তি, কোম্পানী সরকারের প্রকাশ্য নীলামে লাখেরাজ বলে সরকারই নীলেম করিয়েছেন, কিনেছিলেন লালাবাবু দেবত্র হিসাবে। বিহারে এবং অযোধ্যা অঞ্চলে বৃন্দাবনের কাছে সে

সম্পত্তি অনেক সম্পত্তি।

এখন কোম্পানীই দাবী করছেন, খাজনা দিতে হবে। নতুন কালে খবরের কাগজ হয়েছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা কুরিয়ার, ইংলিশম্যান। বাংলা কাগজও হয়েছে।

এসবের মধ্যে সোমেশ্বর জড়িয়ে পড়েছেন। তাতে তাঁর প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। তবে তিনি হিসেবী লোক, সব কাজেই হিসেব করে নামেন। রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বন্ধ করবার মত আন্দোলনের বাইরে থেকেছেন। সে-সব ক্ষেত্রে তিনি রাধাকান্ত দেবের দলের লোক। দ্বারকানাথের একখানা মজার পত্র আছে তাতে। তিনি সোমেশ্বরকে লিখেছেন, "আমি জানিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, স্ত্রীর কথায় তুমি সতীদাহ ও বিধবাবিবাহ সমর্থন হইতে পশ্চাদপদ হইতেছ। ইহা লজ্জার কথা। অতীব লজ্জার কথা।" কাত্যায়নী দেবীর ভয়ে সোমেশ্বর রাধাকান্ত দেবের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এ-সবের নজীর থাকে-থাকে সাজানো ছিল এই জানবাজারের বাড়ীতে। এ-সব আমি অনেক পরে-পরে আবিষ্কার করেছি। আগেরটা পেয়েছি পরে, পরেরটা পেয়েছি আগে। তোমাকে বলবার সময় গুছিয়ে বলছি। আর কিছু শুনেছি গল্প, তার বেশীর ভাগ মেজঠাকুমার কাছে।

* * * *

সুলতা, মেজঠাকুমা আমার মধ্যে-মধ্যে দুঃখ করে বলতেন, সুরেশ্বর, ওরে আমার ভয় হয় কি জানিস? ভয় হয় আমার না রাবণের মা নিকষার দশা হয়! রায়বংশের পুরী আগ্‌লে আমাকে না বসে থাকতে হয়, সেই পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত।

সুরেশ্বর বললে—আমি সেদিন সকালে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি সুলতা। আমি সেই মডার্ন আর্টিস্ট, বিদ্রোহী আধ-পাগলা সুরেশ্বর নই; একটা ভাবের ঘোরের মধ্যে চলে গেছি ১৮৩৭-৩৮ সালে। মধ্যে-মধ্যে সোমেশ্বর রায় হতে চেষ্টা করছিলাম। ওই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে কল্পনা করেছি, মনে হয়েছে চোখে তাকে দেখছি। তোমাকে কাত্যায়নী ভাবতে চেষ্টা করেছি, এমন কি ব্রজদার সেই শেফালি মেয়েটিকে ভাবতে চেষ্টা করেছি, সোমেশ্বরের প্রেয়সী-বাঈজী। ওই যাদের হাতে টাকা দিয়ে সেদিন ঘরে যেতে বলে এসেছিলাম, তাদের ভাবতে চেষ্টা করেছি, সোমেশ্বর রায়ের সেবাদাসী ঝি।

সুলতা হেসে ফেললে। বললে—মনে-মনে পরম তৃপ্তি নিশ্চয় পেয়েছিলে। কিন্তু আমার নামটা টানছ কেন? যদি-বা সেদিন তোমার তা মনে হয়ে থাকেই তবে ওটা বাদ দিয়েই বল। ওর জন্যে তোমাকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলার জন্য নরক-দর্শন করতে হবে না, বা তোমার রথখানি মাটির উপরে বাতাসলোকে চলে না যে ধপ করে মাটিতে আছড়ে পড়বে।

হেসে সুরেশ্বর বললে—এত আছাড় খেয়েছি সুলতা যে, তা খেয়ে আছাড়-প্রুফ হয়ে গেছি। পাহাড়ের শিখর থেকে সমতলে পড়েছি, স্বর্গ থেকে নরকে পড়েছি; তা নইলে আজ তোমার এই কথাটিতেই আছড়ে প'ড়ে হাত-পা ভাঙতাম। ঝগড়া করব না, ধরে নাও কাত্যায়নী তোমাকে ভাবি নি। তবে কথাটা এই যে আমি সেদিন সকালে যেন মৃত্যুপুরা

বা অতীত কালের যবনিকা ঠেলে বর্তমানের দিকে পিছন ফিরে অভিভূতের মত হাতড়ে-হাতড়ে চলেছিলাম, হঠাৎ পথ হারিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। এই সময়ে বেলা তখন দশটা, মেজঠাকুমা এলেন, আমাকে চরণোদক দিয়ে নির্মাল্য মাথায় ঠেকিয়ে ওই কথাগুলি বললেন।

অভিভূত সুরেশ্বর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু হয়ে মেজঠাকুমার দিকে তাকালে।

মেজঠাকুমা অত্যন্ত ম্লান হেসে বললেন—ধনেশ্বর গাল দিচ্ছে রে! ওই কথা বলে গাল দিচ্ছে। বলছে, আজ ওই বিশ্বাসঘাতিনীই সুরেশ্বরকে সব লাগাচ্ছে। ধ্বংস করছে মেজ-তরফকে। নিকষার মত হবে তুমি!

সুরেশ্বর বললে—না ঠাকুমা, পুরাণের কোন দুঃখিনীর সঙ্গে যদি তোমাকে তুলনাই করতে হয়, তবে তুমি গান্ধারী। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ ছিলেন বলে সারাজীবন চোখে কাপড় বেঁধে ছিলেন, আলো দেখেন নি। তুমি বিয়ে করেছিলে ষোল বছর বয়সে ষাট বছরের শিবেশ্বর রায়কে। কুশণ্ডিকার হোমের আগুনে তুমি তোমার ষোল থেকে পঞ্চাশ, এই যৌবন কালটিকে আহুতি দিয়ে একেবারে একান্ন বছরের প্রৌঢ়া হয়েছিলে। তুমিই তো দুর্যোধন, দুঃশাসনকে উপেক্ষা করে সত্য কথা বলবে। নইলে কে বলবে বল!

মেজঠাকুমা বললেন—মনটা জুড়িয়ে দিলি ভাই। আমি এখন যাই রে। একবার বাপের বাড়ী যাব, ওপাড়ায়, আমার বিধবা ভাজ খালাস পাচ্ছে। ভুগছে অনেক দিন থেকে। ডাক্তার বলেছে, আজ আর পার হবে না, একবার দেখে আসি।

সুরেশ্বর চমকে উঠে বললে—আর কোন বড় ডাক্তার দেখালে না?

—ডাক্তার? কি হবে?

—মানে?

—মানে বিয়ের এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়েছে। ছেলে নেই, পুলে নেই। লোকের বাড়ী বলতে গেলে খেটে খায়। প্রথম যৌবনে লোকে এত মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েছে যে, বেঁচে ছিল শরশয্যেতে ভীষ্মের মত! আমার থেকেও বছর চারেকের ছোট। কি করবে বেঁচে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল সুরেশ্বর।

মেজঠাকুমা একটু হাসলেন, যে হাসিতে অন্যের চোখে জল আসে। পা বাড়িয়ে আবার ফিরলেন, বললেন—হ্যাঁরে, চায়ের আগে দুখানা বাতাসা দিয়েছিল রঘু? খেয়েছিস?

—বাতাসা?

—হ্যাঁ, রাজরাজেশ্বরের শয্যাভোগ?

—শয্যাভোগ?

—হ্যাঁ। এখানে শয্যাভোগ হয় ঠাকুরের। আমি বাড়ীতে বলে রেখেছিলাম, তারা ভোর বেলাতেই দিয়ে গেছে। আমাকে বললে তারা?

রঘু বললে—হ্যাঁ, উতো দিয়ে গিয়েসে।

—তা দিস নি কেন ?

—উ।

—ওরে বড়লোকের চাকর বড়লোক! উ! মানে উ কি খাবে আমার বাবু! দে এনে দে। খা ভাই। আমি দেখে যাই। খা।

দুখানি ছোট বাতাসা। মেজঠাকুমাই মুখে ফেলে দিলেন। খেতে হল সুরেশ্বরকে। তবে গুড়ের বাতাসা, খারাপ লাগল না।

মেজঠাকুমা বললেন, আগে বরাদ্দ ছিল কাঁচা মিষ্টির। দুটি করে কাঁচা মিষ্টি, ঠাকুরের শয়নের সময় পাশে রেকাবীতে করে রাখা থাকত। আর জল। বরাদ্দ করেছিলেন রাজকুমারী বউ-কাত্যায়নী। ফোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী। লোকে বলত, বাঘিনী ঠাকরুণ। সুরেশ্বর হেসে বললে, সোমেশ্বর রায়কে মেজঠাকুমা বলেন, ফোমেশ্বর রায়। শ্বশুর-স্বামীর নাম তো করতে ছিল না সেকালে। তারপর সুরেশ্বর জের টেনে বললে—মেজঠাকুমা বললেন—তাঁর মেয়ে বিমলা যখন দু বছরের তখন শেষরাত্রে উঠে সে ক্ষিদে পেয়ে কাঁদত। উপরি উপরি দিন কয়ের পর একদিন ঝিকে বললেন—মাথার গোড়ায় দুটো করে মিষ্টি রেখে দিস, আর এক গ্লাস জল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কীর্তিহাটেও তো খুকী-খোকা আছে, মা মুক্তকেশী খুকী আর রাজ-রাজেশ্বর গোপাল! তাহলে তো তাঁদের ক্ষিদে পায়! এই পরদিন উঠেই হুকুম হল, বজরা সাজাও, আমি কীর্তিহাট যাব। এসেই সেই দিন থেকেই এই ব্যবস্থা হল। সেকালে মিষ্টান্ন তৈরী হ'ত বাড়ীতে। বড় বড় গাই ছিল, মোষ ছিল। ঠাকুরবাড়ীতে হালুইকর বামুন ছিল। তারা ক্ষীর করে, ক্ষীরের নাড়ু তৈরী করে দিত। তারপর তোমার ঠাকুরদাদের আমলে চাকরান জমি দেওয়া হয়েছিল ময়রাদের। তারা কাঁচা মিষ্টি দিয়ে যেত। তারপর তোমাদের সেরেস্তা থেকে ময়রার নিজের খাজনার জোতের উপর যখন বাকী খাজনার নালিশ হল, তখন ওই মিষ্টির জমিটা সমেত ভুক্তান করে নালিশ হল। নালিশের ডিক্রীর দায়ে জোত নীলেম হয়ে গেল। কিনলে ধনেশ্বর। তারপর ময়রা মিষ্টি বন্ধ করলে। তখন থেকে দুখানা বাতাসা ব্যবস্থা হল।

হাসলেন মেজঠাকুমা। বললেন—ওবেলা আসব ভাই, এবেলা যাই। ছুঁড়িটাকে বড় ভাল বাসতাম। শেষ দেখাটা করে আসি।

—চল আমি যাই।

—তুই যাবি ?

—যাব না ? তুমি যাচ্ছ, আমি যাব না কেন ?

—আয়। তার ভাগ্য! যাচ্ছিস যদি তবে তার অস্থিটা অন্ততঃ যাতে গঙ্গা পায় তার ব্যবস্থা ক'রে দে ভাই। দেহ নিয়ে আর কেউ যায় না; আর তাতে বাস্‌মড়াও হয়ে যায়। অস্থিটা পাঠিয়ে দে।

—সে তুমি দেবে। তুমি হুকুম করবে, আমি তামিল করব।

বিহ্বল হয়ে গেল মেজঠাকুমা। নীরবেই পথ চলতে লাগল। সদর রাস্তায় না গিয়ে রায়বাড়ীর পাশ দিয়ে স্নানের পুকুর, দুধপুকুরের বাগানের মধ্য দিয়ে চলছিল মেজঠাকুমা।

হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বললে—এই খানটায় গোপেশ্বর সুখেশ্বরকে মেরে ফেলেছিল।

সুরেশ্বর বললে—চল। দুঃখ আর কত করবে ?

মেজঠাকুমা বললেন—তা ঠিক বলেছিস ভাই। দুঃখ আর কত করব। তাই তো এত বড় ঘেন্নার কথার কলঙ্ক দিয়ে সেদিন ওরা যখন গুজব রটালে তখন প্রথমটা বুকে যেন শেল বিঁধেছিল। কি দুঃখ যে হয়েছিল কি বলব ! কিন্তু ওই বলেই বুঝিয়েছি, দুঃখ আর কত করব !

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন—আঃ হায় হায় হায় ! এ্যা ! এ গাছটাও কেটে ফেলেছে ! সামনে একটা প্রকাণ্ড খালের মত গর্ত। কোন বড় গাছ সমূলে কাটার চিহ্ন !

—হ্যাঁ, কোন বড় গাছ ছিল এখানে।

বাগানের সব থেকে বড় আমগাছ ছিল এখানে। গাছটা দুধপুকুরে বাগান করবার সময় কুড়ারাম মশায় রাজকুমারী পুত্রবধূকে দিয়ে পুঁতিয়েছিলেন। মালদা'র আমের গাছ। আঁটির গাছ, গুঁড়িটা ছিল এত মোটা যে, দুটো মানুষে হাত বাড়িয়েও জড়িয়ে ধরতে পারত না। হুঁঃ! বলে একটি আক্ষেপসূচক ধ্বনি তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বললেন—এ সুখেশ্বরের ছেলেদের কাজ ! ওই যে কল্যাণেশ্বর, ওর মত কুটিল আমি দেখি নি। ওর বাপ বাইরে যত ভদ্র ছিল, ভেতরে তেমনি ছিল কুটিল। ওই তো তোর মেজ-ঠাকুরদাকে ঠাকুরদের গয়না বিক্রী করে বিঘে-কতক ডাঙ্গা কেনা হল এই জমাখরচ দেখিয়ে টাকাটা মারবার ফন্দী দিয়েছিল। ঠিকেদারী করে কল্যাণেশ্বর গাছ থেকে তক্তা তৈরী করিয়েছে।

—চল ঠাকুমা বড় বাজে বকছ।

—বাজে বকছি ?

—বকছ না ?

—তুই ছোঁড়া বুঝবি নে রে। এর বেদনা তুই বুঝবি নে। কলকাতার মানুষ তুই, এখানকার তো নস ! জানিস, এ গাছের একটা গল্প আছে। গাছটা তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কাত্যায়নী ঠাকরুন পুকুরে চান করছেন, তখন বয়স পঁয়তাল্লিশের পার। এই গাছে এক ছোঁড়া ডোম উঠেছিল আম পাড়তে। ঠাকরুণ এসে ঘাটে বসেছেন, গায়ের কাপড় খুলে দাসীতে তেল মাখাচ্ছে। ছোঁড়ার কপালে দৈবঘাত, সে ওই রঙ দেখে হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছিল। আর পড়বি-তো-পড় ঠাকরুণের নজরেই পড়। ঠাকরুণ হেঁকেছিলেন, কে রে শূয়ারের বাচ্ছা ! ছোঁড়াটা ভয়ে হুড়মুড় করে ডালে-ডালে পাঁচিলে নেমে লাফিয়ে পড়ে পালিয়েছিল। পাঁচিলের বাইরে এই যে ঢিবিটার উপর দিয়ে যাচ্ছি, এইটেই ছিল তখন ডোমপাড়া। কর্ত্তারাই বসিয়েছিলেন। বাড়ীতে তারা জমাদারের কাজ করত। ঠাকরুণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাসীকে বলেছিলেন, মাহুতকে বল জংবাহাদুরকে পাঁচিলের ওপাশে নিয়ে আসবে। পিঠে সাজটাজের দরকার নেই। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। হারামজাদী ছেলে-দুলে আস্তে-আস্তে যাবি নি, দৌড়ে যাবি। বুঝলি—আমি একশো গুনব। তার মধ্যে না

এলে ঝাঁটা-পেটা করব। যা। একশোর মধ্যেই সে এনেছিল। তারপর বোধ হয় দুশো-তিনশো গুনতে গুনতে হাতী এল। হুকুম হল, ডোমরা সব জিনিসপত্র বের করে নাও ঘর থেকে! পাঁচশো গুনব আমি। তারপর হাতী ঘর ভেঙে দেবে। কাত্যায়নী ঠাকরুণ বাঘিনী ঠাকরুণ। ডোমরা বাদ-প্রতিবাদ করেনি, বেরিয়ে এসে সরে দাঁড়িয়েছিল। ঠাকরুণ মাহুতকে বলেছিলেন, সমশের জংবাহাদুরকে বল—পাড়াটা ভেঙে মাঠ করে দেবে। তারপর অবিশ্যি ডোমদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল, ঘর করবার জন্যে, টাকা, খড়, বাঁশ, তালগাছ দেওয়া হয়েছিল, তা হয়েছিল। কিন্তু ওই ছোঁড়াটাকে গাছে বেঁধে দশকোড়া লাগিয়েছিল চাপরাশীরা। এ গাছটা সেই গাছ রে!

৬

সুরেশ্বর এসে ভালই করেছিল, নইলে হতভাগিনী বিধবার শেষকৃত্যটাও হত জীবনকালের বেঁচে থাকার লাঞ্ছনার চেয়েও কঠিনতর লাঞ্ছনার মধ্যে।

একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঘোঁট পাকিয়েছে—এর প্রায়শ্চিত্ত হয় নি। একজন ম্যাট্রিক ফেল হাফ-মাতব্বর ছেলে বলেছে—ডাক্তারের কাছে শুনেছে রোগটা টিবি ইন্টেস্টাইন।

প্রবীণদের মধ্যে কয়েকজন ধনেশ্বরের নেতৃত্বে আলোচনা করেছেন, ওর যৌবনে যে অপবাদ হয়েছিল তা অপবাদ নয় সত্য। তার জন্য ওকে কোন যজ্ঞিতে রাঁধতে পর্যন্ত কাঠি দিতে দেওয়া হ'ত না। এ ক্ষেত্রে অন্তত প্রায়শ্চিত্ত একটা হয়ে থাকলে কথা ছিল না। কিন্তু যখন হয় নি তখন এতে কে কাঁধ দেবে!

ধনেশ্বর বলছেন—আমাদের স্টেট থেকে পাঁচ টাকা দেবার কথা ছিল এইসব অনাথা দরিদ্রের সৎকারের জন্যে। তাই বা কি করে দেব? এ তো একরকম ধর্মচ্যুত! রায়বাড়ীর দলিলে এ নিয়ে দুটি নির্দেশ আছে। এক, ওই পাঁচ টাকা বরাদ্দ। দুই রায়বাড়ীর দেবোত্তরের ট্রাস্টি, যাঁর পালা পড়বে দেবোত্তরে, তাঁর তরফ থেকে কারুকে উপস্থিত থাকতে হবে।

পালাটা এখন ধনেশ্বরদের। ধনেশ্বর এসেছেন। তা ছাড়াও যার বাড়ী কেউ মারা যায় সেখানে ধনেশ্বর পালা থাক বা না-থাক যান। এখানে তাঁর উদারতা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু অধর্মের কাজ তিনি করবেন না।

প্রতিবাদ করছে অতুলেশ্বর। শিবেশ্বরের ছোট ছেলে। যে ম্যাট্রিক ফেল করে কংগ্রেস করে বেড়ায়। ১৯৩০ সাল থেকে অগ্নিগর্ভ মেদিনীপুর কংগ্রেস। তবে ভাগ্য ওর ভাল আর ধরা পড়ে নি। গ্রামে প্রায়ই থাকে না। কংগ্রেস করে কীর্তিহাটের বাইরে। সে হঠাৎ গ্রামে এসে গেছে আজকের দিনটিতেই।

অতুলেশ্বর দাদাকে প্রশ্ন করছে—তাহলে হবেটা কি? পচবে ঘরে? গ্রামের মধ্যে?

প্রশ্নটা মারাত্মক, এর জবাবে আমি কি জানি বলা চলে না। যাদের মড়া তারা যা হয় করবে এও বলা চলে না, কারণ মেয়েটি সামান্যমাত্র একখানা ঘর সম্বল করেই কোনক্রমে দিনপাত করে এসেছে। তার শ্বশুরবংশের অন্যদের সঙ্গে পৃথক অনেকদিন।

সুরেশ্বর এবং মেজঠাকুমা এসে উপস্থিত হলেন এই মুহূর্তটিতেই। ধনেশ্বর বলে উঠল—দুর্গা দুর্গা।

দুর্গা শব্দটির ব্যঞ্জনা এখানে অনেক গভীর ছিল, স্থূলতা। ধনেশ্বরকাকার দুর্গা স্মরণে আমার শরীরে পর্যন্ত জ্বালা ধরেছিল। কিন্তু মেজঠাকুমা দেখলাম অবিচল। বললেন—হতভাগী সত্যিই মরেছে না এখন বেঁচে থাকতেই হচ্ছে কথাগুলো?

অতুলেশ্বর বললে—কি রে? তুই তো ভিতরেই ছিলি! বললে সে রায়দের জ্ঞাতি ভটচায-দের একটি ছেলেকে।

সে বললে—না মারা গেছে তা আধঘণ্টা হবে! ওই মেজমাকে খবর যখন পাঠালাম তখনও উ—আঁ করছিল, তারপর যখন চুপ করেছে তখনই বোধহয় হয়ে গেছে। গ্রহণীর রুগী তো! একটু দেখে—আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম—চোখ স্থির হয়ে গেছে, নিশ্বেসও পড়ছে না।

মেজঠাকুমা ভিতরে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন—না, গেছে। খালাস পেয়েছে। তা ওর গতির কি হবে বাবা ধনেশ্বর?

—কি হবে? অনেকে বলছে এটা ওর পেটের যক্ষ্মা। ভয়ঙ্কর সর্বনেশে রোগ। তাছাড়া তোমার তো অজানা নয়, ঠাকুর-দেবতা ব্রাহ্মণভোজনে ভটচাজবাড়ীর বউ হয়েও ছুঁতে নাড়তে পেত না। এখন কাকে বলব—যাও হে গতি ক'রে দিয়ে এস।

—কিন্তু লোকে তো ওর হাতে খেতো। তোমার বাবাও খেয়েছেন। আমার কাছে যখন যেতো ও তখনই বলতেন, নেড়ী, একটা কিছু রান্না করে দিয়ে যা। তোর হাত নয়তো, অমৃত।

ধনেশ্বর বলে উঠল—সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ওটা মানুষের একটা ব্যাধি। তা নইলে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তোমার সঙ্গেই বা গিঠ বাঁধবেন কেন? আর তুমিই বা ঘাটে বসে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখবে কেন?

মুহূর্তে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু কুৎসিত কিছুই নয় ভয়ঙ্কর কিছুও যেন তার সঙ্গে সেই জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়ল। আমিও কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু মেজঠাকুমা সেই মুহূর্তটি বোধকরি একমুহূর্তের জন্য রায়গিন্নী হয়ে উঠলেন। বললেন—তোমার মুখ দেখলে পাপ হয় ধনেশ্বর! তুমি এখান থেকে যাও! গোপেশ্বরের বাপ তো তুমি!

আশ্চর্য শক্তি ছিল ওই কণ্ঠের মধ্যে, কথার মধ্যে। ধনেশ্বর যে ধনেশ্বর সেও একেবারে বোবা হয়ে গেল। মুখখানা হয়ে গেল ফ্যাকাসে! সমস্ত জনতাও স্তব্ধ হয়ে রইল। ফিস্-ফাস্ করেও কেউ একটি কথা বললে না।

মেজঠাকুমা বললেন—একখানা গরুর গাড়ী কেউ এনে দেবে, গাড়ীর দাম দেব আমি। আমিই ওকে গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসব।

ধনেশ্বর মাথা হেঁট করে একটি কথা না বলে ওখান থেকে চলে গেল।

আমি তখন কথা ফিরে পেলাম, বললাম—তুমি চুপ কর মেজঠাকুমা, আমি ব্যবস্থা করছি। না হয় ইস্কুলে যাচ্ছি, সেখান থেকে ছেলেদের ডেকে আনছি, তাদের নিয়ে আমি যাব।

অতুলেশ্বর এগিয়ে এল, বললে—রাজী তো আমরাই রয়েছি।

এর পর আর কোন বেগই পেতে হয় নি। মেজঠাকুমার বিধবা ভাজের সৎকার হয়ে গেল নির্বিবাদে। লোক অনেকগুলিই হল। তবু আমি গেলাম সঙ্গে। মেজঠাকুমা একবার বললেন—তুই যাবি? শরীরে—

হেসে বললাম—শরীরটা কি আমার ননীর পুতুলের মত মেজঠাকমা? আমি ইচ্ছে করলে তো ওই হাড় ক'খানাকে একলাই ঘাড়ে করে দিয়ে আসতে পারি! পারি না?

—রায়বাবুরা সব পারে। তা—যা। বারণ করব না। হতভাগী চিরকাল ভাগ্যের লাথি ঝাঁটাই খেয়েছে। মরবার পর যদি এইটে ওর ভাগ্যে ছিল যে তুই ওর শ্মশানবন্ধু হবি, ঘাটের খেয়ায় তুইও থেকে ওকে তুলে দিয়ে আসবি, তাহলে সেটাতে আর আমি বাগড়া দি কেন? যা!

অতুলেশ্বর এসে বললে—একটু এদিকে শোন। বয়সে ছোট অতুলেশ্বর আমার সম্বন্ধে খুড়ো। তুমি বলে ডাকলে। কথা বললে এই প্রথম। বললে—শ্মশানে যারা যায় তারা কিছু নেশা ভাঙ করে। কেউ মদ কেউ গাঁজা। তা—

বললাম—বেশ তো। সে এদেশে সর্বত্রই করে। শিবঠাকুরের এলাকা। বলে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে দশ টাকার নোট একখানা বের করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল খাট চাই, জিনিসপত্র চাই। বললাম—খাট-টাটের ব্যবস্থাও তো করতে হবে।

হেসে অতুলেশ্বর বললে—এখানে খাট-খাটিয়া নেই, বাঁশের মাচান বেঁধে নিয়ে যায়। আগে রায়বাড়ীতে খাটের রেওয়াজ ছিল, এখন সেখানেও বাঁশের মাচান। সুখেশ্বরদা বাবা একদিনে গেলেন—সে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এমন ব্যাপারটা না হলে অন্তত বাবার জন্যে ঘরের খাটই একখানা দেওয়া হত। কিন্তু সে হয় নি ওই ব্যাপারটার জন্যে। সুখেশ্বরদার লাশ, পুলিস পোস্ট মর্টেমের জন্যে নিয়ে গেল গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে মেদিনীপুর। বাবার দেহটা এইখানেই ছেড়ে দিলে বোনাফাইডি সুইসাইড বলে। বাবা গেছেন বাঁশের মাচায়। খাট বের করবার কথা কেউ মুখেও আনে নি।

চমৎকার কথা বলে অতুলেশ্বর। মেদিনীপুরী টান অবশ্যই আছে। কিন্তু বাঁধুনীতে গাঁথুনীতে শহরের বাগ্‌বিন্যাস থেকে মলিন নয়।

অতুলেশ্বরই বললে—বাঁশের ব্যবস্থা আছে। ওই কাঁসাইয়ের জঙ্গলে বাঁশ আছে, ওটা দেবোত্তরের সম্পত্তি, কিন্তু গ্রামের কারুর মৃত্যু হলে ওখান থেকে বাঁশ পায়। শুকনো গাছ দু-চারটে থাকেই। কাঠও কেটে নেয় ওখান থেকে। তবে নতুন কাপড় চাই একখানা, খানিকটা ঘি, একটুকরো সোনা, একটুকরো রূপো, বালি, কুঁচকাঠি, তা আরও পাঁচটা টাকা দাও। ওতেই হয়ে যাবে।

নোট আর একখানা দশ টাকারই দিলাম। বললাম—বাকিটা এখন রাখ।

মেয়েটার দেহ বের করতে আমিও গিয়েছিলাম। বোধ হয় মেজঠাকুমাকে খুশী করতেই। দুর্গন্ধে আমার বমি আসছিল। বহু কষ্টেই দমন করে বের করে আনলাম। মেজঠাকুমা বোধ হয় দেখলেন না, কারণ তিনি উপু হয়ে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে

কাঁদছিলেন।

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গিয়েছিল। মেয়েটির বাড়ী হয়ে ফিরতে হয়, সেখানে তখনও মেজঠাকুমা বসে ছিলেন, বাইরে পোড়া মালসায় আগুন রেখে এবং দরজার পাশে নিম রেখে। কিছু মিষ্টিও আনিয়ে রেখেছিলেন। এ টাকাটা উনি দিয়েছিলেন। আমি বললাম—মিষ্টি আমি খাব না ঠাকুমা।

অতুল বললে—ও বমি করেছে ওখানে গিয়ে। ওকে বারবার বললাম—তুমি কাঁধ দিয়ো না। ভীষণ দুর্গন্ধ। ও শুনলে না। শ্মশানে গিয়েই হড় হড় করে বমি করে ফেললে। কি করব ফিরে পাঠাতেও পারলাম না। ও—ও এল না। আমি ভাবলাম—ফিরে পাঠালে দুর্নাম করবে, বলবে কলকাতার বাবু!

মেজঠাকুমা বললেন—একটা কণা ভেঙে মুখে দে। তার তৃপ্তি হবে। ওর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা গোটা আষ্টেক টাকা পেলাম—পয়সায় সিকিতে আধুলীতে টাকায়। বোধহয় শেষ কাজের জন্যেই রেখেছিল। তুই ওর ছেলের কাজ করলি, বাপের কাজ করলি, সধবা হলে বলতাম স্বামীর কাজ করলি। নে, একটু ভেঙে নে। কই তোর গা দেখি!

বুকে হাতের উল্টো পিঠটা ঠেকিয়ে বললে—গা গরম হয়েছে সুরেশ্বর! দাঁড়া আমি সঙ্গে যাই। বলেই ডাকলে—রাধারমণ!

রাধারমণ মেজঠাকুমার আর এক ভাই। সেও আমাদের সঙ্গে শ্মশানে গিয়েছিল। তাকে বললেন—বউ আর তুই সব ব্যবস্থা কর এবার। বুঝলি, আমি চললাম।

আলো নিয়ে ভিকু শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিল। পাঠিয়েছিলেন মেজঠাকুমাই। বললেন—চল্ ভিকু!

নীরবে পথ হাঁটছিলেন, হঠাৎ বললেন—চল্ ঠাকুরবাড়ী হয়ে চল্। প্রণাম করে চরণোদক নিয়ে যাবি।

ধনেশ্বর কারণ নিয়ে সন্ধ্যা করছিল, বার দুই কালী কালী বলে গম্ভীরস্বরে ডেকে উঠলেন। প্রণবেশ্বর, কল্যাণেশ্বর এবং কয়েকজনই বসে ছিল কাছারীর দাওয়ায়।

প্রণবেশ্বর বললে—শ্মশানে গেছলে?

বললাম—হ্যাঁ।

—বড় বাড়াবাড়ি করছ। এত কেন?

কল্যাণেশ্বর বললে—তুমি এবার এম-এল-এ হবার জন্য দাঁড়াও সুরোদা। আমরা প্রাণপণে খাটব। টাকা আছে। তার উপর যা নাম হয়ে গেল না ঠিক বেরিয়ে যাবে!

আমি কিছু বলবার আগেই মেজঠাকুমা বললেন—কল্যাণ, দুধপুকুরের সব থেকে বড় আম গাছটা—যেটার নাম ছিল গিন্নীর গাছ—সেটা কে কাটলে রে? তুই?

—কি?

—দুধপুকুরের গিন্নীর গাছটা! তুই কেটেছিস আমাকে বললে—

—কে বললে?

—বললে তোর যারা মজুর খাটে তারা।

—হ্যাঁ, সেটা বাবার আর দাদুর শ্রাদ্ধের সময় কাটিয়েছি।

—সে সব শ্রাদ্ধ তিন দিনে হয়েছে। বারোটি ক'রে বামুন খেয়েছে, তুই এতবড় গাছটা ক্যাটালি—

—কি— ? হঠাৎ সন্ধ্যারত ধনেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন—দুধপুকুরের পাড়ের গিন্নীর গাছ ? তাতে যে একশোখানা তক্তা হবে ! আমি পিতৃশোকে ভ্রাতৃশোকে পুত্রের লজ্জায় কাতর সেই ফাঁকে—

নাটমন্দিরটা কুৎসিত কোলাহলে ভরে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—ঠাকুমা, আমার শরীরটা বড় ক্লান্ত—

—চল্ ভাই চল্ ! না, একটু দাঁড়া। ঘোষালমশাই !

ঘোষাল সুরেশ্বরের নিজস্ব কর্মচারী। ঘোষাল এসে বাইরে দাঁড়াল। মেজঠাকুমা বললেন সুরেশ্বরের একটু জ্বর হয়েছে, ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠান।

জ্বর নেহাৎ একটু নয়, টেম্পারেচার উঠল একশো চার। তার উপর সর্বাঙ্গে বেদনা, কাঁধের ব্যথাটা অসহ্য।

ডাক্তার অ্যাসপিরিনের পুরিয়া তাঁর ব্যাগ থেকেই বের করে দিয়ে গেলেন। সুলতা, আমার ভিতরটা তৃষিত হয়েছিল স্কচ হুইস্কির জন্যে। শ্মশানে আমি ভাল ছেলে সাজবার অভিপ্রায়ে ঠিক নয়, ওই ওদের সঙ্গে দেশী কারণ পান করি নি। করতে পারি নি।

এখানে মেজঠাকুমা বসে। রঘুকে বরাত করতে পারছিলাম না। বললাম—ঠাকুমা, তুমিও তো সারাদিন বসে। বোধহয় খাও নি কিছু। যাও বাড়ী গিয়ে খাও। তুমি ভেবো না, ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বলে আমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে যাব !

মেজঠাকুমা বললেন—না। রঘু—যে ঘরে বউমা, তোর বাবুর মা এসে থাকতেন ওইটে পরিষ্কার ক'রে দে। আমি ওখানেই কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যে করে নেব। শোবও ওই ঘরে। একবার চল্ আমার সঙ্গে ও বাড়ী, কখানা কাপড় আর পুজোর ঝোলাটা নিয়ে আসব।

—কি দরকার ঠাকমা। কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ ?

—ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখা নিয়ে যে কেলেঙ্কারী করছে ধনেশ্বর তারপর প্রকাশ্যে কপালে কৃষ্ণনামের ছাপ না আঁকলে তো রাধার পুজো লোকে করত না রে ! আমার ষোল বছরে ছেলে হলে তার বয়স আজ একুশ বাইশ হ'ত। তুই না হয় আমার নাতি—পৌত্র। ভাসুর-পোর ছেলে। আমি ঠাকুমা। সেই ঠাকুমা হয়ে এই বাড়ীতে বাসা গাড়ব, দেখি কার সাধ্যি আমাকে কি বলে এরপর। চল্ রঘু ! ভিকু বাবুর কাছে বস্। রাত্রে আজ দুজনেই থাকবি। বাবুর জ্বর।

ঠাকুমা নিচে নেমে দরজা খুলতেই আমি উঠে গিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে ফিরে এসে শুলাম। এবং শরীরের ক্লান্তি তাঁর সঙ্গে হুইস্কী ও অ্যাসপিরিনের যৌগিক ক্রিয়ায় ঠাকুমা ফিরবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভেঙে ছিল অনেকটা রাত্রে, তখন অ্যাসপিরিনের ক্রিয়া শেষ হয়েছে। গায়ের মাথার

বেদনা ধীরে ধীরে অ্যাসপিরিনের বাঁধ ভেঙে বাঁধা জলের আস্তে আস্তে ঝ'রে ঝ'রে একসময় সশব্দে ভেঙে নামার পড়ার মত জেগে উঠল। আমি কাতরে উঠলাম—আঃ! পাশ ফিরে শুলাম।

ও-ঘর থেকে সাড়া উঠল। কেউ যেন উঠে দরজার কাছে এল। রঘুর নাক ডাকার শব্দ পাচ্ছি। সে আমার খাটের পাশেই মেঝেতে শুয়ে আছে। আর একটা পুরিয়া খেতে হবে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা পেয়েছে। হুইস্কীর রিঅ্যাকশনও বটে, তার সঙ্গে জরের উত্তাপেও জলের তৃষ্ণা আছে।

দরজাটা খুলে গেল। বললাম—কে? ঠিক মনে ছিল না মেজঠাকুমা এখানে আছেন সে কথা। মেজঠাকুমা উত্তর দিলেন—আমি।

—মেজঠাকুমা!

—হ্যাঁ। তিনি ঘরে এসে ঘরের কোণে টিপয়ের আড়াল থেকে নীল কাচ দেওয়া হ্যারিকেনটা বের করে উস্কে দিয়ে টিপয়ের উপরে রাখলেন। এবং এসে খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন—কাতরাচ্ছিস কেন?

বললাম—দেখ তো জল কোথায়!

জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন। আমি একটু উঠে এক নিঃশ্বাসে জলের গ্লাসটা শেষ ক'রে বললাম—ওষুধের পুরিয়া দাও, আরও জল আন। গায়ের উত্তাপটা বেড়েছে কিনা দেখ দেখি।

গায়ে হাত দিয়ে দেখে বললেন—বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার অ্যাসপিরিন খাবি? আর এই জ্বরে ও ছাই গিল্‌লি কেন?—

—কি?

—কি আর? রায়বংশের যাতে নাড়ী কাটা!

—তুমি টের পেয়েছ?

—পাব না? ও-বাড়ী থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই দেখি সৌরভে সুবাসে ঘর মো-মো করছে। আমি জানি তুই খাস।

বললাম—বকবে না?

—বকব? অন্নপ্রাশনের সময় সেকালে সোনার ছোট্ট গ্লাসে কালীমার প্রসাদী কারণ দিত, তাই ঠেকিয়ে দিত ছেলের মুখে।

বললাম—তাই নাকি?

বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু এখন ঘুমো। মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

তিনি মাথায় হাত বুলতে লাগলেন। কিন্তু ঘুম আমার এল না। বললাম—ওই জানালাটা খুলে দাও। কাঁসাইয়ের ধার থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে।

—ওটা আমিই বন্ধ করে দিয়েছি। জলো বাতাস তো।

—তা হোক। ওতে ক্ষতি হবে না।

—তার থেকে আমি বাতাস করি।

—বেশ।

পাখা ঘুরতে লাগল। বললেন—টানাপাখাটা মেরামত করিয়ে নে না। টানবার লোক অনেক মিলবে।

—পাখা কোথায় ?

—পাখা কোথায় ? বাবা, পঞ্চাশখানা পাখা চলত সেকালে। ছোট ঘরে একটা বড় ঘরে জোড়া। যে পাখা টানত তার হাত-পা কোনখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত আর দড়ির অপর দিকটা থাকত বিছানায়। পাখা টানতে টানতে বন্ধ হলে সেই দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়ত আর হাঁক উঠত, এ্যাও হারামজাদা! কাত্যায়নী ঠাকরুণের আমলে বিধি ছিল রাত্রে যে পাখাওলা য'বার থামবে, সকালে তাকে জওলাপ্রসাদের কাছে তত দু কিল ক'রে খেতে হবে। জওলা না কি একবারে দেড় সের আটা খেতো, পাওভর ঘিউ খেতো। বরাদ্দ ছিল ভাণ্ডার থেকে। খোরাক আর তার ওপর মাইনে পেতো তিন টাকা। সারারাত ছাদে জেগে পাহারা দিত আর হেঁকে হেঁকে ফিরত—অঃ—হ্—হ! অ—হ্—হ! হৈ! সারারাত। জওলা থামলেই কাত্যায়নী হাঁকতেন—জওলাপরসাদ, থামলে কেন? জওলা বলত—তনি তিয়াস পাইল। পানি খাইছিলাম মাঈজী!

থেমে কাত্যায়নীর কথায় ছেদ টেনে বললেন—পাখা ওই নিচের তলার একটা ঘরে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। সবই ভাঙা। তবু দু-চারটে কি ভাল থাকবে না! থাকবে। একটু মেরামত করিয়ে কাপড় লাগিয়ে টাঙালেই নতুন। ছাদে কড়িতে কড়া-টড়া সব লাগানো আছে।

—সে হবে। তুমি কাত্যায়নীর গল্প বল তো!

—ওরে বাবা! সে তো মহাভারতের একটা পর্ব রে! তার ভয়ে শুধু রায়বাড়ী নয় খোদ কর্তা সোমেশ্বর রায় পর্যন্ত টটরস্ত।

* * * *

অসুখে ভুগেছিলাম সুলতা সাতদিন। সাতদিন ধরে গল্প করেছিলেন মেজঠাকুমা কাত্যায়নী দেবীর।

সন্তান হয়ে বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠে কাত্যায়নী স্বামী থেকে আরম্ভ করে জমাদারনী পর্যন্ত এবং কলকাতা থেকে কীর্তিহাট পর্যন্ত কঠিন শাসনে নিয়ন্ত্রিত করে আশ্চর্য শৃঙ্খলায় বদ্ধ করেছিলেন।

স্বামীর কলকাতা ছেড়ে আসবার সময় ছিল না। কাত্যায়নী নিয়মিত আসতেন কীর্তি-হাটে। যে দেবতার দয়ায় তাঁর সন্তান বেঁচেছে, তিনি সুস্থ হয়েছেন, তাঁর প্রতি ভক্তির অন্ত ছিল না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুজো করাতেন, ভোগ শেষ হলে বাড়ী ফিরতেন। তারপর তাঁর রান্না চড়ত। সেই রান্না হ'লে খেতেন। সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমোতেন। সন্ধ্যের পর উঠে গা ধোওয়া চুল বাঁধা শেষ ক'রে আসতেন ঠাকুরবাড়ী, সেখানে আরতি, শীতলভোগ, শয়নের ব্যবস্থা ক'রে এসে বসতেন কাছারীর ঘরে। ফটক বন্ধ হ'ত। আমলা মুহুরী ছাড়া কেউ থাকত না। তিনি বিষয়ের কথা বলতেন ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্যের সঙ্গে। কোথায় কোন

মামলা হচ্ছে, কোথায় কোন্ সম্পত্তি বিক্রী হচ্ছে, খবর নিয়ে বাড়ী ফিরে জল খেতেন। তখন খাবার করা শুরু হ'ত। লুচি তরকারি মাছ ক্ষীর সব তৈরী হ'ত সেই সময়। মেয়ে বিমলা ছেলে বীরেশ্বর মানুষ হত দুজন সুন্দরী সুশ্রী ভদ্রঘরের মেয়ের হাতে। তিনি শুধু খোঁজ নিতেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়, আর কয়েকবার স্তন দিতেন কোলের সন্তান ছেলেকে। রাত্রে খেতে বসতেন ঘরে, বাইরে বারান্দায় এসে বসত ভাণ্ডারী সরকার চাকর ঝিদের প্রধানরা, আর ছিল একজন তার ভার ছিল গ্রামখবরদারির। ঝি চাকরের সর্দারেরা কোন্ চাকর কোন্ ঝি কি দোষ করেছে তা পেশ করত, তিনি বিচার করে দণ্ড দিতেন। ভাণ্ডারী বলত কি আছে কি নাই। সরকার লিখে নিত, কাত্যায়নী বলতেন, কত কি আসবে। গ্রামখবরদারির লোক গ্রামের খবর বলত। কোথায় কে রায়বাড়ীর নিন্দে করেছে, কে ভাল বলেছে, কার বাড়ীতে অসুখ, কার অভাব—নিবেদন করত। সরকারকে হুকুম দিতেন খোঁজ করতে, অভাবীর ঘরে চাল-ডাল পৌঁছে দিতে; অসুখের জন্যে বাড়ীর বাঁধা বদ্যিকে বলতে। আর নিন্দে-বান্দার কৈফিয়ৎ নিতে তাদের ডাক পড়ত খোদ তাঁর কাছে। যারা প্রশংসা করত, তাদেরও তিনি সম্মান করতেন। নোট করা থাকত; কোন উপলক্ষে—বিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন—কিছু তাদের বাড়ী হলেই হয় দামী কাপড়, নয় সোনার কিছু, নয়তো নোকুতো বলে এক টাকা দু'টাকার জায়গায় দশ টাকা দিতে হুকুম দিত।

এই সময় ভাই, দেশ থেকে 'সতী যাওয়া' উঠিয়ে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল দেশের সব মাতব্বরেরা। কেউ রাজা, কেউ জমিদার—সব সায়েবী মতের বড়লোকরা। তার মধ্যে দ্বারকা ঠাকুর ছিলেন মাথার লোক। এই রবি ঠাকুরের ঠাকুরদাদা। তাঁর সঙ্গে সোমেশ্বর রায়ের জানাশোনা দহরম-মহরম ছিল। ওঁরা একবয়সী ছিলেন। তাছাড়া উনি ছিলেন নুনের দেওয়ান। আর সোমেশ্বর রায় কাঁথি তমলুকে হলদীর ধারে তখন নুন তৈরীর 'খালারী' বন্দোবস্ত নিয়ে নুনের কারবার করতেন। সেজন্য ঠাকুরবাবুর কাছে যাওয়া-আসা করতে হত। ঠাকুরবাবু কড়া লোক ছিলেন। আর ইনি খুব হুঁসিয়ার ব্যবসাদার ছিলেন। ওঁর সায়ে সায় দিতেই হত তাঁকে।

কাত্যায়নী ঠাকরুণ তখন কীর্তিহাটে এসে রয়েছেন।

হাসলেন মেজঠাকুমা। বললেন, তখন তো তাঁর স্বামীর শখ মিটেছে। মানে—মেয়ে হয়েছে একটি, ছেলে হয়েছে একটি, আর কি দরকার স্বামীতে? কিন্তু—কথা শেষ না করে বেশ একটু সশব্দে হেসে উঠলেন।

অস্পষ্ট আবছায়ার মত নীল লণ্ঠনের আলোয় সুরেশ্বর খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে শুনছিল। বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে, একফালি জ্যোৎস্না তেরচা হয়ে একপাল্লা জানালার গায়ে লেগে যেন মেঝের উপর পিছলে পড়েছে। হাসির শব্দে সে মেজঠাকুমার মুখের দিকে তাকালে। বললে, হাসলে কেন?

—হাসলাম তোমাদের গুষ্টির ধারা মনে করে।

—কি সেটা?

—সেটা? সেটা হল—যেটা এখনও তোমার মধ্যে দেখছি নে সেইটে। রায়বাড়ীর

বেটাছেলেরা একলা বিছানায় শুতে পারে না। কাত্যায়নীদেবীর সবসুদ্ধ সাতটা ছেলে। তার মধ্যে শেষের দুটো বেঁচেছে। কাত্যায়নীর শরীর ছিল দুর্বল। তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে সরে আসতেন তার ওটাও একটা কারণ। স্বামীর জন্যে দুটো সেবাদাসী নিজে দেখে পছন্দ করে বহাল করে দিয়ে এসেছেন। তার ওপর বাঈজী আছে। এখন আর সেবাদাসীদের চাকরী যেত না। মাথা গরম তো সেরে গিয়েছিল।

সুরেশ্বর অতি বিষণ্ণ হাসি হাসলে। বললে, মিথ্যে দোষ তুমি দাও নি ঠাকুমা! বাবার কথা মনে পড়ছে। বাবার মত মানুষ তো আমি কমই দেখেছি। এত পণ্ডিত, এমন ভদ্রলোক! আর মাকে আমাকে কি ভালোই বাসতেন! তিনি—।

—তুই এবার ঘুমুতে চেষ্টা কর, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি। কথা থাক। চোখই বুজে ছিল সুরেশ্বর। মাথায় লঘু চালনায় মেজঠাকুমার হাতখানি ঘুরছিল। সুরেশ্বর বললে, চুলগুলো বরং টানো ঠাকুমা, ওরকম করে দিলে সুড়সুড়ি লাগছে। না, আরও জোরে টানো। টানো না যত জোর আছে তোমার। মা দুর্গার অসুরের চুল টানার মত টানো না!

মেজঠাকুমা বললেন—বোঁটায় কেন থাড়া, না বংশাবলীর ধারা। তোর মেজঠাকুরদার এই রোগ ছিল। একবার চুল টানতে টানতে আমার চুল এসেছে, টানতে টানতে হাতেও ব্যথা ধরেছে। উনিও যেন ঘুমিয়েছেন। আমি টানা ছেড়ে এমনি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েছি। আর চমকে জেগে উঠে দিলেন হাত ছুঁড়ে। লাগল আমার নাকে। রক্ত পড়তে লাগল। তখন বলে, এমনি সুড়সুড়ি দেয়, আমার মনে হল বিছেটিছে কিছু বেড়াচ্ছে চুলের মধ্যে।

হেসে সুরেশ্বর বললে, মেজঠাকুরদাকে তুমি খুবই ভালবাসতে, না মেজদি?

অত্যন্ত প্রসন্ন ধীরকণ্ঠে বললেন মেজঠাকুমা, আমি খুব সুখী হয়েছিলাম সুরেশ্বর। মিথ্যে বলব না ভাই তোর কাছে, প্রথম যখন বিয়ে হয়, তখন বুড়ো বলে দুঃখু হয়েছিল, কেঁদে-ছিলাম। কিন্তু কেরমে কেরমে দুঃখ কোথায় গেল জানি নে, মনে হত আমি খুব সুখী। তবে যদি বলিস, সুখ কাকে বলে তুমি জানোই না, তবে তার জবাব আমার নেই। যা পেয়েছি, তাই অঢেল। ওঁর জন্যে লজ্জা অনেক পেতাম। উনি যেসব কাজকর্ম করেছেন, সেসব তো চোখেই দেখছিস। আমি বারণ করলেও শুনতেন না। কাত্যায়নী ঠাকরুণের মত দাপটও আমার ছিল না, তিনি ছিলেন রাজকন্যে। রাজবংশ। আমি পুজুরী বামুনের মেয়ে। সে ক্ষমতাও ছিল না। তবে বেশী লজ্জা পেতাম ওঁর মেজবউ মেজবউ রব তোলা বাতিক দেখে। চোখের আড় হয়েছি তো সঙ্গে সঙ্গে মেজবউ! মেজবউ! তারপর বাড়ীর ছাদ কাঁপিয়ে মে-জ-বউ! এলেই জুড়িয়ে যেতেন, বলতেন, যাও কোথা? চটকদুলালী আমার! এই আছে এই নেই। ফুরুত আর ফুরুত। আমাকে আদর করে একলা পেলে বলতেন, চটকদুলালী। বলতাম, একটা কথাই বলতাম—বলতাম, মরতে। বলতেন, সে আমি মরার পর যেয়ো। না হয় যদি পার সেইদিনই যেয়ো, চিতায় পুড়ে মরো আমার। বলে আক্ষেপ করে বলতেন, কলিতে ধর্ম একপদ! তাও এরা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে আধখানা থেকে সিকিখানায় এনেছে। নইলে সতী অধর্ম অন্যায় হয়! কাত্যায়নীদেবী যা লিখেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে ফলছে।

অক্ষরে-অক্ষরে !

বললাম না, কাত্যায়নীদেবী ছেলেমেয়ে নিয়ে তখন এখানে, তাঁর কানে এল, সতী ওঠাবার জন্যে দরখাস্ত করছে কলকাতার বড় বড় লোকেরা। তার মধ্যে দ্বারকা ঠাকুর একজন প্রধান। উনি জানতেন নুনের কারবার করেন স্বামী, তিনি দ্বারকানাথের কত অনুগত। তিনিও তা হলে সই দেবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠি লেখালেন স্বামীকে। ভাল লিখতে জানতেন না নিজে, কোনমতে সই দিতে জানতেন মোটা মোটা করে, তিনি প্রেমপত্র লেখাতেন মুহুরীকে দিয়ে। তিনি বলতেন মুহুরী লিখত। তারপর পড়ে শোনাতো। তাতে তিনি সই দিতেন মোটা আঁকাবাঁকা হরফে—কাত্যায়নী।

ওদিকে তখন ভোর হয়ে এসেছে। আমার জ্বরটা যেন ছেড়ে আসছে মনে হল। ঘাম হচ্ছিল। দেশে তখন ম্যালেরিয়া ছিল প্রচুর। ১৯৩৬ সাল। শীত করে জ্বর আসে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

ঠাকুমা বললেন, দেশের সম্পত্তি পেলে তো! এখন ভোগ। সকালে উঠেই ডাক্তারকে বল কুইনিন ইন্‌জেকশন দিয়ে দিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

* * * *

ভোরে জ্বর ছাড়ল, আবার বিকেলে শীত করে জ্বর এল। কুইনিন মানলে না। সেদিন জ্বর প্রবলতর হল, একশ তিন উঠল টেম্পারেচার।

মেজঠাকুমা ডেকে পাঠালেন বুড়ো ভটচাজ মশাইকে। তিনি নাড়ী দেখে ঠিক বলে দেবেন, ক'দিন হবে জ্বরের ভোগ। নাড়ীতে সর্দি না পিত্তি না বায়ু, না সর্দি পিত্তি, না বাতপিত্তি, কি কি ঠিক বলে দেবেন। ডাক্তারেরা ওসব জানে না, ওরা নাড়ী গোনে ঘড়ি ধরে।

মেজঠাকুমাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। উনি মেজঠাকুরদার কাছে যা হতে পারেন নি, আমার কাছে তাই হয়েছিলেন, হয়েছিলেন কাত্যায়নী দেবী।

দয়াল ভটচাজের বয়স আশী। সম্পর্কে মেজঠাকুমার শ্বশুর। লাঠি ধরে এলেন। পাকা আমের মত চেহারা, তেমনি টকটকে রঙ। মাথার চুল-ভুরু সব পাকা। দেখে বললেন, সাদা জ্বর মেজ-মা। চিন্তা নেই। দিন-পাঁচেক লাগবে। তবে বাবুর মালোয়ারী ধরলে মনে হচ্ছে গো! দুটো ঠায় উপোস দাও।

বসে রইলেন ভটচাজ কিছুক্ষণ। মেজঠাকুমা বললেন, রায়বাড়ীর গল্প শুনতে ওঁর খুব ঝোঁক। ওঁকে বলুন।

দন্তহীন মুখে হেসে দয়াল ভটচাজ বলেছিলেন, আজ নয় মা, কাল বলব। কাল এসে আবার দেখে যাব। বলব তখন।

আমি কি করব। উপোস দিয়েই পড়ে রইলাম আর ডাক্তারের মিকশ্চার খেলাম। কিন্তু কাল কাটে কি করে? পুরনো খাতা আর কাগজ নিয়ে পড়লাম। পুরনো খাতায় পেলাম কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিমলাকুমারী দেবীর শুভপরিণয় উপলক্ষে খরচ। জামাতা আশীর্বাদী! হীরার আংটি একটি, মারফৎ হ্যামিল্টন এণ্ডো কোং, মোকাম কলিকাতা, মূল্য এক হাজার

টাকা! বিস্ময় লাগল। জমা-খরচের খাতাটার সাল ১২৩১ সাল, ইংরিজী ১৮২৪। বিমলা-কুমারীর বয়স সাত, ১৮১৭ সালে তার জন্ম।

কাত্যায়নীরও বিয়ে হয়েছিল সাত বছর বয়সে।

খরচের পাতাতেই চোখ বুলাচ্ছিলাম। সে এলাহি কাণ্ড। পরিশেষে একটা খরচের ফর্দ পেলাম। একসঙ্গে সব হিসেব। খরচ যোগ করে দাঁড়িয়েছে পনের হাজার টাকায়!

তারপরের দিন মেজঠাকুমা ঠাকুরবাড়ী গিছলেন; সেখান থেকে ফিরবার পথে পুরনো বাড়ী হয়ে ফিরলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন রেশমী কাপড়ে বাঁধা একটা কাগজের পুলিন্দা। রেশমী কাপড়-খানা এককালে সুদৃশ্য এবং বেশ মূল্যবান ছিল। বললেন, এটা তাঁর বাক্সের মধ্যে রাখা ছিল রে। দেখ এতে কি আছে।

দেখছিলাম পাল্টে পাল্টে। দেখলাম সবই প্রায় চিঠি। চিঠিগুলি রত্নেশ্বর রায়ের লেখা, লিখেছিলেন অধিকাংশই শিবেশ্বরকে। কয়েকখানা দেবেশ্বর রায়কে লেখাও আছে। তিরস্কারপূর্ণ চিঠি। তার একটাতে লেখা আছে "প্রয়োজন হইলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না। তুমি লিখিয়াছ দেবত্র টিকিবে না আইনে। দেখা যাইবে কি হয়। মোট কথা তোমার অহিন্দু আচরণ আমি সহ্য করিব না ইহা জ্ঞাত হইবে।" শেষে কতকগুলি কথা আছে, যেগুলিকে বেদবাক্যের মত বলা যায়।

আমি ভাবছিলাম। এমন সময় জাঠতুতো ভাই প্রণবেশ্বর, খুড়তুতো ভাই সুখেশ্বর কাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর এল আমাকে দেখতে। বসলে, বললে—অসুখ ধরালে তো!

বললাম, অসুখ নয়। মানে ওই মেয়েটির অসুখ আমাকে ধরে নি।

কল্যাণেশ্বর ছড়ানো কাগজগুলো দেখে বললে, ওগুলো কি?

—চিঠি। পুরনো চিঠি সব। রায়বাহাদুরের লেখা তাঁর ছেলেদেরকে।

—ও কোথায় পেলে?

—বাড়ীতেই। আবার কোথায়!

চুপ করে রইল কল্যাণেশ্বর। প্রাণবেশ্বরদা বললে, দেখ, কল্যাণেশ্বর গার্লস স্কুলের ঠিকে নিয়েছে। ঘর তৈরী হয়ে গেছে, জানালা-দরজা লাগাতে বাকি আছে। এখন ওটা থাকবার জন্য দিতে হবে সেটেলমেণ্ট অফিসারকে তুমি বলেছ। কল্যাণ কাজ শেষ করতে গিয়ে থমকাচ্ছে। কারণ, কাল মেজঠাকুমা সন্ধ্যের সময় বললেন, কল্যাণেশ্বর দুধপুকুরে আমগাছ—কি গিন্নীগাছ না কি নাম—সেটা কাটিয়েছে। ও সেটা কাটিয়েছে ঠিক। কিন্তু সে পোড়া কাঠের জন্যে। ওদিকে ধনেশ্বর কাকা কাল রাত্রে যাচ্ছেতাই করেছেন। যত গাল তোমাকে মেজঠাকুমাকে দিয়েছেন, তত কল্যাণেশ্বরকে। সে যা হয় হবে। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—আমতক্তার দরজা-জানালা লাগালে বিলের সময় তার টাকা দেব না—এ বলবে না তো?

কল্যাণেশ্বর বললে, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি সুরেশ্বরদা, উনি যাই করুন তোমার বিপক্ষে, তাতে আমি আর থাকব না।

একটু বিষণ্ণহাসি আমার মুখে দেখা দিয়েছিল। লজ্জা হয়েছিল। নিঃস্ব রায়সন্তানদের চেহারাটা যেন সাসপেকটেড টি বি পেশেন্টদের মত সকরুণ হয়ে উঠেছে অবিকল।

স্তাবকতায় বাধে না। সামান্য স্বার্থের জন্যও স্তাবকতা করতে পারে। এরা আজ চুরি করে গাছ কাটে। আজ ঝগড়া করে কাল এসে গড়িয়ে পড়ে সামান্য স্বার্থের জন্য। নারীর কাছে এদের দাম হয়েছে বিষাক্ত পোকার মত। তারা ঘেন্নাই করে, ভয় পর্যন্ত করে না সাপ কি বাঘ বলে। বললাম, না, ও-বিষয়ে আমি কোন আপত্তি তুলব না। তুমি ঘরখানার দরজা-জানালা লাগিয়ে দাও। মিস্টার ঘোষ প্রায় নির্বাসিত বিরহী যক্ষ হয়ে উঠেছেন—ভয় হচ্ছে সেটেলমেন্টের পরচা থেকে সেগুলো পরচা-দূত হয়ে না দাঁড়ায়। ক্রোধবশে এর নাম কেটে ওর নাম না বসিয়ে দেন।

খুব হেসে উঠল কল্যাণেশ্বর, অযথা উচ্চহাসি। তারপর বললে, ওই চিঠিগুলো থেকে কি খুঁজছ বল দেখি ?

—খুঁজছি কিছু, ঠিক বিষয় নয়।

—তবে ?

—রায়বাড়ীর ইতিহাস জানতে চাচ্ছি।

—তা কি চিঠিপত্রে পাবে ?

—তাই পাব।

কল্যাণেশ্বর বললে, তাহলে তোমাকে সন্ধান দি সুরেশ্বরদা। দেখগে ঠাকুরের গহনা থাকত যে আয়রনচেস্টে, সেটার মধ্যে অনেক চিঠি আছে। সেসব রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় রেখে দিয়েছিলেন। মিথ্যে বলব না, দুখানা ডায়রীর মত ছিল, একখানা রায়বাহাদুরের, একখানা বীরেশ্বর রায়ের, আমার বাবা তো দাম বুঝতেন, তিনি রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন খুন হলেন, তখন যে সে কে নিলে ? কে নিলে কেন, নিলে বেজোদা নিয়েছে। না হলে হারিয়েছে!

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, খুঁজে দেখ কল্যাণ, আমাকে দিলে আমি এক হাজার টাকা পর্যন্ত দেব।

অবাক হয়ে গেল কল্যাণেশ্বর।

প্রণবেশ্বর বললে, তুমি ঠিক কি খুঁজছ বলবে ?

বললাম, বিশ্বাস করবে ?

—বল।

—প্রথম নিজের বংশের কথা কে না জানতে চায় বল! দ্বিতীয়, রক্তের মধ্যে একটা কি আছে। সেটা কি জানতে চাই। বিষয় চিরকালের নয় বড়দা, সে সবাই জানে। আমি খুঁজছি আমার বাবার কেন এমন হল ? আরও অনেকের ওই পাপ দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের কথাও আমার অজানা নয়। হয়তো বলবে এটা মানুষের পাপ। হয়তো তাই। কিন্তু এ-বংশের পুণ্য তো কম নয়! তবু কি করে পাপ কোথা থেকে এল ? একে আমি বড় ভয় পাই বড়দা।—কেন পাই ? এই আর কি—পাগলামি বলতে পার।

হাতটা উল্টে দিলে প্রণবেশ্বর। অর্থাৎ কিছুই বুঝলাম না।

কল্যাণেশ্বর বললে, ঠাকুরের সিন্দুক খুলে দেখ, অনেক কাগজ-চিঠিপত্রের গাদা পাবে।

মেজঠাকুমা এসে দাঁড়ালেন। চাবি তো তোকে দিয়েছি সুরেশ্বর। তুই সিন্দুকটা খুলে আজ দেখ। কল্যাণকে হাজার টাকার কথা যখন বলেছিস, তখন এখুনি নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে বের করে আন, নইলে আজ রাতেই কেউ সিন্দুকটাকে ভেঙে ফেলবে।

*　　　*　　　*

সেই কাগজের মধ্যে উপকরণ পেলাম। খানকতক মূল্যবান চিঠি। কাত্যায়নী দেবী লিখছেন স্বামীকে—শতকোটি প্রণামান্তর স্বামীচরণে নিবেদনমিদং, স্বামীন, তদীয় পত্র প্রাপ্ত হইয়া অধিনী দুশ্চিন্তায় আশঙ্কায় জীবনমৃতা হইয়া কালযাপন করিতেছে। আপনি কি এমন দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছেন যে, নিশাকালে ভয় প্রাপ্ত হইয়া বু-বু করিয়া উঠিয়াছেন? কিন্তু আপনার কাছে কি রাত্রিকালে কেহ শয়ন করে না? অধিনী তো ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিল, সে ব্যবস্থা কি বলবৎ নাই? যদি বলবৎ না থাকে, তবে আপনি আপনার পছন্দমত লোক নিযুক্ত করিয়া কাছে লোক রাখিবেন। কদাচ একাকী রাত্রে শয়ন করিবেন না। তাহাতে অধিনী কোন আপত্য করিবে না। এখানে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিয়া দেবতার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিলাম। ৺শ্রী চরণে স্বর্ণ-বিল্বপত্র, শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জিউর নিকট স্বর্ণতুলসী অর্পণের ব্যবস্থা হইল। অত্রস্থ কুশল। শ্রীমতী বিমলা এবং শ্রীমান বীরেশ্বরের সর্বাঙ্গীণ কুশল। বীরেশ্বর এমন দুর্দান্ত ও বলশালী হইয়াছে যে, তাহাকে আমি ক্রোড়ে লইতে ভয় পাই। আমার প্রেমচন্দনসিক্ত প্রণাম গ্রহণ করিয়া অধিনীকে কৃতার্থ করিবেন। কারণ কম করিবেন।—ইতি তদীয় শ্রীচরণাশ্রিতা কাত্যায়নী দেবী।

মোটা হরফে লেখা কাত্যায়নী। চিঠি লিখেছে কোন পাকা-হাত মুহুরী। তারপর পেলাম সোমেশ্বরের পত্র।

প্রাণাধিকা প্রিয়তমাসু—

শ্রীমতী কাত্যায়নী আমার প্রেম-আশীর্বাদ জানিবা। তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় অবগত হইলাম, কিন্তু কোন আশ্বাস বা কোন ভরসা আজও পাই নাই। প্রায় নিশাযোগে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। কাছে লোক থাকে। কিন্তু সে কি করিতে পারে? সামান্য মানবকুলের কোন্ ক্ষমতা যে দেবরোষের প্রশমন করিবে? প্রায়শঃই অর্থাৎ দুই-এক দিবস অন্তর স্বপ্ন দেখিতেছি—যেন রাজরাজেশ্বর প্রভু জীউ বালকের মূর্তি ধরিয়া আমাকে শাসন করিতেছেন, আর তান্ত্রিক শ্যামাকান্ত দূরে রক্ত চক্ষুতে তাকাইয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের একখানা চিঠি আমি পেয়েছি সুলতা। সুন্দর চিঠি। যেমন হাতের লেখা, তেমনি সেকালের কথার গাঁথুনির নমুনা। লিখেছেন সোমেশ্বর রায়ের পত্রের উত্তরে। কারণ তার উল্লেখ রয়েছে।

লিখেছেন—অশেষ কল্যাণ ও তত্ত্বসহ সম্মানপূর্বক নিবেদনমেতৎ আপনার লিপিখানি পাইয়া তত্র বাটীর সমাচার অবগত হইয়া চিন্তান্বিত হইয়াছি। আমি তো অত্র ধামে থাকিয়া মহামহিমময়ী শ্রীশ্রীকালিকা দেব্যা মাতাঠাকুরাণীর এবং মহামহিম পরম দয়াল শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জিউ প্রভুঠাকুরের পূজা-অর্চনা এবং সেবাদি যথাসাধ্য করিতেছি। কোন ত্রুটি বা সেবা-

অপরাধ হইতে দিই নাই। নিয়মিত মাতার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র এবং প্রভুজিউয়ের মস্তকে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদত্ত হইতেছে। তত্রাচ এরূপ দুঃস্বপ্ন আপনি দেখিতেছেন কি কারণ তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। এবং সমস্ত আনুপূর্বিক বিচার করিয়া আপনার ন্যায় ধর্মপরায়ণ ভক্তিভাজনের অপরাধ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আপনার দুঃস্বপ্ন দর্শনকেও উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। উপর্যুপরি দুঃস্বপ্ন দর্শন কিমতে উপেক্ষা করিতে পারা যায়। তবে এখানকার সেবা ইত্যাদিতে ক্রটি হয় নাই এবং হইবেক না জানিবেন। তবে হিতৈষী হিসেবে যদি মদীয় চিন্তায় যাহা মনে হইতেছে তাহা নিবেদন করি, তবে আপনি দুঃখ মনে করিবেন না। আপনার অপরাধ ওই শ্যামাকান্তের অপঘাতমৃত্যুতে কিছু অর্শিয়া থাকিবেক বলিয়া মনে লইতেছে। সম্ভবতঃ জলে ডুবিয়া আপনি নিজে বাঁচিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারেন নাই। হইয়া থাকিলে এইখানে অপরাধ হইয়া থাকিবেক। অন্যথায় তাঁহাকেই বা স্বপ্নে দেখিবেন কেন? আমার বিবেচনায় আপনি যদি ৺শ্যামাকান্তের বংশাবলীকে তুষ্ট করেন, তবে অবশ্যই তিনি তুষ্ট হবেন। শ্যামাকান্তের এক শ্বশুরালয় শ্যামনগর। আমার কন্যারও বিবাহ শ্যামনগরে ভট্টাচার্য বংশে দিবার স্থির করিতেছি। তাহার সপ্তমবর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিতেছে। সেই সূত্রে সেখানে গিয়া জানিলাম, শ্যামাকান্তের এক পুত্র আছে। পুত্রটি পিতৃমাতৃহীন। মাতামহী লালনপালন করিতেছেন। অবস্থা ভাল নহে। তাহাকে কিছু অর্থ, কিছু সম্পত্তি দান করিলে মনে হয় ইহার প্রতিকার হইতে পারিবেক। অধিক কি আর, নিবেদনমিতি, পুঃ—শ্রীযুক্তা গিন্নীঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়াই ইহা লিখিলাম। তিনি সাতিশয় বিব্রত এবং ভীত হইয়াছেন।

সোমেশ্বর রায় এই পত্র পেয়ে পত্র উপেক্ষা করলেন না, নিজে স্বয়ং এসে হাজির হলেন কীর্তিহাট। এবং পুরোহিত রামব্রহ্মকে এবং নায়েব গিরীন্দ্র আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন শ্যামনগর। যাতায়াতের জন্য বজরা ছিল নিজস্ব। দুখানা বজরার সঙ্গে পাহারাদারি ছিপে লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। সঙ্গে অর্থ নিয়েছিলেন। দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসবেন। কাঁসাই ধ'রে হলদী হয়ে গঙ্গার উজান বেয়ে এসে উঠলেন শ্যামনগরের ঘাটে। কোথায় কার বাড়ীতে আতিথ্য নেবেন? শ্যামনগর ব্রাহ্মণ সদগোপ-প্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মত্র ভোগ করেন, যাজন-যাজন গুরুগিরি করেন। সদগোপেরা চাষবাস ক'রে খায়। এদের কারুর খড়ের চালের বাড়ীতে সোমেশ্বর রায় স্বচ্ছন্দবোধ করতে পারবেন না। খড়ের চাল মাটির দেওয়ালের ঘরে শুলে মনে হত ঘরে আগুন লাগবে, রাত্রে কোন না-দেখা গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে কামড়াবে, এমন কি ভূমিকম্প হয়ে ঘর ভেঙে পড়বার আতঙ্কও তাঁর ছিল। স্থির করলেন বজরাতেই তিনি থাকবেন। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন তাঁর ভাবী বৈবাহিককে খবর দিতেই গ্রাম ভেঙে এসে দাঁড়াল। কীর্তিহাটের রায়বাবু এসেছেন। তাঁর সাজানো বজরা, সেই বজরা দেখতেই তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

ভট্টাচার্যেরা এসে সসম্মানে তাঁকে আহ্বান করলেন, বললেন—মহাভাগ্য আমাদের! আপনি পদার্পণ করেছেন।

সোমেশ্বর তাঁদের কাছেই খোঁজ নিলেন—শ্যামাকান্ত তান্ত্রিকের বিগত বিবরণ এবং তাঁর

ছেলের বর্তমান অবস্থার সংবাদ।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের ভাবী বৈবাহিক বললেন—শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কাশ্যপ গোত্রীয় কুলীন সন্তান বাবু, মূলবাড়ী ওদের যশোহর জেলায়। শ্যামাকান্তের বাপ কাশীনাথ অনেক বিবাহ করেছিলেন। এই হুগলী জেলাতেই সাত আটটি বিবাহ ছিল। শুদ্ধাচারীর বংশ। সাধনা-টাধনার ঝোঁক তাঁরও ছিল। শ্যামাকান্তকে নিয়ে তিনি ঘুরতেন। ওইটিই তাঁর ঘরণী স্ত্রীর সন্তান। গান তিনিও গাইতেন। শ্যামাকান্তকে বলতে গেলে তিনি মূলধন দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পর শ্যামাকান্তও বাপের বৃত্তি নিয়েছিলেন। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। গানবাজনায় যাকে বলে ওস্তাদ। ওস্তাদও বটে সাধকও বটে।

আমাদের এখানে, আমার জ্ঞাতিভাই অবশ্য, বয়সে আমার থেকে অনেক বড়, বলতে গেলে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ছিলেন—পদ্মনাভ ভট্টাচার্য। পণ্ডিত লোক। টোল ছিল বড়। নাম ছিল। নিজে পণ্ডিতই শুধু ছিলেন না, ক্রিয়াকর্ম, বিশেষ করে তান্ত্রিক পূজা, খুব ভাল জানতেন। তন্ত্রমতে স্বস্ত্যয়নে খুব খ্যাতি ছিল। পঞ্চপর্বে জপতপ-ক্রিয়াও করতেন। শ্যামাকান্ত কোত্থেকে তাঁর খোঁজ পেয়ে তার তানপুরা ঘাড়ে এসে হাজির হল। তখন নবীন যৌবন বলতে গেলে। আমরাও তখন নবীন। কিছু কম বয়স। পদ্মনাভ ভটচাজকে জড়িয়ে ধরলেন—আমাকে পুরশ্চরণ করাতে হবে। দীক্ষা আমার বাবার কাছে নিয়েছি। পুরশ্চরণ করা হয় নি। সেটি করিয়ে পূর্ণাভিষেকে দীক্ষিত করতে হবে। রূপবান চেহারা বাবু, তার উপর সুন্দর কণ্ঠ, তারা তারা বলে গান গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে যেতো; পদ্মনাভ-দাদা ফেরাতে পারলেন না। বললেন—বেশ থাকো। কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্র পড়েছ? সেটা কিছু প'ড়ে নাও। থাকবে আমার এখানে পুত্রের মত। এই থাকতে থাকতে মায়া জন্মাল। নিজের একটি কন্যা ছিল। বললেন—আমার মেয়েকে বিয়ে কর। তুমি শিবের মত পাত্র, আমার কন্যাও সুলক্ষণা। গৃহস্থ হয়ে ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে সাধনা করবে। আমি বলছি, যা চাও তাই পাবে। আমার টোল আমার যজমান—ব্রহ্মত্র রয়েছে, নিশ্চিন্ত সাধনা করতে পারবে। তাই হয়ে গেল। তিনি মানে শ্যামাকান্ত একটা পুরুষ ছিলেন। গানে বাজনায় হাসিতে একেবারে আমাদিগে মাতিয়ে রাখতেন। মধ্যে মধ্যে খ্যাপার মত হাসতেন।

সোমেশ্বর বললেন—সে তো আমি জানি—দেখেছি।

—হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু প্রথম বয়সে দেখেন নি। মানে কুড়ি বাইশ বছরে। তখন বলতেন—জান হে শিবানন্দ, কালী এলে কি বলব জান? আমি বলতাম—কি? বলতেন—বলব—রাজা কর্ আমাকে, রাজা করে দে। হা হা করে খানিকটা হেসে আবার বলতেন—তোমাকে মন্ত্রী করব হে। আর বিয়ে করব একশো আটটা। তোমার ভাইঝির সব দাসী ক'রে দোব।

মধ্যে মধ্যে চলেও যেতেন তানপুরো ঘাড়ে ক'রে। কোথাও ওস্তাদ এসেছে শুনলে কি কোথাও কোন সাধুটাধু এসেছে শুনলে আর তাকে রাখে কে?

পদ্মনাভ শেষটায় আপশোষ করতেন, ওকে বাঁধতে গিয়ে ভুল করেছি। কন্যেটার কপালে কষ্ট আছে। ইতিমধ্যে তিনি হঠাৎ জরবিকারে মারা গেলেন। শ্যামাকান্তকে বলে গেলেন

—দেখ, ঘরে বসে সাধনা কর। এমন ক'রে ছুটো না। তখন আমার ভাইঝি মানে পদ্মনাভ-দাদার কন্যা বড় হয়েছে। কিছুদিন এই সময় সুস্থ হয়ে ছিলেন তিনি। তারপর এই সন্তান হল। সন্তানটি বছরখানেকের যখন তখন একদিন উধাও হলেন। শুনেছেন এক সাধু এসেছে, খুব বড় সাধু। দেখতে গিয়ে বাস মানুষ সেই গেল আর ফিরল না। এর মধ্যে কাণ্ড হল, ওঁর স্ত্রী আমার ভাইঝি মারা গেল। তারপর থেকে আমার বউদিদি, পদ্মনাভ-দাদার স্ত্রী, ওই নাতিকে নিয়ে মানুষ করছেন আর কাঁদছেন। দেখবার শুনবার মানুষ নাই। জমি জেরাত, মালের জোত নিলেম করালে জমিদার, মানে সরকার বাবুরা। এখন ব্রহ্মত্রটুকু আছে। বাড়ীতে নারায়ণশিলা আছে। ওই পালেরা খুব অনুগত ওদের। ও বাড়ীর মহাভক্ত। ভাগে চাষ করে ষোলআনার উপরেও কিছু এনে দেয়। তাতেই চলে। বালকটিও অত্যন্ত সুশীল মেধাবী, নবম বৎসরে উপনয়ন হয়েছে। ভক্তিমান, সুন্দর কান্তি। আমি তাকে শালগ্রাম সেবাপূজা শিখিয়ে দিয়েছি। এখন পূজাও সেই করে। এই কোনরকমে চলছে আর কি! তা আপনি যখন এসেছেন তখন তার আর চিন্তা কি? এবার তার বৃহস্পতির দশা হল। শুধু একটা আপশোস হচ্ছে তিনি জলে ডুবলেন, সে সময় যদি একটা সংবাদ পেতাম তবে শ্রাদ্ধটা করাতাম।

সোমেশ্বর ঘাড় হেঁট ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—ওটা আমার অপরাধ হয়েছে। নিশ্চয় অপরাধ হয়েছে। তবে কি জানেন। আমার মনে হয়েছিল সংসারাশ্রম ত্যাগী সন্ন্যাসী তো। তাঁর আবার শ্রাদ্ধ কি? তবে আমি সন্ন্যাসীর পারলৌকিক যা তা করেছিলাম।

শিবানন্দ বলেছিলেন—তা করবেন বইকি। নিশ্চয়, তাতে ত্রুটি হবে কেন? রাজাতুল্য ব্যক্তি। গৃহে দেবতা অবস্থান করছেন। না, তা আমরা বলি নি। তবে ছেলেকে দিয়ে কিছু করানো যেত এই আর কি!

—এইবার করুন। শাস্ত্রে নিশ্চয় বিধি আছে। পতিত শ্রাদ্ধ উদ্ধার তো হয়! চলুন আমি একবার ছেলেটিকে দেখে আসি।

—আপনি কেন যাবেন। সে আসবে।

—না—না। তার মাতামহীকে প্রণাম ক'রে আসব। দেখে আসব ঘরদোর। পদব্রজে শ্যামনগরের ধুলো পায়ে মেখে সোমেশ্বর রায় এসে উঠেছিলেন পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের ভাঙা ঘরে। ঘর তখন ভাঙাই বটে। নিদারুণ অর্থকষ্টের লক্ষণ গৃহস্থের গৃহস্থালীর সর্বাঙ্গে ভগ্নদেহ রোগীর দেহের মত ফুটে উঠেছে।

সেই ভাঙা দাওয়ায় খুঁটি ধরে একটি সুকুমার কিশোর দাঁড়িয়েছিল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মাতামহী, মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন।

সোমেশ্বর প্রথম দৃষ্টিতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বাঁশীর মত নাক, আয়তটানা চোখ, গৌর-বর্ণ রঙ। দেখতে শ্যামাকান্তের মতই। তাঁর দাড়ি গোঁফ চুল ছিল বলে সাদৃশ্যটা অবিকল তা বোঝা যায় না তবে বললে সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে হ্যাঁ, এই তো তার ছেলেই বটে।

সুলতা, এই টিকলো নাক আর টানা আয়ত চোখ এটা রায়বংশের নয়। এটা শ্যামাকান্ত

চট্টোপাধ্যায়ের বংশের। রায়বংশও সুপুরুষ বংশ। কিন্তু ওই ছবির দিকে চেয়ে দেখ—কুড়ারাম ভট্টাচার্যের, সোমেশ্বর রায়ের, বীরেশ্বর রায়ের রঙ গৌরবর্ণ কিন্তু নাকের ডগাটা মোটা, চোখ বড় হলেও টানা নয়, তার মধ্যে উগ্রতা আছে। কিন্তু রত্নেশ্বর রায়ের চোখ, তারপর থেকে আমাদের চোখ টানা, তাতে একটা মাদকতা আছে।

আঃ, যদি তুমি আমাদের বাড়ীর কোন মেয়েকে দেখতে সুলতা তবে বুঝতে। অর্চনা, জগদীশ্বর-কাকার মেয়ে তার দৃষ্টি যেন মদির!

ঘড়িতে ঢং শব্দে আধঘণ্টা বাজল।

সুরেশ্বর বললে—ঘড়ির দিকে তাকিয়ো না। আমাদের ঘড়ির কাঁটা একশো পনের কুড়ি বছর পিছিয়ে গেছে।

যা বলছিলাম।

সোমেশ্বর যা করলেন তা যে করবেন তা নিজেও বোধ হয় ভাবেন নি। ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। কষ্ট তাঁর হয়নি। বত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়স, সবল রায়বংশের পুরুষ, অনায়াসে এগার বছরের বিমলাকান্তকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—তোমার নাম কি বাবা।

—আমার নাম শ্রীবিমলাকান্ত দেবশর্মা চট্টোপাধ্যায়।

—কি নাম? বিমলাকান্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

ছেলেটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললেন—হে ভগবান। একেই বলে প্রাক্তন ভগবদ্ নির্দেশ। ন্যায়রত্নমশাই—

—আজ্ঞে!

—শ্যামাকান্ত যখন যাগযজ্ঞ করেন আমার সন্তানের জন্য তখন যজ্ঞশেষে বলেছিলেন—কন্যা পুত্র যাই হোক নাম রেখো ব দিয়ে। আমার মেয়ের নাম বিমলা। ছেলের নাম বীরেশ্বর। তিনি ব দিয়ে নাম রাখতে বলেছিলেন। বিমলা রাখতে তো বলেন নি। সেটা তো আমি রেখেছি। তা—হলে?

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—হ্যাঁ, যোগাযোগটা অদ্ভুত বটে।

—অদ্ভুত নয়, বিধিনির্দিষ্ট। বলেই হাতজোড় করে পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে বলেছিলেন—মা, ভিক্ষা চাইছি। আমার কন্যা বিমলার জন্য আপনার বিমলাকান্তকে যে ভিক্ষা চাইছি মা। আমার মা এক কন্যা এক পুত্র সন্তান, আর হবে না। বিমলাকান্তের সঙ্গে বিমলার বিবাহ দিয়ে আমি সম্পত্তি দু অংশে ভাগ করে দোব। ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাব। শ্যামাকান্ত আমার জন্য যজ্ঞ করে পুত্র কন্যা বাঁচিয়েছেন, আমার বাড়ীতে গুরুর মত পুরোহিতের কাজ করেছেন। মা, তাঁর আমলে আমার বৃদ্ধির সীমা নাই। একসঙ্গে নৌকোডুবিতে ডুবলাম, আমি বাঁচাতে চেষ্টাও করি নি মা, নিজে সাঁতার কেটে কূলে এসেছি। ভাবি নি তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মরলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ হত। এ আমার

মহাপাপ হয়েছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব মা, আমি বিমলাকান্তকে জামাই করে।

প্রৌঢ়া মাতামহী বলেছিলেন—ঘোমটার ভিতর থেকে ফিসফিস করে—সে ঘোমটার মুখে কান না-পাতলে শোনা যায় না। সোমেশ্বর বলেছিলেন—বিমলাকান্তের দিদিমা আপনি, আমি তার শ্বশুর হব সুতরাং আমি তো আপনার ছেলে মা। আমার সামনে কথা বলতে দোষ কি।

ঘোমটা-ঢাকা মাথাখানি ঘন ঘন নড়ে উঠেছিল—না। অর্থাৎ তা পারবেন না।

শিবানন্দ হেঁট হয়ে ঘোমটার গায়ে কান পেতে বলেছিল—তবে আমাকে বল আমি বলছি। তখন শিবানন্দকে বলেছিলেন—ওরে বাপরে, এর উপর আমি কি বলব? কি আছে বলবার। আমি তো বাঁচলাম। উনি আমাকে বাঁচালেন। কত্তা স্বপনে বলেন—গিন্নী এস। তা আমি বলি এখন আমি পারব না। এইবার আমি নিশ্চিন্ত। ওকে দিলাম। তবে দুটি কথা। আমি যতদিন আছি ওকে নিয়ে যাবেন না।

সোমেশ্বর বলেছিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ। কালী, কালী। তাই পারি? তবে আপনি চলুন—

—ছি—ছি—ছি!

—কেন তীর্থস্থানে কালীঘাটে! আলাদা থাকবেন।

—তা আমার ঠাকুরসেবার কি হবে?

—হবে। যেমন চলছে তেমনি চলবে। পুজো ভোগ সবের ব্যবস্থা বিমলাকান্তের বউ যে হবে তার কাজ, তার ব্যবস্থা করবে সে!

—ভিটেটি থাকবে তো?

—নিশ্চয়, বিমলাকান্ত আমার জামাই হবে, আমার মেয়ে এই ভিটের বউ হবে—এ ভিটে না-থাকলে যে তাদের অকল্যাণ হবে।

—বেশ বেশ বাবা বেশ! যা করবে তুমি তাই হবে।

প্রণাম করে চলে এসেছিলেন সোমেশ্বর বজরায়। বাড়ী থেকে বের হতেই বৃদ্ধার কান্না শুনতে পেয়েছিলেন, ওরে মা রে—ওরে বাবা শ্যামাকান্ত রে, কোথায় তোরা গেলি রে মানিক, ওরে তোদের বিমলাকান্ত রাজা হল রে, একবার এসে দেখে যা রে।

চোখের জল মুছেছিলেন সোমেশ্বর। এবং তিনদিনে শ্যামাকান্তের শ্রাদ্ধ করিয়ে শ্রাদ্ধান্তে বিমলাকান্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন। একজন চাকর একজন কর্মচারী রেখে বাড়ী মেরামত করবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। চাকর মানে সর্বক্ষণ-স্থায়ী চাকর নয়, ভগবান পালই ওদের তিন পুরুষের জোতদার, ভাগে জমি করে, তাকে ডেকে আনিয়ে মাসে দেড় টাকা মাইনের ব্যবস্থা করেছিলেন। একজন বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়ীর রান্নার জন্য দেড় টাকা বেতনে নিযুক্ত করেছিলেন।

বিষয়-সম্পত্তি কি আছে কি গেছে তাও খোঁজ নিলেন। খাজনার জোত সবই গেছে। ব্রহ্মত্র আছে সামান্য। সোমেশ্বর গিরীন্দ্র আচার্যকে পাঠালেন জমিদারবাড়ী। পত্তনীদার সরকারবাবুদের বাড়ী সন্নিকটেই, শ্যামনগরের একটা মাঠ পার হয়ে রাধানগর। শ্যামনগর

রাধানগর দুটি মৌজা মিলিয়ে লাট যুগলপুর। এর জমিদারেরা প্রাচীন, পরগনা গোকুলশাহী, নবাবী আমলের দানেশমন্দ খেতাবধারী রাজার এলাকা! কিন্তু দশশালা বন্দোবস্তের পর 'সানসেট ল'য়ের আমলে পরগনা রাখতে পারেন নি। কিছু কিছু মৌজা লট অষ্টম আইন হতেই পত্তনী বন্দোবস্ত করেছেন। যুগলপুর লাট বন্দোবস্ত নিয়েছে এখানকার সরকাররা। জাতিতে কায়স্থ। পেশা পূর্বে ছিল ওই পরগনাতেই তহশীলদারী। এখন পত্তনী স্বত্বে জমিদার। পাকা হিসেব, গোমস্তা থেকে জমিদার। এবং মহাজনীও করেন।

বলতে গেলে সুলতা, আমার পূর্বপুরুষ কুড়ারামেরই জাতের লোক তবু তফাৎ একটু আছে। ভারত অধীশ্বর যদি সিংহ হয় তবে ভূস্বামী বৃদ্ধ বাঘের জাত। কুড়ারাম ছিলেন চিতা। আর এরা নেকড়ে বলা যায়। যারা কোল থেকে ঘুমন্ত ছেলে তুলে নিয়ে গেলে জানতে পারা যায় না। আমি জমিদারবংশের ছেলে—আমার কাঁধের উপর ভারীদের মত দুদিকে মস্ত ভারী দুটো ভার। তার একটাতে ভাল কাজের বোঝা আছে, অন্যটায় হয়তো তার থেকেও ভারী মন্দ কাজের বোঝা আছে। সেই আমিই বলছি এদের মাথায় একটা মোট ছিল, সেটা মন্দ কাজের মোট। বগলে ভিক্ষের ঝুলির মত একটা ঝোলা আছে তাতে ভাল কিছু নিশ্চয়ই থাকবে। না থাকা হতেই পারে না।

ঝুলিটার মধ্যে যা ছিল সেটা হল দেব-দ্বিজে মৌখিক ভক্তি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করার পুণ্য, কপালে তিলক কাটতেন—তার পুণ্য। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাতেন এবং উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি বিতরণ করতেন ব্রাত্যদের। কীর্তন গান শুনে কাঁদতেন। এগুলি কৃত্রিম ছিল তা বলছি না। অকৃত্রিমই ছিল।

অন্যদিকে অর্থাৎ মোটটায় ছিল অনেক কিছু। সেগুলো মোটা ভারী কিছু ছিল না। খুন-খারাবী দাঙ্গা ঘর জ্বালানো এসব ছিল না। কিন্তু হিসেব যোগটি ছিল জোঁকের মত। তাই-ব কেন ওই নেকড়ের মত।

কোন ব্রাহ্মণ প্রজা এলে তাঁর পদধূলি নিয়ে প্রণাম করত, যত্ন করে খাওয়াতো। তারপর সুদ মাপের সময় হাতজোড় করে বলত—ওইটি পারব না। টাকা ধার করতে এলে সম্পত্তির খোঁজ-খবর নিয়ে 'কটে' টাকা দিত। কট মানে ব্যারিস্টারের বাড়ীর মেয়ে তোমার বোঝা উচিত। তবে কট আর নেই। কট ছিল মেয়াদী বন্ধকী। দশ বছর, পাঁচ বছর সময় নিদিষ্ট থাকত, তার মধ্যে টাকা শোধ দিতে হবে। না দিলে মেয়াদ-অন্তে ওই ধারের দলিলই বিক্রী দলিল হয়ে যাবে।

এই সরকারেরাই বিচিত্র কৌশলে বিমলাকান্তের মাতামহের জোতগুলি খাস করে নিয়েছে! সরকারদের আয় বিশেষ ছিল না। হাজার চারেক টাকা জোত। তবে প্রজার বাড়ীর চালের লাউ-কুমড়ো, শাক-আড়ার শাক, গরুর দুধ, পুকুরের মাছ প্রভৃতির একটা রাজভাগ বলে ভাগ নিয়ে মন্দ চলত না। ছেলেরা শুধু দুধে-ভাতেই মানুষ নয়, মাছে-ভাতেও বেশ প্রোটিন পুষ্ট দেহ। মাংসটা খেতো না কারণ বৈষ্ণব।

সোমেশ্বরের আগমনবার্তা শুনে তাঁরা নিজেরাই এলেন। সে কি কথা ব্রাহ্মণ। রাজতুল্য ব্যক্তি! তিনি এসেছেন, পদার্পণ করেছেন আমার ভূমিতে, দেখা করতে যাব না!

যাবার সময় চাদরের খুঁটে হিসাব করে পুরাতন জমির জন্য সুদসহ পাওনা এবং নতুন এতশত বিঘা জমির মূল্য বা সেলামী হিসাব করে—প্রায় চার হাজার টাকা—বেঁধে নিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন—হরি বোল হরি বোল। গোবিন্দের মহিমা কাকে যে কথন কি করেন এক তিনি ছাড়া কেউ বলতে পারে না। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ।

বৃদ্ধ সরকারের একটি চোখ ট্যারা ছিল। কোন্‌টি তা খবর পাইনি। পরবর্তী কালে বীরেশ্বরের একখানি চিঠি পেয়েছিলাম। লিখেছিলেন গোমস্তাকে, ওই লোকটা যেন আমার কাছে না আইসে। তাহাকে দেখিলেই আমার ক্রোধ হয়, চোখটা গালিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

এই লাট যুগলপুর বিক্রী করেছিল সরকারেরা বীরেশ্বর রায়কে।

এই ঘটনার প্রায় একত্রিশ বছর পর। ১৮৬২ সাল। মিউটিনীর পর। তখন ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী হয়েছেন।

যাক সুলতা, সে কথায় পরে আসব। সে একত্রিশ বছর পরের কথা। ১৮৩১ সালে বিমলা-কান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিমলার বিবাহ হয়ে গেল। সে বিবাহ মহাসমারোহের বিবাহ। তার খরচের অঙ্কটাই আছে জমা-খরচের খাতায়, বিশদ বিবরণ কোন কাগজপত্রে নেই। বেঁচে আছে লোকের মুখে মুখে, আর কয়েকটি নিদর্শনে।

রায়বাড়ীর খিড়কীতে দুধপুকুর হয়েছিল। সোমেশ্বরের বিয়ের সময় বধূ কাত্যায়নী তাতে স্নান করবেন। এবার কাটানো হয়েছিল বিমল সায়র—কন্যা বিমলার বিবাহে। বিমলা কন্যা। তার গ্রামে বের হতে লজ্জা নেই। তাই কাটানো হয়েছিল ঠাকুরবাড়ীর পিছন দিকে। ঠাকুরবাড়ীর সামনে 'মায়ের পুকুর' কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় কাটানো হয়েছিল। সে পুকুরে স্নান করত পুরুষে মেয়েতে সকলে। জলও খেতো। এবার কাটানো হল বিমল সায়র। এ সায়রে স্নান করবে গ্রামের মেয়েরা। তবে হাড়ি বাউড়ী ব্রাত্যদের মেয়েরা নয়। দু দিকে দুটো ঘাট বাঁধানো হয়েছিল। সে বাঁধাঘাট এখনও আছে। রানাগুলো ভেঙেছে, সিঁড়ি পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গেছে, তবুও আছে। এখনও বিমল সায়রই গ্রামের সব থেকে ভাল পুকুর।

আর সে খাওয়া-দাওয়ার গল্প কাহিনীর মত এখনও লোকের মুখে মুখে আছে। মেয়ের বিয়েতে একটা পর্ব ছিল ক্ষীর চিঁড়ে। ক্ষীর চিঁড়ে কলা গুড় দিয়ে সধবাদের খাওয়ানো হত। সোমেশ্বর ক্ষীর চিঁড়ে করেছিলেন; তার গল্প করে লোকে বলে—ক্ষীর ছিল খুসবু ক্ষীর, গন্ধে মৌ-মৌ করেছিল নাটমন্দির। যারা খেয়েছিল তারা সারাটা দিন খুসবু ভরা ঢেকুর তুলেছিল। চিঁড়ে ছিল গোবিন্দভোগ ধানের, যে ধানে যখন শীষ বের হয় তখন গোটা মাঠটা সুগন্ধে ভরে ওঠে। তাছাড়া কলকাতার সন্দেশ মিষ্টি; তখন কলকাতায় নতুন রসগোল্লা হয়েছে, পান্তুয়া হয়েছে। গ্রামের লোক খায়নি। তার সঙ্গে মর্তমান কলা। দেশের মিষ্টি ছিল মণ্ডা আর বোঁদে। মণ্ডা বলতে চিনির ঢেলা।

বহুবল্লভ পাল গ্রামের প্রবীণতম চাষী সদ্‌গোপ। সে আমার খড়চায় অনেক উপকরণ

যুগিয়ে দিয়েছে। সে শুনেছিল তার বাপ-মায়ের কাছে, ঠাকুমার কাছে। পাল এখন ঘোষ উপাধি নিয়েছে। সে বলেছিল, বাবু, মণ্ডা মানে চিনির ঢেলা, বাড়ীতে ভাঁড়ে থাকত। কখন আসে কুটুম-সজ্জন অতিথি-ফকীর, মাসাবধি থাকলেও গন্ধ হত না। কিন্তু যার দাঁত ভেঙেছে তাকে চুষতে হত। যার নড়া দাঁত তারও জলে গুলে খেতে হত। একবার ওই ঘোষলবাড়ীতে, যিনি আপনাদের নায়েব গো, তার বাড়ীতে এক রাগী বামুন এসেছিল দুপুরবেলায়। তাকে দিয়েছিল মণ্ডা। ব্রাহ্মণ কামড় মেরে বেকুব, নড়া দাঁত ছিল, মট করে গেল ভেঙে, তেষ্টা-ক্ষিধের সময় দাঁত ভেঙে ব্রাহ্মণ আগুন। সেই মণ্ডা নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল গেরস্ত কর্তার কপালে। কপাল কেটে রক্ত পড়ল, মণ্ডা ভাঙল না।

আর গল্প আছে অন্দরমহলের সঙ্গে জোড় লাগিয়ে আর এক মহল অন্দরের পত্তন। কন্যা-জামাতার জন্যে আর এক মহলের বনেদ গোড়া হয়েছিল ওই বিয়ের অষ্টমঙ্গলের মধ্যে। এ কথাটা চলিত আছে কীর্তিহাটে।

অষ্টাহব্যাপী উৎসব। বাঈ নাচ, খেমটা নাচ, তার সঙ্গে বহুবল্লভ পাল বলে—এসেছিল বাবু তর্জা গান! মহাদেব মোদক আর কেষ্ট ঘোষ। বাবার কাছে শুনেছি, তিনি ত্যাখন বালক। বুয়েচেন, মহাদেব মোদক এই কালো রঙ আর শিবের মত ডাগর রাঙা রাঙা চোখ। আর ধবধবে সাদা মাথার চুল। তেমুনি এক জোড়া সাদা মোচ। নেপুর পায়ে দিয়ে কি নাচন ধুয়ো ধরেছিল।

নেচে নেচে আয় রে আমার কেষ্ট নীলমণি
যতনে তোমার পিঠে পটপটাপট লাগাই পাঁচনী।
রাজাবাবুর মেয়ের সাদী পাত্র ব্রাহ্মণ কুলের নিধি
নিখুঁত আচার বেদ বিধি তার সাথে নাচে যবনী
বেটা তোর তার পিছে কিসের ঘুরঘুরানি
পিঠে তোর লাগাই পাঁচনী!

তর্জা গানে সাধারণ লোকে মেতে গিয়েছিল। এখনও লোকে ওই কয়েক ছত্র মনে করেই রাখে নি শুধু, গান করেও গেয়ে থাকে। চাষের সময় মাঠে গেলে চাষীর মুখে শোনা যায়, আমি শুনেছি।

একটা হাসির কথা এর সঙ্গে আছে। পাঁচ বছরের বীরেশ্বর খুব কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন দিদির বিয়েতে সব হয়ে গেল তো আমার বিয়েতে কি হবে?

* * *

এর পর জামাই ছেলেকে নিয়ে—ছেলে জামাইয়ের শিক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে—কাত্যায়নীকে যেতে হয়েছিল কলকাতা।

গ্রামের গল্প এখানেই ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু চার বছর পর সোমেশ্বর আবার সপরিবারে এসেছিলেন কীর্তিহাটে। শুধু জামাইকে রেখে এসেছিলেন কলকাতায়, সে তখন কলকাতায়

হিন্দু কলেজে পড়ছে। বয়স পনের বছর। মেয়ে বিমলার বয়স বার। সে তখন অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে। শিউরে উঠেছেন সোমেশ্বর এবং কাত্যায়নী। মা ছাড়া এ বিপদে উপায় কি? এ ছাড়াও সোমেশ্বরের আর একটা টান ছিল। নীলকর রবিনসন তখন নীলের কুঠীতে লাভ করে ব্যবসা বাড়াচ্ছে। একটা কুঠী থেকে তিনটে কুঠী করছে। নতুন কুঠীর একটা এখানেই মাইল দুয়েক দূরে। আর একটা শ্যামনগরে। শ্যামনগরের সরকারেরা তখন অবস্থায় ঘায়েল হয়েছে। তাদের সঙ্গে রবিনসনের যোগাযোগ সোমেশ্বরই করে দিয়েছিলেন। এবং অন্য দিকে তাঁর ঝোঁক পড়েছে নতুন নতুন ভূসম্পত্তি কেনার উপর। দ্বারকানাথ ঠাকুর মশায়ের মত পরগনা কেনার ঝোঁক তাঁর ছিল না। ছিল বাছাই করে লাট মৌজা খরিদের। নতুন ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য বিচক্ষণ লোক, তাঁর পরামর্শে তিনি কিনেছিলেন সেই সব মৌজা যে সব মৌজায় পতিত আছে বেশী। পতিত আবাদ করিয়ে বিলি করে তা থেকে মোটা লাভ হবে।

৮

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, তুমি নিশ্চয় জান, অন্ততঃ এম-এল-এ সুবোধবাবুর বক্তৃতায় শুনেছ, পশ্চিম বাংলায় জমিদারেরা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের সময় প্রজার কাছে খাজনা আদায় করে কোম্পানী সরকারকে দিত তার ৯০ ভাগ, নিজেরা পেত ১০ ভাগ। সেই স্থলে তারা ক্রমে খাজনা বাড়িয়ে যে আয় করেছিল বা করেছে তাতে এখন সরকারের ভাগ হয়েছে ২১, জমিদার লাভ করে ৭৯। বাংলার সরকারের রাজস্ব আয় এখন এক কোটি বারো লক্ষ—আর জমিদারের আয় সাত কোটি উনআশী লক্ষ। তার পথ আবিষ্কার করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে সোমেশ্বর একজন।

সোমেশ্বর এতেই মেতেছিলেন।

জামাই কলকাতায় পড়ছিল। জামাই বিমলাকান্ত সুপুরুষ, শান্ত বুদ্ধিমান। তার সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ছিল না। কাত্যায়নী কিন্তু বলতেন—বিমলের সম্পর্কেই ভাবনা আমার। ও চালকলা-বাঁধা বামুনের ছেলে, ছেলেবেলায় যজমান চরিয়েছে তো। বিমলাকে যদি আমার রোগেই পায় তবে কুলীনের বেটা সংস্কৃতজানা যজমান-চরানো ছেলে ও কি— ?

অর্থাৎ ও কি আবার তাহলে বিয়ে না করে সেবাদাসী বাঈজী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? আমি যে মাথায় মাথায় ভাবছি গো।

তারপর ছেলে বীরেশ্বরকে দেখিয়ে বলতেন, আর দেখ না, এই ভটচায্যি থেকে রায় হওয়া হারামজাদাকে দেখ না! সেই যে না, হিঁদুর ছেলে মুসলমান হলে কালাপাহাড় হয়, ঠিক তাই। একেবারে মেলেচ্ছ হল।

নয় বছরের বীরেশ্বরের সঙ্গে রবিনসন সাহেবের ছেলে জনি, জন রবিনসনের খুব ভাব হয়েছে। তার বোন মেরীর সঙ্গেও ভাব। সে সকালবেলা উঠেই টাটু ঘোড়ায় চড়ে চলে যায় কুঠী-বাড়ীতে। বেলা বারোটায় এসে খায়। তাতেও তার আপত্তি। ওখানে খাবে না কেন?

ওখানে সে জনির সঙ্গে হুটোপুটি করে, গুলতিতে শিকার করে। বন্দুক নিয়ে বড় রবিনসন শিকার করে, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বীরা, বীরেশ্বরকে পাদরী হিল সাহেব বলে, বীরা; বীরা হেলে সাপের লেজ ধরে ঘুরপাক খাইয়ে ওদের বিস্ময় অর্জন করে বীর হয়ে ওঠে।

মায়ের কথা শুনতে পেলে সে ক্ষেপে যায়, বলে, খবরদার, হারামজাদা তুমি বলবে না।

মা বলত—বললে কি করবি রে হারামজাদা!

প্রথম প্রথম আপন মনে গজগজ করত সে, তারপর বলত, তাহলে তোমাকেও বলব হারামজাদী।

প্রথম দিন শুনে রাগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সেবারেই বিমলার প্রথম সন্তান হল—হল সেই কাত্যায়নীর মত মরা ছেলে। শিউরে উঠলেন কাত্যায়নী।

মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় এসে ডাক্তার দেখিয়ে কাত্যায়নী ফিরে গেলেন। রেখে গেলেন জামাইয়ের সেবার জন্য একটি—

হেসে সুরেশ্বর বললে—কি বলব সুলতা। খারাপ কথা একটু ভাল কথায় ঢেকে বা গিল্টি দিয়েই বলি। রেখে গেলেন একটি 'তাম্বূলকরঙ্ক বাহিনী'। কলকাতার বাড়ীর নায়েব বা ম্যানেজারকে ডেকে শলাপরামর্শ করে ষোল বছরের জামাইয়ের জন্য একটি ষোড়শী মেয়েকে রেখে গেলেন। তার মাসোহারার বন্দোবস্ত করে, টাকা মাস কয়েকের অগ্রিম দিয়ে গেলেন। এবং তার কর্ম কি তাও বুঝিয়ে দিলেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে করেছিলেন।

তাঁর লেখা একখানি চিঠি আছে, তাতে লিখছেন—কুলীনের ছেলে তদুপরি ভট্টাচার্য বংশের পুত্র পাগল বিমলাকে লইয়া ঘর না করিয়া পলায়ন করিয়া বিবাহ করিলে কি করিব? এই সমুদয় চিন্তা করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সেবাদাসী রাখাই স্থির করিলাম। আপনার জন্য বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কলিকাল পূর্ণ হইয়াছে, ওদিকে ব্রাহ্মধর্ম অনাচার শুরু করিয়াছে। আবার বিধবা-বিবাহের হুজুগ উঠিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণকন্যা ভয়ে রাখিলাম না। মুসলমান বাঈজী রাখিলেও বিষম বিপদ ঘটিতে পারে। যদি মুসলমান হইয়া যায়। অগত্যা নানাবিধ শলাপরামর্শ করিয়া ও খোঁজ করিয়া একটি বেশ্যা-কন্যাকেই পছন্দ করিলাম। মেয়েটির মা অত্র কলিকাতার বিখ্যাত ঘোষালবাবুদের বাড়ীর বড়কর্তার বাঁধা খেমটাওয়ালী।

চিঠিখানা সোমেশ্বর রায়ের চিঠির দপ্তর থেকে পেয়েছি। যা ছিল ওই সিন্দুকের মধ্যে।

বাড়ী এসে কাত্যায়নী চারিদিকে খোঁজ করতে লাগলেন সাধু-সন্ন্যাসীর—বিশেষ করে তান্ত্রিক সাধুর। তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের ওষুধ এবং যাগ-যজ্ঞের ফলে তাঁর অসুখ ভাল হয়েছে। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে ওছাড়া পথ দেখতে পান নি। তান্ত্রিক শ্যামাকান্ত তাঁর কিছু ওষুধ গ্রামের বায়েনদের দিয়ে গেছেন কিন্তু সে-সব জ্বর-জড়ির ওষুধ আধ-কপালে মাথাধরার ওষুধ; বন্ধ্যা মেয়ের সন্তান হয় এমন জড়ি বুটি ওষুধও তারা জানে। কিন্তু মৃতবৎসাদোষ সারে, মাথার পাগলামির ওষুধ—এ তারা পায় নি।

ওদিকে ঘটেছিল বিপর্যয় !

জামাই বিমলাকান্ত পলাতক হয়েছিলেন কলকাতা থেকে। একেবারে এসে উঠেছিলেন মাতামহের ভিটেতে। মাতামহী তখন গত হয়েছিলেন বৎসর দুয়েক পূর্বে। ঘর-দোর অবশ্য সোমেশ্বর রায়ের বন্দোবস্তেই সুরক্ষিত ছিল। সোমেশ্বর রায় ঘর-দোর মেরামত করিয়েছিলেন, নতুন কোঠাঘর করিয়েছিলেন, যে ঘর পাকাঘরের মতই অথচ তার থেকেও আরামদায়ক। পাকা বারান্দা, পাকা মেঝে, চুনকাম করা দেওয়াল, শুধু চালই খড়ের। ইচ্ছে ছিল পাকা ঘরই করিয়ে দেবেন। কিন্তু আপত্তি হয়েছিল দু দিক থেকে। প্রথম স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর দিক থেকে, বলেছিলেন, না। তারপর মুখ নেড়ে বলেছিলেন—ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তবে এসব কি খুলে বলতে হয় ? জন জামাই ভাগনা তিন নয় আপনা। মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ের আবার মান বাড়ে। এখানে একটা কিছু হবে আর পাকাবাড়ী থাকলে হনহন করে গিয়ে ঘরে উঠে খিল দেবে। পাকা ঘরে বাস করে খড়ের চালে মানুষ থাকতে পারে না। মনে হয় সাপে কামড়াবে, আগুন লাগবে, ঝড়ে উড়বে। ও থাক।

আর আপত্তি করেছিলেন বিমলাকান্তের মাতামহী, ও থাক বাবা। পাকা ছাদ ঘর করতে নেই। ও গরমে মানুষকে পচিয়ে দেয়। তোমার বাড়ীতে মহল করে দিয়েছ সেই ঢের। এই ভটচাজের ভিটেতে ওটা কর না।

বিমলাকান্ত পাকাবাড়ীতে বেশ ক বছর থেকেও ওখানে গিয়ে থাকতে অসুবিধা বোধ করেন নি। আসবার সময় শ্বশুরকে চিঠি লিখে এসেছিলেন, সে চিঠি আমি পেয়েছি। লিখেছিলেন, ভক্তিপূর্বক অসংখ্য প্রণামান্তর নিবেদনমিদং পরে লিখি যে, আমি অদ্যই শ্যামনগর রওনা হইতেছি। অতঃপর স্থির করিয়াছি যে, সেখানেই জীবন নির্বাহ করিব। এ ধনৈশ্বর্য, এ সম্ভোগ আমার কোনমতেই সহ্য হইতেছে না। সারমেয়ের ঘৃত যদ্রূপ সহ্য হয় না, তদ্রূপই বলিতে হইবে। কিন্তু আমি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। আমার পিতা সাধক ছিলেন। মাতামহ ক্রিয়াবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আমি বাল্যকালে ভক্তিমতী ভট্টাচার্য-গৃহিণী মাতামহীর নিকট যে সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। উপনয়নের পর আমিও স্বহস্তে 'নারায়ণশিলা'র সেবা করিয়াছি। ইহার পর এবম্বিধ রাজৈশ্বর্য বাদশাহী, ম্লেচ্ছসুলভ ভোগ আমার জন্য নহে। বাল্যকালে কোন কদাচার হইলে মাতামহী বলিতেন, কদাচার করিলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, কুষ্ঠরোগ হয়। তাহা আমার পক্ষে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। যাহাই হউক অতঃপর গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রচর্চা ও কুল-কর্ম করিয়াই কাল কাটাইব। পূজ্যপাদ মহাশয়, আমার কোন অভাবও রাখেন নাই। শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী আমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া মদীয় মনোরঞ্জন এবং পরিচর্যার জন্য গীতবাদ্যনৃত্যকুশলা পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ওদিকে হিন্দু কলেজেও আমার জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। মহাশয়ের ইহা অগোচর নহে যে, তত্রস্থ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত ডিরোজিও সাহেবের মতাবলম্বী ধর্মবিশ্বাসহীন অনেক ছাত্র আছে। তাহারা মদ্যপান করে, গো-মাংস ভক্ষণ করে। তাহারা আমার মতামতের জন্য ব্যঙ্গ করে, অনেক সময় আমার পিরানের পকেটে উচ্ছিষ্ট হাড় ভরিয়া দেয়। জোরপূর্বক

মগ্যপান করাইবার জন্ম টানাটানি করে। আমি তাহাদের সহিত কলহে অপারগ। তাহার উপর এই পরিচারিকা নিয়োগকরণের জন্ম আমি সব অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতেছি। ধর্ম চরিত্র গেলে আর কি থাকে মনুষ্যের ? সুতরাং আমি শ্যামনগর রওনা হইতেছি। শ্বশ্রূমাতাকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিবেন। চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি শপথপূর্বক কহিতেছি যে বিমলার অবস্থা যে মতই হউক না কেন, আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ কদাপি করিব না। ইহা ত্রিসত্য বলিয়া কহিতেছি। করিলে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবেক। আমাকে যখন স্মরণ করিবেন তখনই শ্রীচরণে গিয়া হাজির হইব। কেবলমাত্র ধর্মাচরণ ও ধর্মরক্ষা হইলেই হইল। মহাশয়ের শ্রীচরণে আমার অসংখ্য কোটি প্রণাম নিবেদন করিতেছি। পরমারাধ্যা পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতার চরণে—ইত্যাদি ইত্যাদি—।

পত্রখানি আশ্চর্যই শুধু মনে হয় নি আমার সুলতা, একটি সত্যও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কোন দেশের সকল মানুষই পতিত হয় না। কোন ধর্মের এমন বিকৃতি কোন কালে ঘটে না, যাতে সব মানুষ বিকৃত হয়ে যায়। কোন কালেই এমন প্রমাণ নেই যা একটা জাতির সাধনার সবটুকুকে গ্রাস করে অবশেষে যা ফেলে রাখে তার সবই আবর্জনা। সেই কারণেই আজ মানুষ মাটি খুঁড়ে চলেছেই এবং তাদের মিলছেও অতীতের ধনরত্ন। সেকালে বিমলাকান্তের মত কিছু লোক ছিলেন। রেভ্যরেণ্ড কৃষ্ণমোহনদের দলকে যে গুড্‌ম সভা মারধোর করেছিল, তাদের যত অপরাধই থাক, এদের ছিল না। আর গুড্‌ম সভার বলেই সেদিন জাতটা বাঁচে নি। বেঁচেছিল এদের জোরেই।

সুলতা হেসে বললে—মতপার্থক্য থাকতে পারে।

—অর্থাৎ একে তুমি বাঁচা বল না। বল ভূতের উপদ্রবে জীবনের মৃত্যু।

সুলতা বললে—বললে ঝগড়া বাধবে, তর্ক উঠবে। তা করতে আমি আসি নি। আমি শুনতে রয়ে গেলাম, তাই বল।

—বলছি। তবে সেদিন পথের মোড় না-ফিরলে গোটা জাতটাও ক্রীশ্চান হয়ে যেতে পারত। এবং তাতে সম্ভবত তোমার মতে ভালই হত। আমরা তখন থেকেই কোটপেণ্টালুন পরতে শিখতাম। মন্দিরগুলো গির্জে হয়ে যেত। তার সঙ্গে মসজিদগুলো যেতো কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তাহলে তোমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন করতে না, করত এই মসজিদ-ওয়ালারা। তোমরা ক্রীশ্চান হয়ে সাদা গুরুদের অনুগমন করতে।

—না। কিন্তু ও রাথ সুরেশ্বর। বল, কড়চার কথা বল। আমি অবশ্যই বিমলাকান্তের এ আশ্চর্য দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের প্রশংসা করছি, নমস্কার জানাচ্ছি। চরিত্র যেখানে বড় হয়ে ওঠে সেখানে যা ধরেই সে উঠুক না কেন তাই সত্য, তাই শ্রদ্ধার, তাই প্রগ্রেসিভ।

—আর ঝগড়া রইল না। মিটিয়ে ফেললে তুমি। হাসলে সুরেশ্বর। তারপর শুরু করলে—এর পর তুমি যা বললে, তাই হল অর্থাৎ জিতলেন বিমলাকান্তই। জমিদার সোমেশ্বরের বজরাটা সেদিন আবার রওনা হল শ্যামনগর। এবার তিনি একা নন, সঙ্গে শ্রীরাজকুমারী কাত্যায়নী দেবী এবং জমিদার-কন্যা বিমলা। গেলেন না কেবল বীরেশ্বর। তিনি বাড়ীতে হিল সাহেবের কাছে রইলেন। রবিনসন সাহেবের কুঠীতে গিয়ে জানি

রবিনসনকে নিয়ে পাখী শিকার করে বেড়ালেন। তখন বন্দুক ছুঁড়তে শিখেছেন তিনি।

সোমেশ্বর এবং কাত্যায়নী গিয়ে জামাইকে বলেছিলেন—বাবা, তুমি দেবতা। আমরা বুঝতে পারি নি। ইষ্টদেবতার নামে শপথ করে বলছি বাবা, তোমার রান্না আর রাজরাজেশ্বর প্রভুর রান্না একরকম পবিত্রতার সঙ্গে হবে।

বিমলাকান্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। এবং এসেও ছিলেন। বিমলা নাকি হাত ধরে বলেছিল, যাবে না তুমি? আমি কি করে থাকব?

এর পর সোমেশ্বর বাড়ীতে জামাতা ও পুত্রের সংস্কৃত পড়ার জন্য পণ্ডিত এবং পার্সী পড়ার জন্য মৌলবী রেখেছিলেন, ইংরিজী শেখাতেন ওই পাদরী হিল সাহেব। কড়াই বাটা আর ভাত পরিতোষ সহকারে খেয়ে ভিক্টোরিয়া যুগের খাঁটি ইংরিজী শেখাতেন। পণ্ডিত লোক ছিলেন।

তিনি বলতেন, বীরা দি ইন্টেলিজেণ্ট, বিমলা দি ডিলিজেণ্ট। বিমলা খুব বড়া পণ্ডিটা হইবে। কিন্তু জিমিডার হইটে পারিবে না। বীরা জিমিডার হইবে। বিমলা টুমি যডি—শেষটা বলতেন না। কি সেটা তুমি অনুমান করতে পার। অর্থাৎ ক্রীশ্চান!

*　　　*　　　*

সুলতা, একটা সিগারেট খেয়ে নিই। একটু জলও খাব। বকেছি অনেক না? দাও, জলের গ্লাসটা অনুগ্রহ করে এগিয়ে দাও।

সিগারেট ধরিয়ে এক রাশ ধোঁয়া গিলে মুখে-নাকে উদ্গরীণ করে সুরেশ্বর বললে, এইসব উপকরণের মধ্য থেকে সেই অসুখের মধ্যে ফুরসীতে তামাক খেতে ইচ্ছে হত। পাঁচ-ছ দিন জ্বরে ভুগেছিলাম। তার মধ্যে মেজঠাকুমা আমাকে তাঁর ঠাকুরমার ঝুলি প্রায় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। এবং একদিন ডেকে এনেছিলেন জ্ঞাতি ভটচাজদের প্রবীণতম ব্যক্তিটিকে। তিনি সম্পর্কে তাঁর শ্বশুর হতেন। মেজঠাকুরদার থেকে বয়সে বড়। প্রায় আশির কাছাকাছি বয়স। ডেকেছিলেন আমার নাড়ী দেখতে। তিনি নাড়ী দেখে বলে দিতে পারেন, জ্বর কদিন থাকবে, কবে ছাড়বে। তিনি নাড়ী দেখে বলেছিলেন, সাদা জ্বর বউমা। ভয় নেই। পাঁচ দিন ভোগ। তবে কুইনিন যদি ফোঁড়ো তবে এক-আধ দিন কম হবে।

হয়েছিল তাই। কুইনিন ইঞ্জেকশনে তিন দিনে জ্বরটা বেমক্কা ছোট ঘোড়ার রাশের টানে বাগ মানার মত বাগ মেনেছিল কিন্তু পা ঠুকতে মাথা নিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে ছাড়ে নি, মানে একটু করে টেম্পারেচার আরও দুদিন হয়ে ছাড়ল।

সে যাক। পরে বলব।

ঠাকুমা বলেছিলেন, সেকালের কথা শুনবে তো ওঁকে ধর ভাই। উনি আমার খুড়শ্বশুর। তোমার ঠাকুরদার বয়সী। উনি অনেক জানেন।

—কি ব্যাপার?

—ও, রায়বংশের কথা শুনবে। জানে না তো। বাপ গেছেন অল্পবয়সে। মা এ বাড়ী আসেন না। আমি কাত্যায়নী দেবীর গল্প বলছিলাম।

—ওঃ, তিনি ছিলেন রাজার মেয়ে, এখানে বলত রাজকুমারী বউঠাকরুণ। আড়ালে বলত বাঘিনীঠাকরুন। শুনেছি, আমরা দেখি নি। তাঁর দাপে এ গাঁয়ে কোন অন্যায় কেউ করতে পারত না। স্বয়ং সোমেশ্বর রায় তটস্থ। পাদরী ছিল সাহেব পর্যন্ত তটস্থ। একদিন কি হিন্দু-ধর্মের নিন্দে করেছিল। তিনি শুনে বলেছিলেন—ওই পাদরী মিনসেরে বলিস তো ওই সব যদি বলবে তো ওর দাড়ি চাঁচিয়ে দেব। আবার ভক্তিমতীও ছিলেন। শুনলেন কাঁদীর বাড়ীতে সিংহরাজাদের রাধাবল্লভ ঠাকুর সোনার ফুরসীতে তামাক খান তিনবার। একবার বাল্যভোগের পর, একবার ভোগের পর, একবার রাত্রে। অমনি হুকুম হল, রাজরাজেশ্বরেরও সোনার ফুরসীর ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঁচ দিনই তিনি এসে নাড়ী দেখে যেতেন, ঠাকুমা তাঁকে মিষ্টি খাওয়াতেন, চা খাওয়াতেন, তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন সোমেশ্বর রায়ের গল্প। বলতে তাঁর দ্বিধা ছিল বোধহয়। সোমেশ্বর রায়ের কোন ভাল দিক তাঁর মনে স্মৃতির ঘরে বোধহয় স্থানই পায়নি। যেটুকু পেয়েছিল সেটুকু সবই তাঁর আমিরীর কথা। বিশেষ করে দেহবিলাসের।

সেদিন ঠাকুমা ছিলেন না। হঠাৎ বললেন—তাই তো হে, বলব কি করে? একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তা তোমার বয়স অনেক হয়েছে, ষোল অনেক দিন পার হয়েছে। আমি তো তোমার ঠাকুরদাদার খুড়ো। বাহাত্তুরে পেরিয়েছি। তা শোন। সরস করে বলেছিলেন, সোমেশ্বরের এখানকার নৈশজীবনের কথা। কাত্যায়নী দেবী এক কন্যা এক পুত্রের পর স্বামী থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, তাঁর ভয় ছিল, তান্ত্রিক গত হয়েছেন, আবার যদি সন্তান গর্ভে এলে তিনি পাগল হন অথবা মৃতবৎসা রোগ আবার ধরে! এইজন্যে কলকাতা থেকে তাঁর পরিচর্যার জন্য দাসী তিনি এনেছিলেন। কিন্তু সোমেশ্বর তাতেও তৃপ্ত হতেন না। রাত্রিকালে বজরায় তাঁর আসর বসত ব্রাত্য মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু জামাই বিমলাকান্ত আসতেই তাতে ছেদ টানতে হল। বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন, ভাই, সে আসর যেমন-তেমন আসর নয়। স্বর্গের দেবালয়ের আসরের মত আসর। সোমরসে বিভোর হয়ে সোমেশ্বর বসতেন চন্দ্রের মত আর ব্রাত্য মেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসত নক্ষত্রের মত।

শুনেছি। কানে-কানে বলেছিলেন, সে নাকি উলঙ্গের আসর। বাইরে বন্দুকধারী সিপাহী পাহারা দিত। বজরার কামরায় দরজা আগলে থাকত তারাচরণ হাড়ি। সে ছিল একটি ব্যাঘ্র বিশেষ।

সুলতা, হয়তো বুড়োর নিজের মনেও এ নেশার ঘোর কাটে নি। সেই নেশার ঘোরেই দন্তহীন মুখে গল্প করেছিলেন। বলা শেষ করেও হাসি মিলায় নি তাঁর। বৃদ্ধের জিভখানা ফোকলা মুখের মধ্যে থরথর করে কাঁপছিল। বলব কি তোমাকে, তার ছোঁয়াতে আমার জরজর্জর দেহে-মনেও একটা নেশা লেগেছিল। সেই সময় তোমাকে একখানা পত্র লিখেছিলাম তাতে জ্বরের কথা লিখি নি, লিখেছিলাম এখানকার গোয়ানপাড়ার মেয়েদের কথা। তাতে খুব রসিকতা এবং উল্লাস ছিল। সেটা আমার নেশালাগার সত্যকে গোপন করবার জন্যেই বোধহয় লিখেছিলাম।

গোয়ানদের মেয়েগুলো কাঁসাইয়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকত—ঐ বাবু সাহেবের নোকর ! এ রঘু মহারাজ !

রঘু যেত না—যেতেন মেজঠাকুমা—বলতেন, কি লা বজ্জাত ছুঁড়ীরা ?

—বাবু কেমন আছে গো মাঝলা বিবি রাণী ।

—মরণ ! ফের যদি বিবি বলবি তো ডিকুকে বলব, চুলের ঝুঁটি ধরে কিল মারবে পিঠে। বিবি কি লা ? মা বলতে পারিস না ?

ওরা হাসত । খিলখিল করে হাসত ।

মেজঠাকুমা বলতেন, বল না পোড়ামুখীরা কি বলছিস ?

—বললাম তো । বাবু হুজুর কেমুন আছে গো !

—জ্বরে আছে ! যা পালা ।

কোন কোন দিন আমি নিজেই যেতাম ! ওরা যে কত আহা উঁহু করত সে কি বলব। হায় হামারা নসীব ! বাবুর কাহে বোখার হল গো ! হামার কেনো হলো না ! আঃ বাবু ! তোমার চাঁদের পারা মুখ শুখায়ে গেল গো । রোজী বেচারীর নিদ নাই গো !

সঙ্গে সঙ্গে দলটাকে দলটা হেসে উঠত । আমার অসুস্থ দেহের উত্তপ্ত রক্ত আরও উত্তপ্ত হত । মনে হত রায়বংশের ধারাটা যেন এই রক্তসমুদ্রের ঈশান কোণে ঝড়ের মত উঁকি দিচ্ছে ।

সাত দিনের দিন, ছদিন উপবাস করে যেদিন পথ্য করলাম সেদিন, মেজঠাকুমা কাত্যায়নীর মৃত্যু পর্যন্ত এসে পৌঁচেছিলেন ।

তবে মৃত্যুর কথাটা বলি । সেটা আমার ভাল লেগেছিল ।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন, ভাই, স্বামী পুত্র এবং জামাই রেখে কাত্যায়নী দেবী ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেলেন । সজ্ঞানে দেহত্যাগ যাকে বলে, তাই । সামান্য তিন দিনের জ্বর । তিন দিনের দিন সকালে স্বামীকে ডেকে বললেন, ও গো, আজ আমি যাব ।

—সে কি ? কি যা তা বলছ ?

—ঠিক বলছি । কবরেজ ভাল আছে বলে গেল, ও ধরতে পারলে না । আজ যেন কোথাও যেয়ো না । তাই হল ভাই । সেই রাত্রেই গেলেন । স্বামীকে ডেকে বললেন, তোমার পা দুটো আমার মাথায় ঠেকিয়ে দাও । আবার আসছে জন্মে যেন তোমাকে পাই । এই আশীর্বাদ কর ।

হাউহাউ করে কেঁদেছিলেন সোমেশ্বর ।

কাত্যায়নী দেবী ধমক দিয়েছিলেন, দেখ দেখ, বুড়োবয়সে ছেলে জামাই মেয়ের সামনে ঢঙ দেখ ! চুপ কর ! চুপ কর বলছি ! হ্যাঁ !

জামাইকে বলেছিলেন—বাবা, তুমি আমার দেবতা । বিমলাকে তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি ।

ছেলেকে বলেছিলেন, আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিস । আমি হারামজাদা বললে, তুই আমাকে হারামজাদী বলেছিস । যা বারণ করেছি তাই করেছিস । বুড়ো বাপকে যেন কষ্ট

দিস না! বুঝলি!

বীরেশ্বর ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন।

—আর বিমলাকান্ত দেবতা। তার অসম্মান করিস না। তোর দিদি—

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি দিদিকে যত ভালবাস তার থেকে আমি দিদিকে বেশী ভালবাসি। তুমি বরং চুপ কর। এত বকলে অসুখ বাড়বে। অসুখ হয়েছে ক'দিন, অমনি মরব বলে একটা হৈ-হৈ লাগিয়ে দিলে!

—তুই একটা হারামজাদা রে! একেবারে নাস্তিক। আমি বুঝতে পারছি, আজ আমি যাব! তাই তিনি গিয়েছিলেন। বীরেশ্বরেরও ওকথা বলার দোষ ছিল না, কারণ জ্বর মাত্র তিন দিনের। তিন দিনের সকালবেলা থেকে ওই শুরু করলেন, সন্ধ্যে নাগাদ চলে গেলেন।

মেজঠাকুমা হেসে বলেছিলেন, কাত্যায়নী বলতেন, চিঠিতেও স্বামীকে নাকি লিখেছিলেন। সতী-যাওয়াকে যারা অত্যাচার বলে উঠিয়ে দিচ্ছে, দিতে চাচ্ছে তারা ম্লেচ্ছ, তারা যবন। স্বামীকে বলেছিলেন, তুমি যদি দরখাস্তে সই কর তবে তোমার মুখ আমি দেখব না। সতীপ্রথা উঠে গেল, কোন লাট জানি উঠিয়ে দিলে, তোর মেজঠাকুরদা নামটা তার বলতেন।

আমি নামটা বলে দিয়েছিলাম সুলতা। লর্ড বেন্টিঙ্ক!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। লাটসাহেব বেন্টিক। কাত্যায়নী গাল দিতেন বেন্টিঙ্ককে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলতেন, আইন করলি করলি; কলার পাতে লেখা রইল। কাত্যায়নী যদি বিধবা হয় তাহলে সে তোর ওই আইন মানবে না, মানবে না, মানবে না। সতী সে যাবেই।

সেইটেই তাঁর পূর্ণ হল না। তার বদলে সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে দলমল করে চলে গেলেন।

তাঁর চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ হয়েছিল। সে উপলক্ষ্যে কীর্তিহাটের ব্রাহ্মণদিগে সবৎসা গাভী দান করেছিলেন। সে সব বড় গাই। মেজঠাকুমা বলেছিলেন, ভাগলপুরের গাই। গ্রামে বড় পাঞ্জাবী গাইকে ভাগলপুরের গাই বলত। সধবা যে, ব্রাহ্মণ শূদ্র সব, শাড়ী সিঁদুর শাঁখা দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অতিথিশালা।

* * *

সুলতা, এসব জেনে যখন শুলাম রাত্রে তখন কাত্যায়নীর মৃত্যু শ্রাদ্ধ সব কোথায় গেল—মনে জেগে রইল সোমেশ্বর রায়ের ওই নৈশআসরের কথা। যারা সেদিন অ্যাসেম্বলীতে জমিদারের ব্যভিচারের কথা বললেন, তাঁদের দোষ দেব না। আমার পূর্বপুরুষের সব কথা বাদ দিয়ে ওইটে যখন আমার মনেই সাড়া তুললে, তখন আর তাঁদের দোষ দেব কি করে?

শেষ পর্যন্ত নিজের উপর রাগ করে বললাম, যাক ও খাতাপত্র ঘেঁটে আর কাজ নেই। যে বিষ চাপা আছে, সে চাপাই থাক। তাকে খুঁড়ে বের করে কাজ নেই। ছেদ টেনে দেওয়াই ভাল কীর্তিহাটের কড়চার। মন থেকে মুছে ফেলাই ভাল।

মুছে দিয়ে ছেদ টেনে দিতে চাইলেও তা হয় না। ইতিহাসের একটা চক্রযন্ত্র আছে, তাতে অতীতকাল দাঁতওলা চাকার মত বর্তমানের চাকার গর্তে গর্তে ঢুকে নিজের সঙ্গে যুক্ত রেখে মানুষের জীবনকে চালায়। অতীতের কর্ম কর্মফল হয়ে তার আস্বাদ বর্তমানকে আস্বাদন না করিয়ে ছাড়ে না। সে তিক্ত হোক—বিষ হোক—আর অমৃত হোক বা মধুরই হোক। কাল যা খেয়েছি, তার পুষ্টিতেই আজ বাঁচি। এক যারা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তপস্যা করে, সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়—বুদ্ধ চৈতন্য যাঁরা তাঁরা আলাদা।

সুরেশ্বর তা নয়। সে কি ক'রে রেহাই পাবে স্থূলতা, এ থেকে ? জ্বরের সময় উপবাস করা অবস্থায় যা ভেবেছিল, সংকল্প করেছিল, তা পথ্য পাবার দিনটিতেও উল্টে গেল। অবিচার সুরেশ্বরের উপর করো না, সে ইচ্ছে ক'রে তা করে নি।

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে। সে-দিন সে পথ্য করে উঠেছে। মেজঠাকুমা কইমাছ আনিয়ে ঝোল বেঁধে বসে পথ্য করিয়েছেন, এমন সময় তার নায়েব এল—আজই একবার ক্যাম্পে যেতে হবে—ওঁরা হাজির হয়েছেন—আপত্তি দিচ্ছেন। পরিশেষে বললে—ব্যাপার খুব জটিল ছোটবাবু !

—সেই বাড়ীরই ব্যাপার তো ! বাড়ী দেবোত্তরের টাকায় হয়েছে এই তো ? ও আর আমি পারছি না, ঘোষালমশাই। নিন, তাই নিন ওঁরা।

—ব্যাপারটাকে এমন ছোট ক'রে দেখবেন না বাবু ! জাল ওঁদের প্রকাণ্ড। মতলব সাংঘাতিক। আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।

—কি হ'ল ?

—কাল ওঁরা গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। প্রণবেশ্বরবাবু, কল্যাণেশ্বরবাবু আর ধনেশ্বরবাবুর মেজছেলে ভূপেশ্বর তিন জন মিলে গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে সব থেকে বড় দেওয়ানী উকীল সুধাবাবুর কাছে। প্রণবেশ্বরবাবু কলকাতার ব্যারিস্টারের কাছ থেকে যে মত এনেছিলেন তা যাচাই করতে। সুধাবাবু বলেছেন—হ্যাঁ, এ একটা খুব জোরালো পথ বটে। পয়েন্ট খুব স্ট্রং পয়েন্ট।

—বুঝলাম—। কিসের ? এরই তো ?

—শুনুন আগে। এখানে যদি এই হয় যে সব দেবোত্তর। বাড়ী দেবোত্তর। দেবোত্তরের বাইরে সম্পত্তি নাই—তা হলে—সেই নজীরে এঁরা—ওঁদের পূর্বপুরুষ কলকাতায় যে-সব বাড়ী পেয়েছিলেন, তাও দেবোত্তর হবে। জানবাজারের আপনার অংশের বাড়ী, তাও তাই হবে। হবে না ? বুঝে দেখুন ! সেটেলমেণ্টের পরচার বলে, এখানকার সম্পত্তি নিয়ে মামলা ক'রে, তারই নজীরে তখন কলকাতার বাড়ী নিয়ে মামলা করবে। শিবেশ্বরবাবু কলকাতার বাড়ী বেচেছেন—তা ক্যান্সেল হবে, যজ্ঞেশ্বরবাবু বেচেছেন—সে ক্যানসেল হবে, আপনার জানবাজারের বাড়ীর পার্টিশনে পাওয়া তাও ক্যানসেল হবে। বুঝে দেখুন !

চমকে উঠল সুরেশ্বর। অর্থাৎ তাকে একরকম সর্বস্বান্ত হ'তে হবে। জানবাজারের বাড়ীই তার একমাত্র সম্পত্তি—যা সমস্ত দেবোত্তরের মূল্যের চেয়েও মূল্যবান। এর তিন আনা অংশ মাত্র থাকবে তার।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল তার। পরক্ষণেই হল দারুণ ক্ষোভ—তারপর সেটা রূপান্তরিত হ'ল দুরন্ত ক্রোধে। ওঃ!

দুর্যোধন কপট পাশায় যে রাজ্য চৌদ্দ বছরের জন্য জিতেছিলেন, চৌদ্দ বছর পর সেই রাজ্য ফিরে দেবার সময় বলেছিলেন—বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। রায়বাড়ীর পার্টিশন কপট পাশার দান নয়। কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে যে আপোস বিভাগে রাজ্যভাগ হয়ে কৌরবেরা হস্তিনাপুরে—আর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেছিলেন; তাই নাকচ করে সবটা গ্রাস করবার জন্য এটা ওদের পাশা খেলার চ্যালেঞ্জ—কপট পাশার দান ফেলার মত ব্যাপার। সুরেশ্বর যুধিষ্ঠির নয়—সে তাকে খুব পছন্দও করে না। সে অর্জুন ভীম এই দু'জনের ভক্ত। ও পাশার দান ও মেনে নেবে না। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে সে চুপ করে ভাবলে, বললে—দলিল আবার ভাল ক'রে দেখুন।

—দেখেছি বাবু। দলিলে বাড়ীর কথার কোন উল্লেখ নেই। ঠাকুরবাড়ীর কথাই আছে। কিন্তু ওদের যুক্তিটা তো বুঝছেন! দেবোত্তরের টাকা থেকে তৈরী সব। দেবোত্তরের বাইরে কিছু নেই। সুতরাং বাড়ীও দেবোত্তর!

—কলকাতায় যে-ব্যবসা ছিল সোমেশ্বরের, তার থেকেই বলতে গেলে সম্পত্তি কিনেছিলেন তিনি। পত্তনী নিয়েছিলেন। বাড়ী তা থেকে হয়েছে।

—কিন্তু তার নমুদ কোথায়? নমুদ চাই।

—কেন? জানবাজারে খাতাপত্র নিশ্চয় থাকবে।

—আজ্ঞে না। সেসব আছে দেবেশ্বর রায়ের আমল থেকে। তাও কলিয়ারীর খাতাপত্র, সেসব বড়বাবু যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছে। তার আগেকার যা কিছু খাতাপত্র, সে রায়বাহাদুরের আমল থেকে এখানে এসেছিল।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে পড়ে গেল, মেজঠাকুমা বলছিলেন, সোমেশ্বরের কন্যা বিমলার বিবাহের আটদিনের মধ্যে অন্দরের নতুন মহলের ভিত কাটা হয়েছিল। সাল-সন-মাস এ পাওয়া গেছে একরকম কিন্তু খাতা চাই। দেবোত্তরের খাতা আছে। দেবোত্তর থেকে এ-খরচ হয়ে থাকলে নিশ্চয় খরচ থাকবে।

দেবোত্তরের খাতার গাদা সে পেয়েছে। সেদিন খাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রাজরাজেশ্বরের মুকুট এবং গয়না খরিদের খরচ দেখেছে। সে খাতার গাদা ওল্টাতে ওল্টাতে বিমলার বিয়ের বছরের খাতাটা পেলে। বিয়ের খরচের একজায়গায় ফর্দ তার পড়া ছিল। সে খাতাখানা ওল্টাতে লাগল। বিয়ে হয়েছে আষাঢ় মাসে। বৈশাখ থেকে সে বিমল সায়র কাটানোর খরচের আরম্ভ আবিষ্কার করলে। কল্যাণীয়া শ্রীমতী বিমলা দেবী মাতার শুভবিবাহ উপলক্ষে নূতন পুষ্করিণী বিমল সায়র কাটানোর শুভারম্ভ; মুনিষ (অর্থাৎ মজুর) দুইশত ষোলজন

দৈনিক খাটুনীর দাম—এক আনা হিসাবে মোট সাড়ে তের টাকা।

পাতার পর পাতা ওল্টালে সে। নজরে পড়ল বিচিত্র, অবিশ্বাস্য অনেক কিছু। গব্য ঘৃত খরিদ পাঁচ টাকা মণ দরে ষোল সের ঘৃতের দাম—দুই টাকা। কিন্তু সেসব দিকে মন দেবার সময় ছিল না। বিয়ের দিন থেকে আটদিনের খরচ সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজে পেল কিন্তু অন্দরমহলের বা কোন বাড়ীঘরের পত্তনের জন্য ভিত খোঁড়ার খরচ সে পেলে না। ভিত খোঁড়া শুধু হয় না। ভিত পূজা হয়। সোনা-রূপো-তামা দিয়ে বাস্তুদেবতার অর্চনা হয়। তার কোন নিদর্শন মিলল না।

এই সময় এলেন মেজঠাকুমা। সুরেশ্বর বললে—তুমি ঠিক জান ঠাকুমা, ওই মাঝের মহলটা বিমলা দেবীর বিয়ের আটদিনের মধ্যেই পত্তন হয়েছিল ?

—তাই তো গল্প শুনেছি। যার তার কাছে তো শুনিনি, তাঁর কাছে শুনেছি। তাছাড়া মাটির পোড়ানো টালিতে সাল-সন তো লেখা আছে রে। একবারে দ্বিতীয় মহলে ঢুকবার যে বড় দরজাটা আছে, তার মাথায় লাগানো আছে। পুসুশীর অনন্তরাজ, মেদিনীপুরের ফারাতুল্লা রাজ এরাই গেঁথেছে। নক্সা কাটবার মিস্ত্রী এসেছিল কলকাতা থেকে।

সুরেশ্বর নায়েবকে বললে, দেবোত্তরের খাতায় কোন খরচ নেই। এই খাতা দেখালেই হবে।

—ঠিক তা মানবে না। বলতে পারে—আরও খাতা ছিল।

—তা বলুক। সেও ওদের বের করে দেখাতে হবে। শুধু আপত্তি দিলেই হবে না। ওদেরও দেখাতে হবে !

—তাহলে আপনি একবার যদি আসেন—

—চলুন।

মেজঠাকুমা বললেন, আজই পথ্যি করে উঠেই রোদে রোদে যাবি কি ? ম্যালেরিয়া জ্বর, অম্বল হবে আর হুঁ-হুঁ করে কাঁপন দিয়ে আসবে। তুই বরং চিঠি লিখে হাকিমের কাছে সময় চেয়ে পাঠা।

কথাটা সমীচীন বলে মনে হল। বেশ যেন ঘুমের আমেজও ধরে আসছিল। তাছাড়া চড়া রোদ্দুর মাথায় করে খারাপ মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি ওই মেজতরফের ধনেশ্বর প্রমুখদের ছোঁয়াচে বিশ্রী কিছু করে বসে সে, এই ভয়টাও হল। মাথাটা সত্যিই যেন উত্তপ্ত প্রখর হয়ে রয়েছে। কলকাতায় ফ্যানের তলায় যে-মেজাজ গড়ে উঠেছে, মেদিনীপুরের কড়া রোদের আঁচে ঝলসে সে-মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। একখানা কাগজ টেনে নিয়ে সে দরখাস্তের ফর্মে একখানা পত্র লিখে দিলে নায়েবের হাতে—এটা দেবেন, তিন-চার দিন পর যেদিন দিন দেবেন, আমি যাব। লিখেও দিয়েছি, মুখেও বলবেন।

নায়েব চলে গেল। সুরেশ্বর একটা সিগারেট ধরিয়ে গিয়ে কাঁসাইয়ের দিকের জানালাটার ধারে দাঁড়াল। বেলা বারোটা বাজছে। সূর্য প্রখর হয়ে উঠেছে। ওপারে বনটা স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রায়। ক্বচিৎ দুটো চারটে পাখী এ-গাছ থেকে উড়ে ও-গাছে বসছে। গোটা দুয়েক ঘুঘুর সেই একটানা করুণ ঘু-ঘু, ঘু, ঘু-ঘু ঘু শব্দ, একটা এদিক একটা ওদিক

থেকে ভেসে আসছে। আর কয়েকটা বনকাক ডাকছে কক্‌-কক্‌ শব্দে। প্রখর উত্তপ্ত বাতাসের স্পর্শ তার মুখে-বুকে লাগছে। কংসাবতীতে জল এখন কম, ওপারে বালির চড়া পড়েছে। জলস্রোতটা প্রায় বিবিমহলের বনেদের হাতবিশেক দূরে বাঁধানো পোস্তার গা ঘেঁষে চলছে। কাঁসাইয়ের জল কাঁচা স্বচ্ছ, তাতে স্রোত ক্ষীণ, ক্ষীণ স্রোতের ধারায় দুপুরের সূর্যের ছটা গলানো রূপোর মত ঝলছে, মনে হচ্ছে তার উত্তাপও যেন অনুভব করা যায়। দুটো কুকুর উত্তাপক্লিষ্ট হয়ে জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ পিছনদিক থেকে মেজঠাকুমা এসে বললেন---সর।

পিছনের দিকে সুরেশ্বর তাকাতেই বললেন---জানালা বন্ধ করে দি। বিছানা করে দিয়েছে রঘু, শুগে যা। ভালো লাগবে। ছুঁড়িদের আসতে এখনও দেরী আছে। ওঃ কি দরদ বাবুসাহেবের জন্যে ওদের! অর্থাৎ গোয়ান মেয়ে।

সুরেশ্বরের জ্বরের ক'দিন তারা রোজ খোঁজ নিয়েছে। বাবুসাহেব কেমন আছে? উত্তর মেজঠাকুমা দিয়েছেন—মরণ মুখপুড়ীদের, বাবুসাহেবের জন্যে চোখে ঘুম নেই। যা—পালা। বাবুর জ্বর হয়ে আছে।

সুরেশ্বর এসে বিছানায় গড়িয়ে প'ড়ে বললে—যার মেজঠাকুমা নেই তার কেউ নেই।

ঠাকুমা বললেন—তুই বড় ডেঁপো!

—তুমিই ক'রে তুললে!

—তোর সঙ্গে ফক্কুড়ি করবার সময় নেই আমার। আমি চললাম ঠাকুরবাড়ী, ভোগের সময় হয়েছে। তোর জ্বরের আগে বলেছিলাম—ভোগের মাছের মুড়ো যেন তোর জন্যে আসে। পাঠায় নি। তার পরদিন আমার ভাজ মরল, সেখানে গেলাম, তুইও গেলি, তার পরদিন থেকে তো জ্বরে পড়লি। আজ দাঁড়িয়ে থেকে মুড়ো এখানে পাঠাব তবে আমার কাজ!

—কি হবে? আমি তো খেয়েছি।

—ওবেলা পর্যন্ত দিব্যি থাকবে, ওবেলা খাবি। তুই যেন উঠে পড়বি নে বুঝলি! একটু ছবি-টবি আঁক না। খেয়ে ঘুমুলেও অম্বল হয়। বুঝলি। আমার ফিরতে দেরী হবে। সেই সন্ধ্যেবেলা। আমি ওই খাতা খুঁজব! অনেক খাতা সুখেশ্বর হাতিয়ে রেখেছিল। কল্যাণকে পেটে পুরে বের করবার চেষ্টা করব। আমি ওকে টাকা কবলাব। খাতা দিলে সেটা দিবি। অ্যা!

—তুমি মেজদি অদ্ভুত!

—কেন রে?

—তুমি না পারো কি বল তো? মেজঠাকুরদার মত মানুষকে বশ মানাতে পার—ঝগড়া করতে পার। গোয়েন্দাগিরি করতে পার।

—আরও পারি রে। ল্যাভেণ্ডার সাবান মেখে কলঙ্ক কিনতে পারি। তুই যে তুই কলকাতার আমীর তোকেও বশ মানাতে পারি।

বলে হেসে তিনি চলে গেলেন। সুরেশ্বর প্রসন্ন বিস্ময়েই মুগ্ধ হয়ে ঠাকুমার কথা ভাবছিল

ছাদের কড়িকাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ টানাপাখাটা সচল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বুঝলে সুরেশ্বর ; —মেজঠাকুমাই পাখাটানা ছোঁড়াটাকে, কিল না মারুন, ধমক মেরে সচেতন ক'রে দিয়েছেন।

চোখ জড়িয়ে আসছিল আরামে। ঘুমিয়েই পড়তো, হঠাৎ ওই বন্ধ জানালাটার ওপার থেকে বোধহয় কাঁসাই নদীটাই খলখল ক'রে যেন হেসে উঠল।

গোয়ান মেয়েগুলো এসেছে নদীর ধারে তার জানালার সামনে।

তোমাকে বলব কি সুলতা, সে স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আমি আজও অনুভব করি। এবং শিউরে উঠি।

আমার বুকের ভিতরে যেন ওই হাসির প্রতিধ্বনি উঠল, আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মধ্যে। কান দুটো মুহূর্তে গরম হয়ে উঠল। হাতের তেলোয় ঘাম দেখা দিল। আমি শুয়ে থাকতে পারলাম না। রায়বংশের রক্ত উদ্বেল হয়ে উঠল, আমি বিছানা থেকে উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। হাঁপাচ্ছিলাম এবং অন্ধকারের মধ্যেও নিষ্পলক হয়ে চেয়ে ছিলাম কিন্তু কিছু দেখি নি। ভয় এবং আকর্ষণের নিদারুণ দ্বন্দ্ব হচ্ছিল। তারই মধ্যে আকর্ষণই জিতেছিল। জানালার খড়খড়ি সন্তর্পণে তুলে চোখ রেখেছিলাম। খড়খড়িতে চোখ রেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যা দেখলাম, তা দেখব এ কল্পনা ছিল না। কল্পনায় ছিল ওরা দল বেঁধে কাঁসাইয়ের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সাড়া দিচ্ছে আমাকে। আমি যে কেমন আছি সে খবর ওরা রাখে, দু তিন বেলা রাখে। ভিকু পিদ্রু য' বার পাড়ায় যায় ত' বার আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে মুখে মুখে এক একটি বুলেটিন ছড়িয়ে দেয়। ওরা তার উপরে এই ভরাদুপুরে কাঁসাইয়ের ওপারে ডাল ভাঙতে পাত কুড়াতে এসে একবার খবর নিয়ে যায়। আজ নিশ্চয় খবর পেয়েছে যে, বাবুসাহেব আজ ভাত সুরুয়া খেয়েছে, সুতরাং বন্ধ জানালার ধারে এসে ওরা হেসে সাড়া দিয়ে ডাকছে। কিন্তু তা নয়। যা দেখলাম সুলতা, সে কল্পনার বাইরে। মেয়েগুলো কাঁসাইয়ের জলে নেমেছে, সামান্য স্বল্পবাস অর্থাৎ ডুরে গামছা পরে এবং উদ্দাম হয়ে সাঁতার কাটছে আর হাসছে।

রবীন্দ্রনাথের কাশীর মহিষী করুণার যৌবনোচ্ছলা শত সখীর মত ব্যাপার। তফাত সেটা ছিল শীতকাল, কাশীর শীত, সুতরাং তারা কিনারার উপরে উঠে ছুটোছুটি করেছিল আর এরা এই প্রখর গ্রীষ্মে কাঁসাইয়ের এক বুক জলে উবছে উঠছে, সাঁতার কাটছে আর জল ছুঁড়ছে আমার জানালার দিকে এবং খিলখিল ক'রে হাসছে।

কাচস্বচ্ছ জলের ভিতর অর্ধনগ্ন নারীদেহ, সে যে কি মোহের সঞ্চার করে পুরুষের মনে—সে তুমি নারী তোমাকে বোঝাতে পারব না। পুরুষে অনুমান করে বুঝতে পারে। আদিম উষার কাল থেকে প্রকৃতি এমনি করেই পুরুষকে হাতছানি দেয়। পুরুষ যেখানে সভয়ে মা ব'লে কন্যা ব'লে সরে এসেছে সেখানে সে বেঁচেছে, আশীর্বাদ পেয়েছে। আর যেখানে তাকে প্রিয়া বলে দু হাত মেলে এগিয়ে গেছে সেখানে তাকে সে পায়ের তলায় ফেলে বুকের উপর চড়ে নেচেছে। জীবজীবনে প্রকৃতি প্রথমদিকে পুরুষকে কাছে ডেকে তার সঙ্গে নর্মলীলা শেষ ক'রে খেয়ে পেটে পুরেছে! তবু সেই কাল থেকেও তো পুরুষের এই সর্বনাশীর মোহে

তার পিছনে ছোটার শেষ নেই। বুকের রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠল আমার। তোমাকে দেখে কখনও এ মোহ জাগে নি। এমন কি ওই সেই শেফালির ঘরে টাকা দিতে গিয়েছিলাম, ওদের পাড়ায় পথের মেয়েকে টাকা দিয়ে তাদের বিস্মিত করে দিতে চেয়েছিলাম, তাদের দেখেও এ মোহ জাগে নি!

দেহ বোধহয় অবশ হয়ে যাচ্ছিল—মন মোহমগ্ন হচ্ছিল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে জানালাটা সজোরে খুলে গিয়ে কপালে আমার আঘাত করলে, কপালটা কেটে গেল। আমার মোহ ভেঙে গেল। আমি চোরের মত ফিরে এলাম। কপালে রক্ত পড়ছিল, রঘুকে ডেকে বললাম—তুলো টিঞ্চার আইডিনে ভিজিয়ে লাগিয়ে দিয়ে ন্যাকড়া বেঁধে দিতে।

বসে ভাবতে ভাবতে গোপেশ্বরের কথা মনে পড়ল।

শিউরে উঠলাম। নিজেকে তিরস্কারই করছিলাম, কঠিন তিরস্কার।

অনেকক্ষণ পর মন শান্ত স্থির হল। আমি কাজের অভাবে ওই পুরনো খাতাগুলোই দেখতে লাগলাম। ওল্টাতে ওল্টাতে এসে পড়ল রাজরাজেশ্বরের মুকুট খরিদের পাতাটা। মাঃ হ্যামিল্টন এণ্ড কোং, মোকাম কলিকাতা, মূল্য এক হাজার টাকা!

কালীমায়েরও সোনার মুকুট ছিল। সে শুধু সোনার। তাতে হীরে ছিল না। দাম কম ছিল। সোনার ভরি তখন চৌদ্দ-পনের-ষোল। দশ ভরি সোনার মুকুটের দাম একশো ষাট আর বানি। মানে মজুরী—সে কত? বেশী হলে পঞ্চাশ টাকা। কুড়ারাম জহরত কেনেন নি। তিনি সোনা কিনতেন। সোমেশ্বর কিনেছিলেন জহরৎ। তাঁর হাতে হীরের আংটি ছিল, দাম আড়াই হাজার টাকা। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাবার হাতের আংটি হারিয়েছিল, তার দাম ছিল পঁচিশ হাজার টাকা। সে আংটি শ্যামবাজারের এক মিস্ত্রী কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিয়ে বকশিস পেয়েছিল এক হাজার টাকা। সোমেশ্বর কালীর ভক্ত তা হ'লে ঠিক ছিলেন না।

খাতা ওল্টাতে লাগলাম।

কত বিচিত্র আইটেম; কত দুর্বোধ্য খরচ। বারবরদারী খাতে খরচ। মানে বুঝতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বুঝেও বুঝতে পারিনি। ইনাম বকশিস সহজ কথা। বারবরদারী হল ট্রাভেলিং খরচ। টি-এ। রোশনাই জলুস থেকে শুরু করে সংসার খাতে খরচে খুঁটে দেওয়ার খরচ—প্রত্যেকটি লিখে গেছে। জলসা নৃত্যগীত খাতে মোটা মোটা খরচ। বকশিস খাতে বাঈজী বিদায়ে দরাজ হাতের পরিচয়। দানখয়রাত খাতে খরচ তার থেকে কম নয়। ভিক্ষুককে এক পয়সা থেকে ব্রাহ্মণকে এক টাকা থেকে একশো টাকা। আবার হাজার টাকাও আছে। কীর্তিকলাপে মন্দিরনির্মাণ, পুষ্করিণী-কাটা টোল-প্রতিষ্ঠা ইস্কুল-প্রতিষ্ঠা মেদিনীপুর সরকারী স্কুলে দান চার অঙ্কের হিসাব। জমিদারী তদ্বির উন্নতি খাতে খরচ দেখে চমকে উঠেছিলাম। কাঁসাইয়ের ধার বরাবর সাত আট মাইল লম্বা বাঁধ মেরামত খাতে কয়েক হাজার টাকা। হঠাৎ একখানা খাতায় চোখে পড়ল শুভবিবাহ খাতে খরচ। শ্রীমান দেবেশ্বরের বিবাহের খরচ।

আমার মন কৌতূহলে উতলা হয়ে উঠল।

পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলাম। আরম্ভ হয়েছে সিদ্ধি থেকে। সিদ্ধি এক পয়সা।

*　　　*　　　*

সে বিরাট খরচ।

কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে এক পয়সা থেকে হাজার দু হাজার পর্যন্ত দফায় দফায় খরচ জুড়ে সে এক পাঁচ অঙ্কের হিসাব। বারো হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা কয়েক আনা কয়েক গণ্ডা। দফায় দফায় পড়ে গেলাম। প্রতিটি আইটেম। কলকাতায় বউভাত হয়েছিল একটা। আর একটা বউভাত হয়েছিল কীর্তিহাটে। ব্রাহ্মণভোজন, শূদ্রভোজন, অপরাপর ভোজন, গোয়ানদের সিধা, মুসলমানদের সিধা। বারুদের কারখানা। রোশনাই খরচ। কলকাতায় বাঈনাচ। কীর্তিহাটে যাত্রাগান। লাঠিয়াল বিদায়। কত খরচ, খরচের অন্ত নাই। এর মধ্যে পেলাম একজনের নাম। ঠাকুরদাস পাল। ঠাকুরদাসের ও তস্য পুত্র-কন্যার পোশাক বাবদ। গাত্রহরিদ্রা লইয়া যাইবার খরচ মাঃ শ্রীঠাকুরদাস পাল। শ্রীঠাকুরদাসদের পাথেয়। আবার দেখলাম অষ্ট-মঙ্গলার খরচ বরকন্যাসহ ঠাকুরদাস তত্ত্ব লইয়া যায়, তদ্বাবদ খরচ একশত টাকা। কন্যা বাড়ীতে চাকর-বাকরদের বকশিস বাবদ একশত টাকা, জিম্মা ঠাকুরদাস পাল।

আশ্চর্য এই ঠাকুরদাস পাল।

পিতামহ দেবেশ্বর রায়ের বিবাহের সর্বত্র যেন সে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল। আমার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

চাকর? চাকরের আগে তো শ্রী লেখার রেওয়াজ ছিল না।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম সুলতা। আমার প্রপিতামহ রত্নেশ্বর রায় ছিলেন সে-আমলেরই শুধু নয় সকল আমলের দুর্লভ মানুষ। শুনেছি প্রথম জীবনে মামা বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে বিরোধ করেছিলেন তাঁর দুর্দান্ত জমিদারপনার প্রতিবাদে। অথচ এ বংশের দৌহিত্র হিসেবে তিনিই ছিলেন রায়েদের উত্তরাধিকারী ; পরে মামার সঙ্গে মিটেছিল, মামা তাকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। তিনি মামার সঙ্গে বিবাদ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তা হলে সকলেই বলত, তিনি ঝগড়া করেছিলেন সম্পত্তির জন্য। তিনি নীল বিদ্রোহের সময় নীলকরদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে তিনি ইস্কুল করেছিলেন দুটো। চ্যারিটেবল হসপিটাল দিয়েছিলেন। ল্যাণ্ডহোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বর ছিলেন। সেকালের বড় বড় ধনী জমিদারমহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁর কজন পরম প্রিয়পাত্র ছিল, তাঁরা গ্রামজীবনের সাধারণ লোক। তাঁদের ভাইয়ের মত সমাদর করতেন। ঠাকুরদাস তাহলে তাঁদের কেউ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল শ্যামনগরের ইস্কুলের একটা বৃত্তি আছে, মেডেল আছে, যার নাম ঠাকুরদাস স্কলারশিপ, মেডেলটার নাম ঠাকুরদাস মেডেল। গোল্ড সেণ্টার্ড মেডেল। তাহলে? কে ঠাকুরদাস পাল? খাতা ওল্টাতে লাগলাম যদি আর তার কোন পরিচয় মেলে। কিছুদিন পরেই খরচ দেখলাম ঠাকুরদাস পালের পুত্রের বিবাহে বধূ সমাদরের যৌতুকের জন্য গহনা খরিদ একদফা এক হাজার টাকা!

সে আমলে এক হাজার টাকা তো কম নয়। তখন চৌদ্দ টাকা সোনার ভরি! তাছাড়া

সাধারণ গৃহস্থঘরে সোনার গহনার প্রচলন হয়নি। গহনা ছিল রূপোর। উল্টেই যাচ্ছিলাম খাতার পাতা। নানান বিচিত্র খরচ। সেকাল যেন খরচের আইটেমগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের একটা বিচিত্র রূপ উদ্ঘাটিত করছিল। কথকতার খরচ, রামায়ণ গানের খরচ, গায়ক বিদায়, আবার পাল্কি বহনের বেহারা খরচ, মদের জন্য ইনাম বকশিস, ভট্টাচার্যপাড়ায় শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের কন্যার বিবাহে সাহায্য; সে দু চার টাকা নয়, একশো টাকা। সন্ন্যাসীদের জন্য গাঁজা খরচ। সাপুড়েকে বকশিস। গোয়ানপাড়ার সাহায্য। ঘরতৈরীর জন্য দশ ঘর গোয়ানকে একশ টাকা হিসাবে এক হাজার টাকা! ওই গোয়ানরা! মনে আবার গোয়ানপাড়া জায়গা জুড়ে বসল।

গোয়ানদের এনে কংসাবতীর ওপারে ওই শক্তিসাধনার সিদ্ধপিঠ থেকে কিছুটা দূরেই বসত করিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এই হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়—সোমেশ্বরের পুত্র, রত্নেশ্বরের দুর্দান্ত মামা এবং রত্নেশ্বর তাঁর পুত্রও বটেন পোষ্যপুত্র হিসেবে।

অতীত কালের স্বপ্নের মধ্যে একটা বেলা কোথায় কোন্ দিকে কেটে গিয়েছিল ঠিক ছিল না তার। অনেকক্ষণ ওই গোয়ান পাড়ার দিকেই আমি তাকিয়েছিলাম। ওদের পাড়ায় যাই নি কোনদিন। ওদের সঙ্গে ভাল করে কথাও বলিনি, ওদের দিকে তাকাইওনি। তবে দেখছি বইকি। শুধু দেখা নয়, একটা আকর্ষণী বন্ধন যেন বেঁধে ফেলেছে। ডিকু—ডি ক্রুজ, রোজা রোজারিও আমার পেয়াদা হিসেবে কাজ করছে। কথাবার্তায় হিন্দী টান, হিন্দী-উর্দু মেশানো বিচিত্র বাংলা। ওরা নাকি পর্টুগীজদের বংশ। গোয়া থেকে ওদের নিয়ে এসেছিলেন গোলন্দাজী করবার জন্য। এনেছিলেন হিজলীর নবাব। মহিষাদলের গর্গ বাহাদুররাও কিছু এনেছিলেন। বাস করিয়েছিলেন। সে ইংরেজ আমলের আগে। তখন একদিকে বর্গীরা আসছে অন্যদিকে ফিরিঙ্গী জলদস্যু ওই হারমাদরাই আসছে; ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে হিজলী নিয়ে নবাবের ঝগড়া লাগছে। এরা তখন এখানে কামান দাগত। গোলন্দাজের কাজ করত। এরা তাদেরই বংশধর। কি জন্যে যে বীরেশ্বর রায় তাদের এখানে এনেছিলেন তা জানতেন তিনি আর জানতেন রত্নেশ্বর রায়। কিন্তু এরা এ অঞ্চলে মানুষদের বিচিত্র মেলার মধ্যে একটি অতি বিচিত্র রং এবং প্রকৃতি নিয়ে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ দেশে এতকাল বাস ক'রে তার সবই একে একে এখানকার জলে বাতাসে রোদে মুছে মুছে প্রায় এক হয়েই এসেছে তবু কিছু বৈচিত্র্য এখনও আছে। সে মুখে আছে চোখে আছে চুলে আছে, কারু কারু রঙেও আছে। একটা পিঙ্গলাভা ফুটে বেরোয়। চোখে বারুদী উগ্রতা এবং চোখের তারায় পিঙ্গলাভা আছে। প্রচুর মদ খায়। নিজেরাই চোলাই করে। মেয়েরা উগ্র অপকর্ষ প্রসাধন করে। নির্লজ্জার মত হাসে। জামা একটা ক'রে পরে। বুড়ী মেয়েরা এখনও সেমিজ ধরণের ফ্রক বা গাউন পরে। আবার তরুণীরা আঁটোসাঁটো করে কাপড় সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দেহভঙ্গিমাকে যথাসাধ্য প্রকট ক'রে এদেশের মেয়ের মত ঝুড়ি কাঁখে কাঠকুটো ভেঙে বেড়ায়। এবং নদীর ধারে কয়েকজন একসঙ্গে জুটলেই গলা মিলিয়ে গান গায়—নির্জন প্রান্তরে বা জঙ্গলের ভিতরে—"তিলেক দাঁড়াও হে নাগর, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" সে নাগর। ব্রজের কানাই তাও তারা জানে। বাইবেলের কথা সামান্যই জানে। ওই

সামান্যেই তাদের গভীর শ্রদ্ধা। মেইরী বলে কপালে বুকে আঙুল ছোঁয়ায়!

বিবিমহলের নিচেই কাঁসাই। তার ওপারের জঙ্গলের মধ্য থেকে কাঁসাইয়ের কিনারায় এসে কতদিন ওরা দাঁড়িয়ে সমস্বরে গেয়ে যায়—তিলেক দাঁড়াও হে নাগর! কোনক্রমে যদি আমার দেখা পায় সুলতা, তবে খিলখিল ক'রে হেসে ওরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। আমি কখনও বিরক্ত হই কখনও খুশী হয়ে হাসি। তার উপর আজ যেন দারুণ মোহে পড়ে গেছি। আজই দুপুরে তাদের অর্ধনগ্ন দেহে সাঁতার দিতে দেখে কিছুক্ষণের জন্য যেন জগতের আদিম যে ঊষায় পুরুষ এবং প্রকৃতি নর এবং নারীরূপে এসে দাঁড়িয়েছিল সে ঊষাকে প্রত্যক্ষ করেছি।

সেদিন চোখে ওদের সেই সাগেকার কালের আসল চেহারাটা কল্পনা করে মনে আবার একটা রঙ ধরিয়েছিলাম। সেকালের ওদের একটা পোশাকও মনে মনে ছবি আঁকিয়ে আমার মনে ভেসে উঠেছিল। আজকাল যারা ব্যাণ্ড বাজায় তাদের যে ধরনের বিচিত্র পোশাক সেই পোশাক পরিয়েছিলাম ওদের পুরুষদের। এবং মেয়েদেরও এমনি একটা ঢংয়ের পোশাক ও চুল বাঁধার ঢং মনে মনে ছকতে ছকতে এসে আবার দাঁড়িয়েছিলাম কাঁসাইয়ের ধারে বিবিমহলের দক্ষিণের খোলা বারান্দাটায়। তাকিয়েছিলাম ওপারে জঙ্গলের পশ্চিম ধার ঘেঁষে একটা টিলার উপর ওদেরই গ্রামটার দিকে। মধ্যে মধ্যে জঙ্গলের কোলে নদীর কিনারাটার দিকেও তাকাচ্ছিলাম। ওই মেয়েগুলোর প্রত্যাশায়। ওদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ইচ্ছেটা ঠিক কথা নয়, ঠিক কথাটা হল 'বাসনা'। ওদের ভাল করে দেখতে পেলে মনে মনে পুরনো ছাঁদের পোশাক পরিয়ে একটা ছবি দাঁড় করানো যায়। কিন্তু ওদের সাড়াশব্দে অন্ততঃ গানের সাড়া ছিল না। দূরে গ্রামটা থেকে গরুর ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল ওদের ঘরের চালের ওপর কটা মোরগ গলা ফুলিয়ে লড়াইয়ের হাঁক হাঁকছে। মধ্যে মধ্যে কুকুরের ঝগড়ার শব্দ উঠেছে। আর একটা মানুষের আভাস! কখনও একটা তীক্ষ্ণ উচ্চ নারীকণ্ঠ। ঠিক কি বলছে বোঝা যায় না। স্বরটা চিলের ডাকের মত ছড়িয়ে পড়ছে।

মনে আছে সুলতা, নদীর জলে তখন বিকেলের হলদে রোদের ছটা পড়ে রঙীন ঝকমকানি উঠছে। কাঁসাইয়ে জোয়ার আসে নীচের দিকে, এতদূর আসে না। ওপারের বন উজ্জ্বল রোদে ঝলসাচ্ছে। পাখীর ডাক উঠছে প্রচুর। কল-কল, কল-কল। কিচি-মিচি। কিন্তু সব আমার কাছে নিঝুম মনে হচ্ছে ওই মেয়েগুলোর সমবেত কণ্ঠের গানের অভাবে আর হাসির খিলখিল শব্দের অভাবে! এবং মনে হচ্ছে সামনের এই ছবিটা শুধু ব্যাকগ্রাউণ্ড, কটা মেয়ের ছবির অভাবে অসম্পূর্ণ।

এমন সময় পিছন থেকে শুনলাম সরস মধুর কণ্ঠ আমার মেজদির। মেজদির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন—কি রে, এই দুপুরে এই বারান্দায় রোদ মাথায় ক'রে দাঁড়িয়েছিস? তোর মেজদাদু পাখীটার ডাক উঠছে নাকি?

ফিরে তাকিয়ে বললাম—না!

—তবে?

মেজদিকে দেখে রসিকতা করতে ইচ্ছে হল—গোয়ালপাড়ার মেয়েগুলোর গান শুনব বলে

দাঁড়িয়ে আছি।

—সে আমি বুঝেছি। কিন্তু ও শখ কেন বল তো? গোয়ানপাড়ার মেয়ে পাখীগুলোই বেশী রে। ও সুরে ভুলিস না। ওখানকার পুরুষগুলো মোর্গা ভাই, গলা ফুলিয়ে লড়ুয়ে হাঁক ছাড়া ডাক জানে না, আর সবই লড়ুয়ে মোর্গা! খুনখারাপিতে সিদ্ধহস্ত! মাসে দু-চারটে কাটাকাটি ওরা করেই। ওদের পিদ্রু গোয়ানের গল্প শুনেছি, গায়ে কাঁটা দেয়। কি বাড়! আমার শ্বশুরের দাপে বাঘে বলদে জল খেত। সেই তাঁর ছেলেবেলার সাকরেদ-ভক্ত প্রিয়পাত্র ঠাকুরদাস পালকে দিনেদুপুরে ওই কাঁসাইয়ের পাড়ের উপর এই এতবড় ছোরা বুকে বসিয়ে দিয়েছিল। মরে গেল ঠাকুরদাস পাল। বলতে গেলে আমার শ্বশুরের চোখের সামনে। শুনি নাকি তাঁর ঘরেই দুজনের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে কাছারীর বাইরে গিয়ে ওই খানিকটা নদীর ধার পর্যন্ত গিয়েই ঠাকুরদাস হাত চেপে ধরলে, অমনি—! শুনেছি নাকি ঘড়া দরুণে রক্ত পড়েছিল।

—গোয়ানটার কি হল?

—তার অবিশ্যি ফাঁসি না দ্বীপান্তর কি হয়েছিল। সে আর ফেরেনি। লোকটা ডাকাত ছিল। তার মেয়েটা ওই যে হলদি বুড়ী—ওকে তো দেখেছ। সেই যে! সেই ভাসুরপোর শ্রাদ্ধের সময় এসে তোকে বউমাকে সেলাম দিলে। সালাম পহুঁছে হুজুরাইন, হামার ছোটা হুজুর! যে বললে—হমি লোক তো হিয়া পাতা পেড়ে নেই খাবো মালেক। হামরা তো হিন্দু নেহি। হমি লোক কিরিস্তান। আর হারমাদ হামরা—

মনে পড়ল সুরেশ্বরের। বুড়ীকে দেখেছিল বাবার শ্রাদ্ধের সময়।

অনেকটা বয়স বুড়ীর। রঙটা সত্যিই ফরসা। মাথার চুলগুলো শনের মতই সাদা হয়ে গেছে প্রায়। চৌকো গৌরবর্ণ মুখখানায় দাগে দাগে একটা মাকড়সার জাল আঁকা হয়ে গেছে। চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত কটা বা পিঙ্গল। পরনে ছিল একটা সেমিজের মত ছিটের গাউন। অর্থাৎ তার গাউনত্ব ছিল না। কিন্তু সেটা তার তোলা পোশাকী গাউন; সেদিনের বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের বাড়ী আসবার জন্যই প'রে এসেছিল, তা বোঝা গিয়েছিল। তাতে ন্যাপথলিনের গন্ধ ছিল।

মেজঠাকুমা বলেছিলেন—পিদ্রুর সাজা হলে গোয়ানপাড়ার সকলে, গাঁয়ের সকলে ওকে ওর মাকে তাড়াবার জন্য বলেছিল আমার শ্বশুরকে। কিন্তু তাঁর বিচার ছিল অতি ন্যায্য। তিনি তো তাড়ানই নি বরং রক্ষে করেছিলেন। বলেছিলেন—যা ক'রেছে পিদ্রু করেছে তার জন্য ওদের সাজা হবে কেন? সেজন্যে হলদি রায়বাড়ীর অবস্থা এত হীন হলেও খাতির না ক'রে পারে না। তবে তোমাদের মানে ভাসুরের বংশের উপর খাতির বেশী। তার মানে জান?

—কি?

হেসে ঠাকুমা বললেন—আমার ভাই তোর মেজঠাকুরদার কাছে শোনা। তিনি বলতেন দাদার চেহারা ছিল কন্দর্পের মত। তাই বা কেন? কন্দর্পের চেয়ে বেশী। কন্দর্প তো কোমল কিশোর বা যুবক। দাদার ছিল বীরের মত চেহারা। এই লম্বা। তেমনি মুখ

তেমনি চোখ তেমনি রঙ। তেমনি বুকের ছাতি। তাঁকে দেখে ওই হারামজাদীদের লালসার অন্ত ছিল না। দাদারও ক'জন গোয়ান শিকারী ছিল, তারা সঙ্গে যেত, বাঘ মারবার সময়।...

হঠাৎ ঠাকুমা মুখে কাপড় চাপা দিলেন, বললেন—আমি বলেছিলাম, আর তুমি কালো একটু মোটাসোটা বলে তোমার দিকে তাকাতো না বুঝি? ওঃ জ্বলে উঠতেন। দশবার রাধা রাধা বলে বলতেন—শুনলে পাপ হয় এ কথা।

সুরেশ্বর চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরে এসে মেজঠাকুমার সঙ্গেই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, উপভোগ করেছিল এই আশ্চর্য সেকেলে অথচ সর্বকালের মাধুর্যময়ী এই রূপসী ঠাকুমাটির কথাগুলি। উত্তরে নিজেও রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারেনি, বলেছিল—তুমি বুঝি তাঁকে পাহারা দিতে হলদিদের দল যখন আসত? ছাদে উঠেও গোনপাড়ার দিকে তাকাতে দিতে না!

হেসে উঠলেন মেজঠাকুমা, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—যেন ঠোঁটের ডগায় উত্তরটি উদ্যত হয়েছিল, সেটা তোকে সাবধান করা দেখে বুঝতে পারছিস না। সেইজন্যে তো বলছি ভেতরে চল্। মনসার কথায় আছে মনসা যেন বেটীকে বলেছিলেন—সব দিক পানে তাকিয়ো মা, দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না। তোর দাদু ছিলেন কালো এবং আমি যেকালে ভার পেয়েছিলাম সেকালে তিনি বুড়ো হয়েছিলেন। তোর দাদু তোকে দেখে বলেছিলেন—নাতি, তোমাকে দেখে দাদাকে মনে পড়ছে। তিনি রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন। তুমি তার তুল্য কি তার থেকেও সুন্দর হে। তুমি সুন্দর তুমি নবীন। পাঁচজনে কলঙ্ক দিয়ে তোকে আমার নটবর করে তুলেছে। আমাকে ভাবনায় ফেলেছিস তুই। আয়, ওদিকে সেই মুখপুড়ী ছুঁড়ীদের গানের জন্য কান পেতে দর্শনের জন্য চোখ পেতে থাকতে হবে না।

ঘরে এসে ডেকচেয়ারে বসলাম। টানাপাখা আবার চলতে লাগল।

দিনের বেলা খেয়ে না ঘুমিয়ে বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সুলতা, তার মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম; কি দেখেছিলাম মনে নেই, তবে তার মধ্যে ঠাকুরদাস ছিলেন, আমার ঠাকুরদাও উঁকি মেরেছিলেন আর পিদ্রু ছিল, গোয়ানপাড়ার মেয়েগুলোও ছিল। এলোমেলো জড়ানো স্বপ্ন। মানে মাথার মধ্যে সেকালের ওই ইতিবৃত্তগুলো মাতালের মদের নেশার মত ঘুরপাক খাচ্ছিল।

স্বপ্নের শেষের দিকটায় ঠাকুরদাসের রক্তাক্ত দেহ ছিল মনে আছে। একটু আতঙ্কের সঙ্গেই জেগে উঠলাম। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—

রঘু চা এনে দিলে।

চা খেয়ে কি মনে হল, ভাবলাম, ঠাকুমা বললেন—ঠাকুরবাড়ী-কাছারী থেকে বেরিয়ে কাঁসাইয়ের ধারটায় গিয়ে পিদ্রু খুন করেছিল ঠাকুরদাসকে। জায়গাটা দেখে আসি!

বেরিয়ে পড়লাম।

কীর্তিহাট গ্রামখানা নদীর ধারে ধারে লম্বা—কলকাতার মত গড়ন। রায়বাড়ী তার এক পাশে। মানে যে দিকটা জুড়ে আছে তার পরে আর অন্যলোকের বসত নেই। নদীর ঘাটে

গিয়ে একটা রাস্তা পড়েছে। তার ওপারেই গোয়ানপাড়া।

গিয়েছি অনেকবার। কিছুই ছিল না। থাকবার মধ্যে জঙ্গল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম।

গোয়ানপাড়ায় তখন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি চলছে। গরুকে ডাকছে ছাগলকে ডাকছে। হাঁসকে ডাকছে—আ-তি-তি-তি। আ কোর কোর তি-তি-তি। আ—ছেলেগুলো কোলাহল করছে। বকাবকিও শোনা যাচ্ছে। কলহ নয়। গুরুজনেরা বকছে ছেলেমেয়েদের। আমার পাশ দিয়ে ক'টা গোয়ান মেয়ে কীর্তিহাটে বাজার করে ফিরে এসে নদীর ঘাটে নামল। হাতে মুখে দড়ি বাঁধা কেরোসিনের বোতল, মাথায় একটা ক'রে ডালা। আর একটা করে সরষের তেলের ভাঁড়।

আমাকে দেখে ফিক ফিক করে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। আমি প্রাণপণে গম্ভীর হয়ে বিচরণ করছিলাম, বলতে পার শিশিরবাবুর চিন্তামগ্ন আলমগীরের মত। ওদের দেখে ভয়ার্ত যেমন মেকী সাহস দেখায়, তেমনি পোজ নিয়েছিলাম আমার মনে আছে। কিন্তু ওরা ছাড়বার পাত্রী নয়, ওদের উপমা আমাদের পুরাণে, কাব্যে খুঁজে পাই নে। প্রমীলার রাজ্যের কথা শুনেছি। বিস্তৃত বিবরণ নেই। থাকলে বোধহয় উপমা মিলত। ওরা বললে, সেলাম মালিকসাহেব।

আমি বললাম, সেলাম।

—হুজুরের বোখার হয়েছিল। কতদিন জানালাতে দেখি নি। আব্ তবিয়ৎ ভাল হল?

—হ্যাঁ। হয়েছে।

তবুও ছাড়ান দিলে না। বললে, গোয়ানপাড়ার ঘাটে হুজুর?

বললাম, বেড়াতে এসেছি।

—তবে চলেন মালিক হমলোকের গাঁওয়ে।

বললাম, না, তোমরা যাও।

—কোইকে ডেকে দিব হুজুরবাহাদুর?

—না।

—আর তসবীর আঁক না মালিক?

—না।

—এই রোজা মেয়েটা বলে, হুজুরকে বলব, হুজুর হামার তসবীর আঁকো। তা ওর আঁক না হুজুর। উর খুব শখ। আর উ দেখতে ভি খুব সুরত আছে।

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমি নিশ্চয় রাঙা হয়ে উঠেছিলাম। এরা তো সুলতা, অসীমা, সীমা নয়, এদের সঙ্গে আমার পেরে ওঠবার কথা নয়। আর এরা চীৎপুরের বাড়ীর দরজায় যারা পেটের অন্নের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তারাও নয় যে, পকেট থেকে টাকা দিয়ে ঘরে যেতে বললে কৃতজ্ঞতায় মাথা হেঁট করে মনে-মনে পায়ে মাথা ঠেকাবে। এদের গায়ে হারমাদের রক্ত। এরা কাঁসাইয়ের ধারের জঙ্গলে বাস করা আদিম নারী। আমি ভঙ্গ দিলাম। যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওদের

দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাঁয়ের মুখে ফিরলাম। ফিরতে গিয়েই দেখলাম, পিছনে জঙ্গলের মধ্যে কে একজন লুকুচ্ছে। আমি গ্রাহ্য করলাম না, চলে এলাম। কিছুটা এসেছি অমনি মেয়েগুলোর তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি পেয়ে আবার থমকে দাঁড়ালাম। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে কাকে। একটা কথা কানে এল—এঁঃ, রায়বাবুর বাড়ীর লড়কা। কুত্তার পাকিটে একঠো দামাড় নেহি বাবু খিতাব। যা-যা, ভাগ। নেহি তো নাক কেটে লিবো রে শালা!

বুঝলাম, কোন রায়বংশের গুণধর ওদের পিছু নিয়েছিল। তাকেই এ-কথা বলছে।

দুপুরে নিজে যা করেছি তার জন্য লজ্জায় মরে গেলাম।

এবং তখনই বোধহয় জিতে গেলাম।

যৌবনের ধর্মকে আমি মানি। ব্যভিচারী বলে যারা সংসারে ঘৃণিত, তাদের বিচারও আমি সহানুভূতির সঙ্গে করেছি। কিন্তু হ্যাঙলামি-কাঙালপনা; নারীর সঙ্গে প্রেমের ক্ষেত্রে ছিঁচকে চোরের বা গাঁটকাটার কাজ যারা করে, তাদের ঘেন্না করে এসেছি। আমার এই জ্ঞাতি-পুত্রটিকে দেখে যে ঘেন্না হল তার ওপর, তার থেকেও বেশী ঘেন্না অনুভব করছিলাম নিজের ওপর। বিল্বমঙ্গলের মত চোখ দুটোর ওপর ক্রোধের আর সীমা ছিল না।

খারাপ, অত্যন্ত খারাপ মন নিয়েই ফিরে এলাম।

একটা কথা এক সময় বিদ্যুচ্চমকের মত মনে হল, মানুষের এই পাপ রায়বংশে এমন করে বাসা বাঁধলে কেন?

বাবার কথা মনে পড়ল। মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সুরেশ্বরকে নারীদের থেকে দূরে থাকতে বলো। যদি নাই থাকতে পারে, তবে যেন বিবাহ করে।

আর একটা কথা মনে পড়ল, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক মানুষ আর মানুষীর মধ্যে দুটিতেই আবদ্ধ রাখতে হয়। বাকি ক্ষেত্রে সম্পর্ক পিতা-কন্যা; মাতা-পুত্রের। কথাটা রায়-বাহাদুর রত্নেশ্বরের। তিনি বলে গেছেন।

গোয়ান মেয়েগুলোকে মনে মনে মা বলতে গিয়েও পারি নি। তোমাকে মনে করতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তোমার মুখ ঢেকে ওদের মুখ ভেসে উঠছিল। এরই মধ্যে কখন এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম বিবিমহলের দরজায়। মাথা হেঁট করেই আসছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, কে বললে—এই যে!

মাথা তুলে দেখলাম, সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের পেশকার।

লোকটা কালো, রোগা, যারা খুব ধূর্ত হয়। বললে, এই তো বেড়িয়ে এলেন। তাহলে তো ভাল আছেন!

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, লোকটা কি দেখতে এসেছে আমার অসুখ কতটা সত্যি, তাই?

লোকটা বলে চলেছিল—ওঃ, কতক্ষণ এসেছি, আধ ঘণ্টার উপর। চলুন, সাহেব বসে আছেন। মিসেস ঘোষ কাল কলকাতা যাবেন। হঠাৎ ঠিক হয়েছে। তাঁর ছবি এঁকে দেবার কথা আছে। সেটা নিয়ে যাবেন তিনি।

—মানে? এই রাত্রে?

—হ্যাঁ। কাল যে কলকাতা যাবেন, সেখানে দেখাবেন তিনি।

কি হয়ে গেল মেজাজ, বললাম, বলবেন, রাত্রে ছবি আঁকা হয় না।

—হেজাক-বাতি ঠিক করে রেখেছি।

—বলবেন, হবে না। পারব না। আমার শরীর ভাল নেই।

—উনি চটে যাবেন। মেমসাহেব ঝোঁক ধরেছেন।

—তাহলে চটতে বলবেন। বিরক্ত করবেন না। বলে আমি ঘরে ঢুকে গেলাম।

সুরেশ্বরের নিজস্ব কর্মচারী ঘোষাল। হরচন্দ্রেরই ভাইপো। সে বললে, কথাগুলো কড়া হয়ে গেল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে, তা হোক!

নায়েব বললে, পরশু থেকে কীর্তিহাটে বুঝারত হবে আজ ঢোল পড়ল। সাহেব নিজে করবেন।

—তা করুন।

—আপনাকে হয়রান করবে এই আর কি!

—কি হয়রান করবে?

—সঙ্গে সঙ্গে রোদে রোদে ঘোরাবে হয়তো। হয়তো আমাদের কথা শুনবে না। স্বত্বের ঘরে ওরা যা বলবে তাই লিখবে। ওদের তো লম্বা হাত!

—ঠিক আছে। আপনি কাগজপত্র ঠিক করে রাখুন, থাকলে দেখাবেন। না থাকলে বলবেন, কাগজ নেই, অন্যে যা বলছে তাই লিখুন তিনি। তারপর তো মুন্সেফ কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, হাইকোর্ট আছে।

চুপ করে রইল নায়েব, কথাটা তার মনঃপূত হল না। সে একটু চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বললে, একবার চলুন না সাহেবের কাছে। গিয়ে বলবেন, দেখুন লোকজনের সামনে পেশকার আপনার এইভাবে কথা বললে—

সুরেশ্বর একটু রুক্ষভাবেই বললে—না।

নায়েব চলে গেল। সে বিবিমহলের সেই চারিপাশ খোলা ছাদওয়ালা বারান্দায় ঘুরতে লাগল। মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে এসব ওই ওদের দানপত্র করে চুকিয়ে দিয়ে চলে যায় সে, তাহলে এই হরেন ঘোষ নামক সেটেলমেণ্ট হাকিমের লম্বা হাতটিও আর তার নাগাল পাবে না। সে তখন ঠাকুরদাস পালকেও ভুলে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল হুইস্কির বোতল সে এখনি খোলে। এবং তারপর বাজনা বাজায়। রঙ-তুলির মত বেহালাও তার সঙ্গী। সঙ্গেই এনেছে। কিন্তু এই বাজনাটা তার লোকজন থাকলে যেন নিজের কাছেই জমে না। বিশেষ করে এখানকার লোকজন।

সেই বাপের শ্রাদ্ধ থেকে এ পর্যন্ত তার তিনবার আসা হল, এখনও পর্যন্ত বলতে গেলে গ্রামের লোকের কাছে সে অপরিচিতই। এদের যা স্বভাবচরিত্র, সে তার বাবার শ্রাদ্ধের সময় এসে দেখেছিল। সেটা একান্তভাবে লোভ আর খানিকটা সেও লোভ বা আর এক

ধরনের ক্ষুধা—রক্তমাংসের দেহের ক্ষুধা, এই সর্বস্ব। কিন্তু এবার এসে আরও গভীর এবং ভয়াবহ চেহারা দেখছে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে যে ক্ষুদ্রতা এদের এবং যে কুটিলগতিতে সে-ক্ষুদ্রতা পাক খায়, তার তুলনা হয় একমাত্র সাপের সঙ্গে। প্রথমটার তুলনা শেয়ালের সঙ্গে। সত্য বলতে গেলে, এদের সে সহ্য করতে পারে না।

ভিকু বলে, বিলকুল সব হারামী আছে হুজুর।

রোজা অর্থাৎ রোজারিও বলে, বিনা মতলবে কোই বাত করে না মালেক। ঝুটা আদমী, ঝুটা বাত্‌!

সুরেশ্বরও তাই মনে করে, এদের মধ্যে অস্বস্তিও বোধ করে। এমনকি প্রশংসা কেউ করলেও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। বোধহয় ওরাও জানে সেটা অর্থাৎ সুরেশ্বর রায় তাদের চেনে এটাও ওরা বুঝেছে। তাই কেউ এদিকে ধার ঘেঁষে না। একমাত্র ওই মেজঠাকুমা! এই রায়বাড়ী, এই কীর্তিহাট গ্রামে ওই মহিলাটিই তার পরমাত্মীয়, প্রিয়জন। তিনি তাঁর সঙ্গে আদিরস-ঘেঁষা রসিকতা করলেও মিষ্টি লাগে, তার তোষামোদ করে তাকে তাঁর অন্নদাতা বললেও সে সঙ্কোচ বোধ করে না; মনে হয় না কোন মতলবে বলছেন। তিনি দুপুরে একবার খাবার সময় আসেন, আবার সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ী ফেরত পুষ্পচরণোদক নিয়ে তাকে দেন, রাত্রে কি কি খাবার আয়োজন করেছে ঠাকুর তার তদ্বির করে চলে যান। তিনি তো জানেন তার হুইস্কি খাওয়ার কথা, তাই খাওয়ার আগেই চলে যান। হুইস্কির সঙ্গে রাত্তিরের খাবার খেয়ে নিয়ে সুরেশ্বর এসে বসে ওই সামনের মনোরম খোলা বারান্দাটিতে, হাতে বেহালা থাকে। বাজায় আপনমনে। আমেজ লাগে।

আজ এই উত্তেজিত মুহূর্তটিতে সে হুইস্কির বোতলটা খুলে বসে গেল। মেজঠাকুমা এখনও আসেননি। সেজন্য সুরেশ্বর আজ বিরক্ত হয়েছিল মেজঠাকুমার উপর। মনে মনে প্রশ্ন করেছিল, কি দরকার ওঁর রাত্রে আসবার?

প্রায় সেই ক্ষণটিতেই মেজঠাকুমা এসে গিয়েছিলেন। মুখে সুরেশ্বর কিছু বলতে পারেনি। তাই বা কেন, মনটা প্রসন্নই হয়ে উঠেছিল।

মেজঠাকুমা কিন্তু সেদিন ঠিক সেই মানুষটি নন, যাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের হাসি এবং সরস বাক্যে কীর্তিহাটের এই নির্বাসনবাসটি মধুর হয়ে ওঠে।

পুষ্পচরণোদক দিয়ে বললেন, আজ নদীর ওই গোয়ানপাড়ার ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। ঠাকুরদাস পালকে পিদ্রুগোয়ান ওইখানটায় খুন করেছিল, বললে না তুমি? মনে হল জায়গাটা একবার দেখে আসি।

—হুঁ। তা ভিকু কি রোজারি কি রঘুকে সঙ্গে নিলেই পারতে। একলা গেলে কেন?

—কি বিপদ, আমি কি ছেলেমানুষ, পথ হারাব?

—ওরা তো তাই রটাচ্ছে, তুমি ওদের ছুঁড়িগুলোর ইসারায় পথ হারাতেই গিয়েছিলে। চন্দ্রেশ্বর দেখেছে।

চন্দ্রেশ্বর সুখেশ্বরের ছোট ছেলে।

—ও। হ্যাঁ দেখলাম বটে। গ্রাম থেকে কেউ ওদের পিছু নিয়েছিল। আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে জঙ্গলের মধ্যে গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল। মেয়েগুলো যা কুৎসিত ভাষায় ওকে গালাগাল করছিল।

—সেটা এবার তোমার নামে রটল।

—রটুক।

—না ভাই। আমার গায়ে লাগে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল থেকে লোক সঙ্গে করে বেরুবি।

—কেন? এখানে সাক্ষী রেখে বেড়াতে হবে নাকি? না, তোমারও সন্দেহ হচ্ছে?

—তুই আচ্ছা গোঁয়ার কিন্তু। রায়বংশ তো!

—বলতে দাও। ওদের বলতে দাও। ওটা আমার প্রাপ্য রায়বংশ বলেই। কিন্তু তোমার সন্দেহ হয় কিনা বললে না তো।

—হলেই বা তোর তাতে কি যাবে-আসবে বল?

বুঝলাম অভিমান।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, সায়েবের পেশকারের সঙ্গে ঝগড়া করলি।

—হ্যাঁ, তাও করেছি। দরকার হলে আবার করব।

—ওরা মানে ধনেশ্বর লাফাচ্ছে। প্রণবেশ্বর খুশী। পরামর্শ হচ্ছে—কাল প্রথমেই ওরা বাড়ীর স্বত্বে আপত্তি দেবে। বলবে, বাড়ী দেবোত্তর। মানে প্রণবেশ্বরদের অংশ যা কিনেছ, এই বিবিমহল যা তোমার নিজস্ব, এর সব দেবোত্তর। মানে বিক্রী সিদ্ধ নয়। ভাগ সিদ্ধ নয়। সব তো শুনেছিস।

বিরক্তিতে, ক্ষোভে, ঘৃণায় সুরেশ্বরের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে বললে, নিক ঠাকুমা নিক ওরা। ওতে আমার দরকার নেই। নিক।

—না! কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল মেজঠাকুমার। বললেন, জমিদারের ছেলে হয়ে এই কথা বলছিস তুই? ছি! দিতে ইচ্ছে হয় দিতে পারিস। কিন্তু ঠকিয়ে নিতে দিবি? পরকে ঠকিয়ে নেওয়া যেমন পাপ, জেনেশুনে নিজে ঠকাও তেমনি ঘেন্নার কথা। সে যদি আবার ক্ষমতার অভাবে হয়। শোন, তোকে বলি,—যে-খাতাগুলো তোকে দিয়েছি, তার সবগুলো খোঁজ। ওর মধ্যেই পাবি রায়বাহাদুরের দেবোত্তরের বাইরে কলকাতায় যে ব্যবসা ছিল, শেয়ার ছিল কোম্পানীতে, তার জমা-খরচের খাতা। আমি দেখেছি সে খাতা। তার মধ্যে ইমারত খরচ পাবি। তোর কলকাতার বাড়ী এখানকার বাড়ী সব সেই টাকাতে।

বলে চলে গেলেন মেজঠাকুমা।

তার দিকে সুরেশ্বর তাকিয়ে রইল সবিস্ময়ে শুধু নয়, সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে। আজ তাঁর এক নতুন চেহারা দেখেছে সে। একেবারে রাজমাতার মত চেহারা। আশ্চর্য, পুজুরী বামুনের মেয়ে, এমনটা হল কি করে?

* * *

—সমস্ত রাত্রি আমি খাতা উল্টেছিলাম। পাতার পর পাতা। আজ আর ইতিহাস

ঘাঁটতে নয়, নজীর খুঁজতে। ঠাকুমা মনের মধ্যে একটা তেজ বা আগুন জেলে দিয়ে গিয়েছিলেন স্থলতা। সে আগুনটা অ্যালকহলের ছিটে পেয়ে জলে উঠেছিল জোরালো হয়ে। ওদের রায়ত কেনা মেরামত-করানো ভিতর-বাড়ীটা ওরা ঠকিয়ে নেবে ?

এদের অর্থগৃধ্নুতার জন্য নীচতার জন্যে ঘেন্না, ওদের জোট বেঁধে আমাকে ঠকাবার চেষ্টায় রাগ —ওদের মেজঠাকুমাকে পর্যন্ত কলঙ্কিনী অপবাদ দেওয়ার কুৎসিত প্রবৃত্তির জন্য ক্ষোভ—এগুলো মিলে আমাকে নিষ্ঠুর কঠোর করে তুলেছিল সেদিন। মদ খেয়েছিলাম মধ্যে মধ্যে, আর খাতাই উল্টেছিলাম পাতার পর পাতা, খাতার পর খাতা।

২

কিছুই পেলাম না। দেবোত্তরের খাতার মধ্যে কোথাও পেলাম না ইমারৎ খরচ। আবার ওল্টাতে লাগলাম। এবার হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা টাকা জমা হয়েছে সেইদিকে। সামান্য টাকা, দেড়শো টাকা জমা! মাঃ সোমেশ্বর রায়। দেবোত্তরের ইটের পাঁজা বিক্রয় হয়, সোমেশ্বর রায় অন্দরমহল তৈরীর জন্য খরিদ করেন—তস্য মূল্য বাবদ দেড়শত টাকা! চমকে উঠলাম। এই তো পেয়েছি। অর্থাৎ দেবোত্তর থেকে ইট নিয়েও তার দাম পর্যন্ত সোমেশ্বর রায় দিয়েছেন নিজের তহবিল থেকে। পুরো এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে বেহালাখানা তুলে নিয়ে ভাবলাম বেহালা বাজাব। গভীর রাত্রি। আকাশে পশ্চিম দিকে চাঁদ পাণ্ডুর হ'তে সবে আরম্ভ করেছে। ছোটজাতের এক রকম পাখী আকাশে ক্রমাগত উড়েই বেড়াচ্ছে। সে পাখী তুমি বোধহয় দেখনি স্থলতা, কলকাতায় কাটিয়েছ তো সারা জীবন! ওরা চকোর। কাঁসাইয়ের ওপারের জঙ্গল থেকে কোন ফুলের গন্ধ আসছে। বউকথাকও পাখীটাও ডাকছিল। গ্রাম নিস্তব্ধ। শুধু মধ্যে মাঝে গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করছিল। ছড়িটা তুলে নিয়ে টান দিয়েছি; বাজাব—'শুন যা শুন যা পিয়া'। তোমাকেই ভেবেছিলাম মনে মনে! হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল। জমাখরচের খাতাখানা খোলাই ছিল, ফরফর ক'রে ওল্টাতে লাগল। পুরোনো কাগজ ছিঁড়ে যাবে ভয়ে ছড়িটা দিয়েই চেপে ধরলাম এবং বেহালাটা রেখে বন্ধ করতে গেলাম।

হঠাৎ নজরে পড়ল পাতাটায় লেখা—সৎকার খরচ; ঠাকুরদাস পাল খুন হওয়ায় তাহার লাশ সদরে যায়; সদরে লোক পাঠাইয়া তাহার শবদেহ সৎকারের খরচ, পঁচাত্তর টাকা। তার জায় রয়েছে—বারবরদারি যাতায়াত খরচ, তাহাদের খাদ্য খরচ, চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত, নূতন বস্ত্র ইত্যাদি খরচ! ঠাকুরদাস পাল। সেই ঠাকুরদাস! সে খুন হয়েছে। তার সৎকারে চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত খরচ করেছেন রত্নেশ্বর রায়।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। ওল্টাতে লাগলাম। ঠাকুরদাসের শ্রাদ্ধের খরচ পেলাম। সেই পৃষ্ঠাতেই পেলাম পিদ্রু গোয়ানের পরিবারকে সাহায্য।

একটা আশ্চর্য চেহারা ফুটেছিল রত্নেশ্বর রায়ের। মাথাটা নত হয়ে এল। আক্রোশ ক্রোধ তাঁর চিত্তকে দৃষ্টিকে অভিভূত করতে পারে নি। ঠাকুরদাসকে যে খুন করেছে তার

অপরাধে তুমি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে অপরাধী করনি।

উল্টেই গেলাম খাতা। হঠাৎ একটা চার অঙ্কের খরচ চোখে পড়ল। পনেরশো টাকা। খরচের বিবরণ প'ড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। হুজুর বাহাদুরের পত্রের আদেশ অনুযায়ী পিক্র গোয়ানের দায়রা মামলায় তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজায়গায় খরচ—পনেরশো টাকা।

চমকে গেলাম।

প্রতিটি পাতায় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সই রয়েছে। বিশ্বাস করতে পারলাম না। পিক্র গোয়ানের দায়রা মামলায় পনেরশো টাকা সাহায্য? তার পরিবার সন্তান-সন্ততিদের সাহায্য করেছেন বুঝতে পারলাম। দয়া করুণা! এও কি দয়া? করুণা? গোয়ান মেয়েটি কি এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল—বাঁচাও হুজুর! বাঁচাও আমার স্বামীকে! না—? সন্দেহ হচ্ছিল রত্নেশ্বর রায়ের মত ব্যক্তিকেও।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল শ্যামনগরে চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি আছে—ঠাকুরদাস দাতব্য চিকিৎসালয়! মনে মনে প্রণাম করলাম রত্নেশ্বর রায়কে, বললাম—ক্ষমা কর আমাকে।

সারাটা রাত মদের নেশাতেও ঘুম আসেনি।

সকালবেলা স্নান ক'রে নেশাটা কেটেছিল, কিন্তু রত্নেশ্বর রায়ের চরিত্র নিয়ে যে ঘোরটা লেগেছিল সেটা কাটেনি। মনের মধ্যে একটি কথাই ধ্বনিত হচ্ছিল—অদ্ভুত! অদ্ভুত! চা খাচ্ছিলাম এমন সময় আমার কর্মচারী এসে ডাকলে—বাবু, বুঝারত আরম্ভ হয়েছে। গ্রামের নৈঋর্ত কোণ থেকে। এসে পড়ল বাড়ীর সীমানায়। ওরা বাড়ী দেবোত্তর বলে আপত্তি দেবে।

—ঠিক আছে চলুন। ডিকুকে বা রোজারিওকে ডাকুন। খানকয়েক খাতা নিয়ে যেতে হবে।

বাড়ীতে আসতে দেরী ছিল। নায়েব শঙ্কিত হয়ে ছুটে এসেছিল। নৈঋর্ত কোণ থেকে উত্তর দিকে সেটেলমেণ্ট চলছিল। সাহেব টেবিলের উপর ম্যাপ গেঁথে তা থেকে প্লট বাই প্লট বুঝারত করে চলেছিলেন। লোক অনেক জমেছে। গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্যবসাদার সুরেন দে, রাধাগোবিন্দ ভটচাজ, শিবনাথ ওঝা, নটবর সিং, নন্দ ঘোষ, নটু বাউড়ী, মোটা কালো ইব্রাহিম শেখ, তা ছাড়া ধনেশ্বর, প্রণবেশ্বর এঁরা তো আছেনই।

সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—এতক্ষণে সময় হল আপনার?

—তাতে আপনার কাজে ব্যাঘাত হয়েছে?

—নিশ্চয় হয়েছে। আপনারা জমিদার। প্রজা যে স্বত্ব বলছে সে সম্বন্ধে আপনাদের সম্মতি কিম্বা আপত্তি দুটোর একটা চাই। না হলে আমার কাজ শেষ হয় না। ওগুলোতে আপনার মতামত কিছু নাই তাই আমি লিখেছি। মানে প্রজার পক্ষেই গেছে। এঁরা আপত্তি দিয়েছেন। লিখেছি। এটাতে কি বলুন?

তবুও বুঝতে পারলাম না। সবে তো পনের বিশ দিন গেছে। প্রজাইস্বত্বের ব্যাপার ঠিক রপ্ত হয়নি।

হঠাৎ পিছনে একটা দুর্বোধ্য হাউহাউ শব্দ শুনলাম। সকলেই ফিরে তাকালে। দেখলাম, একজন বৃদ্ধ, লোলমাংস থলথল করছে, তার মধ্যে হাড়গুলো প্রকট হয়েছে, মাথায় চুল উঠে গিয়ে যে ক' গাছা আছে তা সাদা ধপধপে এবং ব্যোমকেশের মত উর্ধ্বমুখী, একমুখ খোঁচাখোঁচা দাড়ি গোঁফ, ভুরু দুটোও পাকা এবং ঘন মোটা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, একজন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ফিটফাট পোশাকপরা ভদ্রলোকের হাত ধ'রে আসছে। চোখে দৃষ্টি নেই, ঘোলাটে চোখের তারা দু'টো শূন্য-লোকের দিকে স্থির নিবদ্ধ, পা দুটো ঠিক পড়ছে না। লোকটা হাউহাউ করে কি বলছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

অফিসার বিরক্তিভরে তাকালেন। বললেন—চীৎকার করো না এমন ক'রে!

বৃদ্ধের সঙ্গের ভদ্রলোকটি খাসা ইংরেজীতে বললেন—তার নিজের কথা বলবার অবশ্যই স্বাধীনতা আছে।

হাকিম চটে উঠে বললেন—কে তুমি? ওইই বা কে?

ভদ্রলোক বললেন—ওঁর নাম বহুবল্লভ পাল। উনি এইখানকার বিশ দাগ প্লটের মালিক। আমি ওঁর ছেলে, উনি চোখে দেখতে পান না, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ইংরিজীতেই বললেন।

উক্ত ভটচাজ, সে প্রৌঢ় লোক, বিচিত্র-চরিত্র মানুষ বলে পরিচয়টা শুনেছিলাম স্থূলতা, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় বিশেষ ছিল না। শুনেছিলাম প্রথম যৌবন থেকে মেজঠাকুরদার থিয়েটারে পার্ট করতেন, তারপর প্রেম করে একটি শূদ্রকন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। বাড়ীর জমি বিক্রী করে কিসের দোকান করেছিলেন, তারপর ফেল পড়ে গ্রামে ফিরে বিয়ে করে রায়বাড়ীতে চাকরীও করেছিলেন। এখন গ্রামে মাতব্বরী করেন। ক্রিয়াবাড়ীর যজ্ঞে উক্ত ভটচাজ অপরিহার্য। তিনি রান্নাশালে মোড়া নিয়ে বসেন। বাঁ হাতে সিগারেট পোড়ে ডান হাতে হুঁকো থাকে। কোন নেশা নেই এ ছাড়া। ওই খেয়েই ক্রিয়া শেষ ক'রে উঠে যান। তবে এখনও নাকি ব্রাত্যপাড়া থেকে গোয়ানপাড়া পর্যন্ত মেয়েদের কাছে প্রিয়জন। তার জন্য কিন্তু তিনি লজ্জিত নন। কথা-বার্তা খুব ভাল বলেন অবশ্য তার একটা বিশেষ ধরন আছে। উক্তবাবু বলে উঠলেন—ব্রিলিয়াণ্ট স্টার অব আওয়ার ভিলেজ স্যার। উজ্জ্বল নক্ষত্র। এম. এ'-তে ভাল রেজাল্ট করেছে। আমাদের বহুবল্লভ পালের ছেলে। শ্রীরাধাবল্লভ পাল। উকীল হয়েছেন।

হাকিম বললেন—নরম স্বরে বললেন—বেশ তো, কি বলতে চান সেইটে তো পরিষ্কার ক'রে বলতে হবে।

রাধাবল্লভ বললেন—উনি বলছেন এসব হল লাখরাজ।

এবার ধনেশ্বর এগিয়ে এসে বললেন—না। ওগুলি জোতের সামিল।

—এঁ্যা? জিজ্ঞাসা করলে বহুবল্লভ।

কানের কাছে মুখ এনে ছেলে বললে—ধনেশ্বরবাবু বলছেন—না। এ সব জোতের সামিল! রায়তি স্থিতিবান!

—না। চীৎকার করে উঠল বহুবল্লভ।

হাকিম বললেন—বেশ তো, কাগজ দেখান। লাখরাজ তার প্রমাণ তো দিতে হবে।

—এ্যাঁ ?

কানের কাছে মুখ রেখে ছেলে বুঝিয়ে দিলে। তাতে পাল বললে—কখনও খাজনা আমি দিই নাই! কখুনও না! আমার বাবার আমল থেকে! হ্যাঁ!

উকীল বললেন—ভোগদখল সূত্রে নিষ্কর।

হেসে হাকিম বললেন—নিশ্চয় লিখব। তার সঙ্গে ধনেশ্বরবাবুদের আপত্তিও রেকর্ড করতে হবে আমাকে।

—ধনেশ্বরবাবু! আহা—হা! চীৎকার ক'রে উঠল বহুবল্লভ—রায়বংশের মুখ উজ্জ্বল করছে। বাহবা বাহবা!

ধনেশ্বর বললেন—বহুবল্লভ, তোমার ধন হয়েছে, ছেলে এম-এ পাস করেছে, না? তবুও কথাটা হিসেব ক'রে বলো। বুড়ো হাতী মরতে মরতেও সে হাতী! সেকাল হলে—।

বহুবল্লভের উকীল ছেলে বললে—ড্রোনস অব দি সোসাইটি। লজ্জাও নেই এদের!

প্রণবেশ্বরের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সে বললে—এর মধ্যে ঝগড়ার তো কোন কারণ নেই। বহুবল্লভ যা বলেছে—

—প্লীজ সে বহুবল্লভবাবু! বললে উকীল ছেলে!

—বহুবল্লভবাবু ?

—হ্যাঁ, না বললে উনিও নাম ধরে বলবেন!

—বেশ! যে যা বলছে তাই রেকর্ড করুন আপনি স্যার।

বহুবল্লভ তবু থামল না। সে হাউহাউ করে বললে—কীর্তিহাটে বসতবাড়ী আর গোচরের খাজনা মাফ ছিল। কখুনও জমিদার লেয় নাই, পেজাতে দেয় নাই। মাফ করেছিলেন সোমেশ্বর হুজুরের পিতা কুড়ারাম হুজুর। আজ পাঁচপুরুষ আমাকে নিয়ে ভোগ করে আসছি। ই আমাদের স্বত্ব হয়েছে। আজ লোব বললেই দোব আর জমিদার পাবে? এইটো হাকিমের বিচার ?

হাকিম এবার নিজেই চীৎকার করে বললেন—বিচার আমি করব না। সে পরে হবে। আমি রেকর্ড করে যাব, যা প্রমাণ পাব সব।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার, সুলতা, রায়বংশের পাঁচালী।

কীর্তিহাটে বাস্তু জমি গোধন চারণ ভূমি
মা কালী চরণে নমি দিলাম নিষ্কর
মাঠেতে পুকুর খুঁড়ি সিচ দিনু তিন গাড়ি
মৎস্য খাবে লোকে ধরি রুই কাৎলা পর।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমার কথাটা লিখে নিন।

—আপনার আবার ভিন্ন কথা আছে নাকি ?

—আছে। ধনেশ্বর কাকা বোধহয় জানেন না। না-হলে আপত্তি দিতেন না। বহুবল্লভ

পাল যা বলেছেন তা সত্য। কীর্তিহাটে বাস্তুজমি গোচর নিষ্করই বটে। কুড়ারাম রায়-ভটচাজমশায় দিয়ে গেছেন। তার সঙ্গে মাঠের পুকুরের সিচ এবং কই কাৎলা ছাড়া মাছও সাধারণ লোককে ধ'রে খেতে দিয়ে গেছেন।

—তার নজীর চাই হে। তার নজীর চাই।—গম্ভীর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন ধনেশ্বরকাকা।

আমি বললাম—আছে নজীর। দেখাব। কুড়ারাম রায়-ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিজের জীবনের পাঁচালী আমি পেয়েছি, আমি পড়েছি, আমি দেখাব।

সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বৃদ্ধ বহুবল্লভ বার্ধক্যজড়িত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার ক'রে বললে—পেনাম! পেনাম! তোমাকে পেনাম বাবু! কই তুমি কই! রাধা! বাবু কই? নিয়ে চল কাছে।

ছেলে হাত ধরে বৃদ্ধকে কাছে নিয়ে এল। সে আমার হাত ধরলে প্রথম। তারপর হেঁট হতে গেল, আমি বাধা দিলাম।

—না। বয়সে আপনি অনেক বড়।

—বয়সে বড়? তুলসীপাতা তুমি বাবু। নিখুঁত বেলপাতা। পোকালাগা চক্রলাগা পাতা ফেলে দিতে হয়। ওই ধনেশ্বরবাবুদের মত। তুমি নিখুঁত। মাথায় করতেই হবে গো। পেনাম না লাও, নমস্কার লাও। কই, মুখে একবার হাত বুলিয়ে দেখি!—হ্যাঁ। বটে। বেশ লম্বা গো। লাগাল পেতে বেঁকা কোমর সোজা করতে হয়। নাক টিকলো। চামড়া মাখনের মত। বা বা বা! গোটা গাঁয়ের লোক আশীর্বাদ করবে তোমাকে। তোমার ঠাকুরদাদার বাবা রায়-বাহাদুরকে দেখেছি আমি। ছেলে-মানুষে। ঠাকুরদাস পালের পেথম পক্ষ মারা গেলে আমার পিসীর সঙ্গে রায়বাহাদুর তার পেয়ারের ঠাকুরদাস পিসের বিয়ে দিয়েছিল গো। তিনি ছিলেন এক জবর লোক! তুমি তার বংশের ছেলে বট।

হয়তো কিছুটা নাটুকেপনা আমার মধ্যে আছে সুলতা। আমি ভেবে দেখছি। নইলে ওইভাবে রাত্রে চীৎপুরে দেহ-ব্যবসায়িনীদের দান করে রূপকথার রাজপুত্র সাজতে চাইব কেন? নাটুকেপনা বলতে পার আবার অভিজাতপনা বলতে পার। আবার রায়বংশের ধারাও বলতে পার। আমাকে সেদিন সেটেলমেণ্টের সাহেব ঠাট্টা করেছিল। আমি যে মাত্র ওই পাঁচালীর কথা বললাম এবং বললাম—ভোগদখলকারীদের লাখ্‌রাজ দাবীতে আমার আপত্তি নেই, অমনি তার ক্রিয়া একটা হয়েছিল। যেটার জন্যে বহুবল্লভ পাল প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে। যে কথার পিঠে বা জবাবে ধনেশ্বর-কাকার দল একেবারে চুপ ক'রে গেল—কোন কথা বলতে পারলে না। কিন্তু সায়েব কথা বললে—বেশ অ্যাক্টিং করার মত ভঙ্গি, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ মিশিয়ে বলে উঠল—দেখুন—দেখুন আপনাদের জমিদার সাড়ে আট আনার মালিক—কি মহান্ সত্যবাদী দেখুন।

অভিনয় যখন অভিনয় বলে ধরা পড়ে তখন তার মত বিশ্রী এবং পীড়াদায়ক আর কিছু হয় না।

কজন মুখ টিপে হেসেছিল। এমন কি বহুবল্লভ পালের উকীল ছেলেটি পর্যন্ত। কিন্তু তাতে আমার গায়ে একটুও ছেঁকা লাগে নি।

আমি চলে এসেছিলাম। আমার নায়েবকে বলে এসেছিলাম—আমাদের নিজেদের বাড়ীর প্লটে এলে যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়।

বাড়ী এসে একটা আশ্চর্য তৃপ্তির মধ্যে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কলকাতার মাথায় আকাশ অবশ্যই আছে—কিন্তু সে আকাশ মানুষের চোখে বড় পড়ে না। আমি ঝড়ের আকাশ দেখতে ছাদে উঠতাম। রাত্রে নক্ষত্র দেখতে উঠতাম কিন্তু কখনও সাধারণ সময়ে খোলা আকাশের দিকে ভরপুর মন নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকি নি। সেটা এখানে এসে আমাকে পেয়ে বসেছিল। এখানে আকাশের একটা রঙ আছে। ঋতুতে ঋতুতে পাণ্টায়। সেদিন আকাশটা ছিল ঘষা কাঁচের মত। মানে ধুলো উঠেছিল বাতাসের স্তরে। তারই উপরে খাঁ-খাঁ-করা আকাশে একজোড়া বড় আকারের কালচে রঙের পাখী—দুটি ডানা স্থিরভাবে মেলে দিয়ে পাশাপাশি উড়ে আসছিল। পক্ষীমিথুন তাতে সন্দেহ নেই। কল্পনা করছিলাম—তোমাকে নিয়ে এই বিবিমহলে জীবনটা এইভাবে স্থির পাখা বিস্তার করে ভেসে থাকার মত কাটিয়ে দেব। জমিদারী, বিবিমহল, রায়বাড়ি এ-সবের উপর আমার আকর্ষণ তো ছিল না, সে তুমিই সাক্ষী দেবে, কিন্তু সেদিন ঘোর লেগেছিল। বহুবল্লভের প্রণামের অনেক দাম। ওর উকিল ছেলে আজ মুখ টিপে হাসলেও কাল আমার কাছে নত হবে। ওকেই না হয় এখানে ম্যানেজার রাখব। নতুন উকীলের আর কত উপার্জন, উকীল ম্যানেজারের একজন দরকার হবে।

পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে থেকে জমি নিয়ে আইন বদলাতে বদলাতে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে মহাভারত হয়ে উঠেছে। বেঙ্গল টেনেন্সী এ্যাক্টের আয়তন দেখলে চমকে উঠতে হয়। পঞ্চম আইন, ষষ্ঠ আইন, সপ্তম আইন, অষ্টম আইন এসব সেকালের। তখন প্রজাকে এনে আটক কয়েদ ক'রে খাজনা আদায় করতে পারত জমিদারেরা। তারপর মাঠে ধান ক্রোক করে আদায় করতে পারত খাজনা। সেই আমলে সোমেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায় জমিদারী করে গেছেন। তারপর ওসব আইনের অষ্টম আইন বাদে সব উঠে গেছে। জমিদার-প্রজার মধ্যে সরকারের চোখে ভেদ নেই। এখন সব মুনফেসী সাবজজ কোর্টের এলাকার বিচারের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আদায়-তহশীল সেরেস্তা থেকে মামলা সেরেস্তা বড় হয়ে উঠেছে। এখন একজন উকীল রাখলে মন্দ হয় না। ভেবেছিলাম বিকেলে লোক পাঠাব।

হঠাৎ এরই মধ্যে কি ক'রে ঠাকুরদাস পাল উঁকি মেরে মুখ বাড়ালে বলতে পারব না। ঠাকুরদাস পাল—বহুবল্লভের পিসেমশাই হত।

বহুবল্লভ তো বলতে পারবে ওই কথাটা! ঠিক করলাম নিজেই যাব বিকেলে বহুবল্লভ পালের কাছে।

দুপুরে মেজঠাকুমা এসেছিলেন—তাঁকে বললাম কথাটা। মেজঠাকুমা আশীর্বাদের ছলে অনেক গুণগানই বল আর বাস্তব গানই বল করতে করতে ঘরে ঢুকেছিলেন। তিনি বললেন—সারা-গ্রামে ধন্যি ধন্যি উঠেছে।

কথাটা চাপা দিয়ে আমি বহুবল্লভের ওখানে যাবার কথা বললাম। তিনি খুঁতখুঁত করলেন প্রথমটা। তারপর বললেন—তা যাস। শুনেছি আমার শ্বশুরের হুকুম ছিল আমায়

শাশুড়ীর উপর। বিকেলে তিনি বের হতেন ঝি আর চাকর নিয়ে। বিশেষ করে বাউড়ী বাগদী চুয়াড় পাড়ায় তিনি গিয়ে দেখতেন কার বাড়ীর চাল থেকে ধোঁয়া উঠছে কার উঠছে না। মানে কার রান্না চেপেছে কার চাপেনি। বাড়ী থেকে চাল যেত তাদের বাড়ী। ভদ্র শূদ্র গরীব কারুর অসুখ বেশী শুনলে খোদ কর্তা যেতেন দেখতে—চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তা যেতে পারিস। সঙ্গে লোক নিয়ে যাস।

মেজাজটা যাকে জমিদারী ভাষায় 'সরিফ্' বলে তাই হয়ে গেল। বিকেলে গেলাম বহুবল্লভের বাড়ী। সদ্‌গোপ পাড়া মাটির দেওয়াল—কোঠাবাড়ী খড়ের চাল ঘর। রাস্তা সঙ্কীর্ণ, একখানা গরুর গাড়ী যায়। বহুবল্লভের-ঘরের চালে টিন। পোতা বা ভিত বাঁধানো। বাড়ীর সামনেটার পাকা থামদেওয়া পাকা মেঝে। পাল চোখে অন্ধ হলেও শনের গোছা টানিয়ে টেঁড়ায় পাক দিয়ে দড়ি কাটছিল। তকলীতে সুতা কাটার মত। বসেছিল একখানা তক্তাপোশের উপর উপু হয়ে।

আমার সঙ্গে মানে পিছনে লোকও জুটেছিল—দুটো কুকুরও চেঁচাচ্ছিল। আমি সামনে দাঁড়িয়ে বললাম—পালমশাই, আমি আপনার কাছে একবার এলাম!

দৃষ্টিহীন চোখ সামনে তুলে পাল বললে—কে? তারপর আমার কাপড়জামা এবং ল্যাভেণ্ডার সাবানের গন্ধ শুঁকে বললে—হাকিম মশায়—

—না। আমি সুরেশ্বর রায়।

—আঁ! চমকে উঠল পাল। তারপর চীৎকার করে বললে—ওরে রাধা! ওরে অ রাধা! গেলি কোথা রে বাপু?

আর একজন প্রবীণ এসে দাঁড়াল এবং নমস্কার করে আমাকে আহ্বান ক'রে বললে—আসুন আসুন। বলে ঘর থেকে দেশী ছুতোরের হাতে শালকাঠের তৈরী ভারী চেয়ার এনে পেতে দিয়ে বললে—বসুন।

পাল বললে—কে? বেজো না কে?

—হ্যাঁ।

—রাধা কোথা? রাধা?

—সে হাকিমের কাছে গিয়েছে।

—হাকিমের কাছে? কচু-পোড়া খেয়েছে—নিকাপড়া শিখে উকীল হবে! হাকিম ছাড়া আর চিনলে না কিছু। বসুন বসুন বাবা, বসুন। আজ সমস্তদিন তোমার নাম করেছি গো!

—আমি একটা কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে।

—ওই আমবাগানটার আর পুকুরটার কথা। ওটোতে বাবা কিছু গোল আমাদের আছে। ওটো রায়বাহাদুর আমাদিগে দানটান করেন নাই। যখন আমার পিসীর বিয়ে হয় উনিই খুব ধ'রে পড়ে বিয়ে দেয়ায়েছিলেন। পিসী আমার ডাগর হয়েছিল। বারো বছর বয়ক্রম হয়েছিল। তা তখন পিসের বয়স আমার, তা—পঁয়তিরিশ হবে বইকি! একটুকুন বেমানান হয়েছিল তো!—তা আমার ঠাকুরবাবা—রায়বাহাদুরদের কথা মেনে

বিয়ে দিয়েছিল। তাখন ওই বাগান আর মণ্ডল পুকুর ঠাকুরবাবাকে ভোগ করতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ভোগ কর্‌ তু। কিন্তু গাছ কাটতে পাবি না—, পুকুরের মাছ খাবি—কিন্তুক পুকুর বাগান বেচতে পাবি না। এই বিত্তান্ত বটে মশায়। দেখ বাবু, তুমি আজ এমুনি করে সত্যি কথা বললে—আমি মিছে কি ক'রে বলি ?—

আমি বললাম—না, ওর জন্যে আমি আসিনি।

চোখ স্থির ক'রে পাল বললে—তবে ?

—আমি কয়েকটা কথা জানতে এসেছি ঠাকুরদাস পাল সম্পর্কে।

—অঃ। তিনি মহাশয় লোক ছিলেন গো। যেমন স্বাহ তেমনি ক্ষ্যামতা আর তেমুনি সাহস। দুদ্দান্ত সাহস—দুদ্দান্ত লোক। আপনকার ঠাকুরবাবার বাবা রায়বাহাদুরের চেলা গো! আর আরও ছিল—কমলদাদা অন্তপান। তোমার ঠাকুরবাবার বাবার পেথম নাম তো কমলাকান্ত। মামা পুষ্যি নিয়ে নাম দিলে রত্নেশ্বর। অঃ শুনেছি, আমরা তো তখন জন্মাই নাই। মামা ভাগ্নেতে সে ভয়ানক ঝগড়া। বলে—মামা গুলী করতে গিয়েছিল ভাগ্নেকে। সেই তো ঘরে আগুন লাগল পিসেদের গাঁয়ে। তাতে তোমার ঠাকুরবাবার বাবাকে বাঁচাতে ছুটল পিসে, বাঁচালে, ইদিকে পিসের প্রথম সংসার জলন্ত চাল চাপা পড়ল। আবার শেষটায় যে কি হল—

—কি হল—তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনাকে।

—সেটাতে পিসের দোষই বটে। বুয়েছেন—ঠিক কথাটি কেউ জানে না। সি কাক পক্ষীতেও না! তবে—দোষ পিসের বটে। ক্যানে বলছি—শোনেন। পিসের ছেলে আমাদেরই হামজুটি—এই বছর তিন চারের বড় হবে। সি থাকত কীর্তিহাটে। থাকত আপনকার ঠাকুরবাবা—দেবেশ্বর বাবুমহাশয়ের কাছে। হ্যাঁ, তিনি একটা বাবুমহাশয় বটে। চেহারায় যেমন কার্তিক। তেমুনি মেজাজ। ইংরিজী নেকাপড়াতে পণ্ডিত। বাঘ মারতে যেতেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে একটা হাসি ছিল তার। সি মশায় ছুরির মতন। বুয়েছেন। আমার দাদা ঠাকুরদাস পিসের বড় বেটা তাঁর কাছেই থাকত। কলকাতা গেলেন বড়বাবু, সেও কলকাতা গেল। তাকেও পড়াতে চেয়েছিলেন রায়বাহাদুর। তা তার হল না। লেখাপড়া ছেড়ে ওই বড়বাবুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। শিকারে যেত। তা পরেতে দুম্মতি—গোয়ানপাড়ার পিদ্রু গোয়ানের বুন ছিল—তার নাম ছিল ভায়লা। মশায় সে এক মেয়ে বটে। যেমন রঙ তেমনি চেহারা। সি দেখেছি আমরা। তাকেই সে বার করে নিয়ে ভাগলো। এইতে পিদ্রু খুব খাপ্পা। একে গোয়ান তার ওপর ছিল মারহাট্টা গুণ্ডা ডাকাত। সে রায়বাহাদুরের কাছে লালিশ করলে। রায়বাহাদুর ঠাকুরদাস পিসেকে বললে—তোর ছেলেকে সাজা নিতে হবে। কি হল ঠাকুরদাস পিসের—সে বললে—সাজা কিসের ? সে বেটাছেলে। মেয়েটার বিচার কর। দেখ সেই হারামজাদী আসলে দোষী। রায়বাহাদুর খুব ধমকালে। মশায়—সেদিন সেখানে সে ঘরে মাছি ঢুকবার হুকুম ছিল না। ছিল পিসে, পিদ্রু আর খোদ রায়-বাহাদুর নিজে। পিসের দুম্মতি—সে বললে—তা হলে আমিও সব ফাঁস করে দোব হ্যাঁ। কি ফাঁস করে দেবে, কি বিত্তান্ত তা কেউ জানে না মশায়, জানত পিসে, জানতেন রায়বাহাদুর।

তা লোকে অনুমান করে মশায় যে রায়বাহাদুরের সঙ্গে তার বুন মামলা করেছিলেন জানেন তো। মানে রায়বাহাদুর পুষ্যিবেটা আর মেয়ে হল আসল। রায়বাহাদুর মামলা করেন নাই, টাকা দিয়ে মিটিয়েছিলেন। সেই তারই কোন গুহ্য কথা বোধহয় হবে। তাই ফাঁস করে দোব ব'লে পিসে বেরিয়ে এসে পিদ্রুকে বললে—আয় শালা গোয়ান ওর বিচার রায়বাহাদুর করবে কিরে, তোতে আমাতে হোক। আয়। এই তখুনি রায়বাহাদুর ইশারা দিয়ে থাকবেন। তাই পিদ্রু বেরিয়ে এল, দুজনে হাতাহাতি করতে করতে নদীর ঘাট পর্যন্ত গেল। ঘাটটার নাম গোঘাটা। মানে ওই গোচরের পাশে তো। যেটা নাখরাজ ছিল আপুনি স্বীকার করলেন। ওই ঘাটে গরুতে জল খেতো। এখন লোকে বলে গোঘাটা মানে গোয়ানঘাটা! পিসে যেছিল ওই গোয়ানপাড়াতেই। মেয়েগুলোর সঙ্গে ভজিয়ে দেবে ভায়লার দোষ। বলছিল সে তাই—আয় তোদের বিটী গোলার কাছে শোন কার দোষ। কিন্তু ওই ঘাটে গিয়েই পিদ্রু একবারে এই এক হাত লম্বা ছোরা বার করে আচমকা দিলে বসিয়ে পিসের বুকে। অঃ সে ঘড়া ঘড়া রক্ত পড়েছিল!

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পিদ্রুর মামলায় অনেক টাকা খরচ হয়েছিল—

—হ্যাঁ। বড় উকীল দিয়েছিল। রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন, তাই গুজব মাশায়।

—কেন?

—ক্যানে? একটু চুপ করে থেকে পাল বললে—সঠিক বলতে তো পারব না। এতবড় নোকটা—ধার্মিক নোক—কীর্তিমান নোক—সন্দেহ করলে পাপ হয়। নোকে বলে—দোষ তো পিসের বেটার। পিদ্রুর অপমান তো পিসের বেটাই করেছে। ঝোঁকের মাথায় করেছে। এই বলে দয়া হয়েছিল তার। আবার দুচারজন বলে মশায়, ওই যে পিসে বলেছিল, আমিও তাহ'লে ফাঁস করে দোব তাই জন্যে রায়বাহাদুর পিদ্রুকে হুকুমই দিয়েছিলেন—দে সাফ করে!

কথাটা মনে লেগেছিল আমার স্বলতা। এটাই সম্ভব। একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ঠাকুরদাস পালের কে আছে বংশে?

পাল বলেছিল—পিসের ছেলের ছেলের ছেলে, মানে ছেলের নাতি আছে। সে এখন মস্ত লোক, ব্যারেস্টার সাহেব। সে জাতকুল এখানকার সব ঘুচিয়ে মুছিয়ে সাহেবী কাণ্ড। পিসের ছেলে ভায়লাকে নিয়ে কলকাতা পালিয়েছিল। বাবা খুন হল, রায়বাহাদুরের ভয়ে এল না। পিসী ছাদ্দটাদ্দ করলে। উদিকে তোমার ঠাকুরবাবার কাছে টাকা কিছু নিয়ে সে কলকাতায় ব্যবসা করলে। ভায়লাকেও ছেড়ে দিলে। এখানে বিয়ে ক'রে গিয়েছিল, সে বউ লিলে না। বউটার ভাগ্যি ভাল মরেও গেল। ত্যাখন সে করলে কি, বেহ্ম হয়ে গেল মাশায়। তখন বেহ্ম হওয়ার খুব ধুম হল। বিয়ে করলে বেহ্ম বাড়ীতে। অবস্থা তখন ভাল করেছিল। তারপরেতে ভগবানের মার। ব্যবসা ফেল হ'ল। একবারে ফেল হল। ধাক্কাটা সইতে পারলে না। মরেও গেল। বউ ছেলে কোথায় যাবে, গেল বাপের বাড়ী। তারপরেতে ছেলে লেখাপড়া শিখে উকীল হল। নাতি বিলাত গেল। ব্যারেস্টার

হয়ে এল। মস্ত লোক এখন। তবে শুনেছি নাকি গুজব বটে মাশায়—ওই ছেলের সব খরচ মায় লাতির বেলাত যাবার খরচ সে সব রায়বাহাদুর দিয়েছিলেন। না হয় তোমার ঠাকুরবাবা মানে বড়বাবু দিয়েছিলেন। দেবেশ্বরবাবু মহাশয়। তারা আর এখন পাল নয়। ঘোষ হয়েছে। মিস্টার রমেশচন্দ্র ঘোষ ব্যারেস্টার!

আমি চমকে উঠলাম। সুলতা, মনে হল কংসাবতীতে প্রলয় বন্যা এসেছে, সেই বন্যায় আমরা দুজনে দুদিকে ভেসে যাচ্ছি। তবুও মনে আশা করেছিলাম, ঐ রমেশ ঘোষ তোমার বাবা নন। কিন্তু সন্দেহ রইল না. পালের ছেলে উকীল ফিরে এসে যে ঠিকানাটা দিলে সেটা তোমাদেরই।

আবার আমি রায়বংশের অতীতের অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মত ছুটলাম, কোথায় আলো কোথায় আলো বলে। আলোর বদলে আগুনের কুণ্ডতে প'ড়ে যদি ছাই হয়ে যাই তাও এ থেকে ভাল।

হঠাৎ দিন চারেক পর কৃষ্ণযবনিকা যেন তুলে দিলেন ভাগ্যবিধাতা। হঠাৎ এল ব্রজেশ্বর। মনে আছে ব্রজেশ্বরকে, যে আমার নামে পরিচয় দিয়ে যেতো আসতো শেফালির বাড়ীতে? যে আমাকে বলত রাজাভাই। সেই অতি মিষ্টমুখ, আয়ুর্বিদ্ সুন্দর চেহারা ব্রজেশ্বর। ধনেশ্বর-কাকার বড় ছেলে। যে অতিচতুর রায়বংশধরটি আমাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করেছিল, সেই ব্রজেশ্বর? মনে আছে? হ্যাঁ, সেই হঠাৎ এল কীর্তিহাটে। তার আসার ভঙ্গিও বিচিত্র।

তখন আমি অন্ধকারে অন্ধের মত কাগজের স্তূপের মধ্যেই ডুবে আছি। কিন্তু সেটা বিষয় বা সম্পত্তির জন্য নয়! ওরা বাড়ীর স্বত্বে আপত্তি দিয়েছিল। বলেছিল, এ কারুর ব্যক্তিগত নয়। এ দেবোত্তর। এজমালী অবিভাজ্য।

আমি সেই খাতাখানা দেখিয়েছিলাম। দেবোত্তরের খাতায় ইটের পাঁজা অর্থাৎ ভাটা বিক্রয় দরুণ জমা। শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু সোমেশ্বর রায় মহাশয়ের অন্দর মহল তৈয়ারীর জন্য দেবোত্তরের যে ইটের ভাটা হইতে ইট লয়েন তাহার মূল্যবাবদ জমা মাঃ শ্রীল শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর রায় মহাশয়। টাকাটা সামান্য, সাড়ে তিনশো টাকা।

ওরা চমকে গেল। দেখলে। তারপর আর কথা বললে না, আপত্তিটাও তুললে না। বুঝলাম ব্যক্তিগত জমাখরচের খাতাখানা ওদের হাতেই আছে। কিন্তু এইভাবে ছোট একটা ইটের জমাখরচ দেবোত্তরের খাতায় লুকিয়ে বসে আছে তা অনুমান করতে পারেনি।

সম্পত্তির জন্য আমি খাতা ঘাঁটছিলাম না। ঘাঁটছিলাম ওই ঠাকুরদাস পালের খুনের অন্তরালে কোন্ অনুমানটি সত্য তাই আবিষ্কারের জন্য। ওই সামান্য কি বলেছিলেন ঠাকুরদাস পাল তার জন্য রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর তাঁকে খুন করালেন? রত্নেশ্বর রায়ের পাপপুণ্যে আমার কিছুই করবার নেই। ওর ভাগ বা উত্তরাধিকার নেই। উত্তরাধিকার থাকে বিষয়ের। তা আমি পেয়েছি। কিন্তু এ যে তাঁর পাপ, যদি এটা সত্য হয়, তাঁর পাপই হয়, তবে সেই পাপ যে প্রচ্ছন্ন কলির মত ছুরি বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে তোমার এবং আমার মধ্যের বন্ধনটা কাটবার জন্যে। এ নিয়ে মনে মনে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যেন কেঁদেছ।

মুখ ফিরিয়ে বসেছ। তারপর বলেছ—এর পর আর হয় না তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন। আমিও ভাবছি, ঠাকুরদাস পাল এমন কোন মর্মান্তিক কথা বলেছিল? সে কথা তিনি বলার পরই কি আমিই পারব তোমার সঙ্গে জীবন বাঁধতে? আমি পাগলের মত কাগজ ঘাঁটছিলাম। দেবতার ঘরের সিন্দুকের ভিতর থেকে কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা অনেক চিঠি পেয়েছিলাম সোমেশ্বর রায়ের আমলের। বহু বিচিত্র চিঠি। কাত্যায়নী দেবীর আরও ক'খানা সেই ধরনের প্রেমপত্র ছিল, ল্যাণ্ড-হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েসনের চিঠি, রেগুলেশনের নকল পেলাম। নানান জমিদারের চিঠি পেলাম। আর পেলাম রবিনসন নীলকুঠীর কুঠিয়ালসাহেবের একটি চিঠি। তার মধ্যে দেখলাম তিনি তাকে টাকা ধার দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, রবিনসনের ব্যবসায়ে জমিদার হিসেবে সাহায্য করেছেন প্রজাদের নীল বুনতে বাধ্য ক'রে, এবং আরও অনেক কিছু ক'রে। একখানা চিঠি ছিল বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে। রবিনসন লিখেছে—'মিস্টার রায়বাবু, তোমার ছেলে বীরা এখানে বেশী থাকছে বলে তুমি মনে মনে ভয় পেয়েছ শুনলাম। রেভারেণ্ড হিল আমাকে বলেছেন। চিন্তা করো না। সে আমাদের ভালবাসে, আমার ছেলে জনি এবং মেয়ে মেরীর সঙ্গে তার খুব ভাব। আমরা তাকে ভালবাসি। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে। তবে আমরা তাকে মুর্গী বীফ হ্যাম খাওয়াইয়া ক্রীশ্চান কখনই করিব না। মেরী ইংরেজ মেয়ে। সুতরাং চিন্তা করো না।"

বীরেশ্বর তখন ষোল বছরের।

আরও চিঠি পেয়েছিলাম—একখানা প্রিন্স দ্বারকানাথের। তিনি জানতে চেয়েছিলেন জমিদারী সম্পর্কে কতকগুলো তথ্য। সোমেশ্বর গ্রামে এসে শুধু জমিদারীর খাজনার সঙ্গেই নয় মাটির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে এসব তথ্য তাঁর নখদর্পণে ছিল।

আর একখানা চিঠিতে বর্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের কথা ছিল। দ্বারকানাথ লিখেছিলেন —শ্মশান হইতে পলায়ন করিয়াছে, মরাটা ভান, ইহা প্রায় আরব্য উপন্যাসের সিন্দুক ওড়ার মতই অবিশ্বাস্য। যাহা হউক সঠিক সকল ঘটনা না জানিয়া ইহাকে আমি সমর্থন অসমর্থন কিছুই করিতেছি না। অগ্রে জানিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিব, তদনুসারে কর্ম করিব। পরে এ বিষয়ে আপনাকে সমুদয় জ্ঞাত করাইব।

আর একখানা পত্রে ছিল—"আপনি গ্রামে বসিয়া পৌত্তলিকতা এবং তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি বিকৃত আচার লইয়া আছেন ইহাতে আমার দুঃখ হয়। আপনি কলিকাতায় আসুন। মাননীয় শ্রীরামমোহন রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করুন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনার মতের পরিবর্তন হইবে। তাহা ছাড়া অর্থ লইয়া জমিদারী কেনায় আমাদিগকে ভুলাইয়া ইংরাজেরা ব্যবসা-বাণিজ্য সব হস্তগত করিয়া লইতেছে। বাণিজ্যই লক্ষ্মী। সুতরাং আমাদিগকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও অগ্রসর হইতে হইবে।"

এসব যখন পড়ছিলাম তখন মনের মধ্যে সেকালটা ভেসে উঠেছিল কিন্তু সে আমলের ইতিহাসকে জানার প্রলোভন আমার ছিল না।

আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওই ঠাকুরদাস পাল আর বীরেশ্বর রায়ের কথা। তাতেই আমি এমন মগ্ন হয়ে গেছি যে, শুধু অতীতই বা কেন, বর্তমান কালের আর কিছু মনে ছিল না

আমার। কলকাতা তুমি সব অনেক দূরে চলে যাচ্ছে যেন। আমি ১৯৩৬ সালের এপ্রিলের শেষে কীর্তিহাটে চোখ মেলে বহুবল্লভ পালের উকীল ছেলে, হাকিম হরেন ঘোষ, রায়বংশের ভাঙা কুঁজোদেহ ধনেশ্বর-কাকা, শিবু পণ্ডিতের আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা, সুরেন দের কাছে সেকালের ছ আনা আট আনা মন ধানের দামের কথা, উরু ভটচাজের মুখে দানীবাবু গিরিশবাবুর বক্তৃতার কথা শুনতে শুনতেও রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের আমলে বাস করছি, আর তাঁকেই জেরা করছি। বলুন—কি হয়েছিল বলুন।

এদিকে ওইদিনের ওই ঘটনার পর গ্রামটা গোটা যেন ছুটে আমার কাছে এগিয়ে এল। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা মনে হল আমার। তিন চার বার এসেছি, বাবার শ্রাদ্ধে ক্রিয়াকর্মের সময় সকলকে মিষ্ট ভাষায় সবিনয়ে সম্ভাষণ করেছি, তারাও মিষ্ট কথা বলেছে, তুষ্ট হয়েছে বলে হেসেছে, কিন্তু তবু কাছে আসে নি। যা হয়েছে দূরে দূরে দাঁড়িয়েই হয়েছে। কিন্তু চারদিন আগের ঘটনাটির ফলে এমন একটা কিছু হয়ে গেল যাতে তারা একেবারে দরজা ঠেলে এসে ঘরে ঢুকে চেপে বসল। হেসে বললে—এলাম আমরা।

শুধু ভদ্রজনেই নয়; গ্রামের যাদের আমরা ব্রাত্য বলি তাদের দল এল নালিশ নিয়ে, বললে—আমাদের এইটে বিচার করে দ্যান।

বেশ মদ্যপান ক'রে আবেগবিভোর হয়ে এসে হাজির হল, বললে—লইলে আমরা আর কার কাছে যাব আজ্ঞে? বলে দ্যান!

ওদের প্রথম মামলা নিয়ে মনে হল খুনের মামলার রায় দিতে হবে। সে এক স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ। বুড়ো হাটু বাউড়ী একটি যুবতী মেয়েকে সাঙা করেছিল। যুবতীটি ঘর করতে করতে একটি নব যুবকের সঙ্গে প্রেম করে। তা নিয়ে পাড়ায় হাঙ্গামা অনেক হয়। মারধরও হয়। অবশ্য মেয়েটাকে। এবং ছোড়াটাকে কানও মলতে হয়, কিন্তু শেষে মেয়েটা এর সর্বস্ব হরণ করে ছোড়াটাকে নিয়ে পাশের গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। সেও কীর্তিহাটের সামিল আমাদেরই জমিদারী। মেয়েটা মরিয়া হয়ে আমার সামনেই ঘোমটা খুলে বললে—আমি যাব নি। খাব নি, উর ভাত খাব নি। বুড়ো মড়ার গায়ের গন্ধে আমার ঘুম হয় না!

আমি বিচার করে দিলাম—মেয়েটা যা টাকা গয়না বাসন নিয়ে এসেছে তা ফেরত দিতে হবে। আর ও ওই যাকে বরণ করেছে তার কাছেই থাকবে।

সাধুবাদ পড়ে গিয়েছিল। মেনে নিয়েছিল তারা।

এমনি আর একটা নালিশ সেদিন এসেছিল, গোয়ানপাড়ার নালিশ। মেয়েরা ছিল না। ছিল পুরুষরা। নালিশটা এই—হুজুর মালেক, তোমার জমিনে হামি লোক বাস করি। লেকিন সিটিলমেণ্টে গীর্জের মালিক কেনো হলদী বুড়া হোবে। যে মুখপাত্র হয়ে এসেছিল সে নতুন লোক, তাকে দেখি নি। তাকে দেখে মনে হয় না সে মানুষ অন্ততঃ গোয়ানপাড়ার মানুষ! সে যেন এক গল্পলোক বা স্বপ্নলোকের মানুষ! লোকটার দিকে চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ রায়বাড়ীতে শাঁখ বাজল। উলু পড়ল। কিছু বুঝলাম না। লোকটার দিকেই দৃষ্টি ফেরালাম। এমন সময় কে যেন ছুটে এল, গোয়ানদেরই ছেলে। সাদা ক'রে বহু নিয়ে আইলো বড়কা বাবুর বড়কা ছেলিয়া। বিবুজাবাবু। এই মস্ত বহু। বহুত ফেশন খবসুরত

ভি। আর বিরজাবাবু বঁড়িয়া পোশাক পিহিনকে আইলো। বহুৎ বড়া আদমী হইয়াছে। বড়া নোক্‌রী মিলল উনকে। বাপরে—বাপরে—ক্যা কায়দা!

ওদের আর নালিশ করা হল না। ছুটে সব একসঙ্গে চলে গেল। এ লোকটাও চলে গেল।

চুপ করে বসে ছিলাম কিন্তু মনটা চঞ্চল এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বুঝেছিলাম ব্রজেশ্বর ফিরেছেন এতদিন নিরুদ্দেশের পর কোন এক হতভাগিনীর মস্তক ভক্ষণ ক'রে। কিন্তু বড় চাকরী পেয়েছে বড়লোক হয়েছে সেটা খুব মাথায় এল না। কোন ধনবানকে ঠকিয়ে তার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে অদৃষ্ট ফিরলে বিস্ময়ের কিছু থাকত না। এ চাকরী!

আজ মেজদি পর্যন্ত আসেন নি! মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। বোধহয় ওই বধূটির জন্য। রঘুকে বললাম—বেহালাটা দে।

বেহালাটা নিয়ে বাজাতে গিয়ে একখানা ফটোর দিকে চোখ পড়ল। পুরনো ফটোগ্রাফ, ফেড হয়ে গেছে। রায়বাহাদুর রায়বাহাদুর হয়েছিলেন ১৮৮২ সালে, সেই সময়ের চোগা চাপকান পাগড়ি পরা ফটো, হাতে সনদ। বলতে ভুলেছি, সেকালের কতকগুলো ফটো কাছারীতে পড়ে ছিল, কাঁচ ভেঙে, ফ্রেম ভেঙে, সেগুলো আমি নিয়ে এসেছিলাম। রায়-বাহাদুরকে বললাম—

—তোমার একেবারে মুছে যাওয়া উচিত ছিল।

রঘু এসে ডাকলে—মেজঠাকুরমা আসলেন!

—ডাক এইখানে! নিচে যে ঘরটায় এখন বাইরে লোকজন বসে সেইখানে বসেছিলাম। মেজদি এখানে না-আসা নন। কেউ না থাকলে আসেন।

রঘু বললে—আরও মাইয়াছেলিয়া আছে।

—আরও মেয়েছেলে?

—নতুন বহু লিয়ে আসছেন।

—অ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই উঠে গেলাম।

মেজদি আমাকে দেখেই বললেন—দেখ ভাই নাতি, ব্রজ কেমন বউ এনেছে। তুই এইবার বিয়ে কর ভাই। নাতবউ, এই হল সুরেশ্বর, তোমার দেওর। আর আমার চুলের কালো রঙ। মুখের হাসি। অন্নদাতা। রায়বাড়ীর পঞ্চপিদীমের ঘিয়ের পিদীম।

আমি অবাক হয়ে গেলাম সুলতা! চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ কি বউ! এ যে পরমাসুন্দরী মেয়ে।

বউটিও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সঙ্গে রায়বাড়ীর গণ্ডা দেড়েক আইবুড়ো মেয়ে। দেখতে তারা সুন্দরী। বিয়ের বয়স চারটের বেয়ে যাচ্ছে। তারা নতুন বিয়ে এবং নতুন বউয়ের রসে মগ্ন। গা-টেপাটেপি ক'রে হেসে যাচ্ছে।

আমি বললাম—নমস্কার!

মেয়েটিও বললে—নমস্কার।

বললাম—বসুন! তোরা ব'সরে! মেজদি, এদের সব জলটল খেতে দাও!

আইবুড়ো মেয়েদের মধ্যে সব থেকে বড় জগদীশ্বর-কাকার মেয়ে অর্চনা, সে বললে—জল তো শুধু খাব না। তোমার বাজনা শুনব। ব্রজদা বললে, বউ গান জানে। তুমি বাজাও বউ গান করবে।

অবাক লাগল, প্রমত্ত নটরাজ জগদীশ্বর-কাকার মেয়েটি এমন!

মেজদি বললে—আর তুই নাচবি!

—সে আমি কেন? তুমি নাচবে!

—কেন লা। আমি নাচব কেন? বিয়ে বিয়ে ক'রে ক্ষেপেছিস্, দাদার সামনে ধেই ধেই করে নাচ। দাদা তা হলে বিয়ে দিয়ে দেবে। গতি হবে একটা!

এরই মধ্যে ডাক শোনা গেল—ভাই রাজাবাহাদুর! কই, কোথায়? ওরে বাপরে! করেছে কি তুমি রাজা, এ যে সত্যি সত্যি মহারাজা হয়ে বসে গেছ ভাইয়া!

এসে হাজির হল ব্রজেশ্বর। সেই হাসিমুখ, এতটুকু অপ্রতিভতার চিহ্ন নেই। পরনে স্যুট। চমৎকার চেহারা হয়েছে। দেহের শীর্ণতা আর নেই। এসেই হাতখানা চেপে ধরলে। আমি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। একটু একটু করে সে বিবর্ণ হতে লাগল। হঠাৎ আমাকে টেনে বললে—একটু এখন তাড়াতাড়ি আছে ভাই। পরে আসব। একটা কথা বলে যাই।

ব্রজেশ্বরের হাত ধরে আমিই টানলাম। বললাম—মেজদি, তুমি এদের খাওয়াও। আমি ব্রজদার সঙ্গে কথা বলি।

ওকে টেনে একবারে নিরিবিলি ঘরে নিয়ে গিয়ে বললাম—কি ব্যাপার?

হেসে বললে—অনেক ব্যাপার রাজা। শেফালির ব্যাপারটার জন্যে তোমার কাছে আমার অনেক লজ্জা। মাফি মাংছি ভাই। মাফি কিয়া যায় রাজা! উ ভাই হামার কসুর হুয়া। স্রেফ নেশার ঝোঁকে বলে ফেললাম আমি সুরেশ্বর রায়। ট্যাক্সিতে চাপিয়ে জানবাজারের বাড়ীর কাছে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, বাড়ীর দরজায় আজেবাজে কথা বলে ওদের কাছে খাতিরটা জমিয়েছিলাম ব্রাদার। ঝোঁকে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ছিল না। হিহি করে হেসে বললে—জ্ঞান কোনকালে নেই। করি কি বল! রায়বাড়ীর নামটা আর ওই দালানটা ছেলেবেলা থেকে মাথা খেয়েছে। শেফালিকে বললাম বাঁধা রাখব। বাড়ী ভাড়া করলাম। টাকা তুমি একশো টাকা দিয়েছিলে, আর মাড়োয়ারীর বাড়ী হচ্ছিল, লোহার কড়ি ছিল, তাই দুখানা বেচে টাকা প্রথমটা জুগিয়েছিলাম। ইটও কিছু বেচেছিলাম। শেষে দেখলাম ধরা পড়ব। ভেগে গেলাম রাজা। তোমার কাছে আসতে সাহস হল না, লজ্জাও হল। শেষ বুদ্ধি মাথায় খেলল। ঘুরছি চৌরঙ্গী ধ'রে। তোমার বাড়ী যাব বলে যেতে না পেরে দক্ষিণ-মুখো হাঁটা দিয়েছি। কাবলী ছোলাভাজা পকেটে, চিবুচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম মহারাজা অজিতেশ্বর প্রসাদের বন্ধ ফটকটা খোলা, দরজা দিয়ে তিনখানা মোটর বেরিয়ে গেল। ফটকের সেন্ট্রিটা খট ক'রে পা ঠুকে সেলাম করলে। বুঝলাম রাজাসাহেব এসেছেন—ওঃ, মনে হল, সা—লা, রাজা যদি একটা হ'তাম এমনি। গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে ফন্দি এল মাথায়। মাথায় ধুলো মাখলাম, কাপড়টা খানিকটা ছিঁড়লাম। জামাটার পকেটটা ছিঁড়লাম। বসেই রইলাম, পথের দিকে তাকিয়ে। এক সময় দেখলাম রাজার গাড়ী ফিরছে। গিয়ে ফটকের

সামনে দাঁড়ালাম। গাড়ী ভেতরে ঢুকল। আমি হেঁট হয়ে নমস্কার করলাম। গাড়ী ঢুকে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বিকেল পর্যন্ত। আবার গাড়ী বের হল। ফের নমস্কার। গাড়ী চলে গেল। সন্ধ্যের সময় ফিরল। তখনও দাঁড়িয়ে, তখনও নমস্কার। দাও ভাই, তোমার ভাল সিগারেট দাও।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। সিগারেট ধরিয়ে ব্রজেশ্বর বললে, এ ফন্দি আমাকে সুখেশ্বর-কাকা শিখিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখত বড় বড় রাজাকে। লিখত—আমি রাজবংশের ছেলে, আজ নিঃস্ব, চাকরী করতে পারি না, লেখাপড়া শিখি নি। বড় দুঃখে আছি। সাধারণের কাছে হাত পাততে পারি নে। একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখত "যাচনা মোঘা বরম অধি গুনে নাধমে লব্ধকামাঃ।" টাকা আসত কিছু কিছু। সেই ফন্দি মাথায় গজিয়েছিল। যাক, সন্ধ্যের সময় বারবার তিনবার আমাকে দেখে রাজাসাহেব জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, কি চাই? বললাম—কাগজ দাও লিখে দি। লিখে দিলাম—"প্রিন্স অব কাটিহাট স্টেট, ওয়াণ্টস টু টেল হিজ পেথেটিক স্টোরি।"

বাস, ডাক এল। গেলাম।—ওই বললাম—আমি কাতিহাটের প্রিন্স, আমরা সিন্স দি টাইম অব আকবর শাহ প্রিন্স। ইংরেজ টাইমে আমাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। আজ গরীব। কিন্তু ইওয়োর হাইনেস, শান্তিপুরের ধুতি ছাড়া পরতে পারি না, সিল্কের জামা ছাড়া গায়ে দিতে পারি না। স্কিন ছড়ে যায়। আজ আপনি যদি সাহায্য না করেন তবে মরে যাব।

রাজা বললেন,, তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি তুমি ঝুটা বাত বল নি। কিন্তু কিছু টাকায় তোমার কি হবে? চাকরী কর। বললাম—ইওয়োর হাইনেস, লেখাপড়া জানি না। বাধা দিয়ে রাজা বললেন, কিছু দরকার নেই, তোমার সহবৎ আছে, ইউ নো ম্যানারস। তুমি আমার ছেলের একজন এডিকং হয়ে থাকবে। মাইনে পাবে। তুমি বিয়ে করেছ। বুঝলাম বিয়ে হওয়া-না-হওয়ার উপর মাইনে নির্ভর করছে। বললাম, করেছি। মাইনে হল দেড়শো টাকা। ফ্রি কোয়ার্টার। এবং পোশাক স্যুট তাছাড়া চুস্ত পাজামা শেরওয়ানী তাও পাব।

চলে গেলাম সেখানে। মাস কয়েক পর রাজা ধরলেন, ক্যা মতলব? তুমি বহু আন না, রূপেয়া ভেজো না। ক্যা মতলব? বললাম—হুজুর, বউ শ্বশুরবাড়ীতে আছে, যাব আর নিয়ে আসব।

ভেবেছিলাম রাজা, পালিয়ে এসে আর যাব না। মানে বউ কোথা পাব? কলকাতায় এসে কিন্তু বউ পেয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। এক নারী-কল্যাণ আশ্রমের পাণ্ডার সঙ্গে। চাঁদা তুলে আশ্রম চালায়, বড় বড় ধনী লোক চাঁদা দেয়। অনাথা বিধবা কলঙ্কিনা কুমারী এইসব মেয়েদের আশ্রয় দেয়। খেতে পরতে দেয়। বিয়ে দিয়ে দেয়। আবার পেট্রনদের মনোরঞ্জনের জন্যেও এদের কাজে লাগায়। মেয়েগুলো বলতে গেলে কয়েদীর মত থাকে। দু-চারটে ভাল আশ্রম আছে। সে বললে—তার জন্যে ভাবনা কি। বউ দিতে পারি। এস। তুমি বন্ধু লোক। একটি মেয়ে আছে বুঝেছ, খুব

সুন্দরী, বয়স একটু হয়েছে, বিধবা। দেওর অত্যাচার করেছিল। মেয়েটা চীৎকার করে লোক-জানাজানি করে। কেসে দেওরের কনভিকশন হয়ে গেছে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে স্থানও গেছে। কোর্ট থেকেই নিয়ে এসেছি। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাট ওকে নিয়ে। বিদেয় করতে চাই। দেখ, বিয়ে দিতে পারি। দেখলাম, বয়স আমার সমান হবে হয়তো। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। বিয়ে ক'রে ফেলেছি। ওখানে নিয়ে যাবার সময় সব বলেছিলাম। সরমা ভাল মেয়ে। কিন্তু ওর সন্দেহ এখনও আছে আমি ফেলে পালাব। তাই এবার কুমার-বাহাদুরের কাজে কলকাতা এসেছি, কুকুর কিনতে হবে। একজোড়া ফার্স্টক্লাস অ্যালসেসিয়ান চাই। আমার উপর ভার পড়ল। ও আমার সঙ্গ ছাড়ল না। বললে—সঙ্গে যাব আমি। আর ছুটি নাও, তোমার দেশে গিয়ে তোমার বাবা-মাকে প্রণাম করে আসব। ভাল লাগল। মনে একটা বাসনাও ছিল একবার সেজেগুজে কীর্তিহাটে আসব। আমার এখানকার পজিশনটা দেখাব। বেশী দেখাবার ইচ্ছে ছিল সুখেশ্বর-কাকাকে। জান রাজা, এই লোকটিকে মেরে আমার ভাইটা পাগলা গারদে গেছে তাতে আমার একবিন্দু দুঃখ নেই। আমার বাবা মাতাল বজ্জাত গোঁয়ার সব। কিন্তু সুখেশ্বর-কাকা ছিল স্নেক—পাইথন অজগর! বাবারে বাপরে! তা সে নেই কিন্তু তার ছেলেরা আছে। তারা দেখুক। এখানে এসে শুনলাম তুমি আছ রাজা। আর যা করেছ না তা রাজার মতই করেছ। লোকে ধন্য ধন্য করছে।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—দেখ, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমার অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে, মিথ্যে বলি হরদম, তোমার অনেক আছে, তোমাকে হিংসেও করতাম। তা এখনও করি। মাঝে মাঝে করি। সব সময় করি না। বিলিভ মি। আবার ভালও বাসি। আমি শেফালির ওখানেও গিয়েছিলাম। এবার না। এর আগের বার কুমার সাহেবের সঙ্গে চারদিনের জন্যে এসেছিলাম। সেই সময়। শেফালি খ্যাংড়া নিয়ে তেড়ে এল। আমাকে তো জান। আমি মানাতে জানি। বললাম, তাই মার। পিঠ পেতে দিচ্ছি তারপর বসে একটু পান টান করে কিছু টাকা দিয়ে বললাম—দেখ আমি যাই হই বেইমান নই। না হলে আসতাম না। আর বড়বংশের ছেলেও বটে। তখন ও তোমার কথা বললে। বললে, হ্যাঁ ওই একটা মানুষ বটে! বললে সব কথা। আমি রাজাভাই, পাপী মানুষ, আমি ব্রজেশ্বর, কিছুদিনের মধ্যেই ওখানে ঘুন হয়েছিলাম। সন্দেহ হল কোনখানে নিশ্চয় ঢুকেছ। পথে ঘুরে বেড়িয়েই তো প্রথম সাহস সঞ্চয় হয়। প্রথম কলকাতায় গিয়ে চীৎপুরের ট্রামে ঘুরতাম। সন্ধ্যে থেকে দশটা পর্যন্ত। তারপর পায়ে হেঁটে। তারপর সুড়সুড় করে মুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাঁক ডাক মেরে। কিন্তু দেখলাম রাজার ছেলে এসেছিল দুঃখীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, রাজার ছেলের মতই ফিরে গেছে। ঢোকে নি কোথাও। সেলাম দিলাম। কুর্নিশ!

আমি অবাক হয়ে শুনলাম। বিচিত্র চরিত্র এই মিষ্টমধুর পাষণ্ডটিকে কি বলব খুঁজে পেলাম না।

ব্রজেশ্বর বললে—কিছু বল রাজাভাই। আমি ভাই অকপটে সব বলেছি তোমাকে, দিব্যি গেলে বলতে পারি, একটি মিথ্যে বলিনি।

বললাম—কি বলব তাই ভাবছি। বলবার কিছু পাচ্ছিনে ব্রজদা।

—ব্রজদা না বলে প্রজাদা বলো। তুমি রাজা। কিন্তু শুনলাম মদ খাচ্ছ!

—তা খাচ্ছি।

—অবাক বলতে হবে। মদ খেয়েও তুমি—। মুখের দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি?

ব্রজেশ্বর বললে—আমি খবর সব নিয়েছি। মদ খেয়েও তোমার মন ওদিকে ছোটে না?

—কোন্ দিকে?

—কোন্ দিকে আবার? শিব ছুটেছিল মোহিনীর পেছনে। এখানে পটোরা গান গায়—শিব বাগ্দিনীর পিছনে বাগ্দীপাড়ায় ঘুরত। ব্রহ্মা মদ খেয়ে নিজের কন্যা সন্ধ্যার দিকে তাকিয়েছিল। মানুষের কথা বাদই দাও। মদ খাও, খেয়ে মন ছোটে না? এখানে এমন সোনার চাঁদ গোয়ানপাড়া—ছুঁড়িদের যেমন দেহ, তেমনি রঙ। ওরা একসঙ্গে মেমসাব, আবার দণ্ডকারণ্যের শবরী! তুমি এখানে মদ খেয়ে, ছবি এঁকে, বেয়ালা বাজিয়ে কাটিয়ে দিলে!

চুপ করে রইলাম। মনে মনে যাচাই করছিলাম সরলতা। ব্রজেশ্বর পাষণ্ড হোক, মূর্খ হোক, যা-হোক, কথায়বার্তায় রস রসিকতা যারই ফোয়ারা ছুটিয়ে থাক, তার মধ্যে দুপুরের রৌদ্রের মত একেবারে সাদা এবং প্রখর উত্তাপের মত সত্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। আবহাওয়া কথাটা বলব না, খাপ খাবে না এখানে। ব্রজেশ্বরকে মিথ্যে বলতে ইচ্ছে হয় নি।

—প্রিন্স ব্রাদার!

—ভাবছি ব্রজেশ্বরদা। না-ভেবে তো বলা ঠিক হবে না।

—জান? কেন জিজ্ঞেস করছি জান?

—কেন?

—দেখ, সুখেশ্বর-কাকা একেবারে 'ঔরংজেব' ছিল। সে যদি ভাই অমনি বাদশাহীর আসরে প্রিন্স হয়ে জন্মাত, তবে ঠিক ওই খেল খেলত। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিল—ঠিকেদারীও করত, আমাকে নিয়ে আমার বেনামে ঠিকেদারী চালাত। বলেছি তো—নেটিভ স্টেশনে পর্যন্ত চিঠি লিখত কায়দা করে—তাতে মধ্যে-মাঝে বিশ-পঞ্চাশ-একশোও এসেছে। রায়বাড়ির সম্পত্তি, দাদুর মত ধুরন্ধর, তার কাছ থেকেও বেনামে বন্দোবস্ত নিয়েছে। আমি জানতাম বলে কিছু কিছু টাকার ভাগ আমাকে দিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কাণ্ড করেছিল—রায়বাড়ীর সব মোক্ষম দলিল-কাগজপত্র হাতিয়ে রেখেছিল। দাদু যে

দাদু, সেও জানতে পারে নি। তিনি সেরেস্তা থেকে অনেক কাগজ-খাতা সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ঠাকুরের সিন্দুক থেকে গহনা বের করে গালিয়ে বিক্রি করলেন। জমা-খরচের জোচ্চুরিতে মারলেন। কিন্তু সুখেশ্বর-কাকা সেই সময় সরালেন রাজরাজেশ্বরের মুকুট থেকে পাথর আর সরালেন কখানা দলিল, কখানা বাঁধানো খাতা। একখানা খাতা ইংরিজীতে লেখা—বীরেশ্বর রায়ের ডায়েরীগোছের। আর একখানা রায়বাহাদুরের ডায়েরী। বুঝেছ।

—সে-খাতা কোথায় ? সোজা হয়ে বসেছিলাম আমি।

—সুখেশ্বরকাকা একটা শক্ত ট্রাঙ্কে ভরে রেখেছিলেন নিজের শোবার ঘরে—মাথার শিয়রে। মধ্যে মধ্যে বলতেন, এই তোমাদের মানে তোমার বাবার সম্পর্কে ; বলতেন, ভারী হিংসে ছিল তাঁর। যোগেশ্বরদার ও হতেই হবে। যজ্ঞেশ্বরদার হবে দেখবি। তোমার মা যখন যজ্ঞেশ্বরজেঠার দেবোত্তর পত্তনী নিলেন, বাড়ী কিনলেন, তখন বলেছিলেন, বাবা মরুক, তারপর পাশা উল্টে দেব আমি। মোক্ষম অস্ত্র আমার কাছে আছে।

অধীর হয়ে উঠেছিলাম আমি, বলেছিলাম,—আমি টাকা দেব ব্রজদা, তুমি দিতে পার সুখেশ্বর-কাকার ছেলেদের কাছ থেকে এনে ওই খাতা --

—সবুর রাজাভাই। সবুর কিজিয়ে। উ বিলকুল দপ্তর হামারা পাশ হ্যায়। গোপেশ্বর যেদিন খুন করলে মেজকা'কে, তার দিনতিনেক পর ঠিকেদারীর বিল করবার জন্যে খাতা বার করতে গিয়ে সেই ট্রাঙ্ক আমি খুলেছিলাম। এবং সেই সময় কি মনে হল, ওই দপ্তরটি আমি বের করে নিয়েছিলাম। সে আমি কিছু পড়েছিলাম। ইংরেজী লেখা, সেই কতকালের লেখা পড়তে পারি নি আমি, কিন্তু রায়বাহাদুরের ডায়েরী আমি পড়েছি। ডায়েরী খুব সংক্ষেপ বটে। তবে তার মধ্যে মাঝে মাঝে বড় বড় লেখা আছে। মানে দিল খুলে লিখেছেন। অনেক বড় বড় কথা। ভাল ভাল কথা তাতে আছে।—মধ্যে মধ্যে এমন চিত্তচাঞ্চল্য হয়, কামার্ত হইয়া উঠি, তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানগম্য সব তিরোহিত হইয়া যায়। মন বলে, তুমি ধনী জমিদার-পুত্র, তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ ভোগ করিতে। না করিলে তুমি মূর্খ। তোমার অধিকারের মধ্যে সবই তো তোমার। ইচ্ছা করিলেই পাইতে পার। কেন মিথ্যা মূর্খের মত সংযম করিয়া নিজেকে পীড়া দিতেছ ? মধ্যে মধ্যে এমন চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে যে, নিজেকে স্থির রাখিতে পারা সুকঠিন হইয়া ওঠে। দুরন্ত ক্রোধ হয় সবকিছুর উপর। ইষ্ট-নাম করিতেছি। তাহাতেই বা শান্তি কোথায় ? আজ স্ত্রীকে, সকলকে তিরস্কার করি। কাছারীতে উগ্র হইয়া থাকি। দেহধারণের একি পাপ, একি শাস্তি !

ব্রাদার, সে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যে আমি, আমার ভয় লেগেছিল পড়তে ! কিন্তু কথাগুলো তো সত্যি। নিজেকে খতিয়ে দেখেছি। তফাৎ—তিনি ছুটতেন না, আমি ছুটি পিছনে পিছনে। গালও খেয়েছি কত মেয়ের কাছে—। তা তোমার—

—আমার ভয় লাগে ব্রজেশ্বরদা, আমার ভয় লাগে। বাবার সব কথা মনে পড়ে যায়। মায়ের মুখ মনে পড়ে। কেমন একটা দুরন্ত ভয় লাগে আমার। নিজেকে শান্ত করি কি করে জান ? শান্ত করি, যাকে ভাল লাগে, তার ছবি আঁকি। ছবিতে তাকে অন্যে চিনতে পারে না, আমি পারি।

—রাজা ! মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ব্রজেশ্বর। তারপর বললে, বুঝতে ঠিক না পারলেও, ঝাপসা ঝাপসা বুঝছি। তোমাকে সেলাম।

—কিন্তু সেই খাতাগুলো আমাকে দেবে ব্রজেশ্বরদা ? বিশ্বাস কর, আমি কাউকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে সেগুলো ব্যবহার করব না।

—রাজাসাব, সে আমি জানি। খাতাগুলো আমি লুকিয়ে রেখে গেছি। জানি না উইয়ে খেয়েছে কিনা। যদি না খেয়ে থাকে, আমি দেব তোমাকে। দেব কেন ? দিয়ে রেখেছি সুরেশ্বর। কলকাতা যাবার সময় সঙ্গে নিতে পারিনি ভয়ে। কোথায় যাবে। ওবাড়িতে রাখিনি। কে হাতাবে। এই বিবিমহলে—ওই কোণে একটা কুঠরী আছে। তাতে আছে সব ভাঙা ছবি, কাঠকাটরা ; দেওয়ালে একটা খোলা আয়রণচেষ্ট গাঁথা ছিল—আমি তারই মধ্যে রেখে গেছি—ন্যাকড়াটার ওপর কালি দিয়ে লিখে দিয়েছিলাম—"রায়বাহাদুরের শ্রাদ্ধের ফর্দ" ইত্যাদি। সে কেউ নাড়ে নি বলেই আমার বিশ্বাস, যদি তুমি এবার এসে ফেলে না-দিয়ে থাক। ও-ঘরটায় বীরেশ্বর রায়ের বন্দুক-টোটা থাকত। দরজাটা খুব মজবুত। মদও থাকত। তারপর কাঠকাঠরা ঢুকেছিল বাড়ী যখন তোমার বাবা মেরামত করান তখন। তুমি ওটাকে সাফটাফ করাও নি তো ?

—ভেবেছিলাম করাব। রঙ-তুলির ছবির আড্ডা করব। কিন্তু ছোট আর আলো কম বলে করি নি। কই চল, দেখ কোথায় রেখেছ ?

—এখুনি ?

—এখুনি।

বাধা পড়েছিল। অর্চনা আর মেজঠাকুমা এসে ঘরে ঢুকলেন। অর্চনা বললে—বাবাঃ বাবাঃ, দু' ভাইয়ে কি এত কথাবার্তা চলেছে গো, যার আর শেষ নেই ? আমরা পিত্যেশ করে বসে থাকব কত ?

মেজঠাকুমা বললেন—আমি বলি নি ভাই। অচি আমাকে সামনে করে এল। বলে, বান বিঁধলে তোমাকেই বিঁধবে। ব্রজকে ছেড়ে দাও ভাই সুরেশ্বর। বাড়ী থেকে ডাকতে এসেছে। বউয়ের ঘুম পেয়েছে। এতটা পথ এসেছে। আমরা আজ ওদের ফুলশয্যা করব। বুঝেছ। এখানে তো কিছু হয় নি।

—আর একটু, পাঁচ মিনিট দাঁড়াও, ঠাকুমা। পাঁচ মিনিট। তারপর না-হয় ব্রজদার ফুল-শয্যাতে আমি বাজাব, ব্রজদা গাইবে, সুন্দর গলা ওর। আর কে নাচবে তা ঠিক তোমরাই করে দেবে।

মনটা আমার সত্যই খুশি হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। ব্রজেশ্বর যা দিয়েছে, তাতে আমার মন একেবারে ভরে গিয়েছে। অতীতকালেরই একটা মোহ আছে। রায়বাড়ীর অতীত কাল, সে আমার অতীতকাল ; একান্তভাবে আপনার। যার মধ্যে সূত্র পাব, যা ধরে আমি কেন এমন হলাম, সেই সত্য জানতে পারব। আরও আকুতি ছিল, তোমার এবং আমার মধ্যে যে-ব্যবধান হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, তা কি পূর্ণ করা যায় না। এর মূল্য তোমার কাছে কতটা মনে হচ্ছে জানি না—

* * *

দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনেই চলেছিল সুলতা, কোন কথা বলে নি। এক বিচিত্র সত্য অতীত-কালের মধ্য থেকে এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাকেও অভিভূত করেছিল। তার অতীতপুরুষে ছিল এক ঠাকুরদাস পাল। রত্নেশ্বর রায়ের অনুগৃহীত জন। কেমন একটা অস্বস্তি তার মনে হচ্ছিল বইকি! সে রত্নেশ্বরকে রক্ষা করতে গিয়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে পারে নি। তাকেই আবার রত্নেশ্বর খুব সম্ভবত পিদ্রু গোয়ানকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন। তাতে একটা ক্ষোভও হচ্ছিল তার। ওই অস্বস্তি এবং এই ক্ষোভ দুই মিলিয়ে একটা কি তৈরী হয়েছিল, তার মূল্য নিশ্চয় সে অনুভব করেছে।

এতক্ষণে সে সুরেশ্বরের কথার জবাবে বললে—মূল্য অনেক মনে হচ্ছে সুরেশ্বর। না-হলে এতকাল পরে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার পর তোমার এই ছবিগুলির সামনে নির্বাক হয়ে বসে তোমার কথা শুনছি কেন? বয়স অনেকটা হয়েছে। এইভাবে সারারাত্রি জেগে গল্প শোনার তো কথা নয়। বল তুমি। থেমো না। রাত্রি একটা পার হয়ে গেছে। বল।

ঢং করে ঘড়িতে একটা ঘণ্টা বাজল। সুলতা বললে, ক্লকটা ফাস্ট আছে, দেড়টা হয় নি এখনও। একটা বাইশ। বল।

* *

ব্রজেশ্বর খুঁজে পেয়েছিল দপ্তরটা। আমি খুলে দেখেছিলাম তৎক্ষণাৎ। আমার হাত কাঁপছিল। কেন তা জানি না। বেশ ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল। ব্রজেশ্বর বলেছিল—রাজা, হল কি তোমার?

হেসে বলেছিলাম—জানি না।

সে বলেছিল—আমায় দাও। গিঁটটা অনেক দিনের। মজে গেছে।

সেও খুলেছিল অনেক কষ্টে। দু'খানা খাতাই ছিল তাতে। একখানা ডিমাই আট পেজী। চামড়ায় বাঁধানো ছিল। সেটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল—এইটেই ইংরেজীতে লেখা বীরেশ্বর রায়ের। আর এটা রত্নেশ্বর রায়ের। একেবারে পুরো ডিমাই সাইজের। সেটা বাংলায়।

এর মধ্যে এসেছিল অর্চনা।—হল তোমাদের?

ব্রজেশ্বর বলেছিল—হল।

—কটা বাজছে মনে আছে? এগারটা।

সুরেশ্বর সুলতাকে বললে, আজ দেড়টা বাজে। সেদিন এগারটা বাজছিল তখন। ও-ঘরে ক্লক-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজা তখনও শেষ হয় নি।

ব্রজেশ্বরদা আমাকে বলেছিল—চল রাজা, তুমি আমার বাসী ফুলশয্যাতে বাজনা বাজাবে, এ আমার খুব ভাল লাগছে। তুমি বাজাবে, আমি গাইব। নাও, তোমার বেহালাটা নাও।

চুপি চুপি বলেছিল—একটু খেয়ে নেবে নাকি? রাত্রি হয়ে গেছে—।

—না। চল।

ব্রজেশ্বরদা সেদিন ভাল গান গেয়েছিল। তবলা বাজিয়েছিল ব্রজেশ্বরের সৎ-কাকা। মেজ-ঠাকুরদার দ্বিতীয় পক্ষের এক ছেলে। ওই করেই সে একরকম ফেরে এ অঞ্চলে। নেশা করে। চমৎকার তার হাত।

শেষে গান গেয়েছিল মেজদি এবং অর্চনা। ব্রজেশ্বর কিছুতেই ছাড়ে নি। অনুরোধ ছিল তার অর্চনাকে। কিন্তু অর্চনা ধরেছিল—মেজদিকে গাইতে হবে।

মেজদি অগত্যা গেয়েছিলেন সাদামাটা একখানা কীর্তন। তাও মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন—দূর! সব মাটি করে দিলাম। আমার হয় না বলছি। সত্যিই হচ্ছিল না। সুতরাং শেষ করবার কথাও কেউ বলে নি।

তারপর ধরেছিল অর্চনা। সুলতা, মেয়েটার গলা যেন মধুঢালা। কি বলব তোমাকে। কাজী নজরুলের গানের খুব চল তখন। নজরুলের গজল গাইলে। আমি বেহালায় ছড় টানছিলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। নেশা লাগছিল। গান শেষ করলে অর্চনা, তখনও আমি ছড়ি টানছি।

অর্চনা বললে—এখনও ছড়ি টানো যে!

ছড়িটা তুলে বললাম—তাইতো!

ঠাকুমা খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বললাম—তা হাসতে পার মেজদি। অর্চনার কাছে ঠকে গেছি।

ঠাকুমা বললেন—দেখো যেন প্রেমে পড়ো না ভাই-বোনে। গান শুনে প্রেমে পড়ার নজীর আছে। আমার দাদাশ্বশুর সায়েবী-মেজাজের মানুষ ছিলেন। এ-দেশের মেয়ে তাঁর চোখে ধরত না।

—ঠাকুমা! শাসিয়ে উঠল অর্চনা।

ঠাকুমা দমলেন না, বললেন—এক বন্ধুর বাসরে গানে-বাজনায় আমার দিদিশাশুড়ীর কাছে ঠকে এমন প্রেমে পড়লেন যে, সেই কলকাতায় বসে থেকে বিয়ে করে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

—এমন অসভ্য তুমি! ঠাক্‌মাগুলো এমনিই হয়।

উঠে গেল অর্চনা। সকলে হেসে উঠল। ব্রজেশ্বরদা বললে—এ-বাড়িতে এমন মেয়ে একটাও নেই।

রাত্রি তখন প্রায় দুটো।

বাড়ী ফিরে এসে অনেকটুকু মদ্যপান করেছিলাম। খাতাগুলো সামনে ছিল। যে আনন্দটুকু নিয়ে ফিরে এসেছিলাম, তা তখন উত্তেজনায় পরিণত হয়েছে। ভয় হচ্ছে। আবার অদম্য কৌতূহল!

* * *

সে-কৌতূহল দমন করতে পারি নি। খুলে পড়েছিলাম।

মোটা কাগজের খাতা। পাতাগুলো হলদে হয়ে এসেছে। মধ্যে মাঝে লালচে ছাপ। কোণগুলো আপনাআপনি দুমড়েছে-কুঁকড়েছে। নেড়ে দেখলাম, ভেঙে যাচ্ছে। সন্তর্পণে

নাড়তে হবে। বেশ টানা লেখা। বোধহয় কুইন-পেনে লেখা। লেখা ভাল কিন্তু টান আছে, আর কালি ওই লাল-হলদে রঙের বিবর্ণতার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। একটুক্ষণ মন দিয়ে দু-চারটে লাইন পড়তে পড়তে টানের ছাঁদটা আর্টিস্টের লাইনের ঢংয়ের মত চোখে পড়ে; অক্ষর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

This is not my diary. I don't keep my diary and don't like to keep diary like others. What is the use of writing what you do everyday ? You do the same thing--today—tomorrow—day after tomorrow, you eat you drink you do this and that—you sleep. It seems to me that it is ludicrous to write them every night--before you retire. But this is something else. Something has happened today, that very seldom happens. Wonderful something, memorable something ! That's why I am writing down –in details lest I should forget them. It is just like writing down a poetry—you hear from a poet, which will never be published.

অনেক উচ্ছ্বাস আছে। তারপর নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পড়তে পড়তে মনে হল দাম্ভিক উগ্র শক্ত সাহসী বিলাসী এক রসিক মানুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

I am Bireswar Roy, son of Someswar Roy of Kirtihata. I can easily say—Prince of Kirtihata—I am. My father is really the king of the place. But he is a coward, he is shrewd—and he is—devoted to idolatry. I am opposed to it. I don't believe in it. Neither do I believe in other —theory or thesis about God. No I do not, I don't believe in Rev. Hill's preachings also. I do not believe what Raja Rammohon Roy says. But my father—is an affectionate father. I love him. Still I have ignored his repeated request to marry—where is the girl—that will be my wife ?

স্ত্রী হবার মত নিজের যোগ্য কন্যা বাংলা দেশে তিনি খুঁজে পান নি। কলকাতায় সাহেবদের পাঠশালা থেকে হিন্দু কলেজে কিছুদিন পড়া-শোনার পর দেশে এসেছিলেন বাপের সঙ্গে।

এখানে এসে রেভারেণ্ড হিলকে বাড়ীতে রেখে বীরেশ্বরের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সোমেশ্বর। এখানে আরও আকর্ষণ পেলেন বীরেশ্বর। নীলকর রবিনসনের বাড়ী। তাঁর ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার আকর্ষণ তাঁকে এখানে বাঁধলে। তার সঙ্গে শিকার করে, ঘোড়ায় চড়ে, হিল সাহেবের কাছে পড়ে, এক অদ্ভুত মানুষ হয়ে উঠলেন। না পড়লেন শাস্ত্র,

না পড়লেন দর্শন, এমন কি হিল সাহেব বাইবেলখানা বার দুই পড়িয়ে আর পড়াতে পারেন নি। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় পারঙ্গম হলেন। জীবনী পড়লেন। আইন পড়লেন এবং ঘোষণা করলেন, তিনি ঈশ্বর-ফিশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কালীকে মানেন না! রাজরাজেশ্বর নামক নুড়িকেও মানেন না। ব্রাহ্মদের ব্রহ্মাকেও মানেন না। ইংরেজদের গড, মুসলমানদের আল্লা, কিছুকেই না।

I do not believe in anything, any form of God—not in Kali not in that round shaped stone—not in Brabma, not in God nor in Allha.

এর সঙ্গে তিনি শিখলেন গান। কণ্ঠস্বর ভাল ছিল না কিন্তু কালোয়াত হবার খুব একটা ঝোঁক ছিল।

এই বীরেশ্বর রায় তাঁর যোগ্য কন্যা দুনিয়াতে অন্তত এই বঙ্গদেশে, যেখানে অষ্টমবর্ষে গৌরী হিসাবে বধূ-বরণ করতে হয়, সেখানে পাবেন কোথায়? রবিনসনের কন্যা ছিল কিন্তু সেদিকে মন টেনেছিল কি না কেউ বলতে পারে না। তিনি লেখেন নি। বরং লিখেছেন, আমার হাসি পায় যখন জন রবিনসন এবং তার বোন মেরী কথায় কথায় কপালে বুকে কাঁধে হাত দিয়ে ক্রশ আঁকে। এরা একেবারে মূর্খ কুঠিয়াল। বোধ করি ওদের দেশের লাঠিয়াল ছিল। শব্দ দুটো ইংরিজীর মধ্যে ব্যবহার করেছেন।

তিনি সেদিন স্মরণীয় ঘটনার খাতা হিসেবে এই খাতা আরম্ভ করে লিখছেন—

Today—26th April 1842, 14th Baisakh 1250 B. S. is a memorable day for me. I have found her out. She is she—whom I have wanted all my life and have searched her even in my everyday dreams. Yes—she is the she.

৪

বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন, সুলতা, বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী। কলকাতা জীবনের বন্ধু। সম্পর্কে ভাই। সোমেশ্বরের মামাতো ভাইয়ের ছেলে। কুড়ারাম ভটচাজ বিয়ে করেছিলেন কালীঘাটে এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েকে—তা বলেছি। বিনিময়ে তিনি তাঁর শ্যালকের ভাগ্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন। তাকে নিজের অধীনে কোম্পানীর সেরেস্তায় ঢুকিয়ে-ছিলেন। তিনিও নিজের ভাগ্য গড়ে নিয়েছিলেন যথাসাধ্য। রায় বংশের তুলনায় তা তেমন কিছু না-হলেও যথেষ্ট করেছিলেন। কালীঘাট তখন গ্রাম মাত্র। কালীঘাট ছেড়ে তিনি কলকাতার ভিতরে উত্তরাঞ্চলে বড় বাড়ী করেছেন। ছেলে ইংরিজী লেখা-পড়া শিখেছে। নাম হয়েছে। তারই বিয়ে,—বিয়ে চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে জয়নগর-মজিলপুরের কাছে। কন্যাপক্ষ গ্রামের জমিদার এবং মানী লোক। এ বিয়েতে বীরেশ্বর গিয়েছিলেন। সোমেশ্বরের মামাতো ভাইয়ের ছেলে বীরেশ্বরেরই সমবয়সী এবং সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই।

বিয়ের আসরে বাঈজী-নাচ হয়েছিল—সেই আসরে তিনি বসেছিলেন, মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। নাকি খুব ভাল গাইছিল বাঈজী। বাঈজীর একটি মেয়ে ছিল, সেও তার সঙ্গে সুর দিচ্ছিল। গাইছিল ভৈরবী।

ঠিক ঠিক জায়গায় বাহা-বাহা এবং মোহর বকশিস করেছিলেন। এমন সময় একটি কিশোরী মেয়ে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য সপ্রতিভ এবং আশ্চর্য রূপ। গৌরাঙ্গী নয় শ্যামাঙ্গী কিন্তু অপরূপ তার লাবণ্য। তখন মেয়েরা—সে দশ বছর বয়স থেকে—চিকের ভেতরে বসে। পথে-হাঁটে মুখ নিচু করে। ক্ষণে-ক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে ষাট বছরের বৃদ্ধ থেকে বারো বছরের বালককে দেখে—; সেই আমলে সেই তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরী এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, নমস্কার! আপনাকে বাসরে বর ডাকছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বর সবিস্ময়ে বলেছিলেন, আমাকে?

—হ্যাঁ! আপনি তো বরের ভাই! রায়বাবু!

—হ্যাঁ। কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই, বর বাসরে বিপদে পড়েছেন।

—বিপদে পড়েছেন?

—হ্যাঁ। গান গাইতে গিয়ে মান গিয়েছে। মান বাঁচাতে আপনাকে ডাকছেন। বীরেশ্বর কৌতুক অনুভব করেছিলেন। বরের হয়ে বাসরে তাঁকে গান গাইতে হবে? হিন্দু প্রথা সামাজিক আচার বহু কিছুকেই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু বিয়ের বাসরে একটা রোমান্স আছে এটা তিনি মানতেন।

কণ্ঠস্বর যেমনই হোক, নবযুবক বীরেশ্বরের গায়ক-খ্যাতির জন্য লোলুপতা ছিল। থিয়েটারের দলে সিরিয়াস অ্যাক্টরের সিরিও কমিক কি কমিক পার্টে খ্যাতির জন্য এবং কমিক অ্যাক্টরের সিরিয়াস পার্টে নামের জন্য যেমন লোলুপতা থাকে—এও তাই আর কি। তবে গানে জ্ঞান এবং দখল তাঁর ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে বীরেশ্বরের ফাঁকি ছিল না। তিনি শিকারীও ছিলেন, তিনি লিখেছেন—

"I have never missed my bullet shot at a target nor have I ever erred in 'tal' in any recital of any Raga."

যে ঘটনাটা ঘটল তারই ওপর লিখেছেন ওটা।

বাসরে যেতেই বর বললে—ভাই বীরা, তুমি মান রাখ ভাই। এই ইনি আমার দিদি-শাশুড়ী। গান শুনে বললেন—ওরে, হরু ধোপা বাইরে এসেছে, ওর গাধা হারিয়েছে। বলে ঘরে ঢুকেছে। বল, এ তার গাধা নয়! তারপর এমন গান শোনালেন এঁরা যে, বাজাতে গিয়েও হেরে গেলাম।

হেসে বীরেশ্বর বললেন—আগে ওঁদের অনুমতি হোক!

ঠাকুমা বললেন—তোমার অনুমতি হোক ভাই রায়হুজুর, তুমি বসবে আমাদের ঘরে, এতে আমাদের অনুমতি লাগে! তুমি এসেছ শুনে অবধি আমাদের উঁকিঝুঁকির সীমা নেই। সবাই দেখেছি। আর বলব কি, যাকে বলে মজে যাওয়া তাই গেছি। এই বয়সে

আপসোস হচ্ছে, কেন সেকালে জন্মেছিলাম।

বীরেশ্বর ঘরে ঢুকে বরের আসনের পাশে বসেছিলেন। বাজনার সরঞ্জামের অভাব ছিল না। তবলা পাখোয়াজ থেকে তানপুরা সব।

বীরেশ্বর পাখোয়াজ টেনে নিয়ে ঘা দিয়ে দেখেছিলেন সুন্দর করে বাঁধা আছে। ময়দার লেপনেও হাত দিতে হয়নি। বলেছিলেন—নিন ঠাকুমা, আরম্ভ করুন।

—আগেই আমরা ?

—আমি তো বাজাচ্ছি !

—বেশ। নে লা, ভাই ভবানী, নে। রায়হুজুরের বাজনার সঙ্গে আর কে গাইবে ? তুই নে !

এই সেই মেয়ে যে তাঁকে আসরে ডাকতে গিয়েছিল। সে বললে—না, উনি গাইবেন আমরা শুনব। দায় তো বরের ঠাকুমা, কনের তো নয়। বর গাইতে পারে তো ওকে আমরা ছেড়ে দেব নইলে বেঁধে রাখব। তা ওঁর বদলে উনি এসেছেন, ছাড়িয়ে নিয়ে যান !

বর বললে— না-না। আপনি গান। সত্যি বলতে আপনার গান শোনবার জন্যেই বাবাকে ডেকেছি। নইলে রাখুন না আমাকে বেঁধে। ছাড়ানটা চাচ্ছে কে ? তা ছাড়ান কি এ বাঁধনের পর মেলে কারুর ?

ঠাকুমা বলেছিলেন, তোমরা বড় চতুর জন্তু নাতজামাই। বাঁধন ছিঁড়ে পালাও। আবার রাতচরা গরুর মত রাত্রে চরে এসে ভালমানুষ সেজে দাঁড়িয়ে থাক গোয়ালের সামনে।

মেয়েরা খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল। বীরেশ্বরের মনে খট করে লেগেছিল কথাটা। তিনি গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বলেছিলেন, বেশ আমিই গাইছি। কে বাজাবে ? বরকে বলেছিলেন, তুই ধর ঠেকা দিয়ে যাবি !

—না-না। ওই উনিই ধরবেন।

—কে ?

সেই মেয়েটিকেই দেখিয়ে দিয়েছিল নারায়ণচন্দ্র।

বীরেশ্বর পাখোয়াজটা পাশে রেখে তবলা বাঁয়া এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন নিন। এবং তানপুরাটা নিয়ে সুর দেখে ধরেছিলেন সাধারণ গান।

"কালার লেগেছে রূপ নয়নে।
কালার—।
লেগেছে রূপ নয়নে—এ-এ-এ, লেগেছে !
কালার !"

তবলার কোমল হাতে হলেও চটাং শব্দে ঠিক ধরতার সময় চাঁটির শব্দ তুলে ক্ষিপ্রগতিতে মেয়েটির আঙুলগুলি যেন নেচে উঠল—নাচের জলদ তালে চলা হাল্কা প্রণয়ের মত। তবলা বোল বলে মুখর হয়ে উঠল, একেবারেই পরান দিয়ে বাজনা ধরেছে। বিস্ময়ের সীমা রইল না তাঁর। এ মেয়ে কে ?

হঠাৎ মেয়েটি তালে চাঁটি দিয়ে বললে—হুঁ !

অর্থাৎ তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে, যাচ্ছে যাচ্ছে ধর। হেসে সামলে নিলেন বীরেশ্বর। তারপরই বুঝতে পারলেন বাজিয়ে আড়ি মারছে। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে ধরে মুখ রাঙা করে যেন রোষ ভরে বাজিয়ে চলেছে। আবারও হেসে তিনিও ধরলেন বাঁকা পথ। খেলতে লাগলেন। জলদ থেকে জলদতর করলেন গতিকে।

কালার লেগেছে রূপ নয়নে। কালা-র
লেগেছে রূপ নয়নে রূপ নয়নে রূপ নয়নে
কালা-র। লে-গে-ছে রূপ নয়নে-এ
কা-লা-র। লেগেছে।

ঘরখানা সঙ্গীতের শব্দতরঙ্গে ভরে উঠেছে। কথা গৌণ হয়ে গেছে। খেলছে কণ্ঠে সুর আর তবলার বোল। ঝর ঝর ঝর ঝর শব্দে জলপ্রপাত ঝরছে অথবা ঝমো ঝমো ঝমো শব্দে একখানা বাসন মেঝেতে পড়ে গড়িয়েই চলেছে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। শ্রোতাদের নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। শব্দের মধ্যেও তারা একটা লড়াই চলছে বুঝতে পারছে। অকস্মাৎ বীরেশ্বর অনুভব করলেন তিনি একটি অক্ষর উচ্চারণের মত সময় কখন হারিয়ে ফেলেছেন, এবারই তবলায় গানে সমাপ্তির ছেদ পড়বে, ও মারবে তবলায় চাটিঝাঁ—কিন্তু তাঁর তখনও একটি অক্ষর বাকী থেকে যাবে। কা-লা-র কা লা পর্যন্ত বলা হবে র অক্ষরটি অনুচ্চারিত রাখতে হবে, তিনি হেরে যাবেন। মুহূর্তে তিনি সামলে নিলেন, কা লা দুটি অক্ষরকে জুড়ে ক্লা ক'রে নিলেন এবং গাইলেন কালার লেগেছে রূপ নয়-নে-ক্লার! মেয়েটি ফিক করে হেসে তবলায় সমাপ্তির ধাঁ মেরে বললে, আপনার সঙ্গে আমি পারি! বাবা, এ দৌড়ে কলকেতা পৌছুনে যেতো।

বীরেশ্বর আশঙ্কা করেছিলেন, সে উচ্চহাস্যে ব্যঙ্গ করে এই অতিসূক্ষ্ম ভুলটুকু, যা এদের কারও কাছে ধরা পড়ে নি, তাকে ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে অপদস্থ করবে। কিন্তু তারও উপর বেশী হয়েছিল বিস্ময়। এ মেয়ে কে? তিনি জানেন, তিনি দেখেছেন, সঙ্গীতে জন্মগত প্রতিভা নিয়ে অনেকে জন্মায়। অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। এ যে তাই ত্যতে তার সন্দেহ রইল না! কিন্তু এ মেয়ে কে?

গোটা ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে ছিল। শ্রোতাদের বিস্ময় এবং অভিভূত ভাবটা এখনও কাটে নি! কয়েক মুহূর্ত পর ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, একটা হার-জিত যেন হল! তা' জিতল কে রে ভবানী?

—উনি ঠাকুমা। চমৎকার হেসে মেয়েটি বললে।

ঠাকুমা বললেন—তাতে লজ্জা নেই। বীরু রায় কত বড় বড় ওস্তাদ রেখে গান শিখেছে। তোর বিদ্যে তো ভগবৎদত্ত। তোর বাবার 'ঔরুসের' ফল। তবে তোর ঐ বাবা তোকে সাধতে দেয় এই যা, নইলে এতদিন ভাতের হাঁড়ির কালি আর উনোনের ছাই চাপা পড়ত। তা এইবারে তুই একটা গান শুনিয়ে দে। দেখবি গানে রায়বাবু তোকে ঠকাতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বর পাখোয়াজ কোলে তুললেন। মেয়েটি বললে—থাক।

বীরেশ্বর বললেন—সে কি? না-না, তা হবে না। তা হলে বুঝব আমাকে যোগ্যই মনে করছ না তুমি!

ঠাকুমা বলে উঠলেন—তা বটে ভাই। যোগ্য বর মিলল না বলে মেয়ের বিয়েই দিলে না বাপ। কুল মেলে তো পাত্র মেলে না। পাত্র মেলে তো কুলে মেলে না।

—কি বলছ ঠাকুমা। তা হলে আমি উঠে যাচ্ছি।

—না। হাত জোড় করে বীরেশ্বর বললেন—ঠাকুমার দোষে আমায় অপমান করে চলে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে? বসুন। গান আমাকে শোনাতেই হবে।

ভবানী বসেছিলেন। এবং তানপুরাটা তুলে নিয়ে কানে একটু মোচড় দিয়ে সুরটা ঠিক করে নিয়ে চোখ বুজে মৃদু স্বরে সুর মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর থেমে গেলেন। বরকে বললেন—আপনি তানপুরাটা ধরুন না।

নিজে পদ্মাসন হয়ে বসে হাতজোড় করে চোখ বুজে সুর তুললেন। শুরু হল মৃদুকণ্ঠে সুর বিস্তার। আ-আ-আ ধ্বনির সূত্রে গাঁথা একখানি সুরের মালা বুনছেন যেন।

বীরেশ্বর তাঁর বিবরণে তাই লিখেছেন।

তারপর সুর উচ্চ থেকে উচ্চতর হল—সঙ্গে সঙ্গে বাণী প্রকাশ পেলে তার মধ্যে।—আ—গৌরী—।

মাথাটি এপাশ থেকে ওপাশে নাড়ছিল যেন চোখ বুঁজে গৌরীকে সে দেখছে।

—আ—গৌরী লউটি যায়ে
নয়নে লোর, কাঁপে অধর।—অ
গৌরী লউটি যায়ে।

বীরেশ্বর রায় লিখেছেন, Madam--cupid—has been burnt to ashes—and God Siva has vanished.

তাঁর দিকে না তাকিয়ে চলে গেছেন: গৌরী অপমানিতা বোধ করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরছেন।

বীরেশ্বর লিখছেন, very carefully, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাজনা শুরু করলাম আমি। শুধু ঠেকা দিয়ে। বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে মিলিয়ে। ওর সঙ্গে আড়ি দিতে ইচ্ছে হল না আমার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম অবাক হয়ে। মনে হচ্ছিল ধ্যানস্থ হয়ে গাইছে।

এলায়ে কেশ যোগিনী বে-শ
মাখলি অঙ্গে ভস্ম শে-ষ
হোথা মহেশ, জাগে চমকি,
হিয়া কাতর রে—

পাখোয়াজ জলদে বেজে উঠল। কণ্ঠস্বরে সুরও দ্রুত হল। মাথা দ্রুত নড়ছে মেয়েটির। তারপর আবার বিচিত্র কৌশলে দ্রুত লয় থেকে ফিরে এল সে শান্ত মন্থর লয়ে—

নারদ চলে গিরিবর-ঘর
মনোহর বর যোগী-শ্বর
আওয়ে আওয়ে তব ঘরপর
যাচি গৌরী কর-রে।
জাগে বসন্ত উঠয়ে গৌরী
তনু কাঁপে থর-থ-র রে॥

অত্যন্ত শান্তভাবে গাইলেন ভবানী। কলা-কৌশলের বাহুল্য এতটুকু বিস্তার করেন নি। বীরেশ্বর একবার জলদে তাকে টেনেছিলেন। সে তাল রেখে এগিয়ে গিয়েও এমনভাবে শান্তগতিতে ফিরল এবং তাঁকে ফেরাল যে, তিনি মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না। গান যখন শেষ হল, তখন গোটা বাসরটি যেন হরগৌরীর বাসরের আশীর্বাদের আভাসে ভরে উঠেছে। মেয়েটি তখনও বসে আছে। তারপর একসময় চোখ মেলে তাকিয়ে চারদিকটাকে দেখে নিয়ে, একটু হেসে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বীরেশ্বর শুধু বললেন—এ ভগবানের আশীর্বাদ।

সুরেশ্বর বললে, বীরেশ্বর লিখেছেন, I could find no other expression than this—ভগবানের আশীর্বাদ। Is there any other expression? No.

তিনি ওইখানেই খুড়তুতো ভাইয়ের শ্বশুরকে বললেন, এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই। আপনি সম্বন্ধ করে দিন।

তিনি বিব্রত হয়ে বললেন, বাবা, তুমি রাজপুত্র। মেয়েটি—

—মেয়েটি কি?

—ও এখানকার একজন ভদ্রলোকের পালিতা কন্যা। মহেন্দ্রচন্দ্র যৌবনে চাকরীর সন্ধানে বেরিয়ে মিশনারীদের চাকরী নেন, তাদের সঙ্গে আসামে গৌহাটিতে গিয়েছিলেন। সেখানে কে এক সাধক-দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভক্ত হয়ে পড়েন। এ-কন্যা তাঁর। সাধু পাগল হয়ে যান। সাধুর স্ত্রী ওঁদের আশ্রয়ে থাকেন। তারপর তিনিও মারা যান। কন্যাটিকে মহেশকে দিয়ে যান। বলে যান, যেখানে-সেখানে, যার-তার হাতে যেন এ-কন্যার বিয়ে না দেন। কুলীনদের ঘরে তো কন্যা কুমারী থাকে! তা যার-তার হাতে দেবার মেয়ে ও নয়। চরিত্রও একটু অদ্ভুত। কখনও যেন কেমন কেমন, আবার বেশ সহজ। হাসিখুশি। গান-বাজনায় জন্ম থেকে সিদ্ধ বলতে গেলে। মহেশচন্দ্র নিজে শিক্ষিত মানুষ। লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। কিছু কিছু ইংরিজী জানেন। অসম সাহস। আনন্দময়ী। আনন্দেই থাকে।

—মেয়েটির পালকপিতাকে বলুন একবার। আমাকে যোগ্য পাত্র মনে করেন কিনা দেখুন!

মেয়ের পালকপিতা বলেছিলেন, অযোগ্য তোমাকে কি করে বলব? তবে? একটু

ভেবে বলেছিলেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—করুন।

—তুমি মদ্যপান কর ?

—করি।

—তাহলে ?

—যদি ছেড়ে দি !

—ছেড়ে দেবে ?

—দেব।

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, দাঁড়াও বাবা, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। ওর অমতের জন্যই কয়েক জায়গায় আমার পছন্দ হলেও সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছি। ওকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

বীরেশ্বর লিখেছেন, I began to pace up and down. I was mad for her. At last her father came back with a smiling face, and I know—that she has given her consent—she has liked me. A great joy—a victory. Yes, a victory it was.

মহেশবাবু বলেছিলেন. কন্যা এখন আমার, আমিই সম্প্রদান করব। মেয়েটির পিতা ছিলেন সাধক। পাগল হয়ে কামাখ্যা পাহাড়ে পড়ে মারা গেছেন। তাঁর নাম ভবানীও জানে না। বলতে মানা আছে। তুমিও জিজ্ঞাসা করো না।

—বেশ। তাও করব না। কিন্তু আমার বাবাকে বলবেন, কন্যা আপনার।

—হ্যাঁ, তা বলব আমি।

—আমি বিবাহ করে বাড়ি ফিরব। দিন দেখুন।—দিন মিলেছিল একদিন পরেই। সেই দিনই বিবাহ করে তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন।

সুলতা, এরপর দেখ, ছবির মধ্যে আবার একটা মস্ত ফাঁক।

রায়বংশের জীবনে সেদিন এমন একটি জট পাকাল যে, তার মধ্যে বাঁধা পড়ে গোটা রায়-বাড়ীর সারা অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল। এবং ধারাবাহিকতা পর্যন্ত ওই জটের মধ্যে জড়িয়ে হারিয়ে গেছে।

অথচ ১৮২৪ সাল থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত রায়-বাড়ীতে বহু কাণ্ড ঘটে গেছে। যা বিস্ময়কর অথচ তার কোন কারণ খুঁজে পাই নি।

সব থেকে বিস্ময়কর বিমলাকান্ত রায়বাড়ী থেকে চলে গেলেন। বারো বছর বয়সে জামাই হয়ে এ-বাড়ীতে এসেছিলেন। সোমেশ্বর রায়ের প্রতিশ্রুতিমত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক তিনি। বীরেশ্বর রায় বিমলাকান্তের উপর ছেলেবেলা থেকেই বিদ্বিষ্ট ছিলেন। একেবারে দেখতে পারতেন না। বিমলাকান্ত শান্ত, শ্রীমান পুরুষ, মিষ্টভাষী, গান-বাজনা বুঝতেন কিন্তু ও থেকে দূরে সরে থাকতেন। স্ত্রী বিমলাও উগ্র প্রকৃতির ছিলেন, স্বামীর উপর কথায় কথায় রেগে উঠতেন, কলহ করতেন, বিমলাকান্ত হেসে সহ্য করে যেতেন। বিমলাকে তার মায়ের

ব্যাধি মৃতবৎসা রোগে ধরল, সন্তানের পর সন্তান মারা গেল। শোকে মাথা খারাপ হল তাঁর। পাগলামিতে যা সামনে পেতেন, তাই ছুঁড়ে আঘাত করতেন সামনের মানুষকে। বিমলাকান্ত আঘাত সহ্য করে সামলাতেন। তিনি বলতে গেলে অহরহ আগলে থাকতেন তাঁকে। এক ভাই বীরেশ্বরের সঙ্গে ছিল প্রীতি। কিন্তু বীরেশ্বর এবং বিমলাকান্তকে এক স্থানে রাখেন নি সোমেশ্বর। বিমলাকান্ত কলকাতায় থাকতেন। বীরেশ্বর থাকতেন কীর্তিহাটে। জন রবিনসন নীল কুঠিয়ালের পুত্রের সঙ্গে দুর্ধর্ষপনা করে বেড়াতেন। পাদরী হিল সাহেবের কাছে পড়তেন।

হঠাৎ বীরেশ্বরের জীবনে পরিবর্তন ঘটল। তিনি বিবাহ করলেন ভবানীকে। এবং বললেন, তিনি থাকবেন কলকাতায়।

বিমলাকান্তকে সোমেশ্বর লিখলেন, কীর্তিহাটে এস।

তখন সোমেশ্বরের শরীর ভেঙেছে। তিনি যেসব সম্পত্তি কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের পর কিনে-ছিলেন এবং রায়দের সেই জমিদারীই বেশী, তা সব দেবোত্তর করে ট্রাস্টি নিযুক্ত করলেন ছেলে এবং জামাইকে। অ্যাডভাইসার রাখলেন রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থকে এবং গিরীন্দ্র আচার্যকে।

বীরেশ্বর বিবাহ করে কলকাতায় তখন জীবনে ফিরবার চেষ্টা করছেন। প্রতিশ্রুতিমত মদ ছেড়েছেন। বধূ ভবানীকে নিয়ে আনন্দে থাকেন জানবাজারের বাড়ীতে। বাড়ীটা তখন ছোট ছিল। কিন্তু বেশীদিন থাকা তাঁর হল না। বাপের অসুখের জন্য ফিরে আসতে হল কীর্তিহাটে। কীর্তিহাটে এসে স্বতন্ত্র বাসের জন্য বিবিমহল তৈরী করালেন। ওই বাড়ীতে থাকবেন। তাঁর বাপের দেবোত্তরের দলিলের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—সম্পত্তির অংশ ভাগ্নেকে ভগ্নীপতিকে দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দেবোত্তর রায়বংশের, দেবোত্তরে ভগ্নীপতি ট্রাস্টি কেন হবে? কিন্তু সোমেশ্বর তা শোনেন নি।

তাঁর ওই স্মরণের খাতায় এসব লেখা আছে, তার সঙ্গে আছে কয়েকটা বিনিদ্র আনন্দরজনীর কথা। অকপটে সব তিনি লিখে গেছেন।

তারপর মারা গেলেন সোমেশ্বর। বীরেশ্বর স্ত্রীর অনুরোধেই কোন বিরোধ করলেন না দলিল নিয়ে; কীর্তিহাটে বিমলাকান্তের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না। সেই বৎসর ১৮৪৫ সালে জন্ম হল কমলাকান্তের। শুধু কমলাকান্তেরই জন্ম নয়, বীরেশ্বর রায়ের নিজেরও সন্তান হল। প্রায় একসঙ্গে।

একসঙ্গে ভবানী এবং বিমলার সন্তান হল। দুদিন আগে পরে। তার ফল হল বিচিত্র। মৃতবৎসা রোগ এবারে বিমলার ভাল হল, ভবানীকে ধরল। গ্রামের লোকে বললে, খুঁজে দেখুন রায়বাবুরা, কোন শাপশাপান্ত কোথাও আছে।

বীরেশ্বর বললেন, থাক শাপ। চেঁচাতে বারণ করছি, চেঁচালে চাবুক মারব।

এরই বৎসর-খানেকের মধ্যে বিমলা আত্মহত্যা করলে। তার বাতিক হয়েছিল—মরে গেল, তার ছেলে মরে গেল। কমলাকান্ত দু' বছরের ছেলে, নীচে বাগানে খেলা করছিল। বিমলা বারান্দায় এসে চীৎকার করে উঠল, ঝোপে সাপ আছে। কমলাকান্ত সেই দিকেই ছুটছিল। বিমলা বারান্দা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ল ছেলেকে ধরতে। এবং মারা গেল তৎক্ষণাৎ।

ভবানীই মানুষ করতে লাগলেন কমলাকান্তকে। বীরেশ্বর তাকে তখন থেকেই রত্নেশ্বর বলে ডাকতেন।

তারপর তার দু'বছর পর হঠাৎ একটা কিছু ঘটল। বীরেশ্বর আবার মদ ধরলেন। এবং আক্রোশ হল বিমলাকান্তের উপর আর ওই দুগ্ধপোষ্য চার বছরের কমলাকান্তের উপর। স্ত্রীর উপর বিমুখ হলেন। জন রবিনসন অর্থাৎ জুনিয়র রবিনসন তখন নীলকুঠির মালিক হয়েছে। তার ওখানে গিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। মদ্যপান, শিকার—এই দুই নেশাতে প্রমত্ত হয়ে উঠলেন। তারপর বিরোধ বাধতে লাগল বিমলাকান্তের সঙ্গে। ধীরে ধীরে বিরোধটা যেন একটা গুহাবাসী হিংস্র জন্তুর মত বাইরে আসতে লাগল। দুটো জ্বলন্ত চোখ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। বীরেশ্বর নিজেই লিখেছেন, আমার ক্রোধ, সে ঘুমভাঙা জন্তুর মত গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে আমি বুঝতে পারছি। **I am helpless.**

ফলে বিমলাকান্ত ছেলে কমলাকান্তকে নিয়ে একদিন একটা পর্ব উপলক্ষে শ্যামনগর যাচ্ছি বলে গিয়ে আর ফিরলেন না। ওখান থেকে চলে গেলেন কলকাতায়। নিজে ভাগ্য গড়বেন বলে। বীরেশ্বরকে চিঠি লিখলেন, "তোমার পৈতৃক সম্পত্তি তুমি নির্বিবাদে ভোগ কর। আমি সন্তুষ্টচিত্তে অকপট আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লইলাম। আর কীর্তিহাট ফিরিব না। তুমি চাহিলে যাহা শ্বশুরমহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন, তাহা দলিল করিয়া ফিরাইয়া দিব।"

তার পর একবছর পর যা ঘটল তা আরও মর্মান্তিক।

বীরেশ্বর তখন কীর্তিহাটে—এই বিবিমহলে বাস করছেন। একদিন সকালে কাঁসাইয়ের উপর যে বিবিমহলের ঘাট, সেই ঘাটে ভবানীর একটি গহনার পুঁটুলী পাওয়া গেল; সে গহনাগুলি তাঁর গায়ে থাকত, কিন্তু ভবানীকে পাওয়া গেল না।

একটা দহ ওখানে ছিল। কিন্তু তখন ভরা কংসাবতী। আশ্বিনের মাঝামাঝি দু কূল ভরে বইছে নদী। তবু পাঁচখানা গ্রামের জেলে এল। জাল টানলে সেই দহে। কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।

এই দেখ একখানা বড় ছবি। এটাকে এঁকেছি আবছায়ার মধ্যে। এটা গাঢ় কালি দিয়ে, কালের যবনিকা টানি নি। দেখ, আলো জোর পড়লেই দেখতে পাবে, আভাসে একটি নারীদেহ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ? তারপর অবশ্য এদিকটা গাঢ় কালো। যবনিকা পড়ে গেছে। ঢেকে রেখেছে সবকিছু। তারই মধ্যে গাঢ়তর কালো রঙে আঁকা একটি পুরুষকে পাবে। দেখ। ওই বীরেশ্বর রায়। উন্মাদ। কালপুরুষের মত অট্ট হাসছেন। ওঁর সেই খাতাতে বড় বড় করে লেখা আছে—

Am I going mad ? Yes --It is madness !—Let it come.

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

মঞ্জরী অপেরা

এক

গ্রে স্ট্রীট আর চিৎপুর জংশনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে বাড়িখানা সে বাড়িখানার বারান্দার উপরে একটা মস্ত সাইনবোর্ড। মঞ্জরী অপেরা। ব্রাকেটে লেখা মেয়েযাত্রা। তার নীচে লেখা প্রোপ্রাইট্রেস শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী। ১৯৪৪ সাল। সাইনবোর্ডটায় নতুন রঙ বুলিয়ে সেদিন—রথের দিন আবার টাঙানো হল। ম্যানেজার গোপাল ঘোষ, রাস্তার পুব ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ট্যারাবেঁকা না হয় এইটেই দেখার উদ্দেশ্য।

ঘোষ দেখে খুশী হয়ে বললে—বাস। এই। কি বলে আর একটুও না এদিক-ওদিক হয়। বাঁধন কষে দাও। বলে সে রাস্তা পার হয়ে এসে বাড়ি ঢুকল।

জংশনের এই বাড়িটা বোধ করি তৈরী হবার পর থেকেই যাত্রাদলের আপিস। কোন বছর সাইনবোর্ডে থাকে মথুরশা থিয়েট্রিকেল যাত্রাপার্টি, কোন বছর গণেশ অপেরা, কোন বছর থাকে সত্যেম্বর অপেরা, কোন বছর শ্রীচরণভাণ্ডারী অপেরা, কখনও বীণাপাণি অপেরা, কোন বছর রয়েল বীণাপাণি। মঞ্জরী অপেরার আগে এখানে ছিল আর্য অপেরার আপিস। বহু পুরনো কালে মতি রায়, ধর্মদাস রায়, ভূপেন রায়, ফকীর অধিকারী, শশী অধিকারী মহাশয়দের যাত্রাপার্টির যখন জমজমাট পসার হয় তখন আপিস করার রেওয়াজ ছিল না. হয়তো তাঁদের নিজেদের বাড়িতেই আপিস, নয় আসর ছিল, নয় তো এ বাড়িটা তখন তৈরী হয় নি। আপিসের রেওয়াজ হওয়ার বোধ হয় প্রথম থেকেই বাড়িটা যাত্রাদলের আপিস। লোকেদের মোটামুটি ধারণা এই যে, এই বাড়ি যে দলের আপিস সেই দলই এখনকার কালের সব থেকে ভাল দলের অন্যতম। মঞ্জরী অপেরার নামডাক গত দু বছর থেকে প্রায় হৈ-হৈ-করা নামডাক।

বাংলাদেশে মেয়েযাত্রা খুব বেশী হয়নি, যা হয়েছে, তার মধ্যে ত্রৈলোক্যতারিণী, ভবসুন্দরী, রাধাবিনোদিনীর কথা মনে আছে লোকের। রাধাবিনোদিনীর আগে পর্যন্ত শেষ মেয়েযাত্রার দল, সেও দশ বারো বছর আগে উঠে গেছে। মেয়েযাত্রার পরমায়ু প্রোপ্রাইট্রেসের পরমায়ু আর সক্ষমতার সঙ্গে একসঙ্গে জড়ানো। প্রোপ্রাইট্রেস গত হলেই দল উঠে যায়। আর না হয় তার বয়স হয়ে পার্ট করবার ক্ষমতা গেলেই সে দল তুলে দেয়। সাধারণ যাত্রার দল বড় বড় দল, সবাই দল চালায় পুরুষদের নিয়ে। অভিনেত্রী তাদের দলে থাকে না। তাতে খুব ক্ষতি হয় না। বেটাছেলে মেয়ে সেজে যা অভিনয় করে তাতে তারা মেয়েদের হার মানিয়ে দেয়। সাজগোজ করে যখন আসরে ঢোকে তখন সহজে ঠাওর করা যায় না মেয়ে কি ছেলে। তাছাড়া আরও কথা আছে। যাত্রাদলে কষ্ট তো কম নয়। পুজোর সময় থেকে মফস্বলে বের হয়ে এখান, ওখান, শহর, গ্রাম ফিরে গাওনা করে একবারে ফেরে অগ্রহায়ণের শেষ। পৌষ মাসটা বিশ্রাম, তার পর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা থেকে একনাগাড়ে কলকাতা থেকে সারা বাংলাদেশ, পুবদিকে আসাম সে গৌহাটী থেকে ডিগবয় ওদিকে শ্রীহট্ট শিলচর আবার বেহারে কাটিহার পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ পর্যন্ত। উত্তরে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির চা বাগান। বেহারে আর একটা এলাকা যাত্রাদলের মস্ত আয়ের এলাকা, তবে সেটাকে বাংলাদেশের বাইরে বলে

মনেই হয় না কারুর। সেটা হল বরাকর নদী পার হয়ে কয়লাকুঠির এলাকা। ওখানে যত টাকা তত খাতির ভাল দলের। গাওনা করেও সুখ। বাঙালী সমঝদার এখানে অনেক। কাঁচা পয়সার দেশ। শুধু দলেরই রোজগার হয় না, এখানে ভাল অ্যাক্টর যারা তারা উপহার পায় অনেক। কিন্তু তবু কষ্ট যাত্রাদলের বিধিলিপি। যাওয়ার কষ্ট খাওয়ার কষ্ট শোয়ার কষ্ট। তারও উপর কষ্ট মেয়েদের পক্ষে চারিদিক ফাঁকায় অ্যাক্টিং করা। চারিপাশে হাজারদরুনে শ্রোতা, তাদের শোনানো মেয়েদের কোমল কণ্ঠে কুলিয়ে ওঠে না। সব থেকে আসল কথা উপার্জন। মেয়েদের পোষায় না। অভিনেত্রীর কর্মটি এদেশে এ পর্যন্ত মেয়েদের মধ্যে তারাই করে যারা আসলে দেহব্যবসায়িনা। থিয়েটারে তারা চাকরি করে, তাতে তাদের উপার্জন বাড়ে। আগেকার কালে যখন সারারাত্রি বা রাত্রি দুটো তিনটে পযন্ত অভিনয় হত তখন শনি রবি বুধ পরে বুধের বদলে বৃহস্পতি তিনদিন ছাডা বাকী চারদিন তাদের পেশার উপার্জনের অবকাশ থাকে। কিন্তু যাত্রার দলে, মফস্বলে এ পথ বন্ধ হয়ে যায়। মাইনেও যাত্রাদলে থিয়েটারের থেকে কম। তার উপর কষ্ট পথের। কত জায়গায় গরুর গাড়িতে দশ বিশ মাইল চলতে হয়। পুরুষেরা হেঁটে মেরে দেয়। তারা সঙ্গে চিঁড়ে রাখে গুড় রাখে, পথে তাই ভিজিয়ে খেয়ে পথ চলে। মেয়েরা তা পারে না। তার উপর প্রয়োজন রক্ষকের। শাস্ত্রে নারী এবং পুরুষের উপমা দিয়েছে ঘি এবং আগুনের সঙ্গে। চারিদিক বা দশদিক থেকে যখন বিশ তিরিশ আগুন লোলজিহ্বা বিস্তার করে তখন ঘিয়ের বিপদ। সেই কারণে মেয়েদের যাত্রার দলে নেয়ও না, মেয়েরাও যায় না। কিন্তু মেয়েযাত্রার দল স্বতন্ত্র। সেখানে কয়েকটি মেয়ে ও কয়েকটি পুরুষ পরস্পরের প্রতি অনুগত বা অনুরক্ত থাকবার জন্যই দেহব্যবসায়ের এলাকাকে পিছনে ফেলে পথে ঘর বাঁধে। মেয়েরা সেই দেহব্যবসায়িনী শ্রেণীরই মেয়ে—নাচ গান কেউ ভাল কেউ মাঝারি কেউ কম মোটামুটি জানে, পুরুষেরাই এখানে সেই বাউণ্ডুলের দল যারা কেউ বাজিয়ে কেউ গাইয়ে কেউ অ্যাক্টর—এ ছাড়া যারা সংসারে অন্য কোন কাজ পারে কি না পারে পরখ করে দেখে নি। পরস্পরের সঙ্গে কেমন করে কোন সুযোগে মনের মিলের বাঁধনে বাঁধা পড়ে, যাত্রাদলের কষ্টই মাথা পেতে নেয়। দুজনে রোজগার করে, একসঙ্গে পথ হাঁটে, একসঙ্গে খায়, ছ মাস আট মাসের মধ্যে বাসরশয্যা পাতবার কোন সুযোগ মেলে না, শুধু মুখের কথা, একটু হাস্য বিনিময়—এতেই খুশী। যাত্রার দলের সফর শেষ হলে কটা মাস আবার সুখের দিন, কপোত-কপোতার মত বাস। কিন্তু মূল হল প্রোপ্রাইট্রেস। এমন বাসনা তার না হলে মেয়েযাত্রা হয় না। প্রোপ্রাইট্রেসকে হিরোইন অ্যাক্ট্রেস হতে হবে, তার অর্থ থাকতে হবে, তার ভালবাসার মানুষটিকে হিরো অ্যাক্টর হতে হবে, তবে মেয়েযাত্রা হবে।

মঞ্জরী অপেরার প্রোপ্রাইট্রেস নাম-করা অ্যাক্ট্রেস এবং রূপবতী মেয়ে। প্রবীর পতনে জনার ভূমিকায় এবং সতী তুলসীতে তুলসীর ভূমিকায় তার নাম দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মঞ্জরী আসরে ঢুকলেই আসর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হিরো গোরা চক্রবর্তী ওরফে বিজয় চক্রবর্তীর প্রবীর এবং শঙ্খচূড়ও তেমনি বিখ্যাত। দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ গোরাবাবুর প্রবেশ-প্রস্থানগুলি দিগ্বিজয়ী বীরের মত। অনেকে বলে

বিখ্যাত নট দুর্গাদাসকে অনুকরণ করে গোরাবাবু। কিন্তু আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ অভিনয়—অনুকরণ বলে মনেই হয় না।

এদের সঙ্গে আছে আর একজন প্রবীণ নট। খ্যাতিমান, যাত্রার দলের রাজা অ্যাক্টর রাতুবাবু। রাতেন বোস। দশাসই চেহারা, পয়তাল্লিশ ইঞ্চি বুক, লম্বাতেও ছ ফুটের কাছাকাছি, ভরাভর্তি চেহারা, নাক মুখ চোখ সুগঠিত, কিন্তু বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে এবং মুখের গড়নের কঠিন পরুষ ভঙ্গীতে মানুষকে থমকে দাঁড়াতে হয়। রাবণ, কংস, শিব প্রভৃতি ভূমিকায় খ্যাতিমান নট। দলের গোড়া থেকেই রাতুবাবু দলে যোগ দিয়েছিল। ওই বাউণ্ডুলে মানুষ। ঘর ছিল দোর ছিল, ম্যাট্রিক পাস করে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করত। আর শখ ছিল অ্যামেচার থিয়েটারে। তরুণ বয়সে তরুণ নায়কের পার্ট করত। এখানে ওখানে তাকে ডেকেও নিয়ে যেত। কখনও ছুটি নিয়ে যেত, কখনও এমনি বিনা ছুটিতেই চলে যেত। ফিরে এসে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করত। এতেই ধরা পড়ে চাকরি গেল। চাকরি যাওয়ার পর মা বাপ ভাইদের গঞ্জনা সে সয়ে নিয়েই অম্লান বদনে অ্যামেচার পার্ট করেই ফিরতে লাগল, কিন্তু সে গঞ্জনা তার স্ত্রীর সইল না। সে আত্মহত্যা করে বসল। এর পর রাতুবাবু বাড়ি ছেড়ে এসে থিয়েটারের দোরে দোরে ফিরে এসে ঢুকল যাত্রার দলে। সে আজ চব্বিশ বছর আগের ঘটনা—তখন তার বয়স ছিল চব্বিশ। কয়েক বছর পর দেহব্যবসায়িনী পল্লীতে ঘুরতে ঘুরতে বাসাই নিল একজনের ওখানে। তারপর সেখান থেকে আর একজনের ঘরে। বছর আষ্টেক আগে থিয়েটারের অ্যাক্ট্রেস নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে পটলীচারুর সঙ্গে আলাপ হল, মনে হল তাকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এতদিন। কিন্তু যাত্রার দলের অ্যাক্টরদের, যারা এই ধরনের বাসা বাঁধে তাদের বাসা প্রায় প্রতি বছরই ভেঙে যায়। ভেঙে যায় তাদের কর্মের পাকে। তারা দলের সঙ্গে বের হয়, একনাগাড়ে মাসের পর মাস বাইরে ঘুরে যখন ফিরে আসে তখন সে বাসা নতুন মানুষের দখলে এসে যায়। কিন্তু পটলীচারু তা হতে দেয় নি। প্রতীক্ষা করে বসে থাকত। তাই যখন মঞ্জরী অপেরা খুলল চার বছর আগে তখন পটলীচারুকে নিয়েই রাতুবাবু এসে যোগ দিয়েছিল। পটলীচারু সুন্দরী ছিল—গড়নে তন্বী, তিরিশ বছর বয়সেও তাকে পনের থেকে বিশ-বাইশ বছরের নায়িকা মানাত চমৎকার, নাচত-গাইতও ভাল। দুজনে চাকরি নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, খুব খুশী হয়েছিল, এবং এই বিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্রে যেন অক্ষয় আশ্রয় মিলেছিল বলে মনে হয়েছিল তাদের। দলের প্রতি মমতারও অন্ত ছিল না এই কারণে। তাদের দুজনের নামেও দলের খ্যাতি রটেছিল।

ওদের সঙ্গে আরও তিনটি যুগল এসে জুটেছিল দলে। রাতুবাবু পটলীচারুর মতন। নাটুবাবু গোপালীবালা, কমিক-অ্যাক্টর বোকাবাবু আর বুঁচি ছায়া, বংশী ডান্সিং মাস্টার আর আশা, গাইয়ে নাড়ু আর শোভা। দু বছর আগে পটলীচারু এবং এবারে মারা গেছে নাড়ুবাবু। কিন্তু রাতুবাবু দল ছাড়েনি, শোভাও ছাড়ে নি। গত বছর পটলীচারুর জায়গায় কুমারী নায়িকার উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করে সহজে মেলে নি, বহু কষ্টে মিলেছিল হাবুলিসরি বা সরস্বতীকে; রূপে গুণে সরস্বতী পটলীচারুর থেকে ভালই ছিল, কিন্তু তার জন্যে দলে নিতে

হয়েছিল শিমুলফুলের মত রূপ সার গুণ নেই চালু চারু-দাসকে। এই চালু চারুই দলটিকে আঘাত দিয়ে গেছে। আজ রথযাত্রা—আষাঢ় মাসের ২২শে—আজ থেকে আড়াই মাস আগে খুলনা শহর থেকে দল বছরের শেষ পালা গেয়ে কলকাতা ফিরল ; যে যার সব চুকিয়ে নিয়ে বাড়ি গেল। যাবার সময় সকলেই অনুরোধ করে গেল, যেন আগামী গাওনার মরসুমে দলে তাকে নেওয়া হয়, শুধু বোকাবাবু বলল, আমার কিন্তু ফারখত। আমার জায়গায় লোক দেখবেন।

—কেন ? কি হল ?

—না। আমি আর—

কথা শেষ না করেই সে চলে গেল। এমন বুঁচির জন্যেও অপেক্ষা করল না।

বোকাবাবুর প্রণয়িনী বুঁচি ছায়াকে প্রশ্ন করল গোপাল ম্যানেজার—বুঁচি ? ব্যাপার কি রে ?

—জানি নে। বলে সেও চলে গেল।

মঞ্জরী গোরাবাবু রীতুবাবু এরা শুনে একটু হেসে বলেছিল, যাক না দশ দিন। ঝগড়া-টগড়া হয়েছে। বলেও অবশ্য তারা কেউই সন্তুষ্ট হতে পারে নি। কারণ এ প্রেমে ঝগড়া যা হয়—তা তো চারখানা দেওয়াল ঘেরা ঘর বা বাড়ির মধ্যে হয় না। হয়ে থাকলে হয়েছে পথে বা দলের বাসায় বা সাজঘরে, দলের সকল লোকের মাঝখানে। তাহলে কেউ দেখতে পেলে না, শুনতে পেলে না !

ঝগড়া হয় নি তাই কেউ দেখে নি বা শোনে নি। হয়েছিল অন্য কিছু। হয়েছিল চালু চারুদাস আর বোকাবাবুর প্রণয়িনী বুঁচি ছায়াতে গোপন প্রেম। অতি গোপন। শিমুলফুল চালু চারুদাস আসরে অভিনয়ে অপটু কিন্তু জীবনে অভিনয়ে মাস্টার। নিজের প্রণয়িনী হাব্‌লিসরিকে পর্যন্ত বুঝতে দেয় নি। দল থেকে হিসেব বুঝে নিয়ে যাবার সময়েও দুজনে একসঙ্গে গেল। এক সপ্তাহ পরে শোনা গেল হাব্‌লিসরি বুঁচি ছায়ার বাড়ি চড়াও হয়ে চারু আর বুঁচিকে থ্যাংরাপেটা করে এসেছে দুপুরবেলা। এবং নিজের ঘর থেকে চারুদাসের স্যুট-কেসটা টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। মাসখানেক যেতে-না-যেতে সে থিয়েটারের সখীর দলে কাজ নিয়েছে।

ম্যানেজার গোরাবাবু খবরটা পেয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গোপাল ঘোষকে ডেকে বলেছিল, তাহলে তো লোক দেখতে হয় গোপালবাবু ?

মঞ্জরী অপেরার প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী দেবী, গোরাবাবু ম্যানেজার। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গোপাল ঘোষ, যাত্রাপার্টির ম্যানেজারি করে চুল পাকিয়েছে, ঝানু লোক। প্রকৃতপক্ষে গোপালই ম্যানেজার। গোরাবাবুর একটা বড় পদ না হলে মানায় না বলেই নামে সে ম্যানেজার। গোরাবাবু দলের হিরো, পদে ম্যানেজার এবং মঞ্জরীর স্বামী। বৈষ্ণবমতে দুজনের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু লোকে তা মানে না। মঞ্জরী দেহব্যবসায়িনীর কন্যা, তার আবার জাত এবং তার সঙ্গে আবার বিয়ে ! কিন্তু তারা তা মানে।

গোপাল ঘোষ বলেছিল, হ্যাঁ দেখতে হবে বইকি। লোক তো একজন না, তিনজন।

দুজন ফিমেল, একজন মেল, একে বলে গিয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট ! বোকাবাবুর মত কমিক পার্ট করার লোক মেলা তো সহজ নয়। তার পরেতে কুমারী নায়িকা। সে আরও ইম্পর্ট্যাণ্ট। চেহারা বয়েস গানের গলা—। একে বলে, দেখতেই হবে। না হলে যখন চলবে না, তখন পেতেই হবে।

ঠিক ওই মুহূর্তটিতেই বাড়ি ঢুকেছিল রাতুবাবু। গলা ঝেড়ে সাড়া দিয়ে ভরাট মোটা গলায় ডেকেছিল তার মুখস্থ করা পার্টের মত ডাকটি—আছেন কি দেবতা ?

গোরাবাবু সাগ্রহে সাড়া দিয়েছিল, আসুন আসুন মাস্টারমশাই ! তারপর মঞ্জরীকে ডেকে বলেছিল, মঞ্জরী, মাস্টারমশাই এসেছেন।

যাত্রাদলে প্রবীণ এবং বড় অ্যাক্টর মাত্রেই মাস্টারমশাই নয়তো বাবু, সে বলে নেহাত গ্রাম্য ছোট অ্যাক্টরেরা। গোপাল ঘোষও তাকে মাস্টারমশাই বলে। গোপাল ঘোষের বয়স ষাটের উপর। তবুও রাতুবাবু নাটুবাবু এরা তার মাস্টারমশাই। গোরাবাবু এবং মঞ্জরীর কাছেও রাতুবাবু মাস্টারমশাই। অন্য সকলের মধ্যে বড়দের নামের সঙ্গে বাবু যোগ করে ডাকে। বাকীদের নাম ধরেই ডাকে। আর একজন ছিল মাস্টারমশাই। বুড়ো নাড়ুবাবু, গাইয়ে নাড়ু, নারাণ ঘোষ—কিন্তু সে মারা গেছে মাস কয়েক আগে।

দলের লোকের কাছে মঞ্জরী আড়ালে প্রোপ্রাইট্রেস বা মালিক, কেউ কেউ বলে গিন্নী। সামনে বলে, মা। গোরাবাবু আড়ালে কর্তা সামনে বড়বাবু কিংবা স্যার। রাতুবাবু গোরাবাবুকে বলে দেবতা। মঞ্জরীকে বলে, প্রোপ্রাইট্রেস। সাধারণের সামনে শুধু আপনি বলেই কথা সারে।

গোরাবাবুর ডাক শুনে মঞ্জরী ঘর থেকেই সাড়া দিয়েছিল—বসুন মাস্টারমশাই, আমি পাপর ভাজছি। পুড়ে যাবে। তুলেই নিয়ে যাচ্ছি। গোপালমামা আপনিও যাবেন না।

গোপাল ঘোষকে মঞ্জরী বলে মামা। গোপাল মঞ্জরীর মা তুলসীকে বলত দিদি।

রাতুবাবু আহ্বান পেয়েই গান ধরে দিয়েছিল। এই গান ধরাটা তার অভ্যাস। গলা মোটা, গাইয়েও নয়, রাতুবাবু কিন্তু মোটামুটি চালিয়ে যায়। গান ওর একখানি, অন্তত গোরাবাবুদের বাড়িতে অথবা ওদের দুজনে ছাড়া যেখানে অন্য কেউ জানে না সেখানে ওই একখানা গানই পেয়ে থাকে। তাও দু কলি। গান ধরেছিল—

এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া, ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

কলি দুটির অর্থ এবং দার্শনিকতা যাই হোক আর যেমনই হোক রাতুবাবুর গানের লক্ষ্য গোরাবাবু ; তার সঙ্গে মঞ্জরীও আছে। সে কথা গোরাবাবু এবং মঞ্জরীর কাছে অস্পষ্ট নয় ; শুধু ওরা দুজনেই বা কেন, দলের প্রায় অনেকেই ওর ভিতরকার প্রচ্ছন্ন সরল রসিকতাটুকু বোঝে।

কমিক অ্যাক্টর বোকাবাবু দল ছেড়ে চলে গেল, সে বলত, হরির চরণে তেলই দিন আর তুলসীই দিন মাস্টারমশাই, কংস রাবণ সাজতেই হবে আপনাকে।

রাতুবাবু বলতেন, যা বলেছ বোকা। হরি নিজের পার্টটি কাউকে দেয় না।

বোকা বলত, দেখুন না আমাকে, ন্যাকা বোকা সাজিয়ে বাপের দেওয়া নামটাই চাপা দিয়ে দিলে মশাই। বোকাই হয়ে গেলুম। যা গান ধরেন আপনি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

সেদিন গানের কলি দুটি গাইতে গাইতে রীতুবাবু উপরে উঠতেই গোরাবাবু বলেছিল, হরি যে বিপদে পড়েছেন মাস্টারমশাই! সাজাবার যে লোক পাচ্ছি নে! শুনেছেন ব্যাপার?

শুনেছি। ক দিন ছিলুম না এখানে। বাড়ি মানে শ্রীরামপুর গিয়েছিলুম—সেখেন থেকে বাবা তারকেশ্বর। ফিরেছি পরশু। শুনলাম সব বোকার কাছে।

তাকে কোথায় পেলেম?

—বলছি। ওরে শিউনন্দন, কোথায় গেলি রে? এক গ্লাস জল খাওয়া তো। হ্যাঁ। কাল বেরিয়েছিলুম একবার অভিসারে। মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা। দেখা তো দেখা একেবারে বাড়িটার দরজায়। ও বেরুচ্ছে আমি ঢুকছি। বললুম, বোকা? পায়ের ধুলো নিয়ে বোকা বললে, হ্যাঁ দাদা আমি!

মঞ্জরী এসে দাঁড়াল, হাতে কাচের প্লেটে মিষ্টি আর তকতকে মাজা মোরাদাবাদী গেলাসে জল। স্নান হয়ে গেছে, মাথায় আধঘোমটা, কপালে সিঁদুরের টিপ; পরনে কালাপাড় ফরাসডাঙার শাড়ি; সব মিলিয়ে বড় প্রসন্ন দেখাচ্ছে মঞ্জরীকে। মঞ্জরী দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, স্বাস্থ্যবতী, বয়স তার সাতাশ আটাশ কিন্তু বয়সের অনুপাতে গম্ভীর। রূপে বয়সে তারুণ্যে সন্দেহ হয় না, কিন্তু তারুণ্যের চাপল্য নেই তার মধ্যে। প্লেট এবং জলের গ্লাস নামিয়ে দিয়ে বললে—শিউনন্দনকে আসবামাত্র বলেছি, যা মিষ্টি জল দিয়ে আয়। আমার হাত জোড়া। তা সে শসা পেঁয়াজ কাটতে বসে গেছে। মাস্টারমশায়ের নাম করে বলে—উনি আসিয়েছেন। সাদাপানি কি হোবে? লিয়ে যাব তো দুয়ো দিবন। উনি দিবেন, হামারে বাবু ভি দিবেন। তারপর ভাল খবর তো সব?

—সব? সব তো আমার নেই প্রোপ্রাইট্রেস। আমার বলতে তো শুধু আমি। তা দেখছেনই তো ভালই আছি! হাসলে রীতুবাবু।

গোপাল এতক্ষণ চুপ করেই বসে ছিল, ফরাসের উপর বসে আঙুল দিয়ে দাগ টানছিল—হয়তো কিছু লিখছিল—দুর্গা কালী কৃষ্ণ যা হোক কিছু, আবার হাত দিয়ে মুছে ফেলছিল এবং কথাগুলি শুনেই যাচ্ছিল। ওদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্পর্কের মধ্যে তার প্রবেশাধিকার নেই সে গোপাল জানে। কিন্তু এবার সে বললে—একটা কথা বলব মাস্টারমশাই?

—বলুন। কিন্তু তার আগে দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করে নিই দাঁড়াও। একটা অ্যাসপ্রো কি অ্যাসপিরিন যা হোক চাই যে স্যার। কাল একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল—মাথা খসে যাচ্ছে। এবং সেখান থেকেই সরাসরি আসছি। আপনি তো রাখেন!

শিউনন্দন ট্রেতে মদের বোতল, শসা, গ্লাস, পেঁয়াজকুচি, পাঁপড়-ভাজা এনে নামিয়ে দিল এবং অভিবাদন জানালে—নমস্কার বাবু!

—নমস্কার শিউনন্দনজী! তুমি বাবা সাক্ষাৎ শিবপুত্র গণেশ, সিদ্ধিদাতা। একটা

অ্যাসপিরিন আন দেখি, জলে নয় কারণের সঙ্গে মেরে দি !

মঞ্জরী উঠে গেল—আমি এনে দিচ্ছি। লুকোনো আছে।

—লুকোনো ? তা হ্যাঁ, যা যুদ্ধের বাজার—লুকোনোর মত দ্রব্য বটে। আমি খাই। কিন্তু আজ দোকানে অ্যাসপ্রো আনলাম, কাল আনতে গিয়ে দেখি নেই। আর একটা কি বের করে দিয়ে বলে, এইটে নিয়ে যান।

গোরাবাবু গেলাসে মদ ঢেলে হাতে দিয়ে বললে—এটা খান ততক্ষণ। গোপালবাবু—

—দিন একটু।

গ্লাসটা তুলে নিয়ে রীতুবাবু বললে—যাত্রার দলের জীবন এই জন্যেই ভালবাসি! যত সব আধপাগল—কর্মে কুঁড়ে, অভিনয়-পাগলের দল। রাত্রে রয়াল ড্রেস পরে রাজা সাজি। দিনের বেলা ফকির, ছেঁড়া কাপড়জামা পরে খড়ের উপর চ্যাটাই পেতে শুয়ে বিড়ি টানি। এই দ্রব্যটি ছাড়া বাঁচি কি করে ? তা দিনকাল যা পাল্টাচ্ছে না, তাতে আমাদের সঙ্গেই এ সব শেষ !

—রাইট। গোরাবাবু মদ খেয়ে গ্লাস শেষ করে নামিয়ে রেখে বললে—রাইট। খুব ঠিক বলেছেন। আর আছে কি আমাদের ? মঞ্জরী এই কথাটা বোঝে না। কাল আমাকে বলছিল, আজকাল অন্য অন্য দলে নতুন পাশ-করা ছোকরারা ঢুকছে, তারা নাকি খাচ্ছে না। আমি বললাম, খাচ্ছে না, খাবে। আর যদি না খায় তবে অ্যাক্টর হতে পারবে না। তখন বলে আসরের লোকে ও সইবে না। শোন কথা! নেশা না হলে অ্যাক্টিং হয় ? নেশা না হলে আমি ভাবব কি করে, আমি গোরা ওরফে বিজয় চক্রবর্তী, আমি ধাঁ করে দেবতা হয়েছি কি রাজা হয়েছি কি মরে যাচ্ছি! নিন, সিগারেট নিন। গোপাল মামার বিড়ি চাই—

আমার কাছে আছে। গোপাল পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরিয়ে বললে—কি বলে আপনারাই বা কি খান! আমার যাত্রাদলে চল্লিশ বছর হল। মা ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে ঢুকেছিলাম, কি বলে অ্যাক্টিং করব বলে ; হল না, ম্যানেজার হলুম। ত্রৈলোক্য মায়ের দলের হিরো —কি বলে জগৎবাবু আসরে ঢুকতেন—ঢুকবার মুখে গেলাস আমার হাতে দিয়ে ঢুকতেন। কি বলে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। পার্ট সেরে এসেই আমার হাত থেকে নিয়ে কি বলে চুমুক দিতে দিতে সাজঘরে গিয়ে ঢুকতেন। তাঁর কাছে শুনেছি। তিনি বলতেন গোপ্‌লা বাবা, কি দিনকালই গেছে রে! মেদিনীপুরে জমিদার-বাড়ি যাত্রা করতে যেতাম, বাবুরা জালায় করে মদ রাখত। আর ডাঁই করা থাকত মাটির গেলাস। চুবিয়ে নাও, আর খাও, আর ফেলে দাও।

মঞ্জরী ফিরে এল অ্যাসপ্রো নিয়ে। নামিয়ে দিয়ে বললে—নিন মাস্টারমশাই। খেয়ে নিন। এর পর কিন্তু আমার আর্জি আছে।

গোরাবাবু হেসে বললে—বোতল তুলতে চাচ্ছ তো ?

—চাচ্ছি! অন্যায় করছি ?

—যা সব বলছিলাম, তা তো শুনেছ ?

—শুনেছি বইকি।

—তবে ?

—তবে এখন তো যাত্রার আসরে নামছ না পার্ট করতে! এখন দল গড়ার কথা হচ্ছিল। সেটা তো নেশার ঝোঁকের মাথায় করা ঠিক হবে না।

রীতুবাবু সসম্ভ্রমে বললে—যুক্তি অকাট্য। নে বাবা—

গোরাবাবু হাত চেপে ধরলে—উঁহু। আমি অবাধ্য। আর এক ডোজ করে হুকুম হয়ে যাক। তারপর আমি সুবোধ এবং সুশীল বালক—তাহার পর প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী তাহাকে যাহা বলিবেন তাহাই শুনিবে।

মঞ্জরী হেসে বললে—শিউনন্দন, দে, আর একটু করে ঢেলে দে। না—তুমি ঢালতে পারে না। আর মামাকে দিস নে। এইবার উঠিয়ে নিয়ে যা।

রীতুবাবু বললে—বোকার কাছে সব শুনলুম। ও বললে মাস্টারমশাই, ও শালা চালু চারুকে আপনারা জানতেন না, আমি জানতাম। আগে ও অ্যামেচার থিয়েটারে মেয়ে সাজত। বড় বড় রাজা জমিদারদের থিয়েটারে চাকরি নিয়ে থাকত। যত জায়গায় গেছে, সব জায়গায় শালা ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করেছে, ধরা পড়েছে, মার খেয়েছে। শেষ যাত্রায় ঢুকেছিল। পার্ট করতে পারে না। যা পারে সে মেয়ের। হঠাৎ হাবলিসরিকে মজালে। সরি কোথায়, ওর মেয়ে সাজা রূপ দেখে মজেছিল। থিয়েটার ছেড়ে সে এসে আমাদের দলে ঢুকল। কিন্তু শালা তো কুত্তা। চোট্টা কুত্তা। নজর দিলে বুঁচির ওপর। চালাকের অগ্রগণ্য। হাব্লিও ধরতে পারে নি, কিন্তু আমি ধরেছিলাম। দু একবার বুঁচিকে বলেছি—সাবধান বুঁচি, সাবধান। মফস্বল, কেলেঙ্কারি করতে চাই নি, পারিও না তা। ছাড়বার মুখে বেশ বুঝলাম, বুঁচি আমাকে ছাড়বে। তাই নিজেই ছেড়ে দিলাম। বুঁচি অন্য লোকের কাছে যাবে—তারপর দলে থাকাটা কি রকম দেখায় আপনি বলুন ?

রীতুবাবু একটু থেমে সিগারেটে কটা টান দিয়ে বললে—আমি বললুম, হাব্লিসরির সঙ্গে একটা আপোস করে নিয়ে তুই যেমন ছিলি তেমনি থাক। দল কেন ছাড়বি ? মাইনে ভাল দেয়। প্রোপ্রাইট্রেসের মত মালিক হয় না। স্যার তো আমীর লোক। তারপর ধর, অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের দল। তা বোকা বললে, সে সব হয়ে গেছে। হাব্লি থিয়েটারে চাকরি নিয়েছে। আমি মোহন অপেরায় চাকরি নিয়েছি—মাইনেও বেশী দিয়েছে। তারপর বলে, আপনিও আসুন না মাস্টারমশায়—ওখানে আপনাকে একশো পঁচাত্তর দেয়, এরা দুশো দেবে। দল গড়বে, এবারকার সেরা দল! আসবেন ? মঞ্জরী অপেরাকে ডাউন করবে—এ হল ওদের মালিকের প্রতিজ্ঞা। ওদের কটা বাঁধা ঘর এরা নিয়ে নিয়েছে—ঘর কেন, বরাকর এলাকা-টাতেই ওদের ডাউন করেছে মঞ্জরী অপেরা—এইজন্যে ওরা মঞ্জরী অপেরার লোক বেশী মাইনে দিয়ে নেবে।

গোরাবাবুর সুগৌর মুখখানা টকটকে রাঙা হয়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে স্থির হয়ে শুনছিল সে। রীতুবাবু থামতেই চমক ভেঙে এদিক ওদিকে দেখে সে উঠে চলে গেল ভেতরে।

মঞ্জরীও ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়ল। কিন্তু সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই গোরাবাবু মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এল। মদ খেয়ে এল সে। তারপর বসল। চেহারাটা তার পাল্টে গেছে। একজন জেদী গোঁয়ার বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে থেকে। সিগারেট ধরিয়ে বললে—গোপাল মামা!

বিড়ি টানতে টানতে গোপাল বললে—বলুন।

—বাজারের সেরা দল গড়তে পারবেন?

—তা কেন পারা যাবে না!

—হ্যাঁ। সেই যদি পারেন, তবে দল থাক। নইলে কাজ নেই। কি বলেন মাস্টার মশাই?

রীতুবাবু বললে—নিশ্চয়! এতে আমি একমত। তারপর হাত নেড়ে বক্তৃতার সুরে বললে—জ্যেষ্ঠ নয়—শ্রেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ হতে চাই।

এ ভুবনে শ্রেষ্ঠ একজন—একজন শুধু!
তারপর নিকৃষ্ট সকলে! সকলের সাথে
নিকৃষ্ট হইয়া কোনমতে বেঁচে থেকে
কিবা প্রয়োজন! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।
তাই দ্বন্দ্ব মোর ভগবান—ব্রহ্মাণ্ডের
একমাত্র বিধাতার সাথে। দেবলোক
জয় করি তাই মোর মেটে নি পিপাসা—
খুঁজে ফিরি ভগবানে। তার সাথে
দ্বন্দ্ব মোর। সে বড়? কি আমি বড়?

রীতুবাবুর চোখ দুটো বড় বড়। লাল হয়ে এসেছে সে দুটো। থমথম করছে মুখ! নেশাটা তার ধরেছে। কথা সে মিথ্যে বলে নি। যাত্রাদলের এই বাকসর্বস্ব, অন্য সকল কৃতিত্ব-সম্বলহীন মানুষগুলি স্বপ্ন ছাড়া বাস্তবের মধ্যে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে পড়ে। এবং স্বপ্ন দেখবার একটি মাত্র ওষুধ তারা জানে—সেটা নেশা। এর জন্য পৃথিবীর কারুর কাছেই এদের সংকোচ নেই। নেশা না থাকলেই বরং সংকুচিত হয়ে পড়ে। তা বলে নেশায় এরা সহজে মুখ থুবড়ে পড়ে না। বক্তৃতা আবৃত্তি শেষ হলে গোরাবাবু বললে—মঞ্জরী! তুমি বল।

মঞ্জরী হেসেই বললে—আমাকে বলতে হবে তুমি বলবার পরও?

—তুমি মালিক!

—তুমি নও? তাহলে দল তুলে দাও।

—এই দেখ, তুমি চট করে রেগে যাও!

মঞ্জরী বললে—যাব না? কি করে বললে তুমি কথাটা?

রীতুবাবু বললে—আপনি মাপ চান স্যার। দোষ আপনার।

—আচ্ছা আচ্ছা—তাই। মাফ।

মঞ্জরী তার কথাটা ঢেকে দিয়ে বললে—খুব ভাল করে দল গড়। আমারও ওই কথা। যদি না পার দল তুলে দাও। ওই বোকা যখন বুঁচির সঙ্গে প্রেম করে প্রথম ঠোক্কর খায়, যাত্রার দল থেকে ফিরে দেখে বুঁচি অসুখে মরতে বসেছে, তখন আমি ডেকে টাকা দিয়েছিলাম চিকিৎসার। বুঁচি আমার পায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—বোকা ভগবান সাক্ষী করে বলেছিলে, তুমি ছাড়িয়ে দাও আলাদা কথা। কিন্তু আমরা কখনও ছেড়ে যাব না।

গোপাল বললে—তার জন্য কি গেল এল মা মঞ্জরী! কি বলে, বোকার বদলে ভাল লোক নিয়ে আসব—

রীতুবাবু বললে—এবার একজন বুদ্ধিমান আন গোপাল। ভাবনা মেয়ের—

হঠাৎ ওঁ—ওঁ শব্দে সাইরেন বেজে উঠল। ১৯৪৪ সাল। এখনও মধ্যে মধ্যে সাইরেন বাজে। তবে মানুষে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশের মত ভয় পায় না। তবু সকলে চকিত হয়ে উঠল।

গোপাল বললে—অসহ্য করে তুললে বাবা! যুদ্ধ থেমেও থামে না।

রীতুবাবু বললে—মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!

মঞ্জরী বললে—নীচে চলুন!

গোরাবাবু বললে—নাঃ।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললে—গোপালবাবু, একখানা ভাল ঘর দেখুন চিৎপুরের উপর। আপিস একটা করতে হবে। ভাল দল করতে হলে আপিস চাই। বাড়িতে আপিস এ চলবে না। মাস্টারমশাই, সাইরেন বাজল ভাল হল, এখানেই স্নান করুন, খান, ঘুমোন, বিকেলে একটা প্ল্যান করে কাজে নামা যাক।

মঞ্জরী বললে—কিন্তু দোহাই ধর্ম, মদটা কম খেয়ো।

* * *

সেই প্ল্যান অনুযায়ীই গ্রে স্ট্রীট আর চিৎপুর জংশনের এই সেরা ঘরখানা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আজ রথের দিন, শুভ দিন, নতুন আপিস খোলা হচ্ছে। আজই নতুন লোক নেওয়া শুরু হবে। গোরাবাবু মঞ্জরী যাবে কালীঘাটে—পুজো দেবে! নাটকের 'সারুটে' অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে সিঁদুরের ছাপ দিয়ে নিয়ে আসবে।

গোপাল ঘোষ উপরে উঠে এল। নীচেতলাটায় তখনও ১৯৪৪ সালে বেশ্যাদের বাস; নীচেতলার সঙ্গে যোগাযোগের দরজাটা কুলুপ এঁটে বন্ধ করা হয়েছে। ঘরখানাকে ঝেড়ে মুছে ধুয়ে পরিষ্কার করে একদিকে তক্তাপোশ পাতা হয়েছে, একদিকে একখানা টেবিল, তার দুদিকে খানকয়েক ফোল্ডিং চেয়ার দিয়ে আপিস-আপিস চেহারা বানিয়ে তুলেছে। মাথার উপরে খানতিনেক ছবি—মা কালীর, সিদ্ধিদাতা গণেশের এবং রামকৃষ্ণদেবের। একখানা সুন্দরী একটি মেয়ের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার, তারই পাশে ম্যাড়মেড়ে কাগজের বাংলা মাসের ক্যালেণ্ডার আর একখানা। একটা তাক, আলমারির নীচের তাকে একটা মস্তবড় মাটির কলসী। একটা কুঁজো, উপরের তাকে কলাই করা গ্লাস, গোটা দুই কাচের গ্লাস, গোটা ছয়েক কাপ ডিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলের উপরে খেরো বাঁধা খাতা—তার উপর

একটা খেরোর মলাট দেওয়া পঞ্জিকা। ঘরে ঢুকবার দরজায় একখানা ছোট সাইনবোর্ড—মঞ্জরী অপেরা, প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী দেবী। আলমারীর সব উপর তাকে—দুটো বক্স হারমোনিয়াম, ঢোল, দুজোড়া বাঁয়া-তবলা, মন্দিরা, ঘুঙুর সাজানো এবং বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

মোট কথা, গোপাল ঘোষ যথাসাধ্য আপন রুচিমত আপিসটাকে সাজিয়ে তুলেছে সকাল থেকে। দলের চাকর বিপিন হাজরা রাস্তার ধারের বারান্দায় একটা টুল পেতে আপনার আসন তৈরি করে নিয়েছে।

গোপাল ঘরে ঢুকে দেখে খুশী হয়ে উঠল—বাঃ, বেশ হয়েছে। খাসা। টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে বিপিনকে ডাকল—বাবাধন রে, বিপিন!

—কি—বল? বিপিন এসে দাঁড়াল।

—কি বলে কেমন হল বল্ তো?

—বঁড়িয়া হয়েছে। বহুত বঁড়িয়া। এইবারে ঢোল পেতে কুড়ুতাক কুড়ুতাক ভেপ্পো ভেপ্পো দাও লাগিয়ে। মোহন অপেরার চমকু ঝলসে যাক।

—দেব দেব, ভাবছ কেন? হুঁ-হুঁ। কি বলে এই তো সন্ধ্যে সবে, কি বলে! কিন্তু পান-টানগুলোর অর্ডার দিয়েছ তো?

—সব কম্‌পিলিট! চায়ের দোকানে বলেছি।

ঠিক এই সময়েই সিঁড়িতে শব্দ উঠল পায়ের, তার সঙ্গে বীতুবাবুর গলা শোনা গেল—এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া—। কই, গোপালবাবু কোথায়? এঁরা কই?

এঁরা মানে মঞ্জরী এবং গোরাবাবু। প্রোপ্রাইট্রেস আর হিরো, মঞ্জরীর স্বামী। কালীঘাট যেতে হবে পূজো দিতে।

বলতে বলতেই ট্যাক্সির হর্ন শোনা গেল। ওরাও এসে গেছে।

দুই

একখানা ট্যাক্সিতে কুলোল না। দুখানা ট্যাক্সি লাগল। লোক পাঁচজন, কিন্তু জিনিসপত্র অনেক। ডালায় করে পূজোর জিনিস সাজিয়ে নিয়েছে মঞ্জরী নিজে। ষোড়শোপচারে পূজো। টাকা ধরে দিলে পাণ্ডারা অর্ধেক জিনিস দিয়ে সারে। ফল-মূল, মিষ্টান্ন, জবার মালা, অপরাজিতার মালা, কুঁচো ফুল, বস্ত্র, শঙ্খ সব ফর্দ করে কেনা হয়েছে। ফর্দ করেছে গোরাবাবু নিজে। মঞ্জরী এবং শোভা শিউনন্দনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গিয়ে কিনেছে।

শোভার বেশ বয়স হয়েছে, পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি; জীবনে সে গাইয়ে নাড়ুর সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল, ওই ভালবাসাটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল মেয়ে যাত্রার দলে, সে প্রায় কুড়ি বছর আগে। নাড়ুবাবু তখন যাত্রার দলে বড় গাইয়ে। এবং রাধাবিনোদিনীর দল তখন বেশ নামডাক হাঁকিয়েই চলেছে; নাড়ু এসে এই দলে ঢুকেছিল। শোভার দেহের কাঠামোখানা বেশ উঁচুপুরু; সে আমলে লোকে বলত, দলমলে মেয়ে। রাধাবিনোদিনী নিজে

ছিল দলের বড় হিরোইন, মহিষাসুর বধে দুর্গা ; রুক্মাঙ্গদের হরিবাসরে রাণী, রাবণ বধে মন্দোদরী এই সব পার্ট সে করত ; দরকার হলে শোভা একটিনি চালাত এই সব পার্টে। খুঁত হচ্ছে —গাইয়ে নয় শোভা। রাধাবিনোদিনী দল উঠে যাওয়ার পর অনেক দিন বসে ছিল, নাড়ুবাবু অন্য দলে কাজ নিয়েছিল। কষ্ট হয়েছে তখন, কিন্তু শোভা তার ভালবাসার অপমান করে নি। পটলীচারু রীতুবাবুর প্রণয়িনী ছিল শোভারই বোন। রীতুবাবু পটলীকে নিয়ে মঞ্জরী অপেরায় ঢুকবার সময় নাড়ুবাবু এবং শোভাকে দলে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। নাড়ুবাবুর তখন হঠাৎ গলাটা কেমন ধরা ধরা হয়ে এসেছিল। শোভা দলে ঢুকে প্রতিষ্ঠা খ্যাতি পাক না-পাক, সকল লোকের মনে একটি প্রীতির আসন দখল করে বসেছিল। যার ফলে নাড়ুবাবুর গলাভাঙা সত্ত্বেও চাকরিটা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছিল। নাড়ুবাবু মারা গিয়েছে মফস্বলে, এই বছরই, দল তখন আসামে গৌহাটিতে। শোভা বড় কাতর হয়ে পড়েছিল। তার সহোদরা পটলীচারু রীতুর প্রেমিকা, সে মারা গেলে শোভা এমন কাতর হয় নি। পটলীও মারা গিয়েছিল মফস্বলে। দল তখন পূর্ববঙ্গে খুলনায়, সে দু বছর আগে। পটলীর সামান্য জ্বর, সেই জ্বর নিয়েই সে পার্ট করেছিল, রীতুবাবুই তাকে ব্র্যাণ্ডি কুইনিন খাইয়ে তাজা করে নামিয়েছিল। পার্ট করে এসে শুয়ে ছিল পটলী, ভোররাত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার এসে দেখে বলেছিল, এ যে ডবল নিউমোনিয়া। ১৯৪২ সাল—তখন এম বি, পেনিসিলিন ওঠে নি, তার উপর যুদ্ধের বাজার। টাকা থাকতেও মফস্বলে কালো বাজারের মোটা কালো পর্দাটা ঠেলে ঢুকবার কোন হদিস মেলে নি। দলকে সেই দিনই আসতে হবে দৌলতপুর। সন্ধ্যেতে সেখানে বায়না। রীতুবাবু থেকে গিয়েছিল—পটলীর মাথার শিয়রে বসে। শোভা গিয়ে রীতুবাবুকে বলেছিল, আমি থাকি কি বলেন ?

রীতুবাবু বলেছিল, না-না-না। আমি যাচ্ছি না, পটলী থাকছে না, তার উপর তুমি শুদ্ধ থাকবে না, পালা উঠবে কি করে ? তুমি যাও। প্রোপ্রাইট্রেস নিজের চাকর শিউনন্দনকে রেখে গেলেন। তার সঙ্গে থাকছে নবীন ঘোষ, লোকটা করিতকর্মা।

তাই গিয়েছিল শোভা। চারদিন পর পটলীর সৎকার সেরে রীতুবাবু দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল রানাঘাটে। শোভা রীতুবাবুর কাছে এসে কেঁদেওছিল, তাকেও সান্ত্বনা দিয়েছিল, কিন্তু নাড়ুর মৃত্যুতে সে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল দুদিন। তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল মঞ্জরী। এবং বলেছিল—দল যতদিন থাকবে শোভাদি, যতদিন আমি থাকব, ততদিন তুমি থাকবে। সেই কথাটাই শুধু মঞ্জরী রাখে নি, তার থেকেও অনেক বেশী তাকে দিয়েছে। যে বাড়িতে মঞ্জরী থাকে, সে তার নিজের বাড়ি। তার একতলাটা করেছিল তার দিদিমা চল্লিশ বছর আগের বিখ্যাত কীর্তন গায়িকা রাধারাণী। একাতলার উপর দোতলা হয়েছে তার মা তুলসীর দৌলতে। মঞ্জরীর বাপ, তার জন্মদাতা দোতলা তুলেছিল। সেই অবধি তারা থাকে উপরে, নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া আছে। তিনখানা ঘর, বারান্দা ঘিরে কাঠের রান্নাঘর, এতে তাদেরই সমশ্রেণীর তিনটি মেয়ে থাকে, কিন্তু তারা দেহব্যবসায়িনী হয়েও দেহব্যবসায়িনী নয়, প্রত্যেকেই এক একজনের রক্ষণাধীনে প্রণয়িনী হিসেবে বাস করে। তারই দুখানা ঘর বিয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বরে হাতীবাগানে বোমা পড়তেই খালি হয়ে পড়ে ছিল।

দুজনকে নিয়ে তাদের প্রণয়ীরা মফস্বলে চলে গিয়েছিল। তার একখানা ঘর এমনই ধরনের একটি মেয়ে এসে ভাড়া নিয়েছে। বাকী ঘরখানা মঞ্জরী শোভাদিকে ডেকে দিয়ে বলেছে—এখানেই থাক তুমি। ওখানে যা ভাড়া দাও তাই দিও আমাকে। ঘর তো আমার পড়েই আছে। তুমি তো জান, যাকে তাকে ঘরভাড়া তো দিই না আমরা।

অবাক হয়েছিল শোভা। চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে পড়েছিল। বহু কষ্টেই বলেছিল—তোমার কর্তা—

মঞ্জরী বলেছিল—সেই-ই বললে দিদি। সে শুনেছে, নাড়ুবাবুর বিধবা মেয়েকে তুমি লিখেছ—তুমি যদি ঘেন্না না কর, যদি নাও, তবে আমি তোমাকে মাসে মাসে দশ টাকা হিসেবে পাঠাব। সেই শুনে এসে বললে—জান, শোভাদিকে প্রণাম করলাম মনে মনে। তুমি ওকে এইখানে ওই ঘরখানা দিয়ে থাকতে বল।

শোভা এখন মঞ্জরীর সদাসর্বদার সঙ্গিনী, হাটে বাজারে যেখানে মঞ্জরী যায় সে সঙ্গে থাকে। মঞ্জরীর এটা ওটা বরাতও খাটে। শোভা আজকের পূজোর বাজার করতেও সঙ্গে গিয়েছিল এবং কালীঘাটে যাবার জন্য সঙ্গে এসেছে। শোভা স্নান করে ফিরে পাড় গরদের শাড়ি পরেছে। বয়েস হয়েও চুল একরাশ আছে শোভার, খুব ভিতরে ভিতরে দু-চারগাছি পেকে থাকলেও উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। মুখে একটু স্নো পাউডারের ছোপও রয়েছে। তবে কপালে সিঁদুরের টিপ সে আর পরে না। মঞ্জরীর বেশ পূজারিণীর বেশ। লাল চওড়া পাড গরদের শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। মঞ্জরীর মুখখানিতে বিশেষত্ব আছে, টিকলো নাক, আয়ত চোখ, ছোট কপাল, নিটোল মুখ, যার মধ্যে খুঁত নেই, যে মুখ অল্প একটু ভাবনার ছায়া পড়লেই স্বর্গ-স্বপ্নাতুর অথবা ধ্যানমগ্ন বলে মনে হয়, মনে হয় এর মধ্যে চাপল্য নেই, চাঞ্চল্য নেই, বড় স্থির, বড় গভীর, সেই মুখে ওর অতি সহজেই পূজার্থিনীর সংকল্প ফুটে উঠেছে। শোভার ঠোঁটে পানের রস, কিন্তু মঞ্জরীর ঠোঁট দুটি শুকনো। তাতেই ওই স্বর্গ-স্বপ্নাতুর শুচিতাটি আরও স্পষ্ট মনে হচ্ছে।

রীতুবাবু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোনটায় উঠব ?

শোভা একখানা ট্যাক্সিতে একলা রয়েছে পিছনের সিটে, তার পাশে সাজানো রয়েছে পূজার সামগ্রী। সামনে রয়েছে শিউনন্দন। অন্যখানায় প্রোপ্রাইট্রেস আর গোরাবাবু। মঞ্জরীর কোলে ডালাতেও কিছু জিনিস।

শোভা বললে—কোনটাতে কেন আবার ? এইখানাতেই উঠতে আজ্ঞা হোক। পাশে বেমানান হব না। তা ছাড়া—

সে স্বর মৃদু করে একটি রসিকতাও করলে—যা ঠিক প্রকাশ্যে পরিবেশন বা হজম করা যায় না।

পটলীর দিদি হিসেবেই সে রীতুবাবুকে ঠাট্টা করে, নইলে সাধারণ অ্যাক্‌ট্রেসরা সম্ভ্রম করে, ভয় করে রীতুবাবুকে। অ্যাক্‌টররা তাকে বলে মাস্টারমশাই আর বাবু, মেয়েরা বড় অ্যাক্‌টরদের বলে, বাবা আর মাস্টারমশাই। শোভা দলের মধ্যে প্রবীণা এবং নামকরা অভিনেত্রী, তার উপর মঞ্জরী ভালবাসে বলে সাধারণের উপরে। এ ছাড়াও শোভার আদিরসাত্মক রসিকতার

জন্তু খ্যাতি একটা আছে, সেটা সু-ই হোক আর কু-ই হোক। রীতুবাবু কিন্তু বেশ ঝাড়া গলায় সহাস্য মুখে উত্তর দিলে; বললে—শুধু তো বেমানানের ভয় নয় শোভাদি, পথে যে কনেস্টবলে ধরবে। বলবে সরলা অবলা কুমারীটিকে নিয়ে বুড়ো তুই ভাগছিস কোথায়? নাতনী বললে তো ছাড়বে না!

শোভা বললে—মরণ! এমনি উত্তর শুনতেই সে চেয়েছিল।

গোরাবাবু বললে—এটায় আসুন মাস্টারমশাই। গোপালবাবু উঠুন ওটায়। কথা আছে।

রীতুবাবু গোরাবাবুদের ট্যাক্সিতে উঠে বার দুই জোরে নিশ্বাস নিয়ে বললে—আজ যেন ড্রাই মর্নিং মনে হচ্ছে স্যার?

—করব কি? মঞ্জরী দেখুন না, জল খায় নি, পান পর্যন্ত না! কিন্তু ধরেছেন ঠিক।

—এই দেখুন! বাঘের চোখ প্রখর, না নাক প্রখর দেবতা?

—হার মানলুম। নাকই প্রখর। ট্যাক্সিতে উঠে জোরে নিঃশ্বাস নিয়েছেন বটে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ দেবতা। নাকে ধরলুম। কারণ সকাল থেকে আমিও পান করি নি দ্রব্যটি।

ট্যাক্সিটা এসে চিৎপুর হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়াল। ট্র্যাফিক বন্ধ। মঞ্জরী বললে—আপনি ক'দিন এমন ডুব মারলেন, একবার এলেন না। এদিকে উনি যা করছেন, তার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। বই শুরু করেছেন, কমিক অ্যাক্টর ঠিক করেছেন, নতুন লোক, অ্যামেচার থিয়েটারের পার্ট করে। সিনেমাতেও ছোটখাট পার্ট করেছে। সে আবার খোঁজ দিয়েছে এক মেয়ের। সে আবার ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ে নাচে গানে নাকি খুব নাম। আমি কি বলব, বলতে গেলেই রেগে যান। তার উপর যখন বই লেখেন তখন আবার আলাদা মানুষ। গোপাল মামাকে বলেছিলাম, উনি বিপিনকে আপনার ওখানে পাঠাবেন বলেছিলেন। সেও খোঁজ পায় নি।

রীতুবাবু হাসলে—একটু লজ্জিত ভাবেই হাসলে। বললে—হতচ্ছাড়া জীবনের হতচ্ছাড়া কাণ্ড তো! তা নইলে আর নিজেকে জন্তু বললুম কেন! গেলুম এক জায়গায়—ধরে নিয়ে গেল, পুরনো আমলের থিয়েটারের ভূতি ঘোষাল। বললে, রীতু, অনেক দিন আনন্দ করি নি রে, আনন্দ করা। সত্য সত্য তো ফিরেছিস, টাকা আছে তোর এখনও। খুব ভাল সন্ধান আছে আমার। খাতিরের লোক। বললুম, চলুন। গেলুম তো নাগাড়ে তিন দিন। তিন দিন পর ফিরে মন-মেজাজ খুব বিগড়ে গেল। নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এ হচ্ছে কি? কখনও মনে হয় বেশ করেছি, কখনও মনে হয় ছি—ছি—ছি! দিন দুই ঘরে পড়ে রইলুম, তারপর বেরিয়ে পড়লুম। বীরভূম তারাপীঠে আগে আগে যেতাম, অবিশ্যি অনেক আগে। চলে গেলুম সেখানে। বড় পবিত্র স্থান, ভারী জমকালো শ্মশান, তার উপর যুদ্ধের মন্বন্তরে দেশ জুড়ে মড়ক, মাইল দেড় দুই লম্বা শ্মশানটায় শুধু মড়া—শুধু মড়া। তারই মধ্যে পেলুম এক পাগলা সাধুকে। মনে হল সিদ্ধপুরুষ। বসে গেলুম চেপে। বললুম, চরণ তোমার ছাড়ব না বাবা! সাধু বললে, থাক। থাকলুম সা—ত দিন। গাঁজা, মদ দেদার খায়

সাধু। এতটা সইল না, আর কষ্টও অনেক—যাত্রাদলের ছোট আসামীদের থেকেও অনেক কষ্ট! শেষে উঠে পড়লুম। মনে পড়ল তিন দিন পর রথযাত্রা। মঞ্জরী অপেরার যাত্রা শুরু। পরশু এসে পৌছেছি। কাল ঘুমিয়েছি—ঘষেছি মেজেছি, সাবান স্নো মেখেছি। আজ গোল্ডেন মুন হয়ে উদয় হয়েছি।

মঞ্জরী বললে—সাধু কেমন দেখলেন বলুন?

গোরাবাবু হেসে উঠল—একেবারে সিদ্ধপুরুষ! চাল দিয়ে ভাত তো সাধারণ কাণ্ড, ভাত দিলে চাল হয়। যাবে নাকি?

মঞ্জরী ভুরু কুঁচকেই বললে—গেলে তোমার সঙ্গে যেতে বলব না। সাধু কেমন মাস্টারমশাই!

রীতুবাবু বললে—ভাল লোক। তবে হ্যাঁ, সিদ্ধটিদ্ধ কিছু নয়। সে বলেনও মুখে। তবে কথাবার্তা বলেন ভাল। আমি তো আমার সব বললাম। তো বললেন, 'ওরে বাবা, যাতে মন খারাপ হয়, দেহ খারাপ হয়, আর যাতে অন্যজন্যে দুঃখ পায়, তাই পাপ। তা ছাড়া পাপ নেই! আর যাতে পরম আনন্দ তাই পুণ্যি! বাস।

গোরাবাবু বললে—তা হলে বলব ভাল লোক। মানে নিরীহ সাধু!

মঞ্জরী বললে—সাধুর বাবার ভাগ্যি বলতে হবে!

গোরাবাবু বললে—সাধুদের বাবা থাকে না তা জান তো?

মঞ্জরী বললে—না। তারা আকাশ থেকে পড়ে!

—এই দেখ! নামধাম, ঘরসংসার, আত্মীয়স্বজন, একুল ওকুল, ইহলোক পরলোক, জাতধর্ম, পৈতে, কণ্ঠি, সব হোমের আগুনে ছাই করতে হয়, নয় তো গঙ্গার জলে টুপ করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। অনেকটা আমার মত—

—কি বললে?

—বলছি তুমিই আমার সন্ন্যাস গো!

—সন্ন্যাসেরও মরণ—আমারও মরণ। তা সন্ন্যাস তো ছাড়লেই পার!

গম্ভীর হয়ে গভীর কণ্ঠে গোরাবাবু বলে উঠল এবার—ছাড়বার জন্য নিই নি মঞ্জরী। যা পাবার তোমার মধ্যেই পাবো।

একটি ক্ষীণ স্মিত হাসি ফুটে উঠল মঞ্জরীর মুখে। মাথার ঘোমটাটি অকারণেই একটু টেনে দিয়ে সে বললে—থাক ওকথা। এখন মাস্টারমশাইকে বল তোমার কমিক অ্যাক্টরের কথা, কুমারী নায়িকার কথা।

ট্যাক্সি তখন ধর্মতলা পার হয়ে চৌরঙ্গীতে ঢুকেছে। রীতুবাবু উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু ঠোঁটে তার সূক্ষ্ম একটি হাস্যরেখা। মনে হচ্ছে এ দুটি প্রাণীর সুখী জীবনের কথা! আর মনে হচ্ছে গোরাবাবুর শেষ কথা—ছাড়বার জন্য নিই নি মঞ্জরী! যা পাবার তোমার মধ্যেই পাব! এই ধরণের কথা সেও বলত পটলীচারুকে। হাসিটুকু ফুটেছে সেই কথা মনে পড়ে'। বাঁদিকে টাইগার সিনেমার উত্তর পাশে বিলিতী মদের দোকান। পিচবোর্ড কাটা জনিওয়াকারের মস্ত ছবিটা সকৌতুক সমাদরে যেন ডাক দিচ্ছে। রীতুবাবুর

ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে নেমে গিয়ে কোনও বারে গিয়ে ঢুকে পড়ে।

গোরাবাবু তখন বলে চলেছে নতুন আবিষ্কারের কথা।

—ভাল ছোকরা, আপনি দেখবেন মাস্টারমশাই। কথা বললেই বুঝতে পারবেন। ইয়ং ম্যান, ছাব্বিশ সাতাশ বয়েস। লেখাপড়া জানে। নাম ভবেন বোস—কিন্তু ডাক-নামটাকেই নাম করেছে—বাবুল বোস বলেই পরিচয়। সিনেমাতে অল্প দিনেই নাম করেছে। আমার সঙ্গে আলাপ স্টুডিয়োতেই। মহাশক্তি ছবিতে আমাকে নিশুম্ভের পার্ট দিয়েছে। ওর একটা ছোট পার্ট ছিল। আলাপ হয়েছিল। কথায় কথায় বলেছিল, অ্যামেচারে কমিক পার্ট করে বেড়ায়। পাবলিক থিয়েটারে ঢোকার ইচ্ছে, কিন্তু সে হয় নি। আমার সঙ্গে প্রথম কথাই বলে নি। পাশাপাশি বসে অন্যের সঙ্গে কথা বলে, আমার সঙ্গে বলে না। সত্য সিংহ লক্ষ্য করে বললে, একি, আপনাদের আলাপ নেই? ইনি বিজয় চৌধুরী—গোরাবাবু, যাত্রাদলের ভাল অ্যাক্টর, আর ইনি বাবুল বোস। ছোকরা নমস্কার করে বললে, যাত্রাদলের অ্যাক্টিং সেকেলে ব্যাপার—ভাল লাগে না আমার। সেই জন্যে আলাপ করি নি। আমি বললাম, আপনাদের অ্যাকটিং আমার ভালই লাগে। ছোকরা বললে, লাগবেই, আমরা সভান। বলে ঘুরে বসল। তারপর আমার শট হল ছটো। একটা শট ছিল নিশুম্ভ মহামায়ার রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেছে—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—কথা তিনটি—এ কি অপরূপ রূপ!—মহামায়া হেসে বলবে, এ রূপের অন্তরালে আর এক রূপ দেখতে পাচ্ছ না পশু? মৃত্যুরূপ? শট শেষ এইখানে। ছোকরা দেখে বলে উঠল, গুড—গুড—গুড! তারপর শটে মহামায়া সামনে নেই, তার বদলে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুরূপা কালরাত্রি। সে কালো বোরখার মত আলখাল্লা পরা মুখ ঘন চুল দিয়ে ঢাকা, কালরাত্রির মেকআপটা ভাল করেছিল, লাইটিংও খুব ভাল হয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে নাকচে ফ্ল্যাশে দেখা যাচ্ছে মূর্তিটা। দেখে নিশুম্ভ চমকে দু পা পিছিয়ে আসবে, তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আরও প্রবল মোহ ফুটবে চোখে, কালরাত্রি খিল-খিল করে হাসবে, তখন নিশুম্ভ আত্মহারা হয়ে ছুটে যাবে—আর বলবে, ওগো বিচিত্ররূপিণী—এ যে আরও অপরূপ! এই কি অমৃতরূপ! আ-হা-হা! ওইখানেই শূলবিদ্ধ হয়ে পড়বে নিশুম্ভ। ভাল হল। সকলে তারিফ করলে। সকলের শেষে ও এল। মেকআপ তুলছে। এসে পাশে বসল, আমি কোন কথা বললাম না। ইচ্ছে করেই বললাম না। ছোকরা পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে খস খস করে কি সব লিখে আমার হাতে দিলে—নিন স্যার। দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞেস করলাম কি এসব? বলে একটা অঙ্ক। পড়ুন। আচ্ছা দিন আমি পড়ি। মারভেলাস প্লাস ওয়াণ্ডারফুল মানে আপনার আজকের পারফরম্যান্স প্লাস মাইনাস মাই ওল্ড ওপিনিয়ন—অর্থাৎ যা বলেছি তা উইথড্র করছি, ইজ ইকুয়াল টু আপনি বড় এবং সত্যি মর্ডান অ্যাকটর প্লাস আই অ্যাম এ ফুল। বা আই অ্যাম ভেরি সরি। ব্যস, কাগজখানা দিয়েই রাইটঅ্যাবাউট টার্ন। আমি হাত ধরে বললাম, অঙ্ক ভুল। তখন ফিরে দাঁড়াল, বললে, নেভার। অঙ্কতে আমি ভারী স্ট্রং। আমি বললাম, দেখিয়ে দিচ্ছি। কলমটা দিন। বলে আই অ্যাম এ ফুল কেটে লিখে দিলাম আই অ্যাম অলসো এ ভেরী গুড কমিক অ্যাকটর।

আই প্লেড দি পার্ট অফ এ ফুল। তখন হেসে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ইয়েস, অঙ্ক আমার ভুল হয়েছিল। তবে আপনারও একটু ভুল আছে—আই প্লেড দি পার্ট অফ এ ফুলটা ঠিক নয়, ওটা হবে মধ্যাহ্ন সূর্য অপেক্ষাও মধ্যাহ্নের বালুচর অধিক উত্তপ্ত যে নিয়মে সেই নিয়মে যৌবন অপেক্ষা যৌবনের অহঙ্কার অধিকতর ক্ষিপ্ত। ছোকরা ওয়াণ্ডারফুল রীতুবাবু!

মঞ্জরী হেসে বললে—নিশ্চয়; তোমাকে যখন এত ভাল কথা বলেছে।

গোরাবাবু বললে—চিমটি কাটা হল মেয়েদের স্বভাব। তোমাকে ওর সুশোভনের পার্ট দেখাই নি? ভাল বল নি তুমি?

—সে তো এখনও বলছি।

—সে আবার কোথায় দেখলেন?

—নিজেই নেমন্তন্ন করেছিল, একটা অ্যামেচারে প্লে করলে, রঙমহলে—আমাদের কার্ড পাঠিয়েছিল।

—নিয়ে নিন। ওর আর কথা নেই। নতুনের চটক আছে। বুঝেছেন। ধরে গেলে গণ্ডার মেরে পেরিয়ে যাবে। তবে আসবে তো যাত্রার দলে?

—আসবে। বলেছে আমাকে। আজ সন্ধ্যেবেলা আসবে দেখবেন।

—ভেরি গুড। কিন্তু মালটাল খায় তো?

মঞ্জরী বলে উঠল—আপনাদের ওই নইলে চলবে না বুঝি মাস্টার মশাই?

—চলবে না কেন? তবে টিকবে না। দিন স্যার, একটা সিগারেট দিন। সকাল থেকে শুকনোর বাজার, তার উপর কথায় মশগুল হয়ে সিগারেট পর্যন্ত ভুল হয়ে গেছে।

মন্দির এসে গেল। হুঁশিয়ারি সে পাইজা, রথের মেলার ভিড়! ছেলেপিলেগুলো লাট্টু মারবেলের মত ছুটোছুটি জুড়েছে। তারপরে গাছ আর ডিসপোজালের মালের মেলা। কালো-বাজারের পয়সা। হুঁশিয়ারি সে!

গাড়িখানা উজ্জ্বলা পার হয়ে ডানদিকের রাস্তায় মোড় নিল। দু পাশে বাজার বসে গেছে রথের মেলার। একে কালীঘাট—তাতে ১৯৪৪ সাল, ফ্যান আর এঁটোকাঁটার জন্যে যারা কলকাতায় এসেছিল দলে দলে তারা ফুটপাথে মরেছে সারিসারি, কিন্তু তার অবশেষ যারা তারা আর ফিরে যায় নি। তাদের আড্ডার মধ্যে কালীঘাট একটা মস্ত আড়ৎ। দুখানা ট্যাক্সি থেকে গোরাবাবু এবং মঞ্জরীর মত রূপ এবং শ্রীসম্পন্ন দম্পতি, তার সঙ্গে রীতুবাবুর মত দশাসই চেহারার মানুষকে নামতে দেখে ছেঁকে এসে ধরলে—রাজাবাবু, রাণী মা—

গোরাবাবু চট করে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই বড়বাবু আমার দাদা—ওকে ওকে। ওর হুকুম হলে ওই ম্যানেজার—ওই যে মস্ত টাক!

গোপাল ঘোষের মস্ত টাকটা প্রথম প্রহরের আষাঢ়ে রৌদ্রে ঝকঝক্ করছিল।

মঞ্জরী বললে—দেব রে দেব, আগে পূজো দিয়ে আসি। দেব বইকি। শুভ কাজ হবে —তোরা খুশী না হলে মা তো খুশী হন না। দেব। গোপাল মামা, দশ বারো টাকার পয়সা করে নিতে হবে। এ সবে খুঁত রেখে পূজো হয় না।

খুঁত কিছুতেই হল না, ফেরবার পথে রীতুবাবুর জনিওয়াকারও কিনে নিলে শিউনন্দন।

তিন

বিকেল থেকে নতুন খাতা খুলে তার উপর সিঁদুরের স্বস্তিক এঁকে নিচে নাম লেখা হল—মঞ্জরী অপেরা। সন—ইং ১৯৪৪-৪৫ সাল, বাং ১৩৫১-৫২। শুভ মহরৎ রথযাত্রা দিবস—১২ই আষাঢ়। মালিক—শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী ব্রাকেটে চৌধুরী। মূল ঠিকানা—নং ব্রজদাস লেন, আপিস—নং চিৎপুর রোড ব্রাকেটে চিৎপুর গ্রে স্ট্রীট জংশন।

ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিজয় চৌধুরী, অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীগোপাল ঘোষ। তারপরই প্রথম পাতায় প্রথম নাম, শ্রীরীতেন বোস—রীতুবাবু, মাসিক বেতন—। গোপাল কলম থামিয়ে বললে—কত লিখব মাস্টারমশাই? গতবার একশো পচাত্তর ছিল—তাই রাখি?

—রাখুন। বেশী দরকার হলে দাদন নিয়ে নেব। হাসলে রীতুবাবু।

—না। দুটো আঙুল তুলে দেখালে গোরাবাবু।

পাশের চেয়ারে বসে মঞ্জরী হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে—হ্যাঁ।

গোরাবাবু বললে—এবার—লেখ মঞ্জরী দেবী—

শোভা হেসে বললে—হ্যাঁ। তারপর গোরাবাবু শ্রীবিজয় চৌধুরী লেখ।

—নিশ্চয়। তা নইলে তো হিসেব থাকবে না। যাত্রাদলে লাভ হল কত সেটা তো বুঝতে হবে। খাটনির দাম তো লাভ নয়। লেখ—লিখে যাও।

—শোভারাণী দাসী, গোপালীবালা দাসী—কই, নাটুবাবু কই?

শোভার পাশেই বসে ছিল গোপালী, গোপালী বললে—সে তো ফেরে নি এখনও দেশ থেকে!

গোরাবাবু বললে—ঠিক আছে, নাটুবাবু যথাসময়ে আসবেন—নাম লিখুন।

মঞ্জরী বললে—কী গোপালী? দেখ ভাই—

শোভা অঙ্গভঙ্গী করে বলে উঠল—হ্যাঁ দেখ, দামড়া দড়ি ছিঁড়ল কিনা!

গোপালী হেসে উঠল, হাসি গোপালীর রোগ; দলের পুরুষেরা আড়ালে আবডালে ওকে বলে—দেখন-হাসি।

হেসে গোপালী বললে—দামড়া দড়ি ছিঁড়বে? কেন বল শোভাদি!

—ছেঁড়ে নি বুঁচির বেলা?

—সে দামড়া ছেঁড়ে নি শোভাদি, দড়ি নিজেই খুলে পড়েছিল।

—তা বটে।

রীতুবাবু কানে একটা পায়রার পালক চালাচ্ছিল, বললে—ঠিক আছে। গোপালীদের বেলা দামড়াও আছে দড়ির বাঁধনও আছে। তবে হয়েছে কি জান? গোপালীর দড়িটি একটু লম্বা—তাই বাড়িতে গিয়ে দামখতে নেমেছে নাটু দামড়া। সংসারী মানুষ নাটু, স্ত্রী পুত্রদের ভোলে নি। ঘরকন্না করছে। আসবে।

গোপাল বললে—চাষ। মাস্টারমশাই চাষ লেগেছে তার। অদ্ভুত মানুষ—কড়িটারও হিসেব রাখে। আপনি তো জানেন নাটুবাবু সিগারেট খায় না কিন্তু দু প্যাকেট সিগারেট

ঠিক নেবে। জমাবে, আর যারা বেশী খায় তাদের কাছে বিক্রি করবে। যেখানে সিগারেট পাওয়া যায় সেখানে এক পয়সা কম দাম, যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে দু পয়সা বেশী নেয় নাটুবাবু।

গোপালী বললে—তার আর করে কি বলুন। কাচ্চাবাচ্চা ঘরে। ছা-পোষা মানুষ।

গোরাবাবু বললে—লিখুন—নাম লিখুন। মাইনে নাটুবাবুর পাঁচ টাকা, গোপালীর চার টাকা বাড়ল। কি গোপালী?

—তাই লিখুন।

—তারপর বংশী আর আশা।

আবলুসের মত কালো লম্বা ছিপছিপে চেহারা বংশীর। লম্বা টেরি। সে টেরিতে অনেক কারিকুরি। বংশীবদন দাস, বিখ্যাত ড্যান্সিং মাস্টার। মাথায় বোতল রেখে, গেলাসে জল রেখে মাথায় নিয়ে নেচে প্রথম জীবনে নাম করেছিল। সঙ্গিনী ও প্রণয়িনী আশাও তার যোগ্য জুটি। বংশীর প্রথম নাম ছিল হাবসী বংশী, সে তার এই রঙের জন্য। জীবন শুরু করেছিল ভাড়াটে ড্যান্সিং ব্যাচের নাচিয়ে হিসেবে। কণ্ঠস্বর ছিল মেয়েদের মত। নিতান্তই পথের কুড়নো ছেলে। এই ড্যান্সিং মাস্টার কুড়িয়ে তাকে মানুষ করেছিল। লোকে জন্ম জাত সম্পর্কে অনেক কথা বলে। ছেলেবেলা থেকেই শুনে শুনে সে সব তার সয়ে গেছে। লেখাপড়া ঠিক জানে না, বানান করে পড়ে, কোনরকমে সই করে। কিন্তু বড় শৌখীন লোক। জামা কাপড় জুতোতে ফিটফাট তার, সব থেকে বাহার তার টেরি। সব সময় পকেটে মদের শিশি তার বিড়ির মত প্রয়োজনীয়; রুমাল না থাকলে চলে বংশী মাস্টারের, পাঞ্জাবীতে কোঁচায় মুখ মোছে, (আজকাল আর কোঁচা নেই, পাজামা পরছে, কাপড় পরলে তা কোঁচাহীন আধুনিক আফগানি পাজামার ঢঙে পরে) কিন্তু ওই শিশিটা না থাকলে তার চলে না। আজও ওই নতুন আপিসে এসে অবধি বার দুই উঠে গিয়ে খেয়ে এসেছে। আশা তার যোগ্য সঙ্গিনী—রূপ আশার নেই, বয়সও হয়েছে, পঁয়ত্রিশের উপর হয়তো, কিন্তু ছিপছিপে শীর্ণ দেহখানি তার বয়স ধরতে দেয় না; রঙ মাখলে ষোল সতেরো বছরের তরুণী দেখায়। কবে কোন লগ্নে ওদের দুজনের দেখা হয়েছিল সে শুধু ওরাই জানে। লোকে নানান কথা বলে। একদল বলে, আশা থাকত বস্তিতে, তখন সে তরুণী, বংশীর সঙ্গে শুভলগ্নে দেখা হয়েছিল, তারপর বংশী অবসর পেলেই ছুটে যেত আশার ঘরে। কিন্তু সে ঘরে শুধু আশারই বাসা ছিল না, বস্তির এক বাঘেরও আস্তানা ছিল। কথাটা হয়তো ঠিক হল না। বস্তির এক বাঘ মধ্যে মধ্যে সে ঘরে এসে আস্তানা গাড়ত। সে যখন আস্তানায় থাকত তখন একমাত্র বস্তির সামনের পানবিড়ির দোকানের ছোঁড়া আর বাঘের শাগরেদ দু-একজন ছাড়া কেউ ঢুকতে পেত না; পুলিস এলে বাইরে থেকে সিগন্যাল দিত পানের দোকানের ছোকরা, সেই সিগনালের ইশারায় বাঘ পালাত। পুলিস ছাড়া অন্য কোন লোক এলে দোকানের ছোকরা সাবধান করে দিত—না যানা বাবা। হুঁয়া বাঘ আছে। বংশীকেও সে সাবধান করে দিয়েছিল—নেহি যানা মাস্টার। বাঘ আছে। আজ সকালে এসেছে। এখুন দু-চারদিন ইধ্‌রে এসো না। কিন্তু বংশী তা শোনে নি।

বাঘ ভালুক সাপ যাই থাক, আশার মুখ তাকে দেখতেই হবে। ঝগড়াঝাঁটি সে করবে না, সে হাত জোড় করে বলবে, বাঘ, তুমি দোস্ত আমার। তুমিও থাক, আমি এক পাশে বসে থাকি। গান শোনাব, নাচব—দেখ না কেমন জমিয়ে দিই। কিন্তু বাঘ—সে বাঘ। সে মানে নি, থাবা বসিয়ে দিয়েছিল। চড়-চাপড়েও যখন ভয় পায় নি বংশী, গালিগালাজেও রাগ করে নি তখন সে ছুরি মেরেছিল, এবং মুহূর্তে উধাও হয়েছিল সে আস্তানা থেকে। বংশী পড়ে গিয়েছিল, মরে যাওয়ারই কথা—কিন্তু আশা তাকে বাঁচিয়েছিল। স্থান ও পাত্রের বিচারে বস্তিবাসিনী আশার আহুত বংশীকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করবার কথা। তা সে করে নি। বংশী পড়ে ছিল দরজার বাইরে গলিতে, সেখান থেকে ঘরে তুলে এনেছিল, ডাক্তার ডেকেছিল, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছিল এবং নিজেই তার সেবা করেছিল অক্লান্তভাবে। পুলিস কেস একটা হয়েছিল, তাতে বংশী বলেছিল, ছুরি তাকে কে মেরেছে তাকে সে জানে না, চেনে না। সে আশার ঘর থেকে বের হয় নি, আসছিল ওপাশ থেকে। বাঘ ছিল ষাঁড়ের মত সবল মানুষ। বংশী বলেছিল, লোকটা রোগা-পটকা। হঠাৎ বললে, টাকা নিকালো। সে দেয় নি, তার বাঁ হাতটা চেপে ধরেছিল, সে খপ করে ডান হাতে ছুরি বের করে মেরে পালাল। গলিতে পড়ে সে চেঁচাচ্ছিল, সকলে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল, আশা তার ঘরের দরজা খুলে তুলে নিয়ে বাঁচিয়েছে। কাজেই কেসটা পড়েছিল চাপা। তার পরদিনই বংশী তাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল নিজের আস্তানায়, সেটাও বস্তি, তবে একটু উঁচু স্তরের। তবে উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণে। সারকুলার রোডের ধারে তেল কল এলাকার বস্তি থেকে কালীঘাটের গঙ্গার ধারে ইট এবং সুরকি কলের এলাকায়। এলাকাটায় বংশী মাস্টারের নামডাক ছিল। গুণ্ডা হিসেবে নয়—মাস্টার হিসেবে। হাজরার মোড়ে মেথর পাড়ার ধারে পাকা বাড়ি থেকে শুরু করে পটোপাড়ার বস্তিতে বংশী মাস্টারের অনেক ছাত্রী ছিল—তারা নাচ গান শিখত তার কাছে। শুধু ওদের বাড়িতেই নয়, কালীঘাটের দু-তিনটি অ্যামেচার যাত্রার দলেও বংশী মাস্টার মাস্টারি করেছে অবসর সময়ে। এখানেই ছিল তার বাসা। আশাকেও সে গান নাচ দুই শিখিয়েছিল। তখন সে শ্রীধর থিয়েট্রিকেল যাত্রাপার্টিতে ড্যান্সিং মাস্টার। সখীর দলের ছেলেদের তালিম দিত আর নিজে পালার মধ্যে মধ্যে কখনও ব্যাধ, কখনও লক্কা পিয়ারা, কখনও মাতাল সেজে এসে এক একটা নাচ দিয়ে যেত। কখনও সখীর দলের বড় এবং সব থেকে পাকা নাচিয়ে ছেলেটার সঙ্গে ডুয়েট নাচত। তখন আজকালকার মত টুকরো নৃত্য-নাট্যের চলন হয় নি। নাচের সঙ্গে গান থাকত। এ সবে বংশী মাস্টারের নাম ছিল খুব। রোজগারও ছিল ভাল। তখনকার দিনে মাইনে ছিল ষাট টাকা। এক বাক্স সিগারেট, এক বাণ্ডিল বিড়ি, একটা দেশলাই—রাতের খোরাকি আট আনা। চাকরিটা ছাড়তে পারে নি, আশাও ছাড়তে দেয় নি। চাকরি শুধু টাকার জন্যে নয়—সে কথা অন্যে না মানুক বংশী মানে আর তার অন্তর্যামী জানে আর আশাও জানে। যাত্রা-দলের ড্যান্সিং মাস্টার—এর থেকে বড় খাতির সে কোথায় পাবে? কুড়নো ছেলে হলেও তার পরিচয় সবাই জানে। তার মা সুন্দরবন অঞ্চল থেকে ভিক্ষে করতে এসেছিল। অস্পৃশ্য—যাদের অন্ত্যজ জাত বলে তাদেরই যুবতী মেয়ে। তারপর এখানেই কোন পুলের তলায়

তলায় জন্মেছিল। তার গায়ের রঙ তার সাক্ষী। যাত্রার দলে ঢুকেও সে খাবার সময় একলা একপাশে বসে খায়; কিন্তু আসরে সে ড্যান্সিং মাস্টার বলে খাতির পায়, বসতে পায়। ছোট সখীর ব্যাচের ছেলেগুলো তাকে মাস্টারমশাই বলে। যারা তার জাতের কথা জানে না তারা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে আসে। তাছাড়া পালাগানের রাত্রিগুলি আশ্চর্য স্বপ্নের রাত্রি। সে-স্বপ্ন এতদিনেও পুরনো হয় নি—দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয় না। এ কি ছাড়া যায়? আশাকে ওই ঘরে রেখে ছ-মাসের ঘর ভাড়া দিয়ে বলেছিল, যেন চলে যাস নি আশা। ঘর ভাড়া দিয়ে গেলুম। তোকে গান নাচ শিখিয়েছি, চেহারাতেও চটক আছে—দিন তোর সুখে না যাক দুঃখ হবে না। শুধু কারুর সঙ্গে বাঁধাবাঁধি করে চলে যাস নে। দল থেকে ফিরে এসে যেন পাই তোকে।

আশাও সে কথা রেখেছিল। সত্যসাধ্বী সে নয়—সে দেহব্যবসায়িনী এবং বংশীর মতই তার জীবনের ইতিহাস। সেও ছোট জাতের মেয়ে তবে তার বাপ মায়ের একটা সংসার ছিল—সমাজ ছিল, পল্লীগ্রামের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল পল্লীগ্রামে, দেখতে চিরকালই সে কিশোরী মেয়ের মত—বেঁটে, ফরসা, তার উপর ছিল একটা চটক। পল্লীগ্রাম থেকে গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে কলে খাটতে। সেখান থেকে স্বামী পালাল একজনকার স্ত্রীকে নিয়ে—অনাথা আশাকে সুখের প্রলোভন দেখিয়ে একজন নিয়ে এল কলকাতার বাগবাজারের খালধারের বস্তিতে, সেখান থেকে তার চটকের জোরে সারকুলার রোডের বস্তিতে। সেখানে দেহের ব্যবসায়ে দিনরাত্রি ছিল না। কিন্তু সে তার সয়ে গিয়েছিল। এই পৃথিবীর এইটেই নিয়ম—এই ধারণাই হয়েছিল বদ্ধমূল। লাগতও বেশ। প্রেম ভালবাসা ঘরসংসার এ নিয়ে কোন কামনা বা কল্পনাও ছিল না, শুধু একটি কল্পনা ছিল—সে কল্পনা তার জীবনক্ষেত্রের অলকাপুরী নিয়ে, সোনাগাছিতে একখানি সাজানো-গোছানো ঘরের সাধ তার ছিল। সোনাগাছি চিৎপুর সে বেড়াবার ছলে দেখে এসেছে; এক আশ্চর্য স্বপ্নপুর মনে হয়েছে তার। এ ছাড়া কোন সাধ তার ছিল না—আর কোন কিছু সাধের জিনিস থাকতে পারে এও তার ধারণা ছিল না। হঠাৎ জীবনে এল বংশী মাস্টার। আশ্চর্য বংশী মাস্টার—আবলুসের মত রং, ছিপছিপে পাতলা বংশী মাস্টার গান গাইলে, পকেট থেকে ছোট বাঁশের বাঁশি বের করে বাজিয়ে শোনালে—নিজে গান গেয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে তার ঝমঝমানো সেই বাড়ির ঘরেই তার স্বপ্নলোকের সুর ফুটিয়ে তুলে তাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। অন্য ঘরের মেয়েরা অবাক হয়ে শুনেছিল। পরদিন ভালমন্দ নানান কথার মধ্যে আশা পুলকিত চিত্তে অনুভব করেছিল যে, তার কালকের রাত্রির ভাগ্যের জন্য হিংসে সবারই হয়েছে। সে পথ চেয়ে ছিল এই কালো মানুষটির। মানুষটি ঠিক এসেছিল সন্ধ্যেবেলা। এমনি করে দিনের পর দিন চলতে চলতে বাধ এল একদিন, ঢুকল তার ঘরে। আশাই ওই পানের দোকানের ছোকরাকে বলেছিল, তুই বারণ করিস। বুঝিয়ে বলিস। কেমন? আট আনা পয়সাও দিয়েছিল তাকে। তবু সে এল। ছুরি খেলে। আশা সেবা করে ভাল করতে গিয়ে আরও ভালবাসলে বংশীকে।

এ ভালবাসার স্বাদ আলাদা, মানুষকে সেবা করে বাঁচালে তার উপর নিজের একান্ত আপন

বলে একটা দাবী আসে, আবেগ আসে এর মধ্যে। তারপর বংশী তাকে নিয়ে কালীঘাটে এসে তার ঘরে সংসার পাতলে। তাকে নাচ শিখিয়ে গান শিখিয়ে নতুন জাত দিলে, নতুন চেহারা দিলে, আশা বিকিয়ে গেল। তাই বংশী যাত্রার দলের ড্যান্সিং মাস্টার হয়ে বাইরে গেলে দেহব্যবসায় করে জীবনধারণ করেও তার জন্যে পথ চেয়ে থাকত। একবার আশা বলেছিল, দেখ, ও-কাজ আর করব না। ভাবছি ভাল ঘর দেখে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করব। বংশী বলেছিল,—না—না—না। ঝি-গিরি করবি কি? না—না—না।

—তাতে আমার মান বাড়বে। মান খাটো হবে না।

—উঁহু, উঁহু। নাচ গান সব ভুলে বসে থাকবি। উঁহু। সে হবে না। সে সইবে না আমার।

এই সময়েই পাঁচ বছর আগে মঞ্জরী অপেরা মেয়ে-যাত্রা খুলছে—খবর পাওয়া মাত্র বংশী ছুটে গেল—এবং আশা সমেত দুজনের চাকরি নিয়ে ফিরে এল। আশাকে বললে, ব্যস—যা চাইছিলাম মনে মনে তাই পেয়েছি। চাকরি দুজনের একসঙ্গে। দুজনে মিলে নাচব। ড্যান্সিং পেয়ার।

বংশী ব্যাধ সাজে, আশা ব্যাধিনী। বংশী সাজে লক্কা পিয়ারা, আশা মেয়ে লক্কা পিয়ারু। বংশী সাজে বান্দা, আশা বাঁদী। বংশী গোয়ালা, আশা গোয়ালিনী। বংশীকেই এসব আবিষ্কার করতে হয়। যাত্রার পালার প্রথমেই সখীর ব্যাচের গান হয়। তারপর অঙ্কের বিরতিতে কনসার্ট বাজনার পরেই এমনই এক একটা নৃত্যগীত। মঞ্জরী অপেরার প্রথম বছর বংশী মাস্টার আশাকে নিয়ে প্রথম নাচ দিয়েছিল—আলিবাবার বান্দা বাঁদীর নাচ ও গান।

> আয় বাঁদী তুই বেগম হবি—আমি বাদশা বনেছি।
> বাদশা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি।

সত্যি সত্যি ঘুঙুরের বাজনায় ঝম্‌ঝমাঝম্ তুলে দিয়েছিল ওরা, জমিদার বাড়ির পুরনো সতরঞ্চির ধুলো উড়ে গোটা আসরটার উপর হেজাকবাতির সাদা উজ্জ্বল আলোয় একটা কুয়াশার মত আবরণে ঢেকে দিয়েছিল। এমন জোর পাক খেয়েছিল যে আসর থেকে বের হবার সময় অনভ্যস্ত আশা টলে পড়ে যাবার ভঙ্গী করেছিল; পাকা নাচিয়ে বংশী তাকে ধরে না ফেললে পড়েই যেত। আসর থেকে বেরিয়ে এসে সাজঘরে ঢুকবা মাত্র গোরাবাবু বলেছিল, বহুৎ আচ্ছা!

রীতুবাবুর সঙ্গে বংশীর পরিচয় অনেকদিন থেকে; রীতুবাবু যখন যাত্রায় ঢোকে তখন বংশী কিশোর—তখনও মেয়ে সেজে নাচত; রীতুবাবু বংশীকে তুই বলে। রীতুবাবু তাকে ডেকেছিল, বংশী শোন্।

বংশী কাছে যেতেই গ্লাস হতে দিয়ে বলেছিল, নে—খা।

বংশী লজ্জিত হয়েছিল। যাত্রার দলে মদ শতকরা নব্বই জন খায়, বংশীর তো কথাই নেই। সে সুরু করে সকাল থেকে। যাত্রার দলের মধ্যেই হোক আর ছুটিতে ঘরেই হোক মদ সে সকালে উঠেই এক ডোজ খায়। তারপর তার ঝোঁকটা কমতে কমতে আবার এক ডোজ। স্নানের আগে এক ডোজ। খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দিয়ে ফের এক ডোজ; সন্ধ্যের

পর থেকেই ভোজের পর ভোজ ; যতক্ষণ না ঘুমোয়। পালা গাওনার সময় তো কথাই নেই, শেষ হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যায়। আশাকেও সে শিখিয়েছে খেতে। তবু রীতুবাবু যাত্রার জগতে মান্যের লোক, মাস্টারমশাই, বাপ-জেঠার থেকেও গুরুজন ; সে সামনে পড়লে বোতল গেলাস ঢাকা দেয়, সেই রীতু মাস্টারমশাই মদের গেলাস হাতে তুলে দিতে লজ্জা পেয়েছিল অনেক। কিন্তু এর থেকে বড় সম্মান আর হয় না। সে রীতুবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে একটু সরে যাবার উদ্যোগ করেছিল, কিন্তু রীতুবাবু বলেছিল, না রে ব্যাটা, সামনে খা। আড়ালে তো নিজের বোতল থেকে খাচ্ছিসই। আমি দিলাম—সামনে খেতে। খা।

গেলাসটা উঁচু করে তুলে ধরে বংশী আলগোছে পানীয়টুকু মুখে ঢেলে দিয়েছিল। রীতুবাবু জাতে কায়স্থ, সে অন্ত্যজ। তাঁর গ্লাস কি সে এঁটো করতে পারে !

শুধু মদ নয়, মদ শেষ হতেই গোরাবাবু সিগারেট দিয়েছিল তাকে, নাও, খাও।

কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল বংশী। যাত্রাদল বিচিত্র ক্ষেত্র তখনও পর্যন্ত। একদিকে জগন্নাথ ক্ষেত্রও বটে—অন্যদিকে স্মৃতিতীর্থের টোলও বটে। যাত্রার গাওনার আসরে অজ্ঞাতজাতিকুল বংশী মান্যের লোক ড্যান্সিং মাস্টার, সাজঘরে তার সাজবার জায়গা বড় অ্যাকটরদের পাশেই, কিন্তু খাবার জায়গায় গবেট বামুন অ্যাকটর যার মাইনে তিরিশ টাকা, তার খাতির বেশী। সেখানে সে লোকটা মাছের খানা পাবে, ভাল জায়গায় বসবে ; বংশী সেখানে একপাশে একলা বসে। মেয়েদের জায়গাতেও আশার ঠাঁই আলাদা। ও যে নিচু জাতের মেয়ে সেটা জানা হয়ে গেছে। যাত্রাদলের বাসাতেও একটু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকতে হয় বংশীকে। তাই রীতুবাবু নিজের হাতে নিজের গেলাসে মদ দেওয়াতে এবং খোদ গোরাবাবু নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেট দেওয়াতে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন ম্যানেজার গোপালবাবু তাকে বলেছিল, কাল তোর নাম নোট হয়ে গিয়েছে বংশী।

তার অর্থ বংশী জানত। মাইনে বাড়া। যাত্রাদলের অধিকারী (আগে প্রোপ্রাইটার প্রোপ্রাইট্রেস ছিল না।) মশায়ের নোটবই থাকে। তাতে যে লোকের নাম ওঠে তার মাইনে বাড়ে। আগে এক টাকা দু টাকা ছিল মাইনে বাড়ার রেট। বড় অ্যাক্টরের পাঁচ টাকা।

বংশী গোপাল ঘোষকে প্রণাম করে বলেছিল, কত্তা গিন্নীর ধনেপুতে লক্ষ্মীলাভ হোক, মঞ্জরী অপেরার জয়জয়কার হোক। কিছু হুকুম হয়েছে না কি ?

—হয় নি, হবে। তবে নোট হয়েছে। কাল নাচে খুব খুশী। রীতু মাস্টারমশাইকে পেণাম করিস—তিনি করিয়েছেন। তোর দু টাকা—আশার এক টাকা তো হবেই।

বংশী বলেছিল, মাইনে বাড়ুক আর না বাড়ুক বাবু, দল থাকুক, আর আমাদের চাকরিটা থাকুক। এইতেই খুশী ম্যানেজারবাবু। বোঝেন তো সব !

তা বোঝে গোপাল ম্যানেজার। গোপালের যাত্রাদলের চাকরি তখন পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেছে। কত দলই না ঘুরল। তারও যাত্রার দলের জীবন—বংশীর মত। সে ঢুকেছিল নাচিয়ে ডালিমের টানে।

নাচিয়ে ডালিম !

সে সব কথা তার মনে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

হুগলী জেলায় বাড়ি, কায়স্থ বংশের ছেলে। চেহারাখানি ভাল ছিল, যেমন তেমন ভাল নয়—সুপুরুষ। বুদ্ধিও ছিল, লেখাপড়ায় ছেলেবয়েসে সুনাম পর্যন্ত ছিল; কিন্তু যে একটি ভূত বা প্রেত বা বাউণ্ডুলে বিবাগী এই সব মানুষের অন্তরে থাকে সে হঠাৎ জেগে বসে সংসারী সত্তাকে ঠেলে ফেলে জীবনের মসনদ দখল করে বসল একটি বাঁশের বাঁশী হাতে পেয়ে। গোপাল গান গাইতে পারত না, কিন্তু তাল-মানটা বুঝত এবং যেখানে গান বাজনা হত সেখানেই গিয়ে জুটত। কোথাও বাইরে দাঁড়িয়ে শুনত—কোথাও বা মজলিসের এক পাশে ঠাঁই করে নিত। ছেলেবেলা থেকেই যাত্রার আসরের সামনে বসত সন্ধ্যেবেলা থেকে, এবং পান ছুঁড়ে দিয়ে সখীর দলের ছোকরাদের সঙ্গে ভাব করত। ছেলেবেলায় স্কুলের খাতাতে পশুপতি সরকার, বিভূতি কর্মকারের নাম কত বার যে লেখা আছে তার ঠিকানা নেই। স্কুলে যখন থার্ড ক্লাসে পড়ে তখন মহেশপুরের মেলায় গিয়ে কিনে এনেছিল এক বাঁশের বাঁশী। তারপর সেই বাঁশী তার জীবন জুড়ে বসল। পড়াশোনা সব গেল, কিন্তু বাঁশীটা বাজাতে শিখল। তারই সঙ্গে সঙ্গে জাগল এক স্বপ্নলোকের নেশা। সেই নেশায় স্বপ্নলোকের সন্ধানে জ্যোৎস্নালোকিত মাঠে গিয়ে গভীর রাত্রে বাঁশী বাজাত। বাঁশী বাজানোটা শিখল—কিন্তু দুর্ভাগ্য গোপালের—স্বপ্নলোকের আবছা আভাস ছাড়া সঠিক ঠিকানা মিলল না। ওদিকে স্কুলের বাকী তিন বছরের পড়াটা পাঁচ বছরেও শেষ করতে না পেরে সেবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করে পড়া ছেড়ে দিলে। তারপর স্বপ্নলোকের আভাসটুকুও কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে হল—ঝপ করে কোথা থেকে একটা কালো পর্দা সামনে ঝুলে পড়ে সব ঢেকে দিল। বাড়ির অন্ন তিক্ত হল বাপমায়ের গঞ্জনায়। বেচারা গোপাল নিরুপায় হয়ে যে বিদ্যে আয়ত্ত করতে পারে নি সেই বিদ্যা নিয়ে দোকান খুললে—পাঠশালা খুলে বসল। সে আমলে দুটো ব্যবসা ছিল—সস্তা ব্যবসা—গোপালদের মত ব্যক্তির পক্ষে। এক মাস্টারী বা পণ্ডিতী আর এক হোমিওপ্যাথিক বাক্স এবং কুইনিন ম্যাগসাকাফ ক্যাস্টর অয়েলের শিশি ও একটা স্টেথেসকোপ নিয়ে ডাক্তারী। গোপাল প্রথমটাই বেছে নিয়েছিল। গোটা বারো টাকা হত। আর কিছু সিধের চাল ডাল। বাপ মা বিয়ে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু বিয়ে গোপাল করে নি। বাপ মাকে বলত, খাওয়াব কী? বন্ধুদের বলত, বিয়ে করব কাকে? ওই ভাবনা যেদিন ভাবতে বসত সেই দিন রাত্রে বাঁশী বাজাত এবং সেই দিন কালো পর্দাটা উঠে জেগে উঠত সেই স্বপ্নলোকের আভাসটি। এমন রাত্রে কত দিন স্বপ্ন দেখেছে ছেলেবেলায় যাত্রাদলের রাজা, রাজকন্যা এবং সখী—এরই মধ্যে হঠাৎ এক ক্রোশ দূরের বর্ধিষ্ণু গ্রামে এল মেয়েযাত্রার দল। তখন প্রোপ্রাইট্রেস নয়—মালিক অথবা স্বত্বাধিকারিণী—ত্রৈলোক্যতারিণী। সেই যাত্রা শুনতে গিয়ে গোপালের মনে হল—এই তো তার সেই স্বপ্নলোক! যে স্বপ্নলোকের আভাসই সে অনুভব করেছে কিন্তু ঠিকানা পায় নি! এই তো! তখনও হেজাকবাতি ওঠে নি, তখন কারবাইডের আমল; সেই কারবাইডের উজ্জ্বল ঝলমলে আলোয় সে যাত্রার আসর নয়—সে যেন একটা জগৎ। স্বপ্নজগৎ, স্বর্গজগৎ যাই হোক। ওই আলো—তার সঙ্গে বাদ্য-যন্ত্রের সংগীত; এরই মধ্যে ঝকমকে পোশাকে পেন্টের রঙে আঁকা ভুরুতে চোখে, রাঙানো

ঠোঁটে অপরূপ মানুষের মেলা, মেয়ে পুরুষ যেন অপ্সর-অপ্সরী কিন্নর-কিন্নরী—হাসে কাঁদে নাচে গায়। কি অপরূপ ভাষা! কি মনোরম ভঙ্গি! কি বিলোল চাহনি! কি আলাপ! কি প্রাণস্পর্শী বিলাপ! যন্ত্রসংগীতের সুরে ঝংকারে সুখদুঃখের কি অপরূপ প্রকাশ! এতকাল পর্যন্ত যে স্বপ্নলোকটির অস্তিত্ব এবং প্রকাশ ছিল আভাসে—সেদিন সেই কল্পলোকটির সামনের আবরণ উঠে গিয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার সামনে। শুধু তাই নয়, পালা আরম্ভের প্রথমেই নাচিয়ে ডালিম নর্তকীর সাজে সেজে এসে দাঁড়াল, একটু হেলে দাঁড়াল; মুখটি ঈষৎ বাঁকিয়ে—যেন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে গাইলে—

ওই নীল উজ্জ্বল তারাটি!

কিবা অমিয় মাখানো হাসিটি—স্নিগ্ধ কিরণ ধারাটি—।

ওই ওতেই গোপাল হারিয়ে গেল। গোপালের মনে হল উল্টো। মনে হল এতদিন সে তার আপন ভুবন থেকেই হারিয়ে গিয়ে কোন অজানা অচেনা ভুবনে মনের কষ্টে কাল কাটাচ্ছিল, আজ হঠাৎ খুঁজে পেলে তার সেই আপনার চেনা জগৎ, চেনা মানুষ। তার মধ্যে ওই নাচলে যে মেয়েটি সেই মেয়েটিই তার চিরকালের আপন জন। বাপ মাকেও পর মনে হল। মনে হল ছেলেবয়সে হারিয়ে গিয়ে সে এই বামুন পাড়া কায়েত পাড়া বড়লোক গরীবলোক অভাব অনটন পাঠশালা ইস্কুল পরীক্ষা চাকরি-সর্বস্ব এই পৃথিবীর পথে সেই ঘুমপাড়ানী ছড়ার কথার কত পথের ধুলো গায়ে মেখে মা-মা বলে কাঁদছিল—এই মা তাকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আজ তার ভুল ভাঙল। ভুল যখন ভাঙল তখন গোপাল আর ভুলের পথে ফিরল না। দুদিন পর যাত্রার দল গাওনা সেরে স্টেশনে এসে গাড়িতে চড়ল, সঙ্গে সঙ্গে গোপালও গাড়িতে উঠল। পকেটে পাঠশালার পণ্ডিতীর উপার্জন কিছু ছিল আর ছিল বাঁশীটা। দিন সাতেকের মধ্যে দলের পাশে পাশে ঘুরতে ঘুরতেই ভিতরে ঢুকে গেল। এমন একটা রূপবান ছেলে দলের পাশে পাশে ঘুরছে সেটা মালিক ত্রৈলোক্যতারিণীর নজর এড়াল না। সে তাকে ডেকে বলেছিল, কি গো ছেলে? কোথায় বাড়ী তোমার? দেখছি তো আজ কদিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছ। কেন বল তো বাপু?

গোপাল চুপ করে ছিল, উত্তর দিতে পারে নি।

ত্রৈলোক্য জিজ্ঞাসা করেছিল, কি নাম? কি জাত? কোথায় বাড়ি?

গোপাল মাথা হেঁট করে বসে শুধুই মাটির উপর নখ দিয়ে দাগ কেটেছিল। একটা কথারও জবাব দেয়নি। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ একসময় গোপাল ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে তার পায়ে ধরে বলেছিল, আমাকে আপনাদের দলে নিন। যা দেবেন আমাকে।

তারপর সব পরিচয় দিয়েছিল, ঠিকঠিকই দিয়েছিল—শুধু একটু মিথ্যে কথা বলেছিল, বলেছিল মা নেই। বাবা আবার বিয়ে করেছে, সৎমা বড় যন্ত্রণা দেয়। এই কথাটুকুতেই গলে গিয়েছিল ত্রৈলোক্যতারিণী। সৎমা কষ্ট দেয়! এটা সর্বকালে সর্বদেশে এমন নিষ্করুণ সত্য যে মমতায় বেশ একটু অভিভূত হয়েই ত্রৈলোক্য মা বলেছিল, তাহলে তুমি থাক বাবা। চেহারা ভাল—সুন্দর চেহারা। এর উপর বচন ভাল হলে হিরো হয়ে যাবে। বক্তৃতা আসে?

গোপাল আর মিথ্যে বলে নি—বলেছিল, কখনও তো করিনি বক্তৃতা। তা সবাই পারলে আমি পারব না কেন ?

হেসে ত্রৈলোক্যতারিণী বলেছিল, তা পারে না বাবা। সবারই হয় না। গানও কি সবার হয় ?

গোপাল বলেছিল, গান আমি বুঝি। গাইতে পারি না, বাঁশীতে বাজাতে পারি। বাঁশের বাঁশী ভাল বাজাতে পারি মা।

গোপালের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। বক্তৃতা সে পারে নি, তবে চেহারা ভাল ছিল বলে উজ্জ্বল দৃশ্যে নারায়ণ কৃষ্ণ শিব সাজত। বাজাত বাঁশী। এরই মধ্যে গোপাল নাচিয়ে ডালিমকে জিতে নিয়েছিল। ডালিমের ভালবাসার মানুষ দল ছেড়ে চলে গেল! ডালিমের সঙ্গে ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে তার চাকরি অক্ষয় হয়ে গেল। নিজেরও গুণ ছিল গোপালের—সেটা বাঁশী বাজানো নয়, দলের কাজকর্ম চালানো এবং দেখাশোনার ক্ষমতা। সেকালে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া ছিল, পাঠশালায় পণ্ডিতিও করেছিল। দলের লেখাপড়ার কাজ, খাতা লেখা, পার্ট লেখা এইগুলি বেশ চমৎকার করত। তার উপর বাইরে ইস্টিশানে ট্রেনে পথেঘাটে কথাবার্তা বলা—সে অল্পস্বল্প ইংরিজী হলেও বেশ চালিয়ে দিত। একবার এক ফিরিঙ্গী গার্ড সাহেবের সঙ্গে ঘুষ নিয়ে ইংরিজীতে এমন ঝগড়া করলে যে ঘুষ না দিয়েই কাজ উদ্ধার হয়ে গেল। তখন ত্রৈলোক্যতারিণী খুশী হয়ে বললে, গোপাল, তুই বাপু দলের ম্যানেজমেন্টটা দেখ্। বাঁশী বাজিয়ে তো অকালে বুক ঝাঁঝরা করবি—তার থেকে এই কর।

সেই অবধি গোপাল ম্যানেজারি করছে।

ত্রৈলোক্যতারিণীর দল আট বছর পর গাওনা করতে বেরিয়ে শাল নদীতে পুল ভেঙে ট্রেন পড়ে গিয়ে শেষ হয়েছিল। কিন্তু গোপালের ভাগ্য, ডালিমের হয়েছিল নিউমোনিয়া, সে থেকে গিয়েছিল শেষ গাওনার জায়গা বর্ধমানে। প্রাণে বেঁচে গোপাল ডালিমকে কলকাতায় নিয়ে ফিরেছিল এবং সাঁতরা কোম্পানীতে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারিও পেয়েছিল। কিন্তু মেয়েযাত্রার দলের অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। ডালিমকে কলকাতায় রেখে তাকে সাত আট মাস কাটাতে হত বাইরে-বাইরে।

ঘরে স্ত্রীপুত্র ফেলে চাকরির খাতিরে বাইরে থাকে চাকুরেরা সবাই; মেয়েছেলে নিয়ে বাসা আর কজনে করতে পারে! কিন্তু সে থাকা আলাদা। স্ত্রী সেখানে থাকে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। স্ত্রীর ধর্ম আলাদা। কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ আলাদা। ডালিমের ধর্ম আলাদা, সমাজ আলাদা; সেখানে তাকে ছেড়ে গিয়ে ফিরে এসে পাওয়া যায় না। কিন্তু ডালিমের জন্যে সে ঘর ছেড়েছে, মা বাপ ছেড়েছে; সেই ডালিমকে হারাবার চিন্তায় প্রথম প্রথম তার মনে অস্বস্তির সীমা ছিল না। কিন্তু যাত্রার দলও সে ছাড়তে পারে নি। যাত্রার দলের হাজার কষ্ট হাজার অসম্মান সত্ত্বেও তারই মধ্যে সে কল্পলোকের স্বাদ পেত। কোনক্রমে সেটা সয়ে গিয়েছিল। যাত্রার দলে ঘোরার পালা শেষ করে এসে সে ডালিমের ঘরে মাস চার-পাঁচের সংসার পাতত। সে সময়ের জীবনটা তার সত্যই স্বপ্নের জীবন। তার পর সাঁতরা

কোম্পানী থেকে মথুরশা, সেখান থেকে সত্যম্বর অপেরা, গণেশ অপেরা—বলতে গেলে বড় বড় সব দলেই চাকরি সে করেছে। তারপর মরল। ডালিম মরবার সময় তাকে তার যা ছিল দিয়ে বলেছিল, দেখ্, তুই যেন এ লাইনের কারুর সঙ্গে জুটিস নে। বরং বিয়ে করিস। আমার কখানা গয়না তোকে দিলাম, তাকে দিস। তুই দলের সঙ্গে বেরুতিস আমার যে কি কষ্ট হত তুই বুঝবি নে। সেজেগুজে বাইরে দাঁড়াতে কান্না পেত। বিয়ে করিস। যারা বিয়েলো বউ ধর্ম তাদের রক্ষা করে। আমাদের তো ধর্ম বাঁচায় না।

ডালিমের কথাই সে মেনেছিল, বিয়েও করেছিল। বউ নিয়ে বাসাও পেতেছিল কলকাতায়। যখন দলের সঙ্গে বের হত তখন বউকে রেখে আসত তার বাপের বাড়ি। কিন্তু সে সংসারও ভাঙল। তারপর তার নারীর নেশা ছুটে গেছে, কিন্তু যাত্রার নেশা কাটে নি। সে নেশা কাটাবারও উপায় নেই। খাবে কি? বুড়ো বয়সে নেশার ঘোরে কষ্ট পায়, সহ্য হয় না, তবুও মেয়েযাত্রার দলের মধ্যে আনন্দ যেন সে বেশী পায়। প্রথম জীবনের কথা মনে পড়ে। তাই গোরাবাবু যখন মঞ্জরীকে নিয়ে মেয়েযাত্রার দল খুলবার কথা বলে তখন সে অনেক উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, কম মাইনেতে দলের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারি নিয়েছিল। দলটির প্রতি মমতার তার শেষ নেই। এর জন্যে দলের অ্যাক্টররা অনেকেই তার উপর বিরক্ত বিরূপ।

যাত্রাদলের ম্যানেজারদের ভাগ্যই এই। গাল খেতেই হবে। চোর বদনামও পেতে হবে। চুরি কিছু করে বইকি ম্যানেজারেরা। করে। শুধু নিজের জন্যে করে না—মালিকের জন্য করে, দলের জন্য করে। মধ্যে মধ্যে চুরি না করেও চোর বদনাম নিতে হয়। কোন আসরে গাওনার পর বিদায়ের সময় নায়ক পক্ষ হাজার ফ্যাকড়া তুলে পঞ্চাশ একশো কম দেয়। দলের লোককে বললে বিশ্বাস করে না। কোন কোন আসরে পুরো টাকা নিয়ে এসেও ম্যানেজার বলে, পুরো টাকা দিলে না নায়ক পক্ষ। সে টাকাটা মালিক নেয়, সুযোগ পেলে ম্যানেজারও মারে। বারোয়ারি পূজার আসরে বারোয়ারি কর্তাদের একটা কৌশল হয়েছে আজকাল। গাওনার পর পুরো টাকা দিয়ে তারপর বলে, এইবার পুজোর কিছু প্রণামী বা চাঁদা যা বলেন দিন আপনারা। আমাদের তো চাঁদা করে পুজো। দিতে হয় পঞ্চাশ টাকা। দিলে পরের বছরের বায়নাটা হয়ে থাকে।

এ সবই তার সয়ে গেছে। কখনও মনেও হয় না যে যাত্রাদল ছেড়ে দিয়ে সে আর কিছু করবে। কি করবে? আর তো কিছুই তাকে দিয়ে হবে না। তা ছাড়া এই যাত্রাদলের বাইরে বিশাল কাজ-কারবারের দুনিয়া; সেখানকার জীব তো সে নয়। দল ছেড়ে সেখানে বাঁচতে, দম নিতেই সে পারবে না। সেখানকার বাতাসই যেন আলাদা।

সেদিন অর্থাৎ মঞ্জরী অপেরা যেবার প্রথম পত্তন হল সেবার প্রথম আসরে বংশীর মাইনে বাড়ার খবরটা দিতেই বংশী বলেছিল—মাইনে বাড়ুক না বাড়ুক দল বেঁচে থাকুক, দলের জয়জয়কার হোক।

মনে পড়েছিল গোপালের সাঁতরা কোম্পানীর কর্তার কথা। কর্তা বিষয়ী ঘরের ছেলে তবু ছিলেন তাদের জাতের জীব। শখ করে দল করেই শখ মিটেছিল তাঁর। দলের সঙ্গে

ফিরতেন। খাওয়া শোওয়া একসঙ্গে। তিনি বলতেন, গোপাল চন্দর, জানিস বাবা, যাত্রাদলের আসামী আর পুকুরের মাছ এই দুই একজাতের জীব। যাত্রার দলটি পুকুর আর অ্যাক্টর বাজিয়ে গাইয়ে সব মাছ। জলের মধ্যে মাছের মত দলের মধ্যে এরা বেশ স্বচ্ছন্দ। ঘাই মারছে লাফ মারছে—মনের আনন্দে আছে। জল থেকে মাছ ডাঙায় উঠলে—বাস চারটে খাবি আর দু তিনটে আছাড় খেয়েই শেষ; আসামীও তাই দল ছেড়ে আর কিছু করতে গেলেই ওই দু-দশ দিন পরই না খেয়ে খতম। চুনোপুঁটি থেকে রুইকাতলা সব, কেউ বাঁচে না।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিন বংশীর কথায় মনে হয়েছিল, মাছের মধ্যে রুইকাতলা ছাড়া মাগুর শোল মহাশোলও আছে। পাঁকাল মাছ। বড় মাছের ঘরসংসার পুকুরে হয় না, নদীতে হয়, সেখান থেকে ডিম পোনা এনে পুকুরে ছাড়ে। তারপর ছোট থেকে বড় পুকুরে ফেললে বাড়ে—বড় হয়। পাঁকাল মাছের ঘরসংসার পাঁকে মজা গড়েতে। সেখানেই তাদের ঘরসংসার। তাদের তুলে বড় পুকুরে ফেললেই তারা পাঁকের অভাবে মরে। বংশী আশার মত যারা তারা পাকাল মাছ—মেয়েযাত্রা তাদের পাঁকাল পুকুর গড়ে। গোপাল তার প্রথম জীবনে ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে ডালিমের সঙ্গে সংসার জীবনের স্বাদ আজও ভুলতে পারে নি। কতকাল পর আবার মঞ্জরা অপেরায় এসেছে। ডালিম নেই সংসার নেই—তবু খুব ভাল লাগে।

* * *

আজ ১৯৪৪ সালের রথযাত্রার দিন বংশী আশার নাম উল্লেখ করে কর্তা গোরাবাবু যখন প্রশ্ন করলে—'তারপর বংশী আশা।' তখন গোপাল জানত বংশী কি বলবে। বংশী বলবে, কি বলব আমরা, যা করবেন আপনি। এবং আশা একটু হাসবে। প্রসন্ন সম্মতির হাসি। গোপালের অনুমান মিথ্যে হল না। বংশী হাত জোড় করে বললে—আজ্ঞে না, আমি কিছু বলব না। দলের প্রথম গাওনার রাত্রে আপনি মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আপনার বিচার ন্যায় সূক্ষ্ম বিচার—হাইকোর্টের রায়।

রীতুবাবু বলে উঠল—তুমি ব্যাটা তো দেখছি পাকা উকিলের কান কাটা। হ্যাঁ! যা এক-খানি মোক্ষম তোলান দিলে কর্তাকে!

রীতুবাবুর রসিকতায় কেউ কখনও অসুখী হয় না, ওর রসিকতার মধ্যে কোথায় থাকে একটি স্নেহরসের স্পর্শ—যাতে মনটি প্রসন্ন হয়ে ওঠে। সকলেই হেসে উঠেছিল কিন্তু তাতে বংশী অপ্রস্তুত হয় নি। সে আবার বেশী খুশী হতে পারে। অল্পে খুশী হতে পারার মতই মনের গড়ন তার। সে তার জাতজন্ম এবং শৈশব-বাল্যের অবস্থার জন্যও বটে; কিন্তু সবটা নয়, কিছুটা তার নিজের জন্যও বটে। আড়ালেও সে কখনও কাউকে অতিপ্রচলিত সম্পর্ক পাতিয়ে শালা বলে গাল দেয় না। কখনও কখনও গালাগাল খেয়েও একটু বিষণ্ণ হাসি মুখে ফুটে ওঠে তার। মানুষটার জাত যাই হোক ধাতুটির মধ্যে আশ্চর্য মাধুর্য আছে। বংশী রীতুবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললে—মাস্টারমশাই তা হলে জুরী। শুনেছি নাকি জুরীর মত না নিলে জজ সাহেবের কলমের কোন ক্ষমতা নেই।

—সাবাস রে বংশী, সাবাস! বলে রীতুবাবুই পিঠ চাপড়ে দিলে বংশীর। খুব বলেছিস।

হা হা করে হেসে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে হাসল সবাই। কিন্তু সে হাসি ঢাকা পড়ল নীচের রাস্তায় বাজনা বাদ্যি কাঁসর ঘণ্টার শব্দে। শব্দটা অনেকক্ষণ থেকেই উঠছে—এবার এই মুহূর্তে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। রথযাত্রার দিন, কোন বাড়ির রথ বের হয়েছে। সম্ভবত কোন গলি থেকে বেরিয়ে একেবারে গ্রে ষ্ট্রীট জংশনের মোড়ে। শোভা গোপালী আশা তিনজনে হুড়-মুড় করে বারান্দায় বেরিয়ে গেল; ভারী শরীর শোভা সকলের পিছনে। সে যেতে যেতে বললে —খবরদার, বেটাছেলেরা বারান্দায় আসবে না।

পুরুষদের অধিকাংশই ছিল সিঁড়ির সামনে বড় ঘরটায়। তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। শুধু যেতে পারল না বংশী। কিন্তু সেও চঞ্চল হয়ে উঠল। নীচে যাবার জন্যে তার মনের ছটফটানি ঢাকতে পারছে না সে।

গোপাল ঘোষ, রীতুবাবু, মঞ্জরী, গোরাবাবু এরাও চঞ্চল হয়েছিল। বাজনাবাদ্যির ঘটার বেশ সমারোহ রয়েছে। ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ, গণ্ডাখানেক কাঁসর ঘণ্টা—মানুষের কলকল শব্দ বেশ জোর!

—ওঃ, এ যে বেশ ঘটার রথ মনে হচ্ছে! মঞ্জরীও উসখুস করে উঠল।

গোরাবাবু হেসে বললে—দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না কি?

—তা হচ্ছে বইকি। প্রোপ্রাইট্রেস হয়ে তো মন কান চোখের মাথা খাই নি!

—তা যান না।—রীতুবাবু বলবে—দেখে আসুন, ছেলে মানুষ, ইচ্ছে হবে বইকি। যান।

—আমাকে ছেড়ে দিন মাস্টার মশাই। বংশী অনুনয় করে উঠল।

মঞ্জরী বারান্দায় দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—গোপালীদের পাঁচ টাকা বাড়ল, ওদের চার টাকা করে দিন। কি বংশী?

—তাই হল। তাই অনেক। আমি তো কিছু চাইই নি। তাই হল। আমি চলি তা হলে।

গোপাল ম্যানেজার ধমক দিয়ে বললে—একে বলে গিয়ে রথ পালায় নি। সই দে।

—এসে দোব। না হয় পরে দোব।

—না। আজ রথের দিন।

—তবে টিপছাপ। সই করতে আমার অনেকক্ষণ লাগবে।

ওদিকে রাস্তায় ক্ষণে ক্ষণে মানুষের উল্লাস কলরব করে ফেটে পড়ছে। বারান্দায় মেয়েরা হিহি করে হাসছে। যাত্রাওলা বংশীর অন্তরাত্মা সকালের আলোর ছটায় খাঁচার পাখীর মতই ছটফট করছে।

রীতুবাবু গোরাবাবু দুজনেই হাসলে! বংশী টিপ দিয়ে চলে গেলে রীতুবাবু বললে—চলুন, আমরাও যাই।

বলতে গিয়ে হেসে ফেললে সে।

বুড়ো গোপালও ছটফট করছিল, তবু কাজ ফেলে যেতে পারছে না বেচারা। রীতুবাবু

গোরাবাবু গেলেও সে যেতে পাবে না। সে হাঁকলে—কে রয়েছে হে বাইরে? শুনছ? কিন্তু কোন সাড়া এল না! গোপাল আবার হাঁকলে—আরে, সব চলে গেলে নাকি?

গোরাবাবু হঠাৎ আবৃত্তি করতে সুরু করলে—

কে দিবে উত্তর? ডেকে ডেকে মিছে তুমি ভাঙ কণ্ঠস্বর।
মরজগতের ছোট সুখে ছোট দুঃখে উৎফুল্ল কাতর—
নহে এরা অমৃতপিয়াসী—নবীন সন্ন্যাসী!
তোমার অমৃতমন্ত্র, সে নহে ওদের লাগি!
অমৃতের অধিকারী তুমি যাও আপনার পথে।
ওরা সাড়া নাহি দিবে।

রীতুবাবু গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান। এ পার্ট আমি করেছি মশায়!

গোরাবাবু বললে—কোথায় করলেন? এ তো যাত্রাদলে হয় নি। পড়ন্ত স্টারে হয়েছিল, তাও আট-দশ রাত্রির বেশী চলে নি। 'মারে'র পার্ট। বুদ্ধদেবকে মার বলছে।

রীতুবাবু বললে—হ্যাঁ মশায়। মৃত্যুপথযাত্রী ওরা—তারপর মনে নেই। এক রাত্রি অ্যামেচারে করেছিলাম। ধরেছিল ছোকরারা। স্টারেও দেখছি।

গোরাবাবু আবৃত্তি করলে—

মৃত্যুপথযাত্রী ওরা—মৃত্যুভয়ে সদাই কাতর—
তবুও মোহান্ধ জীব মৃত্যুর বিলাস নৃত্যে;
মদির উল্লাসে মৃত্যু নেচে চলে নূপুর বাজায়ে—
রতিরাগে গান গায়; হাতে তার সুরাপাত্র
সে ছুটেছে আপনার আঁধার আলয়ে।
এরা ছোটে পিছে পিছে—
বহ্নিশিখা প্রলুব্ধ পতঙ্গ সম—
উন্মত্ত অধীর।
ফিরে যাও হে সন্ন্যাসী ফিরে যাও।
তোমার আহ্বানে ওরা দিবে নাকো সাড়া।

আবৃত্তি শেষ করে গোরাবাবু বললে—এই বইয়ে অ্যামেচারে আমার হাতেখড়ি। বুদ্ধদেব সেজেছিলাম।

বলতে বলতে মন্থর পদক্ষেপে দুজনে বারান্দার দিকে এগুচ্ছিল। গোপাল ঘোষ ততক্ষণে বাক্স খাতা বন্ধ করে চাবিটা হাতে নিয়ে সিঁড়ির দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বদিকের দোতলার বারান্দায় মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল। শোভার হাসি সবার থেকে উঁচু পর্দায়। সে ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের দিকে মুখ করে বললে—ও রীতুবাবু, হাতী সেজে নাচছে!

—একটা না দুটো?

—একটা।

—তা হলে পালিয়ে এস শীগগির। জুড়ির জন্যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

সকলে হেসে উঠল। প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী পর্যন্ত। গোপালী শোভাকে বললে—হল তো ?

শোভা হারে না—অন্ততঃ সহজে হারে না। সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—তার থেকে চল না দুজনে নেমে যাই ; ধরাধরির হাঙ্গামাও হবে না—ওদেরও তিনটে হবে।

গোপালী খিলখিল করে হেসে উঠল। মঞ্জরী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে মৃদুস্বরে বললে— বহুৎ আচ্ছা শোভাদি !

রাতুবাবু জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু দেওয়া হল না, সেই মুহূর্তটিতেই গোপাল ঘোষ সিঁড়ির মুখ থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকল যাত্রাদলের প্রবীণ গাইয়ে যোগামাস্টার এবং আর একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। যোগামাস্টার কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল—কই, মা কই ? শুভ মহরতের দিনে যোগানন্দ—। এই যে কত্তা, যোগানন্দ বায়না নিয়ে এসেছে বাবু। এই যে রাতুবাবু মাস্টারমশাই। শোভাদিদি, প্রোপ্রাইট্রেস। সপ্তরথী হাজির। আমি বায়না এনেছি।

উল্লাসে আত্মগৌরবে যোগামাস্টারের বড় বড় কালো দাঁতগুলি বিচিত্র হাস্যশোভায় বেরিয়ে পড়ল।

উদ্যোগের প্রথম দিনেই বায়না সত্যই অপ্রত্যাশিত ; খুশী হওয়ারই কথা। শুধু তাই নয়, মানুষের মন এর মধ্যে শুভ লক্ষণ আবিষ্কার করে নেয়। সে গোরাবাবু থেকে বংশীমাস্টার—আশা পর্যন্ত। প্রায় সকলের হাতে বা গলায় গ্রহকবচ বা আঙুলে গ্রহের আংটি আছেই। ঘর থেকে বাইরের বারান্দা পর্যন্ত সকলেই ঘরের দিকে মুখ ফেরালে। কথাবার্তা পর্যন্ত কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। প্রসন্ন প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে তাকালে। একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাসের ছটা যেন সকলের মুখের উপর পড়েছে।

গোপাল ভদ্রলোকটিকে বসিয়ে বললে—বায়না কোথায় কবে বলুন।

—ঝুলনে, ঝুলনে। লিখুন দু রাত্রি বায়না—

—তুমি থাম যোগামাস্টার। ওঁকে বলতে দাও।

—আমি থামব ! উনি বলবেন ?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে যোগা গাইয়ে বললে—বেশ, তাই বলুন। উনিই বলুন। বলুন মশায়। ছোট ম্যানেজারের হুকুম।

ভদ্রলোকটি বাংলাদেশের জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী শ্রেণীর লোক, পোশাকে চেহারায় এদের যে ছাপটি পড়ে তার সঙ্গে যাত্রাদলের কর্তাদের অন্ততঃ বেশ পরিচয় আছে। ভদ্রলোকটি বললেন, রতনপুরে জমিদার বাড়িতে—

যোগামাস্টার কথাটা পূরণ করে দিলে—বর্ধমান জেলা—আমদপুর কাটোয়া লাইনে পাচুন্দি স্টেশনের সন্নিকটেই, বুয়েচেন এই মাইল দেড়েক পথ—হ্যাঁ দেড় মাইল। ওখানকার সরকারবাবুও জমিদার, বুয়েচেন প্রাচীন জমিদার ; হালে আবার যুদ্ধের বাজারে প্রচুর কামিয়েছে ছেলেরা ; সে বলব কি বুয়েচেন সে একেবারে টেণ্ডাইমেণ্ডাই ব্যাপার—। কি

রকম জমিদারী সেরেস্তার লোক মশাই আপনি! আমিই যদি সব বলব তবে আপনি কি বলবেন? বলুন। ইদিকে তো সেখানে হাঁকডাকের সীমা নেই। বুঝেচেন—সে যত হাঁক তত ফর ফর করে খোলায় খই ফোটার মতন বাক্যি! ইদিকে গোপালবাবু বলছে—তুমি থাম। বলুন—

ভদ্রলোক হেসে বললেন—ওসব কথা অর্থাৎ বাবুদের অবস্থা টাকা কত এসব কি আমি বললে ভাল হয়? আপনি বলছেন সেই তো ভাল লাগছে। আপনার বলা হলে বাকীটা আমি বলব।

রীতুবাবু পকেট থেকে সিগারেট বের করে যোগাবাবুকে দিয়ে বললে—নাও, ধরাও দিকি।

—সিগারেট! জয়জয়কার হবে আপনার! বুঝেচেন কিনা—

—সে পরে। এখন সিগারেট ধরিয়ে ওই বারান্দায় গিয়ে একটু কাশো দিকি। কথা বলবার অবকাশ পাবে না। যাও।

—বেশ তাই যাই।

যোগামাস্টার গাঁজা খায়, বিড়ি খায়, কিন্তু সিগারেট খেলেই কাশি ওঠে। তখন মনে হয় লোকটা বোধ হয় দম বন্ধ হয়েই মরবে। তবু সিগারেট কেউ দিলে সে না খেয়ে পারে না। কিন্তু আসরে নামবার তিন ঘণ্টা আগে থেকে যোগামাস্টার আলাদা যোগামাস্টার। আসরে নামবার আগে শুধু একবার গাঁজা খেয়ে—বাস—আর ধূমপানে নাই। মুখে সিগারেটটা ধরে যোগা বললে—ঘোড়ায় চাপালেন—তা চাবুক মেরে দেন। অর্থাৎ দেশলাই জ্বেলে দিতে বললে সে।

—চল, বারান্দায় চল।

—তার মানে বুঝেচি, বুঝেচেন কিনা—সরাচ্ছেন আমাকে। তা চলুন।

গোরাবাবু বললে—ঝুলন কোন তারিখে গোপালবাবু?

ভদ্রলোক বললে—২৪শে শ্রাবণ। শুক্রবার। ইংরেজী ১০ই আগস্ট। দু-রাত্রি বায়না। যোগাবাবু ঠিক বলেছেন—বাবুর ছেলেরা যুদ্ধের বাজারে প্রচুর কামিয়েছেন—এবার পাকা নাটমন্দির করলেন। এখনও চুনকাম হচ্ছে। সেই নাটমন্দিরে ঝুলনে যাত্রার সংকল্প।

যোগাবাবুর রতনপুরে এক শ্বশুরবাড়ী—প্রথম বিয়ে ওখানে। এখনও মধ্যে মধ্যে যান। কর্তাবাবু নিজে বাজাতে পারেন ভাল, যোগাবাবু গাইয়ে—সেই সূত্রে ওর সঙ্গে জানাশোনা। আপনাদের দলের নাম তো জানাই বটে। তার উপর যোগাবাবু খুব বলেছেন, এবার আপনারা খুব তোড়জোড় করে দল করেছেন। এখন কী নেবেন বলুন।

গোপাল ঘোষ এবার কলমটা তুলে নিয়ে বললে—কোথা নামতে হবে? কত ভাড়া বলুন দিকি?

ভাড়া! বড় রেলে বরাবর গেলে—গঙ্গাটিকুরীতে নামলে ভাড়া কম—দু টাকা তিন আনা। এদিকে রাস্তা একটু বেশী। তার উপর বর্ষার সময় তো। গঙ্গার ধার—

—হ্যাঁ, বৈষ্ণবের দেশ। ভক্তিমতী মাটি। হাসলেন গোরাবাবু।

—আজ্ঞে হ্যা। পাচুন্দি হয়ে পথ কমও বটে, রাস্তাটাও একটু ভাল। আমরা গাড়ীও দোব। সে কর্তা বলেছেন—মেয়ের দল বলে গাড়ী থাকবে। দু তরফাই গাড়ী পাবেন। তার উপর মাছ কাঠ হাঁড়ি যা বটে!

গোপাল কাগজে অঙ্ক কষে বললে—ভাড়াতেই তো তিন শো টাকা! পঞ্চাশ জন লোক দলে।

বারান্দায় যোগাবাবু কাশতে কাশতে কুঁজো হয়ে গেছে—তার মধ্যেও সে একটা হাতের পাচটা আঙুল দু বার দেখাতে চেষ্টা করতে লাগল। অর্থাৎ হাজার টাকা! হাজার টাকা!

দেওয়ালের ধারে বসা গোপাল ঘোষের নজর বারান্দার দিকেই ছিল। যোগাবাবুর ইশারাটা তার নজর এড়াল না। সে গোরাবাবু কিছু বলার আগেই বললে—পাঁচ শো টাকা রাত্রি না হলে তো পোষাবে না! এবার দল আমাদের ভাল করেই করেছি। মাইনে সব বেশী বেশী। বুঝেছেন।

ভদ্রলোক বললেন—সে কথা যোগাবাবু বলে এসেছেন। তাই না হয় পাবেন। কিন্তু ঠাকুর প্রণামী কিছু দিতে হবে মশায়। সেটা এই পুরোহিত-পরিচারক-চাকর-বামুন-দেবোত্তরের কর্মচারীরা পাবে।

—সে পঁচিশ টাকা দেব আমরা।

—আজ্ঞে না। ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক।—সে বেশ শক্ত ঘাড় নাড়া, শতকরা পাঁচ টাকা।

রাতুবাবু এগিয়ে এল—চল্লিশ টাকা—

—আজ্ঞে না। বারান্দার জানালায় দাঁড়িয়ে যোগামাস্টার কাশতে কাশতেই বললে—ওই পঁচিশ। ক্যানে খ্যাচ খ্যাচ করছ ঘোষাল? তুমি পাঁচ টাকা আপোসে লিয়ো। হ্যাঁ, যাও আর বেশী বকিয়ো না। বায়না যা দেবে তা থেকে সে পাঁচ টাকা আগাম বরং কেটে নাও।

কাশির মধ্যে এতগুলো কথা বলে যোগাবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক বোধ করি সেই কারণেই বললেন—বেশ, বেশ, তাই হল—আপনি থামুন মশাই! নিন লিখুন—বায়না—আড়াই শো।

নোটের বাণ্ডিল নামিয়ে দিয়ে বললেন—দুখানা একশো—বাকী দশ। আমাকে পাঁচটা টাকা দেন। আর আপনাদের ফর্ম দিন সই করে দি। রসিদ টিকিট দিয়ে সই করে দিন। জমিদারী সেরেস্তার ব্যাপার।

মঞ্জরী অপেরার প্রথম বায়না হয়ে গেল শুভ রথযাত্রার দিন; শুধু তাই নয় দলের মহরতের দিন। মঞ্জরী পুজোর টাকা তুলে রাখলে বায়নার টাকা থেকে। দলও মোটামুটি ওই দিনই গড়ে উঠল। গোপাল খাতায় সব নাম লিখলে।

প্রোপ্রাইট্রেস—শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী

ম্যানেজার—পরিচালক—শ্রীবিজয় চক্রবর্তী

অ্যাঃ ম্যানেজার কার্যাধ্যক্ষ—শ্রীগোপাল ঘোষ

সংগীত শিক্ষক—শ্রীযোগানন্দ ঘোষাল ও নৃত্য শিক্ষক ড্যান্সিং মাস্টার—বংশী দাস।

যন্ত্রসংগীত ও তবলা ইত্যাদি—ভূদেব ঘোষ ও হরিহর সাঁই

ক্ল্যারিওনেট ও বাঁশের ফ্লুট—রমেশ বোস ও শিবপদ হাজরা

বেহালা—হরেন দাশ, হরু মাস্টার ও ভবেশ পাল

করতাল মন্দিরা—পিণ্টু ঘোষ ও মন্মথ সিং

বেশকারী—শিবু নিকারী ও রাধাচরণ সাঁতরা

প্রম্পটার—রণজিৎ পাল

আসরে যোগানদার—বিপিন হালদার

সাজঘরের ও বাসার চাকর—হরু মহাপাত্র

ঠাকুর—হরিদাস যদুনন্দন দাস

অভিনয়াংশে—শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী, শোভা দেবী, গোপালাবালা, আশা—

গোরাবাবু বললে—কুমারী নায়িকার পার্টের মেয়েটির নাম অলকা দেবী। দেখা তো যাক এই আসরে—যদি সুবিধে না হয় ঝুলনে গাওনার পর বাদ দিয়ে দেওয়া যাবে। তবে নাচে ভাল, মডার্ন নাচ। আমি দেখিনি তবে শুনেছি। আর বাবুল বোস কমিক অ্যাক্টর—বাবুল বোসই লেখ।

যোগামাস্টার এবার সুযোগ পেয়ে বললে—বললে নয়, বলেই চলল—আমার মাইনে কিন্তু বাড়ার ওপরে বাড়বে কত্তা! বুয়েচেন, কথার খড়কাঠ অনেক পুড়িয়েছি। মায়ের বক্তৃতার কথা, গানের কথা। সে আর ফুরোয় না। বুয়েচেন—তখন বলে—আচ্ছা হে আচ্ছা, এবারই দেখছি কেমন তোমার মঞ্জরী মা! এবারই এই ঝুলনে। বাস—হুকুম হয়ে গেল, বুয়েচেন—এক হাঁক। দেবোত্তরের নায়েব। শোন নায়েব, ঝুলনে মঞ্জরী অপেরার যাত্রা হোগা। নায়েব বলে, দাদাবাবুরা বলছিলেন বীণাপাণি কিংবা—। অমনি এক হুঙ্কার—বুয়েচেন তো তখন আমি বেশ তরিবৎ করে তিন কল্কে ফুঁকিয়েছি। সেই ঝোঁকে—হুঙ্কার। কভি নেহি—মঞ্জরী অপেরা। আমি বললাম, তাহলে কত্তা রথের দিনই লোক চলুক আমার সঙ্গে। ওই দিন বুয়েচেন—দলের মহরৎ। ও মশায় ওই দিনই বায়না হয়ে যাবে। তো তাই হুকুম হল। বললে, এ দল নিশ্চয় ভাল দল। রথের দিন যাত্রা সুরু। খুব জমবে। জয়জয়কার হবে। বলে বললে, জান তো এই রথের দিন পৃথিবী সৃষ্টি হল। আমার ঠাকুরমা বলতেন, মিথ্যে হতে পারে না। নারায়ণ বললেন, রথে চড়বেন। বিশ্বকর্মা রথ বানাও কিন্তু রথ চলবে কোথা? বোলাও ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা, আমি রথ চড়ব, জায়গা চাই। তৈরি কর। ব্রহ্মা কি করবেন পৃথিবী তৈরি করে দিলেন। রথ চলল—পৃথিবীও চলতে লাগল। মঞ্জরী অপেরা চলবে—খুব চলবে। বুয়েচেন, আমিও বলছি চলবে। বুয়েচেন—আমার মশাই সাধক নীলকণ্ঠ মশায়ের কাছে যাত্রাদলের হাতেখড়ি! বারো বছর বয়সে রাখালবালক সাজতে ঢুকেছিলাম। মুকুজ্জে মশাই বলতেন—বুয়েচেন—কিনা যোগানন্দ—

রীতুবাবু বললে—তুমি এবার থাম যোগানন্দ। মাইনে তোমার চার টাকা বেড়েছে। হুকুম হয়ে গেছে। এবার নীলকণ্ঠ মশাই রাখ।

চার

রতনপুরের বুড়ো সরকার কত্তার কথা হয়তো সত্যি, রথের দিন অত্যন্ত শুভ যাত্রার পক্ষে, হয়তো এই দিনটিতেই এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে চলতে সুরু করেছিল—নারায়ণ জগন্নাথ রূপ পরিগ্রহ করে মানুষে টানা রথও সেই প্রথম দিন থেকেই চলে আসছে। কিন্তু পৃথিবী যে কক্ষপথে চলে সে কক্ষপথে রতনপুর অঞ্চলের মত প্যাচপেচে কাদা নেই, মহাপ্রভুর রথের পথ পুরীতে সমুদ্রতটে বালির উপর—সেখানেও কাদা নেই। মঞ্জরী অপেরার লোকজন যাত্রার পালা শেষ করলে খুব উৎসাহের সঙ্গে, গাওনা খুব ভাল হয়েছে। ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। কিন্তু পালা শেষ করে মুখের রঙ তুলে বাবুদের ঠাকুরের ঝুলনের প্রসাদ—লুচি বেগুনভাজা কুমড়োর ছক্কা আর বোঁদের মিঠাই খেয়েই স্টেশনে ফেরার পালা আসতেই সব উত্তাপ হিম হয়ে গেল।

ভোর হয়ে এসেছে। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘ। বাদলার হাওয়া বইছে রিমিঝিম—বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। মেঘ কাল থেকেই আকাশে ঘুরছে কিন্তু বৃষ্টি হয় নি ভোর বেলা পর্যন্ত। গাওনা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে সে বোধ হয় বাবুদের ঠাকুরের দয়ায় আর বাবুদের কপালে। এখন এ বাদলা বৃষ্টি যাত্রাদলের লোকেদের কপালের দোষ। বের হতে হবেই, ছটায় পাঁচুন্দিতে ট্রেন। সে ট্রেন ফেল হলে ট্রেন আবার নটায়। এ ট্রেনে গেলে কাটোয়ায় বদল করে একটার মধ্যে হাওড়া পৌছান যাবে। নটায় গেলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে হাওড়া পৌছতে। ওঠো ওঠো সব উঠে পড়। গোপাল ম্যানেজার হাঁকছিল। গরুর গাড়ি চারখানা এসেছে। আসবার সময় গাড়ি ছিল বারোখানা। দুখানায় মালপত্তর, বাকী দশখানায় চার পাঁচ জন ছ জন করে প্রায় সবই কুলিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর চাকর বেশকারীরা এসেছিল মালের গাড়িতেই মালের উপর চেপে। এও ওই বুড়ো কত্তার দয়া বল, মহানুভবতা বল—যাই বল তাই। নইলে সব লোকের জন্যে গাড়ি এ যাত্রার দলের ভাগ্যে বড় জোটে না। কিন্তু সৌভাগ্যটা সে সময় না হয়ে এ সময় হলেই ভাল হত। সে ছিল সকাল বেলা, এ হল ভোর রাত্রি—শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে। তার উপর কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছে সব। যাত্রার পালা আরম্ভ আজ দেরীতেই হয়েছিল, ঝুলন পার্বণ শেষ হওয়ার পর ভোগ শেষ হয়ে আসর বসেছিল এগারটায়। চার ঘণ্টা লেগেছে পালা শেষ হতে। তারপর ছিল প্রসাদ খাওয়ার পালা। বাবুরা বায়নার শর্তের বাইরে রাত্রে ঠাকুরের প্রসাদ লুচি মিষ্টির সঙ্গে বেগুন ভাজা আর কুমড়োর ছক্কা বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। না হলে সেই রাত্রে সব আবার 'ফিলিটে' 'ফিলিটে' রান্না চড়াত। যাত্রার দলের অধিকাংশ দলেই রাত্রে দল থেকে রান্না হয় না, প্রতি আসামী অর্থাৎ অ্যাকটরকে খোরাকী দেওয়া হয়, সে খোরাকী আগে দু আনা দশ পয়সা থেকে দশ আনা বারো আনা নেহাত দু-চার জনের ষোল আনা অর্থাৎ একটাকা পর্যন্ত ছিল, এখন সেটা ক্রমে ক্রমে বাজারের সঙ্গে বেড়ে অবশেষে যুদ্ধের বাজারে ছ আনা থেকে দেড় টাকা পর্যন্ত হয়েছে। খেয়ে ভরাপেটে বা অ্যাকটিং করতে করতে খেয়ে পরিশ্রম কেউ করে না। বারণ আছে। কে বারণ করেছে কেউ জানে না তবে খেয়ে অ্যাকৃটিং যারাই করেছে

তারাই অল্পদিনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। অধিকাংশেরই নাকি হাঁপানী হয়েছে ; সে হাঁপানী হয় পেটের গণ্ডগোল থেকে। আর পালাগানের শেষে রান্নার হাঙ্গামা ও ঝঞ্ঝাট বেজায়।

প্রবীণ যারা তারা বলে নিশি ভোর! তখন যায় খেতে, রান্না যা হয় তাও পিণ্ডির সামিল। তাই খোরাকী ভাল। খোরাকী নিয়ে ছোট মাঝারি বড় অ্যাক্‌টার মিলে এক একটা ছোট দল বেঁধে স্টোভ জ্বেলে রান্না করে নেয়। যত অল্পে হয়। কাদেরও রুটি কাদেরও পরটা তার সঙ্গে দুটো ভাজা একটু গুড় বা মিষ্টি—বাস্। কেউ কেউ মুড়ি চিঁড়েতেই সারে। এই দলগুলির নাম ফ্লিট বা ফিলিট ; কে কবে সৃষ্টি করেছিল তার খোঁজ কেউ রাখে নি।

ইতিহাস ওদের নেই—কেউ লেখে নি, লিখবে না। সভ্য কলকাতায় ওদের খোঁজ কেউ করে না—ওরা সেখানে ব্রাত্য। ওদের আসর কলকাতার বাইরে—বর্ধিষ্ণু গ্রামে—ছোট শহরে। কলকাতা মহানগরীর বাইরে যে মানুষগুলির আসল তৃষ্ণার্ত আত্মা গঙ্গাহীন দেশের গঙ্গাজল প্রত্যাশী শিবের মত রুক্ষ ধূসর জটা ও দেহ নিয়ে পাঁচালীতে বর্ণনা করা শিবের মত খালে বিলে খ্যাপার মত কাদা ঘেঁটে বেড়ায়, তারই মাথায় গঙ্গাজল ঢালবার জন্য এই ব্রাত্য মজুরের দল কাঁধে ভার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শুধু গঙ্গাজল ঢেলে মানুষের তৃষিত আত্মাকে শীতল করে বিদায় নিয়ে ওরা চলে যায়, সম্বন্ধ শেষ—কে ওদের খোঁজ রাখে। সুতরাং ফিলিট নাম সৃষ্টির খবরও কেউ রাখে না। ওরাও রাখে না। ওরা নিজেরা আবার আরও বিচিত্র। অনেকে অনেক সময় মনিঅর্ডার ফর্ম লিখতে বসে ভাবে স্ত্রী বিভার পুরো নামটা বিভাবতী না বিভারাণী? ছেলে ঘঁটের ভাল নামটা কি দেওয়া হয়েছিল যেন? তবে ঝুলনের রাত্রে ফিলিটের রান্নার হাঙ্গামা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে খুশী মনেই খেতে বসে কারুর কারুর হাত দু-এক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল বইকি! যোগাবাবুর একটা কথা মনে পড়েছিল—সে তখন কণ্ঠমশাইয়ের দলে। সদ্য যুবা বয়সে জুড়ি সাজছে। বাসাটা ছেড়েছে। প্রথম বিয়ে আগেই হয়েছিল, তখন সদ্য দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। বউকে ঘরে রেখেই গান করতে এসেছিল মানকরে। সেবার মানকরে মেয়েরা কণ্ঠমশাইকে টিট্‌কিরি দিয়েছিল। কণ্ঠমশাই আসরে নেমে কৃষ্ণকে সামনে দাঁড় করিয়ে গান ধরেছিল—

পুরুষ কোথায় মান করে ?
মেয়েই দেখি মান করে।

আসরেই গান বেঁধে সুর দিয়ে গাইতে পারতেন তিনি। এই গান শুনে মানকরের পুরুষেরা মেয়েরা লজ্জা পেয়েছিল আর খাতির করেছিল খুব। রাত্রে সে দিন তারা লুচি কদমা—মানকরের কদমা, মিষ্টি খাইয়েছিল। মানকরের বিখ্যাত কদমা গোটাকয়েক যোগানন্দ পকেটে পুরে এনেছিল বউয়ের জন্য। আজও খেতে বসে সে দিনের কদমা পকেটে পোরার কথা মনে পড়েছিল। নাটুবাবুরও মনে পড়েছিল বাচ্চা ছেলেগুলোর কথা। সে মনে-পড়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গেই উড়ে গিয়েছে। না গিয়ে উপায় কি? খেয়েদেয়েই যাবার পালা যে! দুঃখ উঁকি মেরেই ভয়ে পালিয়েছে। লজ্জাও পেয়ে গেছে। যার মনে দুঃখ উঁকি মেরেছে, সে নিজেই ঝাঁটা মেরে তাড়িয়েছে।

যোগাবাবুই বলেছে খাওয়ার সময়—লে রে বাবা, খেয়ে লে গবগবিয়ে। কাঁচা না পাকা গরম না ঠাণ্ডা দেখতে হবে না। বলে এই রাত তিনটে—এস্টোভ নিয়ে খচোখচো করতে হল না-- পয়সা খরচ নেই—খেয়ে লে। নিয়ে সেজেগুজে যে যেথা পারিস দেয়ালেমেয়ালে ঠেসান দিয়ে আধ ঘণ্টার চটকা মেরে লে। হ্যা!

কে যেন একজন বলেছিল—লুচিগুলো একেবারে কাঁচা।

বড় বড় রথীদের খাবার জায়গায় অবশ্য বুড়োবাবুর লোক হাজির ছিল। সেখানে পাকা লুচিই পড়েছে। তা ছাড়া সবই ওদের মদের মুখ।

খাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক পর থেকেই গোপালের হাঁক উঠেছে—ওঠো ওঠো। সব উঠে পড। গাড়ী এসে গেছে। বিপিন, শিবু, রাধাচরণ, ঠাকুর, হরু, রাতু মাস্টারমশাই, নাটুবাবু, যোগামাস্টার, শিউনন্দন, ওরে—

কর্তা অর্থাৎ গোরাবাবুকে ডাকতে গোপাল ম্যানেজারের ঠিক সাহস হচ্ছে না। গোরাবাবু ট্রেন থেকেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে আছে। সে শিউনন্দনকে ডাকলে।

*　　*　　*

শোয় নি কেউই। শ্রাবণ মাস, বর্ষার গুমোট, দেওয়ালে বিছানায় ঠেস দিয়েই শোওয়ার কাজটা সেরে নিচ্ছিল। একটু বিশ্রাম। কিন্তু এই অবস্থাতেই নাক ডাকছিল অনেকের। কলকাতার বড় যাত্রার দলের একটা মৌখিক শর্ত থাকে—অন্ততঃ দুখানা ঘর দিতে হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণদের মত বড় অ্যাক্টরদের জন্য আলাদা ঘর এবং বাকী সকলের জন্যে একখানা বড় ঘর দিতে হয়। মেয়েযাত্রার দলের জন্য তিনখানা লাগে—একখানা মেয়েদের জন্য। রতনপুরের কর্তাঠাকুর বাড়ির লাগোয়া মস্ত একখানা খড়ো বাংলা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাঁচখানা ঘর—দু-পাশে দুটো বারান্দা। ঘরগুলোও ভাল, পাকা মেঝে, মাটির দেওয়াল হলেও চুনকাম করা পাকা বাড়ির মত। বাড়িখানা নতুন তৈরি উচ্চপ্রাইমারী মেয়ে ইস্কুল। সচ্ছল জায়গার জন্যে সকলে বেশ ছড়িয়ে থাকতে পেয়েছিল। মঞ্জরা এবং গোরাবাবু এক ঘরে, রীতুবাবু নাটুবাবু মণিবাবু আর নতুন কমিক পার্টের অ্যাক্টর বাবুল বোস এক ঘরে। শোভা আশা গোপালী আর নতুন মেয়ে—অলি দাশ এক ঘরে। বাকী দুখানা ঘরের একখানা হল এবং আর একখানা ছোট ঘরে বাকী সব লোক—সে প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ। কিন্তু ওতে তাদের কোন অসুবিধে হয় নি—গোয়াল ঘরের মত ঘরেও গাদাগাদি করে রাত কাটাতে হয়। কত রাত্রি রেল স্টেশনে, মুসাফেরখানায়, শীতের রাত্রিতে র‍্যাপার কি কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রায় গাদি মেরে পড়ে থাকে। অসুবিধা যা হবার হয়েছে বাবুল বোস, আর অলি দাশের। ওরা নতুন। এর আগে যাত্রাদলে কখনও বায়না গাইতে বের হয় নি। লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে যারা একালে কলকাতায় অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করে—সিনেমাওয়ালাদের কাছে ঘুরে বেড়ায় এরা তাদের দলে। অলি দাশ সকালে উঠেই মুখ ধুয়ে চুলে বুরুশ বুলিয়ে মুখে পাউডারের ছোপ আর ঠোঁটে লিপস্টিক না মেখে বাইরে বের হয় না। বেচারা বিছানায় ঠেস দিয়ে দু হাতের বাঁধনের মধ্যে হাঁটু গুঁজে রেখে আধ-শোয়া হয়ে বসে আছে—পাছে ঘুমিয়ে পড়ে।

শোভা গোপালী আশা বাঁধা বিছানার উপর দিব্যি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে অলি দাশের। মনের মধ্যে অস্বস্তি এবং বিরক্তিরও সীমা নেই। ওঘরে বাবুল বোসেরও অবস্থা অলকা বা অলি দাশের মতই। তারও যাত্রার দলে মফস্বলে নতুন। দু চারটে কলকাতার আসরে সে পার্ট করেছে যাত্রার দলে। কিন্তু মফস্বলে যাত্রার দলের অবস্থা ঠিক সে ধারণা করতে পারে নি। আই-এ পর্যন্ত পড়েছে; পড়তে পড়তেই নবনাট্য আন্দোলনের টানে এসে পড়েছিল এবং নামও করেছিল অল্পদিনের মধ্যে। তারপর পরীক্ষায় ফেল করে ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে একেবারেই ভেসে পড়ল এতে।

বাবুল নিজেই সেদিন রীতুবাবুকে বলেছিল—বুঝলেন স্যার, বেড়িয়ে পড়েছিলাম বেদব্যাসের মত বিপুল তেজে। ব্যাসদেব কাশীর গঙ্গাপার এ পারে এসে নতুন কাশী স্থাপন করবেন বলে তপস্যা করতে বসেছিলেন জানেন তো! তা ব্যাসের তপস্যা নিষ্ফল তো হতে পারে না। কিন্তু ছলনাময়ীর ছলনা—। ব্যাস কাশী হল ঠিক—কিন্তু ছলনাময়ীর ছলনায় ব্যাস কাশীতে মরলে অ্যাস হওয়াই স্থির করেছিলেন ব্যাস নিজেই। অ্যাস আর ব্যাস মিলে আছে কিন্তু মানের তফাত বুঝুন। অ্যাস মানে গাধা—ব্যাস মানে মহাকবি—নাকি ভগবান। স্বয়ং ভেবেছিলাম থিয়েটারে মাতিয়ে দেব হোল ক্যালকাটা, ফিল্মের মধ্যে দিয়ে হোল বেঙ্গল। তা ছাড়া ডাবল এইচ, হাউস হর্স, মানে বাড়ি গাড়ি! বাট্—ওই অ্যাস। অ্যাস মানে যে বেলুন তা জানতাম না। মাই খোদা; সব ফট ফট করে ফেটে গেল!

রীতুবাবু হেসে বলেছিল—বাহবা ব্রাদার! বেশ কথা বলেন আপনি। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। দুনিয়ার কারখানায় একদিকে গাধা পিটে ঘোড়া হয়, আবার অন্যদিকে ঘোড়াকে বোঝা বইয়ে পিটে পিটে গাধা বানায়। ভাবছেন কেন? অহীন্দ্র চৌধুরী মশায় যাত্রায় হাতেখড়ি নিয়েছিলেন। ছবি বিশ্বাস যাত্রায় পার্ট করেছেন। অবশ্য পেশাদারী নয়। কপাল আপনারও খুলতে পারে। আর না খোলে, আমাকে দেখুন। অসুখী মনে হয়? যদি হয় তবে বলব, আপনার ভুল। আমি সুখী।

বাবুল বলেছিল—ওয়াণ্ডারফুল! প্রথম দিনই আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে নিই। আপনাদের দলের নিয়ম—মাস্টারমশাই। আমি বলব, বিগ ব্রাদার। চেহারাতেও বিগ, সম্মানেও বিগ, বয়েসেও বিগ—মানে অনেক বড়। দেখি একটু ফুটডাস্ট, দেখি!

রীতুবাবু বলেছিল, ওঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ পাতিয়েছ? ওঁর সঙ্গে তো আগে থেকেই আলাপ।

—ওঁর সঙ্গে সম্বন্ধ আমার পাতানো আছে। ওঁকে আমি মাই লর্ড বলি।

গোরাবাবুর বাড়িতে বসেই এসব কথা হয়েছিল—ওই রথের দিন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী বাবুল অলকাকে নিয়ে এসেছিল গোরাবাবুর বাড়ি।

হেসে গোরাবাবু বলেছিল—ওকে আমি বলি দিলদার। কপালে হাত ঠেকিয়ে গোরাবাবু আবার বলেছিল—ডি. এল. রায়ের অমর চরিত্র। কিন্তু অলকা, তোমার কেমন লাগছে?

অলকা চুপচাপ বসেছিল। কণ্ট্রাক্টে সই করে সে যাবার সময় বলেছিল—ভালই লাগছে আমার।

গোপাল ঘোষের ডাক শুনে বাবুল এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। রীতুবাবুকে ডাকলে—শুনছেন স্যার! বিগ ব্রাদার!

রীতুবাবু চোখ বুজেই হেসে বললে—হুঁ। গোপাল ডাকছে বুঝি! জয় তারা! বলে উঠে বসল রীতুবাবু। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—তোমার ঘুম হয় নি বুঝি?

—মাই ঈশ্বর! এই অবস্থায় ঘুম? এই বিছানায় ঠেস দিয়ে অ্যাণ্ড ফর্টি ফাইভ মিনিটের ঘুম!

সিগারেটে বেশ জোরে এক টান দিয়ে রীতুবাবু বললে—হবে, অভ্যেস হয়ে যাবে। তারপর থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বললে—ওঃ এই এক রোগ, এই দাড়ি! দশঘণ্টা না যেতেই করকরে হয়ে উঠবে আর চুলকোবে।

তারপর আবার বললে—আমরা এতেই ঘুমুতে পারি। শরীর একটু ঝরঝরে হয়ে যায়। কই, বোতলটা কই? এখন একটু খেলেই ফের চাঙ্গা। এবং ঘুম এসে যাবে। নাক ডাকবে।

বাবুল বললে—ওঃ, এর মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুম!—যেন মাস্টার্ড অয়েল দিয়ে ঘুম! মাই খোদা!

ওদিকে নাটুবাবু মণিবাবু রমণী নাগ একে একে উঠে বসে আড়ামোড়া ছাড়তে শুরু করে দিলে। বাবুল বললে—আমার যা 'কোরোধ' হচ্ছিল না বিগ ব্রাদার; ইচ্ছে হচ্ছিল, র-নস্যি খানিকটা নাকে ঢেলে দি!

খি—খি শব্দে হেসে সারা হয়ে গেল রীতুবাবু।

—নিন, বোতল নিন। খুঁজছিলেন।

গোরাবাবু এসে ঢুকল—উঠেছেন? ক্লান্ত গম্ভীর গোরাবাবু।

—নিশ্চয়। এ কথা কেউ না বলতে পারে না। মুচকে হাসলে রীতুবাবু। তারপর বললে—ঠিক উত্তরটি দিতে হবে।

গোরাবাবু ক্লান্তির মধ্যেই হেসে বললে—আমি বলতে পারি। না হলে—একটু থেমে বললেন—কি বলব এবার? এটা চিতোরের প্রান্তভাগও নয়, তিনজন তুর্কী সেপাইও আড়ালে উদ্যানে প্রবেশ করে নি।

—ফুল মার্ক পেলেন দেবতা। সেই কোন কালে অ্যামেচারে পদ্মিনী হয়েছিল, আমি গোরা করেছিলাম। আপনিও পদ্মিনীতে পার্ট করেছেন নাকি? মনে তো আছে ঠিক! কিন্তু স্যার, আপনার শরীর কেমন বলুন দেখি?

বাবুল বোস অবাক হয়ে শুনছিল এদের কথা। গোপাল ঘোষ এসে ভগ্নদূতের মত দাঁড়াল—চারখানার বেশী গাড়ি আসে নি বাবু। তাও দুখানাতে টাপর, বাকী খোলা। আকাশে মেঘ। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পথ যেতে হবে দেড় মাইল।

বাবুল এবার বলে উঠল—উইদাউট গাড়ি পাদমেকং ন গচ্ছামি। বলে দিন আমরা যাব না। লোকজনকে শুয়ে পড়তে বলুন। য—তো সব—

গোরাবাবু রীতুবাবুকে বললে, আসুন মাস্টারমশাই, দেখি।

চলুন।

দুজনে চলে গেল। বাবুল বোস বললে, মাই খোদা! এরা যে বিনা বাক্যব্যয়ে 'দেখি' বলে চলে গেল! ব্যাপার কি? হেঁটে যেতে হবে না কি? আমি যাব না।

মণিবাবু রমণী নাগ এতক্ষণ ধরে নিরাসক্তের মত সিগারেট টানছিল। নাটুবাবু আপন মনে নিজের স্যুটকেশ খুলে সিগারেটের দুটো প্যাকেট অন্ততঃ দশবার ঢুকিয়ে বের করে, বের করে ঢুকিয়ে এটা ওটা নেড়েচেড়ে গোছাবার কাজেই মগ্ন ছিল, যেন এসব কথায় তার কিছু যায় আসে না। এবার বাবুল বোসের কথার উত্তরে বললে—ভাববেন না, আপনার গতি একটা হবে! নতুন লোক, লেখাপড়া জানা লোক—দলে এ কেলাস—

—রাবিশ। আমি যেন শুধু নিজের জন্যেই ভাবছি! মেয়েরা, বাচ্চা ছেলেগুলো—! গাড়ি না এলে আমরা কেউ যাব না।

রমণী নাগ হেসে বললে—সকালে বাবুদের দারোয়ান এসে বলবে, যাও নিকালো।

—যাও? নিকালো? বললেই হল? ট্রেন নেই যাব কোথায়?

—যে দিকে দু চক্ষু যায়!

—বটে? খাব কি?

মাঠে চরে খাও গে। অনবুঝের মত কথা বলছেন যে! ওদের সঙ্গে দুদিনের বায়না—সে হয়ে গেছে। আর থাকতেই বা দেবে কেন? খেতেই বা দেবে কেন?

—মাই খোদা! ঈশ্বরো আল্লা তেরে নাম, এই বিচার?

—যে বিয়ের যে মন্ত্র মশাই; যাত্রার দলের এই বটে!

ওদিক থেকে যোগাবাবুর ক্রুদ্ধ চাৎকারে সব কথায় ছেদ পড়ে গেল। যোগামাস্টার চেঁচাচ্ছে —আজ্ঞে না না—আমি যাব না; আপনি কার্যাধ্যক্ষ আপনি যান। ওঃ, ভারা গরজ আপনার! এ ভোর রাত্রে সব শুয়েছে—আমি গাড়ি গাড়ি করে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে পেহার খাই! গরজের পা মাথার ওপর, তুমি যাও যোগামাস্টার!

একটু ওদিক থেকে বোধ হয় মঞ্জরী গোরাবাবু যে ঘরে ছিল, সেই ঘর থেকে গোরাবাবু ডাকলে শোনা গেল—ঝগড়া করবেন না গোপাল মামা। ওতেই হয়ে যাবে।

গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর সর্বময় কর্তৃত্বের ওজনে ভারী—উঠে পড়তে বল সব। চাকরদের বল মাল গাড়িতে তুলুক। কি করবে, উপায় কি!

*　　　*　　　*　　　*

চারখানা গাড়িতেই রওনা হল দল। নইলে উপায় কি? একখানা টাপরওয়ালা গাড়িতে মেয়েরা পাঁচজন, অন্য টাপরওয়ালা গাড়িতে পোশাকের বাক্স—তার উপর বাবুল বোস বসেছে। বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ বিষ্টি প্রবল হলে পোশাক ভিজে নষ্ট হবে। বাবুলের পাশে—ঢুকেছে নাটু আর দুটো ছোট ছোট বাচ্চা। একখানা খোলা গাড়িতে রাশীকৃত ছোট বড় মাল, তার সঙ্গে দলের বাসন-কোসন, তীরধনুক, তলোয়ার ঢালের বাণ্ডিল বাক্স। তারই মধ্যে ঠাঁই করে বসেছে গোরাবাবু আর রাতুবাবু। অন্যটায় বাকী ছেলেগুলো আর গোপাল। বাকীরা সেই মেঘলা ভোরের আলোর মধ্যে হেঁটে চলেছে। যোগামাস্টারও হাঁটছে।

যোগামাস্টারকে গোপাল গাড়িতে উঠতে দেয় নি। যোগানন্দ বলেছে, কুছ পরোটা নাই বাবা। যোগামাস্টার এটুকু পথ গণ্ডুষে মেরে দেবে। ব্রাহ্মণ-সন্তান—পুজো করার আগে চা ছাড়া আর কিছু খায় না—জল পর্যন্ত না। অগস্ত্য মুনির বংশ—বিন্ধ্য পর্বত হেঁটে মেরে দিই আমরা।

আপন মনেই বকে চলেছে যোগাবাবু। অন্য সকলে প্রায় চুপচাপ। এই ভোরবেলা ঘুনি ঘুনি বৃষ্টির মধ্যে, সারারাত্রি পরিশ্রমের পর চলেছে সব একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে। আকাশের মেঘ, ঘুনি ঘুনি বৃষ্টির স্পর্শ, দু-পাশে রোয়া জমির ধানের উপর বাতাস বওয়ার শিরশির শব্দ, কিছুর সঙ্গেই ঠিক তাদের যোগ নেই। তাদের অনেকের কানের পাশে এখনও সংগতের সুর বাজছে। কারো বা নাটকের কোন বিশেষ অংশ ভাসছে মনের মধ্যে। সুরেন গরাঞী দূত অনুচর ইত্যাদির পার্ট করে—সে হাটছিল একেবারে পথের ধার ঘেঁষে, হঠাৎ একটা কাদাভরা গর্তে পা ঢুকে একেবারে নির্ঘাত আছাড় খেয়ে পড়ল। দলের লোকেরা হৈ-হৈ করলে না। শুধু বললে—পড়লি? ওঠ্। কয়েকজন দাঁড়াল। বাকী সব চলতেই লাগল। সুরেন খুব অন্যমনস্ক ছিল, বেচারা দূতের পার্ট করছে অন্ততঃ দশ বছর, তবু মধ্যে মধ্যে পার্ট ভুল করে গাঁজায় বেশী দম দিয়ে। গতকাল রীতুবাবু রাজা ছিল, তার সামনে এসে তার বলবার ছিল—এই পুষ্পমাল্য আর এই তরবারি। কি লইতে চান?

রীতুবাবু তরবারি নিয়েছিল নাটকের নির্দেশ মত। মালাখানা ফেলে দিয়েছিল। সুরেনের মালাটা উঠিয়ে নিয়ে চলে আসবার কথা, কিন্তু কি ভুল হয়ে গেল তার, মালাটা তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরে চলে এসেছে। রীতুবাবু সামলে নিয়ে বলেছিল—ঠিক করেছিস। ও মাল্য শৃঙ্খল—প্রভুর প্রতিভূরূপে পরিলি গলায়! যা যা—দূর হয়ে যা! আসরে কেউ ধরতে পারে নি কিন্তু সাজঘরে রীতুবাবু ডেকে বলেছে—এটা কি হল? অ্যাঁ? ক টান গাঁজা খেয়েছিস? আচ্ছা যা, কলকাতায় ফিরে হবে।

সেই কথাই ভাবছিল সে। চাকরীটা গেলে কি করবে সে!

যোগাবাবু দাঁড়িয়েছিল, যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে। সুরেন উঠতেই বললে—আক্কেল কি কোন কালে হবে না? পথের ধার দিয়ে হাঁটছ? হুঁঃ!

বলেই ঘুরে পিছন ফিরে বললে—বুয়েচ হে, ফকীর অধিকারী মহাশয়ের দলে ঢুকেছি তখন কণ্ঠ মশায়ের দল ছেড়ে এসে। বুয়েচ কিনা, পথ হাঁটতে গিয়ে হুঁচোট খেয়েছিলাম। ওই একপাশ দিয়ে হাঁটছিলাম—তা তিনি বলেছিলেন, যোগানন্দ একটা কথা শিখে রাখ, বুয়েচ কিনা।···কি কথা কর্তা? না শোন। "দলের মাঝে মাঝে যাবা। বোঁচকা বালিশ বগল দাবা। হিসেব করে করবে নেশা। তবে নেবে যাত্রাওলা পেশা।" মাঝে মাঝে—মাঝখান বরাবর যাবে, কেন? না, পড়লে ধরবার লোক থাকবে। মাঝবরাবর পথটাই ভাল থাকে। পিছনে পড়লে, কেউ দাঁড়াবে না। আগে তো যেতেই নেই, পথে সাপখোপ যা থাকবে তাকেই ডংশাবে কামড়াবে। আর বোঁচকা বালিশ সঙ্গে রেখো—গোলমাল হবে না। তা ছাড়া বাসাতে উঠেই মনের মত ঠাঁইটি দখল করতে পারবে।

দল নিঃশব্দে হাঁটছে। বংশী সকলের পিছনে, তার পিছনেই আসছে গাড়ি চারখানা। প্রথমেই আছে মেয়েদের গাড়ি। বংশী মধ্যে মধ্যে ফিরে তাকাচ্ছে গাড়ির দিকে। সামনেই বসে আছে মঞ্জরী। তারপর অলকা। তারপর শোভা। তারপর গোপালী এবং আশা। সকলেই ওরা ঢুলছে। নইলে বংশী তাকাতে সাহস করত না, চোখোচোখি হত মঞ্জরীর সঙ্গে। বংশী দেখছে অলকাকে। মেয়েটা ভাল নাচে। নেচে ও তারিফ পেয়েছে। দোষ—মেয়েটা মাথায় খাটো আর গানের গলা ভাল নয়। আশা গোপালী নাম দিয়েছে 'খাপচোমুখী', কে বলছিল বাংলা পাঁচমুখী; হ্যাঁ, মেয়েটার কপালের নীচেই নাকের গোড়া থেকে চোখের কোণ পর্যন্ত একটা খাঁজ আছে, তার জন্যে নাকটা ডগার দিকে একটু উঁচুও বটে। কিন্তু বংশীর মনে হয় মেয়েটার যা চটক বা বাহার তা ওইখানে। আশা তার লম্বা গড়নে পায়ের কাজে মেরে দেয়। এ মেয়েটার সারা দেহ নাচে। তালে খামতি আছে, সে শুধরে যাবে। তবে বড় দেমাক। কাল বংশী ওকে বলেছিল খাসা নেচেছেন। মেয়েটা শুধু 'ধন্যবাদ' বলে সাজঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। অবাক হয়েছে বংশী। শুধু একটি কথা বলে কথা শেষ করে দেওয়ার কায়দাখানা বটে। থাকো থাকো—নাচের পার্ট করবে—বংশীবদন ড্যান্সিং মাস্টারকে ডিঙিয়ে যাবে কোথা? ঢুলছে মেয়েটি। শুধু ও মেয়েটি কেন—সব ঢুলছে।

একটু পাশ কেটে সরে দাঁড়াল বংশী।' পকেট থেকে শিশি বের করে দু ঢোক খেয়ে নেবে!

ওদের গাড়ির পিছনে, সাজের বাক্সের টাপর দেওয়া গাড়িতে বাবুল বোস নাটুবাবু মণি রমণী নাগ ঢুলছে। ঢুলছে নয় ঘুমুচ্ছে। বংশী জানে ওই ঢুলুনির মত ভঙ্গিটা ঢুলুনি নয়, গরুর গাড়ির চাকার পাকের ঝাঁকিতে দুলুনি। বাবুল বোসের কথা জানে না, নতুন এসেছে। কিন্তু নাটুবাবুরা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। হাসি এল, বাবুল বোস টাপরের একখানা বাখারি চেপে ধরেছে। পড়ে যাবার ভয়ে। ওদের পিছনে গোপাল ঘোষ বাচ্চা কটাকে নিয়ে চেপেছে। ব্যাটা বুড়ো; মরণও নেই—নিতু বলে ওই একটা ছেলেকে নিয়ে ছি-ছি-ছি। নিজের কোলে মাথা রাখিয়ে শুইয়েছে! নিজের মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। ওর পরেই খোলা গাড়িতে বাকী চারটে ছেলের সঙ্গে রীতু মাস্টারমশাই আর খোদ কর্তা। ওঃ, এঁরা জেগে আছেন মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, রীতুবাবু কিছু বলছেন—কর্তার মুখের সিগারেটের আগুন চমকে চমকে উঠছে। রাস্তার ধারে বসে পড়ল বংশী। নইলে, কর্তা বলবেন না কিছু, কিন্তু রীতু মাস্টারমশাই গলা ঝাড়া দিয়ে রসালো খোঁচা দিয়ে বলবেন, হুঁ-হুঁ-হুঁ—শ্রীমান বংশীবদন বুঝি? পিছু হাঁটছিস কেন রে! তার থেকে বসে পড়াই ভাল। কোন কথা কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। গাড়িটা পাশ দিয়ে যাচ্ছে, একবার মুখ ফিরিয়ে চট করে এক নজর দেখে নিলে। কথা কানে আসছে। কর্তারা কথায় খুব মশগুল। কয়েকটা কথা তার কানে এল। পুব দিক থেকে পশ্চিমে হাওয়া বইছে, গাঁয়ের বাসিন্দে যাত্রার আসামীরা (লোকেরা) বলছে বাজনার বাতাস। বংশী রাস্তার পশ্চিম ধারে বসেছিল, হাওয়াতে কথাগুলো স্পষ্ট ভেসে আসছে। কর্তার গলা। কান খাড়া করলে বংশী। কী? কর্তা কি বলছেন? হ্যাঁ—শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, বলছেন—কি বলব?

রীতু মাস্টারমশাই ভারী গলায় বললে—কি হয়েছে? শুনতে পাচ্ছি।

—কি হবে?

—সে জানলে জিজ্ঞাসা করব কেন? সেই তো জিজ্ঞাসা করছি। মানে, কেমন যেন—

কর্তা বলছেন, কিন্তু শোনা গেল না কথা; গাড়িটা পাশ দিয়ে পার হয়ে বেশ খানিকটা চলে গেছে।

আর শুনতে পেল না। একবার ইচ্ছে হল, উঠে পড়ে সে চলতে শুরু করে কথাগুলো শোনবার জন্যে। কিন্তু তার থেকেও পকেটের শিশির দ্রব্যের আকর্ষণ বেশী। শরীরটা ভারী মনে হচ্ছে। পৃথিবী যেন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে পড়েছে। শিশির দ্রব্যটুকু মুখে ঢেলে দিয়ে গলাধঃকরণ করে মুখটা একটু বিকৃত করলে বংশী—তারপর একটি সিগারেট। দেশলাইটি জ্বেলেছে, এমন সময় পোঁ শব্দে বাঁশী বাজল ট্রেনের। ওরে বাবা! ট্রেন আসছে! অনেকটা দূরে অবশ্য—কিন্তু ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। বর্ষার দিনের বাদলা ভিজে বাতাসের ছাপে ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আশেপাশে পাক খেয়ে ফিরছে। দে ছুট—দে ছুট।

পাঁচ

কাটোয়া স্টেশনে ট্রেন বদল। ছোট লাইন থেকে বড় লাইন। ঘণ্টা দুই বসে থেকে কলকাতার গাড়ি। পথের মধ্যে আসামা অর্থাৎ যাত্রাদলের লোকেদের খাওয়া-দাওয়ার দায়-দায়িত্ব দলের নয়। খোরাকী দিয়ে খালাস। সেই খোরাকী থেকে যার যা খুশি কিনে খাও। 'ফিলিট' ব্যবস্থাও পথে চলে না।··কে কোথায় রান্না করে! কোথায় জায়গা—কোথায় জল—কোথায় কি! বাসন উনোন—সব বোঁচকায় বাঁধা।

যোগাবাবু বলে—আমাদের পলাশবুনির বাবু ছিল, তার বাড়িতে লোক এলে ফেরবার হুকুম ছিল না। তবে রাঁধা ভাতটাত নেহি দেঙ্গা। বলত—চাউল লেও ডাউল লেও বার্তাকু লেও নিমক লেও। যাও—হুই বটতলামে রেঁধে খাও। তা কাঁহা বটতলা—কাঁহা বাজার! এ বাবা নগদানগদি পয়সা লেও, যা খুশি কিন্‌কে খাও। খাও তো খাও না খাও তো না খাও। না খাও তো পয়সা বাঁচা লেও, গাঁঠমে বাঁধো। দলকা দোষ নেহি।

সোজা বাংলায় বলে—বাবা চিঁড়ে রাখিস, মুড়ি নয়। চিঁড়ে গুড় ব্যস। গামছায় বেঁধে জলে পুকুরঘাটে চুবিয়ে নিয়ে বসে যা। পাতাও লাগবে না। খেয়েদেয়ে আঁচলা ভরে জল খেয়ে নে এক পেট—এক বেলার উপর নিশ্চিন্তি। দম কত চিঁড়ের!

যোগাবাবু কাটোয়া স্টেশনের ওপাশেই যে কুয়োটা সেই কুয়োটার পাড়ে গিয়েও ফিরল। উঁহু, গঙ্গাতীরে এসে কুয়োতলায় যায়? চল্ বাবা গঙ্গার ঘাটে। এক্কেরে চান সেরে চিঁড়ে খেয়ে চলে আসব। ঘাটে কলাও মিলবে। গঙ্গা-যমুনা নিরমল পানি—চল্।

যোগাবাবুর সঙ্গী জুটতে দেরি হয় না। ছোকরা অনেকগুলো জুটে গেল। বয়স্কদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন মেতে উঠল। বংশী তাদের মধ্যে অগ্রণী। বংশী একখানা সাইকেল রিক্সা ভাড়া করে আশাকে ডাকলে। চল গঙ্গাচান করে আসি। সঙ্গে সঙ্গে শোভাদি উঠল—ও গোপালী,

যাবি নে ? কাটোয়ার ঘাটে অনেক পুণ্যি।

দেখতে দেখতে প্রায় গোটা দল। ম্যানেজার গোপাল ঘোষ স্টেশনের উত্তর দিকে যে বাজারটা বসেছে সেই বাজারে একটা চায়ের দোকানে গোরাবাবু, রীতুবাবু, বাবলু বোসদের জন্যে ডিম ভাজাচ্ছিল, গোরাবাবু চা এবং মামলেট আনতে বলেছে। প্ল্যাটফর্মে সাজের বাক্সগুলো পেতে ওদের একটা আড্ডা বসেছে। ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের বারান্দার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে গোরাবাবু। রীতুবাবু বাবুল কথা বলে যাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে ; গোরাবাবু মধ্যে মধ্যে এক একটা কথার জবাব দিচ্ছে যাতে বোঝা যায় সে ঘুমোয় নি। হয় ক্লান্তিতে এমন চোখ বুজে বসে আছে কিংবা কিছু ভাবছে বা মনটা কোন আঘাত খেয়েছে, অভিভূত হয়ে রয়েছে। মঞ্জরী ওয়েটিং রুমের স্নান-ঘরে ঢুকেছে স্নান করতে। অলকা বসে আছে, সে মুখ হাত ধুয়ে ওয়েটিং রুমের ভিতরে একখানা চেয়ারে ঘুমিয়েছে।

গোপাল ঘোষ ছুটে এল গোরাবাবুর কাছে—দল বেঁধে সব ছুটছে বাবু গঙ্গার ঘাটে। যোগা-বাবু হুজুগ তুলে দিয়েছে। এর পর আর ট্রেন ধরা যাবে না। তার ওপর কে কোন দিকে যাবে নিপাত্তা হয়ে, খুঁজতে জান নিক্‌লে যাবে। আপনি বারণ করুন।

নিমীলিত চোখেই গোরাবাবুর ভুরু কুঁচকে উঠল। বললে—কি বিপদ !

রীতুবাবু বললে—ভাববেন না স্যার, দু ঘণ্টা সময় কম নয়। দিব্যি ফিরে আসতে পারবে।

গোপাল ঘোষ বললে—মাস্টারমশাই, শুধু গঙ্গাচান করে ফিরবে ভাবছেন ?

রীতুবাবু বললে—না, তা ভাবছি না ম্যানেজার সাহেব। আমি ভাবছি অনেক দূর। শহর দেখা থেকে বাজার করা—এমন কি পাঁচআইন পর্যন্ত। কিন্তু বাঁধ ভেঙে জল বেরুতে শুরু করলে সে কি আর রোখা যায় ? ও যাবে না !

বাবুল বোস দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তির মতই নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, হাতের আঙুলে ধরা সিগারেটটা ধোঁয়ার শিখা তুলে পুড়েই যাচ্ছিল। অকস্মাৎ সে সোজা হয়ে বসে বললে—আই প্রোটেস্ট—আই অপোস ! এবং সিগারেটটা আছড়ে ফেলে দিয়ে বললে—ডিসিপ্লিন গন্‌ তো এভ-রিথিং গন্‌। গোরাবাবু, রীতুবাবু, সব চলে যাবে স্যার। যোগামাস্টারটা জট ধরে ঘোরাব আমি। চলুন গোপালবাবু। গঙ্গাস্নানে যাবে ! চালাকি পেয়েছ !

উঠে পড়ল বাবুল বোস।

গোরাবাবু এবার চোখ মেলে ক্লান্তকণ্ঠে বলল—দু ঘণ্টা পরে আর একটা ট্রেন আছে। সেই-টেতেই না হয় যাওয়া যাবে বাবুলবাবু। ওরা যখন বেরিয়ে পড়েছে যাক।

তাঁর কণ্ঠস্বরে বাবুল, রাতুবাবু, গোপাল সকলে এক মুহূর্তে কেমন হয়ে গেল। এমন কণ্ঠস্বর গোপাল বা রাতুবাবু কখনও শোনে নি। বাবুলের সঙ্গে পরিচয় অল্প হলেও তারও মনে হল—এ কণ্ঠস্বর গোরাবাবুর হতে পারে না। উগ্র গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় গোরাবাবু, পিঙ্গল তীক্ষ্ণ নেত্র গোরাবাবু—যার দীর্ঘ পদক্ষেপের শব্দে এবং মাপে একটা গম্ভীর বড়-মানুষীপনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যার ভরাট কণ্ঠস্বরের হাসিতে, কথা এবং বাচনভঙ্গীতে

সাধারণ মানুষ একটা সম্ভ্রমবোধ না করে পারে না, সেই কণ্ঠস্বর এই হতে পারে না। এ তো ক্লান্তির অবসন্নতায় দুর্বল নয়, এ যেন কেমন ভেঙে-পড়া মানুষের কাঙালপনায় অসহায় এবং বিষণ্ণ।

রীতুবাবু বাবুলকে বললে—থাক ভাই বোস, থাক। বসো।

গোরাবাবু আবার চোখ বন্ধ করে বললে—আপনি বরং সঙ্গে যান ওদের গোপালবাবু। চলুন—আমিও যাচ্ছি। বিপিনকে বলুন একখানা রিক্সা ডেকে রাখুক। আপনি চলে যান। বলবেন, গঙ্গার ঘাট থেকে সকলকে একসঙ্গে ফিরতে হবে।

এ কথায় কারুর সন্তুষ্ট হবার কথা নয়, অনেক প্রশ্ন এবং প্রতিবাদ উঠবার কথা কিন্তু কেবল গোরাবাবুর ওই কণ্ঠস্বরের বিষণ্ণতার জন্যই কেউ কোন কথা বলতে পারলে না। চুপ করেই রইল। গোপাল নিঃশব্দে চলে গেল; রীতুবাবু অকারণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বাবুল বোসের মত প্রগল্‌ভ মানুষও অসহায়ের মত দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলে।

কয়েক মিনিট পর বিপিন চাকর এসে দাঁড়াল—বাবু! রিক্সা এসেছে।

গোরাবাবু চোখ মেললে—এসেছে? শিউনন্দন!

শিউনন্দন ওয়েটিংরুমের দরজায় মঞ্জরী এবং গোরাবাবুর বিছানা স্যুটকেস বাস্কেট পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এসে দাঁড়াল। গোরাবাবু বললে—ওঁর হয়েছে? দেখ্। হয়ে থাকলে বল—আমি ডাকছি। আর আমার কাপড় গামছা একখানা তোয়ালেতে জড়িয়ে দে।

শিউনন্দন বললে—হামি পানিওয়ালাকে বলিয়েসি পানি দিয়ে দিবে। এখুনি দিবে?

—না, আমি গঙ্গাস্নানে যাব।

গঙ্গাকে পানি বর্ষাকে টায়েম—উ তো বহুত সা ঘোলা হোবে।

—তা হোক। তুই ওকে ডেকে দে।

বাবুল আর সামলাতে পারলে না। বলে উঠল—রাবিশ! কি হল আপনার স্যার? সেই কাল রাত্রি থেকে কি হয়ে গেছেন?

গোরাবাবু উত্তর হয়তো দিত না। কিন্তু দিত কি দিত না—সে কথার মীমাংসা হবার আগেই মঞ্জরী এসে দাঁড়াল। সেও সবিস্ময়ে বললে—তুমি গঙ্গাস্নানে যাবে?

গোরাবাবু তার কণ্ঠস্বর শুনে চোখ মেলে বললে—এই যে! একটা কথা বলছিলাম।

—বল। কিন্তু—

আগে শোন। উঠে দাঁড়াল, বললে—শোন। একটু দূরে গিয়ে মঞ্জরীকে কি বলতে লাগল। বাবুল বোস স্বাভাবিক কৌতূহল বশেই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। রীতুবাবু কিন্তু চোখ বুজে দেওয়ালে হেলান দিলে। মিনিট কয়েক ঘুম—ঘুম না হোক চোখ বুজলেই মিনিট কয়েক বিশ্রামই লাভ। বললে বলে—ভায়া, সংসারে একটা কথা আছে চোরের ঘুম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চুরি করতে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুম। দু মিনিট একদিন যোগ দিয়ে ঘণ্টা পুরিয়ে নেওয়া। আমাদের এও তাই। তিন মিনিট চোখ বুজে এক মিনিট ঘুম। অভ্যেস হয়ে গেল তিন মিনিট চোখ বুজলে দু মিনিট শিশুর ঘুম। বার ত্রিশেক চোখ বুজলেই

এক ঘণ্টা। বলতে বলতেই চোখ বন্ধ করলে, স্তব্ধ হল।

বাবুল ঠেলা দিয়ে ডাকলে—রীতুবাবু!

—কি?

—ঝগড়া লেগেছে।

—লাগুক, মিটে যাবে। চোখ ফিরিয়ে নাও। দেখতে নেই।

—ডাকছে আপনাকে!

—আমাকে? চোখ মেললে রীতুবাবু। দেখলে সত্যিই মঞ্জরী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে আহ্বান রয়েছে। রীতুবাবু উঠে গেল। বিপিন চাকরের পিছন পিছন চায়ের দোকানের ছোকরা দুজন কেৎলী করে চা, চারটে প্লেটে ডিমের ওমলেট, সিঙ্গাড়া নিয়ে এসে দাঁড়াল। বাবুল বোস নিজের প্লেটটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করে দিলে। ক্ষিদে পেয়েছে। দলের লোকেরা ছোট চাকুরের দল দিব্যি মুড়ি, চিঁড়ে নিয়ে কুয়োর ধারে বসে যাওয়ার সময় থেকে ক্ষিদেটা চাগিয়ে উঠেছে তার। অপেক্ষা সইল না আর। আর অপেক্ষাই বা কিসের? নিজের নিজের পয়সায় খাওয়া। কেউ কারুর অতিথি নয়, কেউ গৃহস্থ নয়। দাম দিয়ে খাওয়া —নাও খেয়ে গরম গরম। প্লেটটা টেনে নিয়ে বিপিনকে বললে—দেখ তো অলির চানটান হল কি না। সে আবার কি খাবেটাবে জিজ্ঞাসা কর আর এনে দে। মেয়েটা নতুন। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? অ্যা?

বিপিন হেসে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। ঠিক তখনই ফিরে এল রীতুবাবু, ওদিকে গোরাবাবু আর মঞ্জরী দুজনে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে চলে গেল। বাবুল বোস মুখে খানিকটা মামলেট পুরে চিবুতে চিবুতে বললে—কি ব্যাপার বিগ ব্রাদ্রার? কর্তা সত্যিই গঙ্গাচানে গেলেন আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গডেস লক্ষ্মীর মত গিন্নী?

—ওঁরা গঙ্গাস্নানে গেলেন দুজনেই। দে বাবা, প্লেট দে। একটা মামলেট তিন ভাগ কর। একভাগ এঁকে—এক ভাগ আমাকে, আমারটার সঙ্গে আর একটায় একটা আর এক ভাগ।

বাবুল বোস বললে—মানে?

—মানে ওঁরা খাবেন না। গিন্নীর খাবার চা অলিকে দিতে বললেন, কত্তারটা তিন ভাগ করে তুমি আমি অলি তিনজনে।

—কিন্তু তার তো একটা মানে আছে!

—আছে। কিন্তু—

—নো কিন্তু স্যার অ্যাণ্ড নো কিন্তু! স্ট্রেট সিম্পল সোজা সরল ভাষায় বলুন সেটা কি?

—কত্তার অশৌচ হয়েছে। অশৌচ বোঝ তো?

—ইয়েস, ইয়েস। নো তেল নো শেভিং, আগে তো নো ফিস, ইভেন নো পেঁয়াজ। আবার বাবা মা মরলে নো শু। নো জামা। গলায় কাছা। হাতে কম্বলের আসন নিয়ে ঘোরা।

—হ্যাঁ তাই।

—তা মরলটা কে ? ওঁর আবার আছে কে ?

—নাও ঠ্যালা। ওঁর কেউ থাকতে নেই নাকি ? আছে বা ছিল, নিশ্চয় ছিল। কেউ মরেছে নইলে অশৌচ হবে কেন ? এবং অশৌচ যখন হয়েছে তখন কেউ না মরলেই বা চলবে কেন এবং যে মরেছে সে নিশ্চয়ই গোরাবাবুর খুব আপনার কেউ ছিল।

—মাই খোদা—বাই পরমেশ্বর—ইউ আর এ প্রফেসর বিগ ব্রাদার !

—নাও, এখন খেয়ে ফেল। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। মামলেট শক্ত হলে রস মিলবে না। এই যে অলকা এসেছে। নাও এগুলো তোমার জন্তে। খেয়ে ফেল।

অলকা এসে দাঁড়াল। সদ্য স্নান করে তাকে বেশ সজীব দেখাচ্ছে। ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা এবং ফ্যাশনদুরস্ত মেয়ে সে—হাজার ক্লান্তি বা কষ্টের মধ্যে তার ফ্যাশন এবং স্টাইলের এদিক ওদিক হয় না। বিশেষ করে অভিনয়ের পেশা যখন গ্রহণ করে সে মেয়ে বা পুরুষ যেই হোক তখন তার দৃষ্টি এদিকে প্রখর চেতনায় জাগ্রত থাকে। কোন নাটকে যেন আছে না খেয়ে মর খেদ করো না কিন্তু বাওয়া, মরবার আগে যেন টেরী ঠিক থাকে এটা দেখো। নইলে গো টু হেল। অর্থাৎ ফল—নরকে পতন। টেরী ঠিক থাকলে স্বর্গে যাও বা না যাও গন্ধর্ব বা কিন্নর লোক বাস রোখে কে ! সে অভিনেতা যারা তাদের ছোট থেকে বড় পর্যন্ত ; চর অনুচর থেকে খোদ ইন্দ্র পর্যন্ত। সারাটা জীবনই তাই। তবে বুড়ো বয়সে পড়তি খ্যাতির আমলে ব্যতিক্রম অবশ্যই হয়। অলকার উঠতি বয়স। নবীন জীবন। সাজসজ্জা মেক-আপে লিপস্টিক থেকে বেশভূষা কেশবিন্যাসে এতটুকু খুঁত সে রাখে নি। যেটুকু এলোমেলো ভাব আছে সেটাও ফ্যাশন—যাকে বলে যত্নসহকারে অযত্নপনা বা অমনোযোগিতার ভান। সেটা একটা সুচতুর এবং কলাসম্মত ব্যাপার।

অলকা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে—আমার জন্যে ? আমি তো আজকের খোরাকী নেব বলেছি। আমি তো বরাত দিই নি !

রীতুবাবুই বললে—হায় ভগবান ! সংসারে কি শুধুই ইঁট কাঠ পাথর অলকা ! সবুজ ঘাসের নরম মাটি কি নেই ?

বাবুল বললে—ব্রিলিয়ান্ট বিগ ব্রাদার। বলেই বললে—আমারও যে ব-এ ব-এ বানুপ্রাস বয়ে গেল। এ হল কি ?

রীতুবাবু বললে—লিখতে লিখতেই সরে বাবুল। অভিনয় করতে করতে নাট্যকার হয়ে উঠবে তার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে অলকা, তুমি খেয়ে নাও।

অলকা ভদ্র ঘরের কন্যা এবং খানিকটা লেখাপড়া শিখে অভিনয়ের আসরে নেমেছে। অপ্রগল্‌ভা সে নয় তবে রীতুবাবুর কাছে প্রগল্‌ভতায় তার ভয়ও আছে এবং কিছুটা ঘৃণাও আছে। সে কথা বাড়ালে না, খাবারটা টেনে নিলে। একটুকরো ডিমের মামলেট মুখে পুরে বললে—বাবুলদা, তোমার বুঝি মাইনে বাড়ল ?

বাবুল বললে—হোয়াই দিস কোশ্চেন ?

অলকা বোধ করি সঙ্গগুণ-দোষেই বলে ফেললে—তোমার হৃদয়ে সবুজ ঘাস গজিয়েছে !

বাবুল বলে উঠল—গড লেড বাবুল বোস ! গড ইস গুড অ্যাণ্ড কাইণ্ড টু অল্। বি

কাইণ্ডার টু বাবুল বোস। মাইনে তার বাড়ুক কিন্তু হৃদয়ে সবুজ ঘাস যেন না জন্মায়। তাহলে তো গো-ওয়েস্ট-গন্। মস্ত খাই তার উপর পস্ত লিখতে ধরব তা হলে। মাইনে আমার বাড়েনি অলকা এবং সবুজ ঘাস আমার হৃদয়ে মাইনে বাড়লেও গজাবে না, এটা তুমি জেনে রেখো। ভবিষ্যতে ভাল হবে। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্নো পাউডার এবং লিপস্টিক মাখা অলকার মুখখানি যেন বিবর্ণতায় বিশ্রী দেখালো। কিন্তু তার পরই রাগে অর্থাৎ ক্রোধে স্বাভাবিকের চেয়েও রক্তাভা তার মুখে সঞ্চারিত হল। সে বললে—থ্যাঙ্ক য়ু বাবুলদা।

কিন্তু এর বেশী কথা বলতে পারলে না বা খুঁজে পেলে না।

বাবুল বোস গ্রাহ্যই করলে না, সে পেঁচার মত নির্বিকারভাবে রাত্রির অন্ধকারে ধরা শিকারের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার মতই মামলেট সিঙাড়া খেয়েই গেল।

রীতুবাবু বললে—যাত্রার দলে কিংবা থিয়েটারে এসে বিশেষ জনের হৃদয়ের সবুজ ঘাস খোঁজ কর না অলকা। যার হৃদয়ে ও ঘাস দেখবে সুযোগ পেলেই বসে একটু আরাম করে নিয়ো, তাতেই লাভ। একটু হেসে বললে—ধর ঘাসটুকু আমার এই বুড়ো হৃদয়েই গজিয়েছে।

অলকা বললে—তা হলে কিন্তু আপনি আমার আজ থেকে দাদু। কেমন?

—এগ্রিড। কিন্তু ওমলেট সিঙাড়া চা আমার পয়সায় নয় ভাই। ঠকাতে পারব না। ওগুলো আমাদের যাত্রাদলের মালিক-মালিকানির। মানে গোরাবাবু এবং প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরীর।

চকিত হয়ে উঠল অলকা। এতক্ষণে তার খেয়াল হল—এখানে তারা তিনজন ভিন্ন গোটা দলের আর প্রায় কেউ নেই। বিপিন চাকর এবং চুলওয়ালাদের মধ্যে একজন মুসলমান এবং আর জন চারেক পাকা গাঁজা-আফিংখোর ছাড়া আশেপাশে যাত্রাদলের আর কেউ নেই। তার মধ্যে আবার সব থেকে পাকা গাঁজাখোর যোগাবাবুই নেই। অলকা এতক্ষণে মঞ্জরী গোরাবাবুর অনুপস্থিতি অনুভব করলে এবং প্রশ্ন করলে—তাই তো, ওঁরা কোথায়? এসব না খেয়ে আমাকেই বা—

বাবুলের মামলেট শেষ হয়েছিল। সে এবার বললে—মাদার গ্যাঞ্জেসে স্নান করতে!

—গঙ্গাস্নান?

—ইয়েস।

অলকা সবিস্ময়ে বললে—গোরাবাবু গঙ্গাস্নানে গেলেন?

বাবুল বললে—বিগ ব্রাদার বলছেন গোরাবাবুর অশৌচ হয়েছে। মানে ফাদার মাদার আঙ্কল ব্রাদার কেউ মরেছে।

—বাবা, মা, কাকা, ভাই?

রীতুবাবু বললে—যাত্রাওলাদেরও ওসব থাকে অলকা। তোমার বাবুলেরও আছে, আমারও ছিল। ওঁরও নিশ্চয় ছিল।

অলকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর খেতে শুরু করলে। রীতুবাবু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলে। বাবুল সিগারেট টানতে লাগল।

একটুক্ষণ স্তব্ধতার পর অলকা মামলেট সিঙাড়া চা খেয়ে শেষ করে অকস্মাৎ বললে—বাবুলদা !

—কি ?

—মঞ্জরী দেবী মানে প্রোপ্রাইট্রেসও স্নান করতে গেলেন নাকি ?

—মোস্ট প্রব্যাব্লি । মানে খুব সম্ভব ।

—উনি তো স্নান করেছেন ।

—আস্ক ইওর দাদু ।

দাদুকে জিজ্ঞাসা করতে হল না, রীতুবাবু চোখ বুজেই উত্তর দিলে -উনি আবার স্নান করবেন । মানে নিয়ম হল—স্নানের পর হলেও শোকের সংবাদ শুনবামাত্র অশৌচ হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে হয় । তারপর কারুর দশ দিন কারুর পনের দিন কারুর এক মাস অশৌচ পালন চলে । সে সময় পার হয়ে শুনলে স্নানেই শুদ্ধ হয় ।

অলকা বললে—কিন্তু উনি তো—

বাবুল বললে—ডোণ্ট মেক বড় বড় অলকা, কি দরকার ওসব কিন্তু কিন্তুতে । যত সব —হুঃ ।

রীতুবাবু হেসে বললে—তুমি বড় খেঁকী হয়ে উঠেছ লিটিল ব্রাদার ।

—হুই সাধে ? ও কি জিজ্ঞাসা করছে বুঝছেন না ?

—বুঝেছি । মঞ্জরী বেশ্যার মেয়ে । ওর অশৌচ কিসের ? কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে বললে—ওরা শাস্ত্রমতে বিয়ে করেছে । আর কি জান, স্ত্রী হওয়াটা হতে পারার ওপর নির্ভর করে । গোরাবাবু একবার একটা নাটক শুরু করেছিলেন, উর্বশী পুরুরবাকে নিয়ে । তার মধ্যে লিখেছিলেন—নারী মাতা, নারী ভগ্নী, নারী পত্নী, নারী কন্যা —সেই নারী হয় বারাঙ্গনা । বারাঙ্গনা কালিমা কলুষ—তপস্যার গঙ্গাস্রোতে ধুয়ে মুছে জলাঞ্জলি, হোম বহ্নি আতপ্ত রক্তিম তনু লয়ে, হে উর্বশী, পুরুবংশে পত্নীরূপে করহ প্রবেশ, মোর বংশধরে তুমি করিবে ধারণ ।

বাবুল বলে উঠল—বিউটিফুল । মাই লর্ডের এ কোয়ালিফিকেশন তো জানতাম না ।

অলকা বললে—সে নাটক প্লে হয়েছে ?

—না । নাটকটা কয়েকটা সিন লিখে ছেড়ে দিয়েছেন ।

—কেন ?

—বলেন, ও যাত্রাতে ঠিক জমবে না ।

ঠিক এই মুহূর্তেই গোরাবাবু এবং মঞ্জরী এসে স্টেশনে ঢুকল । তাদের পিছনে শোভাদি, গোপালী, আশা । গোরাবাবুর খালি পা, গায়ে উড়ানী চাদর জড়ানো, পরনে নতুন থান-ধুতি । মঞ্জরীর পরনে লালপেড়ে নতুন শাড়ি । গোপালী হাসছে না—আশা শোভা গম্ভীর । গোরাবাবু স্টেশন প্ল্যাটফর্মের মুখে দাঁড়িয়ে আছে । ওরা সকলে রিক্সাতে এসেছে । লোক-জনেরা পিছনে হেঁটে আসছে । তাদের সঙ্গে গোপাল আছে, নাটুবাবু মণিবাবুও আছে । তবু গোরাবাবু দাঁড়িয়ে রইল । একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা কাছে আসতেই হেঁকে বললে

—সব স্টেশনে এসে বস। এর পর কেউ বাইরে গেলে ভাল হবে না। আর গোপালবাবু, যারা এখান থেকে বাড়ি চলে যেতে চায় বলে দিন যেতে পারে। দলের নতুন বই আখড়ায় পড়বে পনের দিন পর। সে চিঠি দিয়ে জানাব। মাইনেটা, যারা যারা বাড়ি যাবে, দিয়ে দিন।

গোরাবাবু এসে একটা সাজের বাক্সের উপর একখানা নতুন কম্বলের আসন পেতে বসল। উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ভদ্রলোক।

একটু দূরে বসেছে মেয়েরা। চুপচাপ বসে আছে। শুধু অলকা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওরা সকলেই ব্যাপারটা জেনে গেছে। শুধু ওরই জানা নেই। বাবুলও চঞ্চল হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারছে না।

আশা উঠে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওদিকের লোহার রেলিংয়ের গায়ে গিয়ে দাঁড়াল। বংশী দলের সঙ্গে আসে নি। হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে কর্তা গিন্নী গিয়ে স্নান করে নতুন কাপড় পরে উঠল—গোরাবাবু পুরুত ডেকে তর্পণ করলে—সঙ্গে সঙ্গে দলের সব উল্লাস উচ্ছ্বাস যেন মেঘলা সকালের মত ম্লান হয়ে গিয়েছিল। যে যা একটু আধটু হৈচৈ করেছে তা সরে সরে দূরে দূরে। গোপাল ঘোষ আপনা থেকেই কর্তা গিন্নীকে দেখে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং ওদের এই স্নান ও তর্পণকৃত্যের ব্যবস্থা সেই-ই সব করেছে। সেই-ই মধ্যে মধ্যে এদিকে ওদিকে সকলের কাছে গিয়ে বলে এসেছে—চুপ চুপ, সব চুপ। চুপচাপের মধ্যেই গঙ্গাস্নান এবং সেখানে কিনেকেটে কিছু খেয়ে নিয়েছে তারা। আসবার সময়ও গোপাল ঘোষ শোক শোভাযাত্রার একটি আবহাওয়া তৈরী করে নিয়ে সকলকে গুটিয়ে বিনা হাঙ্গামায় চলে এসেছে। কেউ পাঁচমাইনে পড়ে নি, কেউ ইয়ার্কি দিল্লগী করে নি, এমন কি দোকানে দরদস্তুর নিয়েও চেঁচামেচি করে নি। আসবার সময় মঞ্জরীই বলেছিল—মেয়েদের সব রিক্সা করে দিন গোপালমামা। সব একসঙ্গে চলুক। তাই হয়েছে। এরই ফাঁকে বংশী খসে পড়েছে। আশা জানে সে মদের সন্ধানে গেছে। গোরাবাবু বলেছে—তার জন্যে ভেবো না, সে ঠিক যাবে। আর ট্রেন ফেল হলেও ভাবনা নেই—পরের ট্রেনে চলে আসবে। আশাও যে খুব চিন্তিত তা নয়, বংশীকে সে জানে। তবুও এখানে এসে বারবার মনে হচ্ছে মানুষটা গেল—তা বলে তো যেতে হয়! কি মানুষ! গেলই বা কোথায়? বংশী ঝগড়াটে মানুষ নয়, বেহুঁশও হয় না, তবুও বিদেশ তো! এত দেরি!

অলকা এসে আশার কাছে দাঁড়াল। মাত্র ক'দিন তার এদের সঙ্গে পরিচয়। এরই মধ্যে আশা সম্পর্কে একটা ঘেন্না জন্মে গেছে তার। যে ঘেন্না উঁচু জাতের নীচু জাতের উপর জন্মায় এ সেই ঘেন্না। এবং দলেও সেটা যেন মোটামুটি স্বীকৃত সত্য। আশা নিজেও স্বীকার করে সেটা। এই দুদিনের গাওনাই অলকার এদের সঙ্গে প্রথম গাওনা এবং পুরোপুরি মেশা। প্রথম দিন দুপুরবেলাতে খাওয়ার জায়গায় আশা এবং বংশীকে একেবারে একপ্রান্তে খেতে বসতে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। চর অনুচরের পার্ট করে, মাইনে কম পায় এমন কজন বসেছিল সব থেকে ভাল জায়গায়। সে বলেছিল শোভার কাছে—ব্যাপারটা দেখে সবিস্ময়ে সে শোভাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আশা ওখানে বসল কেন?

পোস্তা তার দিকে বিরক্তিভরে তাকিয়ে বলেছিল—কোথায় বসবে তাহলে ?

—কেন ? আমাদের পাশে !

—মরণ ! না, ও ওইখানেই বসবে। তোমার ইচ্ছে হয় যাও না ওর পাশে গিয়ে বস।

কারণটা পরে জেনেছ। যাত্রাদলে খাওয়ার জায়গায় জাতের কড়াকড়ি আছে। বড় পার্ট করে, বড় গাইয়ে—সে জাতে নীচু হলে বসবে আলাদা এবং একটেরে। আশা বংশী তাই। এবং জেনে প্রথমটা ক্ষুব্ধ হলেও পরে মেনে নিয়েছে। অন্ততঃ আশা বংশী সম্পর্কে। জাতের জন্য তত নয়, তবে এত মদ খায় ওরা ! এত খারাপ কথা বলে ! সব থেকে খারাপ লেগেছিল পরের দিন সকালে আশার কুৎসিত দাঁত মাজা দেখে। আঙুলে গামছা জড়িয়ে সেই দিয়ে সে দাঁত ঘষছিল।

তবে দুজনেই ওরা মানুষ হিসেবে নিরীহ। ঘেন্নার সঙ্গে করুণাও হয়। আশাকে উঠে গিয়ে একলা রেলিংয়ের পাশে দাঁড়াতে দেখে অলকা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি জান ?

—কি ?

—কে মরেছে ? অশৌচ বলছে না ?

—মঞ্জরীদির শ্বশুরবাড়ির কে ?

—কে ?

—তা জানি নে। তারপরই আশা বললে—কাঁদছেন দেখছ না ! চোখ থেকে জল পড়ছে বাবুর ! বাবু মানে গোরাবাবু।

ওরা দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিল—তাতে আশাই দেখতে পাচ্ছিল গোরাবাবুদের। অলকা ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। আশার কথায় ঘুরে সে দেখলে—সত্যিই গোরাবাবুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সে কথা বলছে। সে কৌতূহলভরেই এসে ওদের কাছে দাঁড়াল।

গোরাবাবু বলেছিল—জানেন মাস্টারমশাই, ক্ষীরোদবাবুর বাদশাজাদী বলে একখানি নাটক আছে—তাতে বাগদাদী খালিফের খুড়ো নিরুদ্দেশ হয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে দীনদরিদ্র হয়েই বাস করতেন ; কিন্তু হতে পারেন দীন, কিন্তু হীন তিনি নন। তাঁকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলেন খালিফ। দেখেছেন। কিন্তু খুড়ো বলে চিনতে তখনও পারেন নি। কিন্তু তাঁকে দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে বলেছেন—এ যে আকাশস্পর্শী মিনারের ভূকম্প-ভগ্ন মহিমান্বিত নিদর্শন। ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে কিন্তু সেই আকাশস্পর্শী মহিমা—তা যায় নি। আমার দাদু ছিলেন তাই। গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান—। সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সংসারেও কেউ ছিল না—তবু মাথা নোয়ান নি। আমি যখন মঞ্জরীকে বিয়ে করি তিনি আমাকে ধর্ম অনুসারে আইন অনুসারে ত্যাগ করেছিলেন। আমিও তাঁকে ত্যাগ করেছিলাম। হ্যাঁ—আমি তাঁরই নাতি। কিন্তু হি ওয়াজ গ্রেট। সে অস্বীকার করতে পারব না। মৃত্যুকালে, তিন দিন আগে তিনি মারা গেছেন। আমার খুড়োরা আমি ত্যাজ্য নাতি বলে খবর দেন নি। তাঁদেরও তিনি কিছু বলে যান নি। কিন্তু গ্রামের কবিরাজ, ডাক্তারি ওষুধ তিনি খেতেন না। গুরুগিরি ব্যবসা ছিল।

ওই কবিরাজকে বলে গেছেন—কবিরাজ আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁকেই বলে গেছেন—গোরাকে বলো সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। কাল রতনপুরের আসরে নামব—সেজেছি, কবিরাজমশাই এসে আমার সঙ্গে দেখা করে ওই কথাটি বলে গেলেন। কাল থেকেই ভাবছিলাম কি করব। আজ স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে বসে চা-মামলেটের বরাত দিয়ে চোখ বুজে বসে আছি—এদের গঙ্গাস্নানে যাবার কথা বললে গোপালবাবু। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন এটা ডাক এল আমাকে। আমার কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি আমার কাজ করব। গঙ্গাস্নান করে তর্পণ করে থান পরলাম, দশদিনে কাজ করব। মাথা কামাব। পিণ্ড দেব। তাতে যা হয় তাই হবে। খুড়োরা দুজন আছে, তারাও পিণ্ডি দেবে। আমিও দেব। মন্ত্রের সঙ্গে পিণ্ডের সঙ্গে বলব—দাদু, তোমাকে ক্ষমা করার কথা ওঠে না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

রীতুবাবু বললে—পরে হবে স্যার। মানে—

গোরাবাবুর এতক্ষণে খেয়াল হল, তার চারিদিকে ছোট একটি জনতা জমেছে। তার মধ্যে দলের লোক বেশী হলেও বাইরের লোকও রয়েছে। চুপ করে আবার চোখ বুজলে এবং অন্যমনস্ক ভাবে জামার পকেট খুঁজলে। রীতুবাবু বললে—সিগারেট—এই নিন।

—দিন। হাত বাড়ালে।

ওদিকে প্ল্যাটফর্মে শোরগোল উঠল। ট্রেন আসছে। গোপাল এসে বললে—আপনার আর গিন্নীর টিকিট সেকেণ্ড ক্লাসের কেটেছি। মাস্টারমশাই, আপনারও তাই।

বাবুল বললে—আমার ইন্টার ক্লাসের টিকিট তো। দিন। আমিও ওঁদের সঙ্গে যাব। একসেস ফেয়ার আমি দেব।

ট্রেনে চড়বার সময় নিজের স্যুটকেসটা হাতে করে অলকাও চড়ে বসল।

বাবুল বললে—তুমিও ?

অলি বললে—হ্যাঁ।

বংশী ছুটতে ছুটতে আসছে স্টেশনের বাইরের রাস্তা ধরে। রীতুবাবু হেসে বললে—এ বেটা পংক্ষীরাজ, ঠিক এসেছে ! ওঃ, লম্বা লম্বা পায়ে ছুটছে, না উড়ছে !

অলি খিলখিল করে হেসে উঠল—ওঃ, আশার যা ভাবনা ! বেচারা রেলিংয়ের ধারে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ও-গাড়ি থেকে শোভা জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে হাঁকছে—এখানে—এখানে—এখানে।

বংশী গাড়িতে উঠে ধপ করে বসে পড়ে বললে—বাবাঃ, যা ছুটেছি !

আশা বংশী খাবার জায়গায় একপ্রান্তে বসে, কিন্তু ট্রেনে ইন্টারের ভাড়া পায়। ছোট একখানা ইন্টারক্লাস ওরা খালি পেয়েছে। শোভা, গোপালী, আশা, নাটুবাবু, রমণী নাগ, মণিবাবু, বংশী আর গোপাল ঘোষ। গোপাল ঘোষ নিজের পয়সায় ওর আদরের বাচ্চা ছেলেটাকে সঙ্গে নেয়। গাড়িতে ওরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। শোভা স্বচ্ছন্দে প্রায় মনের সুখে খারাপ রসিকতায় ফোয়ারার মুখ খুলে দিলে।

আরম্ভ বংশীকে আর আশাকে নিয়ে। তারপর গিয়ে পড়ল সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীদের

উপর। প্রধান লক্ষ্য রীতুবাবু। বললে—বল তো নাটু, বংশী রড়শীর টানের মাছের মত কাটোয়ার ঘাট থেকে আশার পায়ে ট্রেনে আছড়ে পড়ল তার মানে আছে। তুমি আছ, গোপালী আছে, মানে আছে। ও গাড়িতে মঞ্জরী আছে, গোরাবাবু আছে, বাবুল আছে, ওই ছুঁড়িটা—কুসুমকলি অলি-অলি আছে বুঝলাম। ওই ঢ্যাপসা মিন্‌সে ওখানে ঢুকল কি বলে? তোমাদের রীতুমাস্টার গো! মরণ! আমার গায়ে গন্ধ লাগল মিন্‌সের! জান, ও নিশ্চয় ওই অলিতে মজেছে! মাইরি বলছি! কিন্তু আমার বুক যে ধড়ফড় করছে গো! আমার বুকের দেওয়ালে লাগানো গোবরের তাল চপাস করে পরবুকে লাগল! ও নাটু, একটা উপায় কর। না কর তো, আমাকে ভাই শুতে জায়গা দাও। আমি বসে থাকতে পারব না।

বলে সে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল।

হাসছিল সকলেই। মনে কৌতুক ওদের জেগেই থাকে। ওইটুকুই ওদের এই জীবনের মূলধন বোধ হয়। এর ঠিক পরের গাড়িটাই একটা মস্ত থার্ড ক্লাস। সেখানে যোগাবাবু বোধহয় গাঁজা খাচ্ছে। গন্ধ আসছে। কে যেন কে আবার দলের বাঁশী বাজিয়ে—শিবে হাজরা তাতে কোন ভুল নেই। পালার গানই বাজাচ্ছে। নাচের গানটা—

নন্দন বনে চন্দন বাস চন্দ্রিকা ঝলমল
মন কারে চায় থাকে সে কোথায় বল সখি বল বল
মন চঞ্চল খসে অঞ্চল সারা যৌবন কেন বিহ্বল হল সই?
কেন অতন্দ্র চন্দ্রের পানে অনিমেষে চেয়ে রই?
চাঁদের আড়ালে কোন স্বপ্নের কার মুখ ঢল ঢল?
বল সখি বল বল!

বংশীর পা নাচছে, আশা জানলা দিয়ে বাইরের পানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে অতি মৃদু গুঞ্জনে গানখানা গেয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চলছে। দুপাশে বর্ষার মাঠ। এবার বৃষ্টি নেমেছে ভাল। ধান রোয়ার কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। আকাশ কাল রাত্রি থেকেই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। গরম নেই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাত্রি জাগরণের পর গঙ্গাস্নানে বেশ আরাম হয়েছে সকলের, তার উপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবার চোখেই ঘুম আছে। বংশী তার উপর সকালেই মদ খেয়েছে। তার নাক ডাকতে লাগল কিছুক্ষণের মধ্যে।

সেকেণ্ড ক্লাসের দলটিও শুয়ে পড়েছে। দুটো বাঙ্ক নিয়ে পাঁচখানা বেঞ্চ। একটা বাঙ্কে উঠেছে বাবুল, বাকী তিনটে নীচের বেঞ্চে রীতুবাবু, গোরাবাবু, মঞ্জরী এবং অলকা চারজন। গোরাবাবু এবং মঞ্জরী এক বেঞ্চে। মঞ্জরী শোয় নি, গাড়ির কোণে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে। তার একখানা হাত গোরাবাবুর মাথায়। চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কোণে ঠেস দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের দুজনের এক বেঞ্চে বসবার এবং শোবার কারণ কম্বল। ওদের সঙ্গে বিছানায় একখানা মাত্র রাগ কম্বল ছিল, সেইখানা পেতে শুয়েছে গোরাবাবু, অশৌচে কম্বল ছাড়া শোয়া-বসার জন্য অন্য কিছু ব্যবহারের নিয়ম নেই। মঞ্জরী বলেছে—তা হলে আমিও ওতেই কোণে হেলান দিয়ে বসে যাব। তোমাকে শুতে না থাকলে আমাকে থাকবে কেন?

গোরাবাবু সর্বসমক্ষেই তার মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বলেছিল—আমি ভুল করি নি। আমার দাদু স্বর্গ থেকে দেখে খুশী হচ্ছেন।

মঞ্জরী সলজ্জ হেসে বলেছিল—বেশ, একটু ঘুমোও এখন। কাল সন্ধ্যে থেকে মানুষটা কেমন হয়ে গেল, কিছু বুঝতে পারলাম না। বলো তো কথাটা!

গোরাবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল, কিছুক্ষণ পর বলেছিল—কি বলব? অপরাধ যে আমার অনেক।

মঞ্জরী বলে উঠেছিল—আমাকে বিয়ে করা তোমার অপরাধ যদি হয় আর তা যদি অনেক হয় তো তুমি জান। তুমি বলতে পার। তা ছাড়া কোন অপরাধ তুমি কর নি। আমি জানি।

—না, জান না। এখানকার বায়না নেওয়াটাই আমার অপরাধ হয়েছে, সে অপরাধ অনেক অপরাধ। তুমি বারণ করেছিলে, আমি শুনি নি। তুমি নবগ্রাম এসেছিলে, ওদিকের কথাটাই ভেবেছিলে। শিবহাটীর নাম জানতে—কিন্তু শিবহাটী যে এখানে তা জানতে না। শিবহাটী গঙ্গার ওপারেই বটে কিন্তু গঙ্গা রতনপুর থেকে তিন মাইল পথ। আর একটা ঘটনা তুমিও জানতে না, আমিও জানতাম না। আমার জন্মের আগের ঘটনা। ছেলেবেলায় শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না। আমার দাদু খুব বড় ভাগবত-কথক ছিলেন, কিন্তু ঠিক যাকে পেশাদার বলে তা ছিলেন না। আর খুব গোঁড়া ছিলেন। রতনপুরের এরা আগের কালের জাত বিচারে ভাল নয়। দুর্নামও আছে। কোম্পানীর আমলে নাকি এদের পূর্বপুরুষ কুঠীয়াল সাহেবদের খানসামা ছিল, কেউ বলে সরকার। এবং তা থেকেই সরকার খেতাব। মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরেজদের কাটোয়াতে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে কোম্পানীর ফৌজকে মাংসটাংস এবং অন্য রসদ সাপ্লাই করেছেন। আর নাকি গুপ্ত খবরটবর দিয়েছিল, তা থেকেই ওদের অর্থ সম্পদ জমিদারি।

তারপর অবশ্য ওরা অনেক কীর্তি-টীর্তি করেছে। সে আমলের কীর্তি। বাড়িতে ওই বিগ্রহ স্থাপন করেছে। পুকুর কাটিয়েছে। সে আমলে ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলও করেছিল। টোল করতে চেষ্টা করেছিল, তা সে আমলে তো ভাল পণ্ডিত কেউ আসেন নি। বছর কয়েক পর উঠে গিয়েছিল। সেও আমার দাদুর বাবার আমলে। তারপর দাদুর আমলে ঘটল কাণ্ড। আমার দাদু গাইয়ে লোক ছিলেন। শাস্ত্র চেয়ে গান জানতেন ভাল। তাঁরই আমলে আমাদের টোল ছিল—উঠে যায়। উনি ভাগবত-কথকতা করতেন, তারই মধ্যে গান ছিল প্রাণ। মনে হয় অভিনয়ও ভাল করতেন। শুনেছি লোকে কাঁদত ভাগবত শুনে। এদের তখন টালমাটাল অবস্থা। যত অবস্থা তত মত্ততা। বাড়িতে পাল-পার্বণে খেমটা নাচের ঢেউ বইত। বৈষ্ণব বংশ, কিন্তু মদ চলত পিপে দরুণে। কিছু পরিচয় তো দেখে এলেন। সেই সময় যে কর্তাকে দেখে এলেন, এঁরই মা স্বপ্ন দেখেছিলেন ওঁদের ঠাকুরবাড়িতে দাদু ভাগবত পাঠ করছেন। ছেলেকে বলতে ছেলে মানে ইনি দাদুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন ভাগবত গান করতে হবে। দাদু কথা দিয়েছিলেন, পাঠের জন্যে এসেও ছিলেন। সেটা ছিল দোলপূর্ণিমা। এসে;—এখান থেকে আমাদের গ্রাম শিবহাটি বেশী দূর নয়, চার

মাইল পথ—বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে দেখেন বাড়িতে খুব ধুমধাম, চারিদিকে লোকেরা ব্যস্ত, কলকাতা থেকে থেয়টার দল এসেছে। তাঁকে কেউ দেখলে না, তাঁর কথকতা কোথায় হবে তারও ঠিক নেই। অনেকক্ষণ পরে শুনলেন, সন্ধ্যেতে তাঁকে ঘণ্টা-খানেক পাঠ করে সারতে হবে; কারণ তারপরেই বসবে নাচের আসর। নাচের পালা তিন রাত্রি। তিন রাত্রিব পর তখন এক মাস তাঁর আসর বসবে। কর্তার সঙ্গে দেখাই হল না। দাদু পুঁথি বগলে করে যেমন গিয়েছিলেন তেমনি ধুলো-পায়েই ফিরে এসেছিলেন বাড়ি। পরদিন ওঁর কাছে লোক এলে বলেছিলেন, মদোমাতালের ঠাকুরের কাছে আমি ভাগবত পাঠ করি নে, বলো। অনেক কালের কথা। আমার বাবা তখন ছেলেমানুষ। কবরেজমশাই এসে কথাগুলো বলে বললেন, জ্যাঠামশাই,—দাদুকে কবরেজমশাই জ্যাঠামশাই বলতেন, জ্যাঠামশাই বললেন, গোরেকে বলো, আমি তাকে সত্যি সত্যি আশীর্বাদ করছি। আমার সেদিন অপরাধ হয়েছিল। গোবিন্দ—যিনি ভগবান, তিনি ব্রাহ্মণের ঘরেও ভগবান গোবিন্দ, অন্ত্যজের ঘরেও ভগবান গোবিন্দ; সরকারদের গোবিন্দ মেছুনীর ডালার শালগ্রাম ভগবান, আমার গান শুনতে চেয়েছিলেন, আমি না গেয়ে চলে এসেছিলাম। গোরে এসেছে—গান গেয়ে শুনিয়ে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে—এতেই আমি খুব খুশী। তাকে আশীর্কাদ করছি। তবে বলো, সে যেন এই ধরেই বড় হয়। বড় হওয়া আর ঈশ্বরের কাছা-কাছি যাওয়া, তাঁর দয়া পাওয়া এক কথা। এর পর কিছু তত্ত্বকথা বলেছেন।

হাসলে গোরাবাবু। এবং চুপ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। গাড়ির মধ্যে পাঁচটি প্রাণীই স্তব্ধ হয়ে রইল। গাড়িটা ঝক্ ঝং ঝক্ ঝং মত একটা একঘেয়ে শব্দ তুলে ছুটছিল। বাইরের জানালা দিয়ে কাছের গাছপালাগুলো পিছনের দিকে ছুটছে, দূরের দিগন্ত-সমীপবর্তী গাছপালা মাঠ যেন চক্রাকারে ঘুরছে। মানুষদের দেহ দুলছে। তার মধ্যেই রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত দেহ, এই গন্ধভারাক্রান্ত উদাস মন কখন যে ঘুমের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওরা নিজেরাই কেউ জানতে পারে নি।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল গোরাবাবুর। সে চোখ মেলতেই গাড়ির ছাদের দিকটায় দৃষ্টি পড়ল—অনেক কারুকার্য ছাদে। ইলেকট্রিক পাখা দুটো বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরছে। কপালে গরম বাতাস লাগছে কিসের? ও, মঞ্জরীর নিঃশ্বাস পড়ছে। মাথার পিছনের দিকে দৃষ্টি চালিয়ে দেখল, মঞ্জরী ঝুঁকে প্রায় তার মাথার উপর পড়বার উপক্রম করেছে। মাথার চুলগুলি দুপাশে ঝুলছে। বড় বড় চোখ দুটি মঞ্জরীর ঘুমুলেও কিছুটা খুলে থাকে। মঞ্জরীর ঠোঁটে কাল রাত্রে লাগানো রঙ উঠেও কিছুটা যেন আভাস রয়ে গেছে। ঈষৎ সামান্য লালচে আভা। একটি স্নেহের আবেগ জাগল তার মনে। বেচারী! বড় ভাল মেয়ে। জীবন তার ভরিয়ে দেবার চেষ্টায় আর অন্ত নেই। এবার ও একটু ঘুমুক। সে হাত তুলে ওর কপালে স্পর্শ করে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলে—পাশের বেঞ্চে অলকাও জেগেছে। তার গায়ে রোদ পড়েছে কামরার জানলা দিয়ে। বাইরে কখন রোদ উঠেছে। অলকার মুখ তাদের দিকেই, তাকিয়েও আছে স্বাভাবিক ভাবে তাদের দিকেই। গোরাবাবুও একটু লজ্জিত হল। অলকাও লজ্জা পেলে—তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে—উঃ, রোদ্দুর কি চড়া!

গোরাবাবু লজ্জায় ঝোঁকটা সামলে নিয়ে উদ্যত হাতখানা মঞ্জরীর চিবুকে রেখেই নাড়া দিলে—শুনছ? মঞ্জরী!

মঞ্জরী জেগে উঠল—অ্যাঁ?

—একেবারে আমার কপালে তোমার কপালে ঠোকাঠুকি হবে যে! শেষে শিঙ বেরুবে?

মঞ্জরী একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে সোজা হয়ে বসে দেওয়ালে ঠেস দিলে। গোরাবাবু উঠে বসে বললে—আমি অনেক ঘুমিয়েছি। তুমি শোও দেখি একটু।

—না, আমি বেশ ঘুমুচ্ছি।

—না, বেশ ঘুমুচ্ছ না। যা বলি তাই শোন। শুয়ে পড়। আমি সিগারেট খাই। একটু ভাবি।

মঞ্জরী শুতে গিয়ে আর শুলে না, উঠে বসল। বললে—না। তবে আমিও বসে থাকি।

গোরাবাবু হেসে বললে—অনুতাপ আমি করি না মঞ্জরী। দুঃখ কত সয়েছি তা তো জান।

মঞ্জরী বললে—জানি না। সেই ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে রুখু চুল নিয়ে আমার বাড়ি এলে—পাঁচটা লোক পাঠিয়ে তবে আনতে পেরেছিলাম—সেদিনকার কথা আমার মনে আছে। ভুলি নি।

—সে কি অনুতাপ?

—জানি না।

—ভয় তুমি করো না। সেদিন বাড়িঘর ছেড়ে যে কারণে এসেছিলাম—তা তো ঘটে নি। তা ঘটে থাকলে তোমার সঙ্গে একসঙ্গে অশৌচ স্নান করে দাদুর তর্পণ-টর্পণ তো করতাম না!

রীতুবাবু জেগে উঠেছিল। সে শেষ কথাগুলো শুনেছিল। উঠে বসে সে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললে—তারা—তারা। তারপর বললে—আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি জেগে রইলাম।

এবার মঞ্জরী শুয়ে পড়ল। ওপাশে জানলার কাঠের পাল্লা বন্ধ করে অলকাও আবার শুয়ে পড়ল। এবার সে পিছন ফিরে শুলো। সম্ভবত দুজন পুরুষের চোখ তার মুখের উপর পড়বে এই ভেবেই পিছন ফিরলে। তার আর ঘুম ঠিক আসছে না।

রীতুবাবু ব্যাগ খুলে বোতল বের করে কাপে ঢালল। বললে—অশৌচে—

—দিন। ও বর্জন করলে অশৌচ রাখতে পারব না। ওই রতনপুরের বৃদ্ধ সরকারকে দেখলেন তো! এখন মালা জপেন। প্রায় আমার দাদুর বয়সী। আট দশ বছরের ছোট। ওঁরই গল্প শুনেছি। তখন প্রচুর মদ খেতেন, বাড়িতে রক্ষিতা ছিল, ওঁর মা যখন মারা যান তখন মাকে বলেছিলেন, মা বলে যাও, আমি মদ খাব, আর মাথা ন্যাড়া করব না। নইলে শ্রাদ্ধই হবে না। তবে আমাদের আলাদা কথা। তান্ত্রিক বংশ। ঠাকুরদার বাবা কারণে তর্পণ করতেন। দাদু বৈষ্ণব হয়েছিলেন, তবু তামার পাত্রে নারকেলের জল দিয়ে কারণ

করে নিতেন। আমি তো বীরাচারী বামাচারী যা বলেন!

কিন্তু গ্লাসটা হাতে নিয়েও কয়েক মুহূর্ত ধরে থেকে ফিরিয়ে দিলেন—নাঃ, থাক।

রীতুবাবু গোরাবাবুকে দিয়ে আর একটা কাপে নিজের জন্যে ঢেলে বাঙ্কের ধারটা ধরে ডাকলে—লিটিল ব্রাদার! বোস!

—ঘুমুচ্ছে অঘোরে।

রীতুবাবু নিজেই সেটা শেষ করে আবার ঢাললে।

গোরাবাবু চুপচাপ সিগারেটই টানছিল। হঠাৎ বললে—জানেন, দাদুর কাছেই আমার অ্যাক্টিংয়ে হাতেখড়ি। আমাদের শিবহাটীর দু মাইল দূরে নবগ্রাম। ওখানকার বাবুদেরই তখন ওদিকে খুব বাড়বাড়ন্ত। কয়লা লোহা কনট্রাকটারিতে সে রম্‌রমে ব্যাপার।

মৃদুস্বরে রীতুবাবু বললে, আপনার শ্বশুরকুল—

—ভুলে যান। বলেই আবৃত্তি করে গেল—

মাটির গর্ভের মাঝে যে মৃত নিহিত
সেও মৃত নয়। স্মৃতির মন্দির মাঝে
প্রেমের আরতি দীপে নিত্য চলে আরতি
তাহার। কিন্তু হায় কালের গহ্বর মাঝে
বিস্মৃতির মৃত্তিকা স্তূপে প্রোথিত যে জন
সেই মৃত—তাই মৃত!

তারপর হেসে বললে—সে সব মাটি চাপা পড়ে গেছে। আমি মৃত তাদের কাছে, তারা মৃত আমার কাছে। জানেন, এ কথাটা বলি নি। দাদুর সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু নেই। সে সবই কাকারা নিয়েছে। আর আছে বংশের শালগ্রাম শিলা। আমার পূর্বতন পত্নী পাল্কী করে দাদুর মৃত্যুর পূর্বে এসে আমার পুত্রের নামে ওই দেবসেবার অংশটি লিখিয়ে নিয়ে গেছেন।

—ও সব কথাই এখন থাক গোরাবাবু। না হলে প্রোপ্রাইট্রেসকে ডাকতে হয়।

—না। গোরাবাবু মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ও আমার জীবনের যে কি তা বলতে পারব না।

গাড়ি এসে ঢুকল ব্যাণ্ডেল স্টেশনে। বেলা দেড়টা বাজছে। গোপাল ঘোষ এসে দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে, সঙ্গে সঙ্গে শিউনন্দন।

—কি খাবেন? মাস্টারমশাই? বাবুলবাবু? মঞ্জরী মা, কি আনব? অলকা? পুরী তরকারি, না মিষ্টি?

বাবুল ঝপ করে বাঙ্ক থেকে নেমে বললে—দেখছি আমি। রাইস চাই বাবা। কাল রাত্রি থেকে লোচন চলছে।

মঞ্জরী বললে—আপনি মাস্টারমশাইয়ের ব্যবস্থা করুন। শিউনন্দন তুই দেখ ফল কি মেলে—আর কাঁচা মিষ্টি।

গোরাবাবু বললে—কাগজ একখানা দেখিস রে। আজ তিন দিন কাগজ দেখি নি।

রীতুবাবু বললে—কি দেখবেন স্যার! যুদ্ধ চলছে আর চলছে।

ওদিকে প্রায় গোটা দলটাই স্টেশনে নেমেছে। কেউ কলের গোড়ায় চলেছে চিঁড়ে ভিজুতে। কেউ খুঁজছে যদি দই মেলে। বাকি সব চানাচুর থেকে তেলেভাজা মিষ্টি কিনছে।

বংশী বললে—কি খাবি আশা?

—আলুর দম দেখ না। গোটা চারেক আলু হলেই চলে যাবে। আর ডিম থাকে তো দেখ না।

বংশী নেমে পড়ল।

নাটুবাবু জানালা থেকেই হাঁকছে—এই—এই শোনো। কেয়া হ্যায়? অ্যা!

গোপালী বললে—নামই না ছাই। গাড়ি থেকে কি সব মেলে? দেখ না যদি ডিম মেলে।

নাটুবাবু বললে—না—না। কবেকার ডিম, বাসী সেদ্ধ, না হয় পচা—ডিম খায় না।

শোভা অকস্মাৎ জানালা থেকে ঝুঁকে ডাকলে—ও বংশী। বং—শী। আমার জন্যে একটা ডিম আর একটু আলুর দম আনিস ভাই। একটা ডিম। হ্যাঁ, আর আলুর দম। তারপর আপন মনেই বললে—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই।

বাবুল হন হন করে এসে ঘরে ঢুকে বললে—আমি নামছি স্যার। রাইস কারির বরাত দিয়েছি—খেয়ে লোকালে গোয়িং। পেট বাপ বাপ করছে। ফিরে দেখা করব। হ্যাঁ, অলি? ইউ? উইথ মি—অর উইথ দেম্? দেখো তখন ডোণ্ট সে—হাফওয়েতে ভাগ অ্যাওয়ে করেছি ফেলে!

অলকা উঠে পড়ল—আমি তোমার সঙ্গেই যাব। আমাদের ওদিকে তো তুমি ছাড়া কেউ যাবে না।

রীতুবাবু হাসলে। অলকা স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে শিউনন্দনকে বললে—আমার বেডিংটা নামিয়ে দাও না শিউনন্দন। আসি মঞ্জরীদি, আসি কেমন? কপালে হাত তুলে নমস্কার করলে। তারপর হঠাৎ গোরাবাবুকে বললে—আপনি ব্রাহ্মণ—প্রণাম করি আপনাকে।

নেমে গেলে রীতুবাবু বললে—মেয়েটা রুদ্দল স্যার। বাবুলকে ও ছাড়ছে না।

মঞ্জরী ফল ছাড়াচ্ছিল। সে হেসে ফেললে।

রীতুবাবু বললে—হাসছেন! দেখবেন আমি বলে রাখছি।

মঞ্জরী ও কথার জবাব না দিয়ে বললে—আপনাকে কিছু ফল দিই?

—না—না। ফল এ সময়ে এ মুখে ভাল লাগবে না। ওই গোপাল কি সব আনছে। বলে বোতলটা ফের বের করলেন। কাপে না ঢেলে বোতলেই মুখ লাগিয়ে খেয়ে একটু দম নিয়ে বললে—ফল খায় সন্ন্যাসীতে।

মঞ্জরী হেসে বললে—কিন্তু ফল খেলেই সন্ন্যাসী হয় না। তা হলে সব বানরই সন্ন্যাসী হত। বেশ লিখেছ বইখানা।

গোপাল গরম ভাজা পুরী তরকারি এবং একটা ডিম এনে ধরে দিল রীতুবাবুর সামনে। বললে—একটাকা ছ আনা হয়ে গেল।

—হোক। বেড়ে গরম আছে। নাও, ব্যাগ থেকে দামটা নিয়ে নাও। মাথার বালিশের তলা থেকে ব্যাগটা বের করে গোপালকে দিলে।

গোরাবাবু বললে—চা দেখুন তো। চা। ভাঁড়ের চাই আনুন না। চারটে ভাঁড়।

—ফলের সঙ্গে চা খাবে?

—চা বিবেচনা করুন, যেমন ভাল-ভাত নয়, তেমনি বিষও নয়। আনুন গোপালবাবু, চা আনুন।

কাচের গ্লাসে গোপাল চা নিয়ে এল। গোপালবাবু চুমুক দিতে দিতে বলল—চা জীবনে দুবার খেয়েছি, একবার—

বলতে গিয়ে হেসে ফেললে।

রাতুবাবু বললে—লিখুন না স্যার এমনি একখানা—হোক না সামাজিক—আমরা লাগাই।

গোরাবাবু চা শেষ করে বললে—তাই ছকছি মাস্টারমশাই। শুয়ে ছিলাম, ঘুম আমার ভাল আসে নি। হঠাৎ মাথার মধ্যে এল। এলোমেলো। কিন্তু মন্দ হয় না। ফার্স্ট সিনটা ধরুন—বাপ বেটার মধ্যে কথা হচ্ছে। ধরুন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ, বাপ প্রবীণ ভক্ত মানুষ—জ্ঞান থেকে ভক্তি বড়। গাইতে পারেন। ধরুন ভাগবত পাঠ করছে—মনে মনে অবশ্য—হঠাৎ ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গান ধরলেন। গানের মধ্যে ছেলে এসে দাঁড়াল। গান শেষ হলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। বাপ চোখ তুলে ছেলেকে দেখে বললে, কি, কোথাও যাচ্ছ নাকি? প্রণাম করলে, কাপড়-চোপড় পরেছ?

ছেলে বললে, হ্যাঁ। ধরুন নবগ্রাম, না—নবীনহাট। হ্যাঁ, নবীনহাটই ভাল। ছেলে বললে, হ্যাঁ, নবীনহাট যাচ্ছি। ওদেরই স্কুলের চাকরিটা নেওয়াই আমি ঠিক করেছি। আপনাকে বলতে এলাম।

—ঠিক করে ফেলে বলতে এসেছ! তা—তাহলে বেশ। এর বেশী কি বলব? ঠিক করে ফেলেছ যখন। হ্যাঁ, তখন আর কি বলা যেতে পারে?

—আপনি আশীর্বাদ করুন, সন্তুষ্ট মনে বলুন।

—সন্তুষ্ট মনে? একটু থেমে বললে, তা কি করে বলব বল? আমাদের বংশ প্রাচীন গুরুবংশ। শাস্ত্রচর্চা এবং শিক্ষা বা দীক্ষা দেওয়া, এই ছিল আমাদের কর্ম। পেশা নয়। বাবার আমল থেকে টোল উঠল। ছেলে আসা বন্ধ হল। সবাই ইংরেজী শিখতে ছুটল। তার ওপর অকালে মারা গেলেন। আমি ছেলেমানুষ। আমার নিজের শাস্ত্র পাঠ হল না। সংসারের ভার। অল্প শিখে প্রথমে পুরুতের কাজ করেছি। তারপর ভাল গলা ছিল, গানে জন্ম-দখল ছিল, ভাগবত পাঠ করে কোন রকমে ভক্তিযোগে বংশমর্যাদার খুঁটির ঠেকোয় ঠেকা দেওয়া ঘরের মত খাড়া রেখেছি। তোমাকে বাল্যকাল থেকে শাস্ত্রচর্চা করালাম, কাশীতে বেদান্ত পড়িয়ে আনলাম, তুমি গুরুগিরির পাঠ আবার গড়ে তুলবে। শাস্ত্রচর্চা, ভগবৎচর্চা, একসঙ্গে হবে। কিন্তু তুমি বলছ ইস্কুলে হেড পণ্ডিতি চাকরি নেবে, বেতন মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা। দশটা চারটে চাকরি, নমঃ নমৌ নমাঃ শেখাবে ছেলেদের। সায়েব সুবো এলে স্যার, না কি বলে যেন,. বল্পে খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। বাবুদের দেখলে আগে নমস্কার করে চাকরি

বাঁচাবে। আমাদের বংশের কর্তারা পথ দিয়ে যেতেন, লোকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত। কারও বাড়ি গেলে বাড়ি পবিত্র হত। তারা জলের ঘটি নিয়ে ছুটে আসত পা ধোওয়াতে। তুমি পণ্ডিতমশাই হবে বাবা, তোমাকে লোকে দেখে বলবে নমস্কার পণ্ডিতমশাই। কেমন আছেন গো! বাড়ি গেলে বলবে, আসুন—বসুন—ওই যে মোড়া—বসুন। পায়ে ধুলো দেখলে খিড়কির ঘাট দেখিয়ে বলবে, ওই যে ঘাট, পা ধুয়ে আসুন। বাবা, এসব তো বাইরের কথা। ধর এদিক-ওদিক কাজে সকালে দেরি হয়েছে একটু—দশটা বাজে বাজে। তখন ইষ্ট স্মরণ, পূজা, খাওয়া, ইস্কুলের চাকরি, কোনটা ছাঁটবে বল তো? ঐ ইষ্টপূজা ছাঁটাই হয়ে ইষ্টস্মরণে দাঁড়াবে—তাও হয়তো মাথায় জল ঢালতে ঢালতেই চলবে, নয়তো খাবার আসনে বসে দুবার কেরে-রে-রে করে আঙুলের পর্বে পর্বে বুড়ো আঙুল ছুটবে মাথায় ঘা-ওলা কুকুরের মত। আমি কি করে সন্তুষ্ট চিত্তে হ্যাঁ বলি তুমিই বল!

রীতুবাবু খেতে খেতেই শুনছিল। তার খাওয়া কয়েক মুহূর্ত আগে থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে সে গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। গোরাবাবু থামতেই বললে, গ্র্যারাণ্ড—গ্র্যা-রা-ণ্ড স্যার গ্র্যা-রাণ্ড, ওই বুড়োর পার্ট কিন্তু আমার। ছেলে আপনি।

—উঁহু। বুড়ো আপনিই। তবে ছেলে আমি নই। আমি নাতি। আমি আসব সেকেণ্ড অ্যাক্টে। এ অ্যাক্টে নাতি ছেলেমানুষ। একটা ভাল বাচ্চা চাই। রঙটা ফরসা হতে হবে। নাম হবে জয়ধর। বুড়োর ছেলে ফার্স্ট অ্যাক্টেই মারা গেল আর কি। বাপের সঙ্গে একমত হল না। অগ্রাহ্যও করলে না বাপকে। তবে চাকরি সে নিলে। সে বিনয়ের সঙ্গেই বেশ শক্ত হয়ে বললে, আপনি পিতা, মহাগুরু, ভাগবতে আপনার আশ্চর্য স্ফুরণ। সে ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্র চর্চার সুযোগ যত কমই হয়ে থাক না ও সম্পদ বিধাতা আপনাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। ভক্তিযোগ লোকে বলে জ্ঞানের অভাবে অন্ধের আলোর আকুতির মত জন্মায়। কিন্তু না, ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগেরও পরের কথা। ও দুর্লভ। সংসারে কোন কালেই সুলভ নয়। তার উপর এই কাল, কলিকাল, বিদেশী রাজা। সংস্কৃত ভাষার সমাদর কমেছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গেছে। শালগ্রাম নুড়ি হয়েছে, বিগ্রহ পাথরের পুতুল হয়েছে। লোকে ঘর সাজাচ্ছে কুড়িয়ে এনে। মিউজিয়ম দেখেছি, সেখানে ওর মূল্য শিল্পের আর একটা কালের নিদর্শনের। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা শাস্ত্র চর্চা করি, পূজা করি, তারা লোকের কাছে সমাজের কাছে পরিগণিত হয়েছে লোভী বলে ভীরু বলে, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীব বলে। আপনি সম্মানের কথা বলবেন। বাবা, পিতৃশ্রাদ্ধে মাতৃশ্রাদ্ধে বিবাহে অন্নপ্রাশনে আমাদের ডাকে অনুগৃহীতের মত। ফর্দ দিলে বাজারের ফড়ের সঙ্গে যেমন দর-দস্তুর করে তাই করে। বলে একটা রক্ষা করুন। আমরাও উদরান্নের জন্যে তাই করি। ক্রিয়া-বাড়িতে ক্রিয়া শেষ হলে আর কেউ খোঁজ করে না। পণ্ডিতকে তবু মোড়া দেয়, পুরুতকে গুরুকে কম্বলের আসন দেয় সব থেকে অন্ধকার ওঁচা ঘরে। আমরা অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত, পদে-পদে অপমানিত। না বাবা, গোটা বংশটা এর পর ভিখিরী না হয় ভণ্ড না হয় রাঁধুনী বামুনে পরিণত হবে এ পথে। নূতন কালের জ্ঞানের পথ আমাদের ধরতেই হবে বাবা। ওই জয়ধরকে ইংরিজী শিখিয়ে হয় আমি বিজ্ঞানী করব কিংবা দার্শনিক কাব্যকার লেখক করব। সঙ্গে অন্য ভাইদের ছেলেদেরও। আপনি

বাধা দেবেন না।

—বাঃ! তারপর? বুড়ো কি বললে? রুদ্র তেজ?

—না। বৃদ্ধ ধরুন উত্তর খুঁজে পেলে না!

—তা হলে তো হেরে গেল।

—হার জিত বুঝি না। বাস্তবকে বড় করুন। সামাজিক নাটক।

রীতুবাবু বললে—হুঁ, সামাজিক নাটক! তবে একটা ক্ল্যাশ—দম করে এইখানে হলে না—গোড়াতেই দাউ দাউ!

না।

রীতুবাবু এবার অনেকক্ষণ পর খেতে লাগল। মঞ্জরী থালা সাজিয়ে চুপ করে বসে শুনছে।

গোরাবাবু বললে—বাপ চুপ করে বসে আছে। একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললে, ধরুন বাপ এখানে চীৎকার করেই উঠলেন, না না না। ওরে তার থেকে মৃত্যু ভাল, ধ্বংস ভাল, নির্বংশ। বুঝলেন মাস্টারমশাই, ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ওই নাতি বাইরে থেকে—দাদু বলে উচ্চকণ্ঠে ডেকে এসে ঢুকল—দাদু! বৃদ্ধ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেমন? পোশাক পরিচ্ছদ অবশ্যই সামান্য।

গুড! গুড! গুড! ভেরি গুড!

গোরাবাবু মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বললে—কি? তোমার অভিমত? বল?

সলজ্জভাবে মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে মঞ্জরী বললে—ভাল! খুব ভাল! কিন্তু নাতি কিছু বলুক।

—কি বলবে? বল না তুমি! হ্যাঁ, একটা কিছু বলা চাই।

—বলুক না, দাদু, ওই বাবুদের ছেলেরা কি সুন্দর কপিং পেন্সিল কিনেছে, নিবের কলম কিনেছে, আমাকে কিনে দাও। দাদুর গলা জড়িয়ে ধরুক। দাদু চুপ করে থেকে বলুন, কত দাম রে? দুটোতে আট আনা। দাদু বলুন, চল দেখি, কাল কারা এসে গোবিন্দ প্রণাম করে একটা টাকা দিয়ে গেছে প্রণামী। রেখেছিলাম। তা নে, আট আনা তুই নে। নাতির হাত ধরে বেরিয়ে যাবার সময় ছেলেকে বললেন, তাই নাও তুমি চাকরী, চণ্ডীচরণ। আমি অনুমতি দিলাম।

গোরাবাবু বললে—তোমার তো ঠিক মনে আছে। একটু হাসলে।

মঞ্জরী বললে—হাণ্ডেলটা আমাকে যে দিয়েছিলে রাখতে!

গাড়ি এসে শ্যাওড়াফুলিতে দাঁড়াল। কামরাটায় জন তিনেক ডেলি প্যাসেঞ্জার উঠে বসল।

রীতুবাবু খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে সিগারেট ধরালে। গোপাল নেমে গিয়ে জানালার ধারে একটু দাঁড়িয়ে থেকে ও গাড়িতে চলে গেল। ও ভাবছিল, ওর এই প্রিয় ছেলেটিকে এই বাচ্চাটির পার্টটা যদি দেওয়া হয়! মঞ্জরী গোরাবাবুর সামনে কাচের ডিসের উপর একখানি পাতা বিছিয়ে তার উপর খাবার সাজিয়ে নামিয়ে দিলে, খেয়ে নাও।

—তুমি খাও।

—খাচ্ছি। সে বেঞ্চে পিছন ফিরে বসল।

প্যাসেঞ্জার তিনজন অলকার খালি বেঞ্চে বসলেন। একজন প্রৌঢ়, দুজন কমবয়সী ছোকরা, তারা পরস্পরের সঙ্গী। একজন অন্যজনের গা টিপে বললে—আরে, এ যে যাত্রার দলে অ্যাকট্রেস মঞ্জরী আর গোরাবাবু, মানে মঞ্জরী অপেরা অ্যাণ্ড মঞ্জরী দু বোথের মালিক। আমি চিনি। ওদিকে রীতুবাবু!

ওদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে শ্রোতা বললে—খুব চালুস তো! সেকেণ্ড ক্লাস মারিয়েছে। শালা যুদ্ধের বাজার যে!

—চুপ।

রীতু অকস্মাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসে মোটা গলায় একটা গলা-খাঁকারি দিলে। তারপর বললে—খুব promise আছে বিজয়বাবু। ভাল হবে। কাগজ কলমে করে ফেলুন। আর একটা বেশ চ্যাংড়া চরিত্র আনবেন। বোস্ খুব ভাল করবে। একটা সিন আমার সঙ্গে দেবেন আমি ঠ্যাঙাচ্ছি বেধড়ক। অ্যাঁ? ছত্রিশ ইঞ্চি ছাতিখানা রীতুবাবু প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি ফুলিয়ে দিলে। প্রৌঢ় হয়ে এসেছে রীতুবাবু, তবু যাত্রাদলের হাওয়ায় ছেলেমানুষীটুকু এখনো রেখেছে। বোধ হয় থাকে। ওই দশ বছর বয়সের খোকা থেকে ষাট পঁয়ষট্টির বুড়ো এবং যুবক যুবতীর দল এই কল্পনাকে বাস্তব করে তোলার খেলা বা খেলায় মেতে আছে, এর মধ্যে ছেলেরা বুড়ো হয়, বুড়োরা ছেলে হয়, হয়তো বা দু-পক্ষই যৌবনের টানেই বাঁধা থাকে। অর্থাৎ ছেলেরাও যৌবন পাকড়াতে চায়। বুড়োরাও যৌবন আঁকড়ে ধরে থাকে।

ছয়

ভাদ্র মাস পড়বার আগে থেকেই মঞ্জরী অপেরার রিহারস্যাল শুরু হল। রীতুবাবুই চালাচ্ছে রিহারস্যাল। গোরাবাবু মঞ্জরী আসছে না। অশৌচান্ত না হলে আসবে না।

খুব এমন কিছু জমাট ব্যাপার নয়। ওই আপিস-ঘরটাতেই সে বসে চেয়ারে, আর সকলে বসে তক্তাপোশে। বই ধরে যার যার পার্ট বলে যায়, সে শোনে, মধ্যে মধ্যে বলে, উঁহু, এটা এই রকম করো। বলো।

মধ্যে মধ্যে চা আসে। নীচের একটা দোকানের ছোকরা আসে, আর দিয়ে যায় কারুর নগদ কারুর ধার। ধারের ব্যাপারে মঞ্জরী অপেরার গোপাল ঘোষ আধা জামিন থাকে।

পাশের ঘরটায় গাঁয়ের বা কলকাতার বাইরের লোকেদের মধ্যে যাদের কোন আস্তানা নেই তারা কজন থাকে। তা জন দশেক। হোটেলে খায়। তার মধ্যে যোগানন্দ একজন।

নটার মধ্যেই রিহারস্যাল ভাঙে। ব্ল্যাকআউটের রাত। যে যার চলে যায়। অধিকাংশই

পায়ে হেঁটে। কিছু ট্রামে বা বাসে। বাবুল অলকা সকলের আগে চলে যায়। ওদের যেতে হয় টালিগঞ্জ।

শোভা বলে—খেপেছিস। ওরা যাবে চৌরিঙ্গীতে গিয়ে ঘুরবে। সেই বারোটা একটায় বাড়ি ফিরবে। আমি কষ্কের ছাপ নেব যদি মিথ্যে হয়। আমাদের এখানকার ছুঁড়িদের কাছে সব শুনেছি। একছার নাকি ভদ্দরঘরের মেয়ে আসে। বাপ মেয়ে নিয়ে আসে। ভাই বোন আসে। আর গুপ্ত প্রেমিক প্রেমিকার তো হিসেব নেই। কোম্পানী খুলেছে। ওদের কোম্পানীর নাম বাবুলালি কোম্পানী।

অবশ্য প্রকাশ্যে ঠিক বলে না। কারণ অলকাকে না করলেও, বাবুলকে ভয় করে শোভা। লোকটার সবই গোঁয়াতুর্মি মাখানো-মেশানো। আচমকা এমন হোয়াট বলে ওঠে যে চমকে ওঠে মানুষ। বাবুলবাবু ' না হোয়াট ? একেবারে মারমুখো হোয়াট ' বীতুবাবুর পার্ট দেখে খুশী হয়ে তাকে বলে, ইচ্ছে করছে পেটে একটি ফ্লাওয়েট ঘুষি বসিয়ে দি। আর ইংরিজীর তো ছড়াছড়ি। শুধু তাই নয়, লোকটার কথায় বিশ্রী আলাধরা ধার আছে। যোগাবাবু একদিন বলেছিল, বাবুলবাবু স্যার ' বাবুল ঘুরে ঘাড় বেঁকিয়ে শুধু তাকিয়েছিল, কথা বলে নি। যোগাবাবু দমে নি, বলেছিল—কবে আমরা মিষ্টি খাব স্যার ? অলির সঙ্গে বিয়েটা কবে হচ্ছে ? বাবুল বলেছিল—তোমার মত ঘৃণ্য জীবের সঙ্গে আমি কথা বলি না। এমন করে বলেছিল যে যোগাবাবু যে গাঁজাল গোঁয়ার সেও যেন বেলুনের মত ফুটে চুপসে গিয়েছিল।

বংশী দুটো বারো-তেরো বছরের মেয়ে এনেছে। নাচের দলের সামনে রাখবে। ওই সব খোলার ঘরের ছানাপোনা। বংশী আশাকে নিয়ে মেয়ে দুটোকে সঙ্গে করে বাড়ি ফেরে, হেঁটে। গোপালী নাটুও হাঁটে। নাটু পয়সা খরচের লোক নয়। শোভা আশায় থাকে রীতুবাবুর। ও রিক্সায় ফেরে, বাবু লোক তো! যে দিন গোরাবাবু মঞ্জরীর বাড়ি যায় সে দিন শোভাকেও সঙ্গে নেয়। অবশ্য আলাদা রিক্সা করে দেয়। এক রিক্সায় দুজনের কুলোয় না। কুলোয় না, আবার কুলোয় ঠিক, কিন্তু রীতুর তা পোষায় না। তবে বেশীর ভাগই এখানে আসবার আগে ওখান হয়ে আসছে। এখন যে ওখানে রাত্রের রস-মদ নেই। গোরাবাবুর বাহাদুরি আছে, মদ ছুঁচ্ছে না এ কদিন। বসে বসে বই লিখছে। নতুন বই। চা খাচ্ছে হরদম—বিশ ত্রিশ কাপ, আর সিগারেট। মঞ্জরী গজগজ করছে। মদের সঙ্গে খাবার খায়। সে দিকে খুব নজর। সে তরিবৎ শোভা দেখেছে। এক বাড়িতে থাকে, কতদিন করেও দিয়েছে। প্রথমেই চাই বেশ এতটা মাখন, নোনতা মাখন। সেটা গোড়াতেই খেয়ে নেবে। ওতে নাকি পেটের ভেতরটা বেশ তেলা হয়ে যায় ; তারপর যা যায় মানে মদ সেটা পেটে বেশীক্ষণ থাকে না, পেটের ক্ষতিও করে না, নীচে নেমে যায়। তারপর চপ কাটলেট ছোলা মটর ভিজে, কাঁচা মটরের সময় মটর সেদ্ধ, স্যালাড। সে এই এত। কিন্তু চায়ের সঙ্গে কিছু নয়। মঞ্জরীর গজগজানি সেই জন্যে।

চা ছাড়া অশৌচের নিয়মও মেনে চলেছে ওরা দুজনেই। মেয়েরা সব পারে। সে বেশ্যাই হোক আর গেরস্তই হোক। ধর্ম-কর্ম করা অভ্যাস থাকে। নেহাত উচ্ছন্নে-নরকে পতন না হলে

ওটা যায় না। মঞ্জরী অবশ্য আলাদা বটে। ওর মা দিদিমা এর মধ্যেও বামুন বোষ্টমের রীতি-নীতি মেনে গেছে। মঞ্জরী যাত্রার দল না করলে গেরস্তই হয়ে যেত। বাহাদুরি গোরা বাবুর। বলতে গেলে তো কালাপাহাড়। সোনার সিংহাসন ছেড়ে মঞ্জরীকে বিয়ে করে যাত্রাওলা হয়েছে। বড়লোকের ছেলে অনেক ফতুর হয়, হয়েছে। তাদের ভজে। এসে তো থিয়েটারে কত বড়লোকের পো শেষ হল। তবে এদের ঢঙটা আলাদা।

শোভা চিৎপুরের দিকের বারান্দায় এসে লুকিয়ে একটা সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেট খায়, কিন্তু সবার সামনে খায় না। সকলে দলে একটু সম্ভ্রম করে বলেই খায় না। আজ কেমন যেন সিগারেটের তেষ্টা পেলে। রীতুবাবুর কাছ থেকেই চুপি চুপি চেয়ে নিয়ে এসে খাচ্ছে। বারান্দায় এসে দরজাটা শেকল তুলে বন্ধ করে দিয়েছে। নিশ্চিন্তি।

ও কি! কে যেন ভেতরে হাউমাউ করে কাঁদছে। ও গো বাবু গো!—কে? কার কি হল? কান পেতে শুনে মনে হচ্ছে বঙ্কিম সাধুর গলা। মাঝারি পার্টটার্ট করে। সেনাপতি সামন্তরাণা কিংবা বেশী কথাওয়ালা দূতের পার্ট। বঙ্কিম থাকে সিঁথিতে। এবার কই রথের দিন আসে নি। কে যেন বলেছিল কোন নতুন দলে বড পার্ট নিয়ে নামবে। লোকটার চেহারা ভাল। সে-ই বলেই তো মনে হচ্ছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শোভা দরজা খুলে দাঁড়াল।

হ্যাঁ বঙ্কিমই বটে! বঙ্কিম রীতুবাবুর হাত ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছে—আপনি বলে দিন মাস্টারমশাই আপনি বলে দিন। আমার ছেলে মাস্টারমশাই, ষোল বছরের ছেলে।

গোটা ঘরখানার লোক বোবা হয়ে গেছে। চোখে কারুর পলক পড়ছে না। হয়তো দমও বন্ধ করে আছে। কি হয়েছে বঙ্কিমের ষোল বছরের ছেলের—জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না শোভা। রীতুবাবু বললে—তুমি যে আড়াইশো টাকা চাচ্ছ বঙ্কিম। বিশ পঁচিশ হলে না হয় আমি দিতে পারতাম। তুমিই বুঝে দেখ।

—আজ একশো দিন, কাল বাবুকে প্রোপ্রাইট্রেসকে বলে বাকীটা দেবেন। বাবু, ডাক্তারের বাকী, ওষুধের দোকানে বাকী। বাইশ দিনে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি। ডাক্তার টাকা বাকীতে দেখেছে। তিন চার দিন কথার খেলাপ হয়েছে। আজ সকাল থেকে ক্রাইসিস চলছে। ডাক্তার দুপুরে বলে গেছে টাকা না হলে আর আসবে না। বাবু, মাস্টারমশাই, ডাক্তারের কি দোষ দেব, রক্তটক্ত পরীক্ষার টাকা সব ধারে সে করে দিয়েছে।

শোভা জিজ্ঞাসা করলে—কী হয়েছে ছেলের? কি অসুখ বঙ্কিম?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বঙ্কিম, কান্না জড়িয়ে কোন রকমে বললে—টাইফয়েড। আজ নাকি বলছে, ম্যানেনজাইটিসের সিম্‌টম্ দেখা দিয়েছে।

শোভা বললে—আহা রে! তারপরই বললে—চল, তুমি আমার সঙ্গে, কর্তা গিন্নীর কাছে নিয়ে যাই, ওঁরা নিশ্চয় দেবেন।

—আমার দেরির সময় নেই শোভাদি। সেখান থেকে আবার এখানে পাঠাবেন।

রীতুবাবু বললে—গোপালবাবু, আপনি একশো টাকা সঙ্গে নিয়ে ওর সঙ্গে যান। গিয়ে ডাক্তারকে কিছু ডাক্তারখানায় কিছু দিয়ে ওদের বাকীটা দিয়ে বলে আসুন আরও দেড়শো

টাকার জন্যে দায়ী আমরা থাকব। বুঝলেন? সঙ্গে যান। পান তো ট্যাক্সি করে চলে যান। ওরও তাড়াতাড়ি হবে, আপনারও ফিরতে রাত হবে না। যান। কত্তা গিন্নীকে যা বলবার আমি বলব। ট্যাক্সিতে ফিরবেন। আমি ওখানেই থাকব, দেখা হবে। যাও বঙ্কিম।

গোপাল ঘোষ ও-ঘরে গিয়ে বোধ হয় টাকা নিয়ে এল, তারপর বললে—চল বঙ্কিম।

বঙ্কিমের ঠোঁট দুটি কাঁপছে, তাতে একটু হাসি কিন্তু চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে এখনও। বলতে সে কিছু পারলে না। শুধু রীতুবাবুর পায়ের ধুলো নিলে। রীতুবাবু বললে—ভাল হয়ে যাবে। দেখো তুমি। মা ঠিক ভালো করে দেবেন।

রীতুবাবু বললে—এমন করে মাঝখান থেকে কথা বলো না শোভা, বলতে নেই। টাকা ওকে দিতাম আমি। ভাবছিলাম একটু যাচাই করার কথা। কেন জান, জাতটি তো আমরা ভাল নই। আমরা আসরেও ওই ভাবেই কাঁদি, কাঁদতে পারি। আসল নকল—

শোভা ফোঁস করে উঠল—তুমি ওই কান্না নকল বলছ? ওঃ, তোমরা বড়রা এমনই বটে।

রীতুবাবু হেসে বললে—তুমিও তো ছোট নও শোভা, আর খুকীও নও। এমন মিথ্যে করে টাকা যাত্রার দলে নিই না কেউ?

—নিই। তা বলে এমনি করে ছেলের নাম করে হাউ হাউ করে কেঁদে? অবিশ্যি পরের দলের লোক যদি বল তো কথাই বলব না।

—শোন তা হলে। আমি তখন যাত্রার দলে প্রথম ঢুকেছি। মিউনিসিপ্যালিটির চাকরিই আসল চাকরি, এটা ফাউ। মাত্র রাত্রিতে মানে যে রাত্রি নামি আট টাকা করে পাই। দলটা বড়, বাকী থাকে, কিছু জমলে নিয়ে যাই। সেবার চৌষট্টি টাকা পাওনা নিতে এসেছি দুপুর বেলা আপিস পালিয়ে হাওড়া থেকে। গরমের সময়, চৈত্র মাস। আপিসে এসে টাকা নিচ্ছি এমন সময় বড় নামজাদা অ্যাক্টর তখনকার, সিঁড়ি থেকে ওঃ-ওঃ-ওঃ বলে চীৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। মদে চুর। ঘরে ঢুকেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—ওরে আমার শিবু নেই। হা-হা-হা করে মাথার চুল ছিঁড়ে মাথা চাপড়ালেন। ম্যানেজার ঘনশ্যাম গোসাঁই—সে চমকে উঠে বললে—সে কি! এই তো সাতদিন আগে আপিসে এসেছিল আপনার খোঁজ পায় নি বলে, আপনি টাকা পাঠান নি বলে। উনি একখানা পোস্টকার্ড বুকপকেট থেকে বের করে ফেলে দিলেন, এই দেখ। ঘনশ্যাম পড়লে। কিন্তু খুব বিচলিত হল না। চিঠিখানা টেবিলে রেখে দিলে। আমি পড়লাম। চিঠির গোড়ায় লিখছে, অনেক দিন আপনার খবর পাই নি। আমারও পত্র দেওয়া হয় নি। বাধ্য হয়ে আজ আপনাকে দুঃখের সঙ্গেই লিখছি কাল আপনার বড় ছেলে মারা চলিয়া গেল। সামান্য অসুখ। কিন্তু না থাকিলে জোর করিয়া কি করিয়া রাখিব? জ্ঞাতার্থে নিবেদন। ঘনশ্যামকে উনি বললেন, একশো টাকা আমাকে দে ঘনশ্যাম, আমি বাড়ি যাই, তার কাজ করে আসি। তারপর আঃ-আঃ-আঃ। বুক চাপড়ানো এই সব। ঘনশ্যাম কিন্তু বললে, টাকা তো আমি দিতে পারব না মাস্টারমশাই, আমার ওপর কড়া হুকুম কর্তার সই ছাড়া টাকা দেবে না। ভদ্রলোক উঠে রুদ্রমূর্তিতে শাপশাপান্ত করে বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘনশ্যামকে কিছু বললাম না, টাকাটা নিয়ে একরকম ছুটে এসেই ওঁকে ধরে প্রণাম করে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বললাম,

আমার কাছে আর নেই মাস্টারমশাই। থাকলে দিতাম। ভদ্রলোক খানিকটা মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কেঁদে আমাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। বললেন, পরে আমি ঠিক তোমাকে দেব। উনি চলে গেলেন, আমি ট্রামে উঠব, ঘনশ্যাম আমার ঘাড়ে হাত রাখলে, বললে, টাকাটা দিলেন তো? বললাম, দিলাম বইকি। আমার ওপর তো মালিকের না-দেবার হুকুম নেই। আপনারা বড় হৃদয়হীন। ঘনশ্যাম হেসে বললে, ওর সব মিছে কথা মশাই। 'মারা' কথাটা 'ভারা', বাঁকড়োর ভারা গাঁয়ে ওর বাড়ি। চাকরিস্থলে ছেলেটা, অসুখ হয়েছিল অজুহাত করে ভারা চলে গেছে। মানে বাড়ি চলে গেছে। নইলে মারা গেলে—মারা চলিয়া গিয়াছে হয়? লিখত মারা গিয়াছে। আরও কিছু দুঃখ থাকত। উনি চিঠিখানা পেয়ে ভারাকে মারা করে টাকার তালে এসেছিলেন। ওর দাদন শোধ তো দূরের কথা, মাসে মাসে বাড়ছে। তা ঐ টাকা দিলেন? সব? বললাম, পঞ্চাশ দিয়েছি, চোদ্দ আছে। সে বললে, ভাগ্যিবান, চোদ্দ আনার জায়গায় চোদ্দ টাকা বেঁচেছে। পরে নিজেই তিনি স্বীকার করে উপদেশ দিয়েছিলেন, ভায়া, টাকা আমাকে সহজে দিয়ো না। এই উপদেশের দাম ওই পঞ্চাশ টাকা। তোমার পাওনার সঙ্গে শোধবোধ কি বল?

গল্প শেষ হতে হাসির গুঞ্জন উঠল। যোগাবাবু বলে উঠল, বুয়েচেন্ কণ্ঠমশায়ের দলে—

রীতুবাবু বললে—মাস্টার, কণ্ঠমশায়ের দলের কথা থাক।

—আজ্ঞে না, দলের কথা নয়, খোদ কণ্ঠমশায়ের কথা—উপদেশ। আর বিনা মূল্যে। হ্যাঁ।

—বলে ফেল। রিহারস্যাল বন্ধ। নটা বেজে গেছে।

দলের লোকেরা এতক্ষণ চিনির উপর পিঁপড়ের জটলার মত স্থির হয়ে বসে ছিল, এখন ওই কথাটির ঢেলার ঘায়ে নড়েচড়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। ছড়িয়ে পড়বে। যোগা বললে, শোন শোন 'কাটা বধা নামা। উলটে পড় জামা'। মানে—উলটালে হবে টাকা ধার মানা, সে দেওয়াও বটে নেওয়াও বটে। বুঝলে?

কে বললে—দূর্।

রীতুবাবু বললে—মিছে কথা যোগামাস্টার। কথাটি কণ্ঠমশায়ের কখনও নয়।

—আজ্ঞে, মাইরী—

—ফের মিথ্যে কথা বলছ? দিব্যি করছ?

যোগামাস্টার বিচিত্র, অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাক, হেসে ফেললে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। কিন্তু কি করে ধরলেন?

দু হাত কপালে ঠেকিয়ে রীতু বললে, কণ্ঠমশায় সাধক ব্যক্তি, সিদ্ধ পুরুষ হে। তাঁদের কথার একটা আলাদা জাত আছে, স্বাদ আছে।

—তা বটে।

কে পিছন থেকে বলে উঠল—এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।

যোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল—খবরদার! আমি মিথ্যেবাদী? সে উনি বলতে পারেন। রসিকতা করে বলেছি, তাতে আমি মিথ্যেবাদী!

রীতু মাস্টার একটা বিড়ি তাকে দিয়ে বললে—খাও। চীৎকার করো না। যাও যাও,

যে যার চলে যাও। শোভা, আমি কর্তার ওখানে যাব। আমার সঙ্গে যেতে পার। কই শোভা!

আশা বললে—শোভাদি বোধ হয় চলে গেছে। বোধ হয় গোপালী দিদির সঙ্গে গেছে।

একটু হাসি ফুটে উঠল রীতুবাবুর মুখে। সকলের সামনে শোভাকে ঘুরিয়ে একটু তিরস্কারই করেছে সে। সেই জন্য চলে গেছে। রীতুবাবু বিপিনকে বললে—একখানা রিক্শা ডাক বিপিন।

* * *

মঞ্জরীর বাড়ি এসে রীতুবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় শোভাকে ডেকে বললে—কি শোভা, না বলেই চলে এলে যে?

শোভার ঘরে দরজা বন্ধ। ঘরের ভিতর থেকে নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে—কি করব? ভাল লাগছিল না।

মঞ্জরী সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল এসে, সে বললে—আসুন, কাণ্ড দেখুন।

—কি?

—যা লিখেছিল সব ছিঁড়ে দিয়েছে।

—ছিঁড়ে দিয়েছেন? সে কি?

—হ্যাঁ। বলছেন—ও চলবে না।

রীতুবাবু সিঁড়ি শেষ করে উপরের বারান্দায় পা দিয়েছিল। সেখান থেকেই বললে—কি সার্। কি হল? প্রোপ্রাইট্রেস বলছেন—ছিঁড়ে ফেলেছেন সব?

গোরাবাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ভিতরে শুয়ে ছিল। ভাবছিল। বেরিয়ে এসে সেই চিন্তাকুলতার মধ্যেও ঠোটে একটু হাসির রেখা টেনে বললে—আসুন। হ্যাঁ, ছিঁড়েই ফেলেছি। জিনিসটা তো খারাপ হয় নি, বখন উইকনেস বশে ধরে ফেলি—তাই শেষ করেই দিয়েছি।

ভাল যখন হচ্ছিল তখন ধরে ফেলায় দোষটা কি হত?

হত, হত।—চলত না। দাঁড়িয়ে মার খেতে হত।

—এ কথা বলছেন কেন?

মঞ্জরী বললে—আমি বললাম, যাত্রায় না চলে থিয়েটারে দাও।

—সেও চলত না। এ কঠিন সত্য নাটকে চলবে না মাস্টারমশাই। থিয়েটারেও না। অন্ততঃ সামাজিক চেহারায় চলবে না। বসুন, বলছি। শিউনন্দন, মাস্টারমশাইকে ওর খাবার দে। আমি আপনার কাছে লোক পাঠাতাম। ছিঁড়ে অবধি না বলে স্বস্তি পাচ্ছি নে। তা দূত এসে খবর দিয়ে গেল আপনি আসবেন।

—কে? গোপালচন্দ্র?

—আবার কে! আমি আরও দেড়শো দিয়েই পাঠাতাম। ফিরে এসে খবর দেবে। বসুন। তুমিও বস। কাজটা কি তোমার এখন?

মঞ্জরীও বসল। তবে বললে—কি করব বসে? কথা তো তুমি শুনবে না কারুর।

—কি মাস্টারমশাই, কথা শুনি না আমি ?

হাসলে রীতুবাবু। শিউনন্দন তার গ্লাস ভর্তি করে দিল। গোরাবাবু বললে—আমায় চা দে। তারপর বললে—নতুন করে লিখব ঠিক করেছি। আমাদের যাত্রাদলের পুরনো ইতিহাস মিশিয়ে রোমান্টিক ব্যাকগ্রাউণ্ড।

—কেন ? সঙ্গে সঙ্গেই রীতু আবার বললে—আচ্ছা, বলুন শুনি।

গোরাবাবু বললে—আরও একটা অসুবিধা হচ্ছিল। সেটা হল, আমার নায়কের জন্যে ঠিক জায়গা হচ্ছিল না নাটকে। একটা অঙ্ক বাদ চলে যাচ্ছিল, কারণ প্রথম অঙ্ক শেষ হচ্ছিল নায়কের বাপ মানে বৃদ্ধের পুত্রের মৃত্যুতে।

—হ্যাঁ।

মঞ্জরী বললে—কেন, বাচ্চা ছেলে হিসেবে নাতি তো রয়েছে প্রথম অঙ্কে। প্রথম দৃশ্যেই রয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে ছিল না। সেখানে বাবুদের বাড়ি। তারপর সেই চ্যাংড়াটার পার্ট। তারপর আবার বাচ্চা নাতি। নাতিকে বাবুরা থিয়েটারে বিল্বমঙ্গলে রাখাল বালকের পার্ট দিয়েছে। ঠাকুরদা তাকে শেখাচ্ছে—ভাই, সুর করে বল। জান, বক্তৃতাতেও ছন্দ সুর আছে। ওরও তাল মান আছে। গানের থেকেও শক্ত। বুঝেছ ? সেটা তো বেশ সিন ! তারপর বাপের মৃত্যু হল হঠাৎ। সে সিনেও বাপ বলছে, আমি হেরে গেলাম জয়ধর, তুই যেন হারিস নে। ছেলে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। কাঁদল না।

গোরাবাবু বললে—ঠিক। কিন্তু এর পরই হচ্ছে আট দশ বছরের মত ফাঁক একটা। নায়ক যুবক। জয়ধরের সত্যিকারের গড়ন এই সময়েই মঞ্জরী। বাবা মারা গেলেন, বয়স তখন এগারো। মায়ের সঙ্গে তার কাকাদের কাকীমাদের বনল না। দাদুর বয়স তখন ষাট। অশক্ত হয়েছেন। গলা ভেঙে গেছে। ভাগবত করতে পারেন না। ছেলেদের পোষ্য। কাউকেই বলতে কিছু পারলেন না। না ছেলেদের না পুত্রবধূকে। পুত্রবধূর বাপের অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও খারাপ ছিল না, বাপ তখনও বেঁচে, মেয়ে দৌহিত্রকে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা ছিল। শিবহাটী অগ্রদ্বীপ বেশী দূর নয়। পিতামহও আসতেন মধ্যে মধ্যে দেখতে। একদিন অগ্রদ্বীপের বাবুদের বাড়ি থিয়েটারের রিহারস্যাল হচ্ছে, ঘরের মধ্যে ছোট ছেলেরা ভিড় করেছে জানালার ধারে। বিশেষ আগ্রহ—তাদের গ্রামেরই একটি ছোটঘরের ছেলেকে এনে রাখাল বালকের পার্ট বলাচ্ছে। সেটি জয়ধর নয়। জয়ধর অন্য ছেলেদের সঙ্গে দেখছে এবং দুঃসাহসী বলে সকলের আগে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে পার্টির লোকেরা মধ্যে মধ্যে ধমক দিচ্ছে। ওরা পালাচ্ছে, আবার আসছে। একবার কড়া ধমক দিতেই জয়ধরের অভিমানে লাগল। সে বললে, দূর—দূর—ওর চেয়ে আমি ভাল পারি। ওই আবার বক্তৃতা নাকি ? রিহারস্যাল রুমে বাবুরা বসে ছিলেন, বললেন, কে হে ছেলেটি ? ডাক তো—ডাক তো। ওরা ডেকে নিয়ে এল জয়ধরকে, জয়ধরের চেহারা দেখে খুব খুশী হলেন ওঁরা। বললেন, বক্তৃতা পার বলছিলে, কই বল তো। জয়ধর বললে, বলুন বলছি। অনেকক্ষণ শুনেছিল, ব্যাপারটাও বুঝেছিল, বললে, ভালই বললে। বাবুরা খোঁজ করে

জয়ধরের মাতামহের কাছে এলেন। বললেন, ওকে রাখাল বালক সাজাতে চাই। দেবেন? আমরা ইস্কুলে ফ্রি করে দেব। ভাল করে যাতে পড়াশোনা হয় দেখব। থিয়েটারে নিয়ে ওর ভবিষ্যৎ খারাপ করব না। নেহাৎ এমনি বাচ্চার পার্ট থাকলে নেব। জয়ধরের মাতামহ বললেন, ভেবে দেখি। মা বললেন, আমি দেব। জয়ধরের দাদুর সঙ্গে ঘটনাটা ওই বক্তৃতার সুর ছন্দ শেখা এর পর। দাদু আসতেই জয়ধর খবরটি না দিয়ে পারলে না। দাদু বললেন, কি সাজবি ভাই? জয়ধর বললে, রাখাল বালক ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। দাদু খুশী হয়ে বললেন, বল তো কেমন করে বলবি? তারপর সুর ছন্দ—গদ্য বক্তৃতার পয়ার বক্তৃতার তাল মান শেখালেন। তারপর প্রফুল্লতে যাদব, চাঁদবিবিতে বাহাদুরের পার্ট করলে জয়ধর। পড়াশোনাতেও ভাল ছিল। মাইনরে স্কলারশিপ পেলে। ওখান থেকে কাটোয়া স্কুলে ভর্তি হল। নতুন জীবন। ভাল লাগল খুব। কিন্তু ওই নেশা কাটল না। তবু সুযোগের অভাবে আর নামে নি থিয়েটারে। ম্যাট্রিকেও দশ টাকা স্কলারশিপ পেলে। ভর্তি হল গিয়ে বহরমপুর কলেজে। স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে, তার উপর ভাল চেহারা, এবং অগ্রদ্বীপের বাবুরাও সাহায্য করলেন চিঠিপত্র দিয়ে। বহরমপুরে কলেজে ফ্রি, হোস্টেলে ফ্রি হয়ে গেল। নাম হতেও দেরী হল না। কুমার হোস্টেলের কমনরুম তার কবিতা আবৃত্তি নাটকের বক্তৃতায় জমে উঠল। কলেজ-ম্যাগাজিনে লিখতে লাগল। প্রথমেই লিখলে সে নাটক। রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীর অনু-করণ অনুসরণ। জয়ধরের জীবনের দুটি বীজ—কিংবা একটি বীজের দুটি দল। একটি হল অভিনয়ের বীজ—ওট এসেছে দাদুর কাছ থেকে, অন্যটা উচ্চাশা—ওটা ছিল তার বাপের। আরও একটা আছে, সেটা, মাস্টারমশাই, অপরিতৃপ্তি। ওটা বোধ করি সবারই আছে। কিন্তু শক্তি সাহসের অভাবে আপোস করে নেয় মানুষ। জয়ধরের ওই সাহস দুঃসাহস আর শক্তি এই তিনে মিলিয়ে একটা যেটা সেটাই তার নিজস্ব।

—এটা কি আপনার নাটক হচ্ছে, না নিজের কথা হচ্ছে?

—নিজের কথাই বললাম বোধ হয়। কিন্তু ভাল লাগছে না মাস্টারমশাই। আর নাটকের দিকে এগচ্ছি না।

—এগচ্ছেন কি না বুঝতে পারছি না। তবে ভাল লাগছে। বলুন। প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে পুরনো হয়ে গেছে তো! হাসলে রীতুবাবু। বোতলটা টেনে নিয়ে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললে, দেখছেন না, এমন বস্তু এর মধ্যে আর ঢালি নি!

—তা হলে ফুলমার্ক আমার? নাটকেও এগচ্ছি, বুঝতে পারবেন? জয়ধর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবার সময় ভাল রেজাল্ট করলে না। তখন সে নাটক লিখতে শুরু করেছে। নাটক শেষ করে সে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসে নাটক নিয়ে গেল নবগ্রামের বাবুদের বাড়ি। অগ্র-দ্বীপের বাবুদের থিয়েটার তখন বন্ধ। নবগ্রামের বড়বাবু তখন কলকাতা থেকে ফিরে দেশে বসেছেন। থিয়েটার খুলেছেন। ওঁদের তখন বিপুল অবস্থা। ছোটবাবুর ঝোঁকে থিয়েটার। বড়বাবুর ঝোঁক তার সঙ্গে যোগ হয়ে সে সমারোহ ব্যাপার। জয়ধর নাটক বগলে ছোট-বাবুকে দেখাতে গেল। ছোটবাবু তো ছেলেটির চেহারা দেখেই খুব মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওঁদের গুষ্টিটাই কালোর গুষ্টি। কালো দশাসই চেহারা। থিয়েটারে পার্ট করতেন ভাল।

বড় কর্তাও করতেন কিন্তু থিয়েটার করলে লোকজনের সঙ্গে মিশতে হয়, তাতে ভয় ভেঙে যায় বলে পার্ট করতেন না। বাড়িতে তিন তিনটে গাইয়ে সুন্দর চেহারার ছোকরা থাকত, মেয়ের পার্ট করত। যাই হোক ছোটকর্তা কথাবার্তা বলে খুব খুশী হলেন। নাটক গান তিনি নিজে লিখতেন। লোক হিসেবে বেশ ভাল হাসিখুশীর মানুষ ছিলেন। বললেন, কাল এসো, আমি নিজে দেখে রাখব, তবে তুমি পড়বে আমি শুনব। কেমন ' ভারী ভাল লাগল হে! আমাদের এখানকার বড পণ্ডিত বংশের ছেলে, এমন খাপখোলা তলোয়ারের মত চেহারা, লেখাপড়ায় বৃত্তি পাওয়া ছেলে, সুন্দর কথাবার্তা, ভারী ভাল লাগল। ভাল করে পড়, ফার্স্ট হয়ে বি-এ, এম-এ পাস কর বাপু, স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাও। আই-সি-এস হয়ে এস বুঝলে ? হ্যাঁ, কাল নিশ্চয় এস। ঠিক এই চারটে পাঁচটার সময় আসবে। বই শুনব। কেমন হয়েছে বলব। ভাল হলে প্লে করব হে আমরা। ওঃ, তুমি তো পার্ট করতেও পার ভাল। অগ্রদ্বীপে রাখাল বালক, যাদব, বাহাদুর করেছিলে, খুব প্রশংসা হয়েছিল। তা এখনও পার্ট কর নাকি ? জয়ধর বললে, না। পরের দিন জয়ধর গেল। নাটক পড়লে। খানিকটা পড়েছে, বড়বাবু এসে ঢুকলেন—ছোট বসেছিস রে ? অ্যাঁ! এটি কে ?

পরিচয় করে দিলেন ছোটবাবু, জয়ধর উঠে প্রণাম করলে। বড়বাবু বললেন, বাঃ খাসা চেহারা তো তোমার! হ্যাঁ, তোমার দাদুর চেহারা, তোমার বাবার চেহারাও ভাল ছিল। তবে এমন ছিল না। তবে তাঁরা তো ভটচাজ পণ্ডিত ছিলেন। তুমি তো দেখছি মডার্ন ছোকরা। বৃত্তি পেয়েছ। বাঃ!

ছোট বললেন, নাটক লিখেছে! তাই শুনছিলাম।

—অ্যাঁ, লিখতেও পার ? তাই তো! তা পড তো শুনি খানিকটা।

জয়ধর পড়ে গেল। কর্তা মধ্যে মধ্যে বাঃ বাঃ বলে শুনে গেলেন, সে শেষ পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে লোক এল, কাছারী আপিসে কাজ আছে। লোক এসেছে। কর্তা বললেন—বসতে বল যাচ্ছি।

শেষ হলে বললেন, মন্দ লেখে নি তো। কিন্তু ভাষা যে বড় সাধারণ মেঠো মনে হচ্ছে। তা তোমাদের তো এ কালে সব রবিঠাকুরি ছাঁদ। ভাষা শুদ্ধ করা চাই বাপু। অনেক প্রশংসা করে তিনি উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, রাত্রি তো আটটা বাজে রে ছোট। ওকে না খাইয়ে পাঠাবি ? না না—খাইয়ে সঙ্গে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দে।

যেতে যেতে আবার ফিরে বললেন, আমরা বরং তিনজনেই একসঙ্গে খাব রে। বড়গিন্নীকে খবর পাঠিয়ে দে, বুঝলি। পুকুরে জাল ফেলতে বল। একটা বড় মাছ ধরা।

চলে গেলেন বড়কর্তা।

জয়ধর বলতে গিয়েও বলতে পারলে না—না। সেই সঙ্গেই আরও একটা কথা বলা হল না সে নিরামিষাশী। মাছ মাংস খায় না।

সংসারে এক একটা মানুষ এক এক রকম মাস্টারমশাই, জয়ধর সেই ধরনের মানুষ যাদের শক্তি এবং সাহস শুধু প্রবলই নয়, আবেগও প্রচণ্ড। কোনটা বেশী তা জয়ধরও জানে না।

কথাটা বুঝুন। সব তেলই জলে মাস্টারমশাই, কিন্তু কেরোসিন, পেট্রোল যেমন সহজে জলে তেমনি সহজে অন্য তেল জলে না। একে আগুনের হাত থেকে বাঁচানো কিংবা এর জলাটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সর্বনাশ ঘটিয়ে শেষ হয়। জয়ধরের শক্তি সাহসের কথা বলেছি, তার সঙ্গে তার আবেগের কথা বলা উচিত ছিল, সেটা বলি নি। নায়কের চরিত্রের উপাদান মনে না থাকলে আঁকবার হয়তো অসঙ্গতি হবে। সেটা ধরিয়ে দেবেন। মানে নাটক পুরনো কালের পটভূমিতে আরম্ভ করব তো। থাক, তার আগে বলে নিই, জয়ধর তখন নিরিমিষ খায়, গান্ধীর অহিংসা তার ভাল লেগেছে। বড়লোকের উপর খুশী নয়, বিশেষ করে নবগ্রামের বড়কর্তার উপর। এই বড়কর্তাই তখন ও অঞ্চলের বাঘ। রতনপুরের যে বুড়োকে দেখে এলেন, ও তখন গলিত-নখদন্ত। অগ্রদ্বীপের এঁরা দেশে থাকেন না, কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দে। তাঁদের উপর জয়ধরের কৃতজ্ঞতা ছিল এ কথা সত্য, তবুও সত্য বিচারেও এঁরা মানুষ ভাল। নবগ্রামের বড়কর্তাই দোর্দণ্ডপ্রতাপ, এবং দোর্দণ্ড-প্রতাপের মত শক্তিমানও বটেন। কলকাতা যে কলকাতা সেখানেও নাকি কর্তা 'মামীমার খেল্' খেলে এসেছেন।

হেসে ফেললে মঞ্জরী, বললে—মামীমার খেল্‌টা কি ?

—ওটা যে কি তা জানি নে। তবে কথাটার চল আছে। প্রতাপাদিত্য নাটকে ভবানন্দের মুখে কথাটা আছে। তা থেকে শিখেছি। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনী কাণ্ডের মত কাণ্ড। লোকপ্রবাদ—রাধা নাকি সম্পর্কে কৃষ্ণের মামী হতেন।

রীতুবাবু হাসলে, বললে—তাই।

গোরাবাবু বললে—মোট কথা কলকাতার বাজার তোলপাড় করেছিলেন বড়কর্তা। সে বড়বাজারে লোহা পট্টি, ক্লাইভ রোয়ে কয়লা পট্টি থেকে সিধে চিৎপুর ধরে সোনাগাছি পর্যন্ত। লোহার বাজার কয়লার বাজারের দালাল থেকে শেষের পাড়াটার বাড়িউলি থেকে গুণ্ডারা পর্যন্ত সেলাম বাজাতো বড়কর্তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিঠে ছুরি খেয়ে মাস দুয়েক বাড়িকেই হাসপাতাল বানিয়ে বেঁচে উঠে কলকাতাকে সেলাম করে দেশে ফিরে এসেছেন। ছোট ভাই ছিল সহকারী, টুর করতেন, তাকে নিজের আসনে বসিয়ে দিলেন। মেজ ভাইয়ের ছেলে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছিল, তাকে পড়া ছাড়িয়ে কলকাতার আপিস-ম্যানেজার করে দিয়ে বাড়ি এলেন। দীক্ষা নিলেন। সোনাগাছির ছোঁয়াচ গঙ্গাজলে স্নান করে ধুয়ে ফেলে ও-দিক থেকে একেবারে পাল্টে গেলেন বটে, কিন্তু বিষয়-পিপাসা আর দোর্দণ্ডপ্রতাপপনা একেবারে বিন্ধ্য পর্বতের মত মাথা ঠেলে আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। গলায় তুলসীকাঠের মালা, কপালে চন্দনের তিলক নিয়ে ভোরবেলা স্নান পূজা সেরে এসে আসনে বসতেন। চোখের দৃষ্টিতে লোকে ভস্ম না হোক ধপ করে বসে পড়ত। এই বড়কর্তা। সেই বড়কর্তা সেদিন জয়ধরকে এমন স্নেহ করে খাতির করে কথা বলে প্রশংসা করে রাত্রে খোদ বড়গিন্নীর ঘরে নিজের সঙ্গে বসে খাবার নিমন্ত্রণ করতে জয়ধর শুধু অভিভূতই হল না একেবারে বিগলিত মুগ্ধ হয়ে গেল। তার ধারণাই সব বদলে গেল। রাত্রে খেতে বসে সে যখন আবার মাছ খেলে না তখন আবার বড়বাবু হতবাক হয়ে গেলেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

বললেন—বল কি ? মাছ খাও না ? অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে শুধু তাকিয়েই রইলেন। শুধু তিনি নন, ছোটকর্তা, মেজবাবুর ছোট ছেলে, খোদ বড়গিন্নী এবং তাঁদের সামনে মাছের পাত্র এবং পিতলের হাতা হাতে বড়কর্তার কুমারী মেয়ে সেও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল জয়ধরের দিকে।

—নাটক আমার এইখান থেকে আরম্ভ হবে। এই কথাগুলো ডায়ালগের মধ্য দিয়ে খুলতে হবে। ধরুন—এক রাজা। পুরাণের কালে যাওয়াই ভাল। ধরুন দ্বাপর কি ত্রেতা, না হয় সত্যযুগ। সত্যযুগ ভাল। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত তিন পুরাণের কোনটিতেই এ যুগটার পূর্ণ কাহিনী নেই। ধরুন সত্যযুগ, ব্রহ্মার এক মানসপুত্রের বংশ- -দেববংশের তুল্য, নাম ধরুন ব্রহ্মমিত্র, তাঁর দুই ভাই বসুমিত্র, দেবমিত্র। হিমালয় অঞ্চলে রাজ্য দেবদ্বার, রাজধানী জয়ন্তীপুর।

হেসে রীতুবাবু বললে—এ যে ইতিহাস ভূগোলের মত মুখস্থ বলে যাচ্ছেন দেবতা! তা হলে তো ছকে ফেলেছেন ফের, মনে হচ্ছে!

গোরাবাবু কিছু বলবার আগেই নিচে দরজায় গোপাল ঘোষের সাড়া পাওয়া গেল। সে সিঁথি থেকে ফিরে এসেছে, ডাকছে—নন্দন! শিউনন্দন!

মঞ্জরীর মায়ের মা বাচ্চা শিউনন্দনকে ডাকতেন নন্দন বলে। পুরনো লোকেরা অনেকেই আজও 'নন্দন' বলে। গোপালও মধ্যে মধ্যে বলে। কিন্তু সহজে বলে না। একটু আধটু প্রমত্ততা গোপালের আছে। মধ্যে মাঝে। সেই সময় শিউনন্দনকে বলে 'নন্দন', যোগানন্দকে বলে যোগেশ্বর, বংশীকে বলে বাঁশরীওলা, অর্থাৎ হৃদয়ের আবেগ একটু উথলিত হয়ে ওঠে।

বংশী দরজা খুলে দিতেই সে উপরে উঠে এল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বললে—দিয়ে এলাম বাবু! ছেলেটার কণ্ডিশন খারাপই বটে।

রীতুবাবু বললে—তা এ কার্যটি কোথা হল ?

কার্যটি অর্থাৎ মদ্যপান।

গোপাল একটু হেসে বললে—কি বলে—কাশীপুরের শ্মশানের পাশে একজন সাধু এসেছেন। সেই বাবার কাছে।

গোরাবাবু বললে—এর মধ্যে সেখানেও গিছলেন নাকি ?

গোপাল বললে—হ্যাঁ। কি বলে—বঙ্কিমের বাড়ি গিয়ে দেখলাম ছেলেটি একটু ভাল, মানে বঙ্কিম যে ক্রাইসিস দেখে, কি বলে,, ছুটে এসেছিল—সেটা সামলেছে। সে ওই সাধুর কৃপায়। ডাক্তার টাকা নইলে আসবে না, বঙ্কিম টাকার জন্যে, কি বলে, এখানে এসেছে—ওদিকে খুব বাড়াবাড়ি, তখন কি বলে, বঙ্কিমের পরিবার পাগলের মত ছুটে যায় ওই বাবার কাছে। বাবার পায়ে আছড়ে পড়ে। বাবা, কি বলে, একটু ধুনীর ছাই তুলে হাতে দিয়ে বলেন—যা এই নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দে। বাঁচে তো এতেই বাঁচবে। আশ্চর্য মাস্টারমশাই, কি বলে, বঙ্কিমের বউ বাড়ি এসে যখন পৌঁছুল তখন একটু সামলেছে ছেলে। তারপর ভস্ম খাইয়ে দেয়। এদিকে যে ডাক্তার দেখেছিল—টাকা বাকীর জন্য আসে নি, সেও

এসে হাজির হয়। বলে, অনেকই তো গেছে, না হয় আর খানিকটাও যাবে। মানে সবই বাবার খেলা রীতুবাবু!

রীতুবাবু মদের নেশায় লাল চোখ দুটো বিস্ফারিত করে শুনছিল। মঞ্জরীর মুখও বিস্ময়ে থম্থম্ করছে।

গোরাবাবু একটু হেসে বললে—হুঁ। তা ডাক্তার দেখছে তো? না শেষ ওই ভগ্নসারের উপরই রইল ছেলেটা?

—আজ্ঞে না। ডাক্তার ইনজেকশন দিয়েছেন তারপর। আমরা কি বলে, যখন গেলাম তখন ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে বেরিয়েছেন, রিকশাতে উঠবেন। আমি তাঁকে নামিয়ে টাকা মিটিয়ে দিয়ে রসিদ নিয়ে বললাম—কি বলে ডাক্তারবাবু—গরীবকে দয়া করে দেখে যাবেন। তা ডাক্তারটি লোক ভাল। কি বলে, একশো টাকার ওপব বাকী। তার উপর কি বলে, বুঝলেন—বাঁচবে নাই ধরে নিয়েছিলেন। তাই আসেন নি। বলেছিলেন টাকা নইলে যাব না। তা পরে, কি বলে, বাবার দয়া—বুঝেছেন না, বাবার দয়া, ফিরিয়ে দিয়ে মনে হয়েছে এতদিন দেখে শেষ সময়টা আর না যাওয়াটা কি বলে—ভাল হবে? নিজেই এসেছেন। এসে কি বলে, নিজেও অবাক, বিনা ওষুধেই ছেলের অবস্থা ভাল। তখন কি বলে, ইনজেকশন দিয়েছেন, প্রেসক্রপশন লিখে ডাক্তারখানায় ওষুধ দিতে লিখে দিয়েছেন। ও ছেলে, কি বলে, বেঁচে যাবে। বাবা, কি বলে, আমাকেও বললেন। কি বলে, এই কাণ্ড দেখে, কি বলে, আমি টাকাকড়ি দিয়ে, কি বলে, একটা বোতল নিয়ে, কি বলে, গেলাম তখুনি। তা কি বলে, দেখলাম, দারুণ সাধু একখানা! কি বলে, হাসি কি—হা-হা-হা-হা—একেবারে কি বলে, গঙ্গাতীর একেবারে যেন খল্খল্ করে উঠল। বললেন, তুই বেটা তো ভাল লোক রে। বোতল এনেছিস। তা নে, প্রসাদ নে।

গোপাল ঘোষ পার্টের সময় ইমোশন আনতে পারত না বলে ওর ত্রৈলোক্য মা ওকে বলেছিল, গোপাল, তুই ম্যানেজমেণ্টো ভাল পারিস তাই কর। ও অ্যাক্টো করা তোর হবে না। দূত প্রহরী সেজে মরবি। বাঁশী বাজালে বুক যাবে। কথাটা সত্যি। মধ্যে মাঝে লোকের অভাবে গোপাল দু একবার বছরে নামে এবং প্রতিবারই মিনমিন করে অ্যাক্টিং কোন রকমে সেরে এসে পোশাক খুলতে খুলতে বলে—বাবা, যার কম্ম তারে সাজে। নে রে শিবু, (বেশকারী শিবু) তোর পোশাক নে। ওরে রাধাচরণ, তেল দে বাবা, তুলে ফেলি কলঙ্ক কালী! কিন্তু আজ এতক্ষণ যে বক্তৃতাটি করলে সে তাতে রাত্রির এই আসরটি জমজমাট হয়ে উঠেছিল। বলার মধ্যে যত আবেগ বলার ভঙ্গির মধ্যেও তেমনি একটানা প্রগল্‌ভতা!

গোরাবাবু হেসে ফেললে—সুরেলা গলা কাঁপানো বক্তৃতায় যাদের হাসি পায় মনটা তার তাদের মত—সে বললে—এই তো গোপালবাবু, আপনার বক্তৃতা তো বেড়ে আসে। কিন্তু একটা কথা তো বললেন সাংঘাতিক—দারুণ সাধু! সেটা কি রকম বলুন তো!

রীতুবাবু উঠে দাঁড়াল। বললে—কাশীপুর শ্মশানের কোন দিকটায় বলুন তো?

গোপাল ঘোষ বললে—উত্তর দিকে। বাবুদের বাড়ির ধারে বটগাছটা আছে—

গোরাবাবু চমকে উঠে গোপালের কথায় মাঝখানেই বললে—সেখানে যাবেন না কি এই রাত্রে?

হাসলে রীতুবাবু—কি করব! দেখে আসি। এই রাত্রে যাব হাওড়া। বাসী নোংরা বিছানা—পলেস্তারা খসা ছাদের টালি—আলকাতরা মাখানো পুরনো কড়ি বর্গা; কিংবা পথে যেতে একটা কসবী-পাড়া পড়ে, সেখানে যদি কেউ নয়ন নাচায় তবে "ভেবে দেখ মন কত তোরে নাচায় নয়ন" বলতে বলতে ঢুকে পড়ব। হয়তো কালও পড়ে থাকব। তার থেকে যাই না শ্মশানে গঙ্গার ধারে, দেখে আসি গোপালমহারাজের সাধুজীকে। ঘুম পেলে শোবার একটা কম্বল কিংবা চাটাই চাই। তা দে তো শিউনন্দন একটা কম্বল। রাগটাগ নয়, খাঁটি কম্বল। দে তো বাবা, ভাদ্র মাস, ভিজে মাটি—ওটা না হলে কষ্ট হবে।

মঞ্জরী শুধু একবার বললে—মাস্টারমশাই—

রীতুবাবু বললে—কিছু ভাববেন না প্রোপ্রাইট্রেস, কাল ঠিক এসে হাজরে দেব।

—খেয়ে যান।

—উঁহু। সেও সেইখানে! বরং একটা বোতল আমাকে দিতে হুকুম করুন শিউনন্দনকে। এত রাত্রে দোকান বন্ধ। কোথাও বে-আইনী আড্ডায় গেলে ভয় আছে, যাত্রা ভঙ্গ করে জমে যাব সেইখানেই।

সাত

এ মায়াপ্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

ফুটপাথের উপর থেকেই মোটা গলায় গান ধরে চিৎপুর রোডের আপিসের বাড়ি ঢুকল রীতুবাবু। সেই সেদিন রাত্রে বেরিয়েছিল, ফিরছে আজ চোদ্দ দিন পর। ফিরছে কিন্তু ঠিক দিনটিতে। আজ মঞ্জরী অপেরার নতুন নাটক পড়া হবে, পার্ট ডিস্ট্রিবিউশন হবে। এর মধ্যে চিঠি একখানা দিয়েছিল রীতুবাবু। বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর থেকে। একখানা পোস্টকার্ড। পেন্সিলে লেখা। "সাধুবাবার সঙ্গে বক্রেশ্বর আসিয়াছি। তারকেশ্বর হইয়া এখান—এখান হইতে সম্ভবত তারাপীঠ। সাধুকে ভাল করিয়া কষটু করিয়া না দেখিয়া ফিরিব না। বারো দিনের কড়ার আছে। আপনার দাদুর শ্রাদ্ধে থাকিতে পারিলাম না, তাহাতে লজ্জা হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই। মোট কথা তের চোদ্দ দিন হইবে। শ্রাদ্ধের কাজে গোপাল আছে, ভাবনা নাই। ইতিমধ্যে বই শেষ করুন। বই আপনি ফের শুরু করিয়াছেন তাহা সেই দিনই বুঝিয়াছি। আমি ঠিক পঁহুছিব। ইতি রীতু বোস।"

এমন কাজ রীতুবাবুই পারে। গোরাবাবু হেসেছিল। মঞ্জরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল, বলেছিল—সংসারে উনি বেশীদিন থাকবেন না দেখো।

গোপাল ঘোষ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল—তা উনি পারেন। কথাটা ঠিক বলেছ মা!

গোরাবাবু বলেছিল—ঠিক ফিরবেন উনি।

মঞ্জরী বলেছিল—তা কি করে বলছ ?

বাবুল বোসও সেদিন উপস্থিত ছিল, অলকাও ছিল। রীতুবাবুর অনুপস্থিতিতে বাবুলই সন্ধ্যেতে চিৎপুরের আপিসে রীতুবাবুর কাজ করছিল ; ওখানে যাবার আগে গোরাবাবু মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা করে তবে যেত। সেদিনই চিঠিখানা বিকেলের ডাকে ওদের সামনেই এসেছিল। মঞ্জরীর কথাটায় বাবুল বলে উঠেছিল—কি করে বলছেন ? উনি অঙ্ক কষে বলছেন। আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। সিগারেট প্লাস মদ ইজ ইকোয়াল টু অ্যাট লিস্ট ওয়ান রুপী টুয়েল্‌ভ্‌ অ্যানাস। প্লাস—ছু বেলা রাইস কারি। অ্যাণ্ড তার উপর কন্ট্রোলের বাজার। ডেলি বেগিংএ কত ? যতই হোক একটা তার পরেরটা প্লাস হবে না, মাইনাস। সো, বিগ ব্রাদারকে ফিরতেই হবে।

গোপাল বললে—আপনি জানেন না বোসবাবু। কি বলে, বৈরাগ্য হলে না—

গোরাবাবু হেসে বলেছিল—তা ঠিক, বৈরাগ্য হলে সিগারেট মদ ছাড়াও যায়। আবার সিগারেট মদ গাঁজা, খাওয়াদাওয়া কিছুরই অভাবও হয় না। মঠ বনে যায় বনের মধ্যে শ্মশানের পাশে। কিন্তু কি জানেন গোপালবাবু, অ্যাক্‌টিং করে হাততালি পাওয়া যায় না, রঙচঙ মেখে সাজপোশাক করে দেবদৈত্য ব্রহ্মাবিষ্ণু নাদির শা আলমগীর সাজা যায় না। ও যে একবার এতে মজেছে না—সে ঈশ্বর এলে বলবে, প্রভু, সাজঘরে গিয়ে রঙ মেখে সেজে গান গাইতে গাইতে এস। এমনি জমবে না। রঙ না মাখলে ও মুখ চোখ ধরবে না।

হেসে উঠেছিল বাবুল। গোপালও হেসেছিল। মঞ্জরীও স্বীকার করেছিল—তা বলেছ ঠিক।

অলকা সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল গোরাবাবুর কথা শুনে। বলেছিল—ভারি সুন্দর বলেছেন।

গোরাবাবু লিখতে লিখতেই কথা বলছিল, এরপর আবার লেখায় মন দিয়েছিল। বলেছিল—যাও, তাঁর জন্যে ভেবো না—সে হবে। রীতুবাবু না আসেন অন্য লোক নেওয়া যাবে। ওঁকে ব্রহ্মমিত্র দেব ভেবেছি, যদি ওটাই বড় হয়, কেটে খাটানো না যায়, তখন ওটা আমি করব। তরুণ নায়ক জয়ন্তের পার্টে অন্য লোক নেব। নতুন ভাল ছেলে অনেক পাব।

বাবুল বলেছিল—আমি এনে দেব। পছন্দ না হলে মূল্য ফেরত। গ্যারান্টি রইল। রাণু লাহিড়ী বলে এক ছোকরা আছে, ওয়াণ্ডারফুল।

—সে হবে। এখন গিয়ে আসর বসাও। অলকা, তুমি জনাতে মোহিনীমায়ার নাচটা ঠিক করে নিয়ো। রিহারস্তাল দিয়ো। ওটা আমাদের স্টক প্লে, আর সতী তুলসীতে শ্রীকৃষ্ণ। বুঝেছ ?

গোপাল বলেছিল—বইটার নাম পেলে ভাল হত। ওরা সব হ্যাণ্ডবিল বের করেছে। রয়েল বীণাপাণি খুব বাহারের হ্যাণ্ডবিল বার করেছে—বিদ্যাবিনোদের উত্তরা খুলছে ওরা।

গোরাবাবু মুখ তুলে একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল—আমাদের নতুন বই 'গন্ধর্ব কন্যা'।

রীতুবাবু এসে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে সেই সহাস্য মুখে বললে—যথাসময়ে প্রবেশ করেছি

স্যার।

গোরাবাবু হেসে বললে—আসুন। আমি জানতাম আপনি যথাসময়ে আসবেন।

রীতুবাবু বললে—সাধে কি আপনাকে দেবতা বলি স্যার!

বাবুল বললে—আমিও বলেছিলাম, কি মাই লর্ড, বলি নি ?

—বলেছিলে। কিন্তু সেটা বলেছিলে, সিগারেট আর পানীয়ের জন্যে।

রীতুবাবু বললে—দূর দূর! আজ সাধুর পাল্লায় পড়ে আট দিন স্রেফ বিড়ি আর ছোট কল্কের উপর চালিয়ে এসেছি। পকেট ফাঁক, পাব কোথায় ? শেষে হাতের আংটি বেচে রামপুর হাটে শা কোম্পানীর দোকানে এক পাঁট রাম কিনে বাকিটায় টিকিট কেটে ফিরেছি।

বাবুল বললে—তা হলেও হাফউইথড্র বলেছি স্যার। দেন (then) দেবতা না হতে পেরে থাকি উপদেবতা নিশ্চয় হয়েছি। কি বিগ ব্রাদার ?

—নিশ্চয়। 'সন্দেহ নাহিক ইথে আর।' কিন্তু বইখানার নাম তো বড় ভাল দিয়েছেন। 'গন্ধর্ব কন্যা'। খাসা নাম হয়েছে।

—এর মধ্যে দেখলেন কোথায় ?

সিঁড়ির মুখে দরজার পাশে হ্যাণ্ডবিল সেঁটেছে গোপাল। পড়ে উঠেছি। ভাল নাম। তা নমো রামকৃষ্ণায় বলে শুরু করে দিন। বিলম্ব কিসের ?

—অলকার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রীতুবাবু চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বললে—কই, যোগামাস্টার কই ? সে কোথায় ?

গোরাবাবু বললে—তাকে আমি বাদ দিয়েছি।

—কি ব্যাপার ?

গোরাবাবুর কণ্ঠস্বরে এবার মালিক সাড়া দিলে, বললে—কারণটা আমি বলতে চাই নে মাস্টারমশাই!

মঞ্জরী নত দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে—ও আলোচনাটা থাক।

আসরটা কেমন যেন থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠল। শোভা ওপাশে বসে এতক্ষণ ধরে কথা বলবার সুযোগ খুঁজছিল, অলকার কথা উঠবার সময়টিতেই এক ঢিলে দু পাখী মারবার মত একটি কথাও ঠোঁটের ডগায় এসেছিল তার, অপেক্ষা করছিল রীতুবাবু বলবে—কেন, তার হল কি ? কিংবা 'তার দেরী কেন ?' সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে ভেবেছিল 'সে তোমার বিরহে গড়ের মাঠে গাছতলা সার করেছে।' শোভা কদিন আগে নাটু আর গোপালীর সঙ্গে চিড়িয়াখানা গিয়েছিল দশটার সময়। যাবার পথে সে অলকাকে এসপ্লানেডের পার্কে একটা গাছতলায় একটি ভদ্রবেশী লোকের সঙ্গে কথা কইতে দেখেছে। কথাটা গজ্‌গজ্‌ করছে তার পেটে। বলেছেও কজনকে। কিন্তু এমন আসরে অলকার অনুপস্থিতির সুযোগে একসঙ্গে রীতু এবং তাকে জড়িয়ে কথাটা বলবার জন্য তার প্রাণটা যেন হাঁসফাঁস করে উঠেছিল। কিন্তু রীতুবাবু অলকার কথাটা একেবারেই চাপা দিয়ে যোগাবুড়োর কথা পেড়ে বসল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্তাগিন্নীর কথার সুরে চড়ে থমথমে হয়ে উঠল।

গোরাবাবুই নিস্তব্ধ আসরটিকে কথা বলে চালু করে দিলে—কই গোপালবাবু, চা-টা কই আপনার ? মাস্টারমশাই এলেন—

—এই আনছে। সিঁড়িতে উঠছে চা নিয়ে।

—নিন, ততক্ষণ সিগারেট শুরু করুন। নাও দিলদার।

দিলদার হল বাবুল বোস।

একই সঙ্গে চা-ওলা এবং অলকা ঘরে ঢুকল। অলকার পরনে আজ একখানা ঘোর লাল রঙের রেশমী শাড়ি, ঘরটা ঝিকমিক করে উঠল। বললে—আমার দেরী হয়ে গেছে। বিকেলবেলা যা ভিড়।

বাবুল বললে—রাবিশ। তুমি ঘর থেকেই বের হও নি। আমি চারটে পর্যন্ত তোমার জন্যে ওয়েট করেছি।

শোভা বলে উঠল—না না বাবুলবাবু। এসপ্লেনেডে—গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যা ভিড়। ট্রামের পর ট্রাম চলে যায়, তবু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

গোরাবাবু বললে—আর না। চুপ সব। চা দাও হে। আমি আরম্ভ করছি।

বাতুবাবু বললে—জয় কালী। জয় রামকৃষ্ণ।

গোরাবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে খাতাটা টেনে নিলে। বললে—'গন্ধর্ব কন্যা'।

*   *   *

—পাত্রপাত্রী হল—, না, তার আগে স্থান কালটা বলে নিই। কাল সত্যযুগ। স্থান হল হিমাচল ভূমিতে দেবদ্বার, রাজধানী জয়ন্তীপুর। এরপর পাত্রপাত্রী।

ব্রহ্মমিত্র—দেবদ্বারের অধিপতি—ব্রহ্মার মানসপুত্র বংশোদ্ভব।

বসুমিত্র—ব্রহ্মমিত্রের কনিষ্ঠ।

ভরদ্বাজ—ব্রহ্মমিত্রের মন্ত্রী।

জয়ন্ত—বৃহস্পতির বংশোদ্ভূত পিতৃমাতৃহীন যুবক।

কামন্দক—রাজসভার বয়স্য (তরুণ)।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি পড়ল বাবুলের উপর। এ পার্ট বাবুলের।

বাবুল বললে—হোয়াই তরুণ স্যার, মেক মি ওল্ড।

গোরাবাবু বললে—উঁহু, কামন্দক রাজার রাজভ্রাতার এমন কি রাজজামাতা জয়ন্তেরও বয়স্য।

—দেন (Then) বুড়ো করুন, বুড়ো করুন। নাতি ঠাকুরদার মত রসিকতার রসের মিছরী বানিয়ে দেব।

গোরাবাবু বললে—পরে সে সব হবে বাবুলবাবু। মাঝ জায়গায় এ ধারার আলোচনা করার নিয়ম নেই আমাদের।

—ও-কে। এখন থেকে আমি বোবা—মানে ডাম্ব।

গোরাবাবু হেসে বললে—থ্যাঙ্ক য়ু।

তারপর সকলের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে—মোটামুটি কাকে কোন্ পার্ট দেব আমার একটা ঠিক আছে। রিহারস্যালে হয়তো বদল হতে পারে। সে সবই মাস্টারমশাই

প্রোপ্রাইট্রেস এঁদের পরামর্শ মতই হবে। আবার পার্টেও কিছু বদল করতে হতে পারে। তখন বয়স্ক যদি বুড়ো হলে ভাল হয়, তাই হবে।

—থ্যাঙ্ক য়ু। বাবুল বোস কথাটা বলে উঠল, ঠিক যে ভাবে ঘড়ির বড় কাঁটাটা বারোটায় ঠেকলেই সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে সেই ভাবে। বলেই কিন্তু বললে—আমার কিন্তু দোষ নেই স্যার!

রীতুবাবু বললে—ও-কে লিটল ব্রাদার। রঙ্গের নটবরের ওটা কৌতুক। যিনি নটবর তিনিই মাধব।

—"মূকং করোতি বাচালং"—মাধবের সেটা দয়া। কিন্তু মাধব যখন নটবর হন তখন কৌতুক করে করেন। নিন স্যার, আরম্ভ করুন।

গোরাবাবু বললে—পশ্চিমের জানলাটা কে খুললে? অ। কিন্তু আলোটা আসছে ভাল। তবে—। অলকা, তুমি একটু সরে বস। তোমার সিল্কের শাড়ির লাল রঙের উপর রোদ পড়ে ছটাটা আমার চশমায় লাগছে।

কথাটা সত্যি। গোরাবাবুর চশমায় তো লাগছেই, তা ছাড়াও গোটা ঘরটায় লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। কম আর বেশী।

শোভা মৃদুস্বরে বললে—একটু সরলেই হবে, ছটাটা বাবুল আর মোটকা মিনসের মুখে ঝলবে। বলেই সে গোপালীর হাতের আঙুলে চিমটি কাটলে। গোপালী প্রথমটায় বললে—উঃ! কিন্তু তারপরই হাসতে লাগল।

মঞ্জরী তার দিকে বিরক্তিভরে তাকালে। গোরাবাবু বলে উঠল—এই ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, তারপর পাত্রদের মধ্যে আছে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শাপভ্রষ্ট বৃহস্পতি জয়ন্তকুমারের পিতামহ।

রীতুবাবু অতি মৃদুস্বরে বললে—হুঁ। সেই মনুষ্যটি!

গোরাবাবু বলেই গেল—দেববৃন্দ, সেনাপতি, দূত ইত্যাদি। এইবার নারী চরিত্র হল—

সর্বাণী—রাজা ব্রহ্মমিত্রের মহিষী। দেবকন্যা।

শুচি—ঐ কন্যা, দেব-অংশভূতা। পরে জয়ন্তের পত্নী।

কুসুমিকা—শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব বংশীয়া গায়িকা।

মালবিকা—কুসুমিকার কন্যা।

এ ছাড়া সখী, পরিচারিকা, গন্ধর্ব কুমারীগণ।

গোরাবাবু খাতা থেকে মুখ তুলে একটা সিগারেট ধরালে। রীতুবাবু হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা আকর্ষণ করলে। সন্ন্যাসী সঙ্গ ফেরত রীতুবাবুর পকেটে আজ সিগারেট নেই। টাকাপয়সাও তাই। গোরাবাবু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেখলে—দরজার মুখে দাঁড়িয়ে গোপাল।

সুযোগ বুঝে গোপাল গলা ঝেড়ে ইঙ্গিত দিলে—কথা আছে।

গোরাবাবু বললে—কি?

গোপাল ঘোষ বললে—ইউসুফ চুলওয়ালা এসেছে। বসতে বলব আজ? দিন তো আর নেই।

—বসতে বলবেন?

পোক্তা ফাঁক পেয়ে গোপালীর কানে কানে বললে—হ্যাঁলা, ছুঁড়ির লিপস্টিকের ছটা লাগছে না ওদের চোখে ?

গোপালী মুখে কাপড় চাপা দিলে।

—দেখ দেখ, মোটকা মিনসে ছুঁড়িটাকে যেন গিলছে লো!

গোপালী এবার কাপড় মুখের ভেতর গুঁজলে।

গোপালবাবু বললে—আজ থাক, কাল আসতে বলুন। কি গো ?

মঞ্জরী পানের বাটা খুলেছিল, সে বললে—সেই ভাল। বরং কাল সকালের দিকে আসতে বল।

—তাই।

—হ্যাঁ। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। জয়ন্তীপুরের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ। পুরমহিলা একদল পূর্ণকলসী নিয়ে গান গেয়ে চলে গেল। পিছনে প্রবেশ করলে ভরদ্বাজ—ব্রহ্মমিত্রের মন্ত্রী—তার সঙ্গে একদল লোক, তাদের হাতে ধ্বজাপতাকা—তারা সব নাগরিক, তারা দুই পাশে পতাকা ধরে দাঁড়াল।

মন্ত্রী বললে—

—দেবদ্বার রাজ্যে আজ শুভদিন। জয়ন্তীপুরের
প্রাসাদের বিষণ্ন অন্ধকার অবসান এতদিনে।
পরাও আলোর মালা—উড়াও পতাকা—
প্রোষিতভর্তৃকা জয়ন্তীপুরের পতি দীর্ঘদিন পর
গৃহে ফিরেছেন। আর নাই
অসুর বা দৈত্যদল অভিযান ভয়—
প্রত্যাগত ব্রহ্মমিত্র অমিত বিক্রম।—নাচো গাও—
আলোয় আনন্দে জয়ন্তীপুরের মুখ
উঠুক প্রদীপ্ত হয়ে সীমন্তিনী সম! বল সমস্বরে—
দেবদ্বার জয়ন্তীনগর জয় জয় জয়—
জয় মহারাজ অধিরাজ ব্রহ্মমিত্র জয়!

সাড়া উঠল কিন্তু ক্ষীণ স্বরে।

মন্ত্রী বলবে—এ কি ? এর নাম জয়ধ্বনি ? প্রাণহীন,
বিষণ্ন নিস্পৃহ কণ্ঠে একি জয়ধ্বনি ?

একজন এবার বললে—ক্ষমা করবেন মহামাত্য। মহারাজ সত্যই কি ফিরেছেন ?

—অবিশ্বাসের হেতু শ্রেষ্ঠীবর ?

—তাও কি আপনাকে বলতে হবে মহামন্ত্রী ? আজ দীর্ঘ দশ বৎসর মহারাজ ব্রহ্মমিত্র অমরাবতীবাসী। রাজ্য শৃঙ্খলা হারাল, অসুরকুল দৈত্যকুল সুযোগ বুঝে আজ দশ বৎসর সীমান্ত জনপদগুলি বিধ্বস্ত করলে, লুণ্ঠন করলে। দেবলোকে সংবাদ গেল, মহারাজ এলেন, দৈত্য অসুরেরা অপরাজেয়, দেবপ্রসাদধন্য ব্রহ্মমিত্রের আগমন জেনে আপন আপন রাজ্যে

গিয়ে লুকোল। মহারাজ হেসে দেবদ্বারের অধিবাসীদের ব্যঙ্গ করে আবার কয়েকদিন পর দেবলোকে চলে গেলেন। অমরাবতীর ঐশ্বর্যবিলাস, সেখানকার দেবপ্রসাদ, সেখানকার—

—ভয় কিসের? থামলেন কেন? পুণ্যভূমি সামন্তরাজ, আজ ভয়ের কথা নয়; স্পষ্ট করে বলুন, সেখানে নৃত্যগীত গন্ধর্বলোকের বিলাসব্যসনে তপস্যাধন্য ব্রহ্মাবংশধর ব্রহ্মমিত্র আবার ভুলে গেলেন দেবদ্বারের প্রজাদের। শুধু প্রজা কেন, তাঁর মহিষী, তিনি দেবকন্যা দেবী সর্বাণী একমাত্র কন্যাকে বুকে চেপে ধরে নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিলেন। বিষ্ণুপাদপদ্মে তাঁর অশ্রুধারায় নতন গঙ্গার সৃষ্টি করলে, তবু মহারাজের মোহমুক্তি হল না। অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁর মধ্যম ভ্রাতা শিবমিত্র প্রাণত্যাগ করলেন। মহারাজ এলেন, প্রচণ্ডবিক্রমে সংগ্রাম করে অসুররাজকে নিহত করে শোধ নিয়ে, দেবদ্বারের মানুষদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে, ধিক্কার দিয়ে আবার চলে গেলেন বিজয়দৃপ্ত পদক্ষেপে, পশ্চাতে রেখে গেলেন অবজ্ঞার দৃষ্টি। তাঁর কন্যা, দেবী-অংশ-সমুদ্ভূতা দেবী শুচি বালিকা, তার কচি দুখানি হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল, শুনেছি তিনি নিজেই তার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

মহামন্ত্রী ভরদ্বাজ বললেন—

সত্য—সব সত্য নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিক—
বিজ্ঞবর দ্বিজকুলোত্তম - সব সত্য। তারপর
এই এতকাল পাঁচটি বৎসর বসুমিত্র
কনিষ্ঠ কুমারে লয়ে দেবদ্বার প্রজাবৃন্দ
অসুর দৈত্যের সাথে হীন সর্তে সন্ধি করি—
বৎসর বৎসর নিজেদের অন্নবস্ত্র ক্ষয় করি
দিয়েছি সম্মান পণ। সব সত্য। কিন্তু আজ
তারও চেয়ে সত্য আমি অকম্পিত কণ্ঠে
করিনু ঘোষণা। মহারাজ ব্রহ্মমিত্র এসেছেন
ফিরে। অমরাবতীর মোহ বিলাসবাসনা
সব ধুয়ে মুছে মন্দাকিনীনীরে ফিরেছেন
দেবদ্বারে। পণ তাঁর, মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনও
দেবদ্বার পরিত্যাগ নাহি করিবেন।
দেবদ্বার প্রজার কল্যাণ দেবদ্বার মৃত্তিকার
সেবা—আজই হতে তপস্যা তাঁহার।
আরও সত্য কহি, রক্ত ঢেলে দিয়ে—
মহারাজ ব্রহ্মমিত্র মোহমুক্ত আজি।

সামন্ত: সত্য সত্য? সত্য মহামন্ত্রী?

মন্ত্রী: ঈশ্বরের নাম নিয়ে ত্রিসত্য করিয়া কহি—
অবশ্য আমার বিশ্বাস মত আমার বিচার মত—
ইহা সত্য ইহা সত্য—ইহা সত্য।

* *

শ্রেষ্ঠী বললেন—

রক্ত ঢেলে মুছেছেন বিলাস বিভ্রম মোহ—
এর অর্থ জিজ্ঞাসা কি অপরাধ হবে ?

মন্ত্রী : —অপরাধ নয়। তবে অনুরোধ করি—
এর অর্থ করো না জিজ্ঞাসা। শুধু
আমারে বিশ্বাস করো। সমাদর
করি সোল্লাসে বরণ করো। যেন
মহারাজ স্বচ্ছন্দে সবার মাঝে
সিংহাসনে বসি, অতীত কর্মের লাগি
কোন গ্লানি অনুভব না করেন মনে।
তা হলে দেখিবে শ্রেষ্ঠী, মহারাজ
ব্রহ্মমিত্র সেকালের ব্রহ্মমিত্র হতে
গরীয়ান শতগুণে। ন্যায়ে ধর্মে প্রজার কল্যাণে
দেবদ্বার স্বর্গরাজ্য হতে শতগুণে
হবে গরীয়সী।—ব্রহ্মমিত্র ফিরেছেন
স্বর্গ হতে পূর্ণতর হয়ে।

সামন্তপতি বললেন—

তবে বলো সবে—জয় দেবদ্বার—
জয় জয়ন্তীনগরী। জয় জয় মহারাজ
ব্রহ্মমিত্র জয়।

সকলে প্রতিধ্বনি করলেন সমস্বরে।

শ্রেষ্ঠী বললেন—

জ্বালাও আলোকমালা নগরের প্রতি গৃহমাঝে—
গৃহশীর্ষে তুলে দাও দেবদ্বার ধ্বজা—
উচ্চকণ্ঠে তোল জয়ধ্বনি।
নৃত্য গীতে উৎসব মুখর কর
জয়ন্তীনগরী! গাও, গাও নর্তকীগণ।
গাও, নৃত্য কর। নৃত্যগীতে, নাট্যশাস্ত্রে
সুপণ্ডিত ব্রহ্মমিত্র দেবতা পূজিত
তাঁহার তৃষিত চিত্ত তৃপ্ত করো সবে।

পতাকা উড়িয়ে জয়ধ্বনি দিলে সকলে—তারই মধ্যে প্রবেশ করলে একদল নর্তকী। তারা গাইলে নাচলে—

সজনী নয়ন মুছে ফেলে সই কাজলের রেখা টানো—
বিরস অধর সরস করিয়া রঙীন মাধুরী আনো—

টানো টানো, আনো আনো , বিরহের অবসানো।
সে যে ফিরেছে, সে যে ফিরেছে সে কথা কি নাহি জানো ?
সাজো সাজো লাজ রাখো –
কুসুম পরাগ চন্দন করিয়া বয়ানে যতনে মাখো --
যতন করিয়া চাঁদের মতন সিন্দুর-টিপ আঁকো—

বংশী ঝুঁকে পড়ে গানের কথাগুলো শুনছে। তার চোখ দুটি বড় হয়ে উঠেছে। ওর দৃষ্টিতে সুরের ভাবনা ভেসে উঠেছে। ডান পাখানা হাঁটুর ভাঁজে নাচছে। আশা ঘাড় নাড়ছে। শুধু ওরা দুজনেই নয়, আরও অনেকেই গানের ছন্দের ও মিলের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে, নড়ছে, ঘাড় নাড়ছে। অলকার চোখেও একটা ঘোর নেমেছে যেন। রীতুবাবুও ছন্দের ঝোঁকে ঝোঁকে হুঁ-হুঁ করে যাচ্ছেন।

গোরাবাবু পড়লে—এলানো অলক ভুবন ভোলানো, তাই রাখো, কথা মানো ।

থেমে গেল সে।

রীতুবাবু বললে—ওয়াণ্ডারফুল, কিন্তু শেষ হল না তো দেবতা।

গোরাবাবু সিগারেট ধরালে। বললে –হবে আর কটা লাইন। মনের মত হয় নি বলে এতে লিখি নি। ফাঁক রেখেছি।

রাবুল বলে উঠল—লে হালুয়া। এলানো অলক ভুবন ভোলানো, কিন্তু কাল যে বব ছাটার মাই লর্ড। ওতে শাম্পু করাটা লাগিয়ে দিন মাই লর্ড। লাগেও বেশ।

অলকা একটু নড়েচড়ে বসল। সে অস্বস্তি বোধ করছে। সে চুল শাম্পু করে। মঞ্জরী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিলে—তার চুল আজ এলানো আছে।

রীতুবাবু হেঁকে উঠল—অর্ডার। অর্ডার।

গোরাবাবু পড়তে শুরু করলে—

"বন্ধ করো বিলাস বিভ্রমভরা নৃত্যগীত—
ত্যাগ করো বিলাসিনী বেশ—নয়নে
কটাক্ষ মুছে ফেল, ও নহে আমার তরে আর।
ব্রহ্মমিত্র নৃত্যগীত বিলাস বিভ্রম রূপসীর রূপ মোহ
সবকিছু ত্যাগ করিয়াছে। এ আমার নবজন্ম।"

গোরাবাবু বললে—মহারাজ ব্রহ্মমিত্র প্রবেশ করলেন। সংগীত নৃত্য সব স্তব্ধ হল। উপস্থিত সকলে এ ওর মুখের দিকে চাইলে। মহারাজের অঙ্গে রাজবেশ, কিন্তু তাঁর মণি-মুক্তার মালার মধ্যে রুদ্রাক্ষের মালা রয়েছে।' রাজার চেয়েও তপস্বীর রূপ বড় হয়ে উঠেছে। মহারাজ এই স্তব্ধতার মধ্যে বললেন, মহামাত্য, 'আমি তো আপনাকে জানিয়েছিলাম যেন উৎসব কিছু না হয়। দেবদ্বারে আমি রাজত্ব করতে ফিরি নি—অমরাবতী থেকে আমি ফিরেছি -প্রায়শ্চিত্ত করতে। তপশ্চর্যা করতে। জানাই নি ?

মন্ত্রী ভরদ্বাজ মাথা নত করে বললেন, স্বীকার করছি মহারাজ ! আপনার সে আদেশ আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু মহারাণী আমাকে বলেছিলেন, মহামাত্য—মহামাত্যের কথা

ঢেকে দিয়ে শঙ্খধ্বনি এবং হুলুধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। সকলে দেখতে পেলে অন্তঃপুর প্রবেশপথ মুখে স্বয়ং মহারাণী দেবী সর্বাণী প্রবেশ করছেন, তাঁর সঙ্গে অন্তঃপুরচারিণী—তাদের হাতে বরণডালা। হাতে শাঁখ। একজনের হাতে ভৃঙ্গার। মহারাণী বললেন, আমি বলেছি মহারাজ—বলেছি, সুদীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর যে দিন মেঘ এসে উদয় হয় সেদিন জীবকুলে তৃণগুল্মলতা উদ্ভিদকুলে যে সহজ আনন্দ উৎসবের মত উৎসারিত হয়, সে আনন্দপ্রকাশে নিষেধাজ্ঞা সে কি মেঘেরই দেবার অধিকার আছে ?

মহারাজ বললেন—

দেবি, বলিবার কিছু নাহি মোর, দেবকুল কন্যা।
তুমি , এ কথা তোমার মুখে সাজে। তুমি
পার হাসিমুখে অনুতপ্ত জনে—অপরাধ
ভুলি ক্ষমা করিবারে। মানুষ পারে না।
মহাশক্তি আদ্যাশক্তি যিনি—তিনিই তো—
ভ্রান্তিরূপা , মানুষেরে ভ্রান্তিতে ভুলায়ে—
কৌতুক অপার তাঁর। এই দেখ দেবি—
পৃষ্ঠে মোর কি গভীর ক্ষত চিহ্ন।
এই ক্ষত মুখে সেই ভ্রান্ত দেবতার
পূজা দিয়ে পেয়েছি পরম সত্যে।

মহারাণী শিউরে উঠে বললেন

এ কি মহারাজ! কি গভীর ক্ষতচিহ্ন!
হায় প্রভু- পেয়েছ কি কঠিন যন্ত্রণা।

মহারাজ বললেন-

তার চেয়ে পেয়েছি হে দেবী কঠিন কঠোরতর
মানস-যন্ত্রণা! দেহের যন্ত্রণা হতে
কঠিন সহস্র গুণে! শুন দেবি- শুন সবে
অমাত্য তোমরা। সত্য কথা বলিবার আছে
প্রয়োজন। দেবলোকে অবস্থানকালে
বিদ্রোহী অসুরকুল দমনের পুরস্কার
ব্রহ্মমিত্র লভেছিল দেবরাজ প্রীতি--
সুপ্রচুর অনুগ্রহ। দেবতাকুমারগণ সাথে
সম অধিকার। সেই অধিকারে--
আর নৃত্যগীত-শাস্ত্রে অধিকার হেতু
অপ্সর গন্ধর্বলোকে ব্রহ্মমিত্র
হয়েছিল দেবতা সমান। বিলাস বিভ্রম

নৃত্যগীত সুধাপানে প্রলাপ প্রমোদ আর
প্রমোদ লীলায় দিন কেটে যেত। একদিন
এরই মাঝে গন্ধর্বলোকের প্রান্তে
বিষ্ণুর মন্দির অঙ্গনে দেখিলাম
অপরূপা এক কন্যা—বিষ্ণু নামগান
গাহি করে পূজা নিবেদন। জিজ্ঞাসিনু
পরিচয়। জানিলাম—অভিশপ্তা
গন্ধর্বতনয়া, নাম তার কুসুমিকা।
দেবলোকে অভিশপ্তা—হেতু তার
দেব মনোরঞ্জনে সে করিয়াছে
অস্বীকার, দেবতা-প্রসাদ—মণিরত্নমালা
ফিরায়ে দিয়েছে সবিনয়ে। ভ্রান্ত আমি
তার কাছে করিলাম মুগ্ধ হয়ে প্রণয় জ্ঞাপন।
নাম তার কুসুমিকা। মোর পরিচয় শুনি
সাগ্রহে আমার প্রেম করিল গ্রহণ।
সেইখানে - আজ দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর
কেটেছে আমার। দেবকুল-কন্যা মহিষী আমার
দেব-অংশোদ্ভূতা কন্যা-- লক্ষ্মীরূপা শুচি,
রাজ্য দেবদ্বার, বংশের গরিমা, সব তুচ্ছ
করি গন্ধর্বলোকের প্রান্তে উদ্যান রচিয়া
বসবাস করিয়াছি। ইহলোক পরলোক সব
তুচ্ছ হয়েছিল। সহসা ভাঙিল ভ্রম।
একদিন দেবরাজ-কুমার জয়ন্ত--
নিমন্ত্রিলা অন্য এক অপ্সরা আলয়ে—
গীতবাদ্যে সুকঠিন রাগের আলাপ হেতু।
গিয়েছিনু আমি। রাত্রিশেষে ফিরিবার পথে
পৃষ্ঠে হল ছুরিকা আঘাত। আততায়ী
পলাইল—কিন্তু পরিচয় তার
রহিল না অজ্ঞাত আমার। আততায়ী-
হিংসাতুরা কুসুমিকা নিযুক্ত সে জন।
পত্নী মোর দেবকন্যা সয়েছে আমার ত্রুটি,
আমার অমার্জনীয় পাপ। কিন্তু হায়,
দেহ-ব্যবসায় বৃত্তি যার—সে সহিল না।
আমার ঘুচিল ভ্রম। পণ করিলাম

প্রায়শ্চিত্ত তপস্যার দেবত্বার কল্যাণ সাধনে—
অবশিষ্ট কাল আমি করিব যাপন।
নৃত্যগীত নয়—আলোক উৎসব নয় –
শান্ত-নম্র অনুতপ্ত জনে—
বিনা আড়ম্বরে মোরে করহ গ্রহণ--
ধন্য হব আমি।

দ্বিজবর বললেন—

ধন্য ধন্য তুমি মহারাজ— সত্যবাদী ব্রহ্মমিত্র
সত্যে তুমি রেখেছ মাথায়। ভ্রান্তিরূপা
মহামায়া কঠিনা নিষ্ঠুরা--
তার ভ্রান্তিরূপে, ভুলে যেই তার পিছু ধায়—
লয়ে যায় তারে মৃত্যুপুরদ্বারে—তারপর
অকস্মাৎ ঘুরিয়া দাঁড়ায় কালরাত্রি
মহাতামসিনী রূপে। শুধু সত্যের নিষ্ঠায়
তারে করিয়াছ প্রীত। তারই বরে হবে তব সার্থক
জীবন। মহারাণী—জননী মোদের –
করহ বরণ মহারাজে। বন্ধ কর নৃত্যগীত।
বন্ধ কর বিলাসবিভ্রম। মহারাজ সাথে
দেবদ্বারে মানুষের আরম্ভ হউক –
সুকঠিন চরিত্র তপস্যা নবজীবনের।
আশীর্বাদ করি— অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

মহারাণী নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করলেন। কপালে ফোঁটা দিলেন। শঙ্খ বাজল। বললেন, আসুন মহারাজ, পুরঃপ্রবেশ করুন।

মহারাজ বললেন, কিন্তু মহারাণী--

—কি মহারাজ?

—মনে আমার কঠিন প্রশ্ন জেগেছে—আমার পা উঠছে না।

—কি মহারাজ?

—সত্য বল, যাদের রেখে গিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে শিবমিত্র যুদ্ধে হত আমি জানি। বাকী সব? তাদের সকলকে পাব তো আমি?

—হ্যাঁ মহারাজ সবার মঙ্গল।

—কই, বসুমিত্র কই? প্রিয়তম কনিষ্ঠ অনুজ!

মন্ত্রী বললেন, কুমার বসুমিত্র সীমান্ত থেকে রওনা হয়েছেন। তিনি সীমান্তে ছিলেন। কোন অনিবার্য কারণে হয়তো ঠিক সময় মত এসে পৌছতে পারেন নি। এসে পৌছলেন বলে।

—মহারাণী! বলেই প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—শুচি, শুচি কই! লক্ষ্মী-অংশোদ্ভূতা কন্যা মোর! কই, সে কই?

রাণী : দেবতা মন্দিরে শুচি, দেবসেবা রত।

ব্রহ্মমিত্র : চল, যাব দেবতা মন্দিরে। ওঃ, কত কাল—কতকাল—

নয়ন আনন্দ মোর ননীর পুতলী শুচি
দেখি নাই তারে। আজি মনে পড়ে কত কথা।
সন্তানের তরে তপস্যা করিয়াছিনু,
কঠোর তপস্যা। লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে
আসিলেন বর দিতে। কহিলেন সন্তান
তোমার নাই অদৃষ্ট বিধানে। তবু তব
তপস্যায় প্রীত হয়ে একটি সন্তান দিতে
পারি। যদি পুত্র চাও—মোর অংশে
জন্ম হবে তার। যদি কন্যা চাও—তবে
দেবী লক্ষ্মী অংশ হতে এক কন্যা হবে তব।
ও—কে? ও—কে? মহারাণী! আজি পুনরায়
মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা কেন আমার সম্মুখে।
সেই—সেই রূপ! মা—মা—মা!

শুচি এসে প্রবেশ করলে। তার পূজারিণীর বেশ।

মহারাণী বললেন, ওই—ওই তব শুচি মহারাজ।

শুচি পিতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মহারাজ ব্রহ্মমিত্র আবেগ ভরে বললেন—

—এই শুচি। তুই মোর সেই ছোট শুচি। কচি কচি
দুহাতে বেড়িয়া কণ্ঠ মোর আধো আধো ভাষে
গাহিতিস জয় জগদীশ হরে—
নারায়ণ দশ অবতার স্তবগান! অনুভব
করিতাম—জননী লক্ষ্মীর স্পর্শ অমৃত মধুর।
আয়—আয়—জননী আমার—আয়
কাছে আয়—

শুচি এবার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে—

পরম আরাধ্য তুমি—তুমি পিতা—এ দেহ তোমার দান—
এ ভুবনে সাক্ষাৎ ঈশ্বর। লহ পিতা প্রণতি আমার।

দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেলেন মহারাজ ব্রহ্মমিত্র এবং প্রণতা শুচিকে হাত ধরে তুলতে গেলেন—

—না—না—না। মাগো—প্রণাম নয়, আয়

আয়, আমার বুকে আয়।

শুচি উঠে নতজানু হয়েই হাত বাড়িয়ে নিবারণ করে বললে—

না না, পিতা না। স্পর্শ মোরে করিও না। না।

মহারাজ থমকে গেলেন। সকলে চমকে গেলেন। মহারাণী তিরস্কার ভরা কণ্ঠে বললেন, শুচি!

শুচি বললে, দেবকার্যে রত আছি আমি।

মহারাজ বলে উঠলেন -

ধন্য ধন্য তুমি জননী আমার। মায়াবশে
প্রাণের আবেগে তুমি দেবকর্ম কর্তব্য তোমার
ভোলো নাই। মহারাণী, কর মোর স্নান আয়োজন,
স্নান অন্তে বিষ্ণুরে প্রণাম করি, জননীরে
বক্ষে লব। মহামাত্য —অন্য সব কার্য, সব সুমারোহ
আপাতত রহিল স্থগিত।

মহামাত্য বললেন

তাই হবে মহারাজ। আনন্দে তাই আমি
করিব ঘোষণা। অপরাহ্নে মহারাজ প্রজাবৃন্দে
দিবেন দর্শন।

তিনি চলে গেলেন। ওদিক থেকে শুচি তাঁর কথা শেষ হতেই বলে উঠল—
পিতা।

—বল মা আমার!

—আরও কিছু আছে মোর নিবেদন তব পাশে।
বল পিতা অপরাধ লবে না আমার?

--তোর অপরাধ? ওরে কন্যা মোর, তুই কি জানিস মাগো কি আমার তুই? তুই কে?

—বল পিতা, কেবা আমি?

—তুই মোর কন্যা বটে, দেহ তোর পেয়েছিস
আমা হতে। কিন্তু জন্ম তোর লক্ষ্মী অংশে!

—সত্য কথা পিতা?

—সত্য—সত্য—সত্য! তপস্যা করিয়াছিনু
সন্তানের তরে—

—সে কাহিনী জানি আমি, শুনিয়াছি সব।

তবু প্রশ্ন মোর—তোমার মনের সেই
বিশ্বাস জানিতে। শোন পিতা, সত্য
যদি করহ বিশ্বাস, জন্ম মোর লক্ষ্মী অংশে

সেই হেতু নাম মোর শুচি তবে। প্রশ্ন আমি
করিব তোমায়, দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর
অমরাবতীতে পতিতা গন্ধর্ব নারী সনে
বাস করি, তব দেহে তব মনে, সেই অশুচিতা
যে পাপ হয়েছে সঞ্চারিত, সেই পাপ
সেই অশুচিতা যতকাল পূর্ণরূপে নাহি দূর হয়—
ততকাল মোরে তুমি স্পর্শ করো নাকো।

রাণী : শুচি, শুচি, ওরে সর্বনাশী!

শুচি : স্তব্ধ হও মাতা। দেবকন্যা তুমি—দেবেন্দ্রাণী
শচী দেবী মাতৃস্বসা তব। মাতা, দেবেন্দ্রাণী
শচী তার ব্যভিচারী স্বামী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সনে
সিংহাসনে বসি কোনদিন একবিন্দু গ্লানি
করে নিকো অনুভব। তারই ভাগিনেয়ী তুমি,
তুমি বুঝিবে না লক্ষীর মানস্ব তার পবিত্রতা,
জীবনধাতুর মর্ম। এ জীবনধাতু অশুচিতা
স্পর্শ মাত্রে স্বর্ণ হতে লৌহপিণ্ডে হবে পরিণত।

মহারাণী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ব্রহ্মমিত্র বললেন—

তাই হবে—তাই হবে মাতা।
শুধু অনুরোধ—যদি এ জীবনে
সে তপস্যা নাহি সিদ্ধ হয় -তবে
মোর মৃত্যুকালে অন্তিম মুহূর্তে
তোমার শীতল করতলখানি
রেখো মোর উত্তপ্ত ললাটে ক্ষণেকের তরে।

ঠিক এই মুহূর্তে দূত এসে প্রবেশ করে অভিবাদন করে বললে—

মহারাজ! দুঃসংবাদ আনিয়াছি!
পূজ্যপাদ কুমার, কনিষ্ঠ তোমার, দেব বসুমিত্র
বন্দী আজি অসুরের হাতে।

—বন্দী অসুরের হাতে?

—দেব বসুমিত্র আপনার আগমনবার্তা শুনে
সীমান্ত হইতে রাজধানী মুখে স্বল্প কিছু সৈন্য লয়ে
যাত্রা করেছিল। অসুরেরা শঙ্কিত হয়েছে মনে
আপনার প্রত্যাবর্তন সংবাদে। তারা মধ্যপথে
অরণ্যের মাঝে দেব বসুমিত্রে আক্রমণ করি

বন্দী করিয়াছে। সীমান্তের রাজধানী শ্রীপুর নগরী।
অবরোধ করি অগ্নিকাণ্ডে অত্যাচারে
ছারখার করে চারিধার। মহারাজ ঊর্দ্ধশ্বাসে
আসিতেছি। শীঘ্র যদি সৈন্যদল
না হয় প্রেরিত—তবে সীমান্ত প্রদেশ
হস্তচ্যুত হবে!

ব্রহ্মমিত্র: প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত বুঝি নিজ হতে
এসেছে সম্মুখে। বিদায় মহারাণী—
বিদায় মা লক্ষ্মীরূপা জননী আমার।

প্রস্থান করতে করতে ফিরে বললেন—
মা শুচি!
—পিতা!
—উত্তর আমায় তুমি দাও নাই।
—বল মাতা, কি উত্তর তব!
তাই হবে পিতা! আমি জানি প্রায়শ্চিত্ত শেষ করি
অরাতি দমন করে ফিরিবে বিজয়ী হয়ে।
তবু—তবু পিতা যদি তুমি নাই ফের
প্রাণময় দেহ লয়ে, তবে শুচি তব মৃত্যুহিম
ললাটের পরে রাখিয়া ললাটখানি তার—
অশ্রুজলে ধুয়ে দেবে সব গ্লানি তব।

বাইরে রণবাদ্য বেজে উঠল।

শেষ হল প্রথম দৃশ্য। গোরাবাবু খাতাখানি রেখে সিগারেট ধরিয়ে বললে—চা চাই।

* * *

বংশী পাশের বারান্দায় এসে পকেট থেকে শিশি বের করে খানিকটা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ধরতাটা—তৃতীয় লাইন, টানো টানো, আনো আনো, কাজলের রেখা, রঙীন মাধুরী, টানো আনো, করে করলে কি হয়? থেমে থেমে ভেঙে ভেঙে। টানো টানো, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত একটি হিল্লোল বেয়ে গেল, আবার আনো আনো আর একটি—তারপর আর একটি। তারপর কাজলের রেখা—ডানহাতে চোখে কাজল পরাবার টান, তারপর রঙীন মাধুরী, ঠোঁটের উপর হাতের টান। তারপর টানো আনো। তারপর 'বিরহের অবসানো'। এর পর জলদ ধরতাই সজল নয়ন মুছে। আর মনে নেই বংশীর। পিছন ফিরে সে তাকালে। ঘরের মধ্যে চা চলছে। আশা বসেই আছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে অলকার দিকে, প্রোপ্রাইট্রেস মঞ্জরী দেবীও তাকিয়ে আছে অলকার দিকে।

অলকা মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। এবার তার নিজের মুখে পড়েছে তার নিজের কাপড়ের লালচে আভা। ছাদের কড়ি থেকে ঝোলানো ইলেকট্রিক আলোটার ছাপ

পড়েছে তার কাপড়ে। অন্য সকলে ফিসফাস করছে। হঠাৎ গোরাবাবুর কথা তার কানে এল।

—ভাল মেকআপে ওটা অবিশ্যি শোধরাতে পারে। আর অলকা মাথায় একটু খাটো এই দেখেই নেওয়া হয়েছে। সুতরাং—। না কি বল তুমি মঞ্জরী?

মঞ্জরী বললে—পার্টের কথা এখন থাক না। সে পরে হবে।

শোভা বললে—গোপালা অলকার চেয়ে লম্বা।

বাবুল শোভার কথাটা বোধ হয় শুনলেই না, বললে—মাই লর্ড, ও লম্বা হলে কি আর যাত্রার দলে আসতো। ফিলিমে স্যুট করে বেরিয়ে যেত।

গোরাবাবু ভাবছিল, হঠাৎ বলে উঠল—হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে। অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা দেখাবার মত ট্রিক আমি করে দেব।

মঞ্জরী বললে—বলছি তো ও কথা এখন থাক। বই পড়া শেষ হোক।

তার কণ্ঠস্বরে মুখে চোখে বেশ স্পষ্টভাবেই একটি কাঠিন্য ফুটে উঠল। গোরাবাবু তার দিকে একবার তাকিয়ে বুঝলে [illegible] ছাড় হতে পারে না।

—তা হলে আমিই [illegible] করব। তুমি এখন পড়।

বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে গোরাবাবু পিছনের দিকে একটু হেলে ছাদের দিকে মুখ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ছিল। একটি কাগজ নিস্পৃহভাবে তুলে নিয়ে চুপ করে সে শুনেই যাচ্ছিল। এবার সে বললে—প্রোপ্রাইট্রেস যা বলছেন তাই ভাল। বই পড়া শেষ করুন। প্রথম সর্গেই জমিয়েছেন। [illegible] রাত্রি ক্রমবর্ধমান।

গোরাবাবু আরম্ভ করলে—[illegible] দৃশ্য। দেবদ্বারের সীমান্ত প্রদেশে একখানি গ্রাম। আহত বসুমিত্রকে ধরে প্রবেশ করে। জয়ন্তকুমার আর কামন্দক। জয়ন্তকুমার তরুণ রূপবান ব্রাহ্মণকুমার। সে [illegible], [illegible] ব্রাহ্মণের পৌত্র। কামন্দক বসুমিত্রের বয়স্য, সে দেবদ্বারের রাজসভার বয়স্যও বটে।

থামল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর বললে—আচ্ছা, কামন্দক তরুণও নয় বৃদ্ধও নয়, প্রৌঢ় বলা গেল।

—ভেরি গুড মাই লর্ড। অ্যাণ্ড আই শ্যাল মেক এ নেয়াপাতি ভুঁড়ি। ভুঁড়ি বানানো ইজি থিং। টৈটম্বুরে চান—বাজিয়ে নেবেন। ঢ্যাপঢ্যাপে নরম চান—তাই হবে। সে আমি বানিয়ে নেব। এমনকি ফতুয়ার বোতাম খুলে খানিকটা বেরিয়ে থাকবে। পাঁচ নম্বর ফুটবলের ব্লাডার একখানি। বাস্। আস্ক অলকা—সে ট্রিক আমি জানি। দেখবেন কি করি আমি।

গোরাবাবু বললে—নাউ, সাইলেন্স। তিনজনে প্রবেশ করলে, এখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ কুমার বসুমিত্রদেব। নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন। আমি যাই, আমাদের গ্রামবাসীরা অসুর দুর্বৃত্তদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে পারলে কি না।

বসুমিত্র বললেন—

ব্রাহ্মণকুমার, আজীবন ঋণপাশে আবদ্ধ করিলে
অসুরের বন্দীত্ব হইতে যুদ্ধ করি মুক্ত করিয়াছ,

রক্ষা করিয়াছ তুমি দেবস্থার রাজ্যের সম্মান।

জয়ন্ত : সময় নাহিক দেব, নেতৃহীন সঙ্গীদল মোর।
যুদ্ধ করে অসুরকুলের সাথে। ফিরে আসি,
আগে ফিরে আসি।

কামন্দক : পিতা পিতরৌ পিতরঃ পিতা পিতরৌ পিতরঃ
ও বাবা, বাবারে, বাবারে!
ভো ভো, ব্রাহ্মণকুমার, নাহি গচ্ছ, নাহি গচ্ছ
ভয়াৎ অহং মরিষ্যামি। ভয়ে মরে যাব।

জয়ন্ত : ভয় নাই দেব। কোন ভয় নাই।

কামন্দক : ভয়ং নাস্তি? কথিতং সত্যং? সত্য বলছ?
কিন্তু কহ মহাভাগঃ, এ বনে কুত্র ভরসা?
দোহাই তব, ভো ভো বিপ্রবর
মা কুরু পলায়নং এই অকালে পরিত্যাগং করি।

বসুমিত্র ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—

কামন্দক, এই কঠিন মুহূর্তে তুমি প্রগল্‌ভতা ত্যাগ কর,
বীর ব্রাহ্মণকুমারকে যেতে দাও।

(ঠিক এই মুহূর্তে জয়ন্তের সঙ্গীরা প্রবেশ করলে জয়ধ্বনি দিয়ে)

জয় জগদীশ হরে! আমরা জয়ী হয়েছি প্রিয়বর। অসুরেরা পাঁচজন নিহত হয়েছে। একজন বন্দী। বাকী সব পলাতক।

জয়ন্তকুমার : জয় জগদীশ হরে! আমাদের মধ্যে হতাহত কি বন্ধু?

সঙ্গী : একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে চারজন। আমাদের গোপন অবস্থান-ভূমিতে থেকে যুদ্ধ করলে একজনও হত না। কিন্তু শিবদাস উত্তেজনাবশে লাফ দিয়ে পড়ল পলায়নপর অসুরদের সম্মুখ-পথে। তারা ভল্ল দিয়ে বিদ্ধ করলে তাকে। কিন্তু সান্ত্বনা, আমি শিবদাসের পিছনেই ছিলাম গিরিপথের পাশে আমাদের অবস্থানভূমিতে। আমি তাকে নিহত করেছি খড়্গাঘাতে।

বসুমিত্র : হে আশ্চর্য ব্রাহ্মণকুমার! তুমি কে?

জয়ন্ত : জয়ন্তকুমার নাম। পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণকুমার। দেবস্থার প্রজা। এই গ্রামের অধিবাসী।

বসুমিত্র প্রশ্ন করেন—এই যুদ্ধবিদ্যা কি করে শিখলে তুমি ব্রাহ্মণকুমার! যেমন কৌশল তেমনি ক্ষিপ্রতা; তেমনি অস্ত্রনৈপুণ্য; আর তেমনি সাহস! অকস্মাৎ বনভূমিতে বৃক্ষান্তরাল থেকে যেন মাটির বুক বিদীর্ণ করে তোমরা উঠে দাঁড়ালে। বেষ্টন করলে অসুরদের। সর্বাগ্রে বিচ্ছিন্ন করে নিলে বন্দী আমাকে। আশ্চর্য! কে তোমাদের এই আশ্চর্য রণনৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছে!

বংশী সেই থেকে এখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুর ভাবছে—ভাঁজছে। গানের কথাগুলো এরই মধ্যে প্রায় সব ভুলে গেছে। কিন্তু তাতে আটকায় নি। কারণ গানটার গাঁথুনির ছাঁদ এবং ছক্‌টা তার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। মনে আছে, টানো-টানো আনো-আনো, আর মনে আছে শেষ লাইনটা। খাসা লেগেছে তার। বড় সমঝদার রসিকের কথা। 'এলানো অলক ভুবন ভোলানো'—বহুৎ আচ্ছা কথা। তাই বটে। অলক মানে চুল সে কথা নিরক্ষর হয়েও বংশী জানে। ড্যান্সিং মাস্টার বংশী কেউ বই পড়ে গেলে বেশ বুঝতে পারে। নিজের পড়তে অন্ততঃ শক্ত বানান পড়ে উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়। কিন্তু ওই কলিটা বহুৎ বঢ়িয়া কলি। 'এলানো অলক ভুবন ভোলানো'। বহুৎ আচ্ছা। কর্তা একজন আমীর লোক রইস লোক, কি বলে প্রেমিক লোক। তাই বটে! একপিঠ এলোচুল, সে যে কি নেশা জাগায়! বংশীর তো ভারী নেশা লাগে। আজ বুঝতে পারছে, প্রোপ্রাইট্রেস তার চুল এমন করে অধিকাংশ সময় এলো রাখে কেন? বাঁধে না কেন? ওই কলিটা ভাঁজতে ভাঁজতে তার আপসোস হচ্ছে, সখীর দলে সখীগুলো প্রায় সবগুলোই ছোড়া। সেই পেটেণ্ট জরির ফিতে জড়ানো বেণীওয়ালা পরচুলো পরে নামবে। এক আশার চুল আছে প্রচুর। এবার আরো দুটো বারো তেরো বছরের মেয়েকে নিয়েছে, কিন্তু তাদের চুল লম্বায় আধ-হাতের বেশী পিঠে খোলে না। ওদের বয়স হলে ওই চুলে 'ঝারি' জুড়ে চুল বড় করা চলত। আর ওই কলিটায় বসেই এ ওর খোঁপা খুলে দিয়ে চুলগুলো এলিয়ে দিত। তারপরই স্রেফ একটি বো পাক্‌।

—বংশী, না, কে? বংশী!

কে ডাকছে বংশীকে বিডন পার্কের ফুটপাথ থেকে। চেনা গলা।

—কে? কোথায়?

—বংশী!

লোকটা, এ তো যোগামাস্টারের গলা! হ্যা, ওই লাইটপোস্টটার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্লাক-আউটের ঠুঁডি পরানো আলোটা পুরো মাথায় পড়েছে।

বংশী রেলিংয়ে বুক দিয়ে ঝুঁকে বললে- মাস্টারজী!

—কি হচ্ছে তোদের? নতুন বই পড়া? যোগাবাবু একেবারে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। আপনি কোন্‌ দলে?

—সব শা বেইমান রে! বলে বুড়ো হয়েছি! বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। তা মন টিকল না।

—এখানে কোথা এসেছিলেন?

—সেই সন্ধ্যে থেকে ওই পার্কে বসে আছি। তিন ছিলম ফুঁকে দিলাম। কিন্তু ঢুকি-ঢুকি করেও পারছি না। কত্তার ওই হাঁসা হাঁসা চোখ দেখে আমার কি রকম হয়। জিভ শুকিয়ে যায়। আমার যে ভারী চুক হয়ে গিয়েছে রে।

—কি চুক!

—উঁহু। সি আর বলা হবে না মাইরী। যাত্রার দলের আসামীর পেটে কথা থাকে না। তারপর হয় মদ, নয় গাঁজার নেশায় জিভ আলগা!

—তা হলে?

—তা হলে আর কি? যাই এখন। নইলে শোবার জায়গা পাব না।

—রয়েছ কোথায়?

—পথে পথে ঘুরি। রামবাগানে সত্যিনারাণ গণেশ পুজো করি। খাই যা হোক। শুই গিয়ে ওই ইয়ে বাবুদের ঠাকুরবাড়িতে। অনেক লোক শোয়। দেরি হলে ধারে শুতে হয়, রাতে বিষ্টি হলে ছাট লাগে।

বংশী চুপ করে রইল। কি বলবে সে? যোগাবাবুর হয়ে মালিকের কাছে বলবার সাহস নেই, ওদের বাড়িতে আশ্রয় দেবারও সাহস নেই। যোগামাস্টার বামুন। সে, আশা যাত্রাদলে যাই হোক বামুনকে ডাকতে পারবে না। যোগামাস্টার গাইয়ে মানুষ। গাঁজা খায় বলে রাগী মেজাজ। আর একটু গরুজে মানুষ।

—বংশী, রীতুমাস্টার ফিরে এসেছে?

—আঁ্যা? কিছু বলছেন?

যা বলছে তা জানে বংশী। টাকা পয়সা ধার চাইছে। নিজেই সেদিন বলেছিল কাটা রধা নামা উল্টে পর জাম। তা চাইলে কিছু দিতে হবে বইকি। ভেবেই সে বললে—দাঁড়ান, যাই।

—আসতে হবে না। রীতুমাস্টার এসেছে?

এসেছে। আজ সন্ধ্যেবেলা ঠিক সময়ে হাজির হয়েছে।

—তবে পার্কে বসে আর এক ছিলম খাই। ওকে ধরতে হবে একবার। বুঝলি, চাকরিটা গেলে হাঁড়ির হাল হবে রে। বাড়িতে দুটো পরিবার, তিনটে আইবুড়ো মেয়ে আর একটা কড়ে রাঁড়ি।

যোগামাস্টার রাস্তা পার হয়ে ওদিকে পার্কের দরজার দিকে চলে গেল।

বংশী ঘুরে দাঁড়াল। রীতুবাবুকে কোন রকমে বলা যায় কি না, তার পাশে একটু জায়গা মেলে কি না দেখতে লাগল। রীতুমাস্টার সেই ছাদের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকছে আর বই শুনছে। বই খুব জমেছে মনে হল বংশীর। সব শুনছে চুপ করে।

বংশীর অনুমান ভুল নয়। নাটক বেশ জমেছে। গোরাবাবু পড়ছেও বেশ আবেগ দিয়ে। দ্বিতীয় দৃশ্যে তখন বসুমিত্রকে নিজে পরিচয় দিয়েছেন জয়ন্তকুমার। পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণকুমার, আছেন শুধু পিতামহ। কেউ তাঁকে বলে পাগল। কেউ বলে শাপভ্রষ্ট কোন জন—, মধ্যে মধ্যে পূর্ব কথা মনে পড়ে, তখন নানান কথা বলেন। জয়ন্ত নিজে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু দেবদ্বারের এই দুর্বল অবস্থায় অসুরদের অত্যাচার রোধের জন্য গ্রাম্য যুবকদের নিয়ে দল গঠন করেছে, শাস্ত্রবিদ্যা পাঠ করে অনুশীলন করেছে, অনেক অস্ত্রেই তারা পারঙ্গম। তবে শৃঙ্খলাই তাদের সব। এখানকার অরণ্য, এখানকার গিরিপথ, এখানকার

সব তাদের পরিচিত। তারা পালা করে বৃক্ষশীর্ষে বসে দূরদূরান্তর পর্যন্ত দেখে। কিছু দেখতে পেলেই সংকেত ধ্বনি করে। সেই ধ্বনিতে সমবেত হয়ে তারা তাদের সযত্নে তৈরী-করা গোপন ঘাঁটিগুলিতে অস্ত্র উদ্যত করে বসে থাকে। তারা পার্বত্য অসুর দৈত্যদের সংকেতগুলি জানে, সেই সংকেতে তাদের নিজেদের পরিবেষ্টনীর মধ্যে এনে তাদের অনায়াসে পরাভূত করে।

বিস্মিত হয়ে বসুমিত্র প্রশ্ন করেছিলেন—ব্রাহ্মণকুমার, তুমি তো রাজ্যসংস্থাপন করতে পার ?

জয়ন্তকুমার বলেছে—হয়তো পারি কুমার, কিন্তু রাজ্যে কিবা হবে ? কি হবে রাজা হয়ে ?

—বল কি ! তুমি রাজা হতে চাও না ?

—না, সে কল্পনায় তো আনন্দ পাই না।

—তবে ? জীবনের কি কল্পনা তোমার বলতে কি বাধা আছে ?
বিচিত্র যুবক চিত্ত তব উদাসীন বৈরাগীর মতো।
তাই জাগে কৌতূহল।

জয়ন্তকুমার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—

নাহি জানি। এই মুহূর্তটিতে ওই দূর পর্বত শিখরে
চিত্ত মোর ছুটে যেতে চায়, ইচ্ছা হয়
জীবনের বাকী সব দিনগুলি ওইখানে ছোট এক
কুটীর বাঁধিয়া কাটাইয়া দিই। ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশ
নিম্ন-লোকে শ্যামা সম ভূমি। নিশ্চিন্ত জীবন।
আর আমি কিছু নাহি চাই।

বসুমিত্র : বুঝিয়াছি পূর্ব জন্মে অসমাপ্ত ঈশ্বর তপস্যা
তোমারে টানিছে পূর্ণ সিদ্ধি পথে—

জয়ন্ত : না কুমার, ঈশ্বরে আগ্রহ নাহি মোর—
কি হবে ঈশ্বরে লয়ে ? না—

কামন্দক : কথিতং পরমং সত্যং ইহাতে সন্দেহং নাস্তি
ঈশ্বর ঝঞ্ঝাট শ্রেষ্ঠ—দূরে তা বর্জনং শ্রেয়
ভল্লুক কম্বলরূপী ধরিলে চাপিয়া ধরে,
ছাড়িলে ছাড়ে না সে যে শেষেতে মরণং ধ্রুব।

জয়ন্ত : কতবার গিয়েছি ওই শিখরে। কিন্তু গিয়ে আর ভাল লাগে নি। সমতল ডেকেছে হাতছানি দিয়ে। ফিরে এসেছি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে। এখানেই আনন্দ। শাস্ত্রচর্চায় ডুবে থেকেছি কয়েকদিন। একদিন সে চর্চায় বিরক্তি এসেছে। শাস্ত্রচর্চা ত্যাগ করে বন্ধুদের নিয়ে শস্ত্রচর্চা করেছি। সংগীত আনন্দে মেতেছি। কয়েকদিন পরই সেও ম্লান হয়ে গেছে। নির্জন নদীতটে কিংবা প্রান্তরে গিয়ে চিৎকার করে বলেছি, কে বলে দেবে আমি কি চাই ?

সময়ে সময়ে মনে হয় আমি সব চাই। যাহা কিছু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার সব চাই আমি। কখনও মনে হয়—না না না, কিছুই চাহি না আমি। আমি শুধু দিতে চাই—আমারে নিঃশেষ করে দিতে চাই। কিন্তু নাহি জানি কার কাছে!

অবাক হয়ে গেলেন বসুমিত্র। কামন্দক কাছে এসে বললে—

সাবধানে স্থানত্যাগং ক্রিয়তাম্ দ্রুতপদক্ষেপে—

নিশ্চয় বদ্ধ উন্মাদ—দংশনং ন অসম্ভবং।

পালান। বদ্ধ উন্মাদ। মন এখনই ছোটে পাহাড়ে তখন ছোটে মাঠে। কে জানে মন এখনই আমাদের নাকে কামড়াবার জন্য উসখুস করে উঠবে না! পালান। মম ঈশ্বর! মাম রক্ষ!

রীতুবাবু অকস্মাৎ ফু-ফু শব্দে হেসে উঠে বিষম খেল। ছাদের দিকে দৃষ্টি রেখে বই শুনছিল, হঠাৎ বার দুই ফু-ফু করে উঠল অর্থাৎ মুখ টিপে বন্ধ-করা হাসি জোর করে বেরিয়ে এল। তারপরই হাসি চাপবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সে সশব্দে হেসে উঠল। বাবুল মেঝেতে একটা চড় মেরে বললে—আচ্ছাৎ আচ্ছাৎ, বহুতং আচ্ছাৎ, লঙ লিভং গোরাবাবু!

প্রথমে কারণটা সঠিক কেউ বোঝে নি। এত হাসির মত কিছু তো তারা খুঁজে পায় নি। সেটা পরিষ্কার করে দিলে রীতুবাবু নিজেই। বললে—বাবুল ব্রাদারের ইংরিজী ফোড়ং-এর অভ্যেসটাকে তো আচ্ছা কাজে লাগিয়েছেন দেবতা! ওর হাত দিয়েই ওকে মারলেন। এবং আরও পরিষ্কার করে দিলে বাবুল নিজে ওই মেঝেতে চাপড় মেরে।

গোটা আসরটা এবার সশব্দে হেসে উঠল।

গোরাবাবু বললে—সাইলেন্স। আবার আরম্ভ করলে—এবার সসৈন্যে প্রবেশ করলেন ব্রহ্মমিত্র!

আট

বই যখন পড়া শেষ হল তখন রাত্রি সাড়ে দশটা।

গোটা আসরটা স্তব্ধ। ভালই লেগেছে সকলের। গোরাবাবু বই বন্ধ করে বললে—বলুন মাস্টারমশাই কেমন লাগল?

কিন্তু—

চুপ করে গেল রীতুবাবু।

গোরাবাবু বললে—বলুন কিন্তুটা কি?

—একটু উঁচু ধরনের হয় নি? মানে যুদ্ধবিগ্রহ তো নয়। তত্ত্বটা জটিল—

—জটিল বলছেন?

—আচ্ছা, পড়ুন না ওইখানটা, শুচি আর জয়ন্তকুমারের দৃশ্যটা।

বাবুল বলে উঠল—বটে, রাত্রি প্রায় হাফাহাফি; ট্রাম বাস বন্ধ হল-হল। আমাদের আবার ডাইরেক্ট সাউথ। রাইটে কেওড়াতলা, লেফ্‌টে লেক পার হয়ে সাউথ।

শোভা গোপালীকে বললে—শুনছিস, আমি নয়, আমরা !

—শুনেছি।

—বেশ, তোমরা দুজনে যাও। তবে তোমার কামন্দকের পার্ট কেমন লাগল বল ?

—চমৎকার।

—তোমার ? অলকা ? মাধবিকা যদি দেওয়া হয় তোমাকে ?

—খুব ভাল লেগেছে আমার। আমি প্রাণপণে ভাল করবার চেষ্টা করব।

—আচ্ছা, তোমরা এস।

বাবুল এবং অলকা উঠে পড়ল। রাস্তায় ফুটপাতের উপর দাঁড়াল। ট্রাম-স্টপ পুব দিকে। বাস-স্টপও। রাত্রি সাড়ে দশটা হয়ে গেছে, রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দোকানদানির আলোও নিভে আসছে। ব্ল্যাক-আউটের ঠুলি-পরানো স্ট্রীট-লাইটের আলো এমনই অপর্যাপ্ত যে, উপরের আলোকিত ঘর থেকে নেমে এসে এই স্বল্প আলোকে ভূতুড়ে আলো মনে হচ্ছে। ওই একখানা ট্রাম আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। দুজনে রাস্তা পার হয়ে এ পাশে এসে ট্রাম-স্টপের দিকে এগুতে লাগল।

হঠাৎ অলকা বললে—বই কেমন লাগল বাবুলদা ?

—ভেরি গুড। হোক সত্যযুগ। বাট ভেরি মডার্ন।

—মাধবিকার উপর কিন্তু অবিচার হয়েছে। জোর করে শুচিকে বড় করেছেন !

—ইয়েস। কিন্তু তার আর উপায়ং কোথা ? কঠিনং স্থানং। ও পার্ট যে প্রোপ্রাইট্রেসের। হুঁ-হুঁ !

খিলখিল করে হেসে উঠল অলকা, বললে—এর মধ্যে যে পার্ট রিহারস্যাল দিতে শুরু করলে।

—বেড়ে হয়েছে পার্টটা।

—কিন্তু তোমাকে তো ভাঁড় বানিয়ে দিয়েছে।

—বাবুল বোর্ন ইজ এ স্পোর্ট। তা না হলে—

—কি ? থামলে কেন ?

—তোমার সঙ্গে প্রেমে মজে বসে থাকতাম এতদিন।

—দেখলে না কেন চেষ্টা করে ? অলকা সে মেয়েই নয়।

—দ্যাট আই নো।

—মা বাবা দুজনেই বিয়ে দিতে চাচ্ছে এইবার। বলছে এখন বিয়ে না হলে এরপর আর হবে না। আমি বলেছি, না হোক। মনে রেখো আমি এই করে উপার্জন করে আনি তবে খাও। চুপ করে গেছে।

—হুঁ। আজ আসতে দেরি করেছ। লাল টকটকে শাড়ি পরেছ, কোথায় গিছলে বল তো ? হোয়াটস্ দি আইডিয়া ?

—একটা ছবিতে নাচের পার্টের জন্য ডেকেছিল।

চুপ করে গেল বাবুল। সচরাচর অলকা এসব কথা আগেই বাবুলকে বলে। বাবুল খোঁজ-

খবরটা নিয়ে দেয়।

অলকা হঠাৎ বললে—এই যাঃ!

—কি হল?

—চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল।

- লে ফাদার! থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলে সে কোথাও যদি একটা জুতোসেলাই থাকে। কিন্তু নেই। বললে—হাতে নাও। এসপ্ল্যানেডে দেখা যাবে।

অলকা চটি জোড়াটা হাতে নিয়ে বললে—কি ঝঞ্ঝাট বল তো!

বাবুল বললে—গোরাবাবু ইজ গ্রেট! লিখেছে যাকে বলে নাইস। ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং সত্যং ঝঞ্ঝাটং জগতংময়ং—লে হালুয়া, আর মনে নেই।

অলকা বললে—ওগুলো খুব ভাল হয় নি সে যাই বল তুমি। তবে হ্যাঁ, বাজে লোকে হাসবে খুব।—সে হেঁট হয়ে চটি জোড়াটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে যেন সামনে দাঁড়াল।

—নমস্কার!

অলকা চমকে উঠল—মাগো!

বাবুলও চমকেছিল। যুদ্ধের বাজার, ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি, সাড়ে দশটা বেজে গেছে, চীৎপুর রোড রামবাগানের ধার, সঙ্গে অলকা রয়েছে। সে বেশ জোরেই বলে উঠল—কে?

—ভয় নেই স্যার, আমি, বাবুলবাবু, যোগামাস্টার।

—যোগাবাবু! হ্যাঁ, যোগাবাবুই তো বটে।

পার্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে যোগাবাবু ওদের দুজনকে দেখে। যোগাবাবু বললে—বই পড়া হয়ে গেল বাবু? আসর ভাঙল?

একটু বিস্মিতভাবে বাবুল বললে—ভেঙেছে। বই পড়াও হয়ে গেছে। আমরা চলে এলাম। অনেক দূর যেতে হবে তো। তা আপনি? এখানে এত রাত্রে?

করুণ কণ্ঠে যোগাবাবু বললে—রীতুবাবুর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি—?

—এখনও বেরুন নি। আলোচনা চলছে।

—অ।

—দরকার আছে বুঝি?

—হ্যাঁ। আমার জবাব হয়েছে জানেন তো?

—শুনেছি।

—হ্যাঁ। তাই ওঁকে একবার ধরব। উনি যদি—

—হ্যাঁ, ওঁর কথা শোনেন ওঁরা।

অলকা চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে হঠাৎ প্রশ্ন করলে—আপনি তো কণ্ট্রাক্ট করেছিলেন?

—তা তো, হ্যাঁ তা কণ্ট্রাক্ট বইকি!

—তবে ? তবে হঠাৎ ছাড়িয়ে দেবেন কেন ?

যোগাবাবু হেসে বললে—সে তো মা কদলীপত্র—কলার পাতা। যতক্ষণ চাকরি ততক্ষণ দাম। কলার পাতা—যতক্ষণ ভাত খাবে ততক্ষণই ভাল। ভাত ফুরুলেই সে আঁস্তাকুড়ে ফেলে। তবে দোষ একটা হয়েছে আমার। তা হয়েছে।

বাবুল বলে উঠল—ট্রাম আসছে।

উত্তর দিকে যেখানটায় যাত্রাদলের আপিসের প্রায় আড্ৎ—সোনাগাছির দক্ষিণ—সেইখানটায় ট্রামের মাথার আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল। ব্ল্যাক-আউটের তাড়ায় মাথার আলো পর্যন্ত স্তিমিত। ট্রাম আসছে, শব্দও উঠছে। বাবুল সতর্ক করে দিলে অলকাকে। অলকা কিন্তু তখনও ছাড়েনি। বলছিল—এমন কি দোষ করেছেন ?

বাবুল বললে—করেছেন, করেছেন। এমন ঝঞ্ঝাট বাধাও তুমি! তৈরী হও। ও আপনি Right man select করেছেন, পারলে ওই Big Brotherই পারবে।

—বাবুলদা!

—কি ?

—খালি পায়ে উঠব কি করে ট্রামে ?

—মাই খোদা! তবে কি হেঁটে যাবে নাকি ?

দেখতে দেখতে ট্রাম এসে পড়ল। বাবুল অলকাকে এক রকম টেনে নিয়ে উঠল ট্রামে। প্রায় জনহীন ট্রাম। একটা বেঞ্চে বসে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বললে—সিট ডাউন।

অলকা বললে—কি বিপদ বল দেখি! চটি হাতে করে—

—ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ফেল।

—যাঃ! যত রাজ্যের নোংরা—

—দেন, থ্রো ইট অ্যাওয়ে। না পার আমাকে দাও।

—না। একমাস হয় নি শখ করে কিনেছি। থ্রো ইট অ্যাওয়ে। তার থেকে তোমার রুমালখানা দাও না। মুড়ে নিই।

—নাও। অলরেডি ডার্টি হয়ে গেছে। রুমালখানা কিন্তু পরে ফেরত দিয়ো।

কণ্ডাক্টার এসে দাঁড়াল কাছে—টিকিট!

চীৎপুর রোড, ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি, কিন্তু যুদ্ধের বাজার। দোকানগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু পানের দোকান খোলা। আর দোকানগুলির পাশে—ভিতর-বাড়ির দরজার মুখে আবছা আলোয় দেহব্যবসায়িনীদের ভিড়। দোতলার বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে গলিতে, রিক্সা, ট্যাক্সি ঢুকেছে। মধ্যে মধ্যে ছোকরাদের জটলা। একটা দরজার মুখে মেয়েগুলি খুব হাসছে। কে যেন ঢলে পড়ছে। অলকা বললে—মা গো!

বাবুল বলে—হোয়াই ?

—হাসছে দেখ না!

—লুক—দেয়ার।

—কি ?

—মেয়ার।

অলকা দেখলে দুজন সাদা সোলজার পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনে খাচ্ছে। আরও কিছুদূর এসে এ পালা শেষ হল। এ দিকটা এখন নির্জন হয়ে পড়েছে প্রায়। হ্যারিসন রোড পার হয়ে নাখোদা মসজিদের এলাকাও প্রায় নির্জন। শুধু একটা আতরের দোকান খোলা রয়েছে। একটা তামাকের দোকান। দু-চারজন ঢাউস পাগড়ী-পরা পেশোয়ারী পোশাকী দাঁড়িয়ে ছিল জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের মোড়ে। দুজন উঠে বসল ট্রামে। বাবুলের গা ঘেঁষে সরে এল অলকা। বাবুল বললে—উঁ-হু।

অলকা শুনলে না, বললে—দেখছ না ?

বাবুল চুপ করে বসে রইল। এসপ্ল্যানেডে এসে ট্রাম থেকে নেমে বললে—দেখ জুতোসিলাই এখনও আছে কি না !

একটা ছোঁড়াকে মিলল ; সে তখনও একটা পোস্টে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। ও পাশ থেকে ফিটনওয়ালারা ডাকছে—ফিটিন্ চাই বাবু ? ফিটিন্।

উত্তর দিল না বাবুল। একটা ফিটনওয়ালা কাছে এসে বললে—ময়দান ঘুমিয়ে দিবো বাবু। বিষ্টি নেই—আকাশ কিলিয়ার। চাঁদ ভি আছে খুব ভাল।

—মাই গড। এ যে মুন শোয়িং রে ফাদার।

—বাবু—

—দিক্ মাত্ করো। যাও।

বাবুল জুতো-সেলাইকে বললে—জলদি কর রে বাবা।

অলকা আকাশের দিকে তাকিয়েছে। জুতো-সেলাই চটিটা ফেলে দিলে—দু আনা বাবু।

লেড ল বাড়ির মাথার ঘড়িটার আলো নিভে গেছে। মেট্রোর সামনে পোর্টিকোর তলায় লোক নেই। ব্রিস্টল হোটেলের সামনে দু-চারজন লোক। বাবুলের হাতঘড়িতে এগারটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি দু-আনি একটা ফেলে দিয়ে বাবুল বললে—এস। টানলে সে চৌরঙ্গী রোডের দিকে পূর্ব মুখে।

অলকা বললে—কোথায় ? ওদিকে ?

—ট্রাম কখন আসবে ঠিক নেই। এগারটা বেজে গেছে। ট্যাক্সিতে—

ব্রিস্টলের সামনে চৌরঙ্গী রোডের পশ্চিম দিকে সারিবন্দী ট্যাক্সি তখন। কলকাতার কাজের তাড়ায় ট্যাক্সিগুলোর ছোটা থেকে ছুটি মিলেছে। বনেট খুলে দিয়েছে। ওখানকার কজন ট্যাক্সি-মুছিয়ে আছে—তারা ঝাড়ছে মুছছে। একটাতে চেপে বসে বাবুল বললে—টালিগঞ্জ।

অলকা বললে—ময়দানে একটা পাক দিয়ে সর্দারজী।

সর্দারজী বললে—ঠিক হ্যায়। একপাক দোপাক চারপাক—যো কহিয়ে গা।

বাবুল বললে—নেহি নেহি।

অলকা বাধা দিয়ে বললে—চুপ।

বাবুলের হাত চেপে ধরলে। বাবুল ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালে। অলকা চোখ মুদে পিছনে হেলান দিয়েছে। মনে হল ভারী তৃপ্তি পেয়েছে মনে মনে। কি বলতে গিয়েও বললে না। কিন্তু চুপ করে বাবুল থাকতে পারে না। আরম্ভ করলে—

ঝপ্পাটং ঝপ্পাটং সত্য ঝপ্পাটং জগতংময়ং—
হাটং মাঠং ঘাটং গৃহং ঝপ্পাটং নাস্তি কুত্রো বা।

মাই লর্ড লিখেছে গ্র্যাণ্ড! ঝপ্পাটং দিবসে রাত্রে ঝপ্পাটং চ পদে পদে। গ্র্যাণ্ড!

ট্যাক্সিখানা ময়দানে তখন রেড রোডে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছে। অলকা বললে—গঙ্গা কিনার চলিয়ে পাইজী।

—বহুৎ আচ্ছা।

পাইজী স্টীয়ারিংয়ে পাক দিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল।

বাবুল বললে—রোমান্সটা জোর লেগেছে তোমার।

—চুপ কর। পার্টটা আমার খুব ভাল লেগেছে। দেখ আমি কেমন গন্ধর্বকন্যা করি। শুচিকে আমি মেরে বেরিয়ে যাব দেখো।

—চাকরিটি যাবে।

—যাক্ গে।

গঙ্গার ধারে অন্ধকারের মধ্যে জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত রকম দেখাচ্ছে। অলকা সেই বাবুলের হাত ধরে চুপ করে ঠেস দিয়ে রয়েছে। বাবুল হঠাৎ প্রশ্ন করলে—এ রকম ঘোরা তোমার রপ্ত আছে মনে হচ্ছে। না?

—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি?

—নাথিং। স্রেফ জানার জন্যে। জ্ঞানলাভ। মাইলেজটা জানতে চাচ্ছি। কতটা এগিয়েছ?

—তুমি যে বেশ জাঁকিয়ে মদ ধরেছ?

—তা ধরেছি। তুমি?

—তোমার কাছে ঘ্রাণে অর্ধভোজন এবং কখন-সখনও এক সিপ্, দু সিপ্।

—আই সি। অ্যাণ্ড—এই প্রমোদ-ভ্রমণে—যাকে জয় রাইড না কি বলে!

—স্টেজে অভিনয়ের ভালবাসা যতখানি, তার বেশী না।

—হুঁ।

অলকা বললে—এবার সিধা চলিয়ে টালিগঞ্জ সর্দারজী। সিধা।

টালিগঞ্জ রেললাইনের ব্রিজের তলা পার হয়ে এসে অলকা বললে—থাম সর্দারজী। এইখানে নামব।

বাবুল বললে—কেন, হোল জিঞ্জারটা খেয়ে গাঁটটা বাকী রেখে ফল কি? বারোটা বাজে। চল বাড়িতে।

—না, রোখনা সর্দারজী।

ড্রাইভার রুখে দিলে গাড়ি। অলকা নামল। বললে—কত হয়েছে সর্দারজী ?

বাবুল একখানা দশ টাকার নোট বের করে সর্দারজীর হাতে দিয়ে বললে—থাক। দিচ্ছি আমি। দাঁড়াও, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

দাঁড়াল অলকা। চেঞ্জ নিয়ে বাবুল পা বাড়াল—চল।

—আমি দিব্যি যেতে পারতাম বাবুলদা।

-না।

অলকা খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল—না। তুমি যাও।

—কেন ?

ভুরু কুঁচকে অলকা বললে—বাড়ি ঢুকলেই—তুমি যাও বাবুলদা। না, তুমি যাও। বাবা চেঁচাবে।

—চেঁচাবে ?

অলকা যেন হঠাৎ বললে—আমাকে একটা ঘর দেখে দিতে পার ?

—ঘর ?

-হ্যাঁ। যেখানে আমি স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। কিংবা—

— কি ?

—নাঃ। সে তুমি পারবে না। তা ছাড়া কি হবে তাতে। দুজনেই ডুবব।

—মানে ?

অত্যন্ত সহজকণ্ঠে বললে অলকা—বিয়ের কথা বলছিলাম। কালীঘাটে মালা বদল করে সিঁদুর দিয়ে। বাড়িতে আর আমি পারছি না টিঁকতে। অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে।

বাবুল হতবাক হয়ে গেল। সে নিজে এ কথা কোনদিন ভাবে নি।

বিয়ের কথাটাই মনে হয় নি তার। অন্ততঃ অলকার মত মেয়েকে। অলকা কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করলে না -চলি। কেমন ? বলে পিছন ফিরলে।

অলকা চলে গেল। ছোট রাস্তাটার খানিকটা দূরেই ওর বাড়ি। সে ওই চলেছে। ওই বাড়ির দোরে পৌঁছল। ওই বারান্দায় উঠল। আলো জ্বলল। ফিরল এবার সে। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর রাত্রি। কলকাতার অসংখ্য মানুষও ঘুমিয়েছে। গোটা রাস্তাটা যতদূর দেখা যায় খাঁ খাঁ করছে। রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যেই একটা কথা ভেসে এল—এত রাত্রি? তারপরই পুরুষ কণ্ঠের শব্দ—আঃ, চাৎকার কর কেন ?

অলকার বাবা।

দাঁড়াল বাবুল।

—তোর ছবির কন্ট্রাক্ট হল ?

অলকা কি বললে শুনতে পেলে না বাবুল।

—তবে ? এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলি ?

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাবুল ফিরল। অলকাকে বিয়ে ? হে ঈশ্বর! নাঃ, সে হয় না।

অলকার জন্ম ভাল ঘরেই। শৈশব বাল্য কৈশোর তার সমাদরেই কেটেছে। তার বাপ যোগেন দাশ—শৌখীন লোক। ত্রিবিশ বত্রিশ সালে বিদগ্ধ লোকেদের আসরে ঘোরাফেরা ছিল। সরকারী চাকরে ছিল। চুরুট খেত, মদ খেত, পা-জামা পরত, কাপড় পরলে কাঁচি ধুতি পরত—তাও হয় নিজে হাতে কুঁচিয়ে নয় কোঁচা ঝুলিয়ে রেখে। স্ত্রীকে নিয়ে নানান আসরে যেত। থিয়েটারে অভিনয়ে নাচে খুব বাতিক ছিল, কিন্তু পাবলিক থিয়েটারে এক শিশিরবাবুর থিয়েটার ছাড়া যেত না। বেশী যেত খুব মডার্ন অ্যামেচার থিয়েটারে। দু-চারটে এমন সংঘের সঙ্গে যুক্তও ছিল। তার থেকেও ঝোঁক ছিল ড্যান্স-ড্রামায়। উদয়শঙ্কর, কথাকলি, ভরতনাট্যমের সমঝদার লোক হিসেবে নামও ছিল। সন্তান ওই একমাত্র অলকা। তাকে ছেলেবেলা থেকে নাচ রেসিটেশন শিখিয়েছিল। পড়তেও দিয়েছিল প্রথম মিশনারী স্কুলে প্রাইমারী পর্যন্ত, তারপর লরেটো জাতীয় একটা স্কুলে। ১৯৩৮।৩৯ সন থেকে যোগেন দাশের ভাগ্যের দোর অকস্মাৎ সিংহদ্বার হয়ে খুলে গেল। P. W. D.র ওভারসিয়ার ছিল, তা থেকে সায়েবের নজরে পড়ে হয়ে গেল সুপারভাইজার। সায়েব ছিল ভারতীয় নাচের ভক্ত। সেই সূত্রেই সায়েব তাকে পাকড়াতে গিয়ে নিজে পাকড়ে গেলেন। অলকার নাচ দেখে শুরু। তারপর কোথায় কোন নাচের আসর তার খোঁজ রেখে যোগেন দাশ তার কার্ড যোগাড় করে সায়েবকে নিয়ে যেতে শুরু করলে। তারপর সায়েব মাঝখানে, দুদিকে মিস্টার দাশ আর মিসেস দাশ। পনের বছরে তখন অলকা পা দিয়েছে। কিছুদিন পর দলে সেও ভিড়ল। মধ্যে মধ্যে সায়েব তাদের বাড়িও যেত। অবশ্য তার জন্য বাড়িতে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছিল দাশ সাহেব। তাতে লেখা ছিল—'প্রাচ্য নৃত্যকলা সংঘ'। দেখতে দেখতে এল যুদ্ধ। দাশ সাহেব ধাঁ করে টালিগঞ্জে জমি কিনে বাড়ি ফাঁদলে। অলকা ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হল। বছরখানেক দাশ সাহেবের জীবন হেজাক-বাতির মত চারিদিকে আলো ছড়িয়ে জ্বলে উঠল। কিন্তু চল্লিশ সালের গোড়াতেই সে আলো নিভে গেল দপ করে। কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে ধরা পড়ে গেল ঘুষ নিতে গিয়ে। ঘুষটা কিন্তু সেবার বেশী ছিল না, হাজার দেড়েক। কিন্তু ধরা পড়ে জেল থেকে বাঁচতে খরচ হয়ে গেল যা কিছু ছিল। এমন কি যে বাড়িখানা ফেঁদেছিল তাও বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়ে বাঁচল—কিন্তু চাকরিটা গেল, থাকবার মধ্যে থাকল বাঙুর কলোনীতে স্ত্রীর নামে কিছুটা জমি। তার উপর কৃতী যোগেন দাশ চৌধুরী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছে জমি এবং ভাবী বাড়ি বন্ধক রেখে বাড়ি তুলে বললে—কুছ পরোয়া নেহি। আমি আজও ইয়ংম্যান। বলে ফের শুরু করলে। তখন যুদ্ধ লেগেছে। বিয়াল্লিশ সাল। নতুন করে জীবন পত্তনের চেষ্টা আরম্ভ করলে যোগেন দাশ, যুদ্ধের কন্ট্রাক্ট এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্রমে ইংরেজ-বিরোধিতা। কন্ট্রাক্টে সুবিধে হল না, কিন্তু ঘোরতর ইংরেজবিদ্বেষী হয়ে যোগেন দাশ চৌধুরী আরও প্রোগ্রেসিভ হয়ে উঠল। নৃত্যনাট্য এবং প্রোগ্রেসিভ কালচারের সঙ্গে যোগেন দাশের সম্পর্ক অনেক দিনের, এবার সরকারী চাকরি ছেড়ে তারও পাণ্ডা হয়ে উঠল সে। কিন্তু এটা ওটা পাঁচটা যা সংসার চালাবার জন্য করছিল তার সবগুলোই আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। যোগেন দাশের একমাত্র খুঁটি হল—ওই প্রগ্রেসিভ কালচার। তখন

অলকার পাড়ায় এবং বেপাড়ায়—এখানে ওখানে নাচের জন্যে নাম হয়েচে। এবং তেতাল্লিশ সালে কলকাতা শহরে আই. পি. টি.-এর পত্তন হয়ে দেখতে দেখতে চারিদিকে কালচারাল সংঘে ছেয়ে গেল প্রায়। এই অল্প বছর দুয়েকের মধ্যেই যোগেন দাশ এমন ভেঙে পড়ল যে ঠেকা দিয়েও আর সোজা করা গেল না। প্রগ্রেসিভ যোগেন দাশ চৌধুরী বরাবরই খেত—এবার মাতাল হল, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সুদ মাসের পর মাস বাকী পড়ে মোটা হল, নালিশের নোটিশ এল। অলকার কলেজের মাইনে ছ মাস সাত মাস বাকী পড়ে নাম কাটা গেল। ওদিকে তার নিজের উৎসাহও খুব বেশী ছিল না, মনে মনে সিনেমা-স্টার হবার আকাঙ্ক্ষাও উঁকি মারতে শুরু করেছে। সদ্য সদ্য দুটো তিনটে ছবিতে বেশ নাম-করা ঘরের মেয়েরা সিনেমায় নেমেছে। এবং রাতারাতি স্টারও হয়ে গেছে। তার উপর বাপ মাইনে না দিতে পেরে কলেজের উপর মর্মান্তিক আক্রোশে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল—যেতে হবে না কলেজে। যত সব ফাঁকিবাজ প্রফেসর, অধিকাংশই তো নোট পড়ে পড়ায়। যত রিঅ্যাকশনারির দল। আমি তোকে পড়াব।

মা বলেছিল—তুমি পড়াবে? তবেই হয়েছে!

দাশ চৌধুরী বলেছিল—দেখবে তুমি। আমি ওকে কি করে তুলি দেখো।

অলকা খুশী হয়েছিল। বাপ মাসখানেক পড়িয়েও ছিল। কিন্তু তারপর আর না। অভাবপীড়িত বিক্ষুব্ধ-চিত্ত দাশ হয়তো মনে মনে মেয়ের পড়ার দায় থেকে অব্যাহতিই চাচ্ছিল। তবে মেয়েকে নিয়ে কালচারাল শো বা সভা-সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করে নি। তার নিজের ডাক তখন বন্ধ হয়েছে কিন্তু অলকার ডাক আসতে শুরু হয়েছে।

এরই মধ্যে দাশের হল স্ট্রোক। সামলে উঠল, কিন্তু খানিকটা প্যারালিটিক হয়ে গেল। মাস তিনেক তাকে বিছানায় থাকতে হয়েছিল—এরই মধ্যে অলকা নিজের পথ নিজে বেছে নিলে।

দাশের চিকিৎসায় খরচ বেশী হয়েছিল এমন নয়। তবু কিছু হয়েছিল। আসলে বেঁচেছিল সে নিজের গায়ের বা আয়ুর জোরে। কিন্তু মা মেয়ের অন্নসমস্যা তো পর এসে মিটিয়ে দেয় নি—মেটাতে হয়েছিল নিজেদেরই। সাহায্য করেছিল তাতে এই বাবুল বোস।

* * *

বাবুল বোস এ-পাড়াতেই থাকে। বাপ পেনসনার—বাড়ি করেছিল একখানা। তিন ভাই ওরা। কাবুল ভাবলু বাবুল। বড় দু ভাই মোটামুটি গৃহস্থ, চাকরি করে। লেখাপড়াও শিখেছিল। দুজনেই গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু বাবুল ম্যাট্রিক ফেল মুখে বললেও আসলে টেস্টেই অ্যালাউ হয় নি। বাল্যকালে মাতৃহীন, বাপের আদরে বড় হয়েছে। খেয়েছে বাড়িতে, খেলেছে পাড়ায় পাড়ায়। কি ভাবে কোন প্রভাবে এমন ধারাটা হয়েছে তার জীবনের সে নিজেও তার সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারে না। তবে ইংরিজী বুকনি দিয়ে কথা বলাটা ওদের পরিবারগত। ওর বাপের কথাবার্তা এইরকম ছিল। কিন্তু তাঁর কথা ছিল সিরিয়স ব্যাপার। বাবুল ওটাকে সিরিওকমিক করে নিয়েছে, সেটা নিজের চরিত্রমতও বটে, আবার যুগের হাওয়ার জন্যও বটে। ছেলেবেলা থেকেই বাবুল বেঁকিয়ে কথা বলে, খুঁচিয়ে কথা বলে,

হাসতে ভালবাসে। লোকে হাসে, দেখতেও ভালবাসে। অভিনয়েও ঝোঁক ছেলেবেলা থেকে। এখন ১৯৪৪ সালে ওর বয়স বত্রিশ চৌত্রিশ, তার মানে তার পাঁচ সাত বছর শৈশব বাদ দিয়ে আঠারো উনিশ সাল থেকে রুচিটা আপনা থেকেই দেখা গিয়েছে। প্রথম শুরু ইস্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে সুকুমার রায়ের হাসির কবিতা আবৃত্তি করে। তা ছাড়া ওর একটা বিচিত্র স্বভাব ছিল বেড়াল ডাকা। একঘর লোক বসে কথায়-বার্তায় মশগুল, ও তক্তাপোশের তলায় ঢুকে বেড়াল ডাকতে শুরু করত। লোকে সচকিত হয়ে উঠত, তাতেই ছিল ওর অপার আনন্দ। স্কুলে পড়াশুনোর জন্যে প্রাইজ সে পেত না, কিন্তু রেসিটেশন-প্রাইজ সে পেতই। এতেই ওর দোর খুলল ভবিষ্যতের। পুরাতন ভৃত্যে—'কেষ্টা বেটাই চোর' আবৃত্তি করতে গিয়ে সে নাম কিনে ফেললে। তারপর থেকে রেসিটেশন কম্পিটিশনে কাপ-মেডেল পাওয়ার ঝোঁক পেয়ে বসল ওকে। তারপর থিযেটার। পুজোর সময় পাড়ার থিয়েটারের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে ও বাচালের পার্ট পেলে, এবং ভাল পার্ট করলে। সেই থেকে অ্যামেচারে হল প্রতিষ্ঠা। এইটেকেই সে পেশা করবে বলে ঠিক করে নিলে। তার আগে থেকেই বাচনভঙ্গিতে, নাড়ার ভঙ্গিতে বাবুল বোস অভিনয়ই করে যায়। এবং ওইটেই হয়ে গেল তার স্বাভাবিক ভঙ্গি। ছেলেবেলা মা মারা গিয়েছিলেন, বাপ চাকরি করতেন, পেন্সন নিলেন এবং তখন যখন এই ছোট ছেলেটির দিকে তাকালেন তখন আর তাকে তার নিজের ইচ্ছেমত দিকে চালাবার সময় চলে গেছে। তবু ঝগড়াঝাঁটি কম হয় নি। এবং বড় দুই ছেলের কথায় ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেবার ভয় দেখাতেই সে নির্ভয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। গুণ ছিল বন্ধুত্ব জমানোর। এবং আর এক গুণ ছিল, মান অপমান জ্ঞান বাড়িতে তার যত উগ্র এবং তীক্ষ্ণ ছিল বাইরে বন্ধুদের কাছে সেইটে ছিল তত নরম এবং মোলায়েম। যার জন্যে কোন বন্ধুর বাড়ি পাঁচ দিন থাকতে থাকতে যেই বুঝত তারা বিরক্ত হচ্ছে অমনি তার সুটকেসটি তুলে নিয়ে বলত, স্প্রেডিং উইংস। ফ্লাইং টু নর্থ।

বন্ধুবান্ধবে ওর কথা প্রায় সকলেই বুঝত। কেউ না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করত, মানে ?

—মানে ডানা মেললাম—উত্তর অভিমুখে উড়ব। হংস-বলাকা। সাইবিরিয়েন গ্যাণ্ডার।

অন্য কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে সোজা বলত, দেখ, দিন কয়েক থাকব, ফাইভ সিক্স ডেজ। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড !

মধ্যে মধ্যে কলকাতার বাইরেও চলে যেত। সেটার সুবিধেও তখন হয়েছিল। থিয়েটারে ওর নাম তখন ছুটেছে। পারে সব। ডিরেকশন প্রোডাকশন মেকআপ মোশন-মাস্টারি সবই কিছু কিছু পারত, নিজের সিরিওকমিক পার্ট তো আছেই। সর্বত্রই এক কথা, উত্তরে যাব, গাছ পেয়ে বসছি ! বুঝেছ ? তাড়া দিলেই উড়ব।

এর মধ্যে হঠাৎ বাবা মারা গেল হার্টফেল করে, বাবুল বোস ফিরে এসে বাড়িতে জেঁকে বসল।

—ফাদারস্ সন্ ইকোয়াল রাইট।

সেটা সে আদায় করলে। বাড়ির ছিল খানচারেক ঘর। একখানা ঘর নিয়ে একখানা ঘরের একের তিনের জন্যে হাজার দেড়েক টাকা বড় ভাইদের কাছে আদায় করে ব্যাঙ্কে মজুত করে বললে, নাউ এ ক্যাপিট্যালিস্ট। দেড় হাজারের মালিক। স্টোভ কিনে রান্না করত, অথবা হোটেলে খেত। এবং থিয়েটার করে বেড়াত। ফিল্ম স্টুডিয়োতে ঘুরতে শুরু করলে। এরই মধ্যে এল ১৯৪২ সাল। টাকা নোটে পরিণত হয়ে উড়তে আরম্ভ করলে। ময়দান হোটেল বার অঞ্চলে নোট উড়তে লাগল। এবং কিছুটা তার এসে পৌঁছল ওসব এলাকা ছাড়িয়ে মানুষের এলাকায়। সেখানে আমোদ প্রমোদ কালচারাল ফাংশন বর্ষার শেষে ব্যাঙের ছাতার মত গজাতে লাগল। ব্যাঙের ছাতার তরকারি খেয়েছে বাবুল বোস, এবার দেখলে ওর তলায় বেশ রোদ জল বাঁচিয়ে দাঁড়াতেও পারা যায়। অবশ্য আরও একটা কথা মনে হয়েছিল তার। মনে হল মানুষেরা সব ব্যাঙ। বড়গুলো জলে থাকে, গর্তে থাকে, পুকুর ডোবা থেকে ধারের গর্তগুলো দখল করে বসে আছে আর তারা সব ব্যাঙাচি এখনও লেজ খসে নি, খসলেও মটর-দানা বা তার থেকে বড় গোছের তাদের আকার, এই ছত্রাকের তলাতেই ভিড় জমিয়ে বেশ আছে। জমিয়ে আছে। এখন অবশ্য সে অনেকটা বেড়ে বড় হয়েছে। নামডাকে লাফ দিয়ে চলছে। এরই মধ্যে একদা অলকা দাশ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ। এক পাড়ায় বাড়ি, একটু দূর, অলকা দাশ চৌধুরী, চৌধুরী সাহেবের মেয়ে নাচে চমৎকার; কথাটা তখন উচ্চ মার্গের কথা। বললেই কথাকালি ভরতনাট্যম নিউ এম্পায়ার মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ দস্তুর মত হোটেল-প্রাঙ্গণে মধ্যাহ্নের রঙিন বড় ছাতার তলায় বেতের চেয়ার টেবিলের ব্যাপার দাড়ায়, সেখানে গগল্স-চোখে সরোবরবাসিনী সবুজ রঙের লম্বা অর্থাৎ দীর্ঘাঙ্গ বেঙার মতই অলকাকে কল্পনা করে সকলে, ছত্রাকের তলায় কাঠ ব্যাঙেরা ওদিকে লাফ মারতে ভরসা পায় না। সেই সময় বাবুল বোসকেই একদিন এমনি একটি রঙিন ছাতার আসরে ডেকেছিল স্বয়ং চৌধুরী সাহেব। ডেকেছিল তারই দেওয়া একটা পার্টিতে। অলকা নাচবে, গাইবে আধুনিক গাইয়ে মন্টি সেন, আর কমিক করবার জন্য বাবুলকে প্রয়োজন হয়েছিল। পাড়ারই কেউ নামটা বলে দিয়েছিল। মন্টি সেন নামকরা গাইয়ে, দুখানা গান গেয়েই চলে যাবে। অলকার নাচ দুখানা, ফাঁকগুলো ভরাবে বাবুল বোস। বাবুলই কিন্তু বাজিমাত করেছিল সে আসরে। আলাপ সেই সূত্রে। তারপর আর খুব জমেনি। হঠাৎ মাস আষ্টেকের মধ্যে চৌধুরী সাহেব ডিগ-বাজি খেয়ে থ্রম্বসিসে পড়ে গেলেন। তখনই একদিন সে অলকাদের নতুন বাসার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল, অলকা তাকে নিজেই ডেকেছিল। বাবুল সবিস্ময়ে বলেছিল—এখানে! ম্যাটারটা কি?

—কেন? এখানেই এখন থাকি আমরা।

—মানে?

—সে অনেক কথা। বসুন।

অনেক কথার কিছু কথা সেই দিনই সে তাকে বলেছিল। এবং যাওয়া-আসার পথে

কয়েক দিনের মধ্যে আলাপ একটু নিবিড় হয়েছিল। তার মা-ও তার সামনে বের হচ্ছেন তখন। বাবা তখনও ঠিক সুস্থ নন। কয়েকদিন পর সেদিন হঠাৎ অলকার মা প্রশ্ন করেছিল—কে বলছিল তুমি নাকি সিনেমায় নামছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আমি লাকি ক্যাট—শিকে ছিঁড়ে একটা পার্ট পেয়েছি।

—ভাল পার্ট ? হিরো ?

—হিরো ! মাই ঈশ্বর ! বাবুল বোসকে খোদা চোরা ক্যাট করে তৈরি করেছেন। চিরকাল টাইগারের মাসী তো বলতে পারি না, মামাই ধরুন—মেটারন্যাল আঙ্কল। মানে কমিক ছাড়া পারিও না কিছু, চেহারাও টাইগার—মানে হিরোর না। ছোট একটা কমিক পার্ট। তবে আশা করছি এতেই ওয়া গুরুজী কি ফতে করে দেব। জমাব। ডিরেক্টার বলেছে গুড। সেদিন বলেছে ভেরি গুড।

অলকার মা বলেছিল, বাঃ ! বস, আমি চা আনি।

সমাদর করে চা খাইয়ে মা বলেছিল, দেখ, আমার খুব ইচ্ছে নয়, তবে অলির ইচ্ছে ও সিনেমায় নামে। ওর বাপের কথা তো শুনেছ, জানও। একেবারে আলট্রামডার্ন, কোন কিছু মানে না। বলে, সংসারে কোন পথে পাপ নেই, যদি পাপ মানে পরের অনিষ্ট নিজের অনিষ্ট না করে। আর মিথ্যেকে যে কি ঘেন্না ! এই তো পাঁচজনে ওর ডিপার্টমেণ্টে পেছনে লাগল। কেন ? না ওদের সঙ্গে ক্লিক করে কিছু করবে না। সাহেব ভালবাসে, অনেস্টির জন্যে উন্নতি হয়, বাস্, সে ওদের সয় না। পিছনে লাগল। জেদী মানুষ, একদিন ফিরে এসে বললে, আই হ্যাভ কিকড দেম আউট। চাকরি ছেড়ে দিলাম। দুঃখ দুর্দশা—কুছ পরোয়া নেই। বাড়ি করেছি, বিক্রি করব। ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করব ওই টাকায়। অসুখ হয়েছে, তাতেও বলে ঠিক আছে। তিনি বলেন, ঠিক লাইন ধরেছে অলি। মেয়েদের পক্ষে সব থেকে শাইনিং লাইন। ওই লাইনেই যাবে ও। কি বলব বল !

অবাক হয়ে শুনছিল বাবুল। অলির মা থামতেই বলে ফেলেছিল, সত্যিই তো। টেল মি নট ইন মোর্নফুল নাম্বারস—ও বিষণ্ণ ভাবে কিছু বলবেন না। মানে দুঃখ করবেন না। তা নামুক না। উনি ঠিক বলেছেন—শাইনিং লাইন বটে। নেমে যাও অলি। আচ্ছা, আমি চলি।

—তুমি একটু দেখো। একটা ভাল বই, হিরোইনের পার্ট—এ হলে আমি আপত্তি করব না। বুঝলে ? আমি ওকে বলছি একটা বই তুমি নিজেই করে ফেল। তা সে ওর ভাল লাগছে না।

—ইয়েস, ইয়েস, ও ইয়েস, আমি ঠিক বুঝেছি ! রাইট বলেছেন। টুইংকল্ টুইংকল্ লিট্‌ল স্টার চিরকাল লিট্‌ল স্টারই থেকে যায়, সান মুন কি বৃহস্পতি শুক্র হয় না। একেবারে হিরোইনের পার্টই ভাল। ভেরি ভেরি ভেরি রাইট। আচ্ছা, চলি আমি। সেই বইয়ে আমাকে একটা ভাল কমিক পার্ট দেবেন। চৌধুরী সাহেব ভাল হয়ে উঠুন, একটা বই প্রডিউস করে ফেলুন। বাস্, এক বইয়েই অলকা দি নিউ মুন !

বলেই সে চলে এসেছিল, দাঁড়ায় নি। রাস্তার পিছন থেকে অলকা ডেকেছিল, শুনুন !

—মাই খোদা, তুমি!

—হ্যাঁ।

অলকা কাছে এসে বলেছিল, আপনি তো পাঁচটা অ্যামেচারে পার্ট করেন, আমাকে তাতে পার্টটার্ট করার সুযোগ করে দেবেন?

সোজা বাংলা বেরিয়ে এসেছিল বাবুলের মুখ থেকে বিস্ময়ের আতিশয্যে, তুমি আমাদের সঙ্গে এই সব অ্যামেচারে পার্ট করবে?

—করব। না হলে আমাদের সংসার অচল হয়েছে।

—সংসার অচল হয়েছে!

—হ্যাঁ, সে অনেক কথা। এই আজকেই বাবার একটা ওষুধ কিনতে হবে। ইটালিয়ান ওষুধ। বাজারে নেই। ডাক্তার বললেন একজনের কাছে আছে, কিন্তু দাম নেবে কুড়ি টাকা। আসল দাম আড়াই টাকা। বাবার নতুন রোগ হয়েছে বাত। একেবারে পঙ্গুর মত। ডাক্তার বলছেন দুটো ইনজেকসন দিলেই সেরে যাবে। কিন্তু কোথায় টাকা। এমন কি ঘরে বিক্রি করবার মতও কিছু নেই। আমার গায়ে যা রয়েছে সব গিল্টির।

বাবুল তাকে সেই দিনই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল একটি অ্যামেচার পার্টির কাছে। তিন দিন প্লে হবে, তাতে অলকা পার্ট করবে। নাচের পার্ট—তার জন্যে দেড়শো টাকা পাইয়ে দিয়েছিল। অনুগ্রহের দেড়শো টাকা। এবং অলকাকে বলেছিল, দেখ আসল পার্ট স্টেজের বাইরে। বিটেন থেকে লাইম খসলেই ইউ আর গন।

অলকা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বাবুল বলেছিল, নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? পান থেকে চুন খসলেই তুমি যাবে। হয় দিস সাইড, নয় দ্যাট সাইড। এক সাইডে আস্তাকুড়, অন্য সাইডে খাদ। মানে দ্যাট প্রডিউসার লম্বাচুলো রিচম্যানস্ সন—ওর সঙ্গে ইয়ারকিও দিতে হবে, মানে ফিশ অ্যাণ্ড ফিশ-ক্যাচার প্লে। ঠোক্কর মারবে, কিন্তু গিলবে না। বুঝেছ? গিললে গন। আর ঠোক্করও যদি না মার তবে রাস্কাল চারে ঢেলা মেরে ভাগাবে। আর পাবে না পার্ট।

অলকা একটু হেসে বলেছিল, জানি।

—জান? মাই খোদা! আমি ভেবেছিলাম কাঁচা—

—অভাবের তাড়ায় পেকেছি বাবুলদা! তোমাকে দাদাই বলব, কেমন!

—ও-কে! বাট্, দাদা বললে আজকাল লোকে সন্দেহ করে।

—তা করুক।

—আপত্তি নেই। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে যেন তুমি ফিশ ভেবো না। ও আমার সইবে না।

সেই দিন থেকে বাবুল বোসই ওকে সঙ্গে নিয়ে এখানে-ওখানে পার্ট পাইয়ে দিয়েছে। অলকা নামও করেছে অ্যামেচারে। কিন্তু সিনেমায় সুবিধে হয় নি মাথায় খাটো বলে। একটু মোটাও মনে হয় সে দৃষ্টে। এবার মঞ্জরী অপেরায় নিজে ঢোকবার সময় ওকেও নিয়েছে। মেয়েটার ওপর একটা মায়া ওর আছে। কিন্তু আজ অলকা যা বললে এবং ওর

বাড়িতে ওর বাপ-মায়ের যে সম্ভাষণ শুনে এল এটা সে কল্পনা করে নি।

অলকাদের বাসা থেকে তার বাড়ি প্রায় আধ মাইল পথ। টালিগঞ্জের এলাকায় রসা রোডের দু পাশে দুটো নূতন কলোনী হচ্ছে। অলকারা থাকে পশ্চিমে, বাবুলদের বাড়ি পুবে। রাস্তা জনবিরল হয়ে গেছে, তার উপর ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার। কিন্তু তাতে খুব ভয় নেই বাবুলের। পাড়ার রাত্রিচর এবং রোয়াকবাজেরা তাকে জানে; দেখলেই হেসে ফেলে, সে হাত নাড়লেও হাসে, রাগ করলেও হাসে। ভয় হয় কোনোদিন যদি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ও কাঁদে তাহলে সেটাও একটু নতুন কমিক কিছু বলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। তার মাই লর্ড, মানে গোরাবাবু, তার বইয়ে তার পার্টের এমনি একটা সিন লিখেছে। কামন্দক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে গাছতলায় আর কাতরাচ্ছে। শবর মেয়েরা এসেছে বনে কাঠ সংগ্রহ করতে; তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে তাদের কাছে জল চাচ্ছে। অবশ্য নিজের ভঙ্গিতে—

মুমূর্ষু মুমূর্ষু অহং, জলং জলং সুশীলতলং—
শীঘ্রং দেহি, ভো শবরী, নচেৎ মরণং ধ্রুব।

শবরী বলছে—তোমার জাত যাবে যে ঠাকুর—

কামন্দক বলবে—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষং নাস্তি আতুরে নিয়মো নাস্তি
তথাপি যদি যায়—শবরোহং ভবিষ্যামি।

ওরে রাক্ষসী, তোর ঘরেই তখন হাঁড়ি কাড়ব।

মেয়েগুলো হেসেই আকুল। বলে, ঠাকুরের ঢং দেখ!

কামন্দক চীৎকার করে উঠবে, জল জল জল। ওরে প্রাণ যায়!

তারা ছি ছি করে বেশী হেসে উঠবে। এমন সময় নায়ক গোরাবাবু ঢুকবে। জল দেবে। সেই সূত্র ধরে রাজবয়স্য কামন্দক নায়ক ব্রাহ্মণপুত্রের মিত্র হল। এবং ব্রাহ্মণকুমার রাজজামাতা হয়ে শেষে রাজকন্যার ধর্মপরায়ণতা এবং শুচিতার নিষ্ঠুরতায় নির্মম ভাবে পীড়িত আহত হয়ে ঘর ছেড়ে ওই গন্ধবকন্যার প্রেমকে অবলম্বন করে সারা জীবন পতিত হয়েই কাটিয়ে দিল। তখন সে তার সঙ্গী হয়ে রইল।

পার্টটা ভাল। গোরাবাবু তার ইংরিজি বুকনির মুদ্রাদোষ বা স্বভাবকে চমৎকার ব্যবহার করেছে ভুল সংস্কৃত বুকনিভরা বক্তৃতায়। বেড়ে হয়েছে জায়গায় জায়গায়—ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং সত্যং ঝঞ্ঝাটং জগতংময়ং—। ওটা এরপর শ্রোতাদের মুখে মুখে ফিরবে। এবং কথাটাও সত্য, খাঁটি সত্য।

বাড়িতে ঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকে, আলোর সুইচ টিপে দেখে আলো জ্বলে না। বারবার চেষ্টা করেও আলো জ্বলল না। সে এবার চীৎকার করে বলতে লাগল, আলো জ্বলে না কেন? অ্যাঁ! বলি আলো জ্বলে না কেন? বাড়ির সব ডেড্ না কি? সাড়া দেয় না? ওরে ও গোপাল! গোপলা রে! এই!

উপর থেকে মেজ বউদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মরণ! এই রাত্রে ষাঁড়ের মত চীৎকার! ফিউজ হয়েছে গোটা বাড়ি। আলো জ্বলবে কি করে!

ওদের সঙ্গে মানে দুই ভায়ের স্ত্রীদের সঙ্গে ওর কথা নেই। ভাইদের সঙ্গেও নেই।

ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে আছে, তারা ওর ভক্ত।

ঝক্কাটং ঝক্কাটং সারাং ঝক্কাটং জগতংময়ং। মাই খোদা, হে গড, এর ভগবান—দেশলাইয়েও দেখা যায় গোটা কয়েক কাঠি।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে শুয়ে পড়ল বাবুল বোস। পৈতৃক বাড়িতে উপরে নীচে খানচারেক ঘর ; ওই বাইরের ঘরখানা নিয়ে বাকীটা ওদের ছেড়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, আবার এসে তালা খুলে ঘরে ঢোকে। ভিতরের দিকে দরজা বন্ধই থাকে। বাবুলের কল পাইখানা বাড়ির পাশের চার ফুট গলির মধ্যে। শুধু ইলেকট্রিক মিটারটা একসঙ্গে আছে। এটাও ঘোচাতে হবে। এবার করবে। মঞ্জরী অপেরায় চাকরিটা প্রায় সাত আট মাসের। বাইরে বেরুতে পারলে টাকা জমবে। দৈনিক খোরাকি আছে, এক প্যাকেট সিগারেট আছে, শুধু মদের দাম। তা হয়ে যাবে। বিগ ব্রাদার আছে, মাই লর্ড আছে। ওরা দুজনে রইস আদমি! অ্যারিস্টোক্র্যাট! মাই লর্ড গুণী লোক। বইখানা—

বিগ ব্রাদার বলছিল—বইখানা মাই লর্ডেরই জীবন একরকম। গরিবের ছেলে, গুণী ছেলে, গুণ দেখে বড়লোকরা জামাই করে বাড়িতে রেখেছিল। কিন্তু বড়লোকের ধার্মিক শুচিবাইগ্রস্তা মেয়ের তাপ সইতে পারে নি। পালিয়ে এসে মঞ্জরীর প্রেমে পড়ে মঞ্জরী অপেরা খুলেছে। যাত্রাতে মঞ্জরী করবে সেই স্ত্রীর পার্ট। অসি মঞ্জরীর পার্ট—মন্দ ব্যাপার নয়।

নয়

'গন্ধর্বকন্যা'র প্রথম অভিনয় হল কলকাতায়—মঞ্জরী অপেরার পেট্রন পাকপাড়ার রাজাদের বাড়ির উঠোনে। কুমার বিমল সিংহ পণ্ডিত লোক, রসিক লোক, অমায়িক লোক, এ যুগে এমন লোক দুর্লভ। তাঁর দুই ভাই অমরেশ সিংহ, বৃন্দাবন সিংহ এবং ওঁদের কাকা জগদীশ সিংহ সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং রসিক লোক। ওঁদের বাড়ির নাট্যরসামোদিতা বহুকাল থেকে বিখ্যাত। ওঁদের বেলগেছের বাড়িতেই প্রথম থিয়েটার হয়েছিল। রাসের সময় মুর্শিদাবাদে ওঁদের মূল বাড়িতে আজ কয়েক বছরই মঞ্জরী অপেরা নিয়মিত গান করে আসছে। প্রথম কোন বই খোলাবার সময় প্রথম গাওনাটা এই ভাবে কোন বড় বাড়িতে গেয়ে দেখে নেয় পার্টি—বইটা দাঁড়াল কেমন। মোটামুটি ওটা একরকম ড্রেস-রিহারস্যাল। অভিনয় কিছুটা ছাড়াছাড়া এবং কাটাকাটা হয় বটে তবে কেমন জমাট হবে, লোকের কেমন লাগবে, এটা বোঝা যায়।

জমাট নাটক। গোড়া থেকেই প্রায় জমে গেল। বংশীর কৃতিত্বই জমিয়ে দিলে। গানে সে এমন সুর দিয়েছিল যে প্রথম গানেই যেন আসর রমরম করে উঠল। আশা নিজে নেমেছিল সখীর দলে। তার ওদিকে নিয়েছিল চোদ্দ পনের বছরের নতুন মেয়েটাকে। নতুন হলেও মেয়েটার গলা আছে আর নাচবার মত লম্বা দেহ আছে। এখনও ঠিক যুবতী সে হয় নি, কিন্তু ওকে আশা ঠিক যুবতীই বানিয়ে তুলেছিল। এবং মোটামুটি তালে পা ফেলাটাও

ঠিক চালিয়েছিল।

আনো আনো, রঙিন মাধুরী আনো—
টানো টানো, কাজলের রেখা টানো—

বলে চোখের কোলে কোলে বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী টেনে কটাক্ষ হেনে একটু ঝুঁকে একটু থেমে জলদে সজল নয়ন মুছে ফেলে সই কাজলের রেখা টানো, বিরস অধর সরস করিয়া রঙিন মাধুরী আনো, ধরতেই যেন আসর তালে তালে নেচে উঠল, দুলে উঠল। বাঁয়া তবলার সংগতে সে যেন হিল্লোল বইয়ে দিলে একটি। আসরের লোকের পিছনে রাতুবাবু ব্রহ্মমিত্র সেজে দাঁড়িয়ে ছিল, তার পাশে সর্বাণী সেজে শোভা, তারা একটু পরেই ঢুকবে। ব্রহ্মমিত্রের প্রবেশ এই গানের পরেই। তারও আগে দাঁড়িয়ে দলের আর কয়েকজন লোক। যোগাবাবুও রয়েছে। যোগাবাবুর গণ্ডগোল মিটে গেছে, সে আবার দলে ঢুকেছে। রাতুবাবু অনেক বলে-কয়ে অপরাধ মাফ করিয়ে দিয়েছে। অপরাধ যোগাবাবু নিজের অজ্ঞাতসারে ঠিক না হলেও মূর্খতার জন্য করে ফেলেছিল। ওই পাঁচুন্দির কাছের বায়নাটা সে এনেছিল, কিন্তু সমস্ত জেনেশুনেও সে ঠিক বুঝতে পারে নি যে, ওটা গোঁরাবাবুর বুড়ো ঠাকুরদা এবং গোরাবাবুর শ্বশুরদের আঘাত দেবার জন্যেই বায়না করছে।

গোরাবাবু ওকে জিজ্ঞাস করেছিল—আপনি তো জানতেন, ওখানে যখন শ্বশুরবাড়ি আপনার, তখন আমার বাড়ি ওখানে, শ্বশুরবাড়ি ওখানে, তা তো জানতেন?

যোগ সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানতাম। নিশ্চয় জানতাম। জানতাম না। বললে অন্যায় মিথ্যে বলা হবে যে। জানতাম। এককালে আপনার শ্বশুরদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ছিল তাও জানতাম। আবারও হবে যখন আবার এরা মাথা তুলেছে, তখন আবার লাগবে, তাও জানি।

—আমার ঠাকুরদার ব্যাপার? জানতেন না?

—মিথ্যে বলব না। জানতাম। শুনেছি। হ্যাঁ শুনেছি। শুনেছি বইকি।

—তবে!

—এতটা ভাবি নাই বাবু। না, আমি ভাবি নাই।

—ভাবেন নি?

—কি করে ভাবব বাবু! আমি তো নিজে যাত্রাওলা। যাত্রাগান গেয়ে খাই। ওদের ওখানে যাই, কত্তা আদর খাতির করে। আমার অপমান তো লাগে না।

বলেই সে পা দুটো চেপে ধরেছিল গোরাবাবুর—দোহাই বাবু, বুড়ো বামুন, ঘরে দুই পরিবার, গণ্ডাখানেক বিটি। তার কটা আইবুড়ো, একটা বিধবা—

—ছাড়ুন। যান, কাজ করুন গে।

—ঈশ্বর মঙ্গল করুন বাবু। মঞ্জরী অপেরার জয়জয়কার হোক। আমি মিছে বলব না, সত্যি বলব। কত্তার কাছে মঞ্জরী অপেরার বড়াই করেছিলাম, তা উনি বলেছিলেন, আন দেখি দল, দেখি। যদি আনতে পার তবে বকশিশ দেব তোমাকে বিশ টাকা। আমি বলেছিলাম, আলবৎ আনব। বুঝতে পারি নাই বাবু। বোকা গাঁজাখোর বামুন তো,

খোরপ্যাচ বুঝি নাই।

গোরাবাবু বলেছিল—ঠিক আছে। যান।

যোগাঠাকুর চলে গিয়েছিল শোভার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে—শোভাদিদি শোভাদিদি, আমার জিত, তোমার হার।

মীতুবাবুই যোগাঠাকুরকে নিয়ে এসেছিল, সে বললে, অন্যায় করলেন দয়াময়। কথা কয়া উচিত ছিল না—টাকা নিয়েছে। জানলে আনতাম ওকে আমি!

—ওর চেয়ে আমার অন্যায় বেশী মাস্টারমশাই। আমার বায়না নেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু আমার শ্বশুরদের অপমান হবে এইটের জন্যে এবং আর একটা কথা, মঞ্জরীকে বিয়ে করেছি, যাত্রা করি, এতে আমি কোন অন্যায় করি নি। এইটে দেখাবার জন্যে আমি বায়না নিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম মাস্টারমশাই, এমনি করেই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু ভাবি নি, এর ধাক্কায় দাদু মারা যাবেন। তবে আমার সান্ত্বনা আমি মঞ্জরীর অপমান করি নি।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—যোগাবাবুকে আমি নিজেই ডাকতাম। আপনি নিয়ে এলেন সেটা ভাল হয়েছে। বোকা লোক, কিন্তু সরল। বুঝতে পারি নি, কৈফিয়তটা আমি ষোল আনা বিশ্বাস করেছি।

যোগাবাবু দর্শকদের ঠিক পিছনে দলের লোকের আগে দাঁড়িয়ে তারিফ করছিল—বাহবারে বেটা বাহবা! বেটা আমার সুরের খেলে আচ্ছা খেলোয়াড়।

অর্থাৎ বংশী। এবং ওই সব ঝোঁকের মাথায় সঙ্গীদের দেহ হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহেও হিল্লোল খেলাচ্ছে ও। অত্যন্ত কুৎসিত লাগছে সে খেয়াল নেই।

মীতুবাবুর হাতের সিগারেটটা পুড়েই চলেছে।

শোভা পাশে দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে বলছে—আমার পা নাচছে মাস্টার।

মীতুবাবু ভদ্রতার খাতিরে বললে—হুঁ।

—চল না, এরপর আমরা দুজনে ডুয়েট্ নাচ নাচতে নাচতে গিয়ে ঢুকি।

মীতুবাবুর হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, সে একবার একটু মুখ ফিরিয়ে একটা রূঢ় দৃষ্টি হেনে বললে—চুপ কর।

শোভা থমকে গেল। তার মনে হল তার মুখের উপর একটা চড় মারলে মীতুবাবু। চুপ করে গেল সে। আলো এখানে অবছা নইলে হয়তো দেখা যেত, শোভার মুখের পেন্টে লাল রঙের মাত্রা যেন বেশী হয়ে গেছে।

গান শেষ হতেই মীতুবাবু গিয়ে ঢুকল—রাজা ব্রহ্মমিত্র, বন্ধ করো, বন্ধ করো গান। বন্ধ করো উৎসব উল্লাস।

ভরাট গলায় আবেগ সঞ্চারিত কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠল। আসরের পরিবেশ সুন্দর, প্রশস্ত উঠোনের চারপাশে জোড়া জোড়া গোল থামের ঘের, বারান্দায় পূব দিকে মেয়েদের আসর, অন্য দু দিকে বিশিষ্ট দর্শকেরা চেয়ারে বসেছেন। মাঝখানে উঠোনে সাদা ফরাশ,

চারপাশে উজ্জ্বল আলো। উপরটা খুব সযত্নে ঢাকা, ব্ল্যাক-আউট, যাতে এক ফোঁটা আলো না বের হয়। রীতুবাবু প্রথম বক্তৃতাতেই ক্ল্যাপ পেলে। তার পরেই ঢুকল শোভা—মহারাণী সর্বাণী আর নিজে মঞ্জরী—সে রাজকন্যা শুচি। শান্ত ধীর কণ্ঠে মঞ্জরী তার পিতার প্রসারিত বাহুর সীমানা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললে:

ক্ষমা কর পিতা, দেবকার্যে রত আমি,
হাতে মোর পূজা উপচার

বাধা দিয়ে সর্বাণী বললেন—শুচি, শুচি। পিতারে প্রণাম কর।

ব্রহ্মমিত্র বললেন:

না না রাণী। গন্ধর্ব-আলয় থেকে
প্রত্যাগত মোর দেহে মনে—পাপ গ্লানি—

শুচি বাধা দিয়ে বললে:

তাও মোর কাছে বাধা নয়। আমি কন্যা, তুমি পিতা।
কিন্তু পিতা এ পুরে প্রবেশ করি কাহারও প্রণাম ভক্তি
লইবার আগে তুমি নিজে ভক্তিভরে প্রণাম
করহ আসি এ গৃহের দেবতার পদে।
গঙ্গাবারি স্নান তরে রয়েছে প্রস্তুত।
কর স্নান, পট্টবস্ত্র পর, খোল মুক্তাহার—
কৃতাঞ্জলি পুটে তোমারই স্থাপন করা
দেবতার পদে প্রণাম করিয়া লহ
তাঁর আশীর্বাদ। তারপর আসিয়া
দাড়াও রাজাসন পাদপীঠে, আমরা প্রণত
হয়ে ধন্য হই সবে।

চারিদিকে রব উঠে গেল—সাধু সাধু সাধু।

সাধুবাদ প্রথম দিয়েছিলেন গৃহকর্তা নিজে।

ওদিকে গ্রীনরুমের মধ্যে গোরাবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। এবার ঢুকবে সে। নাটুবাবু বসুমিত্র, বাবুল বোস কামন্দক। নাটুবাবুও ভাবছিল—নিজের পার্ট। বাবুলের কিন্তু ওসব ভাবনা চিন্তা নেই, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে একটা টর্চ তুলে নিয়ে কানে লাগিয়ে বললে—হ্যালো, হ্যালো। জলদি, ফায়ারব্রিগেড। মেক হেস্ট। ফায়ার। কোথায়? আমাদের পালা—হ্যাঁ গন্ধর্বকন্যা—একদম ফায়ার। ফায়ারব্রিগেড না থাকে কাউকে মেঘমল্লার গাইতে বলুন। Yes, yes, yes—গন্ধর্বকন্যা ফায়ার। হ্যাঁ, রাম ফায়ার!

সত্যিই পালাটা খুব জমাট হয়ে চলেছিল। বংশীর দেওয়া গান নাচ তার স্বাদ গন্ধ রূপকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। সকলের মধ্যে নার্ভাস হয়েছে শুধু অলকা। তার গলা শুকুচ্ছে, ঘন ঘন জল খাচ্ছে। সে-ই হিরোইন, সে-ই গন্ধর্বকন্যা মালবিকা। শোভা বিব্রত হয়ে আছে।

গোপালীর সঙ্গে যার দুই কথা-কাটাকাটি হয়েছে। মঞ্জরী খুব গম্ভীর। তার পার্টের ছায়া পড়ছে যেন। রাজকুমারী শুচি বিবাহের রাত্রে বাসরে জয়ন্তকে বলছে :

জীবনে চাহিয়াছিনু পুরুষ-উত্তম যিনি—নারায়ণ অবতার
রাম সম পরম পুরুষে। পিতা মোর তোমারে আনিয়া
কহিলেন, তুমি তাঁর প্রতিনিধি। নারায়ণ সাক্ষী করি
তোমারে প্রণাম করি দেহ মন সঁপি ধরি তব হাত।
ধর্মপথে পুণ্যপথে একদিন সেই পথে মিলিবে সাক্ষাৎ
লক্ষ্মীনারায়ণ সাথে। তুমি মোর সাক্ষাৎ দেবতা—
লহ প্রণাম আমার।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জয়ন্ত তার মুখের দিকে।

শুচি বললে—মুখপানে চেয়ে কি দেখিছ স্বামী! রূপ?

জয়ন্ত বললে—রূপ নয়, খুঁজিতেছি হৃদয় তোমার।

শুচি বললে—হৃদয় হৃদয়ে নাই—তোমার চরণতলে করেছি অর্পণ।

জয়ন্ত বললে—না।

—না? শুচি নয় অসত্যবাদিনী!

—অসত্যবাদিনী নয়। সত্যেরে সে বোঝে নাই।

—সত্যেরে বোঝে নি শুচি?

—না। তব বাক্য প্রমাণ তাহার।

হৃদয় বাক্যের উৎস দেবী।
হৃদয় সঁপেছ তুমি ধর্মের চরণে।
আমি ধর্ম নই।

—স্বামী! কি বলিছ তুমি?

—সত্য কথা কহি দেবী। আমি ধর্ম নই।

সামান্য মানব আমি। জয়ন্ত আমার নাম।
ধর্মের নিয়ম আছে, সে নিয়ম ভাঙে না, ছেঁড়ে না—
নিয়ত বন্ধনপীড়া আমারে পীড়িত করে—
আমি সব ভেঙে ছিঁড়ে মুক্তি চাই।
ধর্মের সাহিক তৃষ্ণা—মোর তৃষ্ণা অফুরন্ত।
জয়ন্ত খুঁজিয়া ফেরে সুখ। দুঃখ মাঝে।
পরিতুষ্ট ধর্ম—সুখ নিদ্রাতোর। ধর্ম মোর আছে,
কিন্তু তারে আমি গড়ে লই।

শুচি এবার স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে :

বল দেবী, যে মাল্য পরায়ে দেছ গলে—

ফিরাইয়া দিই ; এই স্তব্ধ নিশীথ প্রহরে—
সবাকার অগোচরে চলে যাই আমি !
তুমি চল আপনার পথে। আপন তপস্যা
তব পূর্ণ কর তুমি। পাও তুমি নারায়ণে।

শুচি এসে হাত ধরে বললে :

আমার তপস্যা বলে
তোমারেই হতে হবে সনাতন ধর্মের প্রতিভূ।
তোমারে ছাড়িয়া নাহি দিব। আজি হতে
এই হবে তপস্যা আমার।

করতালিতে আসর ভরে গেল।

মঞ্জরী কিন্তু ফিরে এল। তার মুখে হাসি নেই, তার মুখ থমথম করছে।

অলকা গন্ধর্বকন্যা মালবিকা, কুসুমিকা তার মা, যে রাজা ব্রহ্মদত্তের গান্ধর্বমতে বিবাহিতা স্ত্রী, এ পার্টে নেমেছিল গোপালীবালা। দলের সকলেরই একটা ধারণা ছিল, খাটো মাথায় একটু হৃষ্টপুষ্ট অলকাকে পার্টে ঠিক মানাবে না, বিশেষ করে গোরাবাবুর দীর্ঘদেহ নায়কের বিপরীতে নায়িকা হিসেবে বেমানান হবে। রিহারশ্যালে পার্ট সে মন্দ বলে নি, এবং নতুন মেয়ে বলে গোরাবাবু রীতুবাবু এবং মঞ্জরী পরামর্শ করে তার পার্ট কমিয়ে ছোট করেও দিয়েছিল। কিন্তু আসরে বিপরীত ব্যাপার ঘটে গেল। অলকা মেক-আপের আর্টটা জানে, সে চুড়ো করে চুল বাঁধার ঢঙটাকে একটু বদলে নিয়ে মাথায় চুলের এমন একটি খোঁপা তৈরি করেছিল যে তাকে খুব খাটো বলে মনে হয় নি, এবং তার পোশাক এমন আঁটসাঁট করে পরেছিল যে তাকে তন্বীর মতই মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা ভুল করেছিল সে। তার পার্টের সঙ্গে মিলিয়ে সাজসজ্জা যা করেছিল, তাতে জৌলুস ছিল না। জৌলুসহীন সাজে কেমন যেন ম্লান লাগছিল ; তার উপর পার্টের বেলায় কেমন মিইয়ে গেল। মার্ভাস হয়ে গেল বলে মনে হল। পার্টটি অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধ ফুলের মত কোমল একটি সন্ত-যুবতীর পার্ট।

কুসুমিকা গন্ধর্বকন্যা দেব-পরিচর্যা করতে গিয়ে দেখা পেয়েছিল দেব-অংশোদ্ভূত মানব-বংশের বীর্যবান রাজা ব্রহ্মমিত্রের। এবং পরস্পরের প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে গন্ধর্বমতে বিবাহ করে জীবন-যাপন করছিল, তারই ফল মালবিকা। দেবতাদের ষড়যন্ত্রে ব্রহ্মমিত্র কুসুমিকাকে বিশ্বাস-ঘাতিনী ভেবে দেবলোক গন্ধর্বলোক ছেড়ে নিজের রাজ্যে চলে এসেছেন, কিন্তু কুসুমিকা বিশ্বাসঘাতিনী নয়, সে ব্রহ্মমিত্রকে অপরাধী করে নি, নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করে, আপন জীবন-তপস্যা করে চলেছে কন্যাকে নিয়ে। দেবতাদের অজস্র প্রসাদের প্রলোভন উপেক্ষা করে নারায়ণ-মন্দিরে নারায়ণ-মহিমা কীর্তন করে জীবন ধারণ করে। কন্যাকেও সেই ব্রতে দীক্ষা দিয়েছে। মালবিকা সেই কন্যা। সে রাত্রে নারায়ণ-মন্দিরে এসে আরতি-নৃত্য করে। চোখে তার স্বপ্ন—নারায়ণ দেখা দেবেন ! চন্দ্রালোকিত মন্দির-প্রাঙ্গণে আরতি

করবার জন্য দুই হাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে প্রথম প্রবেশ তার, আরতি-নৃত্য করে নতজানু হয়ে সে প্রার্থনা করছে গানে—

পূর্ণ করো পূর্ণ করো—পুণ্য করো পুণ্য তুমি, পুণ্যময়—।

নাচলে সে ভালই। গান থেকে থেকে ম্লান হতে লাগল। গানখানা ভাল হল না। গানের গলা তার চলনসই; তার উপর গলা সে তুলতেই পারলে না। জমাট অভিনয়ের আসরে ঢুকেছিল। প্রথমেই ছিল নাচ। তারপর গান। সে ভুলতেই পারলে না যে তার গলা মঞ্জরীর মত ভাল নয়। ঠিক একটা দৃশ্য আগে মঞ্জরী গান গেয়ে এনকোর পেয়ে গেছে। লোকে প্রথমটা অপেক্ষা করছিল যে গলা ধীরে ধীরে উঠবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই পাউডার—শুনতে পাচ্ছি না।—রব উঠতেই সে চঞ্চল হয়ে পড়ল, গলা চড়াতে চেষ্টা করতেই বেসুরো হয়ে গেল। যাই হোক, গান শেষ হতেই ওর মা কুসুমিকা এল, এবং তাকে বললে তার জন্মকথা। বললে নিজের ব্রতের কথা, এবং তাকে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষার কথা। বললে:

মালবিকা, গন্ধর্বের কুলে জন্ম—দেবতালোকের মোরা
বিলাসসামগ্রী। বিধাতা-নির্দেশে—
এরই তরে সৃষ্ট মোরা— কোন পাপ স্পর্শ নাহি করে।
তবু, তবু চিত্তলোকে নারীমন করে হাহাকার
স্বামী পুত্র গৃহ লাগি। মন চায় তুলসীমঞ্চের
তলে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া স্বামী দেবতার লাগি
প্রতীক্ষা করিতে। সহসা পুরিল সাধ। একদিন
দেবলোকে সমাদৃত নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ ব্রহ্মমিত্র
সাথে হল দেখা। দিব্যকান্তি বীরবপু—
মানুষের চিত্তলোক হাসি কান্না,
সুখ দুখ—মেঘ রৌদ্র খেলায় বিচিত্র,—
নয়নে কি প্রেমদৃষ্টি আকাঙ্ক্ষার মণিদীপ শিখা।
তাহারে বলিয়াছিনু।—তিনি মোরে গন্ধর্ব বিধানে
বিবাহ করিয়া মোর সাথে বাঁধিলেন ঘর।
তার ফল তুই। অর্ধেক গন্ধর্ব তুই অর্ধেক মানবী।
তাই তোর চিত্তলোকে সতীত্বের সাধনা পিপাসা
সুগভীর অন্তস্তলে বয়ে যায়—পাতালের
গঙ্গাধারা ভোগবতী সম।

চমকে ওঠে মালবিকা—মাতা! সত্য কথা? মানবের কন্যা আমি সত্যিই মানবী! আমার পিতার নাম ব্রহ্মমিত্র রাজা?

একটু স্তব্ধ থেকে বলে—তাই তাই।

কুসুমিকা বলে—তাই কি মালবিকা?

মালবিকা বলে :

তাই মোর দেবতারে ভাল নাহি লাগে। তাহার বেদনা নাই,
মাতা, আনন্দের স্পর্শ চেয়ে বেদনার স্পর্শ মোর
মধুর মধুরতর লাগে। তাই মাতা, মোর চক্ষুজলে
লবণাক্ত স্বাদ! তোমার মতন স্বাদহীন জলবিন্দু নয়!
আমি মানবী!

কুসুমিকা : হাঁ৷ মালবিকা, মানবশ্রেষ্ঠের কন্যা তুমি মানবী!

মালবিকা একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বলে : তাই! মাগো তাই!

তাই মোর স্বর্গ-শিলা দিয়ে গড় এই যে বিগ্রহ —
নারায়ণ মূর্তিখানি এও যেন-

—চুপ মালবিকা, চুপ।

মালবিকা চুপি চুপি বলে :

এও মোর চিত্ত নাহি ভরে। এরই পদে
ঢেলে দিতে আসি দেহ প্রাণ মন, কিন্তু দিতে এসে
ফিরে যাই। বলে যাই, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে —
ভয় লাগে, নিদারুণ ভয়, নারিলাম দিতে।
ফিরে যাই আমি। তাই মাগো, তাই
মন মোর, দৃষ্টি মোর যত ধায় ঊর্ধ্বলোকে—
তৃপ্তি যত পাই আমি আলোকের ধারাস্নানে -
তত দেখি আমারই কায়ার ছায়া কৃষ্ণরূপ ধরি
পদতলে বসুন্ধরা বক্ষখানি আঁকড়িয়া ধরে।
তাই মাতা—তাই!

কুসুমিকা বলে—হাঁ৷ তাই—তাই!

মালবিকা বলে :

তাই মাতা মনে মনে কল্পনায় জেগে ওঠে
এক অচেনা জনের ছবি, মুখে যার আধো আলো
আধো ছায়া খেলা করে মেঘ রৌদ্র সম। বুকে যার
তটপ্রান্তে উল্লাসের আনন্দে তরঙ্গ ভাঙিয়া পড়ে
কল-উতরোলে—আর সুগভীর অন্তস্তলে
বেদনা কাঁদিয়া ফেরে বিষণ্ণ কল্লোলে।
যাহার দেহের ছায়া গাঢ় হয়ে আমারে [illegible]য়া
অবলুপ্ত করি দেয় কৃষ্ণসমুদ্রের তলদেশে—
স্বপ্ন ঘেরা প্রবাল পুরীতে।

কুসুমিকা বলে : তারই স্বপ্ন সাধনা তোমার কন্যা—নরশ্রেষ্ঠ

ব্রহ্মমিত্র সুতা। তাহারই তপস্যা কর। তাই আনিয়াছি
গৈরিক বসন। দীক্ষা সাথে দিনু এই বাস--
তপস্যা-সার্থক-করা তপস্যা তোমার।

কুসুমিকা গৈরিক বস্ত্র দিলে. মালবিকা সেখানি উত্তরীয়ের মত অঙ্গে জড়িয়ে মাকে প্রণাম করে বলে—করো আশীর্বাদ।

-আশীর্বাদ।

এমন ভাল কথাগুলি সে বলে গেল, কিন্তু জোর দিয়ে আবেগ দিয়ে বলতে পারলে না। সাজঘরে ফিরে এলে কেউ তাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে সংবর্ধনা করলে না। বাবুল বললে- ম্যাটারটা কি? একদম যে ড্যাম্প মেরে গেলে।

রীতুবাবু বললে—ঠিক আছে, পরের দিন থেকে জোর দিয়ে বল, গলা চড়িয়ে বল। লোককে শোনাতে এসেছ, শোনানোটা সব থেকে আগে। গলা চড়াও।

গোরাবাবু বললে বলার দিক থেকে তোমার ঠিক হয়েছে। ও পার্ট চ্যাঁচানোর পার্ট নয়। সে দিক থেকে ঠিকই হয়েছে। আর একটু লাইফ, লাইফ দিতে হবে। বুঝেছ?

অলকা চুপ করে বসে রইল আপনার জায়গায়। হাত পা ঘামছে।

কিন্তু অলকা ত আর পারলে না। সে যেন ভেঙে পড়ে গেল। এবং শেষ দৃশ্যটা মালবিকা এবং জয়ন্তের মিলন দৃশ্য সে দৃশ্যটায় গোটা বইখানা একেবারে যেন মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। গোরাবাবুকে লোকে খাতির করে, তবুও কে একজন চীৎকার করে উঠল—দূর।

গোরাবাবু চিন্তান্বিত মুখে ফিরে এল। অলকা গ্রীনরুমে কাঁদো কাঁদো হয়ে ঢুকে তার নিজের বাক্সের উপর বসে ঘাড় হেট করে বসে রইল, কে যেন বললে—চণ্ড! তার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। একটু দূরে চেয়ারে মঞ্জরীও মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

রীতুবাবু বললে - হল না কর্তা। শেষটাই একেবারে ভিজে নয়, ডুবে গেল!

নাটুবাবু বললে—হিরোইন বদলে দিন স্যার।

বাবুল বললে রাবিশ! আমিই রেসপনসিবল স্যার। কিন্তু এমন তো হয় না। পার্ট তো ভালই করে।

গোরাবাবু চুপ করে বসে রইল।

শোভা একটি কথা বললে না। রীতুবাবুর কাছে সেই ধমক খেয়ে অবধি সে চুপ করেই আছে। পার্ট কিন্তু ভালই করেছে।

হঠাৎ মঞ্জরী ডাকলে--গোপাল মামা!

ম্যানেজার গোপাল বাইরে বারান্দায় চুপচাপ পায়চারি করছিল বাস আসবার অপেক্ষায়। জিনিসপত্র সব তুলতে হবে। রাত্রি বারোটা বাজে। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে তিন ঘণ্টার জায়গায় সাড়ে চার ঘণ্টা লেগে গেছে। তার উপরে প্লেটার এমন অবস্থা হওয়ায় মন মেজাজ তার ভাল নেই। মঞ্জরীর ডাক শুনে সে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল। মঞ্জরী

বললে—শুনুন।

একটু সরে গিয়ে মঞ্জরী বসলে—কাকে পাওয়া যায় বলুন তো? ওসব নতুন-টতুন নয়, পুরনো—মানে ওতরানো অ্যাকট্রেস।

—দেখি। কুমারী নায়িকা যে! নইলে আর লোকের অভাব কি! এই তো এস্টারের হরিমতী রয়েছে, সন্ধ্যা রয়েছে—

গোরাবাবু এসে দাঁড়াল, বললে—কুমারসাহেব ডাকছেন, ওপরে উঠবেন, ডেকে পাঠিয়েছেন দেখা করে যাবেন।

মঞ্জরী উঠে দাঁড়াল। কথা পরে হবে। পশ্চিমদিকের বারান্দার কোলে ওদের ড্রইংরুম। মস্ত লম্বা হল, ভিতরে পুরনো আমলের মূল্যবান আসবাব, সে যেমন কাঠ তেমনি পালিশ, তেমনি ভারী, আর আকারেও তেমনি বিচিত্র। প্রকাণ্ড ঘরখানায় অন্তত পঞ্চাশ ষাটজন লোক বসে। তারই মধ্যে ঠিক মাঝখানে ওঁরা চারজন বসে আছেন—আছেন তিন ভাই আর খুড়ো কুমার জগদীশ সিংহ। সোনার মত দেহবর্ণ, তেমনি সৌম্য মিষ্ট চেহারা। বসে কথাবার্তা বলছিলেন, হাসছিলেন। গৌরাবাবু মঞ্জরী ঘরে ঢুকে নমস্কার করবার আগেই নমস্কার করে বললেন—এই যে আসুন। আপনাদের কথাই হচ্ছিল বেড়ে ওটা লিখেছেন মশায়—ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং সত্যং ঝঞ্ঝাটং জগতং ময়ং, ঘাটং মাঠং হাটং গৃহং ঝঞ্ঝাটং নাস্তি কুত্রো বা। ঝঞ্ঝাটং দিবসে রাত্রে শয়নে স্বপনে চাপি, মরণে মৃত্যুলোকে চ ঝঞ্ঝাটস্য দাপাদাপি। বেড়ে হয়েছে ওটা।

একজন বললে—লোকটি পার্টও করেছে খাসা। আরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন।

বড়কুমার বললেন—মঞ্জরী দেবীর পার্ট অপূর্ব হয়েছে। আপনার কথা বলব না, নিজে নাট্যকার।

কুমার জগদীশ বললেন—তবে মশায়, শেষটা ঠিক হল না।

গোরাবাবু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। শেষটা বড্ড মার খেয়ে গেল। ভাবছি আমরা।

মঞ্জরী মৃদুস্বরে বললে—হিরোইন ফেল করলে মার তো খাবেই।

—উঁহু। গোরাবাবু বললে—হিরোইন ফেল করেছে ঠিক কথা, কিন্তু—

বড়কুমার হেসে বললেন—হ্যাঁ, আরও কিন্তু আছে। সেইটে বলব বলেই ডেকেছি। মানে, বাস্তবে যাই ঘটে ঘটুক, নাটকের বাস্তব ও নয়। ব্যাপারটা ঘটেছে শুচির মত ধর্মপরায়ণা মেয়েকে ছেড়ে ওই নায়িকা যতই রোমান্টিক হোক, ওর সঙ্গে মিলনে মানুষের আপত্তি হবেই। অন্তত এদেশে হবে। শুচিকে শুধু দজ্জাল করুন, তা হলে নেবে। সূর্য সে গ্রীষ্মকালের হলেও সূর্য ডুবলেই রাত্রি হয়, সে পূর্ণিমা হলেও রাত্রি। রাত্রি মানুষের জন্যে নয়, ওটা তাদের চোখ বুজে থাকার কাল—ঘুমের সময়।

সকৌতুকে হেসে বললেন—পূর্ণিমার রাত্রেও ভূত বেড়ায়, লোকে দেখে মশাই। সেইজন্যে বলছি শুচিকে আগুন করুন, তা হলে চলবে।

একজন বললেন—তা হলে এ মেয়ে হবে তোমার জল না কি?

—উঁহু, তুলসীতলার প্রদীপ। বলেই বললেন—আর এক কাজ করতে পারেন। সুবিধে

আছে, পৌরাণিক নাটক। শেষ দৃশ্যে নারায়ণকে নিয়ে আসুন শুচির হাত ধরে। এসে বলুন ঝগড়াটা কিসের? শুচিও যে, মালবিকাও সে; দুইয়ে মিলে ওরা সম্পূর্ণ। ধর্মকামনা, পুণ্য আর জীবনকামনা প্রেম দুইয়ে মিলে তবে নারী সম্পূর্ণ। লক্ষ্মী আর রাধা। বুঝলেন না? মালবিকা শুচির সঙ্গে মিশে যাক। দেখবেন কি রকম নেয় লোকে। আমি রসিকতা করি নি, ভেবে দেখবেন।

এক ভাই বললেন—তুমি রসিকতা কর নি, কিন্তু মানুষের বোকামির সুযোগ নিয়ে ওটা একটা নিদারুণ রসিকতা। আপনার ড্রামা মশাই পৌরাণিক হলেও খুব মডার্ন। সাহস থাকে চালান, না থাকে ড্রপ করে দিন।

হঠাৎ সব যেন শক্ত হয়ে উঠল, সরসতাটুকু উবে গিয়ে সমস্যাটা সমস্যা নিয়ে আলোচনার আসর—সব গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকে সামনে দাঁড়াল।

বড়কুমার বললেন—আপনাদের কিছু সম্মানী আমি ম্যানেজারবাবুকে বলে দিয়েছি। আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি।

মঞ্জরী ওঁদের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। গোরাবাবু নমস্কার করে বেরিয়ে এল। বাইরে দরজার পাশে গোপাল, যোগাবাবু, বংশী, মণিবাবু অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল।

মঞ্জরী গোরাবাবুকে বললে—এগিয়ে এস একটু।

চলতে চলতে বললে—বই যেমন আছে তেমনি থাকবে। মালবিকা আমি করব। শুচির পার্টের লোক দেখ।

—তুমি করবে মালবিকা?

—হ্যাঁ, কিন্তু শুচির পার্ট তুমি করবে—

বলে সবিস্ময়ে গোরাবাবু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

বাধা দিয়ে মঞ্জরী বললে—কিন্তু মালবিকা তো আমি।

—তা হলে শুচিকে আগুনই করে দি।

—না। তার উপর অবিচার করবে কেন? সে তো সত্যিই ধর্মের জন্যে এতটা করেছে।

—সে যে ভুল ধর্ম।

—সত্য তাও তুমি বল নি এতে। যা আছে তাই থাকবে। তা ছাড়া এখন বই বদলালে বদনাম হয়ে যাবে। অন্য দল হাসবে। পার্ট বদল করে আর একদিন পুজোর আগে প্লে করে নাও। দলের কথা ভাব।

দশ

মঞ্জরী কথাটা ঠিক বলেছিল। কথাটা যাত্রাদলের পক্ষে খুব সত্য। শুধু যাত্রা কেন, থিয়েটার ফিল্ম সব তাতেই কথাটা খাটে। যে বই অভিনয়ের পর কাটতে হয়, বদলাতে হয়, তার একটা বদনাম হয়ে যায়। ফিল্মে যে বইয়ে সেন্সারের কাঁচি না ঠেকে তার একটা সুনাম

হয়। সেক্ষারে ছুঁতে পারে নি। যাত্রা থিয়েটারে বদল ছাটাই একটু-আধটু হয়ই, কিন্তু তার বেশী হলেই অন্য দল মুচকে হেসে বলে, ঠেলে সাজাতে হচ্ছে। কিন্তু তাতেই কি আর ধরে! এমন কি দলের সাধারণ আসামী বা অ্যাক্টরেরাও হতাশ হয়। তারাও নিজেদের মধ্যে ওই কথা বলাবলি করে। শুধু তাই নয়, যে কোন দলের, অবিশ্যি বড় দলের কোন নতুন নাটকের প্রথম অভিনয়-রাত্রে অন্য দলের লোক কিছু আসে, চুপিসাড়ে এসে দেখে যায়। তারা গিয়ে রিপোর্ট করে কেমন কি বৃত্তান্ত। পাকপাড়ার আসরে তিন চারটে বড় দলের চর এসেছিল, দেখে গেছে। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে রটিয়েছে অপ্সরা কন্যা নয় ধপ করে পড়া কন্যা—শেষ সিনটা চমৎকার, তালগাছের মাথা থেকে কন্যে ধপ করে মাটিতে পড়ে ঘাড় ভেঙেছে।

কথাটা এসে বললে গোপাল ম্যানেজার। বললে—যোগামাস্টার শা কোম্পানির দলের ছোকরা গাইয়ে দেবু ঘোষের সঙ্গে বিশ্রী কাণ্ড করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত মারতে গিয়েছিল। দেবু ঠেলে দিয়েছে, যোগামাস্টার পড়ে গিয়ে হাঁটুর চামড়া তুলেছে। আমি বকলাম ওকে। তা সেই ভাঙা পা নিয়েই তড়পাচ্ছে।

কাগজ পড়ছিল গোরাবাবু। যুদ্ধের খবরই সব। আজকের খবর ইউরোপে জার্মানী হারছে। সে বাঁচবার জন্য লণ্ডনে ইংলণ্ডে বোমা বর্ষণ করছে। জেনারেল রোমেলের কোন খবর নেই। মন খারাপ হয়ে গেছে গোরাবাবুর। রাজনীতির ধার খুব ধারে গোরাবাবু। তবে শতকরা সত্তর ভাগ এ দেশের লোকের মত ইংরেজ হেরে যাক এটা চায়। সেইজন্যে জার্মানী হারলে তার মন খারাপ হয়। এর উপর পূর্বসীমান্তে নেতাজীর আবির্ভাব, আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরীর সংবাদে মনটা আরও অক্ষশক্তির পক্ষে হয়েছে। ইউরোপে রাশিয়াতে জার্মানীর বিপর্যয় ঘটেছে। প্রচণ্ড লড়াই করছে রাশিয়ানরা। জার্মানী হটছে। রোমেল গোরাবাবুর প্রিয় জেনারেল,—রীতুবাবু বলে বাঘের বাচ্চা একটা। রোমেলের খবর নেই। সেখানেও কিছুদিন থেকে এরা জিতছে।

পাতাটা উলটে দিল। দ্বিতীয় তৃতীয় পাতায় বিজ্ঞাপন আর সভাসমিতি, আইন আদালত। আইন আদালতে একবার চোখ বুলোলে। সেখানেও এমন কিছু নেই। পকেটমারের কারাদণ্ড। ব্যাঙ্ক প্রতারণা, ভুয়া চেকে টাকা তুলিতে গিয়া হাতেনাতে ধৃত--

চারের পাঁচের পৃষ্ঠায় দেশের খবর। খবর মানে দেশের দুঃখ—অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, মহামারীর প্রাদুর্ভাব। বাড়ির দরজায় চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলের চার পাঁচটি তো বাসা গেড়ে রয়েছে। ফুটপাথেই শুয়ে থাকে। আর খবর জেলে বন্দী নেতাদের। জিন্না সাহেব বম্বেতে বসে চেঁচাচ্ছে। বাংলা দেশে নাজীমুদ্দিন সুরাবর্দী ফজলুল হক।

মঞ্জরী বললে—গোপালমামা কি বলছেন শুনেছ?

—গোপালবাবু কখন এলেন?

—এই তো একটু আগে, তোমার সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেলেন। তুমি কাগজে মুখ ঢেকে কাগজ পড়ছিলে। কিছু না বলেই আমার কাছে চলে গেছেন।

—ও! আমি পায়ের শব্দ শুনেছি, ভেবেছি শিউনা। কি বলছেন?

শিউনন্দনকে কখনও কখনও 'শিউনা' বলে থাকে গোরাবাবু। ওটা মঞ্জরীর খুব ছেলেবেলার দেওয়া নাম। গোটাটা বের হত না, মুখে বলত 'শিউনা'।

মঞ্জরী বললে—শোন না নিজের কানে। কাগজটা রাখো। কাগজে তো সব আছে যুদ্ধ যুদ্ধ। তাও যদি হার জিত একটা কিছু হত।

হেসে গোরাবাবু বললে—এ কি যাত্রার দল যে পাঁচ মিনিট তলোয়ার ঘুরিয়েই একজন পড়ে গেল আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল! তবে মনে হচ্ছে এবার একটা ধারে এসে পৌঁছবে।

—বাবাঃ, বাঁচি তাহলে। এই ব্ল্যাক-আউট থেকে রেহাই পাই। বলেই ডাকলে—গোপাল মামা!।

গোপাল এসে দাঁড়াল। এবং সরাসরিই বলে ফেললে—বই পালটানো-টালটানো হবে ন বাবু। না। তাহলে মান সম্মান আর কিছু থাকবে না।

-কি হল?

যা ঘটেছিল বলে গোপাল বললে -যোগাবাবুর হাঁটু এক রাত্রে ফুলে লা—ল হয়ে উঠেছে। আমাদের ছোঁড়ারা বলছে, দেবু ঘোষকে ঠেঙাবে। ও আমাদের আপিসের পিছনের খোলার ঘরে আসে যায়। কালই দিত, তা বীতু মাস্টারমশাই মানা করলেন।

—কি করলাম আমি! আমাব নাম হচ্ছে যে!

সি ড়িতে মাস্টারমশাইয়েব কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কিন্তু পায়ের শব্দে যেন আরও লোক আছে বলে মনে হল। গোরাবাবু ডাকলে—আসুন মাস্টারমশাই।

মঞ্জরী একটু ঘোমটা টেনে দিলে মাথায়। গোপাল হেসে সিঁড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল অপেক্ষা করে। মাস্টারমশাইয়ের পিছনে বাবুল বোস। গোপাল ঘোষ তাব বুক পর্যন্ত, তাকে দেখা যাওয়ামাত্র বললে—কালকের সেই কাণ্ড বলছি মাস্টারমশাই।

রীতুবাবু হেসে বললে—ছোঁড়ারা আমার উপর চটেছে। কথাটা ঠিক বুঝলে না আমার। বুঝলেন না দেবতা, মানুষেরই রসজ্ঞান কমে গেছে। বললাম, অন্য কোথাও মারিস বাবা বরং যুদ্ধ করে মারিস। এ অবস্থায় মারা বারণ— মহর্ষি বাল্মীকি বারণ করে গেছেন। সেটা তো একটা পাখী।

গোরাবাবু হেসে উঠল। মঞ্জরী মুচকে হেসে মুখ ফেরালে। বাবুল বোস—বাবুল বললে—বাট, হোয়াট জটেবুড়োর নী-খানা একেবারে লক্ষ্ণৌর মেলন—মানে খরমুজা হয়ে উঠেছে মাই লর্ড। মনে হচ্ছে রাইপ করবে। গায়ে ফিবার। কলকাতার রাস্তায় পড়েছে। একটা ব্যবস্থা করুন। বিগ ব্রাদার কি একটা মলম বাতলে এলেন।

রীতুবাবু বললে—নতুন যাত্রার দলে ঢুকছেং কামন্দকং সবুরং কুরু। ক্রমে বুঝবে। মানুষের মধ্যে যাত্রাদলের আসামী আর জলের জীবের মধ্যে কইমাছ, গাছের মধ্যে মুথো-ঘাসের মরণ সহজে হয় না। ব্যবস্থা ঠিক করেছি আমি, গরম জলে কার্বলিক সাবান দিয়ে ধুয়ে হারান কোবরেজের ক্ষতারি মলম লাগিয়ে দিয়েছি, ওতে আমার পায়ের এমনি ফোলা সেরেছিল, এই তো বছর খানেক আগে। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, সে বলে সেলুলাইটিস। হারান কোবরেজ বন্ধু, গেলাম তার কাছে। কোবরেজ, কি করি বল তো!, মলম এক

কৌটো দিয়ে বললে—সেলুলাইটিস তো সেলুলাইটিস, সব টিস্ টিস্ সেরে যাবে। স্রেফ চাব্বিশ ঘণ্টা! বারো ঘণ্টাতেই বুঝতে পেরেছিলাম কমছে। তিন দিনের দিন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে স্ট্র্যাপ-বাঁধা চটি পরেছি। তা ছাড়া যোগা শক্ত আছে। গেলাম, তো দেখি ফোলা হাটুর উপর হাত বুলোচ্ছে, আর গাইছে—হায় রে, ভ্রমে অন্ধ দু নয়ন, রাঙা দেখেই ভাবলি অধর, নারলি চিনতে শ্রীচরণ! মানে জরা ব্যাধের গান।

—সেটা আবার কেটা বিগ ব্রাদার? হু ইজ দ্যাট জরা ব্যাটা?

—সে অনেক বিত্তান্ত ঠাকুর। সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের বোনপো বউয়ের বোনঝি জামাই।

গোরাবাবু হেসে বললে—সে বোঝাতে তোমাকে রামায়ণ থেকে মহাভারত পর্যন্ত পড়তে হবে দিলদার। ওটা ভিনসেণ্ট স্মিথের ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রিতে নেই। যাত্রাদলে থাকতে থাকতেই জানবে।

মঞ্জরী বাধা দিয়ে বললে—ওসব কথা থাক এখন। যোগাবাবুর বাড়াবাড়ি হলে কাল পর্যন্ত না কমলে ডাক্তার দেখাব। কিন্তু কথাটা চাপা পড়ে গেল। এরপর মঞ্জরী বললে—বইয়ের কথাটা। মাস্টারমশাই, উনি সেই কুমার বিমল সিংহের কথা ধরে আছেন। বই পালটাবেন। শুচি আর মালবিকাকে মিলিয়ে এক করে দেবেন ভাবছেন।

—উঁ-হু। উঁ-হু! উঁ-হু! বড্ড দুর্নাম হয়ে যাবে। ও পালা আর শুনতেই চাইবে না লোকে, জোর করে শোনাতে গেলে জমবে না যদি পালটান। লোকে জমতে দেবে না।

গোরাবাবু চুপ করে ভাবছে। মনে মনে ছবি আঁকছে। মঞ্জরী বললে—আমি সেদিন থেকেই বলছি। আজও বলছি। বই যেমন আছে থাক। আমি মালবিকার পার্ট করব। শুচির পার্টের লোক দেখুন। ও পাওয়া যাবে।

গোরাবাবু তবুও চুপ করে রইল। রাতুবাবু বললে—দাঁড়ান, ভাবি। মনে একবার আপনাকে মালবিকা সাজিয়ে দেখি।

—মেক-আপে ঠিক হবে মাস্টারমশাই। তা ছাড়া—

—হ্যাঁ, পার্ট তোমার। কথাটা বলেছ সত্যাই। কিন্তু ভাবছ না সে কাল থেকে আজ কত বছর কেটে গেছে। ভারী হয়েছ, মাথায় বেড়েছ।

—তা হলে বইটাই বন্ধ কর।

গোরাবাবু হঠাৎ বললে—হ্যাঁ, তাই হবে। হয়েছে। তুমিই কর মালবিকার পার্ট। শুধু নাচ যা আছে সেটা তুমি নাচবে না। বুঝেছেন মাস্টারমশাই, মালবিকার ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্সেই নাচ আছে তো?

—হ্যাঁ, আরতি-নৃত্য।

—হ্যাঁ। মঞ্জরী হাতে বা মাথায় আরতির প্রদীপজ্বালা থালা নিয়ে এসে দাঁড়াবে। সখী ওর চারপাশে নাচবে। নাচ শেষ হলেই সে চলে যাবে, মালবিকার পার্ট শুরু হবে।

—তা হলেও লোকে বলবে।

—বলুক তাতে ক্ষতি হবে না। কিন্তু—

থেমে গেল গোরাবাবু।

--কি কিন্তু শুনি? মঞ্জরী বললে।

নাচলে পার্টে তুমি দাঁড়াতে পারবে না। এবং নাচটা তো দরকার নেই। ওটা অলকা ভাল নাচে বলেই দেওয় হয়েছে।

দৃঢ়স্বরে মঞ্জরী বললে—তা হলে নাচ বাদ দাও। আমি দাঁড়িয়ে আরতি করে থালা নামিয়ে রেখে প্রণাম করব, তারপর গান। না, তাও বাদ দেবে?

—অন্যায় বলছ, গান তা হলে বাড়িয়ে দেব মালবিকার। কিন্তু—

—আবার কিন্তু কি?

—বাবুলবাবু আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।

—বুঝলাম না।

—অলকাকে জবাব দেবে?

--ভেবে দেখতে হবে।

—কিন্তু সেটা অন্যায় হবে।

—অন্যায় হবে? মঞ্জরী গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

গোরাবাবু বললে—হবে অন্ততঃ আমার মন তাই বলে। মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা কর। কি মাস্টারমশাই?

তার আগেই মঞ্জরী বললে—তুমি বলছ, তার ওপর কথা থাকতে পারে না। থাকবে ও। নাচ গানের পার্ট তো রয়েছে। জনাতে মোহিনী মায়া। সতী তুলসীতেও কৃষ্ণের পার্ট, রিহারস্থালে ভাল করেছে। আর মানাবে খুব ভাল। মুখে কেমন একটু পুরুষালি ভাব আছে। ও থাকবে যেমন আছে। এতেও নাচ দেব বলছ, তা না হয় দাও। কি মাস্টারমশাই?

রীতুবাবু বললে—খাঁটি প্রোপ্রাইট্রেসের মত কথা। বাস্ বাস্, ও থাকবে।

বাবুল বলে উঠল—গড সেভ দি প্রোপ্রাইট্রেস। সত্যি বলতে আমি বেশ চিন্তিতং ছিলাম।

রীতুবাবু বললে—কিন্তু একটা কাজ করবেন। এই দীনদরিদ্রের কথাটা শুনবেন। শুচির পার্টটা আরও কড়া কাঠ কাঠ করে দিন। আর মালবিকার সম্বন্ধে ওই যে ওর মায়ের কথা রয়েছে একাধারে কলালক্ষ্মী-তপস্বিনী সরস্বতী দেবীকে অর্চনা করি পেয়েছিনু তোরে, ওটাকে আরও একটু ফুটিয়ে দিন।

—শুচির পার্ট কড়া করে দেব?

মুখ মচকে একটু হেসে মঞ্জরী বললে—পার্টটার উপর মায়া আছে তোমার, না? কিন্তু আসলে তো কড়া কাঠ কাঠ হওয়াই উচিত ছিল। ছিল না, বল বুকে হাত দিয়ে?

শিউনন্দন তরিবত করে ডিম পাঁউরুটি চা এনে নামিয়ে দিল।

রীতুবাবু বললে—একটু আদার রস দিতে পারিস শিউনা?

—হাঁ। লিয়ে আসি।

মঞ্জরী বললে—ওটা খান আপনি। নতুন চা আদা দিয়ে করে আন শিউনা।

—হোয়াই নট উইথ তেজপাতা বিগ ব্রাদার ?

—উঁহু, সে পাঁচন হয়ে যাবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিল রীতুবাবু।

-কি ভাবছ বল তো ? মঞ্জরী গোরাবাবুকে বললে।

গোরাবাবু সত্যিই ভাবছে। খাবার, চায়ের কাপ এসব দিকে দৃষ্টিও ফেরায় নি। এতগুলো কথা হয়ে গেল তাতেও তাকায় নি। মঞ্জরীর সেটা চোখ এড়ায় নি।

গোরাবাবু বললে—হ্যাঁ ভাবছি।

--কি, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

আমি বলব দয়াময় ?

একটু হাসল. সে হাসিও চিন্তাকুল। বললে--আমিই বলছি। ভাবছি অবিচার হচ্ছে বোধ হয়।

—কিসের অবিচার ? মঞ্জরী প্রশ্ন করলেন।

-অবিচার হচ্ছে.এই যে, শুচির পার্ট কড়া করব, মালবিকাকে সরস্বতীর অংশ বলব, তাহলে একবার অলকাকে চান্স দেওয়া উচিত না ? এতে তো ও-ও দাঁড়াতে পারে।

দৃঢ়কণ্ঠে মঞ্জরী বললে---না, পারে না।

—সেটা তো অনুমান।

—নো মাই লর্ড, অনুমান নয়। প্রোপ্রাইট্রেস রাইট। অলি শাস্ত সিরিয়াস পার্ট পারবে না। আমাকে কাল বলেছে। কাল আমার ওখানে এসে হাজির। ক্রাই-ক্রাই মুখ। বলে, এ পার্ট আমার হবে না বাবুদা। আমার দ্বারা ওণ্ট ডু। আর আমিও দেখেছি, নাচ, অল্প গান, নষ্টিনষ্টি, মানে—চঞ্চলা ফঞ্চলা হলে ও একসেলেণ্ট। তারপর বলে, আমাকে কি ছাড়িয়ে দেবে ? ওর হোমলাইফ টেরিবল হয়েছে। ফাদার মাদার দুইয়ে মিলে চুষে খাচ্ছে, খেতে চায়। ফাদার তো এখন হাফ ম্যাড। কাল বলেছে, টাকা চাই। যেখান থেকে যেমন করে হোক আনতে হবে। কি একটা সার্টিফিকেট আছে—একশো টাকার। কাল টাকা দিতে হবে। একবার দু টাকা ব্রাইবিং করে ব্যাক কিক্ করে দিয়েছিল, আদালতে মিসেস অ্যাণ্ড মিস দরখাস্ত করেছিল অন অস্থাবরস তাদের। কর্তা ইনসলভেন্সী ফাইল করবেন বাট পাওনাদার ভেরী হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন পাওনাদার—সে বডিওয়ারেণ্ট বের করেছে। খবরটা পেয়ে গেছেন। কোথাও যে ফ্লাই করে লুকোবেন তার জায়গা নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন সে ক্ষমতাও নেই। এখন অ্যাসেট হল ডটার। আন তুমি মানি, হোয়ার টু গেট সে আমরা কি জানি। মাদার কাল চুলের মুঠো ধরে লেডী দুঃশাসনের পার্ট করেছে। দ্রৌপদী না হলে এখন আর উপায় কি। টাকাটা আমি দিয়েছি, কিন্তু ও আর ও বাড়িতে থাকবে না। এখন চাকরিটা গেলে শুধু জাম্পিং ছাড়া পথ নেই—হয় মাদার গ্যাজেসে নয় সামবডিস স্কন্ধোপরি।

—তুমি অ্যাফ্রেড না কি ? রীতুবাবু বললে।

—তা লিটল্ লিটল্ আফ্রেড হচ্ছে বইকি !

মঞ্জরী বললে—আপনি ওকে বিয়ে করে ফেলুন বাবুলবাবু।

—বিয়ে! ও মাই লর্ড, হে মাই ঈশ্বর! অয় মাই খোদা! ও প্যাচে আমি নেই ম্যাডাম।

—কিন্তু ও তো তোমাকে ছাড়বে না লিটল্ ব্রাদার। এবং তুমিও তো—

—দেয়ার ইজ দি বিপদ বিগ ব্রাদার। মেয়েটার প্রতি আমার অ্যাফেক্‌শন্ আছে।

গোরাবাবু উঠে ভেতরে গিয়ে মঞ্জরীকে ডাকলে—শোন।

কিছুক্ষণ পর দুজনেই বেরিয়ে এল এবং মঞ্জরী দুশো টাকা বাবুলের হাতে দিয়ে বললে—আপনি একশো টাকা যেটা অলকাকে দিয়েছেন সেটা নেবেন। আর একশো টাকা ওকে দেবেন। বলবেন, কোথাও একটা আস্তানা দেখে নিতে।

রীতুবাবু বললে সাবালিকা তো? আঠারো পার হয়েছে? না হলে বাপ নাবালিকা বলে হাঙ্গামা বাধাবে।

গোরাবাবু বললে—সব থেকে ভাল হয় ওর যদি একটা মেকী বিয়েও দিয়ে দাও। মেয়েটার দোষ অনেক হয়েছে কিন্তু তার সবটার জন্য ও দায়ী নয়। কিন্তু গুণও অনেক আছে। পার্ট ও করবে ভাল ভবিষ্যতে। একধরনের পার্ট। নাচে ভাল। গলা মাজলে ভাল হবে। দাও না ভাই দিলদার ওকে একটা চান্স। তোমাদের দুজনের সঙ্গে আমরা তিন বছরের কণ্ট্রাক্ট করে নিচ্ছি।

বাবুল বললে—জাঁহাপনা, এর অ্যানসার তো দিলদারের কোশ্চেনের মধ্যে আছে। লেজ যদি কুকুরকে চালাতো তবে কুকুরের কি হতো? মাই লর্ড, সে সমস্যার সমাধানের জন্যে ওস্তাইনেস কুকুরের লেজটা কেটেই ফেলেছেন। আই অ্যাম এ লেজকাটা জীব মাই লর্ড, লেজ জুড়ে প্যাসাদ আমার সইবে না। তার থেকে ওয়ান থিং করুন না। অলিই বলছিল। বলছিল, ওঁদের মানস আপনাদের বলে কয়ে ওঁদের বাড়িতে একটু থাকবার জায়গা করে দিন, আমি পুলিসকে বলে-টলে ওখানে গিয়ে উঠব। তারপর যা হয় করব। মানে একেবারে মরিয়া।

মঞ্জরী বলে উঠল—পাগল নাকি! ও হয় না। না, সে হবে না।

রীতুবাবু এবার বললে—খাওয়া শেষ করে একটা পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললে—বেদ্দাও মহেন্দর—ও সব কথা বেদ্দাও। যত সব বাজে কথা। ছেড়ে দিন। ও মেয়ে আপনার প্রবলেম আপনি সলভ্ করবে। 'হৃদবক্ষে জলরাশি যথা বাঁধ ভেঙে নামে সমতলে।'

গোরাবাবু বলে উঠল:

> "সব ক্ষেত্রে সত্য নয় দেব, ব্রহ্মপুত্রে মুক্তি দিতে
> পরশুরামের ভীম কুঠারেরও হয় প্রয়োজন।
> ব্রহ্মকমণ্ডলে বন্দিনী গঙ্গার মুক্তি
> ভগীরথ তপস্যার অপেক্ষায় থাকে।"

মঞ্জরী মাথায় অকারণে কাপড় টেনে নিয়ে বললে—রুক্মিণীহরণ পালা গাইতে শুরু করলে যে। ও সব রাখ, রেখে এখন আসল কথা ভাব। আর তো দেরি করবার সময় নেই, ভাদ্র মাস

শেষ। ১০ই আশ্বিন পুজো। অষ্টমীর রাত্রে গাওনা শুরু। নতুন বই ধরবার সময় নেই। ধরলেও মহা দুর্নাম। এই বেশী কাটাকুটিতেও তাই। কাটাকুটি, তার রিহারস্যাল, সেটা কি দাঁড়াল দেখা—এসব হাঙ্গামা তো আছে। তা ছাড়া অন্য দলে দুর্নাম রটাবে—ওই বই বেজমাট, বাজে।

—প্রোপ্রাইট্রেস ঠিক বলেছেন মাই লর্ড। কি বিগ ব্রাদার?

—আমি তো আগেই বলেছি।

গোরাবাবু বললে—বেশ, যা বলেছেন তাই মানলাম। বই আমি আজই যে সংশোধন করা দরকার করে দিচ্ছি। ভাল, বলুন—এক নম্বর শুচির পার্ট একটু কড়া করতে হবে?

—হ্যাঁ।

—কতটা?

মঞ্জরী বললে—ওই ধর প্রথম সিনে সব শেষে যেখানে ব্রহ্মমিত্র সীমান্তে যুদ্ধে যাবার সময় বলছে, বল শুচি, আমার অন্তর চিত্তশুদ্ধির আগে এই যুদ্ধেই যদি মরি তা হলেও তুই কি আমাকে স্পর্শ করবি নে আমি অশুচি বলে? শুচি বলছে, তা হলে পিতা তোমার শীতল হিম ললাটের উপর আমার ললাটখানি রেখে আমার অশ্রুজলে তোমার সব গ্লানি ধুয়ে দেব।

—ওটা কাটব?

—কাটবে।

গোরাবাবু চুপ করে ভাবতে লাগল।

—মায়া হচ্ছে? কিন্তু ওটা তো সত্যি নয়। যা সত্যি তাই লিখতে বলছি। এটা আমি শুচির পার্ট করব বলে তুমি জুড়েছিলে। নিজে মুখে বলেছ আমাকে।

—বেশ তাই হল। তারপর?

—তারপর জয়ন্তকুমারের সঙ্গে বিচ্ছেদের সিনটা।

—ওটাতে কি কাটতে বল?

—পড়।

—মুখেই বল না।

—তা হলে মুখে বলতেই বা হবে কেন? নিজেই মনে করে সত্যি যা তাই লেখ। কাটতে হবে না। ওখানে শুচি বলছে:

গন্ধর্ব-কন্যার মোহ কলঙ্কিত অঞ্জনের মত
গাঢ় কৃষ্ণ রেখাঙ্কনে অঙ্কিত নয়নে তব।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমা ব্রাহ্মণ তনয়!
অস্বীকার করিতে কি পার? যাও নাই তাহার
ভবনে?

গোরাবাবু বললে—জয়ন্ত বলছে, গিয়েছিলাম। অস্বীকার করব কেন? তোমার পিতার অনুরোধেই গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ। শুচির উত্তর—তাতে তোমার ধর্ম পবিত্রতা রক্ষা হয় নি! তুমি সে গৃহে পদার্পণ

করেছ, সেখানে বসেছ, তাদের স্পর্শ করে দেহ অপবিত্র হয়েছে, শুধু দেহ নয়, রূপে মুগ্ধ হয়ে অন্তরে মনে চিত্তে অপবিত্র হয়েছ !

জয়ন্তের উত্তর—না। তারপর বল কি আছে ?

গোরাবাবু বললে :

না, ভুল ভুল, ওই শাস্ত্রবিধি ভুল, দর্পিত মনের সৃষ্টি,
এ সংসারে এ সৃষ্টিতে বিধাতার সমদৃষ্টি রৌদ্রালোক সম।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ রাজকন্যা ভিখারিণী শিরে রবে সমান দীপ্তিতে
সমান উত্তাপস্নেহে।
চণ্ডাল চণ্ডাল নয় জন্মের বিপাকে। এ ভেদ সমাজসৃষ্ট।
সত্য তত্ত্ব—ব্রাহ্মণও চণ্ডাল হয় আপনার কর্মের কলুষে !
গন্ধর্বের এই কন্যা দেহোপজীবিনী নয়,
স্বর্গদেবতার মনস্তুষ্টিবৃত্তি দূরে তুচ্ছ করি,
প্রসাদ উপেক্ষা করি
সন্ন্যাসিনী সম তপস্বিনী ! রাজকন্যা ব্রাহ্মণতনয়া সে।
তবুও সে নহে তাহা সমাজের বিভ্রান্ত বিধানে।
শোন শুচি, পবিত্র সে তোমারই মতন,
কিন্তু তোমা চেয়ে শ্রেষ্ঠা সে যে নারীহৃদয়ের
কোমলতা স্নেহ প্রেম সব ধর্মগুণে।

গোরাবাবুই বলে গেল। শুচি বলছে বাধা দিয়ে :

স্তব্ধ হও। স্তব্ধ হও, কামার্ত পুরুষ।
রূপে মোহে ভ্রান্ত তুমি।
শোন মোর কথা। আমি নহি দেহাভিলাষিণী
নারী মানব-লোলুপা। লক্ষ্মী-অংশে
জন্ম মোর। কামার্ত প্রেমার্ত হয়ে বরণ করি নি
আমি তোমারে কখনও। আমি নারায়ণ
অভিলাষিণী সাধিকা, ধর্ম সাক্ষী করি
তোমারে বরণ করি চেয়েছিনু তোমার মাঝারে
নারায়ণে টানিয়া আনিতে। সে সাধনা
নিষ্ফল করিয়া দিলে। আজি হতে
তব সাথে সম্পর্ক আমার আজি এইক্ষণে
ছিন্ন করি দিনু। চলে যাও সম্মুখ হইতে,
চলে যাও দেবভূমি রাজ্য হতে। চলে যাও,
চলে যাও।

মঞ্জরী এবার বললে—শুচি বলে উঠুক এবার এইখানে এর সঙ্গে জুড়ে দাও, তুমি আমার

বাবার অন্নদাস, আজ আমার অন্নদাস। যে অন্নদাস তার মুখে এত বড় কথা সাজে না। সত্যের বাইরে যেতে বলছি নে আমি। মানে যা সত্যি তাই লেখ। দেখ ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো আর শুচির পার্ট করছি নে। মায়াই বা ত' হলে কিসের বল।

গোরাবাবু ডাকলে—শিউনা ?

—যাই।

—বইয়ের খাতা কলম কাগজ আর বোতল গ্লাস নিয়ে আয়। আসুন মাস্টারমশাই, ধরুন।

সিগারেটের বাক্সটা খুলে ধরলে—দিলদার।

ওরা সিগারেট নিল। নীতুবাবু বললে—আপনি কাজ করুন তা হলে। এখন উঠি।

—হ্যাঁ। কিন্তু বোতলটা আসছে, একটু করে নিয়ে যান।

মঞ্জরী বললে—তার আগে আর একটা কথা শেষ করে নাও। শুচির পার্টের জন্যে বুঁচিদি কেমন হবে ? বুঁচিদির সঙ্গে শিউনার দেখা হয়েছিল। শিউনা গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছিল, বুঁচিদি ডেকেছিল, শিউনা শোন্। মঞ্জরীর দলে নাকি লোক নেবে রে ? মঞ্জরী যে পার্ট করেছে সেই পার্ট ? খুব তেজী মেয়ের পার্ট। শিউনা বলেছে, ঠিক তো হয় নি, তবে বাত হচ্ছিল। বুঁচিদি বলেছে, বলিস রে আমার কথা। আমি বসে আছি অনেক দিন। থিয়েটারে তো এখন আবার গেরস্ত হাফ-গেরস্ত এসে ভিড় জমিয়েছে। দাসীতে আর থিয়েটার চলছে না, দেবী চাই। বলিস। বুঝলি ?

গোরাবাবু তাকিয়েছিল গেলাসের দিকে, শিউনন্দন তিনটে গেলাস টেবিলের উপর রেখে মদ ঢালছিল, কিন্তু ঠিক মদ ঢালা যেন দেখছিল না, সম্ভবতঃ লেখার চিন্তাতে মগ্ন ছিল। সে উত্তর দিল না। মঞ্জরী বললে—চুপ করে রইলে যে ? মাস্টারমশাই কি বলছেন ?

গোরাবাবু অকারণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হুঁ। তা—

একটু চুপ করে থেকে বললে—বুঁচির বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। নইলে অ্যাকট্রেস তো ভাল।

—নিয়ে নিন। গ্লাস তুলে নিয়ে নীতুবাবু বললে—নিয়ে নিন। এ পার্ট ভাল করবে। খাপ্‌চো মুখ ওর মানাবে মশাই। মেয়েটার আশ্চর্য চেহারা। যত আকর্ষণ তত বিকর্ষণ। সাজলে বেশ লাগে, অথচ ওই খাপ্‌চে মানে থুতনিটা সামনের দিকে ঠেলে থাকায় মনে হয় বড় নিষ্ঠুর। বয়স হয়েছে, ভাল পেন্ট করলে ঠিক বিশ বছর চুরি করে মেরে দেবে। ওঃ, ওর খাটী যৌবনে সখীর দলের নাচের ঠমক তো দেখেন নি। ওরে বাপরে, শীলদের এক শৌখিন ছোকরা—

মঞ্জরী বললে—ওঃ, শেষ বুঁচিদিকে জুতো দিয়ে পিটেছিল। তারপর ছেড়ে দিয়েছিল। বড় বদমেজাজী ছিল শীলদের ছেলেটা। মরলও তেমনি।

বাধা দিয়ে গোরাবাবু বললে—তাই মরে। থাক ওসব কথা। নাও তাই, বুঁচিকেই নাও। বিলিতী ভাল পেন্ট আনলেই হবে। গোপালমামা চলে যান আপনি বুঁচির কাছে। কত মাইনে বলবেন ? অলকার সমানই বলবেন। কি বল ?

—সে কি! তাই হয়? বেণী দিতে হবে? কত বড় অ্যাকট্রেস ছিল!

—তাই। আচ্ছা মাস্টারমশাই, আমি বসলাম। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—। লেখা শেষ করে উঠব। আর গোপালবাবু, মানিকতলার কারখানার বিশ্বকর্মা পুজোর বায়নাটা নিন। বলে আসুন ওদের ওখানে আমরা প্রথম গান করে দল খুলেছি, ওরা যা দেবে তাই নেব। ওই আসরেই গন্ধর্বকন্যার টেস্ট হয়ে যাক। বুঁচি পাঁচ দিনে ও পার্ট ঠিক করে নেবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আরতি নৃত্যটা তা হলে অলকার থাকছে? কথা দু-চারটে দেব না কি?

-তা হলে কিন্তু সিক্‌ল্ সিক্‌ল্ কথা—মানে কাস্তের মত বেঁকা করকরে কথা দেবেন। জোক, হিউমার, হিট করে কথা—একটু হেলে দুলে—। যাঃ ফাদার, ওয়ান গ্লাসে লেগে লেগ আটকে যাচ্ছে!

নিজেই হেলতে দুলতে গিয়েছিল বাবুল, পায়ে পায়ে ঠেকে গেছে। খানিকটা অতি চঞ্চলতার জন্যে, খানিকটা মদের প্রভাবও বটে বইকি।

গোরাবাবু বললে—তাহলে সময়ে গৃহে গচ্ছ। এবং ট্রাম থেকে নেমে রিক্‌শা করে নিও।

দলের হেড চাকর বিপিন এসে দাড়াল। বললে—বায়না করতে লোক এসেছে।

রীতুবাবু ডাকলে—গোপাল।

উত্তর পেলে না। রীতুবাবু ডাকলে—শিউনন্দন!

—বাবু!

গোপাল কোথায়? ছাদে উঠেছে?

—হাঁ। হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ। 'ম্যানিজারবাবু' বলে সে হাঁকলে। পরমুহূর্তেই বললে—এই নেমে এসিছে। যাও, বায়না নিয়ে লোক এসিছে।

গোপাল সিঁড়িতে দাড়িয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে চাপা দম ছাড়লে হুস করে, অল্প খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে গেল। গোপালও ছাদে নেশা করতে গিয়েছিল। ওর নেশা গাঁজা। গাঁজা কলকেতেও খায় আবার বিড়ির তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে বিড়ি পাকিয়েও খায়। গোপাল দ্রুত নেমে এসে বারান্দায় এদের আসরে আর দাড়াল না, সরাসরি বিপিনকেই বললে—চল্। কোথাকার লোক? বসিয়েছিস, চা-টা খাইয়েছিস তো? চল্।

বিপিনের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে নামতে লাগল। গোরাবাবু বললে—আড়াই শো রাত্রি, তার কমে রাজী হবেন না। আর -

যদি যাওয়া-আসার পথে পড়ে?

—ওই বিশ-পঁচিশ কম। আর বুঁচির কথা বলেছি, শুনেছেন না? ছাদে ছিলেন। মাইনের কথা এখানে এলেই হবে। আজই সন্ধ্যেতে আনবেন। এখানে।

ঘাড় নেড়ে জানালে গোপাল—হ্যাঁ।

নীচে নামছে, রীতুবাবু ডাকলে—দাড়াও ম্যানেজার, দাড়াও। আমরাও যাব।

গোপাল ফুটপাথে বেরিয়ে একটা বিড়ি ধরালে। কোন সময় কোন তান, গাঁজার শেষ টানটা সব থেকে মৌজের, সেটাই সে নিতে পায় নি।

রীতুবাবু বাবুল সিঁড়ি ভেঙে নেমে দরজার মুখে আসতেই নীচের তলার ঘর থেকে শোভার

গলা শোনা গেল। সেই পাকপাড়ার বাড়িতে অভিনয়ের রাত্রে রীতুবাবুর ধমক খেয়ে অবধি সে গুম হয়ে আছে। রীতুবাবুর সঙ্গে কথা বলে না। সে ঘরের ভিতর থেকে বলছিল—সিঁড়িটা কাঁপছে মা চলনের দমদমানিতে! বলে যে সেই অতি বাড বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে! এত বাড! বাড়ি কাঁপিয়ে চলা! বুকের ছাতি ফুলিয়ে! বাপ্‌!

বাবুল বললে—বিগ ব্রাদার!

—শোন ব্রাদার, তুমি শোন। মা কুরু গর্বং! শুধু তোমার পিছনে অলকাই লাগে না। আমার প্রেমেও পডবার নায়িকা আছে। আবার এই দেখ শ্রীমতী বুঁচি আসছেন—

—তিনিও—

—হ্যাঁ। এক সময় পটলীচারু মরার পর ওর চারে ঘোরাফেরা করেছিলুম। মজতে মজতে জমাটি ভেঙে গেল। থিয়েটারের অ্যাক্‌টর রূপেন এসে থিয়েটারে নিয়ে গেল।

গোপাল বললে—বলুন।

দোরের সামনে অপেক্ষা করে সে দাঁড়িয়ে ছিল।

রীতুবাবু বললে—চল, আজ আপিসেই ভোজনং শয়নং দিনের বেলাটা। ভেবেছিলাম এখানেই কাটবে। তা কর্তা দেখলাম লেখায় বসল। চল। একসঙ্গে যাই। তুমি তো লিটল্ ব্রাদার ট্রাম ধরবে—ওখানেই ধরবে।

—চলুন।

—তুমি কি শ্রীমতী অলকার চাকরির জন্যে এসেছিলে?

—ইয়েস। নইলে শোল্ডারের উপর মৃত সতী না হোক ঘুমন্ত বা হতচেতন সতীর মত চেপে পডলে করব কি বলুন তো? মাই ফাদার--সে আমি ভাবতেই পারি না।

—তবে এ লাইনে এলে কেন?

—আরে সেই জন্যেই কমিক অ্যাক্‌টর। নইলে সিরিয়াস পার্ট করে হিরো সেজে ব্যাম্বুফ্লুট বাজাতাম। ও প্রেমকে আমার বড ভয়।

—তাহলে বিয়ে করে ফেল গেরস্ত কন্যা দেখে।

—মাইণ্ডের কথাটি বলেছেন। করব—সে কিছু সঞ্চয় করি, তারপর। তাও হয়তো করতাম, বাড়ির শেয়ারে আয়, দাদাদের কাছে হাজার দেড়েক টাকা যখন গেট করলাম তখন একবার উইশ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের মার্কেট—হোয়াইট মার্কেটে লং—লম্বা কিউ আর ব্ল্যাকে থোট কাটিং লাইফের ধার দেখে ওয়াইফের ভাবনাকে ভল্ট ডিপোজিট করেছিলাম। তবে ওয়াইফের অভাবে ওয়াইনটা অভ্যেস হয়ে গেল—মানে বেশী বেশী। বিয়ে করলে ওটা বাড়ত না। অলকা মেয়েটার পচ ধরেছে, নইলে হয়তো—

—গলায় বেঁধে ঝুলতে।

—ইয়েস। ক্যাচ করেছেন!

—লভ করতে দোষ কি?

—মাই খোদা! এয় ভগবান! হে গড! লভ যে আসে না বিগ ব্রাদার! হাসি পায়।

গোপাল ঘোষ নীরবে শুনতে শুনতে যাচ্ছিল, এবার সে খিক্ খিক করে হেসে উঠল। গোপালের রসের হাসি ওই খিক্ খিক্ করে। ওই হাসির মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন কাতুকুতু আছে, সেটা অপরকে অনেক হাসি হাসিয়ে দেয়। সে হাসিতে রীতুবাবু বাবুল এমন কি বিপিন সুদ্ধ হেসে উঠল। রীতুবাবু বললে—তোমার গলায় রসের খুকি লাগে, না গোপাল? এমন খিক্ খিক্ শব্দ ওঠে।

এবার গোপাল পর্যন্ত উচ্চ হাসিতে ভেঙে পড়ল। সত্যিই সে হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে গেল। রীতুবাবু বললে—এটা ট্রাম লাইন গোপাল, ওদিক থেকে ট্রাম আসছে। পড়ে গেলে চাপা পড়বে। মঞ্জরা অপেরার দাঁত ভেঙে যাবে।

গোপাল একটু দস্তুরও বটে। দাঁত তার ভেঙেছে কিন্তু সামনের বড় দাত দুটোই আছে। ওর হাত চেপে ধরলে রীতুবাবু। বাবুল বললে—আমি এই ট্রামেই উঠলাম।

বেলা দশটা।

* * *

বিডন স্কোয়ারে একটা ভিড় জমেছে। অনেক লোক। রীতুবাবু বললে—ওটা কি? কি ব্যাপার রে বিপিন?

বিপিন বললে—একটা ভিখিরি মেয়ে সকাল থেকে ধুঁকছিল। মরেছে এই কিছুক্ষণ আগে।

রীতুবাবু বললে—এর থেকে দেনা বাবা গোটাকত বোমা ঝেড়ে সব শেষ করে। জাপানাগুলো যে কি করলে—ক-দিন ফুটফাট করে থেমে গেল।

বলতে বলতে উঠে এল ওপরে। নায়কপক্ষ অর্থাৎ বায়নাকারীদের লোকটি বসে আছে, ওঘর থেকে তাকে অনর্গল মঞ্জরা অপেরার প্রশংসা শুনিয়ে যাচ্ছে যোগামাস্টার শুয়ে শুয়ে। এবং তার উপলক্ষ্য হল, নতুন বই গন্ধর্বকন্যা।

বলছিল—হ্যাঁ, বই বটে একখানা, বই বেটা বই বলে, এ মশাই বইয়ের বাবা বই। হ্যাঁ, দেখবেন মঞ্জরা দেবার কি পার্ট। শালা আগুন। তেমনি গোরাবাবুর জয়ন্ত। আর ওই নতুন ছোকরা বাবুল—ঝঙ্কাটং ঝঙ্কাটং সত্যং ঝঙ্কাটং জগতংময়ং ঝঙ্কাটং দিবসে রাত্রে—তার পরে কি বটে! আর কুমারী হিরোইনের নাচ একখানা দেখবেন, স্রেফ পাগল হয়ে যাবে লোক। উন্মাদ। পাকপাড়ার রাজকুমারেরা অঃ—কি পেশংসাই করলে! কলকাতার ফাস্টো দল। কালীয়দমনে কণ্ঠমশায় যেমন দল করেছিলেন, শখের যাত্রায় মঞ্জরী অপেরা এবার তেমনি দল করেছে। মেয়েতে মেয়ের পার্ট করে। আর সে সব মেয়ে কী! যেমন রূপ তেমনি যৌবন, তেমনি কটাক্ষ। ওই কুমারী হিরোইন না, ও মশাই খাস ভদ্র ঘরের দস্তুরমত পাস করা মেয়ে।

গোপাল এবং রীতুবাবু ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বসল, গোপাল বাক্স খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট দিয়ে বললে—খান। দেশলাই নিজে জেলে ধরিয়ে দিয়ে বললে—বিশ্বকর্মা পুজোয় বায়না, দুটো বায়না হয়ে গেছে, এর ওপরে বায়না এসেছিল, আমি ফেরত দিয়েছি। তারা খোদ কর্তা আর প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে গিয়ে ধরেছিল। তাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওঁরা, সেখানে গিয়েছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

লোকটি বললে—না না—

—মনে করবেন কি? কি মনে করবেন? আমি হাজির রয়েছি। খাতিরের কোন ত্রুটি হয় নাই। কত কণ্ঠমশাইয়ের দলের গল্প বললাম। তিনি বলতেন, কালদমুনের কাপ, সাতখুন মাপ। মানে যাত্রাদলের দোষ ধরতে নাই। যত দুঃখু তত সুখ। রাত্রে রাজা, দিনে ফকির বাউণ্ডুলে।

—মাস্টার, অনেক বকেছ। অসুখ বাড়বে, থাম। রীতুবাবু বললে।

গোপাল প্রশ্ন করলে—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—ভোমরাপুরা কলিয়ারী থেকে। বরাকর থেকে উত্তরে, নতুন কলিয়ারী।

—কখন বায়না?

—বরাকরের বাজারে তো আপনারা লক্ষ্মীপুজোতে যাবেন?

—হ্যাঁ, বায়না ওখানে দু রাত্রি আছে।

—আমরা যদি লরি দি, তাহলে ওই দুদিন দশটা থেকে আমাদের ওখানে গাইতে পারেন?

—প্রথম দিন একটার আগে হবে না। ওঁদেরই আরম্ভ বলেছেন আটটায়। লাগবে সাড়ে তিন ঘণ্টা। একটা দেড়টা হয়ে যাবে। আর যদি বেলা চারটে থেকে নেন, তবে হতে পারে। দ্বিতীয় দিন এগারোটা। আর যে বই এখানে হবে, সেই বই ওখানে হবে। দলের জিনিসপত্র লোকজন যাবে, আবার ফিরে বরাকরে আসবে, তার জন্যে লরি হাজির থাকা চাই। তা চারখানা। একখানা অন্তত বাসটাস, মানে ঢাকা গাড়ি চাই।

—কত করে নেবেন?

—আড়াই শো। বরাকরে দুশো পঁচিশ নিয়েছি। ওরা আমাদের প্রতিবছর নায়কপক্ষ। ওদের সঙ্গে কারুর সঙ্গ নেই।

—তা হলে হল না।

—ওর কমে আমাদের মাইনে মেটে না স্যার। শেষ রাত্রে গাওনা, তাদের বেশী দিতে হবে। অন্য দল বিশেষ দেয় না। কিন্তু আমাদের তা হবার উপায় নেই।

—তা হলে উঠি।

গোপাল রাতুবাবুর দিকে তাকালে। রাতুবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। গোপাল কাশলে, তবুও চোখ তুলল না।

ওধার থেকে যোগামাস্টার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বললে—মনামনি হয়ে গিয়েছে ম্যানেজার বাবু, ওঁরা অনেক মন নিয়ে এসেছেন, আমাদেরও মন আছে। এখন আর কথাকথি করবেন না, ও দুশোতে করে নেন। বুঝেছেন, কণ্ঠমশায় কখনও ফেরাতেন না। বলতেন, ওহে, ওদের গান শোনার তেষ্টা—সেটা মুড়কির দাম দিতে পারে, দোকানদারের মত জল দেবে না। ও বাবা, তা এ যে কটকট্ করছে পাখানা—

আসল কথা গোপাল ঘোষ ওর দিকে কটকট্ করে তাকিয়েছিল।

রীতুবাবু বললে—তাই নাও হে। বুড়ো যোগামাস্টার বলে ফেলেছে, নাও।

চোখের ইশারাও করলে—নাও।

—আপনারা বলছেন। তা বেশ, বায়না কত দেবেন?

—একশো টাকা।

গোপাল বাক্স খুলে ওদের দলের চিঠির কাগজ বের করলে।

বায়না করে ভদ্রলোক চলে গেল। গোপাল ম্যানেজার একদফা যোগামাস্টারকে তিরস্কার করলে। যোগামাস্টার রাগ করলে না, স্বীকার করলে বারবার—হ্যাঁ, অন্যায় হয়ে গিয়েছে ম্যানেজার। তা হয়েছে।

গোপাল ধরে রইল—তা হবে কেন?

রাতুমাস্টার নাপিত ডেকে বারান্দায় বসে কামাচ্ছিল আর নীরবে শুনছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়ে গেল। যোগামাস্টার বললে—কেন হল সে বলা তো বিপদ গো! গানে কেন তাল কাটে, তালে কেন পর্দা ছাড়ে, বেয়ালায় কেন তার ছেঁড়ে, কালা আমার পরপুরুষ—মন তবু কেন তার সঙ্গে ফেরে? এ যার-তার কথা নয় ম্যানেজার, কণ্ঠমশাইয়ের কথা।

গোপালের আর সহ্য হল না, সে বলে উঠল—কিছু না বলেছে বামুনকে—নিকুচি করব যদি ফের কণ্ঠমশাই কণ্ঠমশাই করবে তুমি!

—অ্যাঁ! কি? কণ্ঠমশাই বললে নিকুচি করবে তুমি। পাপী, মহাপাপী তুমি, চণ্ডাল তুমি। পাষণ্ড তুমি। তোকে আমি পৈতে ছিঁড়ে শাপ দেব।

বলে সে পৈতে দু হাতে টেনে ধরলে। কালো ময়লা মোটা সুতোর পৈতেটা মজবুদ।

গোপালের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রাতুবাবু নাপিতের ক্ষুরটা সন্তর্পণে ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলে—যোগামাস্টার!

এ ডাকে যোগামাস্টার স্থির হয়ে গেল। রাতুবাবু বললে—পৈতে ছাড়।

—কি ভাবে কণ্ঠমশাইকে অপমান করলে! বললে কণ্ঠমশাইয়ের নিকুচি করি—

—না। তা বলে নি ম্যানেজার। বলেছে বারবার কণ্ঠমশাই কণ্ঠমশাই করলে তোমাকে নিকুচি করবে। কণ্ঠমশাইকে নয়। তিনি সাধক—পুণ্যাত্মা। ছাড়, পৈতে ছাড়।

সঙ্গে সঙ্গে পৈতে ছেড়ে দিলে যোগামাস্টার। রাতুবাবু বললে—যাও, ও-ঘরে যাও। ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। নইলে—

যোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল—তা আমাকে ক্ষমা কর ম্যানেজার। আমি বুঝতে পারি নাই। হ্যাঁ, বুঝতে পারি নাই। মানে বুদ্ধি তো কম!

তারপরই হঠাৎ একটু ঝুঁকে গোপালের হাত ধরে বললে—ক্ষমা কর ভাই। একসঙ্গে কত গাঁজা খাই। বন্ধু লোক। আর কিছু হত না, বুঝলে আমি পৈতে ছিঁড়লেও কিছু হত না। মাইরি বলছি, কতবার পৈতে ছিঁড়েছি, লোককে শাপান্ত করেছি, কারুর কিছু হয় নাই।

গোপাল হেসে ফেললে।

রাতুবাবু আবার গিয়ে কামাতে বসল, নাপিত ক্ষুর লাগাবার আগেই বললে—বায়নার রকমটা

কি রকম গোপাল ? কতদিন হল ? মানে ঢাকের বাজনায় হল কিছু ?

—ভাল হয়েছে মাস্টারমশাই ।

—কি রকম ?

—পুজোতে কলকাতায় অষ্টমী নবমী চার পালা । সাতটায় মল্লিক বাড়ি, বারোটায় শোভা-বাজার বারোয়ারিতলা । আর দশমী বাদ একাদশী দ্বাদশী কলকাতা । তারপর দু দিন নেই । পূর্ণিমের সকালে রওনা, লক্ষ্মীপুজোয় দু দিন বরাকর বাজার । তার সঙ্গে এই দু দিন হল । তারপর কদিন ফাঁক । কালিপুজোর দিন থেকে নাগাড় সাত দিন—কোন দিন দুটো, কোন দিন একটা ।

—জগদ্ধাত্রী পুজোয় কোথায় ?

—আসানসোলের কাছে ।

—রাসে ?

—কান্দী বাঁধা আছে রাজবাড়িতে ।

কামানো শেষ করে উঠে বললে—তা হলে তো ভালই । বলে বিপিনকে ডাকল—বিপ্পন্ রে ! বিপ্পন্ !

বিপিনকে আদর করে বিপ্পন বলে রীতুবাবু ।

—আজ্ঞে ?

—একবার যাও বাবা । একটা নিয়ে এস । ছোট একটা । মাংস ভাতের ব্যবস্থা করে এস । বলে এস রাণ্ড ঠাকুরকে । নাও, দু-টাকার নোটটা রাখ । একটা সিগারেট চাই । বাড়তি লাগলে দিও । দেব এর পর ।

সিঁড়ির মুখে যোগামাস্টারদের ঘর । যোগা বলে উঠল—শিউনন্দন যে ! কি খবর ? এই তো ম্যানেজার এল, আবার তুই কেন রে বাবা ?

—চিঠি আছে । আর বড় মাস্টারবাবু আছেন ইথানে ?

—রীতু মাস্টার ? আছে বইকি । একটা বায়না হয়ে গেল রে ।

শিউনন্দন এসে এ-ঘরে ঢুকল । গোরাবাবুর চিঠি এনেছে । গোপাল পড়লে : আপনাকে বুঁচির ওখানে যাইতে হইবে না । বুঁচি নিজেই আসিয়াছিল । কথা পাকা হইয়া গেল । মাস্টার মশাই থাকিলে আটকাইবেন । এখানে পাঠাইয়া দিবেন । এখানেই খাওয়াদাওয়া করিবেন । বরাকরে সাহেব কলিয়ারীর চিঠি আসিয়াছে, তাহাদের কালীপূজার দিন নড়বড় হইয়াছে । বিলাতের সাহেব আসিতেছে, সে কালীপূজার দশ দিন পর কলিয়ারী আসিবে । উৎসব সব সেই সময় । সাহেব যাত্রা দেখিবে । হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে অন্য কোথাও বায়না আছে কি না । ইতি বিজয় চক্রবর্তী ।

এগার

পুজো এবার শেষ আশ্বিনে। ২৯শে আশ্বিন সপ্তমী। অক্টোবরের চোদ্দই। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ সাল থেকে যুদ্ধ, দেশে দুর্ভিক্ষ মড়ক এসেছে, যুদ্ধও শেষ হয় নি, দুর্ভিক্ষ মড়কেরও শেষ হয় নি, তবে সে সময়ের মত বোমার আতঙ্ক নেই এবং দুর্ভিক্ষ মড়কের ঠিক সে চেহারাও নেই। রেশনিং হয়েছে, কিউ হয়েছে, কাপড়ের কণ্ট্রোল, কোরোসিনের কণ্ট্রোল, কয়লার কণ্ট্রোল—সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকমার্কেটও ফাঁপছে, ফলে দুর্ভিক্ষ মড়ক যুদ্ধাতঙ্ক এসবের অবস্থাটা কলেরা' থেকে বেঁচে-ওঠা কঙ্কালসার লোকের মত। লঙ্গরখানা অনেক হয়েছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দুধ বিলুচ্ছে, কম্যুনিস্টরা জনযুদ্ধ বলে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ওদিকটা গোটাই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে—জোর নেই। কালোবাজারেই জোর হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে সর্বজনীন পুজো—মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর, ব্যবসায়ীদের ঘরের পুজো এবং সমারোহ বেড়েছে। হাওয়াতে নোট উড়ে ছুটছে, যাদের গাড়ি আছে তারা হাঁকিয়ে গিয়ে ধরছে, যারা পায়ে হাঁটে তারা ছুটতে গিয়ে হুঁচোট খেয়ে পড়ে মরছে। কিছু কিছু ব্লাডতি-পড়তি মেয়েরা পুরুষেরা যারা গলিঘুঁজিতে ঢুকতে সাহস করে, চেনে, তারা পাচ্ছে। এই গলিগুলোর দুপাশের দেওয়ালে ঠেকে নোট দু-দশখানা ঝরে পড়ে। মঞ্জরী অপেরার সে দিক থেকে দুশো-দুশো পঁচিশের বায়নাগুলো ঠিকা হয়েছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল বিশ্বকর্মা পুজোতেই। মানিকতলার খালধারে বিস্কুটের কারখানায় মঞ্জরী অপেরার আসর ছিল। এই কারখানাতেই মঞ্জরী অপেরা প্রথম ব্যবসার আসর পেতেছিল চার বছর আগে, নেমেছিল সতীতুলসী নিয়ে। দক্ষিণে দিয়েছিল পঁচাত্তর টাকা। সেই অবধি বিশ্বকর্মা পুজোয় ওখানে ওদের বাঁধা আসর। কারখানার লোক নিজে না এলে গোপাল নিজে গিয়ে বায়না নিয়ে আসে। তার আগে ওদের পাকপাড়ার রাজবাড়িতে যে আসর বসে সেটা ব্যবসার আসর নয়। সেটা প্রকৃতপক্ষে ড্রেস-রিহারশ্যাল। এবার বিস্কুট কোম্পানীর লোকেরা নিজেরা থিয়েটার করছে বলে ওরা আসে নি। গোপাল ঘোষ নিজে গিয়ে দাবি করে বলে এসেছিল—বেশ তো, আমরা বিনা পয়সায় গেয়ে যাব। প্রোপ্রাইট্রেস তাই বলেছেন। আমরা চারটে থেকে আটটায় পালা শেষ করে চলে যাব। পরে আপনাদের থিয়েটার হবে। কিছু দিতে হয় দেবেন, না হয় দেবেন না। আমাদের আসা-যাওয়া মাল আনা-নেওয়ার খরচ আর আসর খরচ দেবেন।

ওরা বলেছিল —আপনাদের পালাটা কি গন্ধর্বকন্যা ? জমে নি বলছে।

—কে বলছে ?

—এই তো অন্য দলের লোক বলছে।

—ভাল, পাকপাড়ার কুমারদের সার্টিফিকেট দেখুন।

সেটা গোপালের সঙ্গেই ছিল। গোরাবাবু নিজে গিয়ে কুমার বাহাদুরের কাছে ওটা লিখিয়ে নিয়ে এসেছে। রীতুবাবু পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ রটনাটা অন্য দলে বেশ উচ্চ স্বরে চাউর করেছে। কুমার বাহাদুর ভাল প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। বলেছেন—শেষ দৃশ্যটা তো খারাপ ঠিক হয় নি, তবে জমে নি। কিন্তু জমাট হওয়াই তো একমাত্র গুণ নয়। আর বলছেন

সংশোধন করেছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সংশোধন করেছি। হিরোইন পালটেছি।

—হ্যাঁ, ও মেয়েটি বড কাঁচা। তবে মশাই নাচে বড় ভাল।

—ওর নাচটা রেখেছি। সেটা আছে।

—সে কি করে হল!

—হল একটু কৌশল করে। মঞ্জরী নিজে সাজছে মালবিকা।

—সে কি! শুচি করবে কে মশাই?

—করবে বুঁচি বলে একজন পুরনো অ্যাকট্রেস। ভাল অ্যাকট্রেস। থিয়েটারে ছিল। ভাল করবে।

—ভাল করবে? তা করতেও পারে—শুচির সঙ্গে বুঁচির মিল আছে মশাই।

হেসে উঠেছিলেন তিনি। কৌতুক বড় ভালবাসেন কুমারসাহেব! লেখাটি রেখে দেবার মত। ওটাকে বাঁধিয়ে রেখে দেবেন। গোরাবাবু ঠিক করেছেন। তার আগে ব্লক করে নিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের প্যাম্পলেটে ছাপবেন। প্রেসের ফেরতই গোপাল গিয়েছিল।

লেখাটি পড়তে পড়তে কারখানার ম্যানেজার বললেন—এটার মানে কি? পণ্ডিত বিদ্বানের প্যাচ ধরতে পারি না। কি পরিতুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া মনে হইতেছে ঠিক হইল না, তোষণ শব্দে ঠিক বলা হয় না, তৃপ্তি—পরমতৃপ্তি পাইয়াছি লিখিলে তবে ঠিক হয়। নাটকের অভিনয়ে পরিতৃপ্তি পাইয়াছি। যেমন সুন্দর নাটক, ভাব ভাষা গ্রন্থন, তেমনি অভিনয়। গৌড়-জন আনন্দে সুধা পান করিবে।

গোপাল বললে—গোরাবাবু বলছিলেন, ওর মানে বুঝে বোঝা যায় না। গন্ধের মত ধরতে হয়।

—ও বাবা! এ যে আরও শক্ত! বেশ, তাই করবেন।

অভিনয় থিয়েটারের জন্য বাঁধা স্টেজের উপরেই হয়েছিল। একটা সিন পিছনে রেখে যন্ত্রারা সব স্টেজের উপর আসরের মত চারপাশে বসল। তারই মধ্যে গাওনা হল প্রবেশ-প্রস্থান উইংসের ভেতর দিয়ে, এতে জমাটির পক্ষে ভালই হয়েছিল, শুধু অসুবিধে হয়, তিন দিক বন্ধ থাকে, একদিকে মুখ করে গাইতে হয়। তাতে যাত্রাদলের যেটা নড়াচড়ার ঢং সেটা খাপ খায় না। যাত্রার আসরে চারিদিকে মুখ করে গাইতে হয়। যোগামাস্টার বলে—কণ্ঠমশায় বলতেন, ঘুরে ঘুরে বাবা ঘুরে ঘুরে। তাও তালে তালে। যাত্রাদলে গাওনা করতে হলে চারিদিকে চারটে মুখ চাই, চতুর্মুখ ব্রহ্মা হতে হয়।

খ্রীতুমাস্টার কথাটা কপালে হাত ঠেকিয়ে কণ্ঠমশায়কে প্রণাম করে গ্রহণ করেছে, সেও কথাটা বলে। এবং রিহারশ্যালে ওটা অভ্যেস করতে হয়। স্টেজে সেই অভ্যেস সরিয়ে রেখে গাওনা। তাতে অসুবিধে হয় নি বিশেষ। বড়দের তো হয়ই নি। ছোটদের কিছু কিছু হয়েছে। আবার সুবিধে ঢের। সোজা একমুখে কথা ছুঁড়লেই শুনতে পাবে সমস্ত লোক। তিন দিকে ঘেরা, আওয়াজ চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে না, তিন দিকে ঠেক খেয়ে

একদিকের জোরটা বেড়ে যায়।

প্রথম দৃশ্য থেকে প্লে জমাটিই ছিল। এখানেও ওই বংশীর গানে জমেছিল। এখানে সখীর দলের সামনে ডান দিকে ছিল আশা, বাঁ দিকে ছিল অলকা। অলকা মাথায় একটু খাটো বটে কিন্তু তার মুখে আছে পরিমার্জনার সুন্দর একটি শ্রী। তার উপর মেক আপ সে জানে। ওর নিজের একটা ছোট বাক্স বরাবরই আছে, এবার সেটাকে বেশ ভালো করে গুছিয়ে নিয়েছে। এর উপরেও তার বয়স নূতন যৌবন শ্রী। এই ধরনের সখী যাত্রাদলে থাকে না। যাত্রা দলের সখীরা সবই ছোট ছেলে নিয়ে হয়ে থাকে। চোদ্দ বছর যেতে-না-যেতে গলায় বয়সা ধরে ছেলেগুলোর, মুখে ব্রণ বেরোয়। কারুর কারুর মুখে দাড়ি গোঁফের হালকা সবুজ আভাস দেখা দেয়। এবং ওই ছোঁড়াগুলোকে কোনক্রমেই যুবতী দূরের কথা কিশোরী বলেও মনে হয় না। তবুও ওদের বুকে কাঁচুলি পরায়। সে আদৌ মানায় না। এখানে দুই দিকে দুটি সত্যিকারের মেয়ে সখী, ওদের আড়াল করে পিছনে রেখে দাঁড়াবামাত্র দর্শকেরা খুশী হয়ে উঠেছিল, চোখ মন দুই ভরে গিয়েছিল। এই সখীর দলের নাচে অলকার অসুবিধে হয়েছিল, তার বরাবরই একলা নাচার অভ্যাস। তাতে মুদ্রার, কাজ বেশী। এ সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে গায়ের হিল্লোল মিলিয়ে নাচা এই তার প্রথম। এবং আশার মত সে ঘন ঘন কটাক্ষ হেনে একটু পঙ্কিল ভাবে গায়ের হিল্লোল খেলিয়ে, হেসে নাচতে ঠিক সে পারে নি। বংশী স্টেজের উইংসের পাশ থেকে বারবার প্রম্পটিংয়ের মত বলেছে—একটু নুন ঝাল মিশিয়ে। হেসে, চোখ খেলিয়ে।

বুঝতে পারে নি প্রথমটা অলকা যে কথাটা তাকেই বলছে। সে মুখ ফেরায় নি। বংশী এবার গলা ঝেড়েছিল উঁ-হু উঁ-হু। অলকাকে কি বলে ডাকবে সেটা বংশীর বিনত এবং অশিক্ষিত ড্যান্সিং মাস্টারের মাথায় আসে নি। এবার বংশীর পিছন থেকে গোরাবাবুর গলা শোনা গিয়েছিল— অলকা। অলকা।

অলকা মুখ ফেরাতেই বংশী কিছু বলবার আগেই কথাটা মুদ্রার সঙ্গে অর্থাৎ নিজে নৃত্যভঙ্গিতে দেহ হেলিয়ে কটাক্ষ হেনে হেসে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল—এই ভাবে। আশার মত। একটু সেক্স মেশাও।

অলকা ফিক করে হেসে ফেলেছিল।

গোরাবাবু বলেছিল—এই হয়েছে। হ্যাঁ। চালিয়ে যাও।

ওদিকের সামনের উইংসে দাঁড়িয়েছিল ব্রহ্মমিত্র রাঙুবাবু, সখাণী শোভা। তারা গোরাবাবুর নাচ দেখানো দেখে হেসে ভিতরে ভিতরে প্রায় ভেঙে পড়ল। শোভা মুখে কাপড় চাপা দিলে। তবু খুক খুক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। ওর পাশে ছিল যোগাবাবু। সে অতি-বিস্মিত কৌতুকে কুঁজো হয়ে পড়ে বলে উঠল—এ মা! তারপরই মুখে হাত চাপা দিলে। রাঙুবাবু কিন্তু হাসে নি। তার কাছে এটা হাসবার ঘটনা নয়। গোরাবাবু না দেখালে হয়তো সে-ই নেচে দেখাত। এটা দেখাতে হয়। বিশেষ করে স্টেজে। পার্টে খামতি হলে, ভুল হলে উইংসের ফাঁক থেকে নীরবে অথবা ফিসফিস করে বক্তৃতার ভঙ্গি অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে দিয়ে থাকে প্রবীণেরা। যাত্রাদলেও আসরের মধ্যেই কো-অ্যাক্টরকে ফিসফিস করে বলে

দেয়, জোর দিয়ে বল। অথবা গলা চড়িয়ে। আবার প্লে জমে গেলে আনন্দে বড় বড় অ্যাক্টর পযন্ত ছেলেমানুষের মত নেচে দেয়।

ওদিকে গ্রীনরুমে ঠিক তাই হল।

নাচের ঘুঙুর এবং গানের সুরের তালে তালে পা নাচতে লাগল, গা দুলতে লাগল। যারা বসে ছিল তারা দাঁড়িয়ে উঠল, যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা এগিয়ে এল স্টেজের দিকে। বাবুল বোস মেক-আপ করতে করতে উঠে একটা পাক খেয়ে কপালে চাপড় মেরে বলে—অহো অহো! হা হতোস্মি! দেখ্‌তেং পেলাম নারে।

মঞ্জরী কথা বলছিল বুঁচির সঙ্গে।

বুচি পাকা অভিনেত্রী। কোঁকড়া চুল, নাকটি ছোট, গোল মুখ, বড় বড় চোখ, থুতনির দিকটা সামনের দিকে একটু বেরিয়ে আসা, চল্লিশ বছরেও সমুন্নত যৌবন, শুধু একটু বেশী ভারী। মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুদিন মঞ্জরী অভিনয় করেছিল—সে প্রায় বছর আষ্টেক আগে। তখন মঞ্জরী ছিল তরুণী নায়িকা, ইয়ং হিরোইন। যাত্রাদলে যাকে বলে কুমারী নায়িকা, আর বুঁচি করত ভারী বড় পার্ট। ঠিক প্রায় আজকের মতই। আজ সে শুচি, মঞ্জরী মালবিকা। তখন পরস্পরের সঙ্গে একটা আঁকশা-আঁকশিও ছিল। এ ওকে মারতে চেষ্টা করত অর্থাৎ খাটো বা ছোট করে দিতে চাইত। 'একদিন মঞ্জরী অভিনয়ের মধ্যে হঠাৎ নতুন ভাবে বুঁচির কথা ধরে এন্ট্রান্স দিয়ে ক্ল্যাপ পেয়ে গিয়েছিল। আগে তারা তিন-চারজনে প্রবেশ করত একসঙ্গে, বুঁচির কথা ছিল বেশী। সে যা বলছিল তা ঠিক ন্যায়সঙ্গত নয় কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করছিল না, শেষে মঞ্জরী অসহ্য বোধ করে বলে উঠেছিল, এ অন্যায়, আমি এর প্রতিবাদ করি। তাতে ফল অবশ্যই হত কিন্তু ক্ল্যাপ পড়ত না। বইয়ের অথার সেদিন স্টেজে ছিলেন, তিনি সেদিন ওকে বলেছিলেন, তুমি ওদের সঙ্গে ঢুকো না তো। ক্যাচ ধরে ঢোক, দেখ তো কি হয়। মঞ্জরী তাই করেছিল।

বুঁচির পার্ট ছিল: এ আমার কঠিন আদেশ। যে আদেশ লঙ্ঘন করবে, প্রতিবাদ করবে—

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরী ঢুকে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, প্রতিবাদ আমি করছি। তোমার এ অন্যায় আদেশ সর্বাগ্রে লঙ্ঘন করব আমি'।

ফল হয়েছিল বিদ্যুতের চমক দেওয়া স্পর্শের মত। সমস্ত দর্শক তার স্পর্শে চকিত এবং উল্লাসে দীপ্ত হয়ে উঠে করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। বুঁচির মুখ হয়ে উঠেছিল হাঁড়ির মত। তারপর প্রাণপণ উত্তেজনা সঞ্চার করেও মঞ্জরীর পার্টের ব্যক্তিত্বের উপরে উঠতে পারে নি। স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে সে প্রায় ব্যাঘ্রীর মত তাকে আক্রমণ করেছিল, কেন তুমি এ ভাবে ঢুকলে? কেন?

মঞ্জরী অথারকে দেখিয়ে দিয়েছিল। বুঁচি তাতেও নিরস্ত হয় নি। সে থিয়েটারের ম্যানেজারের কাছে। গিয়ে অভিযোগ করেছিল। এবং জিতেছিল। অথার রাগ করেছিলেন কিন্তু ম্যানেজার সেই আগের মত অভিনয় ব্যবস্থাই বহাল রেখেছিলেন। প্রতিযোগিতা রেষারেষি সত্ত্বেও ভালবাসাও ছিল। পাকা অ্যাকট্রেস—তবু মঞ্জরীর করা পার্ট সম্পর্কে

তার কাছে কিছু কিছু জেনে নিচ্ছিল। রিহারশ্যালে মঞ্জরী একবার দেখিয়ে দিয়েছিল, তাতেই সে অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করে নিয়েছিল পার্টটা।

সেই প্রথম যেদিন চাকরিতে ঢোকে সেই দিন বিকেলেই।

মাইনে হয়েছিল একশো পঁচিশ টাকা। খোরাকি এক টাকা। বুঁচি খুশী হয়ে চাকরি নিয়েছিল। বলেছিল, মঞ্জরী, আমার ইজ্জত রাখলে ভাই। যা অবস্থা হয়েছিল, কি বলব!

থিয়েটারে যাত্রায় তখন মাইনের বাজার সদ্য উঠছে। আগে থিয়েটারেই বড় বড় অভিনেত্রীরা একশো পঁচিশ প্যায় নি। সেদিন রিহারশ্যাল হয়েছিল মঞ্জরীর বাড়িতে। রীতুবাবু গোরাবাবু মঞ্জরী আর বুঁচি। শোভাকে ডেকেছিল মঞ্জরী কিন্তু শরীর খারাপ বলে সে আসে নি। বিছানায় সত্যিই শুয়েছিল। নিজের মনে বকেছে। মধ্যে মধ্যে বাবা বাবা বাবা বলে উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠেছে। প্রথমটা রিহারশ্যাল দিতে দিতে এরা থেমেছিল। শিউনন্দন ছিল সেখানে, ফরমায়েশ খাটাচ্ছিল। সে হেসে বলেছিল—উ আজ পিয়েছে।

—পিয়েছে!

—হাঁ। আমি তো আনিয়ে দিলম।

—আচ্ছা! রীতুবাবু বলেছিল—নিন, চলুন। আমার কপাল আর কি!

বুঁচি মুখ মচকে হেসেছিল। মঞ্জরীও। গোরাবাবু বলেছিল—বিচিত্র চরিত্র তুমি নারী। ছিন্নমস্তা ধুমাবতী তুমিই হইতে পার। নিন, বলুন মাস্টার মশাই—

রীতুবাবু হেসে বুঁচিকে বলেছিল—হাসছ কি?

—কেন হাসব না?

—হাসবে না এই কারণে যে তুমি আজ অগ্নির শিখায় ঘৃতাহুতি সম এসে পড়েছ।

—মরণ! আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

—তোমার কাজ হয়তো আছে, কিন্তু ও ভাবছে আমার কাজ নেই।

—সত্যি?

—সে ও বলবে। আমি কি করে বলব। নাও, এখন বল। বলান স্যার!

বই ধরে প্রমট্ করছিল, গোরাবাবু ফার্স্ট সিনে ব্রহ্মমিত্র। সর্বাণী, শুচি। গোরাবাবু বললে—বলুন মাস্টারমশাই, আয় আয়, আয় মাগো, কোলে আয়, বুকে আয়!

রীতুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে বললে কথাগুলি। গোরাবাবু প্রমট্ করলে—না না না পিতা, না! না!

মঞ্জরী নতজানু হয়ে বসে কথাগুলি বলে দেখিয়ে দিল। গোটা পার্টটাই শেষ পর্যন্ত করে গেল। তারপর বুঁচি উঠল। বললে—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আমি হাঁটু না গেড়ে যদি প্রণাম করতে যাই এমন সময় উনি ওই কথা বলেন আর আমি পিছিয়ে পিছিয়ে চাই—তা হলে ভাল হয় না?

—তা হলে মেয়ের আর বাপকে প্রণাম করার মোমেণ্ট হবে না। তা ছাড়া ওই ভাবে এগুনো আর পিছুনো ওটা খারাপ দেখাতে পারে।

—হ্যাঁ, তা বটে। ঠিক বলেছেন।

রিহারশ্যাল ভাল দিয়েছিল, এবং শুচির কঠিন মনের দিকটা ওর মুখের গড়নের জন্যে ভাল হয়েছিল, জায়গায় জায়গায় মঞ্জরীর চেয়েও ভাল হয়েছিল। এবং মঞ্জরীও ওই আসরে মালবিকার পার্টের রিহারশ্যাল দিয়েছিল। সত্যিই, রিহারশ্যালেই মঞ্জরী ওই ঝিমিয়ে-যাওয়া, এলিয়ে-পড়া শেষ দৃশ্যটা জমিয়ে তুলেছিল।

রীতুবাবু বলেছিল—সাবাস! মাথায় পাগড়ি কি টুপি থাকলে খুলে ফেলে মাটিতে নামিয়ে দিতাম। ওঃ, দেবতাও আজ আর এক জয়ন্ত হয়ে গেলেন!

মঞ্জরী হেসে বলেছিল পার্ট টা আমার মাস্টারমশাই।

—হ্যাঁ।

—আট বছর আগের তুমি আমি হলে দেখতে কি হত! ওই নাটকটার অনেক কথাই আমার ভাল লাগে, কিন্তু একটা কথা আশ্চর্য ভাল লাগে। "জীবনে সমাপ্তি আছে, থামা চলে, কিন্তু পিছনে ফিরে যাওয়া যায় না।"

তবু অনেকখানি গেছেন। ভাল হয়েছে। বুঁচি বলেছিল—সুন্দর হয়েছে।

—মেলোড্রামা বড্ড বেশী রকম করে তবে হল। গোরাবাবু বলেছিল।

রীতুবাবু বলেছিল—যাত্রার দলে ওটা বাদ দিতে অনেক কাল লাগবে স্যার। হোক মেলোড্রামা, বই জমেছে। এখন কুমারবাহাদুরের একটা প্রশংসাপত্র নিয়ে প্যাম্পলেট ছেপে বিলিয়ে দিন। এই পালাতেই আমাদের জয়জয়কার হয়ে যাবে।

মঞ্জরী বলেছিল—বুঁচিদি শুচির পার্ট আমার থেকেও ভাল করবে।

বুঁচি বলেছিল—কি যে বল ভাই! তুমি অনেক উন্নতি করেছ। এখন—

বাধা দিয়ে মঞ্জরী বলেছিল আমি মিথ্যা কথা বলি নি বুঁচিদি। দিব্যি করে বলছি। ও পার্টটা আমার ভাল লাগত না। মনের ভাব হবে কি করে?

—কেন? পার্ট তো ভাই ভালো পার্ট।

—সে তো ভাই মনের কাজ।

—বুঝেছি। শুনেছিলাম বটে। তা মালবিকা-জয়ন্তের মিলন দৃশ্যটাতে আঁচ আছে। হ্যাঁ, আঁচ আছে।

গোরাবাবু অকস্মাৎ উঠে পড়ে বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—উঃ, কত তারা আর কি সুন্দর জ্যোৎস্না-মাখা আকাশ! মেঘগুলো ভেসে চলেছে—

রীতুবাবু বলেছিল—হ্যাঁ, এই সময়ে সাইরেন ভ্যাঁ-ও করে উঠলেই মাথায় চড়বে। আসুন, ফিরে এসে বসুন। শিউনন্দন, গলা শুকিয়ে গেল বাবা! সেরেফ ভেরাই মেরে গেল! রিহারশ্যাল তো ওভার।

—রিহারশ্যালে মদ্যপান নিষিদ্ধ। শিউনন্দন সাড়া দিয়েছিল—হামি সব তৈয়ার করে রেডি রাখিয়েছি, মাস্টারবাবু!

—তা ইভরেডী ব্যাটারীর আলো দেখাও, সন্ধ্যে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ।

মঞ্জরী উঠে পড়েছিল—মা গো, আমার ঠাকুরঘরে প্রণাম হয়নি!

—আমিও উঠলাম ভাই। একটা রিকশা এনে দে না বাবা শিউনন্দন।

গোরাবাবু পানের আসরেও অন্যমনস্ক ছিল। রীতুবাবু জিজ্ঞাসা করেছিল—দেবতা, এত চুপচাপ কেন বলুন তো? বই জমে গেল, নির্ঘাত জমে গেল। তবু—

হেসে গোরাবাবু বলেছিল—ভাবছি একটু।

—কি বলুন তো।

—শুচির পার্টটায় অবিচার হয়ে গেল। ক্যারেকটারটা খামতি হল।

—কি ব্যাপার? মায়া না কি গো? অ্যাঁ?

কথাটা বলেছিল মঞ্জরী।

—তুমি?

—হ্যাঁ। শুনে ফেলেছি।

—আমি কি অন্যায় বলেছি?

—আমিও অন্যায় বলি নি। তার উপর মায়া না হলে এ কথা বলতে না। দাদুর শ্রাদ্ধের সময় যে চিঠিখানা লিখেছিল, তুমি আমাকে দেখাও নি, কিন্তু আমি দেখেছি। তারপরেও যদি বল শুচির পার্ট কঠোর করে অন্যায় করেছ, তাহলে কি বলব। এর কারণ হয় তোমার মায়া নয় আমার উপর বিতৃষ্ণা।

স্থির দৃষ্টিতে মঞ্জরীর দিকে তাকিয়েছিল গোরাবাবু, তার কথা শেষ হলেই বলেছিল—দেখেছ সে চিঠি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু

—কি কিন্তু? এর পরও কিন্তু?

—হ্যাঁ। সে কিন্তুটা হল কমলা আর শুচি এক নয়। কমলা রক্তমাংসের মানুষ, শুচি বইয়ের চরিত্র—আমার সৃষ্টি। কমলার উপর অবিচার করুণা ঘৃণা সব করবার আমার অধিকার আছে, শুচির বেলা তা নেই।

—ওরে বাবাঃ। বড় বড় কথা। তা বেশ তো, কাটা কথাগুলো দাও না রেখে। বুঁচিদি ক্লাপ পাবে।

—চুপ করলাম।

রীতুবাবু হঠাৎ উঠে পড়ে বলেছিল—উঠলাম মাই লর্ড।

—মানে? এখানে খেয়ে যাবেন। বসুন।

—না স্যার। যুদ্ধের বাজার। ব্ল্যাক-আউটের রজনী—

কেমন যেন অপ্রতিভের হাসি হেসেছিল রীতুবাবু।

—সত্য?

—এটা কি মিথ্যা?

—আমি বলব?—মঞ্জরী বলেছিল।

—বলুন।

—আমি দেখেছি।

—দেখেছেন ?

—হ্যাঁ। চারিচক্ষুর কথা আমার কাছে ছাপি নেই।

হা হা করে হেসে উঠে গোরাবাবু বলেছিল—তবে এতক্ষণ বসে কেন স্যার ? বেচারী একলা গেল!

রীতুবাবু হেসে বলেছিল—ভাবছিলাম।

—শুভরাত্রি।

—ধন্যবাদ। বলে দু পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে এল, এক গ্লাস মদ ঢেলে সিগারেট ধরিয়ে গোরাবাবুর কানে কানে কিছু বললে। গোরাবাবু বললে—নিশ্চয় না। বলে উঠে গিয়ে দশ টাকার দুখানা নোট এনে হাতে দিল।

সেদিন রীতুবাবু বুঁচির ঘরেই কাটিয়েছিল। শুধু সেদিনই নয়, মধ্যে মধ্যে এর মধ্যে আরও গেছে। শোভা কিন্তু সামলে নিয়েছে। আবার পূর্বের মতই সহজ হয়ে উঠেছে।

রীতুবাবু বুঁচির পার্টটাও তৈরি করিয়ে দিয়েছে। কয়েক দিনই বুঁচির বাড়ি গেছে বুঁচির নিমন্ত্রণে।

শোভা এখন বেশ সহজ ভাবেই সেই নিয়ে রীতুবাবুকে ঠাট্টা করছে।

আজও নামবার আগে বুঁচি মঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছিল পার্টের কথা। আজ জানতে চাচ্ছিল—মঞ্জরী এই সিনে কোথায় কোথায় বাহবা পেয়েছে, ক্ল্যাপ পেয়েছে। পার্টের কাটাকুটির কথাও সে জানে, রীতুবাবু সে সব প্রায় খুলেই বলেছে। সেই কথাই হচ্ছিল।

—শেষটা কাটা হয়েছে। ক্ল্যাপের কথাগুলিই নেই। ক্ল্যাপ ওখানে পড়বে না। আমি জানি।

মঞ্জরীর পার্ট পড়বে পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। সে মেক-আপ নিচ্ছিল। সে তার দিকে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকালে। বুঁচি কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলে—কত্তার ঘরের বিয়ে করা বউ এমন দজ্জাল ছিল ? বাবাঃ!

মঞ্জরী হেসে বললে—মাস্টারমশাই আমাদের সদাশিব!

বুঁচি হেসে উঠল। হেসে বললে—ওই পার্টের কথা থেকেই কথা উঠল। মানুষটা তো খোলা প্রাণের। তার উপর নেশা। জিজ্ঞাসা করতেই বললে, আগাগোড়া হুবহু সত্যি প্রায়। সে যে কি রমণী—তা ওই গোরাবাবুই জানেন। ওঃ! আমাকে বলেছেন, বোধ হয় মঞ্জরীকেও বলেন নি—বলেছেন মাস্টারমশাই, মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করতাম। তুমিও তাকে নাকি দেখেছ ?

—দেখেছি। বাপ তো আমাদের এক। সে মানুষ যে-সে মানুষ নয়। কঠিন মানুষ। তাকেই সে যা—

ঠিক এই সময়ে গ্রীনরুমের ভিতর পর্যন্ত স্টেজের ধার থেকে উল্লাস এবং কৌতুক রসের

ঢেউটা ভেসে এল। মঞ্জরীর জন্য পর্দা দিয়ে তৈরী ছোট ঘরটির মধ্যেও ধাক্কা দিয়ে গেল।

বাঁশ বাঁধা থিয়েটারের স্টেজের গ্রীনরুম; তেরপল দিয়ে তালাবদ্ধ আপিস স্টোরের বারান্দাটার আশপাশ ঘিরে, স্টেজের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা ছোট পাশ মেয়েদের জন্যে, বাকীটা পুরুষদের। প্রথম দিকটায় পুরুষ, মেয়েরা একেবারে একপাশে। নইলে উঁকি মারবে পুরুষেরা। দলের পুরুষেরাই। তারই মধ্যে আবার মঞ্জরী অপেরার ম্যানেজারের নির্দেশে ছোট একটি পর্দা-ঘেরা খুপরি হয়েছে প্রোপ্রাইট্রেসের জন্যে। এখানে একটা চেয়ার টেবিলও আছে। বাকী সব যাত্রাদলের ধারাপদ্ধতি অনুযায়ী লম্বা এক একটা সাজের বাক্সের ওপর আপন আপন মেক-আপ বাক্স, ছোট্ট টিনের স্যুটকেস খুলে বসে গেছে। সবাই আবার বসবার জন্যে সাজের কালো স্টীল ট্রাঙ্ক পায় না। তারা মেঝের উপর বিছানো শতরঞ্চি বা যা হোক কিছুর উপর বসে। স্টেজের উইংসএর ধার থেকে পুরুষদের গ্রীনরুম হয়ে ঢেউটা বয়ে নিয়ে এসেছিল গোপালীবালা। মেয়েদের গ্রীনরুমে তখন মঞ্জরীর ঘেরা ঘরে মঞ্জরী এবং বুঁচি ছাড়া আর কেউ নেই। শোভা সর্বাণী, সে স্টেজে এখনই ঢুকবে। ব্রহ্মামন্ত্রের পরই। আশা অলকা এবং কিশোরী মেয়েটা আসরে নাচছে। গোপালাও ছিল ওখানে, ও বড্ড হাসে। হাসি একটা রোগ বললেই হয়। রাতুবাবু ওকে হ্যাথন-হাসি বলে, তাতেও হাসি, যোগা ওকে ক্যাকক্যাকানি বলে, তাতেও হাসি। ইদানীং বাবুল এসে ওর নাম দিয়েছে বিস্ফারণী টুটপেস্ট, থার্টি-টু। ম্যানেজিং এজেন্ট নাটু কোম্পানি! এতেও আজকাল হেসে গড়িয়ে পড়ে। হি-হি-হি-হি-হি-হি করে হাসতে হাসতে গোপালী গ্রীনরুমে ঢুকল। এবং হাসতেই লাগল।

মঞ্জরী চকিত হয়ে উঠল—এত হাসছ কেন? এখন তো কোন কমিক সিন নয়, সিরিয়াস সিন, গান হচ্ছে, বুঁচি মঞ্জরী দুজনেরই পায়ের পাতা ছন্দে তালে গোপন নৃত্য করে যাচ্ছে, এখন হাসির কি হল? কেউ হাস্যকর কিছু করে ফেলল না কি? পা হড়কে পড়ল? না, কারুর চুল বা দাড়ি খুলল, না কেউ বিশ্রী বদজবান করে ফেলল? এ হয়। থিয়েটারেও হয়। একবার নামজাদা অ্যাক্‌ট্রেস ফিলিং দিয়ে পার্ট করতে করতে তোমার ছিন্ন শির বলতে বলে ফেলেছিল, তোমার শিন্ন ছির—। এবং থেমে গিয়েছিল আচমকা। স্টেজের অ্যাক্‌টর থেকে অডিটোরিয়াম হাসিতে ফেটে পড়েছিল। সে হলে প্লে গেল। সর্বনাশ! প্রথম আসরে এ হলে আজকের প্লে জমবে না, এবং নতুন বইয়ের পালা শেষ। মঞ্জরী বলে উঠল—কি হল?

বুঁচি পর্দা সরিয়ে দেখে বললে—গোপালী হাসছে। ও কিছু না।

মঞ্জরী কিন্তু স্থির থাকতে পারলে না, বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে বুঁচিও। ওর তো পার্টই আছে সিনে।

পুরুষদের সাজঘরে বাবুল বোস পাক খাচ্ছে তখনও, আর গাইছে, টাইমায়ার চায়ার চায়ার, ভাব্‌লে সাভার ভাইনো মোনাই—। টাইমায়া—। গানটা—বাংলা তিমিরে ধীরে ধীরে ডুবলো সাধের দিনমণি। মেমসাহেব রোমান স্ক্রিপ্টে লিখে নিয়ে শিখতে গিয়ে ও-ই

শা'নয়েছিল তাকে। ওটা শাবুলের পেটেণ্ট কমিক। অন্য সকলেও হাসছে। মঞ্জরী সোজা গিয়ে স্টেজের উইংসের ফাঁকে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—কি, হল কি ?

রীতুবাবু ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, সে চট্ করে বলে দিল—প্লে জমে গেছে। বলেই সে ঢুকল- -

বন্ধ করো বন্ধ করো গান। বন্ধ করো উৎসব-উল্লাস—
নির্বাপিত করে দাও আলোকের মালা।

মুহূর্তে সব স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে গেল। মঞ্জরী ভ্রূ কুঞ্চিত করে শোভাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল ? এত হাসছে সব।

শোভা আবার মুখে কাপড় দিলে। আবার তার হাসি পেয়েছে।

যোগামাস্টার বললে—কত্তা নেচে দিলে মা।

—কে ?

—কত্তা। গোরাবাবু। ওঃ, সে কি নাচ। নাচও উনি জানেন ?

—চুপ কর। এখানে গুজ-গুজ ফুস-ফুস করছ কেন ? প্রম্পটিং শুনতে পাবে না যে! গোরাবাবু এদিকে এসে দাঁড়িয়েছে।

—না, মা—

—আবার।

মঞ্জরী বললে—আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম। এত হাসছে কেন ?

—চল ভিতরে গিয়ে বলছি।

ভিতরে এসে গোরাবাবু হেসে বললে—আমার নাচ দেখে হাসছে সব।

—শুনলাম। তুমি নাচলে—সেটা কি রকম ? আনন্দে। কতটা মদ খেয়েছ এর মধ্যে ?

—আঃ।

—আঃ করলে কি হবে ? মদ না খেলে নিজের পজিসন ভুলে নাচে কেউ ?

—না, মদ খেয়ে নয়। দায়ে পড়ে। দলের ম্যানেজার আমি, বই আমার—দায় যে অনেক।

মঞ্জরী থমকে গেল। গোরাবাবু বললে—সখীর ব্যাচে অলকা নাচে নি কখনও, প্রথম নেমে আশার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না।

—ওর নাচে তো তাল কাটে না। নাচে তো ভাল।

—সে সোলো ড্যান্স। আর সখীর দলের নাচও নয়। তাল ঠিক কাটছিল না, তবে আড়ষ্ট হচ্ছিল। না দেহ খেলে, না চোখ খেলে। বংশী উইংস থেকে বলেও শোনাতে পারে না। তখন আমি নাম ধরে ডেকে নিজে নেচে বললাম, এই ভাবে।

—পারলে ?

—ভাল পেরেছে। হয়তো আমার নাচ দেখে ইনস্পিরেশন পেয়েছে।

মঞ্জরী এবার হাসলে। বললে—আমার ভাগ্যি আমিই দেখতে পেলুম না।

ওদিকে মঞ্জরীর কুঠরীর বাইরে মেয়েদের গ্রীনরুমে আশা, কিশোরী মেয়েটি, অলকা ঘাম

ঝম ঘুঙুরের শব্দ তুলে ঘরে এসে ঢুকল। ঘুঙুরের সঙ্গে হাসি। শুধু অলকা বললে—কি হাসছ এত ?

আশা বললে—ওরে বাপরে, কত্তার নাচ! কি চোখের খেলা!

গোরাবাবু গলা ঝেড়ে সাড়া দিলে। ওরা চুপ হয়ে গেল। গোরাবাবু ডাকলে—অলকা।

অলকা সাড়া দিলে—অ্যাঁ।

—প্রোপ্রাইট্রেসের ঘরে এসো।

পর্দাটা সে তুলে ধরল। অলকা গোরাবাবুর হাসিমুখ দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল, নইলে ভয় পেয়েছিল। তার জন্যে গোরাবাবুকে নাচতে হয়েছে। স্মিত হাসি-মুখেই এসে দাঁড়াল।

ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে গোরাবাবু বললে—ওয়েল-ডান। ভাল নেচেছ। এত শাই কেন ? এটা অভিনয়। সব মিথ্যে। আর অভিনয়, ঘৃণা লজ্জা ভয়—তিন থাকতে নয়। অভিনয়ে শুধু দেবাই সাজলে চলবে না, পিশাচীও সাজতে হয়। পারলে তবে অ্যাক্‌ট্রেস!

—পারবে। নিশ্চয় পারবে। বেচারী নতুন—সেটা ভুলে যাচ্ছ তোমরা। মঞ্জরী বললে।

অভিভূত হয়ে গেল অলকা। এত অভিভূত হল যে, তার মত শিক্ষা-দীক্ষা-কৌলীন্য গরবিণীও হঠাৎ হেঁট হয়ে মঞ্জরীকে প্রণাম করে বসল।

মঞ্জরী শশব্যস্ত হয়ে উঠল—ও কি, আমাকে প্রণাম করছ কেন ভাই? না না না, বরং ওঁকে প্রণাম কর। ব্রাহ্মণমানুষ, পণ্ডিত, অথার মানুষ। তোমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন নেচে!

গোরাবাবু বললে—সে নাচ ছবি তুলে রাখার মত। বংশী হেরে যায়। সে যথাসাধ্য অঙ্গ দুলিয়ে কটাক্ষ হেনে—

হেসে উঠল গোরাবাবু।

অলকা লজ্জা পেয়েছিল। সে এই ফাঁকে টুপ করে একটি প্রণাম করে বেরিয়ে পালাচ্ছিল। মঞ্জরী ডাকলে—শোন।

অলকা দাঁড়াল। মঞ্জরী বললে—লাস্ট সিনে নাচটা কিন্তু খুব—কি হবে বল না গো?—মানে খুব সংযম থাকা চাই। আরতি নৃত্য তো! আর গোটা সিনটাই মিলনান্ত হলেও বেশ পবিত্র। তোমার সখীর কথাগুলো খুব যেন—দেখ আমরা বলি 'নোস্তা'—নোস্তা না হয়!

—আচ্ছা।

অলকা আবার যেতে উদ্যত হল। এবার গোরাবাবু বললে—ভাল অ্যাক্‌ট্রেস হবে তুমি। একটু স্লিপিং করো। আর তোমার নতুন বাসায় ভাল আছ ? ভাল লাগছে ?

—খুব ভাল লাগছে।

মঞ্জরী বললে—বাবা মা—

—না। আমি খালাস পেয়েছি, আপনারা সে জানেন না। পুলিসে আমি ডায়রী করে তবে চলে এসেছি। আমি বেঁচেছি।

বলে সে চলে গেল। এ অলকা সঙ্কুচিত বিমুগ্ধ অলকা নয়। আর এক অলকা

—বাবু! পর্দার বাইরে থেকে গোপাল ডাকলে—বাবু!

—গোপালবাবু! আসুন।

—আপনার পার্ট এবার।

—ফার্স্ট সিন হয়ে গেল?

—শেষ হচ্ছে। বঙ্কিম ক্ল্যাপ মেরে দিলে. দূতের পার্ট।

—বঙ্কিম সাধু?

—হ্যাঁ, ভাল বলেছে।

বরানগরের বঙ্কিম সাধু, যার ছেলের অসুখে টাকা দিয়েছে মঞ্জরী অপেরা।

মঞ্জরী হেসে বললে—ভগবান বলে একজন আছেন, বুঝলে? বেচারীকে টাকাটা দিয়েছি, তিনি দেখিয়ে দিলেন, লোকের ভাল করলে তোমারও ভাল হয়।

গোরাবাবু ও কথায় গেল না, প্রশ্ন করলে—শুচি কেমন করলে?

—ফার্স্ট ক্লাস। হাজার হলেও পুরনো চাল। রীতুবাবুর কোচিং।

একটু হাসল গোরাবাবু। ডাকল--শিউনা!

—হাঁ। গিয়ে হাসি দাঁড়িয়ে আছে।

মদের গ্লাস। গোরাবাবু যেতে উদ্যত হতেই মঞ্জরী বললে—হুঁ! হুঁ -

-কি?

-কপালের সাদা ফোঁটাটা।

সাদা পেন্ট দিয়ে ফোঁটাটা সে ভাল করে এঁকে দিল। গোরাবাবু বেরিয়ে এল। শিউনন্দন গ্লাস এগিয়ে দিলে। সেটা খেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে, হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে উইংসের ধারে গিয়ে দাড়াল। পিছনে পিছনে মঞ্জরীও।

প্রথম সিনের লোকেরা বেরিয়ে আসছে।

এবার দ্বিতীয় সিনে নাটুবাবু আর বাবুল বোস। বসুমিত্র আর বিদূষক। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকবে গোরাবাবু, জয়ন্তকুমার আর তার সঙ্গীরা।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে টিপে দিলে।

বুঁচিদি বেরিয়ে এসেছে, রীতুবাবুর সঙ্গেই হাসতে হাসতে গ্রীনরুমের দিকে চলেছে। এবার বোতল খুলবে মাস্টারমশাই। বুঁচিদি? বুঁচিদি খায় অন্তত খেত। শোভাও খায়। গোপালীও। আশাব তো কথাই নেই। কিন্তু প্লের সময় এক আশা লুকিয়ে-চুরিয়ে খায়, তা ছাড়া কেউ খায় না। বুঁচিদি যদি এর ওপরে একজনের সঙ্গে দুজন হয়, তবে খারাপ হবে। ওটা বারণ করতে হবে।

এদিকে তখন দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়ে গেছে। লোকে হাসছে। বাবুল খাসা ধরতাই ধরেছে—

বাবা বাবারে বাবারে, পিতা পিতরৌ পিতরঃ
ভো ভো ব্রাহ্মণকুমার, নাহি গচ্ছ নাহি গচ্ছ—
একাকী এই বনোমধ্যে ভয়াৎ এবং মরিষ্যামি।

খাসা ভঙ্গি করে বলেছে।

গোপাল এসে বললে সেজে নিন মা। বিপিন দাঁড়িয়ে আছে, বলতে পারছে না।

—যাই।

অলকাও সাজছে। বাঃ! মেয়েটা সাজতে জানে। মঞ্জরী ঘরের মধ্যে ঢুকল। তাকেও সাজতে হবে। এ সজ্জা বড় কঠিন। ঝকমকানি বাদ দিয়ে সাজতে হবে। রজনীগন্ধার মত। জয়ন্তকুমার মালবিকাকে জ্যোৎস্না-রাত্রে নারায়ণ-মন্দিরে দেখে বলবে—

রজনীগন্ধার শুভ্র অনুপম স্নিগ্ধ লাবণ্যে গঠিত তনু
মৃদুগন্ধা মৃদুচ্ছন্দা অপরূপ কোমল মাধুরী
তপস্বিনী সম রুক্ষ কেশভার—

চুল শ্যাম্পু করেছে মঞ্জরী, ফুলে ফেঁপে পিঠে পড়ে রয়েছে, কপালের উপর দু গোছা ইচ্ছে করেই টেনে দিয়েছে, সেগুলি এলোমেলো হয়ে উড়ছে। মুখে সে বিলিতী পেণ্ট ব্যবহার করেছে। রুজ একটু বেশী হয়েছে। তা হোক। খুব অল্প বয়স লাগছে। কাপড় কাঁচুলি বেশ একটু নিবিড় করে শক্ত করে পরলেই নিখুঁত হয়ে যাবে। কপালে সে টিপ পরলে কুমকুমের।

আয়নায় কার ছায়া পড়ল! কে? অলকা!

—আসব?

ফিরে তাকাল মঞ্জরী। চোখ আর তার ফিরল না। এমন করে সেজেও অলকার পাশে দাঁড়িয়ে তার বয়স বেশী মনে হবেই।

—মেক-আপটা দেখাতে এলাম।

—ভাল হয়েছে।

—আপনার মুখের রঙটায় পাউডারের পাফ দিয়ে রুজটা একটু মেরে দেব? আর চুলগুলি ঠিক করে দেব? আরও ভাল হবে।

—দাও। তুমি ভাল সাজতে পার।

—বিউটি সেলুনে গিয়ে মেক-আপ করতাম তো। সেখানে শিখেছিলাম।

ঠিক করে দিলে সে। মঞ্জরী দেখলে সত্যিই ভাল হয়েছে আগের থেকে।

সে হঠাৎ বললে—যাত্রাদলে তোমার আসা ঠিক হয় নি। মানে এ সব শেখার পর।

—কি করব? ম্লান হেসে বললে অলকা, চেষ্টা তো কম করি নি। চান্স পাই নি একবারে তা নয়। কিন্তু পারলাম কই? যাত্রাদল পেয়েছিলাম বলে বেঁচেছি। নইলে, যে কসাই বাপ মায়ের পাল্লায় পড়েছিলাম! ওরাই আরও হতে দিলে না।

দুজনেই এর পর চুপ হয়ে গেল।

বাইরে খুব হাস্যরোল উঠেছে। কান পেতে শুনে অলকা সচকিত হয়ে বললে—বাবুলদা। ঝঙ্কাটিং ঝঙ্কাটিং সত্যং। যাই দেখে আসি।

—যাও।

একটু পরই গোরাবাবু এসে ঢুকল। বললে—বাবুল, ওয়াণ্ডারফুল! মারভেলাস!

ওঘরে রাঁতুবাবু বাবুলকে পিঠ চাপড়ে বলছে—জিতা রহো, জিতা রহো, মাস্টার। লঙ লিভ মাই লিট্‌ল্ ব্রাদার।

বাবুল বললে—টুইঙ্কি্‌ল্ টুইঙ্কি্‌ল্ লিটিল্ স্টার—। ওপেন ওপেন বট্‌ল স্যুন। ইয়োর লিট্‌ল্ স্টার ইজ থার্স্টি।

—নাও। রেডি করে রেখেছি!

—এ বোতল যে সিকি শেষ করেছেন এর মধ্যে!

—তা করেছি।

—আমাকে কিন্তু বারণ করবেন। অল আর্থ হয়ে যাবে।

গোরাবাবু মঞ্জরীকে বললে—তুমি একটু ভাবছ! নার্ভাস হলে নাকি?

—তা একটু হয়েছি।

—নতুন কথা। কিচ্ছু ভেবো না। রিহারশ্যালে আমি প্রায় অঙ্ক কষে হিসেব করেছি। প্লে জমবেই। লাস্ট সিনে ক্ল্যাপ তুমি পাবে না, কিন্তু লোকে তোমার জন্যে পাগল হয়ে যাবে।

—একটু বাধা দাঁড়াচ্ছে।

—সেটা আবার কি?

—অলকাকে দেখেছ?

—দেখেছি বইকি।

—উঁহু। অলকা। অলকা। শোভাদি, আশা, কে আছ অলকাকে পাঠিয়ে দাও তো।

—আমাকে ডাকছেন? আসব? পর্দার ওধার থেকে অলকার সাড়া এল।

—হ্যাঁ। ভিতরে এস।

অলকা ভিতরে এসে দাঁড়াল—কি?

—তোমার মেক-আপ দেখাচ্ছি ওঁকে। দেখ।

—বাঃ! সেদিন তো এমন মেক-আপ কর নি রাজবাড়িতে?

—বলেছিলেন যে মালবিকা হবে বিষণ্ণতার মত। রূপ দিয়ে সে জয় করছে না। পবিত্র পরিচ্ছন্ন নিশ্চয় হবে, রজনীগন্ধার মত, কিন্তু ঝলমলানি থাকবে না। সেইজন্যে এ ধরনের মেক-আপ করি নি।

—হুঁ। তুমি বড় অ্যাক্‌ট্রেস হবে গো।

মঞ্জরী বললে—আচ্ছা যাও তুমি।

অলকা চলে গেল।

মঞ্জরী মৃদুস্বরে বললে—আমার বয়স মেক-আপ করেও ওর মত দেখাবে না।

—না না, তোমার মেক-আপ অপূর্ব হয়েছে। আমার সে-কাল মনে পড়ছে।

তবুও মঞ্জরী বললে—উঁহু। ও সিনে ওর কথাগুলো না থাকলেই ভাল হত। মানে নাচ শেষ করেই যদি ও চলে আসত, তা হলে ঠিক হত। ভেবে দেখ তুমি।

—কিছু ভেবো না। তুমি পার্ট করে যাও। তোমার রূপ আমার চোখ দিয়ে দেখবে

অভিয়েন্স। নিজের চোখে নয়।

।পটনন্দন এসে দাঁড়াল—মাস্টারসাহেব, বাবুলবাবু ডাকছেন আপনাকে।

চল।

সত্যিই তৃষ্ণা পেয়েছে। সিগারেটও খায় নি অনেকক্ষণ।

কথা মঞ্জরীর সত্য হল না। গোরাবাবুর কথাই সত্য দাঁড়াল। গন্ধর্বকন্যা সুন্দর জমাটির মধ্যে শেষ হল। এবং সত্যিই গন্ধর্বকন্যা তপস্বিনী মালবিকা দর্শক মনে সন্ধ্যার অন্ধকারে রূপে গন্ধে সদ্যফোটা রজনীগন্ধার মতই একটি রোমান্টিক নেশা ধরিয়ে দিল। মঞ্জরী নিজেও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সে স্টেজ থেকে ফেরবার পর অনেকক্ষণ কেমন স্তব্ধ হয়ে ছিল। বুঁচি এসে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলেছিল—আমার ইচ্ছে হচ্ছিল প্রেমে পড়ি তোর পুরুষ হয়ে। শোভা বললে—সতীতুলসীতেও এমনি আছে কিন্তু এত ভাল নয়। তারপর কানে কানে কি বলেছিল যা শুনে মঞ্জরীর অভিভূত ভাব কেটে গিয়ে সে চপলা হয়ে উঠেছিল এবং বলেছিল—যাঃ। কি অসভ্য মা!

শোভা হেসে ভেঙে পড়ত। গোপালী কথাটা না শুনেও গড়াচ্ছিল হেসে। অলকা বুঝতে পারে নি, সে মুগ্ধার মত দাঁড়িয়ে ছিল। সে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছে।

মঞ্জরী।

গোরাবাবু এসে ঢুকল, সকলে চলে যাচ্ছিল, গোরাবাবু বললে—বায়না। কাল। একটা নয় দুটো। দুটোই দুশো পঁচিশ করে, আসব খরচ পাঁচশ, সাব বাস। নিচ?

গোপালও পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃদু মৃদু হাসছে, কিন্তু সে হাসি কেমন বোকা-বোকা। আশা ফিসফিস করে বললে গোপালীকে দু জনকে গাঁজা একসঙ্গে খেয়েছে, হাসিটা দেখ ক্যাবলার মত। মরণ!

গোপালী খিলখিল করে হেসে উঠল।

-কিন্তু এদের থিয়েটার পক্ষ খুব রেগেছে। বলছে ওদের প্লে এর পর নরবে না। আর ওরা চাচ্ছে অলকাকে। ওদের দুটো অঙ্কে যদি দুটো নাচ দেয় টাকা দেবে। চল্লিশ টাকা। কি বলব?

-তা—

—যাক। ওর কিছু হবে। কি বল?

—বেশ।

পরের দিন অন্য দুটো কারখানায় দুটো অভিনয়। ওই একই বই। এক বই নইলে দু জায়গায় গাওনায় অসুবিধে অনেক। সাজগোজ সব পাল্টাতে হয়। এ প্লেতে যে যুবক সে হয়তো অন্য প্লেতে বুড়ো। একজন এক প্লেতে অনায কি দৈত্য—গতবার থেকে মঞ্জরী অপেরার দৈত্য অনায এদের পেন্টে নীল রঙ মিশিয়ে নীলচে করে রঙ—। তাকে অন্য বইয়ে দেবতা সাজতে হলে পেন্ট তুলতে হয়। তারপর পালার একসেসেরিজ মানে জিনিসপত্তর।

তারপর পোশাক, হাঙ্গামা অনেক। এক প্লে হলে, এক জায়গায় প্লে শেষ করে সেই মেক-আপ নিয়েই অ্যাকটর অ্যাকট্রেসরা চলে এসে সাজঘরে নেমে পনের মিনিটের মধ্যে নেমে যেতে পারে। যারা বাদ্যযন্ত্রী তাদেরও এক প্লের গান সুর সব তাকে তুলে নতুন প্লের গান সুর তাক থেকে পেড়ে নিতে হয় না। তা ছাড়া দুই কারখানাই নিজে থেকেই গন্ধর্বকন্যা চেয়েছে। দুই কারখানারই লোক এসেছিল দেখতে। তাদের উদ্যোগ শেষ বেলায় সম্পূর্ণ হয়েছে; আগে দল বায়না করতে পারে নি। এখন যুদ্ধের বাজারে কারখানাগুলির ফাঁপি অবস্থা; সব জায়গাতেই যাত্রা হচ্ছে প্রায়। প্রায় সব দলই আজ গাওনা করছে। আর্য অপেরা, নবরঞ্জন, রয়েল বীণাপাণি সব। কারখানা দুটির লোক কয়েক জায়গাতেই যাত্রা শুনেছে, এবং টেলিফোন করে নিজেদের কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মঞ্জরী অপেরাকেই বায়না করতে মনস্থ করেছে।

মঞ্জরী একটা প্রায় অদ্ভুত কাণ্ড করলে। এবং নাটক সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানবোধ প্রমাণ করে দিলে। এটা সে বিশ্বকর্মা পূজোর অভিনয়ের পরই বোধ হয় ঠিক করে রেখেছিল। বাবুল বোস রাতুবাবু নাটুবাবু আর বুঁচিদিকে বলে রেখেছিল, সকাল বেলাতেই বাড়ি আসবার জন্যে। বলেছিল, চা খাবেন, আর কথা কিছু আছে আমার।

সকলেই এল। রাতুবাবু সকলের থেকে দেরিতে। বুঁচি বললে—আমার ওখানে গিয়ে একটু বসেই সে কাল বাড়ি চলে গেছে। বাড়ি মানে হাওড়ায় একটা টিনের-চাল-ইটের-দেওয়াল কোঠার দোতলায় এককুঠরী এক আস্তানা।

বাবুল বললে—ইয়েসটারডে থেকেই বিগ ব্রাদারের কেমন মেডিক্যাল্টি মেজাজ হয়ে গেছে। প্লের পর ভাম হয়ে বসে ছিল। অল অব এ সাডেন বলে উঠল লিটল ব্রাদার। বললাম, ইয়েস বিগ ব্রাদার। বললে, কি ফিল করছ, বল তো? বললাম, ভাদ্র মাস তো, বড্ড গরম ফিল করছি। অ্যাণ্ড পান বেশী হয়ে গেছে, বিলকুল সব পো পো রীল করছে। বললে, রাবিশ। তুমি একটা পথল সেটান। প্রেম ফিল করছ না? বললাম, না। বিগ ব্রাদার বললে, আমি ফিল করছি, প্রেম ছাড়া কিছু নাই কেহ নাই। ইচ্ছা হয় প্রেম লাগি সন্ন্যাসী হইয়া যাই। প্রেম ছাড়া সব মিথ্যা। বললাম, বুঁচিদিকে ডাক? বললে, তুমি একটি উল্লুক। নইলে অলকার প্রেমে পড না? আমি চেপে গেলাম জাঁহাপনা। দিলদার সব পারে—এভরিথিং। এনিথিং। বাট্ প্রেম নট্। ওর থেকে টাইফয়েড, টি-বি ভাল।

সকলে হেসে উঠল। রাতুবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ভাগো, বহুৎ দিয়া হ্যায়। যাও, যাও।

রিক্‌শায় টুন টুন শব্দ উঠল। রিক্‌শাওলাকে বকছে। তারপরই গলা শোনা গেল—"এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে। রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে!" নটবরের জয় হোক। কি পালাই গেঁথেছেন নটবর! "ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, ধন্য তোমার রাধাপ্রিয়া, তোমারে বেঁধেছে ভাল রাঙাচরণ ধরাইয়া!" সিঁড়ি শেষ করে উপরে উঠে বললে—ওয়াণ্ডারফুল স্যার, নেশা লেগে গিয়েছে কাল থেকে। ইচ্ছে হচ্ছে বিবাগী হই

সকলে হেসে উঠল। গোরাবাবু বললে—বাবুল বলছিল। কিন্তু—

—বলুন। কিন্তু। দাঁড়ান, আমার কিন্তুটা সারি। শিউনন্দন বাবা, আমাকে একটু বোতলপানি দাও। চা চলবে না। কাল প্রেম প্রেম করে প্রেফ গিলেছি। মাথা কষে আছে। পেট জ্বলছে। খাই নি পর্যন্ত কিছু।

– এই নিন খান।

মঞ্জরী একখানি প্লেট এগিয়ে দিলে, শিঙাড়া কচুরি মিষ্টি সাজানো প্লেট একটা টেবিলে আগে থেকেই নামানো ছিল।

শিঙাড়া তুলে মুখে পুরতে গিয়ে থেমে বললে রীতুবাবু—তুটো ডিম আমাকে দে। তারপর বলুন দয়াময় কি বলছিলেন?

গোরাবাবু বললে- -বলছিলাম দোহাই আপনার, এখন সন্ন্যাসী বিবাগী হয়ে মঞ্জরী অপেরাকে ডোবাবেন না।

শোভা বলে উঠল—প্রেম করে সন্ন্যেসীই বা হতে হবে কেন গুণমণি? ভালবাসলে ভাল-বাসাতে আমিও জানি, বুঁচিও জানে গো।

রীতুবাবু বললে- উঁহু, প্রেম করে সন্ন্যেসী সন্ন্যেসিনী হতে হবে। না হলে যাচাই কিসের? আর প্রেমের মাধুর্য কোথায়?

বুঁচি বললে রক্ষে কর। সন্ন্যেসিনী হতে পারব না বাবা। কি গো গোরাবাবু, বল না। তার দরকার হয়? সন্ন্যেসীকে ফিরিয়ে আনি আমরা। নয়?

বাবুল বলে উঠল— রাইট, রাইট, রাইট। ডার্ক নাইটে ব্রাইট ল্যাম্পের ইশারায় টেনে এনে বলে, পথিক এস। কাম ইন ভ্যাগাবণ্ড!

—হুঁ, যে যায় সে খতম। ঘরে গেলেই গলায় দড়ি বেঁধে ভেড়া বানায়।

—যে যায় না, সে কি বলে জানেন? গোরাবাবু বললে।

—হুঁ, অয়ি পাপীয়সী!

—না না না। "সময় যেদিন হইবে সেদিন যাইব তোমার কুঞ্জে।"

—বহুৎ আচ্ছা। ভাল মনে পড়িয়েছেন। কাল বুঁচিও তাই বলেছে আমাকে। আমি বললাম, বুঁচি, ভালবেসে সব ছেড়েছুড়ে কোথাও গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে থাকি গে চল, যাবে? বললে, এখন না। আরও বয়েস হোক। আমি চলে গেলুম। ভাবলুম, রাত্রেই চলে যাব। কিন্তু পারলুম না, ভয় করল। উঠলুম গিয়ে হাওড়ার কোটরে। এক টাকা ব্ল্যাক দিয়ে বোতল একটা কিনে আকণ্ঠ গিলে পড়ে রইলুম। নেশার ঘোরে শুধু আপনাকে সেলাম জানিয়েছি। আপনি সত্যিই একদিন সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়েছিলেন।

—সেই জন্যেই গন্ধর্বজ ডটার নিক্‌লেছে।

গোরাবাবু স্তব্ধ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। শরতের নীল আকাশ অতি শুভ্র দিবালোকে ঝলমল করছে। কয়েকখানা সাদা মেঘ দ্রুতবেগে উড়ে যাচ্ছে। গ্রামের আকাশে এ সময় বকের ঝাঁক সাদা পদ্মের মালার পাপড়ি দুলিয়ে চলার মত উড়ে যায়।

রীতুবাবু বললে—আকাশে চোখ তুললেন যে! বলুন কি বলবেন?

—উনি বলবেন। আমাকে বলেছেন কাল।

—আপনি কি বলেছেন ?

—কিছু না। আপনারা বলবেন। আমি অথার। বই কাটা সম্পর্কে আমার ভুল হতে পারে।

—তা হলে বলুন প্রোপ্রাইট্রেস !

মঞ্জরী বললে—সে হিসেবে আমি বলছি নে। আমি অ্যাক্‌ট্রেস, বইয়ে হিরোইন, আমি সেই হিসেবে বলছি। আমার সিন চারটে, তার মধ্যে দুটোতে সখী আছে। অলকার পার্ট। ওর আরত্তি নৃত্য ঠিক আছে। নাচে খুব ভাল। আমার স্থির হয়ে আরতির ডালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভালই আছে। কিন্তু আমার গানের পর মা কুসুমিকা ঢোকে। তার সঙ্গে মালবিকার কথা হয়, জন্মকথা। সেখানে সখী থাকবে কেন ? আমার খুব অস্বস্তি লাগে।

রীতুবাবু বললে—কথাটা তো ঠিক বলেছেন। নিশ্চয় অস্বস্তি লাগবার কথা।

গোরাবাবু বললে—শেষটায় ওর কাজ আছে, কথা আছে। জয়ন্ত স্বর্গপুরীর দৌত্য নিয়ে যাবার পথে নারায়ণের মন্দিরে প্রণাম করতে ঢুকেছে, তাকে দেখে মালবিকা মুগ্ধ হয়ে বলছে, এ কি, অপরূপ রূপ ! নারায়ণ ? এ কি, নারায়ণ এসেছেন ছলিতে আমায় ! সখি, সখি !

তখন কৌতুক করে সখী মঞ্জুলিকা বলছে, চোখ ধুয়ে ফেল সখি, চোখ দুটো কুঁজোর জলে ধুয়ে ফেল। মালবিকা বলবে, কেন ? ও বলবে, জ্যোৎস্নার মায়া ধুয়ে যাবে। মালবিকা বলবে, জ্যোৎস্নার মায়া ? এ—এ আমার ভ্রম ? মঞ্জুলিকা বলবে, নইলে ও মানুষ দেখতে পাচ্ছ না ? মালবিকা বলবে, না না না। ভ্রম নয়, ভ্রম নয়, মায়া নয়, মোহ নয়। বাধা দিয়ে মঞ্জুলিকা বলবে, দেখছ না দুটো হাত ! দেবতা হলে কমপক্ষে চারটে হাত হত। বানর হলে লেজ থাকত। অপ্সরা হলে ডানা থাকত। এগুলো নাটকের অঙ্গ। তা ছাড়া রিলিফ। লোকে হাসে।

—আরও হাসির দরকার আছে বিদূষকের ওপর ? তা ছাড়া মালবিকার মোহ নয় এটা। এটাতে সে সত্যিই নারায়ণকে দেখছে জয়ন্তর মধ্যে। সুতরাং ওটা বাদ দিলেই নাটক আরও ফুটবে ! সাবিত্রী সত্যবান মনে আছে ? সেখানে দুজন দুজনকে দেখে বিহ্বল হয়ে যায়। ভুলে যায় সব। সেখানে কমিক ঢোকালে সেটা থাকে ? বলুন মাস্টারমশাই ?

—তা দেখুন না—আজ ওটুকু বাদ দিয়ে।

—নাটুবাবু ?

—আমার তো আপনার কথা খুব সত্যি মনে হচ্ছে।

—বুঁচিদি ?

—তুমি হিরোইন, তুমি নিজে যখন অসুবিধা বোধ করছ, তখন কাটাই উচিত।

—আমার মন রেখে বলছ না তো ?

—না না না। আমার সেই উষাহরণ প্লের কথা মনে পড়ছে। উষা সেজে নাকাল হত আমার এমনি একটা সিনে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে প্রথম দেখার সিন।

মঞ্জরী এবার শোভাকে জিজ্ঞাসা করলে—শোভাদি ?

শোভা বললে—আমি ভাই অতশত বুঝি নে। তোমাকে নিয়ে বই—অসুবিধে হলে বাদ দাও। কিন্তু ভাই, মেয়েটা সুন্দর সাজে তো, আর চটপটে খুব। ঘুর-ঘুর করে, ফষ্টিনষ্টি করে বেশ। বেশ রসিয়ে দেয়। তেল-ঝোলে, ধানি কাঁচা লঙ্কার জিভে ঠেকে চিড়িক মারার মত—বেশ চিড়িক দেয়।

—বাবুলবাবু?

—অ্যাঁ?

—আপনি?

—বললে তো ঠাট্টা করবেন?

– কেন?

—বলবেন অলির প্রেমে পড়েছি।

—তা বলব না।

—মেয়েটা বড় দমে যাবে। হয়তো কেঁদেই ফেলবে শুনে।

গোরাবাবু বললে—তুমি বুঝিয়ে বলো দিলদার। ওর নাচ বাদে পার্ট বাদই পড়ল।

মঞ্জরী বললে—সতীতুলসীতে ওকে কৃষ্ণ দিয়েছি। ভাল পার্ট। জনাতে মোহিনীমায়া পেয়েছে। বরং গন্ধর্বকন্যায় প্রথম নাচ আশা বংশীর বাদ দিয়ে ওকেই দেব। তা ছাড়া কাল ওকে থিয়েটারে নাচতে দিয়েছি। অবিচার আমরা একটুও করি নি তার ওপর—

—তাই হল। আসর শেষ করুন। রাত্রে দুটো প্লে। রীতুবাবু কথাটা শেষ করে দিলে।

ভেঙে গেল আসর। যে যার চলে গেল। লরি বাস আসবে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। ছটায় রওনা। সাড়ে সাতটায় প্লে শুরু। প্রথম আসর নারকেলডাঙায়, দ্বিতীয় আসর বরানগরে। সেখানে পাশের কারখানায় সন্ধ্যে থেকে নিউ শান্তা কোম্পানির থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি। প্লেতে খুঁত এতটুকু হলে চলবে না।

তা হলও না। মঞ্জরীর কথা আশ্চর্যরকম ফলে গেল। সখীর পার্টটুকু বাদ দেওয়াতে হিরোইন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং মিলনান্ত হয়েও যে একটি পবিত্রতার সুর সাদা গন্ধপুষ্পের মত মাখানো আছে আখ্যানবস্তুতে—সেটি গন্ধে এবং বর্ণ-শুভ্রতায় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অলকা শুধু গম্ভীর হয়ে গেল। একবারও সে নিজে থেকে মঞ্জরীর কাছে এল না। মঞ্জরী তাকে বোঝালে মিষ্ট কথায়। সে শুধু বললে ঠিক আছে। যেমন বলবেন তেমনি করব। দুঃখ কিসের?

কথাগুলি প্রাণহীন। মঞ্জরী দুঃখ পেলে, বুঁচি ছিল সেখানে, তাকে বললে—বেচারীকে দুঃখ দিতে হল। কি করব।

প্লের শেষেও মঞ্জরী অলকাকে ডেকে বললে—দেখলে?

—হ্যাঁ।

—ভাল হল না?

—হয়েছে। অনেক ভাল হয়েছে। এর পরেরটা আরও ভাল হবে।

—মানে ?

– মানে, ঐ প্লেতে তো কেটে প্রথম পে। দ্বিতীয় প্লেতে আরও ভাল হবে নিশ্চয়।

তাই হল। বাত্রি তিনটেতে প্লে ভেঙে দল ফিরল মহানন্দে। শাহা কোম্পানি পাশের কারখানায় খুব মারামারি খুনোখুনির পালা 'উত্তরা' করে গেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শেষ। বিয়োগান্ত করুণ রসের বই। লোকে কেঁদেছে। তবুও এই প্লে লোকের বড় ভাল লেগেছে। রূপকথার মত। ও কারখানা তিনখানা মেডেল দেবে। এ কারখানাও চারখানা মেডেল দিতে চেয়েছে। মালবিকা জয়ন্ত বিদূষক আর অলকাও পেয়েছে তার সুন্দর নাচের জন্য।

মঞ্জরী বলেছিল, খুশী হয়েছ এবার ?

অলকা বিচিত্র প্রশ্ন করেছিল, মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আপনারা বলে দেওয়ালেন নাকি ?

—এ কথা বলছ কেন ?

—মনে হল তাই বললাম।

গোরাবাবু তার পিঠ চাপড়ে বললে—বি এ স্পোর্ট। এ সব সন্দেহ কেন ? আমি নায়ক পক্ষ হলে তোমার জন্যে গোল্ড সেণ্টার মেডেল দিতাম। নাচ তোমার অপূর্ব হয়েছে। এবং আমি বলছি, সতীতুলসীতেও তুমি মেডেল পাবে। কলিয়ারী অঞ্চলে চল না। দেখবে মেডেল দেওয়ার বহর। কম্পিটিশন।

গাড়ি এসে দাঁড়াল চিৎপুরের আপিসে। রাত্রির বেশী নেই। বাকী রাত্রিটা প্রায় সকলেই এখানে কাটাবে। গোরাবাবু মঞ্জরী তাদের সঙ্গে শোভা বুঁচি চলে গেল বাড়ি।

অলকা বললে—ট্যাক্সি পেলে বাবুলদা আমি চলে যাই।

—কিন্তু এত রাত্রে ট্যাক্সি কোথায় ?

গোরাবাবু বললে—কাল সকালে হিসেবপত্র করে বেলা দশটা নাগাদ যাবেন গোপালবাবু, তার আগে নয়।

বারো

দলের লোকের মাইনের হিসেব। এখন থেকে পূজো পর্যন্ত বায়না নেই। পূজো পর্যন্ত ছুটি। প্রায় সকলেই বাড়ি যাবে। মাইনে নিয়ে যাবে, পূজোর কাপড়চোপড় কিনবে, বাড়ির কাজকর্ম দেখবে। মফস্বলের লোকদের অনেকে গৃহস্থ বাড়ির ছেলে। যোগাবাবু নাটুবাবুর মত আরও কয়েকজন গৃহকর্তাও আছে। আশ্বিন মাস—চাষবাস একটু দেখবে। দোকানদারির দেনা মেটাবে। মাইনেতে আর কত হয়। হয়তো ধার-দেনাও দেখতে হবে। এখন কেউ কেউ দাদনও নেবে। হিসেব তারই।

শহরের লোকেরাও নেবে। তাদেরও পূজো আছে, খরচ আছে। রাতুবাবুর মত আর কজন ? কেউ নেই। রাতুবাবুরই কিন্তু বেশী খরচ। এবার তো বুঁচিকে একখানা দামী কাপড় দেবেই। আজও সে এদের সঙ্গে গেল না। আপিসেই থাকল। বিড়বিড় করছে।

প্রেমের নেশা লেগেছে এই বয়সে। তা লাগুক। সন্ন্যাসী হবে না। তবে নতুন একটা স্বাদ পেয়েছে। পটলীচাকুর সঙ্গে সেও এককালে ঘর বেঁধেছিল। প্রেম তার মধ্যেও ছিল? ছিল বইকি। কিন্তু এতে যা আছে তার কোন্‌টুকু যে ছিল না, তা বলতে পারবে না। তবে ছিল না, বেশ কিছুর অভাব ছিল। এই বইটা তো শুধু বই নয়, এর সঙ্গে গোরাবাবু মঞ্জরী এমন ভাবে মিশে আছে—যাতে বইটা সত্য হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, রথের দিন গোরাবাবু হঠাৎ বক্তৃতা, আবৃত্তি করেছিল। বুদ্ধদেব নাটকের মারের বক্তৃতা, মনে পড়েছিল সে নিজে একবার পার্টটা করেছিল। এই ধরনে জোরালো ভিলেনের পার্টে তখন ঝোঁক ছিল তার। মানুষকে মাতিয়ে অ্যাক্‌টিং করা যায়, নিজেরও বেশ মাতন লাগে।

—মৃত্যুপথযাত্রী ওরা—

তাই বটে। মৃত্যুপথযাত্রী অবশ্য সবাই, মরবে না আর কে? কিন্তু, তবু সকল মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। বাউণ্ডুলে মন—কোথাও স্থির নয়; দিন দিন নয়, রাত্রি দিন। মানুষের মনে যা আনন্দ দেয়, বিচিত্র বিচিত্র কথা ঘটনা—তারা বলে ঘটায় অভিনয় করে, রাত্রিকালে আলো-ঝলমল আসরে, দিনের আলোয় সব ঝুটা হয়ে যায়। হয়তো সবই ঝুটা। সবই মিথ্যে।

অনেক টাকা যদি হত বা থাকত রাঁতুবাবুর, তা হলে একটা ভাল দল করত। আর সব বাউণ্ডুলেকে খানিকটা স্বস্তি শান্তি দেবার ব্যবস্থা করত।

করেছিল—বাগবাজারের একজন। হাঁ, ওই সব মানুষই পারে। গরীব মজুর মানুষ ছিল। হাওড়ায় বার্নের ডকে জাহাজ মেরামতি রিপিটিং করত। একখানা জাহাজ এসেছিল, ফোরম্যান বলেছিল তিন চার দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে জলে নামিয়ে দেবে। কনট্রাক্‌টার বলেছিল, অসম্ভব। যাতে অন্তত দশ দিন লাগবে তা তিন চার দিনে হয় না। হতে পারে না। আমি পারব না। ডকের ফোরম্যান এই লোককে ডেকে বলেছিল—তুমি কাজের লোক যোগাড় করতে পার? তিনগুণ লোক! পারবে? সে বলেছিল, পারব। সাহেব বলেছিল, বাস, তুমি কনট্রাকটার কাম্ তুলে দাও। সে এবার পিছিয়ে বলেছিল, সাহেব, কনট্রাক্টে বিনে টাকা। আমি এদের দেব কি? কাজ করবে—দিন আনে দিন খায়। সাহেব অ্যাডভান্স ঢেলে দিয়েছিল। মজুর মানুষ—তিন দিনে কাজ তুলে কনট্রাক্টর হয়ে গেল। বাঁধা কাজ। তার শখ হয়েছিল যাত্রাদল করবার। করেছিল। এবং দলের লোকের সব অভাব সে মেটাবার ব্যবস্থা করেছিল। যে আসামী এসে দাঁড়িয়েছে, বাবু বিপদ!—সে বলত, ভয় নেই। টাকা চাই? নিয়ে যা টাকা। লোকের ঘরের খোঁজ করে বলত—দাও হে, ওর মাগ ছেলে উপোস যাবে, টাকা পাঠিয়ে দাও। ও এখানে একটা খানকী নিয়ে থাকে—ওকেও টাকা দিও, বন্ধ করো না, মেয়েটারও তো পেট আছে, পেটের জ্বালায় খুনোখুনি করবে। নীলকণ্ঠ মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিল, তো বলেছিল—প্রভু আপনি সাধক সিদ্ধ ভক্ত, আমাকে আশীর্বাদ না করে যারা যাত্রা করে তাদের আশীর্বাদ করুন যেন শান্তি পায় বেটারা।

শান্তি! শান্তিই বা কি বস্তু? তার জীবনে শান্তি নেই নাকি? বুঝতে তো পারে না। বেশ তো আছে। দুঃখ আছে। টাকা নেই অনেক। হাঁটতে হয়। গরম লাগছে ভাদ্র মাসের গুমোটে, অসুখ করে, দাঁত নড়ছে; এবার পড়বে। মাথা ধরে। কিন্তু অশান্তিটা যে কোথায়? এই এখন প্রেমের নেশায়—ওটা পায় নি বলে মনে কেমন একটা কি হচ্ছে, বুঁচির বাড়ি যেতে ভাল লাগছে না, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, কিন্তু দিন কতক—দিন কতক গেলেই ওটা যাবে।

—মাস্টারমশাই আপনি এখানে? গোপাল ম্যানেজার ছাদের কোণটায় এসে হাজির হয়েছে। এ পাশটায় রীতুবাবু একা বসে আছে একটা মাদুর পেতে। কতকগুলো মাদুর এখানে কিনে রেখেছে দল থেকে—রিহারশ্যালে পেতে বসা হয় আবার এমনি গাওনার রাতে পালা-শেষে এক একজন এক একখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। নাটুবাবু, রমণী নাগ এদের নিজের আছে। নাম লেখা। যে-সে মাদুরে শুতে পারে না। রীতুবাবুর ও বালাই নেই। তবে সে তো বড় এখানে রাত কাটায় না। বেশীর ভাগ কর্তা গিন্নী নিয়ে যায়। আজ সে কিছুতেই যায় নি।

গোপাল বললে—আপনি এখানে?

—নিশ্চয়, এ কথা কেউ না বলতে পারে না। ক্ষীরোদপ্রসাদের পদ্মিনী নাটকের কথা, কথাটা বেরিয়ে গেল আপনি মুখ থেকে।

গোপাল বললে—আমি আপনাকে খুঁজছি। একবার ছাদে এসেছিলাম, তা এ কোণে বসে আছেন কি করে জানব?

—কিন্তু ব্যাপারটা? ম্যানেজার, এত রাত্রে খুঁজে বেড়াচ্ছ? সন্দেহ করেছ লুকিয়ে প্রেম করছি?

—রাধে রাধে! কি যে বলেন!

—তবে?

—ছেলেটার বড় জ্বর। উ-আঃ করছে! কি করি বলুন তো?

—কার? তোমার নিতুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জ্বর?

—খুব জ্বর। ঠিক-দিশে নেই। জ্বর নিয়েই গান করেছে তো!

—এত রাত্রে কি করবে? মাথাটা ধুয়ে দাও। আর অ্যাসপিরিন-টিরিন থাকলে আধখানা খাইয়ে দাও। স্টকে আছে তো?

—আছে।

—তবে তাই দাও। আর আমাকে একটা দিয়ে যাও হে।

গোপাল চলে গেল। রীতুবাবু একটু হাসল। এই এক ব্যাপার যাত্রার দলে। ব্যাপারটা বোঝে সে। এতেও একটা রঙ আছে। ছোঁড়াগুলো রঙ মেখে চুল কাঁচুলি পরে মেয়ে সেজে মেয়েলিপনা করে, প্রেমের অভিনয় করে, গান গায়, নাচে—তখন নেশা ধরে। আর এ তো

নেশার রাজ্য। নেশা আর ছোটে না!

মনে পড়ে গেল তার প্রথম জীবনের কথা। দলের সঙ্গে বেরিয়েছে মফঃস্বলে। দিনের বেলা সকলে ঘুমুচ্ছে, তার ঘুম আসে নি। তখন সে তরুণ নায়ক। কিসের জন্যে ঘুম আসে নি মনে নেই। পাশে ম্যানেজার। শেষে চোখটি জুড়ে এসেছে, জোড়টা ছেড়ে গেল কান্নার আওয়াজে। কে কাঁদছে। উঠে বসে দেখলে, একজন অ্যাক্টর একটা বারো চোদ্দ বছরের ছোঁড়াকে নিঃশব্দে মারছে। ঘাড় ধরেছে। ছেলেটাও চিৎকার করে না, শুধু যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে কাঁদছে।

সে বলেছিল—ও কি, মারছেন কেন? ও মশায়?

সে লোকটি ফিরে তাকিয়ে তাকে তুচ্ছ করে আবার ঘাড়টা তার নুইয়ে দিয়েছিল।

ম্যানেজার অকস্মাৎ মাথা তুলে উঠে বলেছিল, শুয়ে পড়ুন মাস্টারমশাই। ও যা করছে করুক।

—সে কি কথা? একটা ছেলেকে—এইভাবে—

—আরে মশাই দয়া করে অধমের কথাটা শুনুন! চোখ বুজে থাকুন, দেখবেন না ওসব। ও সব—। বলব, পরে বলব। আপনি নতুন মানুষ, নিজেই জানবেন পরে।

কথাটা সে শুনেছিল, শুয়ে পড়েছিল। শোনা কথা মনেও পড়েছিল। আরও মনে পড়েছিল, ছোঁড়াটা সখীর দলের মুখপাত।

পরে বলেছিল ম্যানেজার। যাত্রা জীবনের ব্যাধি!

ছোঁড়াটা আবার সন্ধ্যেবেলা তাকে প্রণাম করেছিল হঠাৎ। জিজ্ঞাসা করেছিল—প্রণাম কেন রে?

—এই নতুন জামা রুমাল হয়েছে আমার।

ঠিক মেয়েদের গয়না হলে প্রণাম করার মত।

গোপালের ওই বাচ্চাটার উপর আশ্চর্য মমতা। যাত্রাদলে সবাই তাই মনে করে। তবে কেমন সন্দেহও হয় রীতুবাবুর। আর হলেই বা কি!

মৃত্যুপথযাত্রীদের জটলা। বাজারের মধ্যে কালোবাজার, সন্ন্যাসের মধ্যে ভণ্ডামি, মানুষের মধ্যে চুরি ডাকাতি, মেয়ে-পুরুষের মধ্যে—তার মত পুরুষ, বুঁচির মত দেহব্যবসায়িনী বাদ দিয়েও—কত পাপ! যাত্রার দলে এ পাপ বল, ব্যাধি বল, প্রবেশ করে বসে আছে কালের মধ্যে কলির মত, খাদ্যের মধ্যে বিষের মত, পথের ধারে মদের দোকানের মত; সংসারের মধ্যে অভাবের মত, জীবনের মধ্যে দুঃখের মত, দুশ্চিন্তার মত; মনের মধ্যে হিংসার মত; লোভের মত। মত কেন? বিকৃত জীবন, বিকৃত প্রেম-কামনা, বিকৃত দেহলালসা!

গোপাল ফিরে এল—নিন মাস্টারমশাই। এক গ্লাস জলও এনেছে।

—দাও।

—জল এনেছি, জল দিয়ে খাবেন, না—

—মদ ফুরিয়ে গেছে।

—এনে দেব?

—না হে। মনটা এখন আকাশে উড়ছে, ফটিক জল—ফটিক জল করছে।

—তেষ্টা পেয়েছে?

—পেয়েছে। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না।

জল দিয়ে অ্যাসপিরিন খেয়ে নীতুবাবু বললে—বোস, অলকা এখানে রয়েছে না?

—হ্যাঁ। মঞ্জরী মা বলে গেলেন, ওদের অভ্যেস নেই—ওদের একটু যত্ন করতে। বাবুল মাস্টার পুবের বারান্দায় শুয়েছে। অলকা ঘরে আছে। আশা গোপালী আর ওই ছোট মেয়েটাকে ছোট ঘরটা দিয়েছি। অলকা তক্তপোশে শুয়েছে।

—প্রোপ্রাইট্রেস ভাল লোক।

—তা—একবার!

—তোমাকে একটা কথা বলব? তুমিও ভাল লোক। নইলে বলতাম না।

—নিতুর কথা বলবেন তো?

—তুমি তো বোঝ সব গোপাল—তবে?

গোপাল চুপ করে রইল। নীতুবাবু বললে—ওর থেকে তুমি মেয়েছেলের সঙ্গে সংসার পাত না কেন? এই বয়সে সেবা-যত্ন পাবে!

—মাস্টারমশাই!

—বল!

—ছেলে—বাচ্চা ছেলেকে ভালবাসলে কি ওই হতে হবে?

নীতুবাবু চমকে উঠল, আরক্ত চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করে বললে—গোপাল?

—ওকে আমি ছেলের মত ভালবাসি।

—ছেলের মত?

—ও আমার ছেলে মাস্টারমশাই—

—আমার গা ছুঁয়ে বলতে পার? তবে ও তোমাকে বাবা বলে না কেন? দোষ কি?

—আপনার গা ছুঁয়ে বলছি। তবে ও আমার পরিবারের ছেলে। আমার নয়। তাই ওর বাবা ডাক শুনলে আমার গা টা ঘিনঘিন করে ওঠে। কেউ জানে না। বলতে পারি না—আজ বললাম যখন তখন সবটা বলি শুনুন।

—বল—শুনতে শুনতে বাকী রাতটা কেটে যাক। যাঃ!

—কি হল?

—আকাশে একটা তারা খসে গেল হে!

তারপরই হঠাৎ বললে—অলকা কোথা হে?

তারপর আবার বললে—না থাক, তোমার কথা বল। শুনি—তোমার একথা গোপাল, আমার কাছে আজ অমৃতসমান মনে হচ্ছে। শুনলে পুণ্যবান হব, বল!

—ডালিমের কথা তো জানেন? ত্রৈলোক্য মায়ের দলে ওরই টানে ঘর ছেড়ে এসে ঢুকেছিলাম।

—সে-কাহিনী ভুবনবিদিত।

—ভাসিম মরে গেল। আমি কিছুদিন ছুটে চরে বেড়িয়ে—গণেশ অপেরায় ম্যানেজার। হঠাৎ কি খেয়াল হল বিয়ে—

বাধা পড়ল।

—বিগ ব্রাদার!

ছাদের দরজায় বাবুল বোস ডাকলে। গোপাল থেমে গেল। হঠাৎ সিঁড়ির ঘরটার কোণ ঘুরে বাবুল সামনাসামনি দাঁড়াল।

রাতুবাবু ডাকলে—ইয়েস ব্রাদার।

—এখানে? কাউন্টিং স্টারস্?

—শুনছিলাম, হঠাৎ একটা খসে যাওয়ায় ক্ষান্ত দিলাম। তারপর গোপালের সঙ্গে গল্প হচ্ছে। ও এসে পড়ল।

—হোয়াট গল্প? চলুক তাই। আমার ঘুম হল না—নাকের ডাকের শব্দে। অনেকক্ষণ থেকে—কিন্তু প্রথম ঘরে মেয়েরা স্লিপিং, দরজা বন্ধ, আসি কি করে? লাস্ট, অলকাকে ডেকে দরজা ওপেন করিয়ে উঠে এলাম। ওটাও ঘুমোয় নি।

—কি ব্যাপার?

—আই থিঙ্ক আজকের ব্যাপার। মেডেলে বেদনা মরে নি। হয়তো ছেড়ে দেবে।

—মেয়েটার পার্টস্ আছে হে।

—ছাড়ান দ্যান ওর কথা। বলুন গোপালবাবু কি বলছিলেন।

—অ্যাঁ? গোপাল ভেবে পেল না কি বলবে। সে কথা—

রাতুবাবু বললে—ধর, কলকাতায় মহাষ্টমী-নবমী দুটো করে চারটে। দশমী বাদ দিয়ে একাদশী-দ্বাদশী দু দিনে দু রাত্রি। একদিন বোধ হয় দক্ষিণেশ্বরে। না?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

গোপাল বাঁচল। সে বললে—তারপরই কলকাতা থেকে মফস্বল। কোজাগরীতে বরাকর বাজারে দু রাত্রি। তারপর আসানসোলে আড্ডা। কালীপুজো পর্যন্ত বাঁধা বায়না নেই। দু-চারটে ধরতে হবে। রাণীগঞ্জ অণ্ডাল কাজোড়া, ওদিকে কুলটী বার্নপুর। কাঁচা পয়সা! দু-চার রাত্রি হবে, বসেও থাকতে হবে দু-চার দিন। তারপর কালীপুজো থেকে নাগাড় দশ দিন। কালীপুজো থেকে চার দিন তো দুটো করে। শেষ হবে সায়েব কলিয়ারীতে—সেখানে তিন দিন গাওনা। আপনি তো জানেন ওদের। এবার আবার বেশী ধুমধাম, বিলেত থেকে সাহেব আসছে। তাকে যাত্রা শোনাবে।

রাতুবাবু বললে—ওদের দিল খুব বড। একদিন খাওয়ায়—সে খুব উঁচু দরের খাওয়ানো।

রাস্তায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠল।

রাতুবাবু পূব-আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে—ভোর হয়ে গেল?

ময়লাফেলা গাড়ি চলছে রাস্তায়।

—বাবুলদা!

অলকাও উঠে এসেছে বাবুলের খোঁজে।

—ইয়েস!

—দেখ না একখানা ট্যাক্সি রিক্শা যা হোক।

—ডেস্পারাস। মাই ফাদার! এই ভোরে বেরিয়ে লালবাজার লকআপে যাই!

—কেন?

—পথে পুলিস ক্যাচ করবে—বলবে ইলোপ করে নিয়ে যাচ্ছ! ওয়েট—

—বাবাঃ! জান আমি মরে যাচ্ছি! সারারাত ঘুমুই নি!

—ডোণ্ট বদার। অভ্যেস হয়ে যাবে দুদিন পর।

রীতুবাবু বললে—যোগামাস্টার একটি ভাল কথা বলে—ওর তো সবই কর্তামশায়ের কথা—তবে এটা হতেও পারে। তিনি নাকি বলতেন, তেল মাখবে আবাথাবা, মানে ঘটিতে হাত ডুবিয়ে এখানে খানিকটা ওখানে খানিকটা থপথপ করে লাগিয়ে পরে ঘষে সমান করে নেবে। চিত হয়ে শোবে বাবা, চিত' হয়ে শুলে জায়গাটা বেশ বসবে। আর থাল দেখে পাড়বে পাত, মানে মাটি খাল থাকলে ডাল ধরবে বেশী। তবে খাবে কালদমনের ভাত। কালদমন কালীয়দমন মানে কৃষ্ণযাত্রা। তখন তো সবে শখের যাত্রা হচ্ছে। কালীয়দমন কৃষ্ণযাত্রাই তখন যাত্রা ছিল। এতে অনেক কষ্ট অলকা। কষ্ট কলঙ্ক—অনেক কিছু। এই ভোরবেলা—মেজাজটা রাত্রে আজ আকাশে উড়েছিল! একটা তারা চোখের সামনে খসে গেল। তোমার মুখটা মনে পড়ল। গোপালকে বললাম, অলকা কোথায়! তারপরই ভাবলাম, যাক গে, যে খসবে সে খসবে। বললাম, না, থাক। অন্য কথায় চলে এলাম। তা তুমি এলে, এই ভোরবেলা, সারারাত্রি ঘুমোও নি—মায়া লাগছে। তুমি এ রাস্তা ছাড়।

অলকা বললে—না রীতুবাবু—

—এই, শাট আপ!

—কেন? কি করলাম? অলকা বিস্মিত হয়েই বললে—কিন্তু ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ হল না, বাবুলকে সে জানে।

বাবুল বললে—মাস্টারমশাই সে—কর। মানে সল।

—তাই। এখনও রপ্ত হয় নি। হয়ে যাবে। তবে ফেরা আর আমার হবে না মাস্টারমশাই। এসেছি অনেকটা। অনেকটা—

—দাগা পাবে। এখনও সপ্তপদী হয় নি। সাতপাকে জড়িয়ে যাও নি যাত্রার সঙ্গে।

—কি জানি ক পা তবে মা বাপ যে দাগা দিয়েছে, তারপর আর কি বেশী দাগা হবে! তবে ছাড়ব। কিছুদিন পর। এখানে নাম করে দেখিয়ে দিয়ে ছাড়ব।

রীতুবাবু বললে—বহুৎ আচ্ছা। তুমি মেয়েছেলে, নইলে বলতাম এই তো মরদ কি বাত! আজ বড্ড লেগেছে না?

অলকা উত্তর দিল না।

শুধু অলকা নয় সবাই চুপ হয়ে গেল। বাবুল বলে উঠল—হরি হে, রাজা কর। মেক

* *

মি এ কিং প্লিজ !

দেখতে দেখতে পূবদিকে আলো ফুটেছে তখন। ট্রাম চলে গেল একখানা। বাবুল বললে —নাও, এইবার ওঠো। ট্রাম বেরিয়েছে। চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে ট্রাম আসবে। কাল আসব বিগ ব্রাদার।

দোতলায় সব আসামীই উঠে বসেছে প্রায়। ঘুম ভাল কাল কারুরই হয় নি। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা রয়েছে, আর রয়েছে একটা করে হিসেব। পুজোর কাপড়, তিরিশ—না, তিরিশে কি করে হবে? যুদ্ধের বাজার। কণ্ট্রোলে কাপড় যে মেলে না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের হাত। তার মর্জি। কেউ কেউ ঘুষ খায়। ব্ল্যাকে কিনতে দাম গলাকাটা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। কারুর বা বিশ-পঁচিশ। কারুর হাল হদিস নেই, পাল দরুনে বাচ্চা। ছিট কিছুটা এখান থেকে কিনতে হবে। কারুর খাজনা আছে দিতে হবে। দোকানের বাকী আছে। জুড়তে জুড়তে তিন অঙ্কে পৌঁছে যায়। কালো যবনিকার মত সব অন্ধকারে ঢেকে যায়। এ টাকা দাদন চাইবেই বা কি করে? মাইনে তিরিশ-চল্লিশ; পঞ্চাশ সাত-আট জনের। শ-দুশো মাত্র ক'জনের। তাদের ভাবনা নেই। এরা ভাবছে। ভাবনায় ভাল ঘুম হয় নি, ভোরে উঠে থেকে ভাম হয়ে বসে ভাবছে, সামনে একটা কালো পর্দা ঝুলছে। যোগা-মাস্টার গুনগুন করে গান গাইছে। কণ্ঠমশায়ের গান—

আমার ঘরে আছে দুই সতীনে—ঝগড়া করে রাত্রি দিনে—
বাড়ির দোরে দুই সতীনে—দান করে তাই আপন গুণে
দুই সতীনে ডুবুক জলে।

কণ্ঠমশায়ের বাড়ির দোরে খিড়কি পুকুর দুই সতীনে আজও আছে। ওই পুকুরে বন্যা ঢুকত। সেই বন্যায় কোন্ কালে কোন্ দুই সতীন ঝগড়া করে দুজনেই ডুবেছিল—তাই নাম ছিল দুই সতীনের পুকুর। পুকুর ছিল জমিদারের। জমিদার বাড়ি গাওনা করতে গিয়েছিলেন, জমিদার খুশী হয়ে বলেছিলেন, কণ্ঠমশায়, আপনার যা ইচ্ছে হয় আমার কাছে চেয়ে নিন। আমি ধন্য হই। অবশ্য আমার সাধ্যের মধ্যে হওয়া চাই। কণ্ঠমশাই চেয়েছিলেন ওই পুকুরটি। তাঁরও ছিল দুই বিবাহ। দুই সতীন ছিল ঘরে। যোগামাস্টারের দুই বিয়ে—ঘরে দুই সতীন। আজ দাদনের জন্যে ধরতে হবে, তাই ওই গান মনে পড়েছে। ভাঁজছে।

বাবুল মেঝে পার হয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—ম্যাটারটা কি? গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান, হ্যাঁ—মর্নিংএ উঠেই দুই পরিবারকে স্মরণ? রোজ কর না কি?

—বাবুলবাবু! এই যে অলকা মা গো! আঃ, কাল কি নৃত্যটাই করলে! বাহবা বাহবা! আর কি সেজেছিলে! মুনিজনের মন ভোলে গো।

অলকা লজ্জিত হল। রাগও হয়েছিল, কিন্তু মা বলায় সে রাগের সুযোগ হল না।

—বাড়ি চললেন?

—হ্যাঁ। এস অলকা।

—আসছেন তো দশটার সময়?

—কেন ?

—অ। আপনারা বুঝি দাদন, মানে অগ্রিম নেবেন না ? আজ দশটাতে দেবেন তো। কাল অর্ডার হয়ে গিয়েছে। তা আপনি এলে আমার সুবিধে হত। আমার জন্যে বলে দিতেন। ঘরে দুই পরিজন, দুজনের আটটা বিটি—তার তিনটে মরেছে, পাঁচটা মজুত। একটা বিধবা, ঘাড়ে ফিরে এসেছে। একটা সধবা, তার তর আছে! তিনটে আথও যুবতী এখনও সোঁদা। আবার শখ কত—বলে, বাবা, মানে-না-মানা শাড়ি এনো! একটুকন বলে-টলে দিতেন। রীতু মাস্টার চটে আছেন। আমি রতনপুরের বাবুদের কাছে টাকা নিয়েছিলাম বলে।

—এলে, স্মাল টেল, ওল্ড ব্যাণ্ডমাস্টার! এস।

সিঁড়িতে পিছন থেকে অলকা বললে—তুমি আসবে না ?

—নো। আমি দাদনে নেই।

—তোমার ব্যাঙ্কে টাকা আছে। তোমার ভাবনা নেই। আমাকে আসতে হবে।

—মানে ? অলরেডি টু হাণ্ডে্ড দিয়েছে। আবার আস্ক করবে কি বলে ?

—আমি আস্ক করব না। তুমি করবে আমার হয়ে।

—মাই খোদা! সে আই ওণ্ট।

—তা হলে তুমি সেই একশো টাকা দাও। পুজোর সময় আমার না হলেই চলবে না।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর গাঢ় করে অলকা বললে—আমার যন্ত্রণা তুমি জান না বাবুলদা। আমি চলে আসার পর সব বেচা হয়ে গেছে, মা-বাবা উপোস করছে। বাবা বোধ হয় দু-এক মাসের মধ্যেই যাবে। দু-একদিনও হতে পারে। কিছু টাকা দিতেই হবে। তুমি ভাইদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিঁড়েছ। তারা অভাবীও নয় খুব। এ বাপ মা। আর আমি হাজার হলেও মেয়ে।

প্রগল্ভ বাবুল বোস চুপ হয়ে গেল। নীচে নেমে বললে—চল দোকানটায় চা খেয়ে নিই।

চা খেতে বসে অলকা বললে—তা হলে তুমি দেবে ?

—উঁহু। শ্যাল কাম। কি করব ? পরশু তো থিয়েটারে ফটি পেয়েছ!

—আমার দরকার দু শোর।

—দু শো! নো বডি উইল ম্যারি ইউ!

হেসে অলকা বললে—তুমি তো এভরিবডি নও! দেখো!

—আমি তাদের বলে দেব।

—তবুও তারা বিয়ে করবে।

—মরুক তারা। উইল গো টু হেল! নাও নাও, খেয়ে নাও। ট্রামের শব্দ উঠছে। আজ জুতো ঠিক আছে তো ? এস।

ট্রামে উঠে বাবুল ঘুমিয়ে পড়ল। অলকা ঠিক ঘুমোল না। ঢুলুনির মধ্যে ভাবছিল নিজের কথা। মনের মধ্যে কাল রাত্রি থেকে একটা ক্ষোভ জমে আছে। তার পার্ট বাদ দিয়ে সারা দলের কাছে তাকে ছোট করে দিয়েছে। গন্ধর্বকন্যার হিরোইনের পার্ট কেড়ে নিলে। সে বলতে পারে নি কিছু। সে পারেনি—তা বুঝেছিল। সখীর পার্টটা পেয়ে সে

খুশীই হয়েছিল। এই ধরনের পার্টই তার প্রিয়। গোরাবাবু কথাগুলি দিয়েছিলেন চমৎকার। করেছিলও সে ভাল। লোকে হেসেছিল। সে হাসি বাবুলের ওই ভালগার ভাঁড়ামি শুনে হাসি নয়। সত্যিকারের রসিকতা শুনে হাসি। চিরকুমার সভার মত। মঞ্জরী দাঁড়াতে পারছিল না, অসুবিধে হচ্ছিল। সেটা তার অক্ষমতা, তার নয়। সে হিরোইন—সে প্রোপ্রাইট্রেস, সুতরাং দাও তার পার্টটা কেটে উড়িয়ে। এসপ্লানেডে এসে বাবুলকে ডেকে তুললে সে—ওঠো। এসপ্লানেড।

টালিগঞ্জের ট্রাম দাঁড়িয়ে ছিল, উঠে বসে অলকা বললে—তুমি যদি—

—যদি হোয়াট? থামলে কেন?

—বেনা বনে মুক্তো ছড়িয়ে হবেটা কি?

—মুক্তোর গাছ হবে। বলে ফেল।

—তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে, তবে—

—মাই ভগবান!

—সবটা শোন না। তা হলে দুজনে একটা যাত্রার দল খুলতাম।

—স্কাই ফ্লাওয়ার! তার থেকে দশটার সময় কাম। নিয়ে আসব। অ্যাণ্ড গোরাবাবুকে বলে অ্যানাদার টু হাণ্ড্রেড করে দেব অ্যাডভান্স। আমার ব্যাঙ্কের ওই কটা টাকার দিকে তাকিয়ো না।

—বেশ। কিন্তু যাত্রার দল আমি একদিন করবই তুমি দেখো।

—দেন ক্যাচ রাঁতুবাবু।

—ভাগ্!

—দেন সাট-আপ।

ট্রামটা তখন জগুবাবুর বাজারে এসেছে, একদল লোক উঠছে।

দশটার সময় এসে অলকা অবাক হয়ে গেল। তার থেকেও বেশী অবাক হল বাবুল বোস। দাদনের আসরে লোক নেই, বারান্দাটা প্রায় ফাঁকা, শুধু গোরাবাবু বসে আছে। আর তার সামনে বসে আছে একজন পাগড়ি-বাঁধা লোক।

গোরাবাবু বললে—আরে এই যে! তোমার ওখানে গাড়ি নিয়ে শিউনন্দনকে পাঠাচ্ছিলাম।

—মি? বুকে হাত দিয়ে বললে বাবুল।

—নো। অলকা। ইনি বসে আছেন। কাল রাত্রে উনি আমাদের প্লে দেখেছেন, নারকেলডাঙার ওদের কারখানার সাপ্লায়ারও বটেন—মালও কেনেন। সিনেমায় নামবেন। পৌরাণিক বই। অলকার নাচ ভাল লেগেছে। নাচ দেবেন খান দুয়েক। অলকার সঙ্গে কনট্রাক্ট করবেন। কাল রাত্রে আমাকে আমার জন্যে বলছিলেন। আজ সকালে এসে বলছেন অলকাকেও নেবেন। কি বল? উনি কনট্রাক্ট সই করিয়ে যাবেন। আমি বলেছি দুখানা নাচে পাঁচশো টাকা। উনি বলছেন—দুশো।

বাবুল বললে—রাবিশ !

অলকার চোখ জলজল করছিল, সে বললে—সাড়ে তিন-শো দেবেন। উনি বলেছেন পাঁচশো, আপনি দুশো—সাতশোর অর্ধেক সাড়ে তিন-শো। দেবেন ?

—লিন, সহি করেন। এখুনি এক-শো দিব। বাকী কাম খতমকে বাদ।

—না। মধ্যে আর এক-শো দেবেন। গোরাবাবু বললে।

—সহি।

—আর আমাদের ডেট—রাসের পর, বড় দিনের আগে নয় বড় দিনের পর সরস্বতী পুজোর আগে। কেমন ?

—হাঁ, উ ঠিক আছে।

সই করিয়ে লোকটি টাকা দিয়ে চলে গেল। গোরাবাবুর সই হয়ে গেছে, টেবিলের উপর আড়াই-শো টাকা পাথর চাপা রয়েছে। ওর কনট্রাক্ট হাজার টাকার।

মঞ্জরী এবার বেরিয়ে এসে বললে—এবার খুশী অলকা ? কাল তুমি রেগেছিলে।

লজ্জিত হল অলকা, বললে—না রাগি নি তো ! তবে দুঃখ হয়েছিল।

—হবার কথা। সে বুঝি। কিন্তু বইটার দিকে তাকাতে হবে তো !

অলকা চুপ করে রইল।

বাবুল বলল—ও এসেছিল অ্যাডভান্সের জন্যে।

গোরাবাবু বললে—এই তো হয়ে গেল।

—আমার বাবার অসুখ। বড্ড অসুখ। ভেবেছিলাম ওদের কথা আর কখনও ভাবব না। কিন্তু—

—কত চাই বল ?

—আগে দুশো দিয়েছেন, এখন আরও দুশো চাচ্ছি।

বাবুলের চোখ বড় হয়ে উঠল। কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না। মেয়েটার অবলীলাক্রমে চাওয়াটাকে আশ্চর্য মনে হল তার। কিন্তু কোন সংকোচ হল না অলকার। এবং ঠিক যেন অশোভন মনে হচ্ছে না—সম্ভবতঃ এই সিনেমা কনট্রাক্টটা তার একটা কারণ।

মঞ্জরীই বললে—বেশ, বেশ। তা নিয়ে যাও। আপিসে যেতে হবে না, এখান থেকেই দিচ্ছি আমি। রসিদ একটা আর খাতায় সই পরে করে দিয়ো। জান, ভারী ভাল লাগল তোমার কথা। কি কথা জান ? তোমার বাবার অসুখ—সংসার থেকে বেরিয়ে এসেও আজ না দিয়ে থাকতে পারছ না। ভারী ভাল লাগল।

গোরাবাবু সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। বললে—আমাকে কিছু অ্যাডভান্স দাও না প্রোপ্রাইট্রেস ! আমি মঞ্জরীর জন্যে শাড়ি কিনব।

—আমিও ম্যানেজারের কাছে চাইব, আমাকে দেওয়া হোক—। যত সব ! এস অলকা, ভেতরে এস।

গোরাবাবু বললে—সামথিং হবে নাকি দিলদার ?

—এই দেখুন ! নো অফার তো নো ওয়ান্ট। অফার তো এভার রেডি। তখন সামথিং

মেনিথিং হয়ে যায়।

—শিউনা!

শিউনন্দন হাজির। তবে সে পাকা লোক। মাপ তার কষা। এবং সোডা ব্যবহার করতে সে ভোলে না। হাজির করে দিল সে দুটো গ্লাস।

মঞ্জরী এবং অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মঞ্জরী বললে—তোমার এই তেষ্টা বড় বেড়ে যাচ্ছে।

—অনন্ত তৃষ্ণা গো!

—জলের তৃষ্ণা মেটে। মরীচিকার তৃষ্ণা যে!

—হ্যাঁ, তৃষ্ণা ছোটে—মরীচিকা পিছোয়। তৃষ্ণা থামে—মরীচিকা থামে। তৃষ্ণা পিছোয়—মরীচিকা এগিয়ে আসে। ডাকে।

অলকা বললে—সুন্দর কথাগুলি।

—রাবিশ। হি ইজ অ্যান অথার।

মঞ্জরী বললে—অথার এখন জোরালো করে একখানা বিজ্ঞাপন লিখুন তো! মঞ্জরী অপেরার। বাবুল বোস—সিনেমা আর্টিস্ট, অলকা চৌধুরী—সিনেমা আর্টিস্ট।

—উঁহু, অলকা নয়—অলি চৌধুরী। লিখব, নিশ্চয়। লিখতে হবে।

—আমরা উঠলাম জাঁহাপনা।

—ডুব মেরো না, এসো। বুঝেছ?

—মরীচিকার টানে আসব। আচ্ছা, হরিণেরা দল বেঁধে মরীচিকার পেছনে ছোটে কিনা বলতে পারেন মাই লর্ড?

—নিশ্চয়। হরিণীর পিছনে ছুটলে গুঁতোগুঁতি করে। এতে বেরাদারি বেড়ে যায়।

—রাইট রাইট রাইট। উঠি। হ্যাঁ, একটা কথা।

—সেটা কি? তোমার তো দরকার নেই টাকার!

—বাবুলদা তো মহাজনি করে।

—ডেঞ্জারাস! ও সব ডোনট্ সে। মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্টে ধরবে।

অদ্ভুত কথা বলার ভঙ্গি বাবুলের, এক নিশ্বাসে ওরই সঙ্গে লাগিয়ে বললে—আমি ওই জটেবুড়ো যোগামাস্টারের কথা বলছিলাম। ছোটো বড় পাঁচটা মেয়ে। রাস্কেল বলে বিটি!

—রাঢ় যে। তাই বলে রেঢ়ো-রা। আমিও রেঢ়ো। তা সে দেড়শো নিয়েছে। কর্তামশায়ের গান শুনিয়ে, ওই পঞ্চকন্যার দোহাই দিয়ে—ঠিক আদায় করেছে।

—ও কে। চলি।

—আমিও যাই। অলকা বললে।

—এস।

মঞ্জরী বললে—দেখো, পার্ট যেন শিকেয় তুলো না। সতীতুলসীর শ্রীকৃষ্ণের পার্ট ভাল পার্ট, বড় পার্ট। পুজো পর্যন্ত রিহারস্থাল নেই। পুজোতেই সতীতুলসী হবে।

গোরাবাবু বললে—ও ঠিক করবে। আমি বলে রাখলাম দেখো। কিছু ভেবো না

প্রোপ্রাইট্রেস, এবার মঞ্জরী অপেরার বিজয় অভিযান। গন্ধর্বকন্যা, সতীতুলসী, জনা। বিজয় চক্রবর্তী প্রণীত অনুপম নাট্য-নিবেদন। নাট্য-সম্রাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী। বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী —ওরফে ছোট বুঁচি, সিনেমাস্টার লাবণ্যবতী অলি চৌধুরী।

বাবুল বললে—নটচূড়োমণি, উঁহু চূড়ামণি কেমন ভটচায্যি ভটচায্যি ঠেকছে।

মঞ্জরী বললে—ওঁর টাইটেল আছে নটসুধাকর।

—ওয়াণ্ডারফুল।

গোরাবাবু বললে—সিনেমা অভিনেতা বাবুল বোস। তোমার টাইটেল দেব—নটরসরাজ!

—বিগ ব্রাদার!

—উনি শুধু রীতুবাবু। যাত্রাজগতে ভাস্ম। টাইটেল উনি নেন না।

মঞ্জরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মঞ্জরী অপেরার বিজয় অভিযান যেন তার চোখের উপর ভাসছে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

বিপাশা

শ্রীমান রমাপদ চৌধুরী

কল্যাণীয়েষু

বরাকর নদের উপর মাইথন ড্যামের ঠিক মাঝখানে একলা চুপচাপ বসে ছিল একটি মেয়ে। স্তব্ধ নিশ্চল একটি মূর্তির মত। মেয়েটির রূপ অপরূপ কিনা সে বিষয়ে মতভেদ নিশ্চয় হবে, কিন্তু তার রূপটি যে এই দেশের মানুষের পক্ষে বিস্ময়কর তাতে সংশয় নেই। বরাকরের মাইথন ড্যামের একদিকে বেহার, অন্যদিকে বাংলা। শ্যাম রূপের দেশে এ মেয়ের গায়ের রঙ শুভ্র—চোখের রঙ পিঙ্গল—চুল স্বর্ণাভ। একসময়, অর্থাৎ শৈশবে ও বাল্যে নিশ্চয় একেবারে স্বর্ণাভ বা শুভ্রাভ ছিল—দিনে দিনে বয়সের সঙ্গে কালো হয়ে এসেও পুরো কালো হয়নি, আলো পড়লে পিঙ্গলাভা বা স্বর্ণাভা স্পষ্ট হয়ে যেন ঠিকরে পড়ে। বাংলাদেশে পিঙ্গল রূপকে চলতি ভাষায় বলে কটা রূপ। কটা শব্দের মানে এখানে কড়া। এ রূপ মানুষকে মুগ্ধ কতখানি করে, তা হয়তো মানুষের রুচির উপর নির্ভর করে, কিন্তু একশো মানুষের দুশো চোখ—নিশ্চয় তার উপর নিবদ্ধ হবে, এবং বিস্ময় একটু জাগবেই। ভাববে এ কি এদেশের মেয়ে? একটু যেন ভয়ও হয় এ রূপে। যাঁরা মানুষের ইতিহাসে কৌতূহলী, তাঁরা মনশ্চক্ষে দেখবেন। রক্তকণিকায় এবং প্রাণ-কণিকার মধ্যে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে শীতপ্রধান শুভ্রদেশ ইওরোপের স্পর্শ।

মেয়েটির নাম বিপাশা। পাঞ্জাবের নদী বিপাশা। পাঞ্জাবে জন্ম—বাপ বাঙালী, মা পাঞ্জাবী। কিন্তু তাতেও প্রশ্ন মেটে না। পাঞ্জাবের পক্ষেও এ রঙ, এ চোখ, এ চুল একটু উগ্র। পাঞ্চেৎ এলাকায় মিশনারীদের পরিচালিত জেনানা মিশনে কাজ শিখতে এসেছে। ভারত সরকারের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের কর্মী—এখানে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কাজ শিখছে। একটু দীর্ঘাঙ্গী—দেহখানি শীর্ণ মনে হয়। প্রাণচাঞ্চল্য এবং রূপের মতই একটু উগ্র প্রকৃতির মেয়ে। এমনভাবে একলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার তার কথা নয়। তার পক্ষে অস্বাভাবিক।

বিপাশা ভাবছিল, তার নাম বিপাশা না হয়ে দময়ন্তী হলেই যেন ভাল হত। দেবতাদের উপেক্ষা করে দময়ন্তী মানুষ-রাজা নলকে বরণ করেছিল। রাজ্য হারিয়ে হৃতসর্বস্ব হয়ে নল বনে গেলে দময়ন্তী পিতৃগৃহে ফিরে যায়নি—ছেলেদের সেখানে রেখে সে নলকেই অনুসরণ করেছিল। স্বামীর সঙ্গে একখানা কাপড় দুজনে ভাগ করে পরে বেড়াচ্ছিল। সেই নল, দময়ন্তীর ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ছুরি দিয়ে কাপড়খানাকে কেটে তাকে গভীর বনের মধ্যে ফেলে পালিয়েছিল। হায় পুরুষ!

দিব্যেন্দু তাকে যেন ঠিক তেমনি করেই ফেলে গেল। দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী—এখানকার অ্যাসিস্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার—তার জীবনের প্রিয়তম আগন্তুক।

অত্যন্ত অকস্মাৎ ঠিক নলের মতই কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। সে এক মাস আগের কথা। সেদিন বিকেলে পাঞ্চেতে দামোদরের ধারে নির্দিষ্ট শিলাখণ্ডটির উপর বসে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিব্যেন্দু এল না দেখে ফিরে এসেছিল। ভেবেছিল বোধহয় কাজে আটকে পড়েছে। দ্বিতীয় দিনও আসেনি। তৃতীয় দিন সে নিজে এসেছিল মাইথন। এসে দেখেছিল দিব্যেন্দু নেই। শুনেছিল—দিব্যেন্দু কোনো চিঠি পেয়ে আপিস থেকেই ছুটির দরখাস্ত দিয়ে চলে গিয়েছে। দরখাস্ত মঞ্জুর হবে কি হবে না ভাবেনি, কোনো কারণ দেখায় নি, শুধু লিখেছিল অত্যন্ত জরুরী পারিবারিক প্রয়োজনে এই মুহূর্তেই তাকে যেতে হচ্ছে। এবং

প্রায় ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই অল্প কিছু জিনিসপত্র নিয়ে সে চলে গিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে, কবে নাগাদ ফিরবে এ কথাও কেউ বলতে পারে নি। কারণ ভর্তি আপিসের সময় সেটা। আপিসের কাউকে কিছু বলে নি, তার কোয়ার্টারের চাকরটাকেও কিছু বলে নি, বিপাশা থাকে পাঞ্জেতে, তাকে বলবারও বোধ হয় সুযোগ হয়নি। সেদিন তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু থাকলেও কি সে তাকে জানাতো? আজ সন্দেহ হচ্ছে, বিপাশার দৃঢ় সন্দেহ, সে জানাতো না। জানাবার অভিপ্রায় থাকলে একখানা চিঠি—অন্তত একখানা চিরকুটের মত চিঠিও সে রেখে যেতে পারত। অবশ্য হতে পারে যে, দুঃসংবাদটি খুবই গুরুতর ছিল, যাতে ধৈর্য বা মনের বল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

বিপাশা চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু তারও তো খোঁজ করবার কোন উপায় ছিল না। কোথায় গেছে দিব্যেন্দু, কেমন করে জানবে? এবং সেই দিন সে প্রথম নিজের নির্বুদ্ধিতার, অল্প বয়সের আবেগাচ্ছন্ন অদূরদর্শিতার জন্য নিজের কাছে লজ্জা পেয়েছিল এবং নিজেকে সেজন্যে তিরস্কার করেছিল। দিব্যেন্দুর কোন ঠিকানাই সে জানে না! অথচ তার সব কথাই তো সে জানে, দিব্যেন্দু তো তাকে গল্পচ্ছলে সবই বলেছে!

বলেছিল—তোমার সঙ্গে আমার খুব মিল আছে বিয়াস। আমরা ছেলে বয়স থেকেই পিতৃমাতৃহীন। তোমার তবু মা-বাপকে মনে পড়ে, আমার তাও না। তবে তার পরের দুর্ভোগ তোমার থেকে আমার কম।

দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী—বাপ ছিলেন এঞ্জিনীয়ার। এখানে পাস করেই বিয়ে করেছিলেন তার মাকে এবং তারপর পড়তে যান বিলেতে। সেই বিলেতেই তিনি মারা যান। মা ছিলেন মাতামহের কাছে। মাতামহ মাতামহী ছিলেন বিচিত্র মানুষ। সরকারী চাকুরে ছিলেন মাতামহ। নেহাৎ ছোট চাকরি নয়। অফিসার গ্রেডের চাকুরে। চাকরিজীবনে ছিলেন সাহেব। তার মা ছিলেন তাঁদের সবকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর উপরে ছিলেন দুটি ছেলে। তাঁরা আজও আছেন। বাবার চেয়েও তাঁরা কড়াতর সাহেব। সরকারী অফিসারের ছেলে—লেখাপড়াও শিখেছিলেন। চাকরিও পেয়েছিলেন। একজন রেলে—একজন তেলের কোম্পানীতে। স্ত্রী নিয়ে চাকরির স্থানে স্থানে ঘুরতেন। চাকরিতে তাঁদের ঘুরতে হত গোটা দেশ চষে। মায়ের সঙ্গে বধূদের মিল ছিল না।

দিব্যেন্দু বলেছিল—জান, আমার দিদিমাই আমাকে মানুষ করেছেন। আমার মা আমাকে পাঁচ বছরের রেখে মারা যান। অফুরন্ত তাঁর স্নেহ। তবু এ কথা স্বীকার করব যে, মামাদের আমার কত দোষ—তা বলতে পারব না, কিন্তু দিদিমা তাদের মাথা না খেয়ে কোনো দিন জল খেতেন না। ওঃ; সে কি বাঁধুনী! হাসত দিব্যেন্দু সে-সব কথা স্মরণ করে। এবং তারপরই বলত, সে কি আমিই বাদ যেতাম! আমাকেও গাল দিতেন। অলক্ষুণে, অশুভক্ষুণে! মা-খেগো, বাবা-খেগো। বাপে-তাড়ানো, মায়ে-হারানো হারামজাদা! আমাদের দুটোকে খা না। খেলেই চোকে। তোর জন্যেই, ওরে তোর জন্যেই আমার এত যন্ত্রণা!

কথাটা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য, তাও দিব্যেন্দু স্বীকার করত। কারণ মাতামহ এবং

মাতামহীর সঙ্গে তাঁদের ছেলে-বউদের যে গরমিল ছিল, সেটা একটা কলহে এবং বিচ্ছেদজনক মনান্তরে পরিণত হয়েছিল তার মাকে নিয়ে এবং তাকে নিয়ে, তার বাপের মৃত্যু-সংবাদ এলে। সম্ভবত মাতামহ এবং মাতামহী তার মা এবং তাকেই তাঁদের উত্তরাধিকারী বলে একটা উইল করেছিলেন। এবং তাদের নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন কাশী। চাকরিতে পেনসন হতে তখনও কিছুদিন বাকী ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করে রিটায়ার করে চলে এসেছিলেন কাশী। কাশীতে বাড়ি ভাড়া করে সেখানেই ছিলেন তাদের নিয়ে, এবং সাহেবদের আশ্রয় এবং অনুকরণ ছেড়ে দেবতাকে আশ্রয় এবং পূজা করে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। •

দিব্যেন্দু বলত—তা ফল পেয়েছিলেন বইকি! বিধবা মেয়ের মুখ বেশী দিন দেখতে হয়নি। বছর তিনেকের মধ্যেই তার মা বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন।

মায়ের মৃত্যুর পর মানুষ করেছিলেন দিদিমা। দিদিমা মামাদের গাল দিতেন, মামীদের মাথা খেতেন, দিব্যেন্দুর বাপের আদ্যশ্রাদ্ধ করতেন—মায়ের বেলায় জ্ঞান হারাতেন। দিব্যেন্দুর মরা মাকেও মর-মর-মর বলে অভিসম্পাত দিতেন। দিব্যেন্দুকে কথাই নেই। অবশ্য আদরও করতেন—বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন।

মামাদের সে একবার মাত্র চোখে দেখেছে। সে তার মাতামহের মৃত্যুর পর। তখন দিব্যেন্দু কাশী থেকে ম্যাট্রিক পাস করে সবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। তখন মামারা এসেছিলেন—শ্রাদ্ধ করতে। মামীরা বা তাঁদের ছেলেমেয়েরা আসেন নি। তার আগে, মাতামহী তাকে দিয়ে তিন দিনে একটা শ্রাদ্ধ করিয়েছেন। মামারা পদার্পণ মাত্রেই সেই সংবাদ পেয়ে শুরু করেছিলেন তাঁদের মায়ের সঙ্গে ঝগড়া।

—কেন তুমি তা করালে? কেন?

দিদিমা বলেছিলেন—বেশ করেছি। তিনি বলে গেছেন।

—তিনি বললেও এ হয় না—হতে পারে না। আমরা আসব—শ্রাদ্ধ করব।

—সে তোমরা করতে পার! নিজের নিজের খরচে করগে!

—নিশ্চয় করব। এই অনাচার—এ সহ্য করব না। শ্রাদ্ধে বিশ্বাস করি চাই না-করি, দেশাচার হিসেবে—করব। শাস্ত্র যদি সত্য হয় তবে তিনি নিজের নরক গমনের দ্বার প্রশস্ত করেছেন ওর পিণ্ড নিয়ে—আমরা পিণ্ড দিয়ে যতটুকু প্রতিকার হয় তা করব।

তা তাঁরা করেছিলেন। এবং যে কয়েকটি দিন ছিলেন—দিন রাত্রি ধরে মায়ের সঙ্গে পুরনো ঝগড়ার মরচেপড়া, ময়লাধরা ছুরি বা ছোরা বঁটি যাই হোক সেটা—সেটাতে শান দিয়ে ঘষে ঝকমকে এবং ধারালো করে নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। দিব্যেন্দু এর মধ্যে মাথা গলায়নি। বাড়ি থেকে সে সরেই গিয়েছিল। প্রথম দিনই একটা কাণ্ড ঘটেছিল। যা ঘটেছিল কাণ্ড ছাড়া তা আর কি? মামারা দুই ভাই রাত্রে দুধ-মিষ্টি খেয়ে জল খুঁজছিলেন। জল দিতে তাঁরা ভুলেছিলেন, দিদিমাও দেন নি, সে পাশের ঘরটায় ছিল; মামাদের জল চাই বুঝে সে-ই জল গড়িয়ে তাঁদের কাছে যেতেই তাঁরা বলেছিলেন—তোমাকে কে জল আনতে বললে?

বড়মামা হাতের জলপাত্রটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন—গেট আউট ফ্রম হিয়ার। পাপ, একটা পাপ!

দিব্যেন্দু আহত হয়ে চলে এসেছিল এবং দিদিমাকে জাগিয়ে তুলে বলেছিল—দি-মা, আমি ক'দিন ভেলুপুরায় গিয়ে থাকছি—বন্ধুর বাড়ি। মামারা চলে গেলে আমি আসব।

—তোর হাতের জল ফেলে দিলে—না? বলেই তিনি উঠে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ছেলেদের ঘরের দিকে। সেই অবসরে সে-ও বেরিয়ে চলে গিয়েছিল বন্ধুর বাড়ি। এসেছিল মামারা চলে গেলে। চলে গিয়েছিলেন তাঁরা হতাশ হয়ে। কারণ, দাদামশায় রেখে কিছুই যাননি। পেনসনের টাকা মৃত্যুতেই বন্ধ। ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউণ্ট ছিল—তার পাস বইয়ে ছিল মাত্র কয়েক টাকা কয়েক আনা। বাড়ি ভাড়ার। লাইফ ইনসিওরেন্সের একটা প্রাপ্য ছিল—হাজার তিনেক—কিন্তু সেটাকে বন্ধক রেখে কোম্পানী থেকে—যতখানি পেতে পারেন ধার নিয়ে তিনি তাকে শূন্যতে পরিণত করেছিলেন। সেই টাকাটাই ছিল দিদিমার হাতে। কিন্তু তার কোন কিনারা তাঁরা করতে পারেন নি। আর ছিল কিছু গহনা। সে দিদিমায়ের নিজস্ব।

দাদামশায়ের মৃত্যুর পর দিদিমা তাকে নিয়ে খুব সস্তার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। এবং দিব্যেন্দু হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে—আই. এস্‌সি. পাস করে এঞ্জিনীয়ারিং পড়া শুরু করেছিল। মামাদের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। এবং দিদিমার সঙ্গেও তাঁরা আর পত্র দিয়েও সম্পর্ক রাখেন নি।

দিব্যেন্দু বলত, সি ওয়াজ এ ভেরী হেভী লেডী—ভেরী হার্ড। যেমন শক্ত তেমনি ভারী! মানে একখানি স্টোন-রোলার। নড়ানো যেত না। বুঝেছ বিয়াস, একটা বিচিত্র ধর্মঘট ছেলেরা তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত চালালে—কিন্তু তিনি হার মানলেন না।

দিব্যেন্দুর যখন এঞ্জিনীয়ারিং কোর্সের শেষ বছর, সেবার তিনি মারা গেলেন। তখন তাঁর হাতে মজুত সামান্যই। শ' আষ্টেক টাকা। দিব্যেন্দু তখন নিজেও উপার্জন করে; তার আলাপ ছিল বাংলা প্রেসের সঙ্গে, কিছু কিছু লেখার সূত্রে প্রুফ দেখে কিছু উপার্জন করত। একটা প্রাইভেট টিউশনিও করত। দিদিমার মুখাগ্নি সে-ই করেছিল এবং শ্রাদ্ধও করেছিল। মামাদের ঠিকানা জানত না। পুরানো ঠিকানায় পত্র দিয়েছিল কিন্তু কোন উত্তর বা কেউ আসেনি।

দিদিমার মৃত্যুর পর তাকে পাস করে বসে থাকতে হয় নি; চাকরি পেয়েছিল। নিজের পৈতৃক গ্রামের নাম জানত এই পর্যন্ত। আজও পর্যন্ত কেউ তার খোঁজ নেয়নি। তারও কখনও খোঁজ নেবার কথা মনে হয় নি এবং মনেও নেই। তারপর কাশী ছেড়ে চাকরি-জীবন।

এই সব কথা কতবার শুনেছে—কখনও আগাগোড়া, কখনও খানিকটা টুকরো, কিন্তু কখনও মনে হয়নি—যদি কখনও এই এমনি ঘটনার মধ্যে দিব্যেন্দুর খোঁজ করতে হয় তো করবে কোথায়? দিব্যেন্দু চলে যাওয়ার পর প্রথম কথাটা মনে যখন হয়েছিল সেদিন—তখনও এর উপর এতটা জোর দেয়নি। ভেবেছিল, দু-তিনদিনেই চিঠি পাবে তার! লিখবে, 'বিয়াস, হঠাৎ চলে আসতে হয়েছে—' কিন্তু আজ এক মাস হয়ে গেল, দিব্যেন্দুর কোন

সংবাদ নেই। কাল তার উপর খবর পেয়েছে, দিব্যেন্দু হেড আপিসে রেজিগনেশন লেটার দাখিল করেছে, এবং তা গৃহীতও হয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হবে, তার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কাগজে। স্তম্ভিত হয়ে গেল বিপাশা। তাকে কোন একটা কথা জানালেও না দিব্যেন্দু, তাকে জানানো প্রয়োজনই মনে করলে না!

কথাটা আজ বেশী করে মনে হচ্ছে, তার কারণ আজ খবর এসেছে, দিব্যেন্দু রেজিগনেশন দিয়েছে। রেজিগনেশন-এর অর্থ—এখানকার সঙ্গে সে সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে নূতন জীবন-ক্ষেত্রে আহ্বান পেয়েছে। তার মধ্যে অনেক কিছু আছে—শুধু এখানকার কাজ-কর্ম যন্ত্র-পাতি সংগঠন এগুলিই সে পিছনে রেখে চলল তা তো নয়, এখানে যারা কর্মী, এতদিনের কর্মসঙ্গী, যাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সঙ্গে তার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না জড়িয়ে ছিল—তারাও পিছনে পড়ে রইল। সব থেকে বিচিত্র এবং বিস্ময়কর এই যে, এমন মিশুক, এমন আবেগ-প্রবণ সর্বজনপ্রিয় কারুকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে না? তাকেও না? অথচ তার সঙ্গে তার জীবন যে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে জড়িয়ে গেছে ভেবেছিল। এক মুহূর্তে যেন নল রাজার মত ছুরি দিয়ে বন্ধন কেটে তাকে বনের মধ্যে দময়ন্তীর মত ফেলে চলে গেল। তাহলে তার সব ভুল হয়ে গেছে?

এ তাহলে দিব্যেন্দু কি সেই মানুষ, যে স্বল্পকাল পরে অকস্মাৎ দেখা হলে আগেভাগে সোল্লাসে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাউকে ভ্রূক্ষেপ না-করে বহু লোকের সামনে হাত তুলে চিৎকার করে উঠবে—হে—! হ্যালো হ্যালো—হ্যালো—!

অনেক দিন পর হলে হয়তো মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলবে—ওয়েল স্যার, ডোণ্ট টেক্ অফেন্স প্লিজ—অথবা—প্লিজ এক্সকিউজ মি ইফ আই অ্যাম রং। হে ঈশ্বর—হে ভগবান! দিব্যেন্দু কি তাকেও এই সাধারণ বন্ধু-বান্ধবদের সামিল করলে! ঈশ্বর ভগবান—এ দুটি শব্দ ছাড়া আর কোন্ শব্দ তার মুখ থেকে বের হতে পারে এক্ষেত্রে!

শয়তান? না। এ শব্দ নাস্তিকেও উচ্চারণ করবে না। বিপাশা তো তা পারবেই না। জীবনে সান্ত্বনার জন্য শয়তানকে ডাকতে তো পারবে না।

* * *

সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। ড্যামের রাস্তার উপর দিয়ে চলেছে সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে। কখনও কখনও চলছে সাইকেল-আরোহী নতুন ভারতের নবীন নাগরিক। পূর্ব পাড়ের পাহাড়ের মাথায় সূর্যের লালচে আলো পড়েছে। সামনের দিকে রিজারভয়র লেকটা লাল জলে ভরে আছে; মাঝখানে দ্বীপটা জেগে রয়েছে, ওদিকে পাহাড়, এদিকেও পাহাড়—কিন্তু তার উপর দিয়ে চলে গেছে পিচ-ঢালা রাস্তা মাইথন হয়ে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত। তাকে দেখে তার মনের অবস্থা অনুমান করা যায় না। বাইরে থেকে শান্ত এই লেকটার মত। কোন স্রোত নেই মনে হচ্ছে। যেন নিথর জলরাশি পড়ে রয়েছে, মধ্যে মধ্যে বাতাসে ঈষৎ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু বরাকরের জল আসছে উপর থেকে—লেকের মাথায় জমছে—নীচের দিকে ছুটবার জন্য সে ঠেলা মারছে এই বিরাট বাঁধটার উপর। বোধহয় এক হাজার হাতী একসঙ্গে মাথা দিয়ে ঠেললে যে চাপ হয়—তার থেকেও অনেক

বেশী। ওই যেখানে হাইড্রলিক যন্ত্রগুলি বসানো আছে, সেখানে গেলে বুঝতে পারা যাবে। এই জলের মাত্র একটা অংশ সেখানে নির্গমন-পথে বের হচ্ছে—তারই ঠেলায় চলেছে ওই যন্ত্র-গুলি। বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরী হচ্ছে। ওপাশে বরাকরের খাতে কলস্বর তুলে তরঙ্গভঙ্গে ছুটছে সে জল। কিন্তু এ পাশের লেকটা বাইরে থেকে দেখতে স্থির শান্ত একখানা বিস্তীর্ণ গেরুয়া রঙের সতরঞ্জির মত যেন এই নির্জন পার্বত্য বনভূমের তলদেশে কে বিছিয়ে রেখেছে, একটা যেন আসর পাতা হয়েছে।

বিপাশা না-হয়ে অন্য মেয়ে হলে সে বোধহয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত কোন নির্জন স্থানে, হয়তো বা গলায় দড়ি দেবার বা বিষ খাবার কল্পনা করত। অবশ্য এমন মেয়েও আছে, যারা নীচে নেমে গিয়ে লেকের জলে মুখহাত ধুয়ে, দিব্যেন্দুর সকল স্পর্শচিহ্ন ও স্পর্শস্বাদ মুছে ফেলত। এর অনেক আগেই মুছে ফেলত। দিব্যেন্দু চলে গেছে এক মাস। তারা হয়তো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করত। বেশী হলে পনের দিন। এবং আজ এক মাস পর যখন তার রেজিগনেশনের সংবাদটা এল, তখন একটু বক্রহাসি হেসে ঠোঁট দু'টি একবার উল্টে নিয়ে, দিব্যেন্দুর পরেই যে ব্যক্তিটি তার মানসলোকের দুয়ারের কিউয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার সন্ধানে চারিদিকে চেয়ে দেখত। তার উল্টো প্রকৃতির হলে? নীচের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে বিপাশা—প্রায় একশো ফুট নীচে জল। নীচে আরও হয়তো এতটাই থাকবে। সে শুনেছে কলকাতার বড় বড় বাড়ি কয়েকটাই থাক করে সাজালে জলের তলে ডুবে যায়। এখান থেকে একশো চার পাউণ্ড ওজনের চার ফুট আট ইঞ্চি লম্বা একটি মেয়ে লাফ দিয়ে পড়লে তলা পর্যন্ত যেতে যেতেই শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বিপাশা জীবনচক্রে পাক খেয়েছে মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে এবং গতিতে। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে জীবনের হাপরে সর্বনাশের আগুন জ্বলে। সেই আগুন যখন জ্বলে, তখন কত মানুষ যে গলে-পুড়ে ছাই হয়ে শেষ হয়ে যায়, তার আর ঠিকঠিকানা থাকে না। কিন্তু যারা তাতে পুড়েও কালের হাতুড়ির পিটনে একটা গড়ন নিয়ে বেরিয়ে আসে, তারা ওই দুটোর কোন দলেই পড়ে না। বোধহয় মৃত্যুর চিতায় পোড়ালে তাদের সব হাড়গুলো পুড়বে না, এবং মাটির সঙ্গে মিশে থেকেও হাজার বছরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে না, হয়তো পাথরে পরিণত হবে। এই বাইশ বছর বয়সে সে কালান্তরের আগুনের হাপরে পড়েও ছাই হয়নি।

এই দুটো দল ছাড়াও আর দুটো দল আছে। একটা বন্য বর্বরা—সেই বনের সভ্যতার মেয়ে, যে এরপর ছুরি হাতে খুঁজে বেড়াবে দিব্যেন্দুকে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। তার বিপরীত প্রান্তে, আর একদল—যারা এর পর সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে বেদনার বৈরাগ্যে। সে মরবেও না, সন্ন্যাসিনীও হবে না। এই বাইশ বছরের জীবনের মধ্যেই ওই মহাকালের অগ্নিকুণ্ড হেঁটে পার হবার সময় এক বুড়ো সর্দারজীর একটা কথা শুনেছিল—কথাটা তার জীবনে গাঁথা হয়ে আছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসছে তখন, সেই আসবার সময় একজন জীপে-চড়া অফিসার, সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তার কে কোথায় আছে তার কথা। সর্দার বলেছিল, কেউ কোথাও নেই, সব খতম হয়ে গিয়েছে। জরু বেটা বহু দো পোতা—বিলকুল খতম। আছি আমি একা। আর এই পথে

কুড়ানো লেড়কী।

ভুরু কুঁচকে কপাল কুঁচকে সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসেও অফিসার বলেছিল—সর্দারকে বলে নি, বলেছিল তারই সহকর্মীকে—দেখ, এই বাঁচার কিছু মানে হয়? বাংলাতে বলেছিল। তারা দুজনেই ছিল বাঙালী। সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিল—বাবুজী, হামি বাংলা সমঝে। ওর জবাব আমিও জানতাম না এর আগে; এই বুড়ো বয়সে ভীষণ খুনোখুনির মধ্যেই জানতে পারলাম। উমর হয়ে গেল সোত্তর। সে উত্তর শুনবে? বাবুজী, মানুষ যতক্ষণ মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে লড়াই না করে, ততক্ষণ জীবনের মানে সে বুঝতে পারে না। বাঁচার মানেও না। মরণের সঙ্গে লড়ে মর—তাতেও বুঝতে পারবে—বাঁচো, তাতেও বুঝতে পারবে। তাই বাবুজী, মরণ আজকাল যেমন সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছে তেমন করে যতক্ষণ দাঁড়ায় না—আর তাই তো বলতে গেলে বেশীর ভাগ কাল দুনিয়ার জিন্দিগীতে—খায় দায়, কাম করে, নিদ যায়, আর রোগ হলে মরে—তখনই মানুষ জীবনের মানে খুঁজতে সন্ন্যাসী হয়, তপস্যা করে, কিতাব লেখে, গীত রচনা করে, আর কাঁদে; বলে—এর মানে খুঁজে পেলাম না বলে—কি হবে বেঁচে, আত্মহত্যাও করে। দেখ বাবুজী, শেষ ছিলাম আমি আর আমার এক বেটা, পচাশ বছরের জোয়ান। আসছিলাম—পথে মিলল এই লেড়কী। বারো বছরের খুবসুরত লেড়কী পথের ধারে পড়ে ছিল, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছিল। তুলে নিলাম বাবুজী। নিয়ে যাবে ওরা লুটে। বিক্রি করে দেবে হাটে, বাঁদী বানাবে। নিয়ে আসছিলাম। শেষে লড়াই হল, বাবুজী, হিন্দুস্তানের সীমানায় আধা মিল আগে। রাতে আমাদের দলের উপর ওরা বহুৎ ভারী দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আঁধিয়ারা—তার উপর দলে ভারী ওরা। আমরা ছিটকে পড়লাম ইধার উধার। একটা গাঁওয়ের একখানা ভাঙা বাড়িতে বাপ বেটা আর এক লেড়কী—তিনো প্রাণী ঢুকে পড়েছিলাম। ওরা জানতে পারে নি। তারপর তখনও রাত শেষ হয়নি, নেকড়েরা যেমন গন্ধ পেয়ে সন্ধান পায়, তেমনি ভাবে কেমন করে ওরা চার আদমী এসে দাঁড়াল বাইরে, আর হুকুম করলে—বাইরে আয়রে কুত্তা-লোক। বেটা আমার ঘুমিয়ে ছিল, ওকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিলাম। ঐ লেড়কী কেঁদে উঠল। বাইরে তারা হল্লা তুললে, ছোকরী আছে। আমরা কিরপান নিয়ে বললাম—বাইরে আমরা যাব না, মেহমান এস তোমরা, ভিতরে এস। তোমরা চার, আমরা দুই। আমরা দুজন যাব, কিন্তু তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাব। তোমরা দুজন ফিরবে। লোকসান কি—এস! তারা বললে—না রে কমবক্ত, আমরা পাঁচজন যাব। আমরা চারজন, আর ওই ছোকরী! বললাম—বহুৎ আচ্ছা, এস তাহলে! বাবুজী, ঘরের মধ্যে থেকে আমাদের সুবিস্তা ছিল, লড়াই দিলাম। ওরা একজন গেল, আমার বেটা নিলে তাকে। কিন্তু একটা বর্শা বিঁধে দিলে বেটার বুকে আর একজন। তখন মনে হল একবার, বাবুজী, বেঁচে কি হবে? কিন্তু মনে পড়ল এই লেড়কীর কথা। হামি লড়াইমে তিনজনের জান নিলাম। বেটা একটা কাম করেছিল—ওদের একটাই বর্শা ছিল, সেটা কলিজায় নিয়ে শুয়ে ছিল, আর তার ভারে সেটা ভেঙেও গিয়েছিল। তিনজনকে নিতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি। তিনজনের একজন খতম, একজন বহুত জখম—বাঁচবে না, আর একজন বাঁচতেও পারে।

আমি আর দাঁড়াই নি বাবুজী, মরা বেটা পড়ে রইল—গুরুজীকে বললাম—তুমি গতি করো, অলখ নিরঞ্জনকে বললাম—তোমার হুকুমেই মরা বেটাকে ফেলে, এই লেড়কীকে নিয়ে আমি চললাম। সেই শেষ রাতে, লেড়কীকে নিয়ে, কখনও কান্ধায় কখনও হাঁটিয়ে, টেনে হিঁচড়ে ভোর-ভোর এই এলাকায় এসে ঢুকলাম। এই বাঁচায় জীবনের মানে বুঝেছি, দাম বুঝেছি। আউর ভি দশ-বিশ বরষ বাঁচতে চাই। দুনিয়া ন-তিতা বাবু ন-মিঠা। তোমারই জিভেই আছে তিতা আর মিঠার তার। তুমি বিশ্বাস করতেই পারবে না বাবুজী, যখন লেড়কাকে কান্ধা পর নিয়ে হিন্দোস্তানের জমীনের পর এসে পড়লাম, তখন সাক্ষাৎ অলখ নিরঞ্জনের পরশ পেয়ে গেলাম, তাঁর জ্যোতি দেখলাম, তাঁর বাত শুনলাম, বললেন—জিতা রহো! বল তো বাবুজী—মরতেই যদি চাইব, মরাই যদি আমার উচিত, তবে দুনিয়ায় এতকাল ধরে সাধু মহন্ত গুরু পিতা-মাতা কেন, 'জিতা রহো' বলে আশীর্বাদ করে? অলখ নিরঞ্জনই বা বললেন কেন, জিতা রহো? জীবনের ধর্মই হল বাঁচা, জিন্দগী বাবুজী; মরা নয়। লড়াইয়ে মরা—সে বাঁচাই বাবুজী—মরা নয়।

বাবুরা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, বরং অপ্রতিভ অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—না—না সর্দারজী, আমরা ঠিক তা বলি নি। মানে আমরা—অপর জনে, প্রথম কথাটা তিনিই বলেছিলেন, তিনি এবার ইংরাজীতে বলেছিলেন, কাজ কি কথা বাড়িয়ে, থেমে যাও। বিচিত্র দুনিয়া—শুধু দেখে যাও। বৃদ্ধের এখন দর্শনের আশ্রয় ছাড়া আশ্রয় কোথায়! থেমে যাও।

সর্দারজীও এবার বলেছিল—হ্যাঁ মহাশয়, থেমে যাওয়াই ভাল। আমিও কিছু কিছু ইংরাজী জানি। এককালে পেশাতে ছিলাম মাস্টার। আপনাদের ক্যালকাটায় আমি গুরুদোয়ারা পরিচালিত ইস্কুলে মাস্টারি করতাম। হিন্দীও জানি। উর্দু তো জানিই। কাজেই থেমে যাওয়াই ভাল। কাজ কি?

তাঁরা এর পর কাজে মন দিয়েছিলেন। তাদের একজন, সরকারী অফিসার—অবস্থা দেখে বেড়াচ্ছিলেন, গায়ে মিলিটারি উর্দি; আজ বিপাশা বলতে পারে তিনি ছিলেন আই. এম. এস.। রেফুজীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করে বেড়াচ্ছিলেন—আর সঙ্গের লোকটি ছিল খবরের কাগজের লোক—বাঙালী। ওই কাগজের লোকই প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল।

সর্দারজীর বিবরণ শুনেছিল আগে। কলকাতায় মাস্টারী করত দশবছর আগে, ষাট বছরে দেশে গিয়ে ক্ষেতের কাজে মন দিয়েছিল। গাঁয়ে থাকত স্বামী আর স্ত্রী। এক বেটা, বেটার বউ, দুই ছেলে থাকত শিয়ালকোটে। ওখানে ব্যবসা করত—ঘোড়ার সাজের ব্যবসা। বৃদ্ধের বাড়ি ছিল কিছু দূরে ওই এলাকাতেই। হিন্দুস্থানে আজাদী এল, দাঙ্গা শুরু হল বাংলায়। তারপর পাঞ্জাবে। যে গাঁয়ে বুড়ো থাকত, সে গাঁয়ে শিখ বেশী হলেও এলাকায় মুসলমান বেশী। গাঁওয়ে যখন হামলা হল, তখন দুদিন লড়ার পর তারা গাঁও ছেড়ে দল বেঁধে বের হল, চলবে জম্মু হয়ে হিন্দুস্থানের দিকে। বুড়ী চলতে পারছিল না। বৃদ্ধ বললেন—বাবুজী, একরোজ রাতে বুড়ী নিজের জান নিজে বরবাদ করে দিলে—একটা নদীর পুল থেকে

হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, তার আগে থেকেই বলছিল—আমি ভার হয়েছি, তুমি চলে যাও—শিয়ালকোটে জলদি যাও, সেখানে বাচ্চাদের হাল কি হল দেখো। আমি মরে যাই। আমি অনেক বুঝিয়েছিলাম, তারা তিন বাপ বেটা আছে—তিন জোয়ান আর এক জেনানী, তাদের জন্য তুমি ভেবো না। কিন্তু না ভেবে উপায় ছিল না; কারণ খবর পাচ্ছিলাম শিয়ালকোটে হিন্দু ঔর শিখ ঔরতের বেইজ্জতির আর কিনারা নেই। ওরা বলছে অমৃতসরে মুসলমান ঔরতের বেইজ্জতির কিনারা নেই। তার বদলা ওরা শিয়ালকোটে ঔরতদের রাস্তে পর নংগী খড়ী কর দিয়া। ঔর—। শেখপুরায়ে ইজ্জতকে লিয়ে শিখ ঔর হিন্দু লোক—বেটি-বহু-জরুদের খুন ক'রে বেইজ্জতি থেকে বাঁচিয়েছে। ভাবনা আমারও হচ্ছিল। আসছিলাম আমরা পাঁচশো আদমী। শুধু বুড়োরাই নয়—দশ বিশ ঔরৎ আপনি আপনার জান দিয়েছিল। পথে তো হামলার শেষ ছিল না। ওরা মধ্যে মধ্যে পথে আটকাচ্ছিল, লড়াই হচ্ছিল। কিছু ছিনিয়েও নিয়ে যাচ্ছিল। বুড়ী মরল। আমি শিয়ালকোটে যখন এলাম, তখন ওদিকে ওরা তিন বাপ-বেটা মওজুদ। বেটার চোখ লাল। এক পোতা ছোরা খেয়ে জখম হয়েছে। শিখ হিন্দুর দল বেরুল বেরুব করছে। বহুকে বেটা নিজের হাতে কেটেছে। ওখান থেকে বের হলাম। পথে একদিন পরে গেল জখম হওয়া পোতা। তিন দিন পর আর এক পোতার হল কলেরা। দুদিনে সেও গেল। তখন বাবুজী, আমরা জম্মুর এলাকা থেকে দূরে নেই; ওরা শেষ হামলা করলে। আমরা বাপবেটায় পোতার লাশ নিয়ে সৎকার করবার জন্যে রয়ে গেলাম। কাঁধে নিয়ে গেলাম দরিয়ার সন্ধানে—ভাসিয়ে দেব। সিরিফ দুজন হয়ে গেলাম। লাশ ভাসিয়ে দিয়ে রওনা হয়ে আসছি, পথের ধারে দেখলাম লেড়কী পড়ে আছে। একটা খাদের ভিতর পড়ে আছে, মনে হল উপর থেকে পড়ে গেছে। আমরা ওদের হল্লা শুনে এই খাদটার মধ্যে লুকোতে চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম, লেড়কী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। পড়ে বেহোঁস হয়ে গিয়েছিল—হোঁস হয়েছে। পরনের পোশাক দেখে মনে হল হিন্দু বা শিখ, রঙ দেখে মনে হল হয়তো এর মা-বাপ ইওরোপীয়ান—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—বোধহয় ক্রীশ্চান। নাম পুছলাম—বললে বিপাশা। জাত পুছলাম, বললে হিন্দু। বাস্, আর কিছু পুছলাম না, সন্ধ্যা হতেই খাদ থেকে বের হলাম, ও তাকিয়েই ছিল আমাদের দিকে—পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল—পড়েছিল বোধহয় গাছের বা ঝোপের উপর নইলে বাঁচতই না। কি করব? আমি ওকে কান্ধা পর তুলে নিয়ে বললাম—চলো। বেটা এগিয়ে এসে বললে—আমাকে দাও পিতাজী, আমি জোয়ান তুমি বুড়ো। তারপর তো বলেছি বাবুজী। পরমাতমার হুকুমে সব যাওয়ার পরও বেঁচেছি—আর ওই লেড়কীকে বাঁচিয়েছি, বাস্, তার জন্যে মনে কুছ আপসোস আমার নেই।

তারপর সাংবাদিক—আজ বিপাশা ওকে সাংবাদিক বলছে—কিন্তু সে-দিন সে লোকটি তার কাছে আখবরকো আদমী কিংবা জার্নালিস্ট ছিল; সাংবাদিক তাকে কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করেছিল। উর্দুতেই করেছিল—

কি নাম তোমার? সর্দারজী বলেছিল—বিপাশা। চমৎকার নাম।

উত্তর সে দেয়নি। দিয়েছিল সর্দারজী। অফিসার মশায় চুরুট টানছিলেন এবং শুনছিলেন।

সর্দারজী বলেছিলেন—নাম বহুত সুন্দর আর ওই নাম ভি ওর খাঁটি সত্য। বিপাশা হল পাঞ্জাবের পঞ্চ দরিয়ার এক দরিয়া। মিয়ানি শহরের কোল ঘেঁষে এসে শতদ্রুর সঙ্গে মিশে সিন্ধুতে পড়েছে। কিন্তু বাবুজী, ওর মহিমা হল বৃহৎ মহিমা। রামায়ণের ঋষি বশিষ্ঠের একশো বেটা, ওই বেটাদের নাশ করেছিল ওঁরই শিষ্য। ওঁরই শাপে সে হয়েছিল ব্রহ্ম রাকসস। এতবড় ঋষি পুত্রশোকে অধীর হয়ে নিজের হাতে-পায়ে পাশ দিয়ে বন্ধন ক'রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বিপাশার জলে। বিপাশা দরিয়া ঠিক এই লেড়কীর মত—"ঋষির পাশ-বন্ধন খুলে" তীরে তুলে দিয়ে বলেছিল—"বাঁচ ঋষি; শোককে জয় করে বাঁচ। লড়াইয়ে মর ফুলরি বাত, কিন্তু লড়াইয়ে হেরে নিজেকে নিজে খতম করা সরম কি বাত। ও পাপ।" এ লেড়কী সত্যই বিপাশা।

অফিসার বলেছিলেন—সর্দারজী, আপনি থোড়া বিশ্রাম করুন। ওকে কথা বলতে দিন। তারপর বিপাশাকে বলেছিলেন—এখন তুমি বল বিপাশা।

বিপাশা ঠিক ধরতে পারে নি। সে অন্যমনস্ক ছিল। বিহ্বল অবস্থায় তখনো সে আচ্ছন্ন। অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। সাংবাদিক ডেকেছিলেন তুড়ি দিয়ে—তুড়ির শব্দে তাকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

এই—এই—শুনো।

বুকে হাত দিয়ে সে বলেছিল—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। তোমার নাম তো বিপাশা?

—হ্যাঁ।

—তবে সাড়া দাও না কেন?

—বিপাশা বলে তো ডাকে না আমাকে—আমাকে ডাকে বিয়াস বলে।

—আচ্ছা।

—তোমার ঘর কোথায় ছিল?

—শিয়ালকোট।

—কোন্ জাত?

—হিন্দু।

—বাবার নাম কি ছিল?

—নগিন্দর নাথ ভট্টচারিয়া।

—ভট্টচারিয়া?

—হ্যাঁ।

—তুম লোক বাঙালী?

—হাঁ। বাবা বলতেন আমরা বাঙালী। এবার সে তার জানা বাংলায় উত্তর দিয়েছিল।

—বাংলা দেশে কোথায় বাড়ি?

—তা জানি না। কলকাত্তার নজদিক এই জানি!

--কতদিন আছ শিয়ালকোটে? পাঞ্জাবে তোমাদের কতদিন বাস?

—বহুত দিন। হামার দাদো এসেছিল পাঞ্জাব, বাবা বলতেন। হামি বাংলা মুলুক দেখি নি। হামার জনম হয়েছিল বিয়াস দরিয়ার ধারে এক গাঁওয়ে। ওই লিয়ে মেরি নাম বিপাশা। —ডাকে বিয়াস নামসে।

—কি করতেন বাবা?

--পিতাজী প্রফেসর ছিলেন।

- তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল কি করে? তিনি কোথায়?

—ওই খালের ধারে আমাদের দলের উপর হামলা হয়েছিল—লড়াই হয়েছিল। ইদিক-উদিকে হঠবার সময় আমি গির গিয়েছিলাম। পিতাজীর বুকে গুলি তার আগে লেগে তিনি গির্ গিয়েছিলেন। কেঁদে ফেলেছিল বিপাশা। সর্দারজী তার মাথায় হাত রেখে বসে ছিল।

কিছুক্ষণ পর সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করেছিলেন—

—মাতাজী?

—মাতাজী দু বরিষ আগে মারা গিয়েছেন!

- আর কে আছে?

সে তাকিয়েছিল সর্দারজীর দিকে।

সর্দারজী বলেছিলেন--উপর দেখলাও বেটী। এক হ্যায় উপরমে—আওর হ্যায় তুমারা কলিজামে।

—সে আছে আর তুমি আছ। আমি ফালতু। ভরোসা ভগবানের, পরমাত্মার; আর জিন্দিগীর হিম্মৎ তোমার। ব্যাস।

আজ মনে হয়—সেদিনের সেই দিন আর সর্বহারা রক্তাক্ত পরিচ্ছদ বৃদ্ধ সর্দার বলেই এত কথা তার মানিয়েছিল—এবং অফিসাররাও শুনেছিল--নইলে মানাতও না, কেউ শুনতও না—হয়তো বৃদ্ধ সর্দার বলতও না। বারো বছরের মেয়ে বিপাশার সে অবস্থা ছিল কেমন স্তম্ভিত হয়ে-যাওয়া অবস্থা। স্তম্ভিত হয়ে সে শুধু শুনেই গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য। আজও পর্যন্ত শিয়ালকোট থেকে শুরু করে সেই 'নিবিড় তিমির নিশীথিনীর' মত সেই ক দিনের কথা তার মনে আজও একেবারে স্পষ্ট হয়ে আছে। সব কথার অর্থ সেদিন বোঝেনি—পরে ধীরে ধীরে মনে পড়ছে—মনে করেছে আর বুঝেছে।

অফিসার সর্দারের কথায় বলেছিলেন—হ্যাঁ, আপনি সচ্ বাত বলেছেন। একটু থেমে থেকে আবার প্রশ্ন করেছিলেন—বোধ করি এইটেই তাঁর আসল কথা—এই কথাতে আসবার জন্যেই আগেরটুকু ছিল সান্ত্বনা দেওয়া, বলেছিলেন—এখন আপনার কি সাহায্য করব বলুন? এখানে সরকারী আশ্রয়-ক্যাম্প হয়েছে, চলুন সেখানে। তারপর তাঁরাই ব্যবস্থা করবেন আপনি যেখানে যাবেন সেখানে পাঠাবার।

সর্দার বলেছিলেন—আমি কোথাও ঠারতে চাই না সাহেব। আমি অমৃতসর গুরুদোয়ারায় যাব—অমৃতকুণ্ডে আস্নান করব। এই সব খুন ধুয়ে ফেলব। আজই আমি

রওনা হতে চাই।

—এই বাচ্চা লেড়কী—এ যেতে পারবে?

একটু থেমে সর্দারজী বলেছিলেন—ওর দায় কি এখনও আমাকে বইতে বলছেন আপনারা? দেশে আজাদী এসেছে—সরকার এখন হামারই সরকার—; আজাদীর বাটোয়ারার লড়াইয়ে লেড়কা ওর বাপ হারিয়েছে। ও তো সরকারের লেড়কী, ভার তো তাদের।

অফিসার বলেছিলেন—ঠিক হ্যায়। সরকার ভার নিশ্চয় নেবে—শুধু ওর কেন আপনাকেও তো বলছি—

—হামারা সব কুছ গয়া—সরকার হামারা জিন্দাবাদ—লেকেন এখন ভরোসা আমার পরমাত্মার। আমার আত্মা বলছে গুরুদোয়ারায় গেলে তাঁর সন্ধান আমার মিলবে। ওর ভার তোমরা নাও সাহেব। এ লেড়কী বলেছে ওরা বাঙালী—তোমরা বাঙালী—

অফিসার বলেছিলেন—আমি তো সরকারী কামে ঘুরছি সর্দারজী। আর ইনি বাংলার আখবরের লোক। আমি আপনার আর লেড়কীর অমৃতসর যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেখানে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবেন। লেড়কীকে দেখে মেমসাহেবের লেড়কী বলে মনে হয়—একে একলা রাস্তায় যেতে দিলে বিপদ হতে পারে।

—বহুত আচ্ছা। পরমাত্মার যখন তাই ইচ্ছা—তখন তাই হবে। ওর ভার আমি বইব অমৃতসর পর্যন্ত।

লরীতে এসেছিল ওরা অমৃতসর। গায়ে তখন জ্বর, অসহ্য বেদনা। কলেরা ইনোকুলেশন দিয়েছিল লরীতে সওয়ারী হবার আগে।

সর্দারজী তাকে কোলের কাছে নিয়ে বসেছিলেন, ফণাধর অজগর সাপের সন্তান-স্নেহ আছে কি না তা বিপাশা জানে না, কিন্তু শুনেছে, মা-সাপ ডিমের উপর আহার-নিদ্রা ছেড়ে বসে থাকে, আশে-পাশে সামান্য শব্দে গর্জন করে। সর্দারজীও ঠিক তাই ছিলেন। তাকে কোন কথা বলেন নি; শুধু পিঠে হাত রেখে এসেছিলেন সারাটা পথ। এবং কেউ তাকে একটু ঠেললে কি তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইলে, গর্জন করে উঠেছেন। শীত পড়ছে তখন; পাঞ্জাবের শীত; লরীতে ওঠার আগে ফি জনকে দুখানা করে কম্বল দেওয়া হয়েছিল; সর্দারজী নিজে একখানা কম্বল রেখে তার গায়ে তিনখানা কম্বল জড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কথা বলেন নি—তার বাপ, মা, অতীতের কথা, এমন কি কষ্ট হচ্ছে কিনা তাও প্রশ্ন করেন নি। নিজে যতটুকু অনুভব করেছেন, তারই সাধ্যমত প্রতিকার করেছেন। বোধহয়, তাঁর অন্তরের অন্তর পরমাত্মার সন্ধান করছিল। তার সঙ্গে কারবার ছিল বাইরের অন্তরের। কিংবা কথাবার্তা বলে তার মধ্যে দিয়ে নিজের অন্তরস্রোতের সঙ্গে তার অন্তরস্রোতের সংগম ঘটাতে চাননি। স্রোতের মত যার সত্তা তার দুটি মিশে একটি হলে আর তাকে আপন আপন সত্তায় পৃথক করা যায় না। সেই মিলিত স্রোত আবার যখন পৃথক হয়, তখন দুয়েরই কিছু কিছু ছিন্নভিন্ন পৃথক হয়ে যায়। সেই বিচ্ছেদ মর্মচ্ছেদী। বোধকরি, তার ছিন্নভিন্ন মর্মকে আরও বেশী করে রক্তাক্ত করতে চাননি।

অমৃতসরে তাকে রিহ্যাবিলিটেশন আপিসে দেওয়ারই কথা। অফিসারটি একখানি পত্র দিয়েছিলেন এয়ারফোর্সের এক বাঙালী অফিসারের নামে। সর্দারজী খোঁজ করে অনেক চেষ্টা করে সেই অফিসারের সঙ্গে দেখা করে তার হাতে চিঠি দিয়ে তার জিম্বায় তাকে দিয়ে এসেছিলেন।

অফিসার চিঠি পড়ছিলেন, সর্দার তাকে এতক্ষণে বলেছিলেন-- লেড়কী, এখন আমার ছুট্টী। এইবার আমি চলে যাব। তোমার ভালমন্দ এখন তোমার নসীবের হাতে। আর নসীবের মন্দ খেলের হাত থেকে বাঁচবার ভার পরমাত্মার হাতে আর তোমার আত্মার হাতে। ভরোসা, পরমাত্মার—হিম্মৎ তোমার আত্মার। পরমাত্মা বাৎলাবেন কি করতে হবে—তোমাকে তাই করতে হবে। আনন্দ রহো বেটী। ইয়াদ রাখো কি, জীবনকে আনন্দ হ্যায় জিন্দিগীমে। জানকে ধরম হ্যায় জিন্দিগী! বাঁচবে। লড়াই করে বাঁচবে। তবে হ্যাঁ—মরণও কভি কভি সাচ্চা হয়—সে কখন জান, যখন মনে হয় মরণেই আনন্দ। শোকে নয়, দুঃখে নয়, জানের ভয়ে নয়। আনন্দে। ইজ্জৎ বাঁচানোর আনন্দে। লড়াইয়ের আনন্দে।

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে এয়ার অফিসার বলেছিলেন--এই মেয়ে বাঙালী? দেখে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা কাশ্মিরী মনে হচ্ছে! ইংরিজীতে বলেছিলেন।

বিপাশা ভাঙা বাংলায় বলেছিল—হামার পিতাজীর নাম হচ্ছে নগিন্দরনাথ ভটাচারিয়া।

—নগিন্দরনাথ? নগেন্দ্রনাথ? হুঁ!

—হাঁ—নগেন্দ্রনাথ ভটাচারিয়া। কলকাত্তার নজদিকে হামাদের ঘর ছিল।

—আচ্ছা। তুমি বস!

সর্দারজী বলেছিলেন—নমস্তে সাব, হামি চলি! লেড়কীর ভার আপনার। আচ্ছা বেটী। আবার ঘুরে বলেছিলেন--হামার নাম হরদয়াল সিং, গুরুদোয়ারা অমৃতসর হামারা পতা। আচ্ছা।

সর্দার হরদয়াল সিং। তাকে অনেকবার চিঠি লিখেছে সে—দুএকখানা প্রাপকের সন্ধান মেলেনি বলে ফিরে এসেছে—বাকীগুলো ফেরতও আসেনি, উত্তরও মেলেনি।

দিব্যেন্দুও কি সর্দার হরদয়াল সিংয়ের মত হারিয়ে যাবে? সর্দার হরদয়াল সিং তার দ্বিতীয় পিতা--দিব্যেন্দু তার প্রথম প্রণয়ী। মনে মনে সে তো তাকে স্বামীত্বেই বরণ করেছিল। পরস্পরের কাছে মনের কথাটি অজ্ঞাত ছিল না। বলা হয় নি কোন দিন পরস্পর বাক্যবদ্ধ হয়নি — কিন্তু যা হয়েছে সে যে বাক্যে প্রকাশের চেয়ে অনেক বেশী।

বাক্যে প্রকাশ হয়নি--সেও তো দিব্যেন্দুর আগ্রহে। কতদিন সে বলেছে না ওইটুকু বাকী থাক, অনুক্ত থাক। পূর্বরাগের মাধুরীর মধু দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ সুলভ হয়ে গেলে শ্রমের পর বাতাস ও জলের স্বাদের দুর্লভতা হারিয়ে যাবে। চিনি খেলেও তেষ্টা যায় বিয়াস, কিন্তু বৈশাখের রৌদ্রে বালির প্রান্তর পার হয়ে ঝরনাকে আবিষ্কার করে জল খেয়ে যে তৃপ্তি, তার যে স্বাদ, তা কি চিনি-মিষ্টি খেয়ে জল খেয়ে পাওয়া যায়? তা হোক না সে সুন্দরী বধূর হাতের তৈরি।

প্রচণ্ড জীবনাবেগ-ভরা দিব্যেন্দু!

সর্দারজীর কথা শুনে বলত—ভারী ভাল কথা বিয়াস। জানকে ধরম্ হ্যায় জিন্দগী। জীবনকে আনন্দ হ্যায় জিন্দগীমে। জিন্দগী হ্যায় সাচ্চা। আওর বিলকুল ঝুট্টা। বহুৎ আচ্ছা। ঠিক কথা বিয়াস নইলে দুনিয়ায় আদি কাল থেকে সবাই ওই আশীর্বাদই করেন কেন—জিতা রহো। আনন্দ রহো।

দুর্দান্ত দিব্যেন্দু। প্রচণ্ড দুর্দান্তপনার জোরে তার জীবনটাকে যেন জবরদস্তি দখল করে নিয়েছিল। প্রথম পরিচয়েই সে যে কথাগুলো তাকে বলেছিল—অভিসম্পাত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল, সেগুলো আজো তার কানে যেন সঙ্গীতের কথার মত মোহ এবং মাধুরীর সৃষ্টি করে। সেদিন তার ভাল লাগে নি। প্রচণ্ড ক্রোধ হয়েছিল।

দিব্যেন্দু প্রশ্ন করেছিল—তুমি বাঙালীর মেয়ে? প্রশ্ন করেছিল অবশ্য তার এই রঙ চোখ চুল দেখে!

সে বলেছিল—হ্যাঁ। বাঙালী মানে কালো সাঁওতাল নয়। সে কি রঙে, কি আচারে-ব্যবহারে!

দিব্যেন্দু দমে নি! বলেছিল—ওগো বর্ণগরবিনী, এত গরব ভাল নয়। এদেশ এই ভারতবর্ষের সব সৌন্দর্য কালোতে। তার সব সাধন কালোর জন্যে। সাদা শিব, কালীর প্রেমে পায়ে পড়েছেন। রাধারা কালোর জন্যে দেহপাত করেছেন। এদেশের সব থেকে বড় মানুষ, ভগবান বলে যাদের ডাকি, তারা হলেন—রাম আর শ্যাম। পাঞ্জাবে কাশ্মীরে তোমার মত অনেক রূপ দেখেছি, সেখানে আর্য সৌন্দর্য এসে কালো চুল কালো চোখ নিয়ে অপরূপ হয়েছে। মার্জারসুন্দরী, তোমাকেও আমি বলছি, কালোরূপের জন্য পাগল হতে হবে। অবশ্য আমি নই, যদিও আমি কালো।

কথাগুলো হয়েছিল তাদের পরিচয়ের প্রথম দিন। ঝগড়ার মধ্যে সে বিচিত্র পরিচয়।

দুই

দিল্লীর কনস্টিটিউশন হাউস। বিপাশা তখন সদ্য বি-এ পাস করেছে। মিশনের চাকরিটা তখনও নেয় নি। তাঁরা চেয়েছেন—তাকে, কিন্তু সে ভাবছে! জীবনে তখনও সমস্যা কোন পথ নেবে। এয়ার হোস্টেস? অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো? কমার্শিয়াল ফার্মে রিসেপশনিস্ট? শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখে কোন চাকরি? এম-এ পাস করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন? স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়ে আসা? অথবা মিশনের ওই শিক্ষাব্রত? মিশনের কাছে তার অনেক ঋণ। কয়েক বছর সে পড়েছে। তাদের প্রভাবও আছে এই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। সে ভাবছে। সর্দার হরদয়াল সিংয়ের সে-উপদেশ সে ভোলে নি। জানকে ধরম হ্যায় জিন্দগী। জিতা রহো, আনন্দ রহো পৃথিবীর প্রথম আশীর্বাদ, শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। জিন্দগী সচ্চা হ্যায় আনন্দমে, বিনা আনন্দসে জিন্দগী ঝুটা, মিথ্যা। সে তাই বিচার করে দেখছে, ভাবছে, আনন্দ সে কোন্ পথে পাবে?

হাই-হিল জুতো পরে, বব করে বা সিংগল করে চুল ছেঁটে, লিপস্টিক-রুজে তার শুভ্র সুন্দর মুখকে এনামেল করে সোসাইটি গার্ল হয়ে বা ওই উপযোগী চাকরিতে আনন্দ, না কল্যাণধর্মী শিক্ষাব্রতে আনন্দ? প্রথম দিকটাই নিশ্চয় সে বেছে নিত, যদি এই কয়েক বছর মিশনারীদের সংস্রবে না-আসত এবং সর্দার হরদয়াল সিংকে ভুলতে পারত! তার যে আজও মনে পড়ে তাদের সেই পিতাপুত্রের চারজনের সঙ্গে যুদ্ধ; পুত্রের মৃত্যু; মৃত পুত্রকে ফেলে, তাকে কাঁধে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে পাকিস্তান সীমারেখা পার হয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসার সেই স্মৃতি। সেই ছবি। এখন সে থাকে একটা বোর্ডিংয়ে। কনস্টিটিউশন হাউসে আসত তার বান্ধবীর কাছে। কনস্টিটিউশন হাউস বিচিত্র ক্ষেত্র; সারা ভারতবর্ষ, শুধু তাই কেন, বহিঃপৃথিবীর মানুষকে শুধু নিয়ে সে মেলা বা জগন্নাথক্ষেত্র। কেরানী থেকে আই-সি-এস, এম-পি-দের বস-বাস এখানে। এখানে কয়েকজন বান্ধবীই তার ছিল। পুরুষ বন্ধু আজও তার জোটে নি। জোটায় নি সে। চিত্ত তার ওদিকে যেন উন্মুখই হয় নি। বরং একটু বিরূপ এবং বিমুখই ছিল। তার জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা, তার দুঃখ-কষ্ট তাকে শুধুই ঠেলত তখন—শক্ত হয়ে আগে নিজে দাঁড়াও। এই একুশ-বাইশ বছরের জীবনে, সেই বারো বছর থেকে সে তো দেখে এসেছে পুরুষের নারীদেহ-লোলুপতা। পিশাচ বর্বর পশুদের সে মূর্তি তার মনে পড়ে। তারপর অনেক—অনেক দেখেছে। পুরুষের মধ্যে প্রেমে তার বিশ্বাসই নেই তখন।

তার বান্ধবী মারাঠী মেয়ে যশোদা বাঈ তাকে বলত, ইউ সি বিয়াস, তুমি যদি মুঘল আমলে দিল্লী আসতে, তাহলে কোন্ দিন তুমি লালকিল্লার বাদশাহী হারেমে গিয়ে ঢুকতে। লাল কুঁয়রের মত তুমিই চালাতে তামাম হিন্দুস্থানের শাসন—আর বাদশা জাহান্দার শার মত কোন শাহ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত। এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির আজাদ-হিন্দুস্থানের ডেমোক্রেসীই তোমার লাককে ব্যাডলাক করে দিয়েছে।

সে বলত—তাহলে তুমিও বাদ যেতে না যশোদা। আমি অন্তত বাদশার কানে তুলে দিতাম—অমুক ঠিকানায় যশোদা বলে এক মারাঠী সুন্দরী আছে। তাকে না আনলে জাঁহা-পনার হারেমের শোভায় খুঁত থেকে যাচ্ছে।

যশোদা বাঈয়ের স্বামী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরে, দিল্লীতে বদলী হয়ে এসেছিল বছর কয়েক আগে। একটি বাচ্চা। যশোদা সত্যিই সুন্দরী মেয়ে। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলেজে। প্রাইভেটে আই-এ পাস করে এসেছিল দিল্লীতে, এসে বি-এ দিচ্ছিল। স্বামীর উপাধি তলোয়ারকর, চাকরিই করত। এখানে এসে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগেছিল ফরেনঅ্যাফেয়ারস্-এ ঢুকে দেশান্তর ঘোরে। তাতে নিজের যোগ্যতার সঙ্গে স্ত্রীর বিদেশ-বাসের যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। যশোদারও সে দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল। তাড়াতাড়ি বা নিশ্চিতরূপে একেবারেই বি-এ পাসের আশায় কলেজে ভর্তি হয়েছিল। আলাপ ওর সঙ্গে কলেজেই। মিশনারীদের পরিচালিত একটি মেয়েদের কলেজের সান্ধ্য-বিভাগে। সেখানে বেশীর ভাগই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ক্রীশ্চান। এরা দুজন হিন্দু বলে আলাপের ক্ষেত্রটি অনুকূল হয়ে উঠেছিল। কনস্টিটিউশন হাউসের কিচেন সহ একখানা ঘর নিয়ে যশোদারা থাকত। সেখানে সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই আসত বিপাশা। যশোদার ছেলেটির সঙ্গে খানিকটা খেলা করে, তাকে নিয়ে খানিকট

লোফালুফি করে সন্ধ্যে হতেই দুজনে বেরিয়ে যেত কলেজে। যশোদার স্বামী তলোয়ারকর তখন ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। বিপাশা দিনে একটা চাকরি নিয়েছিল ওই মিশনারীদের বাচ্চা ছেলেদের স্কুলে।

কনস্টিটিউশন হাউসের আর এক বান্ধবী তার মিস সেন। চাকরি করেন রেডিয়োতে। ওরই কাছে বাংলা শিখত বিপাশা। দিল্লীতে এসে স্কুলে ভর্তি হয়ে অবধি প্রাণপণ চেষ্টায় সে বাংলা শিখেছে। বারবার তার গায়ের রঙ, চোখ ও চুলের রঙ দেখে লোকে তার বাঙালীত্বে যে সন্দেহ করেছিল—সেটা বিপাশাকে আহত করত। তাই পড়ার সুবিধা পেতেই সে চেষ্টা করে বাংলা শিক্ষার সুযোগ করে নিয়েছিল। জীবনের শুরুতেই বাপ-মাকে হারিয়ে হয়তো তার গোপন মনে বাসনাও জেগেছিল তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে যে, একদিন কলকাতায় গিয়ে খুঁজে দেখবে তার আত্মীয় স্বজন কেউ আছে কি না। কলেজে এসে বাংলা নিয়ে পড়ায় বাধা হয়েছিল। সেই সুবিধাটা করে নিয়েছিল সে মিস সেনের কাছে। মিস সেন তার থেকে বয়সে বেশ কিছুদিনের বড়। মিষ্ট প্রকৃতির মেয়ে। গান গাইতে পারেন, অভিনয় করতে পারেন, দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন মিস সেন। প্রকৃতিতে ঠিক বিপাশার সঙ্গে মেলে না, কারণ মিস সেন সোসাইটি-ঘেঁষা মেয়ে। যশোদাই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। যশোদা মিস সেনের কাছে সোসাইটির আইন-কানুন শেখে। দেশ বিদেশ ঘুরে এবং রেডিয়োতে চাকরি করে মিস সেন ও-সবে খুব পোক্ত। মিস সেন বিপাশাকে বলে কাশ্মীরী বেগম। উদিপুরী। সম্রাট আলমগীরের উদিপুরী গো! প্রথম প্রথম বুঝতে পারত না বিপাশা। তারপর একদিন মিস সেন তাকে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আলমগীর ও উদিপুরী রেকর্ডখানা শুনিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ বইখানাও পড়িয়ে দিয়েছেন।

এই দুজনের কোন একজনের কাছে সে যেতই কনস্টিটিউশন হাউসে।

সেদিন, যশোদাদের ঘরটা বন্ধ, ওদের উইংয়ের পরিচারক বলেছিল—গোল-মার্কিটে গিয়েছেন মিস্টার-মিসেস, জলদি ফিরবেন। মিস সেন নেই, তিনি ডিউটিতে গেছেন। অগত্যা সে ডাইনিং হলের সামনে বইয়ের স্টলটায় কাগজ বই উল্টে দেখছিল, এমন সময় একটি কালো—অবশ্য ভারতবর্ষে যাকে শ্যামবর্ণ বলে তাই, সাহেবী পোশাক-পরা তরুণ আপন মনে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। বাংলা কবিতা। স্বাভাবিক ভাবেই সে কান পেতেছিল।

> প্রচণ্ড আবেগে যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—
> তব দ্বারে করাঘাত করি—
> আকুল প্রেমার্ত মোর জীবনের অর্ঘ্য তুলে ধরি—
> তাও তুমি নেবে না সুন্দরী?
> বশিষ্ঠের মত—

আর সে শুনতে পায়নি। লোকটি লাউঞ্জের দরজায় ঢুকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। বাংলাতে তার তখন যথেষ্ট দখল হয়েছে। উচ্চারণে একটু টান থাকলেও বেশ বাংলা বলে, লেখে আরও ভাল। বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছে, শরৎচন্দ্র পড়েছে, রবীন্দ্রনাথও পড়েছে তবে কবিতা

সব বোঝেনি। কথা ও কাহিনীখানা কণ্ঠস্থ; নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ মুখস্থ। বাঙালীদের এখানে ওখানে যে সব ক্লাব আছে, সে সব জায়গায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তি করেছে। কিন্তু উচ্চারণের জন্য পুরস্কার পায়নি। সেবার কালীবাড়ির আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় ওই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আবৃত্তি করেছিল—তাতে তাকে ভিন্ন-প্রদেশিনী বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনে করে উৎসাহিত করবার জন্য একটা পুরস্কার তাঁরা দিয়েছিলেন—কিন্তু সে তা নেয় নি। তার ট্রেনার ওই মিস সেন। তিনি হেসে বলতেন—যা শিখেছ তুমি, তা কম নয় বিয়াস। এর থেকে বেশী শিখতে হলে, কিংবা তোমার কথাবার্তা পারফেক্ট করতে হলে—খাস বাংলাদেশে যেতে হবে। তোমাকে তো বহুবার বলে দিয়েছি যে, আমরা অনেক স্থলে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করি নে। উহ্য থাকে। যেমন—জিজ্ঞাসা করছে কেউ তোমাকে—মিস সেন তোমার কে? ওখানে ক্রিয়াটা হল—'হন', ওটা বলিনে। তুমি উত্তর দিচ্ছ—আমার বান্ধবী। বা, আমার শিক্ষয়িত্রী। এখানেও তাই, ক্রিয়া উহ্য। কিন্তু তুমি ঠিক বলবে—মিস সেন তোমার কে হচ্ছেন? উত্তরেও বলবে, বান্ধবী হচ্ছেন। মানে 'হায়'টা ভুলতে পার না। আমাদের হিন্দী পুলিস আয়েগীর স্থলে আয়েগার মত। আমার হিন্দী দিল্লীতে এসে রপ্ত হয়েছে। বাংলা রপ্ত করতে তোমার কলকাতায় যেতে হবে। নাও না—রেডিয়োতে একটা চাকরি। চলে যেয়ো কলকাতা। বাংলায় ইণ্টারভ্যুতে তুমি ফেল করবে না, এ আমি লিখে দিতে পারি।

সেদিন এই কালো স্বাস্থ্যবান তরুণটির আবৃত্তি তার ভাল লেগেছিল। বাংলা আবৃত্তি মিস সেন বেশ ভাল করেন। এ তার থেকে মন্দ করে নি। কয়েকটি লাইন শুনে অর্থ তার ঠিক উপলব্ধি হয়নি—তবে এটুকু বুঝেছিল—কোন সুন্দরীর কাছে ভদ্রলোক প্রেম নিবেদন করছেন। একটু মুখ টিপে হেসেছিল। তরুণ বয়সে পুরুষদের বড় জ্বালা! বেচারারা!

ওঃ, কত জনকে যে কত কটু কথা, কত ধমক তাকে দিতে হয়েছে এই বয়সে! বাপ্! তবে ধমক খেলেই এই প্রেম-পাগলেরা পিন-ফোটানো বেলুন হয়ে যায়।

ওঃ! কনট সার্কাসে সে থিয়েটার কম্যুনিকেশন বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর এক প্রেমার্ত তরুণ তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজকাল পেণ্টালুন আর বুশ শার্টের দৌলতে কোন্ প্রদেশের লোক চেনা কঠিন—শুধু পাঞ্জাবীরা পাগড়ী বজায় রেখে জাত রেখেছে; বাকী তো সব ইণ্টারন্যাশানাল। ছোকরা তাকে দেখেই তার পিছু নিয়েছিল। এবং কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করেই মৃদুস্বরে অন্য দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করেছিল—হ্যালো মিস! হ্যালো মিস!

একবার পকেট থেকে একগোছা নোট বের করেছিল। গুণে দেখার ছল করে পরিমাণের বহরটা বুঝিয়ে দিয়েই বোধহয় পকেটে পুরেছিল। তিক্ত কৌতুকে সে তির্যক দৃষ্টিতে সবই দেখেছিল। সে সম্পর্কে ছোকরাও সচেতন ছিল। এবং তাতেই উৎসাহিত হয়ে একটু কাছে এসে বলেছিল, কফি হাউসে এক কাপ কফি খাওয়া সম্পর্কে কি বলেন আপনি?

সে তার মুখের দিকে ভাবলেশহীন ভাবে তাকিয়েই ছিল, ভাবছিল—মারবে এক চড়? অথবা স্যাণ্ডালটা খুলে পটাপট ঘা কতক? ছোকরা সম্ভবত মৌনং সম্মতি লক্ষণং ভেবে

অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে বলেছিল—তারপর একখানা ট্যাক্সিতে কুতবমিনার পর্যন্ত ? কি বলেন আপনি ? বলেই সে একটা ধাবমান খালি ট্যাক্সিকে ডেকেছিল—ট্যাক্সি !

সঙ্গে সঙ্গে বিপাশা এবার মৃদুস্বরে ডেকেছিল—পুলিস ! পুলিস শুনতে পায় নি, কিন্তু সেই ছোকরা শুনতে পেয়েছিল, এবং যেন আতঙ্কে চমকে উঠেছিল, বলেছিল—কি ? কেন ?

—পুলি-স—আবার ডেকেছিল সে একটু গলা উঁচু করে। অথচ হাসিতে তার ভিতরটা যেন ভেঙে পড়ছে।

তখন ছোকরার মুখ-চোখ শুকিয়ে একমুহূর্তে যা হয়েছিল—তার উপমা পিন-ফোটানো বেলুন ছাড়া কিছু হয় না। ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়িয়েছে তখন, ছোকরা প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দরজা খুলে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু পা হড়কে পড়েছিল হুমড়ি খেয়ে। বেচারা আধখানা ট্যাক্সির মধ্যে, আধখানা বাইরে রাস্তায়। বেচারা কোন রকমে উঠে গাড়িতে বসেই বলেছিল—চালাও ! জলদি !

ওকে ভয় দেখাতে কৌতুক করে এক পা এগিয়েছিল বিপাশা, যেন গাড়িটা ধরবে। ড্রাইভার একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, স্টার্ট দিতে দেরি করেছিল। ছোকরা এবার চিৎকার করে উঠেছিল, আ—শব্দ করে।

আর থাকতে পারেনি বিপাশা—সে ফিরে হন হন করে চলে গিয়েছিল মার্কেটের কোনও নির্জন কোণে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে হাসতে।

চড়-চটীও বার দুই তিন সে চালিয়েছে। এ-সবগুলো ছ্যাচড়া, ছিঁচকে চোরের মত। এরা বাদ দিয়েও সুস্থ সবল তরুণেরা যেন প্রেমের ক্ষেত্রে একটু বোকা-বোকা। কেউ কেউ আবার বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সেটা এদের অন্তত এই ভদ্রলোকের, কবিতা আবৃত্তির মধ্যে স্পষ্ট। এ দেশেরই বা দোষ কি ? কোন দেশের পুরুষেরাই তা নয়। যুদ্ধের মত নিষ্ঠুর কঠিন ক্ষেত্রে 'মাতাহারি'রা কি খেলাই না খেলে গেছে। ভদ্রলোকের আবৃত্তি শুনে এত সব কথাই তার মনের মধ্যে পর পর ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটি কৌতুক-উপভোগকারিণী মনের প্রসন্নতায় বক্র হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল তার মুখে।

ঠিক এই সময়েই ফিরেছিল যশোদা। রবিবার আজ, তাই একবার মার্কেটে গিয়েছিল স্বামী-স্ত্রীতে, রাত্রে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করবে আজ। আজ তাদের বিয়ের অ্যানিভারসারি।

চটে গিয়ে বিপাশা বলেছিল—কিন্তু তুমি আমাকে কাল তো বল নি ?

লজ্জিত হয়ে যশোদা বলছিল—বলতাম। কিন্তু—

—কি কিন্তু ? তুমি ইচ্ছে করে বল নি !

—না মিস ভট্টাচারিয়া, আমি অপরাধী—আমার কাছে শুনুন, কাল সারাটা দিন ওর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ ছিল না। উই কোয়ারল্ড।

যশোদা বলেছিল—সে ভাই ঠুটো বেড়ালের মত। ও-কোণ থেকে ও এ্যা-ও করেছে, এ কোণ থেকে আমি করেছি—এ্যাঁ-ও ! জান, একবার খেপে গিয়ে বাচ্চাটাকে আমি মেরেছিলাম—অ্যাণ্ড হি জাম্পড্ অন মি। সত্যি বলছি। খপ করে পিছন দিক থেকে

আমার বেণী ধরে টেনে বলেছিল—খবরদার, আমার বাচ্চাকে তুমি মারবে না।

নিজের হাতখানা বিপাশার চোখের সামনে ধরে তলোয়ারকর বলেছিল—দেখুন, হাতটা কি করেছে দেখুন, নখের আঁচড়ে!

বিপাশা হেসে উঠেছিল এবার, বলেছিল—ছি-ছি-ছি, পাড়া জানিয়ে করেছ তো সব! এই কনস্টিটিউশন হাউস, অলইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মুসাফেরখানা; ছড়িয়ে গেল তো বিশ্বময়!

তলোয়ারকর বলেছিল—হলফ করে বলতে পারি, ইন দি নেম অব গড, উই কোয়ারল্ড বাট ভেরি সাইলেণ্টলি! একবার চাপা গলায় বলেছিলাম, বাচ্চা আমার, খবরদার মারবে না। তাও মারাঠীতে। ও-ই তার উত্তরে জোর চেঁচিয়ে উঠেছিল—কি! সব তখন ঘুমুচ্ছে অবশ্য; কেবল সামনের উইংয়ের ঘরটায় এক বাঙালী এসেছে, লোকটা জেগে কিছু লিখছিল, ও শুনেছিল। কিন্তু বাচ্চাটা সিচুয়েশন সেভ করেছে, জোর চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল। লোকটা বাইরে এসেছিল, কিন্তু বাচ্চার কান্না শুনে ভাবল, পড়ে টড়ে গেছে।

বিপাশা সকৌতুকে বলেছিল—লম্বা কালো মত তো? সেও এক পাগল। আপন মনেই হাত-পা নেড়ে কবিতা রিসাইট করতে করতে গেল, করিডোর দিয়ে! তারপর তোমাদের মিটল কি করে?

যশোদা বলেছিল—সেটা যার বিয়ে হয় নি সে শুনবার অধিকারী নয়। শুনলেও বুঝতে পারে না। ওটা বিবাহিতদেরই ওপেন সিক্রেট! তাদের একজন হলে জিজ্ঞাসাই করতে না কথাটা!

বিপাশা বলেছিল—হ্যাঁ। বোকাদের সিক্রেট বুদ্ধিমানেরা বুঝতে পারে না। আমার বুঝে কাজ নেই। কিন্তু আমি আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে। বলেই উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। কনস্টিটিউশন হাউসের সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড, কার্জন রোডে ফটফটিয়াও ছুটেছে মিনিটে-মিনিটে, চার আনা সিট কনট সার্কাস পর্যন্ত। সে একটা ফটফটিয়ায় সওয়ারী হয়ে কনট সার্কাস গিয়ে কিছু ফুল কিছু মিষ্টি এবং বাচ্চাটার জন্যে একটা বল কিনে নিয়ে ফিরে এসেছিল।

যশোদা এবং তলোয়ারকর দুজনেই তাকে এরপর ধরেছিল রাত্রে খেয়ে যেতে হবে। বিপাশা তা প্রত্যাখ্যান করেনি। বলেছিল—নিশ্চয়! তোমরা ভেবেছ তোমরা না-বললেও আমি চলে যেতাম? নেভার। আজ তোমাদের বিবাহিত জীবনের মধু এবং মাধুরীর অ্যানালিসিস্ করে তবে আমি যাব।

যশোদা হেসেছিল, বলেছিল—রকেট ছুঁড়ে মহাশূন্যের তথ্য জানার মত হবে আর কি।

বিপাশা ওদের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলেছিল—ও আমি জেনে গেছি যশোদা। এই দেখ, তার স্বাদ আমি গ্রহণ করছি।

তারপর তাকে নিয়ে সামনের মাঠে বলখেলা শুরু করে দিয়েছিল। কনস্টিটিউশন হাউসের প্রতি উইংয়ে সারিবন্দী ঘর এবং সামনা-সামনি দুই উইংয়ের মধ্যে সুন্দর একটি করে

লন। সারাটা গ্রীষ্মকাল লোকে এই লনে খাট পেতে শুয়ে থাকে, বিকেলে ছেলেরা খেলা করে, শীতকালে মৌসুমী ফুলের সমারোহে ঝলমল করে। যশোদার বাচ্চাটি স্বাস্থ্যবান ছেলে, মহারাষ্ট্রীয় দৃঢ়তা যেন ওর সর্বাঙ্গের গড়নের মধ্যে উদ্যত হয়ে আছে, রঙটা মায়ের মতই ফরসা, একমাথা কোঁকড়া চুল, গ্যালিসের মত কাপড়ের ফিতেওয়ালা হাফ-প্যাণ্ট-পরা ছেলেটির মধ্যে একটি গ্যাণ্ডো-গ্যাণ্ডো ভাব আছে; ছোটে যেন গুলবাঘের মত। পড়েও কাঁদে না। বিপাশা পায়ে ঠেলে বল ছুঁড়ে দিচ্ছিল, আর সে ছুটে গিয়ে ধরছিল, সেও পা দিয়ে মারতে চেষ্টা করছিল, মধ্যে মধ্যে পড়ছিল। বিপাশা তাকে উৎসাহিত করছিল, বাহবা মেরে লাল! সে-ও আধ-আধ ভাষায় বলছিল, বাঃ! মেলে লাল! লাল! লাল! এরই মধ্যে হঠাৎ একসময় বিপাশা শুনতে পেল সেই আবৃত্তি। খেলতে খেলতে থেমে দেখল, সেই বাঙালী ভদ্রলোক, এখনও তাঁর আবৃত্তি চলছে। ঘরের দরজা খুলে ঢুকে গেলেন। আবৃত্তি চলতে লাগল।

বহুদিন হল কোন ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়

এলে তুমি ঘন বরষায়;

বাঃ, বরষায় বলার কায়দা আছে ভদ্রলোকের এবং আশ্চর্য ধৈর্যও আছে, একেবারে শেষ লাইন পর্যন্ত আবৃত্তি করে গেল—

এ পরান ভরি যে গান বাজালে সে তোমার করো সায়—

আজি জলভরা বরষায়।

সে আবার কাঁপিয়ে হেলিয়ে বেঁকিয়ে কত কায়দায় ব-রষায়!

ইচ্ছে হল একবার ব্রাভো ব্রাভো বলে বাহবা দেয়। বা, বলে আসে—মহাশয়, প্রতিবেশীদের কর্ণগুলির জন্য একটু বিবেচনা করিলে অত্যন্ত সুখী হইব।

যশোদা এই মুহূর্তে ডাকলে—চা খাও।

বাইরে বারান্দায় মোড়া এবং বেতের টেবিল পাতা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে বসেছিল। ভদ্রলোক তখন থেমেছেন। সে বলেছিল, বাবাঃ! এতক্ষণে যেন থেমেছেন ভদ্রলোক। বোধহয় ক্লান্ত হয়েছেন।

যশোদা বলেছিল—উঁহু। ও যন্ত্রটি থামে না এবং দমও ফুরোয় না। কাল সকালে এসেছে, সারাটা দিন চলেছে। আমরা রাত্রে যখন ঝগড়া করছি, তখনও আবৃত্তি চলছে।

—বোধহয় কবি অথবা অ্যাক্টর! কিন্তু অ্যামেচার।

তলোয়ারকর বললেন—না। এঞ্জিনীয়ার। ভাকরা-নাঙাল দেখে পাঞ্জাব ঘুরে এসেছে। বাংলা দেশের ডি-ভি-সি দামোদর ভ্যালী—

ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল, ও-গো—!

যশোদা বললে—ওই শুরু হলো আবার! বলছি তো—ওর জন্মক্ষণ থেকে ভগবান যন্ত্রটিতে অফুরন্ত দম দিয়ে রেখেছেন।

বিপাশা অকস্মাৎ ঈষৎ চকিত হয়ে উঠল। খানিকটা চা ছলকে পড়ে গেল টেবিল-ক্লথের উপর। যশোদা বললে—হোয়াটস্ আপ, কি হল?

—চুপ কর তো একটু !

আবৃত্তি তইন চলছে—

"অপরূপা সুন্দরী বিয়াস, তপস্বিনী কুমারী বিপাশা—"

যশোদা বললে—স্ট্রেঞ্জ ! বিপাশা !

আরক্ত হয়ে বিয়াস বললে—চুপ কর !

"জীবনের মিটাতে পিপাসা—
তোমার তরঙ্গময়ী উজ্জ্বল যৌবনস্রোতে—
মর্ত্যসীমা গিরিচূড় হতে—
প্রচণ্ড আবেগে যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়ি,
তব দ্বারে করাঘাত করি—
আকুল প্রেমার্ত মোর জীবনের অর্ঘ্য তুলে ধরি ;
তাও তুমি নেবে না সুন্দরী ?

উঠে দাঁড়াল বিপাশা উত্তেজনা বশে। যশোদা প্রশ্ন করলে—কি বলছে ?

তলোয়ারকর প্রশ্ন করলেন—এ কি তোমাকে বলছে ?

বিপাশা বললে—ঠিক বুঝতে পারছি নে।

—তোমাকে ও জানবে কি করে ?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলে স্থির হয়ে আবৃত্তি শুনছিল বিপাশা। চোখের পলক পড়েনি। আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করে চলেছিল ভদ্রলোক। দিব্যেন্দুর তখন ভদ্রলোক ছাড়া তো অন্য অভিধা ছিল না, যদিও বিপাশার মনে হচ্ছিল, অতি বুদ্ধিমান অভদ্র ব্যক্তি। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তার ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

আবৃত্তি চলেছিল। দেখতে পাচ্ছিল বিপাশা, ঘরের ভিতর আরাম-চেয়ারে বসে হাত নেড়ে লোকটা আবৃত্তি করে চলেছে।

"আমি তো বশিষ্ঠ সম শোকতপ্ত মৃত্যুকামী নহি,
আমি আসিয়াছি আজি উন্মাদ উল্লাস রাশি বহি—
আমার জীবন পণে আসিয়াছি নিতে তোমা জিনি।
শুনিয়াছি, ওগো তপস্বিনি—
খুলিয়া সবার পাশ, সেই পাশে রয়েছ বন্দিনী।
ফিরে যেতে আমি আসি নাই—
নির্ভীক পৌরুষ বলে আমি তব ব্রতভঙ্গ চাই।
ঝাঁপ দিয়া তব জল তলে—
খুলিয়া তোমার পাশ—পুষ্পমালা দিব তব গলে।
বিপাশা ঘুচায়ে ছিল পাশ
সে কোন্ অতীতে ; আজ তুমি হয়েছ বিয়াস ;
তা ধ্বনির সঙ্গীতে ও ইঙ্গিতে প্রকাশ—

ডাকিতেছে এস প্রিয়, এস বন্ধু, মিটাও তিয়াস।

আমার বিয়াস!

শেষ হল আবৃত্তি। মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করলে বিপাশা আরও আছে কিনা বুঝতে, তারপর হন হন করে গিয়ে দরজায় টোকা মেরে বললে—মে আই কাম ইন?

—ইয়েস, প্লিজ কাম ইন—

উঠে দাঁড়িয়েছিল দিব্যেন্দু। এবং কুণ্ঠিত ভাবে বলেছিল—প্লিজ বি সিটেড!

—না। আপনি ও কি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন? কণ্ঠস্বর তার সংযত কিন্তু তার উত্তাপ স্পষ্ট। ইংরিজীতেই বললে সে।

দিব্যেন্দু বলেছিল—কেন বলুন তো? আপনি যেন বিরক্ত হয়েছেন মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ হয়েছি। না, চিৎকারের কথা নয়। আমি জানতে চাই, এ কবিতার কবি কে? আপনি?

—হ্যাঁ। আমার অক্ষমতা আমি জানি। কিন্তু আবেগ আমি সামলাতে পারিনি। পাঞ্জাবে বিয়াস নদীতে সাঁতার দেওয়া খুব কঠিন। আমার বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ফেলে সাঁতার দিয়েছি এবং ডুবে জলের তলা থেকে পাথর তুলে এনেছি। বাজী জিতেছি। এই আমার ট্রফি।

টেবিলের উপর একটি গোল পাথর পড়েছিল। সেটা দেখিয়েছিল দিব্যেন্দু। আর দেখিয়েছিল একটা রূপোর সিগারেট কেস। বিপাশা বিস্মিত হয়েছিল গল্পটা শুনে। এবং তাতেই সে একটু থমকে গিয়েছিল। না-হলে হয়তো ঘটনাস্রোতে আকস্মিকভাবে প্রপাতের আবর্ত ও গর্জনের সৃষ্টি করতো। এক মুহূর্ত চুপ করে ভেবে দেখতে তাকে হয়েছিল, কিন্তু সবই মিথ্যা বলে মনে হয়েছিল। ওরা সব পারে। বিশেষ করে বাঙালীরা এই কল্পনার ক্ষেত্রে ওস্তাদ। সবটা মিথ্যা, সবটা বানানো। সে নিশ্চয় রাগ করে আসবে, কৈফিয়ৎ চাইবে বলে নুড়িটা রেখেছে এবং সিগারেট কেস দোকানে পাওয়া যায়। বিপাশা টেবিলের উপর থেকে নুড়িটা নিয়ে দেখে ব্যঙ্গ করে বললে—এটা বুঝি বিয়াস নদীর কুমারী-হৃদয়?

—খুব ভাল বলেছেন। চমৎকার বলেছেন। ওইটিই বিয়াসের কুমারী-হৃদয় বা তার ভগ্নাংশ।

—এই কুমারী-হৃদয়টি ছুঁড়ে যদি আপনার কপালে মারা যায় তো কেমন হয়?

বিস্মিত হয়ে দিব্যেন্দু বলেছিল—কেন? তা মারবেন কেন?

—কারণ, আপনি একটি চতুর মিথ্যাবাদী। যা বলেছেন তা মিথ্যা। নিছক মিথ্যা।

—তার মানে? কি বলছেন আপনি?

—ঠিক বলছি। বাঙালীরা কবিতায় গল্পে ওস্তাদ। মিথ্যে খুব বানাতে পারে। আপনি কাল সন্ধ্যেতে এই কবিতা রচনা করেছেন, এখানে বসে; এই ঘরে আমাকে দেখে, আমার নাম শুনে। আমার নাম বিপাশা—ডাক নাম বিয়াস। শরৎচন্দ্রের সেই বাঙালী ছেলে যে বর্মী মেয়েটির কাছে মিথ্যে কান্নার সুরে, বাংলায়—'তোর ওই হাতের আংটিটাও দে রে নিয়ে যাই'—বলে প্রতারণা করেছিল, তাতে আপনাতে কোন প্রভেদ নেই। একটু ভুল আপনার

হয়েছিল—আপনি জানতেন না যে, আমি বাংলা জানি।

এতগুলো মারাত্মক অভিযোগের কথা দিব্যেন্দুর কাছে ওই শেষের কথাটায় চাপা পড়ে গিয়েছিল—সে সবিস্ময়ে বলেছিল—আপনি বাংলা জানেন?

—জানি না তো কবিতাটা নিয়ে এত প্রশ্ন করলাম কি করে?

—তাই তো!

এবার বিপাশা বাংলাতেই বলেছিল, এতক্ষণ ইংরিজীতেই কথা হচ্ছিল, বলেছিল—আমি বাংলা জানি, আমার নাম বিপাশা, এবং বিয়াস সে আগেই বলেছি—তা আপনি জানেনও। এবং আমি নিজে বাঙালী।

—আপনি বাঙালী? বাঙালীর মেয়ে? অসম্ভব। ইংরিজীতে বলেছিল দিব্যেন্দু। বোধ হয় ভুলতে পারছিল না, বিপাশার চমৎকার ইংরিজী এবং তার গায়ের রঙ।

—বাংলায় বলুন। অনেক অশুদ্ধ খারাপ ইংরিজী শুনেছি। বাংলায় বলুন।

—বাঙালী আপনি? মানে বাংলাদেশেই জন্মেছেন—

—না—না। আমি বাঙালীর মেয়ে বাঙালী। বাঙালী হলেই গায়ের রঙ সাঁওতালদের মত কালো হয় না এবং আচারে-ব্যবহারে তারা বর্বর অসভ্য হয় না আপনার মত। অসভ্য, বর্বর, মিথ্যাবাদী কোথাকার!

বলেই সে হন হন করে চলে আসছিল।

দিব্যেন্দু এবার ডেকেছিল—শুনুন!

—কি?

—আপনার রঙের আর রূপের খুব অহঙ্কার? না? আর মর্যাদারও খুব তেজ! না?

—নিশ্চয়! সেটা মিথ্যে নয়।

দিব্যেন্দু ঘাড় নেড়ে বলেছিল—আপনি বাঙালীও নন—ভারতবর্ষীয়ও নন।

—কি বলছেন আপনি!

—ঠিক বলছি। হলে আমি কালো বলে সাঁওতাল বলতেন না।

—ইস্কাপন চিরদিনই ইস্কাপন।

—ওটা ইংরেজের কথা। ভারতবর্ষের কালো ইস্কাপন নয়। কালো হচ্ছে তার জীবন আলো-করা রূপ। আপনি জানেন—আর্যদের রাঙাটে সাদাটে রূপ এখানে এসে চোখে চুলে কালোকে শিরোধার্য করে ধন্য হয়েছে? পাঞ্জাব কাশ্মীর যান প্রমাণ পাবেন। সাদা দেবতা শিব এখানে কালো মেয়ের পায়ের তলায় ধন্য হয়েছে। গৌরী রাধারা কালোর প্রেমে ঘর ছেড়েছে। ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যে দু'জন ভগবানের অবতার। একজন রাম, একজন শ্যাম! শুভ্রবর্ণগরবিনী আপনি এ দেশের মেয়ে হলে—আপনিও একদিন কালো কারুর জন্যে পাগল হবেন। আমি নির্দোষ। আমাকে কটু বললেন বলে কটু ভাবেই বললাম।

কথার বাঁধুনী শুনে অবাক হয়েছিল বিপাশা।

দিব্যেন্দু একটু হেসে বলেছিল—আমি বলছি না যে আমার জন্যে। কারণ আমিও কালো।

তলোয়ারকর কখন এসে ঘরের দোরে দাঁড়িয়েছিল। সে এবার এসে ঘরে ঢুকেছিল। ইংরিজী কথাবার্তা সবই সে বুঝেছিল, বোঝেনি শুধু বাংলাটুকু। সে এসে বিপাশাকে বলেছিল, মিস ভট্টচারিয়া, যশোদা ডাকছে তোমায়। আর না। যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যাও—আমি ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই।

বিপাশা চলে এসেছিল। এবং তিক্ত-বিরক্ত চিত্তে চুপ করে বসে ছিল। এতক্ষণে তার যেন সবটা খতিয়ে দেখার অবকাশ হয়েছিল। ভাবছিল, হয় তাকে সত্যিই শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল, নয় এতটা করা উচিতই হয় নি। ভাবছিল, কালই সে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে সব জানাবে। ও কে, ওর ঠিকানা—কনস্টিটিউশন হাউসের রিসেপশনেই পাওয়া যাবে। আইনমত এর প্রতিকারে তার সাধ্য নাই, কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই ভাবে কোন কুমারীর অপমান করলে কি কোন প্রতিকার হবে না?

ঠিক এই সময়েই ফিরে এসেছিল তলোয়ারকর। হাতে একখানা উর্দু হরফে ছাপা কাগজ। মফস্বলের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। তলোয়ারকর বলেছিল—একটু বেশী করে ফেলছ বিপাশা।

ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে।

হেসে তলোয়ারকর বলেছিল—কাগজটা পড়। জম্মুর কাগজ।

—কি আছে ওতে?

—ও সত্যিই বাজী রেখে বিয়াসে সাঁতার দিয়ে এপার-ওপার করেছে, ডুব দিয়ে নীচ থেকে পাথর তুলছে। ওরা কয়েকজন এঞ্জিনীয়ার বেড়াতে গিয়ে কাণ্ডটা করেছিল। তাই বেরিয়েছে কাগজটায়।

কাগজটা নিয়ে পড়তে বসেছিল বিপাশা।

খবরটা সত্য। একটু স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বলেছিল—তাই তো!

যশোদা হেসেছিল খুব। তুমি তো খুব ওকে বকে দিলে! ওঃ, কি বকুনী! পাথরটা নিয়ে বলে, কুমারী-হৃদয়টি কপালে ছুঁড়ে মারলে কি হয়? তুমি ভাই ল-ইয়ার হও!

বিপাশা তলোয়ারকরকে বলেছিল—ভদ্রলোককে ডাকুন না মিঃ তলোয়ারকর! তলোয়ারকর বেরিয়ে গেলেন—মিঃ চ্যাটার্জী!

আবার ডাকলে—মিঃ চ্যাটার্জী! সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন।

বিপাশাও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল।

তলোয়ারকর তখনও উইংয়ের ভদ্রলোকের বারান্দায়, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—এ যে তালা দেওয়া দেখছি! বেরিয়ে গেলেন।

বিপাশা থাকতে দিব্যেন্দু ফেরেনি। পরদিন গিয়েও দেখা পায়নি। দিব্যেন্দু চলে গিয়েছিল। তলোয়ারকর তার হয়ে মাপ চেয়েছিলেন। দিব্যেন্দু বলেছিল—মাফ কিসের। ও তো একটা সুন্দর পরিহাস হয়ে গেল। অম্ল-মধুর।

তলোয়ারকর হেসে বলেছিল—ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে গেছে তোমাকে দেখে।

যশোদা ঠাট্টা করেছিল—কথায়, না, রূপে?

—দুইয়েই। তবে বার বার প্রশ্ন করেছিল—বাঙালী? আশ্চর্য তো! মা পাঞ্জাবী হলেও, চুল-চোখ-রঙ! আশ্চর্য তো!

তিন

তার এই বাইশ বছরের জীবনে একটা যুগান্তর ঘটে গেছে—সমাজে দেশে। শুধু তাই বা কেন—সারা পৃথিবীতে। গোটা পৃথিবীটা একটা আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদগার করলে। ভূমিকম্প হল। এর মধ্যে কত জন পুড়ে ছাই হল—কত জনে গড়িয়ে কোথা হতে কোথায় গেল, তার হিসেব এত লম্বা যে, মনে করতে বসে মনের খাতা খুলেও মনে করা যায় না। ছোটখাটো ঘটনাগুলো যেন—একদফা, আর একদফা—আবার একদফা বিবিধ খরচ বাবদ একটা সমষ্টিভূত অঙ্কের মত হয়ে গেছে। এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে এত দিনে কাদার তাল জমে শক্ত হয়ে যাওয়ার মত নিরেট বস্তুতে পরিণত হয়েছে। নিজেও ওই কাদার তাল হয়ে-যাওয়া বহুজনের সঙ্গে একসঙ্গে ঠাসা হয়ে কোন একটা শ্রেণীর তালের মধ্যে হারিয়ে যায়নি—এই ঢের। ভাগ্যই হোক, আর ঘটনা-বৈচিত্র্যের আনুকূল্যে হোক, নিজে সে একটি পাথরের মত বা নুড়ির মত নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে—পাঞ্জাব থেকে দিল্লি—দিল্লি থেকে বিহারের প্রান্ত-সীমায়, পাঁচেৎ-মাইথন এলাকা পর্যন্ত, অন্তত হাজার মাইল পথ এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দশটা বৎসর সে চলে এসেছে এবং তার কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে এত ঘটনা, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পর পর ঘটে গেছে যে, ওই হিসেবের এক এক দফা বিবিধ খরচ জমার মত জমাট-বাঁধা পৃথক করে মনে করা যায় না। মানুষও মনে পড়ে না। মনে পড়ে সর্দার হরদয়াল সিংকে—তাঁর সঙ্গে সেই কয়েকটা বিচিত্র দিন—সে তার অবিস্মরণীয় কয়েকটা দিন; অক্ষয় সম্পদ তার জীবনে। দিব্যেন্দুর সঙ্গে ওই প্রথম সাক্ষাতের বিচিত্র কলহ এবং তার শেষ—এটিও একটি তেমনি ঘটনা। আশ্চর্য লোক—সবল স্বাস্থ্যবান, লম্বা টিকলো নাক, টানা চোখ, ভারী গলা, পাগলা-পাগলা মানুষ; কালো রঙের গরবে শুধু গৌরবান্বিত বোধই করে না, সে-কালের দুর্বাসা-বিশ্বামিত্রের মত অভিসম্পাতও দেয়; বেশ সুন্দর সরস ভাষায়—'ওগো শুভ্রবর্ণগরবিনি! কালোকেই তোমাকে ভালবাসতে হবে। অবশ্য আমাকে নয়—যদিও আমি কালো।' তার মধ্যে তীব্রতার চেয়ে রসজ্ঞানের পরিচয়ই ছিল বেশী। স্মৃতিটি তার কাছে জীবনের 'অম্ল-মধুর' স্মৃতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতি।

বাকীগুলির, অন্তত যা তার মনে রেখাপাত করেছে তার কিছু অতি-তিক্ত, কিছু অমৃত-মধুর। সবই প্রায় তার এই শুভ্র দেহবর্ণ, চোখ চুল—যা ইওরোপের রূপের আভাস দেয় তাই উপলক্ষ্য করে। এটা এসেছে তার মায়ের দিক থেকে। মা ছিলেন পাঞ্জাবী পণ্ডিতের কন্যা। মাতামহ নাকি খ্যাতিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বাড়ি ছিল বিপাশার তটে একখানি গ্রামে। মিয়ানি শহরের কাছে। তাঁদের বংশে নাকি এই ধরণের রূপের মধ্যে মধ্যে বিচিত্র আবির্ভাব হত। বারবার ফলিত সত্য হিসাবে মাতামহ বংশের বিশ্বাস ছিল—এই রূপ যখন পুত্রকে আশ্রয় করে আসে, তখন বংশের সমৃদ্ধি হয়, খ্যাতিতে রাজপ্রতিষ্ঠা আসে; আর মেয়ে হলে—আসে

বিপদ, প্রচণ্ড আঘাত পড়ে বংশে ওই মেয়েকে উপলক্ষ্য করে। শর্মা-বংশ প্রাচীন বংশ। আদি পুরুষ থেকে মাতামহ চতুর্মুখ শর্মাচার্য পর্যন্ত বহু শাখায় বিভক্ত; কাশ্মীর পাঞ্জাব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সব শাখাতেই এমন আবির্ভাব হয়েছে এবং এমন ঘটনাই ঘটেছে। কাশ্মীর জম্মুতে, পশ্চিম পাঞ্জাবে, ঝিলমের ধারে তিনটি নামী ব্রাহ্মণ জমিদার জায়গীরদার বংশ আছে, যাদের ঘরে জন্মেছিল এমনি রূপের ছেলে। একটি শাখা মুসলমান হয়ে গেছে—সিন্ধুর ধারে তাদের ঘরে জন্মেছিল এমনি মেয়ে। মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল এক নবাব। দুটি শাখা আছে, যাদের ঘরের কন্যার জন্য গোটা পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ-বংশ লালায়িত। তার কারণ, এমনই রূপের দুটি মেয়ের রূপের জন্য যখন শক্তিমদমত্ত দেহভোগীরা লালায়িত হয়ে এসে চড়াও করলে, তখন একজন শিবিকার মধ্যে বিষ খেয়ে মরেছিল এবং একজন নিজের হাতে চিতা জ্বেলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জওহর ব্রত উদ্‌যাপন করেছিল। এক শাখা গুরু নানকের সময়েই তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে গিয়েছিল। তাদের বংশে জন্মেছিল এমনি এক মেয়ে, কালটা তখন ভীষণ কাল। নাদির-শাহী আমল সদ্য কেটেছে, শাহ দিল্লী পাঞ্জাব শ্মশান করে চলে গিয়েছে বছর খানেক কি বছর দুয়েক—তখন জন্মেছিল এই মেয়ে। শলা-পরামর্শ অনেক হয়েছিল, এ মেয়েকে রাখা উচিত হবে কি না সে নিয়ে। মমতা জয়ী হয়েছিল। কিন্তু তার ফল ফলেছিল ঠিক। আমেদশা আবদালী এল হিন্দুস্থানে; দিল্লীর হারেম থেকে দুই বাদশাজাদির সঙ্গে যখন মথুরা পর্যন্ত এলাকার হাজার হাজার মেয়েকে তারা বাঁদী করে লুঠে নিয়ে যায়; তখন তাদের বংশের এই মেয়ে নিয়ে এদের ঘরে জ্বলেছিল আগুন। বাপ নিজে হাতে বেটিকে কেটে আফগানদের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়েছিল। মা এক ছেলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কোন সুদূর দেহাতে। সেখান থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল অমৃতসরে। এক পুরুষ বাদে ছেলের এক ছেলে হয়েছিল—এমনি ছেলে। সে ছেলে পাঞ্জাব কেশরী হরিসিং-এর সঙ্গে কাবুল লুঠে এসেছিল। সর্দার হরিসিং-এর পাশেই থাকত এই সর্দার—কালো ঘোড়ার উপর লালচে চুলদাড়ি, পিঙ্গল চোখ, এই সওয়ার ছিল আফগানদের বিভীষিকা। সর্দার নিজেও মরেছিল যুদ্ধে এবং এ-বংশ এখানেই শেষ।

মায়ের কাছে শোনা তার এ সব কথা। তার মা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না, বাঙালী ব্রাহ্মণ-পুত্রের সঙ্গে বিবাহই তার অন্যতম প্রমাণ। মিয়ানি স্কুলে তরুণ অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন সবে এসেছেন। লাহোরের বাঙালীদের কালিবাড়ীর বাঙালী ব্রাহ্মণ পূজারীর ছেলে। লাহোর ইস্কুলে এবং কলেজে পড়ে বি. এ. পাস করেছেন দর্শনে। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল বেদ অধ্যয়নের। মাতামহ তখন গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছেন, ইস্কুলেই সংস্কৃতের শিক্ষকতা করেন। সামান্য ক্ষেতি আর যজমানদের যজ্ঞ করে আর সংসার চলে না। নতুন জমানা তখন আসছে। লাহোরে জালিওনওয়ালাবাগ হয়ে গেছে। ১৯৩২ সাল। সংসারে স্ত্রীর এবং একমাত্র কন্যা বিপাশার মা, বেদবতী তখন কিশোরী। একটি ছেলে ছিল, সে মারা গেছে। কন্যার ছিল পরম সমাদর। বেদবতীকে কালের হাওয়ায় ইস্কুলে পড়াচ্ছিলেন। সে সেবার ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবে। নগেন্দ্রনাথ তাকে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। তা থেকেই দুজনে দুজনের প্রতি অনুরক্ত হন। তাই নগেন্দ্রনাথের প্রতি কন্যার অনুরাগ লক্ষ্য করে পণ্ডিত চতুর্মুখের স্ত্রী যখন শঙ্কিত হয়ে স্বামীকে

সাবধান করলেন, পণ্ডিত চতুর্মুখ বলেছিলেন—দাঁড়াও, আগে নিশ্চিত হয়ে নিই। কন্যাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মা, এ কি সত্য ?

কন্যা নতমুখী হয়ে নিরুত্তর ছিল। পণ্ডিত চতুর্মুখ বলেছিলেন—নিরুত্তর থাকলে তো চলবে না মা। আমার যে সঠিক জানা প্রয়োজন। উত্তর যে আমার চাই।

বেদবতী এবার বলেছিলেন—হ্যাঁ!

চতুর্মুখ শাস্ত্রী শর্মা এবার নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারপর নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিবাহ দিয়েছিলেন। স্ত্রীকে বলেছিলেন—জমানা বদলেছে। মনকেও বদলাও। কন্যা সুখী হবে। আর নগেন্দ্রনাথ বাঙালী হোক—ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ।

তখন ১৯৩৪ সাল।

১৯৩৮ সালে জন্মেছিল ওই মাতামহের গ্রামের বাড়িতে বিপাশার তটপ্রান্তে এই শুভ্রবর্ণ, নীলনয়না, স্বর্ণাভকেশিনী কন্যা!

বেদবতী শিউরে উঠেছিলেন। এ কি হল! তার পিতৃবংশের অভিশাপ এসে লাগল তার সংসারে! বাঙালীকে বিবাহ করার জন্য।

নগেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন—তাহলে এবার উল্টো হবে। আপনাদের কুলে পুত্র এনেছে সমৃদ্ধি -কন্যা এনেছে বিপদ, এবার কন্যার বংশে এসে কন্যা আনবে সমৃদ্ধি, পুত্র আনবে বিপদ।

তখন পণ্ডিত চতুর্মুখ কন্যা-জামাতাকে রেখে ঋষিকেশে চলে গেছেন। তাঁর স্ত্রী, বেদবতীর মা মারা গেছেন। ঋষিকেশ থেকে তিনি পত্রযোগে জানিয়েছিলেন, আমার মনে হয় নাগিন্দরনাথ ঠিকই বলেছেন। এ কন্যা শুভ সমৃদ্ধিদায়িনী হবে। আনন্দের কারণ হবে। শোক-দুঃখকে দূর করবে। ওর নাম রেখো বিপাশা। বিপাশার মত শোক-দুঃখপাশ মোচন করবে ও; বিপাশার তটে ওর জন্ম। নাগিন্দরনাথের নাম পছন্দ হবে কিনা জানি না, কারণ বাঙালী মেয়েদের নাম বড় আধুনিক, তবে আমার কথা মানলে সুখী হব।

নগেন্দ্রনাথ খুশী হয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন—পণ্ডিত চতুর্মুখের কথা মিথ্যা হবে না। ও আমাদের বিপাশা। দুঃখ যখনই পাশে জড়াবে, তখনই ডাকব—বিপাশা, 'ডুরি' খোল দে মা। ব্যাস, খুলে যাবে। ডাক নাম হবে বিয়াস।

মিয়ানি থেকে বাবা এসেছিলেন শিয়ালকোটে। তখন এম. এ. পাস করেছেন প্রাইভেটে। এবং শিক্ষক থেকে হয়েছেন অধ্যাপক। তখন তার বয়স পাঁচ-ছ বৎসর। মা মারা যান যখন, তার বয়স দশ। ১৯৪৮ সালের প্রথম। এর মধ্যে এই আলোচনা সে অনেক শুনেছে। মাসে একদিন বা দু-দিন এ আলোচনা উঠতই। বাড়িতে চারটে ভাষার প্রচলন ছিল। গুরুমুখী, উর্দু, বাংলা, ইংরিজী। সে যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ আলোচনা চলত ইংরিজীতে নয় বাংলায়। গুরুমুখী আর উর্দু তার মাতৃভাষা, জন্মমৃত্তিকার ভাষা, বাংলা তার পিতৃভাষা, ইংরিজী তার শিক্ষার ভাষা। মা ছিলেন রুগ্ন, প্রথম জীবনে রুগ্ন ছিলেন না; তার জন্মের পর দ্বিতীয় সন্তান হয়েছিল ছেলে, তৃতীয় সন্তানও ছেলে, তারা সূতিকাগারেই মারা যায় এবং মায়েরও জীবন সংশয় হয়। ফলে তিনি রুগ্নই হয়ে গিয়েছিলেন। রুগ্ন দেহে এ আলোচনা করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে

উঠতেন, তাঁর খেয়াল থাকত না যে, সেখানে সে-ও উপস্থিত আছে। বাবা বলতেন—বেদবতী, ডোন্‌ট্‌ ফরগেট। বলে ইশারা করে তাকে দেখিয়ে দিতেন। প্রথমে মা চুপ করতেন। প্রথম প্রথম সে-ও ধরতে পারত না। তারপর মা-ও থামতেন না, সে-ও বুঝতে পারত। মা বলতেন —নো, সি মাস্ট নো।

বাবা বলতেন—বিয়াস, যাও, বাইরে খেলা করগে।

সে উঠে গিয়েও বাইরে আড়াল থেকে শুনত।

বাংলা ইংরিজী যতদিন ভাল আয়ত্ত না হয়েছিল, ততদিন সব বুঝতে পারত না। বাবা তাকে মিশন ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলেন। বাড়িতে ইংরিজী তিনিই শেখাতেন, বাংলাও শিখেছিল তাঁর কাছে। তিনি কথা বলতেন তার সঙ্গে বাংলাতে।

আজ মনে পড়ে—রবীন্দ্রনাথ সে কিছুতেই বলতে পারত না। বলত—রবীন্দরনাথ।

বাবা ইংরিজীতে বলতেন, নো, নট রবীন্দরনাথ, সে—রবীন্দ্রনাথ।

ইংরিজীতে—চেষ্টা করে রবীণ্ড্রনাথ এসেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসে নি। বাবার নাম নগিন্দরনাথ থেকেই গিয়েছিল—দিল্লী আসা পর্যন্ত। তাই বা কেন, তারও অনেক পর পর্যন্ত। তার মা তার বাবার কাছে বাংলা খারাপ শেখেন নি, কিন্তু উচ্চারণ তাঁর এমনিই ছিল, বলতেন, ভাগ্য রোখ্‌তে পারো নাই কথা সত্য হয় না। তুমি বললে ভি সত্য হয় না। সাধনা থাকলে রোখতে তুমি পারো। আগে থেকে জানলে বেবাস্থা করতে পার। তুমি ইংরাজী শিখাচ্ছো, মেম বানাচ্ছো মেয়েকে, পথ তো তুমিই খুলে দিচ্ছ। এ কন্যার বিপদ আসে, কোন বিপদ আসে। হিসাব করো। ধরম নাশ হয়। ধরম রাখতে গেলে কন্যার জীবন যায়। সংসার নষ্ট হয়। কন্যাকে মেমসাহেব বানাচ্ছ—তুমি তো নিজে হাতে ধরম ওর নাশ করছ।

বাবা নগেন্দ্রনাথ অনেক বুঝাতেন। বলতেন—দেখ, আমাদের ধর্মে নিজেকে মেরে ধর্ম বাঁচানো, সেটা তো হেরে যাওয়া। আমি ওকে এমন বিদ্যার বল দিচ্ছি, যাতে মরবার আগে ধর্ম যে নাশ করতে আসবে, তাকে সে মারতে পারবে।

তার মা তিক্ত হাসি হেসে বলতেন—হাঁ, তুমি বাঙালী, তুমি বলছ ই কথা, সাজছে! কিন্তু তোমার সরম হওয়া উচিত ছিল—আমার কাছে এ কথা বলতে। পাঞ্জাবের মেয়ের কাছে ই কথা বলছ তুমি!

একদিনকার কথা তার মনে আছে। বাবার ছিল অসাধারণ সহ্যশক্তি এবং কথা ছিল মিষ্ট, কিন্তু সেদিন সহ্যশক্তি বোধহয় ভেঙে পড়েছিল, তাই কথাও হয়েছিল ধারালো, এবং কণ্ঠস্বর হয়েছিল তীক্ষ্ণ—দেখ, তোমরা পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষে তোমরা বীরও বটে—আর্যবংশের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও করতে নিশ্চয় পার। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেয়ো না—দুনিয়া একজায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। দুনিয়াও নেই, মানুষের বিদ্যা-জ্ঞান—তাও নেই; সবই সেকালের ভাল ছিল, সে জমানাই সচ্চা, আর এ জমানা ঝুটা এ ভাববার কোন কারণ নেই। আগে গ্রহণ কি করে হত, জানত না, ভাবত রাহুতে খাচ্ছে। এখন তা ভাবে না, কারণটা জানা হয়েছে। আগে জানত না ভূমিকম্প কেমন করে হয়, এখন জেনেছে। তাতে দুনিয়ায় অকল্যাণ হয়নি। সেটা আমরা বাঙালীরা যদি

তোমাদের আগে জেনে থাকি, তবে মিছে বাঙালী বাঙালী বলে চিমটি কেটে কি লাভ? ও স্বভাবটাই হল মূর্খের।

তার মায়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, তুমি এমন করে কথা বলছ আমাকে?

কথাবার্তা বাংলায় শুরু হয়েছিল; কিন্তু মাঝখান থেকেই পাল্টে শুরু হয়েছিল গুরুমুখীতে।

বাবাই শুরু করেছিলেন, বোধহয় ভেবেছিলেন, বাংলায় বললে মা সব ঠিক কি ধরতে পারবে না। মায়ের কথার উত্তরে বাবা হেসে হেসে সস্নেহে বলেছিলেন—মাফ করো বেদবতী। আমার মেজাজটা কেমন ঠিক ছিল না। কিন্তু তুমি খানিকটা অবুঝের মত কথা বলছ না? তুমি ভেবে দেখো।

—ক্যা দেখুঙ্গী শোচকে? যা হবার তা এই এমনই করেই হয়।

—না। ভেবে দেখ তুমি। তোমাকে আমি তো বুঝিয়ে বলেছি অনেকবার, সৃষ্টির বিধান-বৈচিত্র্য কতকাল আগের কোন পূর্বপুরুষের এমন রূপ হয়েছিল। হয়তো যে প্রথম পূর্বপুরুষটি মধ্য-এশিয়া থেকে এসে এখানে তোমাদের বংশস্থাপন করেছিলেন, তার হয়তো এমন রূপ ছিল। কিংবা কেউ এনেছিলেন জয় করে ইউরোপ থেকে, বা যে-সব গ্রীকরা এসেছিলেন এখানে, তাদের কোন কোন কন্যাকে জয় করে নিয়েছিলেন—তাঁর ছিল এই এমনি রূপ। সেই রূপ বিচিত্র নিয়মে কয়েক পুরুষ পরে পরে এইভাবে প্রকাশ পায়। এ রূপটি বিচিত্র। বিশেষ করে সূর্য-দেবতার আশীর্বাদ-ধন্য এই ভারতবর্ষে। এ হল ঘন সবুজের দেশ, শ্যামশোভার দেশ। এখানে এ রূপ বহুর মধ্যে এক। কাজেই এ রূপ নিয়ে সে-কালে মারামারি কাটাকাটি হত। রাজারা খেপত, নবাবরা খেপত, জমিদারেরা খেপত। ডাকাতেরাও খেপত। ডাকাত অবশ্য সবাই। কিন্তু সে কাল আজ আর নেই। কাজেই দুদিক দিয়ে ভেবে দেখ যে, এ মেয়ে অভিসম্পাত নিয়ে জন্মেছে, এমন দুর্ঘটনা ঘটবেই—এ-ভাবা ঠিক নয় বেদবতী। ওটা কাল আর পাত্র এই দুয়ের জন্যেই ঘটত। কাল পালটেছে, সুতরাং ও আর ঘটবে না। আবার পুরুষ বেলাতেও তাই; এমন পুরুষের একটা প্রতিষ্ঠা হত সেকালে। দলপতি হয়ে যেত। দলপতির, রাজার, সবায়ের নজর পড়ত। দুটোই যে একেবারে গেছে তা বলব না—তবে ওটাকে ভাগ্যচক্রের একটা বাঁধা ছকের মধ্যে ধরলে ভুল হবে। তা-ছাড়া, ধর্ম জাত এ নিয়ে গোঁড়ামিও কমছে ক্রমশ।

বেদবতী বলেছিলেন—হ্যাঁ, জমানা বদল হয়েছে। এখন হয়তো ওকে কেড়ে নিয়ে যাবার দরকারই হবে না। আমি যেমন জোয়ানীর আবেগে উচ্ছ্বাসে, বাংগালীবাবুর মহব্বতিতে অন্ধা হয়েছিলাম, ও তেমনি কোন ইংরেজ কি কোন মুসলমান, কি অন্য কোন দেশের কে। নও-জওয়ানের সঙ্গে মহব্বতি করে এসে বলবে—ওকেই আমি শাদী করব। তুমি বলবে, নিশ্চয়, বাধা কিসের? হায় আমার নসীব!

তার বাবা আর কিছু বলেননি; উঠে চলে গিয়েছিলেন।

সেই দিন তার মা তাকে ডেকে সব কথা গুছিয়ে বলেছিলেন। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছিল। শেষ বলেছিলেন—তোর বাপ ইজ্জত মানে, কিন্তু দেখছি ধরমকে ঠিক মানে না। আমার নসীব। ও বুঝতে পারে না, ধরমকে বাদ দিয়ে ইজ্জতের মানে হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথা কাহিনী পড়েছিস বেটী? পড়বি। বুঝতে পারবি। দেখবি, এই পাঞ্জাবের শিখলোকের

কাহিনীয়া, ইতিহাসের বানানো গল্প নয়। দেখতে পাবি, ধরমের পর বিশ্বাস না থাকলে ইজ্জতের ওই জলুস, ওই জোস, ওই মহিমা হয় না রে! নবাব বললে—বেণী কেটে দাও সর্দার—বাস, তোমার ছুটি। সর্দার বললে—উসকে সাথ, শির ভি দুঙ্গা নওয়াব, কুছ যাস্তি লেও। গুরু বান্দা আপনার লেড়কার কলিজায় ছুরি বসিয়ে মারলে। নওয়াব বললে—ধরম ছোড়ো, নেহি তো আপনা হাঁতসে লেড়কাকো উখাড়ো। গুরু ধরম রাখলে, বাচ্চার কলিজায় ছুরি বসালে, বাচ্চা শেষতক পুকায়লে, ওয়া গুরুজীকি ফতে। অলখ্‌ নিরঞ্জন! যঁহা ইজ্জত হ্যায়, হুঁয়াই ধরম হ্যায়। যঁহা ধরম নেহি, হুঁয়া ইজ্জত নেহি। থাকতেই পারে না। কখনও যেন ধরম ছাড়িস নে! এই বাত আমার তোকে বলা রইল।

সেদিন শুনতে শুনতে তার বারবার কান্না পাচ্ছিল। আবেগে সে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিল। মায়ের কথা শেষ হলে সে বলে উঠেছিল—মা!

—হাঁ। বেটী!

—আমি জহর খেয়ে মরে যাব? বাবাকে লুকিয়ে?

শিউরে উঠে মা বলেছিলেন—না রে বেটী, কভি না। মরবি কেন? তা তো বলিনি আমি! মরণা তো এক মিনিটকে বাত। মরণা হ্যায়, তো লড়াইসে, তেজসে মরণা হ্যায়। পহেলা মারনা হ্যায় পিছে মরণা হ্যায়। ভরনা নেহি হ্যায়। ধরমকে ইজ্জতকে প্রেমসে মরণা হ্যায়, একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তবে শুধিয়ে নিস তোর পিতাজীকে, তোর ধরমটা কি!

* * *

মায়ের মৃত্যুর এক বৎসর পর যেদিন স্বাধীনতার আনন্দ-উল্লাসকে আঘাত করে এল দাঙ্গা, জ্বলে উঠল সমস্ত পাঞ্জাব, যেদিন তার বাবা তাকে নিয়ে একটা দলের সঙ্গে শিয়ালকোট ছাড়লেন, সেইদিন সকালবেলা, তিনি তাঁর মুখের দিকে যেন এক বিচিত্র বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

সে ভয় পেয়েছিল। বলেছিল—কি বাবা?

বাবা বলেছিলেন—কিছু না। বলে চলে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেছিলেন—তোকে আমি মিশনারীদের ওখানে পাঠিয়ে দেব। পাঞ্জাবী সালোয়ার ছেড়ে তুই ফ্রক পরে নে।

সে প্রশ্ন করেছিল—কেন বাবা?

বাবা বলেছিলেন—দেখছিস তো মা, কি হাল চারিদিকে। ওখানে তুই নিরাপদে থাকবি। এর পর সব থামলে আমি তোর খোঁজ করে নিয়ে যাব।

মেয়ে চুপ করে থেকে বলেছিল—ওরা যদি তখন ছেড়ে না দেয় বাবা? ক্রীশ্চান করে দেয়? মিশনে তো ক্রীশ্চান ছাড়া থাকতে কেউ পায় না!

বাবা চুপ করে ছিলেন।

বিপাশা আবার বলেছিল—ওরা যদি ওখান থেকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেয় বাবা? আমাকে তো আমার চোখ আর চুলের জন্যে অনেকে চেনে।

তার মনে তখন সেই মায়ের শোনানো গল্প যেন ধ্বনিময় হয়ে মনের মধ্যে বেজে চলেছিল—

স্মৃতির মধ্যে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের মত মায়ের কণ্ঠস্বরে কথাগুলি ধ্বনিত হচ্ছিল।

উত্তর পায়নি বাপের। সে আবার প্রশ্ন করেছিল—মর যাউঙ্গী বাপজী? জহর পিইকে?

বাবা চমকে উচ্চকণ্ঠে যেন চিৎকার করে উঠেছিলেন—না! নেহি! নেহি করনা ই কাম। খবরদার!

—তব্?

বাবা বলেছিলেন—মরতে তোর ডর হবে না?

—না।

—তবে তুই আমার সঙ্গে চলবি। পথে যদি হামলা হয়—আমি যদি মরি কি হেরে যাই—তবে সেইখানে তুই মরবি।

কি করে মরবে সে বাবা বলেন নি। তবে ছুরি একখানা তার কাছে ছিল। কিন্তু পথে যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হামলাদারেরা হা-হা হল্লা করে তাদের দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন সন্ধ্যার মুখ, সব আবছা এবং তার মধ্যে বাবা যখন পড়লেন তখন ছুরি তার কাজে লাগে নি। রাস্তাটার একপাশে জঙ্গল, একপাশে খদ, সেই খদের মধ্যে সে পড়ে গিয়েছিল। নিজে লাফিয়েছিল না পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল, সে কথা স্মরণে নেই। পড়ে গিয়েছিল একটা ঝোপের উপর। নীচের পাথরে পড়লে চুর হয়ে যেত। তবে লাফিয়ে সে পড়েনি—এ কথা সে মনে করতে পারে। মায়ের বলা গল্প সেই আতঙ্কের মধ্যেও তার কানের পাশে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বেজে চলেছিল।

মা তার কত গল্পই বলেছিলেন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে!

একটা গল্প সেই মুহূর্তে তার মনে পড়েছিল। অথবা মায়ের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হচ্ছিল আর সে কানে যেন শুনছিল। চোখেও বোধ হয় দেখছিল।

এই মাইথন ড্যামের কিনারায় বসে ছবিটা যেন সে আজও চোখে দেখছে। কাবুল-কান্দাহারের শাহ আবদালীর লুঠেরা সওয়ারেরা যখন লাহোরের কেল্লা দখল করে বসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল লুঠের জন্য, তখনও পাঞ্জাবের লোকেরা সাবধান হতে সময় পায় নি। পালায় নি ঘর-দোর ছেড়ে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে দুর্গম স্থানে। সবে শলা-পরামর্শ চলছে। শর্মাশাস্ত্রীদের এক শাখা লাহোর থেকে পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে একটা গ্রামে বাস করত। তারা নিশ্চিন্তই ছিল—দিল্লীর পথ থেকে দূরে। আবদালী যাবে দিল্লী। যত জল্লাদ যাবে, ততই তার সুবিধে। গাজীউদ্দিন উজীরের সঙ্গে তার বুঝাপড়া। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় খবর এল, বিশ কোশ দূরে এক শহরে হানা দিয়েছে রোহিলারা। রোহিলখণ্ড থেকে আবদালীর সঙ্গে জুটতে চলেছে তারা। পথে লুঠতে লুঠতে চলেছে।

বিয়াস চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে—মশাল জ্বলছে। হল্লা উঠছে। ঘরে আগুন লাগছে। তার সামনে তরঙ্গ-হিল্লোলিত বিরাট লেকটা যেন সন্ধ্যার আবছায়ার সঙ্গে মিশে অতীত কালের সেই পটভূমির সৃষ্টি করেছে।

মাইথনের পশ্চিম দিকে দূরে কলোনির মধ্যে ইলেকট্রিক আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। সন্ধ্যার

আকাশে কুমারডুবি চাঁচমগমার ফায়ার-ব্রিক্সের কারখানাগুলোর চিমনির মাথায় আগুনের আর ধোঁয়ার হল্কা উঠছে। সামনে উত্তর দিকে বরাকরে দুপাশের সবুজ পাহাড়গুলো কালো হয়ে আসছে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে আলোর ছটা—টুকরো টুকরো আলো ; আর উঠছে বনের ভিতরের গ্রামগুলির মাথায় ঘরে ঘরে জ্বালা উনানের ধোঁয়া। এ অঞ্চলে কয়লার কারবার। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশে। বাঁ দিকে কোলিয়ারি অঞ্চলে স্তূপীকৃত কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে সফ্‌ট্‌ কোক তৈরী হচ্ছে—তার ধোঁয়া উঠছে। ভার্টিকাল বয়লারের মাথায় আগুনের শিখা। মনে হচ্ছে ১৭৫৭-৫৮ সালের পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে আবদালী রোহিলাদের আগুন জ্বলছে—গ্রাম পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে। পিছনে মাইথন ড্যামের মসৃণ পিচ-ঢালা পথ, পথের দুপাশে সুন্দর শৌখীন ডুম-লাগানো সারি সারি আলো রেলিং—এসবের দিকে তাকালে স্বপ্ন ভেঙে যায় নিশ্চয়, কিন্তু সেদিকে সে তাকায় নি। তবে হাইড্রোলিকের প্রণালী-মুখে লেকের জল টারবাইন ঘুরিয়ে কল্লোল গর্জন তুলে, বরাকরের খাত বেয়ে ছুটছে, তার শব্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বর্বর উল্লাসের হো-হো আর আর্তনাদের হা-হা মেশানো শব্দের পটভূমি। সে যেন দেখতে পাচ্ছে—ওই সামনের আবছায়ার মধ্যে শর্মাশাস্ত্রীর বাড়ি। পালাবার আয়োজন হচ্ছে গ্রাম জুড়ে। শর্মাগৃহকর্তা তলোয়ার হাতে ঘুরছে উঠোনে। কি করবে। সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার কন্যা—তারই মত অবিকল তার রূপ। হয়তো তার থেকেও দীপ্ত। কারণ, তার দেহে তো সবুজ বাংলার কালো রূপের ছোঁয়াচ আছে। বাপ বলছে—ভগবান, বলো কি করব ?

কন্যা বলছে—আমাকে তুমি কাটো, বাবা। আমার রক্ত পবিত্র থাকতে থাকতে আমাদের উঠান ভিজুক। ভগবান খুশী হবেন। পিতৃপুরুষ আশীর্বাদ করবেন—তোমাকে আমাকে !

ও-কথা ওই দিন ওই রাত্রি ভিন্ন বলা ওই কন্যার পক্ষেও সম্ভবপর ছিল না।

হল্লা উঠল গ্রাম-প্রান্তে। হুঁশিয়ার ! হুঁশিয়ার ! এসে গেছে !

শব্দ উঠেছে ঘোড়ার খুরের। হা-হা হুঙ্কার উঠছে।

দরজার গোড়ায় হল্লা উঠল।—এই বাড়ি। এই বাড়িতে আছে—সেই আশ্চর্য মেয়ে। এই বাড়ি।

বাপ দাঁড়ালো ঘুরে। সে রুখবে। মেয়ে পড়ল লাফ দিয়ে কুয়োতে। বাপ কি ভেবে নিজেও এসে লাফ দিল কুয়োতে। তলোয়ারখানা নীচের দিকে মুখ করে ধরেছিল শক্ত হাতে। যদি লাফ দিয়ে পড়েও বেঁচে থাকে মেয়ে ! তার পিছনে ঝাঁপ দিল মেয়ের মা, ঝাঁপ দিল বেটার বউ। লড়াই দিয়ে জখম হয়ে পড়ে গেল ছেলে।

সেই ছেলে বেঁচেছিল।

গাঁওয়ে গাঁওয়ে গীত গেয়ে বেড়াতো পাঞ্জাবের ভিক্ষুক গায়ক।

•

সে-ও সেদিন ঠিক এইভাবেই পড়েছিল খদের মধ্যে। বাপজী তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপ দিতে পারেন নি।

তার আগেই গুলি এসে বুকে লেগেছিল তাঁর। সে খদে পড়েছিল। তারপর সবে তার জ্ঞান হচ্ছে তখন।

এই রঙ এই চুল চোখে দেখে সর্দার হরদয়াল আর তার বেটা সবিস্ময়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন সেই খদের মধ্যে—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ? ক্রীশ্চান ?

সে বলেছিল—না, আমি হিন্দু।

—হিন্দু ?

সর্দার হরদয়াল তাকে উঠিয়ে নিয়ে বলেছিলেন—চলো বেটী। উঠো।

সে আর্তস্বরে প্রশ্ন করেছিল। কাঁহা ?

চলো। হিন্দোস্থান। থোড়া দূর গেলেই মিলবে।

হরদয়ালের প্রৌঢ় সর্বহারা ছেলে বলেছিলেন—আমাকে দাও। তুমি বইতে পারবে না।

সর্দার বলেছিলেন—আরে, সফেদ ফুলের মত এই মেয়ে—ওজন তার কতটুকু। চলো বেটী।

সর্দারের ছেলে ছিল আজাদ হিন্দ্ দলের সিপাহী। সবে মাসকতক সে দেশে ফিরেছিল। সে চলেছিল নিঃশব্দে। তার দুই ছেলে গেছে, স্ত্রীকে নিজে হাতে কেটে এসেছে। কথা তার যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। রাত্রিটা এসে, ভোরের সময় একখানা পুড়ে যাওয়া গ্রামের প্রান্তে একখানা পোড়ো ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। একটু পরই এসেছিল শিকারী জন্তুর মত চারজন।

* * *

—হ্যাঁ, এ তো ঠিক আপনি। এখানে এমন করে চুপচাপ বসে ?

একখানা জিপ এসে সশব্দে থেমে গিয়েছিল। জিপের শব্দে তার একাগ্রতা ভঙ্গ হয় নি, কিন্তু কথায় হল। সে মুখ ফেরালে। কণ্ঠস্বরে চেনার আভাস জেগেছিল, কিন্তু তন্ময়তার জন্য যেন অনেক দূরের ডাকের ক্ষীণ আবেদনের মতই স্পষ্ট হয় নি, প্রত্যক্ষভাবে তাকে স্পর্শ করে নি।

ডাকছিলেন তাকে মাইথনেরই একজন এঞ্জিনীয়ার; দিব্যেন্দুরই বন্ধু। জীবন মিত্তির। কাজে কোথায় বেরিয়েছিলেন। সম্ভবত আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাওয়ার হাউস থেকে আসছেন। ওই পাওয়ার হাউসেই তার দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল দিব্যেন্দুর সঙ্গে।

মিত্তির বললে—ওপাশের বাঁকটা ঘুরেই ড্যামের মুখে জিপটা আসতেই দেখি রেলিংয়ে চিবুক রেখে কে বসে। ইলেকট্রিকের আলো মাথায় পড়েছে। গালের একপাশে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মিস ভট্টাচারিয়া ছাড়া আর কেউ নয় এ। এ রঙ, চুল, একজনেরই আছে এখানে। এবং এই শুভ্র পরিচ্ছদ-রুচি।

বিপাশা বললে—হ্যাঁ, আমার সৃষ্টিকর্তা আমার সর্বাঙ্গে একটা ছাপ মেরে দিয়েছেন বটে। চুলগুলো তার ধ্বজা। এ দেশের সবার চোখ আগে ওইখানেই পড়ে।

—আপনি রাগ করলেন না কি ? আমি কিন্তু—

হেসে বিপাশা বললে—না। আমার রাগ আমার চুল চোখ রঙের মত উগ্র। তাতে আপনি অন্তত জ্বালা অনুভব করতেন। রাগ করিনি তবে এখানে বসে বসে ওই কথাই ভাবছিলাম কিনা ! আমার জ্ঞান হওয়া অবধি—মায়ের কাছে, বাবার কাছে, জানাচেনা অচেনা লোকের কাছে—এত বার শুনেছি এই কথা ! এবং এতবার এর জন্যে বিপদে পড়লাম, আবার উদ্ধারও পেলাম, আবার তাই হল নূতন বিপদ—সে কি বলব আপনাকে। পাকিস্তান থেকে আসবার পথে বাবা মারা

গেলেন, আমি ঝাঁপ দিয়েছিলাম একটা খদে—সেখানে কিভাবে একটা ঝোপে পড়ে বেঁচেছিলাম। সর্দার হরদয়াল সিং আর তাঁর ছেলে আমাকে দেখে মরা ভেবেও এই এরই জন্যে আমার কাছে এসে দেখেছিলেন। চোখ মেলে তাকাচ্ছি দেখে প্রশ্ন করেছিলেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান? ক্রীশ্চান? ওঃ!

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—সর্দার হরদয়াল অমৃতসরে এক বাঙালী ফ্লাইং অফিসারের হাতে বাঙালী বলে সঁপে দিলেন—তা সে ভদ্রলোক বিশ্বাসই করবেন না যে এই রঙ, এই চুল, এই চোখ বাঙালীর হয়। যাই হোক, তিনি আমাকে সেইদিন তাঁর প্লেনে দিল্লী আনতে পারলেন না। আমাকে পৌঁছে দিলেন রেফিউজি উইমেন ক্যাম্পে। সেখানেও সেই বিস্ময়। তখন আমার জ্বর, কলেরা ভ্যাকসিন নিয়েছি, তার উপর ওই উঁচু থেকে ঝোপের উপর পড়ে বেঁচেছি কিন্তু সর্বাঙ্গে ব্যথা যন্ত্রণা। ক্যাম্পের একপাশে খান তিনেক কম্বল নিয়ে পড়ে আছি। প্রায় বেহুঁশ। সেই সময় এক খাণ্ডারনী মেয়ে এসে চেঁচাতে লাগল, ই কৌন হ্যায়? এই—এই—! এই লৌণ্ডি! এই!

অনেক কষ্টে চোখ মেলে চাইলাম, বললাম—আমি কিরিস্তান নই।

মেয়েটা গর্জে উঠল—তবে তুই মুসলমানী।

বললাম—না। আমি হিন্দু।

সে বলে—কথনও না। হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে। ইচ্ছে বলে তখন কিছু ছিল না। শুধু মনে এল একটা দারুণ আতঙ্ক। শুধু কাঁদতে লাগলাম।

মিত্তির বললেন—ওঃ, সত্যিই সে এক ভীষণ অবস্থা। বাচ্চা মেয়ে আপনি তখন—

—বারো বছর বয়স।

মিত্তির বললেন—আপনি কি এখানে বসে থাকবেন এখন?

—কি করব? ভাবি একটু জীবনের কথা।

—না। উঠুন। চলুন জিপে করে আপনাকে পাকেত পৌঁছে দি। আমি জানি মিস ভট্টাচারিয়া দিব্যেন্দুর উদ্দেশ্যহীন হয়ে ডুব মারার কথা। আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও জানি। আপনি এই লেকের ধারে বসে থাকবেন একা চুপ করে—এটা ঠিক হবে না। আমার অনুরোধ, আপনি ফিরে চলুন।

একটু হাসলে বিপাশা। তারপর হেসে বললে—আপনার ভয় হচ্ছে?

—বলতে পারেন। এবং যুক্তি অনুসারে নেহাৎ অমূলকও নয়।

—নাঃ, আমি মরতে যাব না সহজে। অন্তত দুঃখে মরতে যাব না। ভয়েও যাব না। শোকেও না।

—তা হোক। উঠুন। আপনার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেও বলছি—মানুষের বিচিত্র খেয়াল তো! যদি এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে ডুব মেরে বরাকর নামক নদকুমারের কুমারহৃদয় তুলবার খেয়াল হয়, কে বলতে পারে? একটু হাসলেন মিঃ মিত্তির। অর্থপূর্ণ হাসি!

বেদনা-মিশ্রিত একটি স্মিত হাসি একবার বিপাশার মুখে ফুটে উঠল। বললে—আপনি তো অনেক জানেন দেখছি! চলুন। জিপে সে এবার উঠে বসল। সত্যিই রাত্রি বেশ হয়েছে।

পাহাড়ঘেরা মাইথনের বুকের আলোগুলি শরতের অমাবস্থার রাত্রির আকাশের নক্ষত্রের মত দেখাচ্ছে। তাকে পাঞ্চেতে ফিরতে হবে। মিশনের প্রধানা মাদার গ্রাহাম—বড় খিট্‌খিটে মানুষ। এমনিই তাঁর সঙ্গে বনাবস্তি নেই। তিনি কিছুতেই মনে করতে পারেন না, বা, রাখেন না যে, সে তাঁদের কেউ নয়।

মাদার গ্রাহাম আজও মনে ভাবছেন যে, সরকারী এই বৃত্তির অধ্যায় শেষ করে এ মেয়ে নিশ্চয় তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। এবং তিনিও ভাবতে পারেন না যে, এমনই যার সর্বাঙ্গে ইওরোপের সম্পর্কের চিহ্ন বিদ্যমান—হোক না সে সম্পর্ক-সূত্র সুদীর্ঘকাল অতীত পর্যন্ত দীর্ঘ তবুও এ মেয়েকে ক্রাইস্টের প্রবর্তিত ধর্মরাজ্যের প্রজা হতেই হবে। এ যে রক্তের দেয় রাজকর!

জীপটা ছুটে চলল। মিত্রের পাশে বসে পুরনো কথার জের টেনে সে বলল—যে কথা বলছিলাম—সেই রেফিউজি ক্যাম্পের মেয়েটা একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে। আমি অসহায়। বুঝতে পারিনে কি করব! সে যে কি ভীষণ এবং জটিল অবস্থা সে. আপনি ভাবতে পারবেন না।

মিত্তির স্টিয়ারিংট ধরে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। অন্ধকার ঘন হয়েছে, তার মধ্যে ইলেকট্রিক আলোয় পিচঢালা পথ চলে গেছে। পথে লোকজন বড় নেই। ভয় হঠাৎ পাশের অন্ধকার থেকে কোন অর্ধনগ্ন ছেলে ছুটে এসে পড়বে পথের উপর। অথবা কোন মদ্যপ্রমত্ত ব্যক্তি, এসে পড়বে টলতে টলতে। মিত্তির বললে—অনুমান নিশ্চয় করতে পারি।

—না, পারেন না। শুনুন। এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে একসময় এলেন একজন সুবেশা প্রৌঢ়া। সব খোঁজ করে গেলেন। মিষ্টি কথা বলে গেলেন। কিছু ফল নিয়ে এসেছিলেন—ফল দিয়ে গেলেন। এক দয়াবতী মহিলা। একটা ব্যাজ রয়েছে বুকে। তিনি আমার কাছে দাঁড়ালেন। ঝগড়া মেটাবার জন্য কত মিষ্টি কথা বললেন। কিন্তু সেই খাণ্ডারনী অটল। কিছুতে শুনবে না। অবশেষে সেই দয়াবতী বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে বললেন—ওঠ বেটি, চলো তুমি, আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে আমাদের দলের সঙ্গে দিল্লী পৌঁছে দেব। আমি বাঁচলাম। আমাকে বললেন—তুমি বলবে, আমি তোমার আপন-জন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। আমি চললাম। বেরিয়ে এলাম; তাঁর সঙ্গে গাড়ি ছিল—টাঙ্গা অবশ্য। নিয়ে গিয়ে তুললেন একটা বাড়িতে। সেখানে আরও প্রায় তিরিশজন মেয়ে আঠারো বিশ পনের ষোল; সবাই দেখতে সুন্দরী। বাড়ির দরজায় পাহারা। সেটাও একটা ক্যাম্প। কিন্তু কিসের জানেন? নারী বেচা-কেনার কারবারীর। ওই প্রৌঢ়া তার একজন সংগ্রহকারী। মালিক কয়েকজন আছেন শিখ সর্দার, হিন্দুশ্রেষ্ঠ, একজন তিলকধারীও ছিলেন। ক্রেতা—বড় বড় শহরের ব্রথেল পরিচালকরা। শুধু তারাই নয়, জমিদার আছে, রাজাও আছে, আবার বর্ধিষ্ণু চাষীও আছে।

মিত্তির বলে উঠল—মাই গড্! বলেন কি?

পৃথিবীর বুকে অরণ্য কেটে নগর বসিয়েছে মানুষ, রাস্তায় আলো জ্বেলেছে, কিন্তু তারই মধ্যে আশ্চর্যভাবে অরণ্যের অন্ধকার মিশে রয়েছে এবং চলছে অরণ্যের খেলা। শ্বাপদে শ্বাপদে লড়াই চলছে, বাঘে হুঙ্কার দিচ্ছে, ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে হরিণের উপর, রক্ত পান করছে। আবার হায়েনা

ঘুরছে, চুরি করে আনছে বাঘিনীর শাবক। শেয়ালে ধরছে খরগোস। হয়তো বা মানুষের সমাজের অরণ্যের কারবার আরও হিংস্র, আরও কুটিল, আরও জটিল। মানুষ ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরে। মানুষও ধরে। এবং এ ফাঁদে মানুষ যারা ধরা পড়ে, তাদের নিষ্কৃতি থাকে না। সে—স্লেভ মার্কেট, মিস্টার মিত্তির, এ ভেরী বিগ স্লেভ মার্কেট! সেখানে রাজার মুকুট. শেঠের পাগড়ী, ফেল্ট হ্যাট, কোট-প্যাণ্ট-টাই—সব দেখেছি, ক্রেতা। দে কেম ইন বিগ কার উইথ আর্মর্ড গার্ডস সিটিং বাই দি সাইড অফ্ ড্রাইভারস্। আমার ভাগ্যবলে আমি তার মধ্যে থেকে উদ্ধার পেলাম। আমাকে কিনেছিল দিল্লীর এক শেঠ। নিজের জন্য নয়। দিল্লীর জি. বি. রোডে ছিল মস্ত বাড়ি। সেখানে থাকত এই দেহপণ্যারা। জন দশেক মেয়ে কিনে সে ফিরছিল। আসছিল ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে। সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল ক'জন প্রৌঢ়া—ক'জন যোয়ান। সব থেকে আশ্চর্য কি জানেন—যে খাওারনী ক্যাম্পে আমাকে মুসলমানী ক্রীশ্চান বলে হৈ-চৈ করেছিল, সে-ও ছিল তার মধ্যে। যোয়ানদের সঙ্গে ছোরা। সেগুলো আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছিল মধ্যে মধ্যে। আমি খানিকটা বুঝছিলাম, খানিকটা বুঝছিলাম না। সন্দেহটা দৃঢ় হল খাওারনীকে দেখে। কিন্তু কি করব? অন্য যারা, বয়স বেশী, কিন্তু আমার থেকে ভীতু। তারা হতভম্ব হয়ে বসে ছিল। একদিন একরাত্রি পর তখন সন্ধ্যে হবে হবে—হল কি জানেন, একটা রেলওয়ে ক্রসিংয়ে গাড়িটা আটকে গেল। শুধু আমাদের ট্রাক নয়—সারিবন্দি গাড়ি। জিপ আর ট্রাক। তার সঙ্গে রয়েল গাড়ি। লোকে চলেছে দিল্লী। দিল্লীতে তাদের—হামারা সরকার। সেই সরকারের কাছে চলেছে। খেতে দাও, থাকবার জায়গা দাও, হামারা এই-এই লোক হারিয়েছে, খুঁজে দাও!

আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল আমার মায়ের কথা। মরণা হ্যায় তো লড়না হ্যায়। মারণা হ্যায় তব মরণা হ্যায়। সাহস পেয়ে গেলাম সামনে খান দুই জীপ দেখে আর একখানা গাড়িতে একজন মিশনারী ইংরেজকে দেখে। ওদের ইস্কুলে ছেলেবেলায় পড়েছি। আমি হঠাৎ উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ট্রাক থেকে, ছুটে গিয়ে মিশনারী ফাদারকে বললাম—সেভ মি ফাদার—সেভ মি! প্রাণ ফাটিয়ে চিৎকার করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। জীপ থেকে মিলিটারী অফিসার লাফিয়ে পড়ল। লোকজন হল্লা করে উঠল। কি হল? আমি বললাম—আমাদের ওরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে? কে? কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন মিলিটারী অফিসার। কোমরের পিস্তলটা হাতে উঠল। এরপর আর জানি নে। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হয়ে দেখলাম, আমি মিশনারী সাহেবের গাড়িতে। আমার এই রং চুল দেখে আমাকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ক্রীশ্চান জেনে তুলে নিয়েছেন। কথাও বলেছিলাম আমি ইংরিজীতে। সুতরাং—

একটু হেসে বিপাশা বললে—ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার হয়ে গেল। হিন্দুর মেয়ে পড়লাম ক্রীশ্চানের হাতে।

মিত্তির জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু তাদের কি হল?

—শুনেছিলাম, মেয়েগুলো সেই খাওারনী-সমেত ধরা পড়েছিল—কিন্তু পুরুষগুলো লাফ মেরে

পড়ে সেই হাজার হাজার রেফুউজীর দলে কোথায় যে মিশে গেল ধরতে পারে নি। ড্রাইভার ধরা পড়েছিল। তাদের খুঁজে বের করার উপায় ছিল না, কারণ ফটক খুলতেই চলমান জনস্রোত বাঁধভাঙা জলের বেগে ঠেলা মেরে এগুতে আরম্ভ করেছিল।

মাইথন থেকে পাঞ্চেতের পথে খুদিয়া নদীর পুল। সেই পুলের উপর উঠল জীপ।

মিত্তির বললেন—ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার ছ্যান ফিকশন, আপনার জীবন তাই।

চুপ করে গেল বিপাশা। যেন অকস্মাৎ থেমে গেল। খুদিয়াপুলের উপর উঠে অকস্মাৎ তার দিব্যেন্দুকে মনে পড়ে গেছে।

ছদিকে আশে পাশে কোলিয়ারি। বয়লারের ফানেলের আগুনের শিখা নাচছে। ওদিকে ফায়ার-ব্রিক্স কারখানায় সারি সারি চিমনির মাথায় আগুন দেখা যাচ্ছে। কোলিয়ারির গিয়ার হেডের তারের দড়া নামার শব্দ, বয়লারের গুম্ গুম্ শব্দ, স্টীম বেরুনোর শব্দ, কুলীদের গান—শোনা যাচ্ছে।

মিত্তির কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে প্রশ্ন করলে—ক্রীশ্চান তো হন নি আপনি?

—না। ছেলেবেলা থেকে মা আমার মনে হিন্দুধর্মকে পাকা করে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। আজ ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি নেই আমার। কিন্তু সংস্কার আমার মনের গভীরে রয়েই গেছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—তার জন্যে আমি লজ্জিত নই কোনদিন।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনের নীতিধর্মকে, তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে যারা ধর্মের উর্ধ্বে তুলতে পারে তারা নমস্য, মহতো মহীয়ান। যাঁরা ধর্মকে ধ'রে ধর্মগত নীতি মেনে সংস্কৃতিবান—তাঁরা মহৎ। কিন্তু ধর্মকে পায়ে দলে নীতি-বিচারকেই আবর্জনার মত ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যারা সংস্কৃতির বড়াই করে, তারা যে পায়ে ধর্মকে দলতে চায়—তারই পথের ধুলো উড়িয়ে গায়ে-মাথায় মেখে রসাতলে দেয় সংস্কৃতিকে। নাইট-ক্লাবে তার সাক্ষাৎ পরিচয় মিলবে। এমনতরো অনেক সংস্কৃতির আসর আছে শহরে শহরে। আমি সাধারণ একটি মেয়ে—যে ধর্মে মানুষ হয়েছি তাকে ছাড়তে আমি পারব কেন? চাইনেও ছাড়তে।

মিত্তির এর কোন উত্তর দিলেন না। জানতে চাইলেন এর পরের কথা। বললেন—কিন্তু এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে বেগ পেতে হয় নি?

—হয়েছিল। সেও অনেক কথা। কিন্তু—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে বিপাশা—মনটা কেমন ক্লান্ত হয়ে গেছে অকস্মাৎ। বলব—অন্য কোন দিন। আজ থাক।

এর পর জীপ চলল তার শব্দ তুলে। এরা নিস্তব্ধ। পাঁচেতের আলো দেখা যাচ্ছে এবার। পাচেত আজও শেষ হয় নি। কাজ চলছে। এই রাত্রেও মেশিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিপাশাই বললে—'উপনয়ন' নৃত্যনাট্যে আপনি সেজেছিলেন বরাকর। না?

—হ্যাঁ। দিব্যেন্দু নিজে দামোদর।

—খুদিয়া?

—মেয়েটির নাম ভুলে গেছি। কলকাতা থেকে এসেছিল।

হেসে বিপাশা বললে—খুদিয়া ব্রিজটায় উঠে মনে পড়ে গেল। খুদিয়া ব্যঙ্গ করে বলছে দামোদরকে—আ, তুরা আর বুলিস না গো, কথা আর বুলিস না। সাদাবরণ গঙ্গার লেগে পরাণ তোর উথালি-পাথালি করছে! আঃ, হায় মরদ! যত মর্দানী আমাদের কাছে। সে তো পুঁছলেও না। আঃ।

—আপনাকে একটু ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিল দিব্যেন্দু। আমাকে বলেছিল।

আবার চুপ করে গেল বিপাশা। মাইল দেড়েক রাস্তার মধ্যে আর সে কথা বললে না। জীপটা এসে দাঁড়াল পাঞ্চেতে জেনানা মিশনের কাছে। জীপ থেকে নেমে বিপাশা বললে—আচ্ছা। আপনাকে ধন্যবাদ।

—দাঁড়ান, এক মিনিট!

দাড়াল বিপাশা।

মিত্তির বললে—দিবোন্দুর খোঁজ করতে আমি চেষ্টা করছি। আমি ঠিক এখনও বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার!

শুধু সংক্ষিপ্ত একটি কথা—ধন্যবাদ।—বলেই চলে গেল বিপাশা। অত্যন্ত দ্রুত পদে। বোধ করি চোখে তার জল এসেছে।

চার

আপনাকে প্রণাম, মাদার গ্রাহাম বিকেল বিকেল বেলা চলে গেছেন। একটা জরুরী টেলিগ্রাম এসেছিল।

বিপাশার কোয়ার্টার্স আলাদা। এখানকার মিশনের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে। ছোট একখানি ঘর এবং রান্নাঘর বাথরুমযুক্ত কোয়ার্টার। একটি আদিবাসী মেয়েই তার কাজ-কর্ম করে। রান্নাও সেই-ই করে, কিন্তু কুকারে হয়। একটি ছাগল আছে, আর আছে একটি বেড়াল। ছাগলটা ওই আদিবাসী মেয়েটির—চুড়কির। বেড়াল নিজেই এসে স্থান করে নিয়েছে বিপাশার কোল ঘেঁষে বসে। আর একজন আছে, তার খাদ্য এখান থেকেই মেলে কিন্তু দরজার বাইরে তার স্থান। সে একটা কুকুর।

বাড়িতে এসেই সে চুড়কির কাছে মাদার গ্রাহামের খবর শুনে নিশ্চিন্ত মনে মুখ হাত ধুয়ে এসে জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ওঃ, একটা তিক্ত বাদানুবাদের অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন ভগবান। ডাকলে—চুড়কি!

—হুঁ, যাই। চায়ের জলটা চড়ায়েছি। চা ভিঁজায়ে আসছি!

সামনে ওই দূরে দামোদরের গর্ভ। বালি-ঢাকা পাথুরে নদীগর্ভ। সারি সারি আলোর ছটায় দেখা যাচ্ছে। মধ্যে পাথরের স্তর উঠে জেগে রয়েছে বাঁধের মত।

ভাঙরে—ভাঙরে—ভাঙরে—
বুক দিয়ে ঠেলে ভাঙরে—
নখে দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে রক্তে অঙ্গ রাঙরে—

দামোদর নদের মুখের গান। রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ছায়া আছে, কিন্তু সে ছায়াকে এরা বর্বর সুর আর প্রকাশভঙ্গি দিয়ে চাপা দিয়েছে। এর সঙ্গে মাদল বাজতো, মুখেও বোল বলত, ধিত্তাং তাং, ধিত্তাং তাং—তাংরে।

ওই 'উপনয়ন' গীতি-নাট্যের গান। রচনা করেছিল দিব্যেন্দু। এবং অভিনয় করেছিল অনেক বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে। দিব্যেন্দু নিজেই নিয়েছিল দামোদরের ভূমিকা। এই অভিনয়ের আসরেই দিব্যেন্দুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল। অর্থাৎ দিল্লীর কনস্টিটিউশন হাউসে প্রথম সেই সাক্ষাতের কথা-কাটাকাটির পর। সে সবে এখানে তখন মাত্র দিন তিনেক এসেছে। জেনানা মিশনেও ওরা নিমন্ত্রণ করেছিল, সেও একখানা কার্ড পেয়েছিল। বেশ লেগেছিল। কিন্তু শেষটায় মনে মনে হেসেছিল। একটু লজ্জাও হয়তো হয়েছিল। কারণ, ওর মধ্যে গঙ্গার ভূমিকাটিতে যেন সে নিজেকে দেখতে পেয়েছিল! যে মেয়েটি গঙ্গা সেজেছিল তাকে সাজানো হয়েছিল তার রূপ অনুকরণ করে এবং দিল্লীতে কনস্টিটিউশন হাউসে তার সঙ্গে দিব্যেন্দুর যে বিরূপতার মধ্যে পরিচয় হয়েছিল, তার কিছু কথাবার্তাও এসে পড়েছিল। অথচ, সাধারণের কাছে এতে কোন কিছু অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয় নি। হিমাচল-দুহিতা গঙ্গা, গলিত তুষারবর্ণা, তার চুল স্বর্ণাভ, চোখ স্বর্ণাভ। এবং বর্বর অরণ্য পর্বত যা হিমালয়ের কাছে ব্রাত্য, তার সন্তান দামোদরকে সে গ্রাহ্য করবে কেন? দিব্যেন্দু ভুলতে পারে নি কনস্টিটিউশন হাউসের সেই কথাগুলি।

চুড়কি এসে দাঁড়াল দু'কাপ চা নিয়ে। একটা কাপ নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—সাহেব? সি কুথা?

ভ্রূ-কুঁচকে তাকালে বিপাশা—কে সাহেব?

—কেনে সেই সাহেব—মাইথনের সাহেব? যার সঙ্গে দেখা হয় তুমার, নিত্যি—

—তাকে কোথায় দেখলি তুই? বিপাশা বুঝলে সে দিব্যেন্দুর কথা বলছে।

—কেনে, তুমাকে গাড়িতে করে নিয়ে এলো যি! নামলে দুজনাতে।

—না। সে মিস্তির সাহেব। চলে গেছেন তিনি।

—সি? সি সাহেব কুথা গেল? লোকে বুলছে কুথা গেলছে। ফিরে নাই?

—না!

—কবে আসবে?

—জানি না! হয়তো আসবে না।

—আসবে না? চুড়কি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু হেসে বিপাশা বললে—না এলে কি করব?

—কেনে? চুলের মুঠো ধরে নিয়ে আসবে! তুমি ছাড়বে কেনে?

—তা তো আনব। কিন্তু পাব কোথায় ?

—কেনে ! তার বাড়িকে যাও।

—তুই বুঝি যেতিস ?

—হুঁ। ঠিকই যেতম। বলতম—তুমার লাজ নাহি হে ? তুমি ঘুরুর ঘুরুর করলে—ছিঁচকার মতুন। আমি ডাকলাম ভালমানুষ ভেবে। ভালবাসা দিলম। তুমি পালায়ে এলে ? কেনে তা আসবে ? ছাড়ব কেনে হে তুমাকে ? বলে তার চুলের মুঠা খামুচে ধরতম। পঞ্চায়েৎ ডাকতম।

—তাই যাব। কিন্তু আজ আর আমার জন্যে ময়দা মাখিস নে। রুটি খাব না।

—কি খাবে ?

—ভেবে দেখব পরে চুড়কি। তুই যা এখন। তুই এখন যা। তোর রান্না তো আছে। খাবি তো তুই।

—যাচ্ছি আমি। তুমি বৈঠে বৈঠে ভাব—আর ফোঁসর ফোঁসর কর।

বলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল—নোকেরা সব হাসছে।

—হাসুক !

চুড়কি চলে গেল। চুড়কির নোকেরা অর্থে মিশনের শিক্ষয়িত্রী যারা তারা। তা তারা হাসুক।

তবে চুড়কি যা বলেছে, তা খুব অযুক্তির কথা নয়। দিব্যেন্দুর একটা খোঁজ করবে না ? তাকে খুঁজে অন্তত এই প্রশ্নটা করবে না—তুমি মানুষ না পশু ?

এই প্রশ্ন সে ওই নৃত্যনাট্যের দিন অবশ্য অন্যভাবে করেছিল। সে দেখা করতে এসেছিল অভিনয়ের পর অন্য একটা তাগিদে। তাগিদে নয়—একটা বিশেষ কৌতূহলের প্রেরণায়। দামোদর নদের ভূমিকায় সে যে মেকআপ করেছিল—সেই মেকআপে তাকে যেন খুব চেনা মনে হয়েছিল। খুব চেনা। কিন্তু তা সে ঠিক ঠাওর করতে পারে নি। কিন্তু বলতেও পারে নি। সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল। তখন অবশ্য মেকআপ তুলে ফেলে দিব্যেন্দুই হয়েছে। তাই সে-কথা বাদ দিয়ে ওই প্রশ্নই করেছিল। তার মধ্যে এই অভিযোগ ছিল না—সরস স্মৃতি-জড়িত একটু সলজ্জতা ছিল। নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের পর বলেছিল—আপনি কে বলুন তো ?

দিব্যেন্দু হেসে বলেছিল—অভিনয়ে দেখলেন তো, বন্য-বর্বর। কৃষ্ণাঙ্গ।

সে বলেছিল—আপনি খুব সেন্টিমেন্টাল এবং স্মৃতিও খুব তীক্ষ্ণ।

—বন্যেরা তা হয় একটু।

—না, দামোদরের কথা বলছিনে। আপনার কথা বলছি।

—হ্যাঁ, তাও বটে। তা না হলে এঞ্জিনীয়ার হয়ে নৃত্যনাট্য রচনা করি ! না পাঞ্জাবে গিয়ে বাজী রেখে নদীতে ঝাঁপ খাই !—বলেই একটু হেসে বোধ করি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যেই বলেছিল—তারপর, কেমন লাগলো বলুন ?

—অভিনয়—রচনা ?

—তীর যখন লক্ষ্যভেদ করেছে—অর্থাৎ হিট দি মার্ক হয়েছে তখন ফুলমার্ক পাবেন আপনি।

আরম্ভটা চমৎকার হয়েছে। পুরাণ-টুরাণ খুব পড়েছেন, না? সুন্দর। এবং সুচতুরও বটে।

সত্যই সুন্দর। এবং সুচতুর এই অর্থে যে, দিল্লীতে তার সঙ্গে যা যা ঘটেছিল—তাই নিশ্চয় তার মনের মধ্যে বেশ একটা ক্ষোভ এবং বেদনার সঙ্গে ফুটে উঠতে চেয়েছিল—ফুটে উঠেওছে, কিন্তু সেটা যে তার জীবনের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তা কোনক্রমেই বোঝা যায় না। আরম্ভ করেছিল মাইক্রোফোন মারফৎ একটি ভূমিকা পাঠ করে।

পুরাণের কাল। তখনও ভারতবর্ষের বুকে গঙ্গার ত্রিতাপহারিণী সলিলধারা প্রবাহিণীরূপে প্রবাহিত হয় নি। আজকের গাঙ্গেয় উপত্যকা—সেই বিস্তীর্ণ ভূমি—হরিদ্বার প্রয়াগক্ষেত্র বারাণসী তীর্থ-মহিমায় মহিমান্বিত হয় নি, হিমাচল বক্ষকণার উর্বরতায় উর্বর হয় নি, এই বিস্তীর্ণ ভূমিতল তখন আকাশ-প্রসাদ-ভিক্ষু; বঙ্গোপসাগর থেকে হরিচন্দনের মত কোমল মৃত্তিকাময়ী অঞ্চলের তখনও জন্ম হয়নি। তখন একদা উদ্ধত সগরসন্তানেরা মহাতপস্বী কপিল মুনির ক্রোধানলে ভস্ম হলেন। তাদের ভস্মরাশি সলিল-সিঞ্চন-বঞ্চিত মৃত্তিকার উপর নিয়ে এল মরুভূমির ধূসরতা। গঙ্গার উপকূল থেকে দূরে যাবেন আপনারা লালমাটি আর কাঁকরের দেশে—পাবেন আজও তার রুক্ষতা ও অনুর্বর ধূসরতার সামান্য কিছু পরিচয়। এই ভস্মরাশির মধ্যে লক্ষ সগর সন্তানদের প্রেতাত্মা সমাধিস্থ। ভগীরথ গেলেন তপস্যা করতে। তপস্যায় তুষ্ট করলেন। ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে বিষ্ণু পাদোদ্ভূতা গঙ্গা মাতৃগর্ভে অপরূপা কন্যার মত ধ্যানমগ্না। ব্রহ্মা কন্যার ধ্যানভঙ্গ করে বললেন—মা, তোমার ভূমিষ্ঠ হবার লগ্ন সমাগত। তুমি ভূমিষ্ঠ হও; অবতীর্ণ হও নগাধিরাজের অঙ্গনে, তাঁর মহাশক্তিরূপিণী কন্যা উমারই মত সমান সমাদরে গৃহীত হও; সেখান থেকে অবতীর্ণ হও হরিদ্বারে, ধূর্জটি তোমাকে জটাজালে ধারণ করবেন, তাঁর শিরোমণির সমাদর গৌরব গ্রহণ করে অবতীর্ণ হও ভূমিতলে—বসুমতী ধন্য হোন, ভারতবর্ষ পুণ্য মহিমায় মহিমান্বিত হোক, শ্যামলা হোক, কোমলা হোক, তোমার শীতল শীকরস্নিগ্ধ সমীরণাকাঙ্ক্ষিণী হয়ে স্বয়ং কমলা শ্যামাঞ্চলখানি বিছিয়ে তাঁর সোনার অঙ্গ এলায়িত করে সুখাসীনা হোন; স্বয়ং উমা গৌরী অন্নপূর্ণারূপিণী হয়ে তাঁর অন্নশালার প্রতিষ্ঠা করুন। লক্ষ সগর সন্তানের অভিশপ্ত আত্মা অভিশাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গগামী হোক। তাদের সঙ্গে কোটি কোটি পতিত আত্মার উদ্ধার হোক। পাপী পাপমুক্ত হোক, তাপী তাপমুক্ত হোক তোমার স্নিগ্ধ সলিল অবগাহনে। ভূমি শস্যশালিনী হোক—নিরন্ন ক্ষুধার্ত অন্নে তুষ্ট হোক তৃপ্ত হোক, সাধু তপস্বীর সাধনা পুষ্ট হোক—তপস্যা সিদ্ধ হোক তোমার তটপ্রান্তে।

ব্রহ্মার বাক্য শেষ হতেই কমণ্ডলু থেকে আবির্ভূতা হলেন এক অপরূপা কন্যা। শুভ্র তাঁর দেহবর্ণ, স্নিগ্ধশীতল তাঁর স্পর্শ, নীলাভ তাঁর চক্ষুতারকা, আয়ত নেত্র দুটি যেন সদ্য জলোত্থিত শ্বেত পদ্মকোরক, মূর্তিমতী পবিত্রতা—মূর্তিমতী নিখিল-শুভ্র-সৌন্দর্য। কন্যা বললেন—কিন্তু এ কি দুষ্কর কর্ম দিলে আমাকে পিতামহ? এত পাপ, এত তাপ আমি বুকে ধরব কি করে?

পিতামহ বললেন—মা, যে বিষ্ণু থেকে তোমার উদ্ভব—আর যে ধূর্জটি তোমাকে মস্তকে ধারণ করবেন—তাঁরা হরিহর মূর্তিতে মিলিত হয়ে মহাসমুদ্রের মধ্যে তোমার জন্য আদিকাল থেকে

অবস্থান করছেন ; মহাপাল আর মহাকাল—তোমার পিতা এবং স্বামী উভয়ে গ্রহণ করবেন এ ভার।

দেবী সুরধুনী এবার নামতে লাগলেন পুণ্যলোক পথে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য দেবমহিমাও বিগলিত হয়ে কুমার কুমারীর মূর্তি ধরে নামতে লাগল। ব্রহ্মার মহিমা অপরূপ কুমার রূপে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করে নামতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্রমহিমা মহাবীর্যবান কুমার সিন্ধুরূপে অবতীর্ণ হলেন। ওদিকে নামলেন—শোণভদ্র। সঙ্গে সঙ্গে নামলেন চন্দ্রভাগা, শতদ্রু। নামলেন দেবকুমারীকুল। যমুনা, সরস্বতী, বিপাশা, ইরাবতী, সরযূ। বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হবেন গঙ্গা দেবীর নির্দেশে। কেউ যাবেন পশ্চিমে আর্য ঋষিদের তপস্যা ক্ষেত্রে। কেউ যাবেন পশ্চিম সমুদ্রে। কেউ যাবেন পূর্বে।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আচ্ছন্ন করে এলেন পুণ্য পুষ্কর মেঘ, তিনি মেঘপুষ্প অর্থাৎ বারিধারা বর্ষণ করতে লাগলেন—লাজবর্ষণের মত। হিমাচল শীর্ষে সে সলিলধারা শুভ্র তুষারে পরিণত হল। তারই উপর পাদক্ষেপ করলেন তুষারবরণী শুভ্রকেশিনী গঙ্গা। হিমাচল বললেন—ধন্যোঽহং! সেখানে পূজা সমাদর গ্রহণ করে, ধূর্জটি-জটাজালে নৃত্যলীলা শেষ করে দেবী নামলেন ভূমিতলে ভূতলে, ভারতবক্ষে হরদ্বার—হরিদ্বারে। সমগ্র ভারত-ভুবন শঙ্খধ্বনিতে কাঁসর ঘণ্টা বাদ্যে উৎসবময়ী সরসা হয়ে উঠল। ভয় নাই, আর ভয় নাই। সঙ্গীতধ্বনি উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা উত্তোলিত হয়েছিল।

শুভ্রবর্ণা শুভ্রকেশিনী গঙ্গাকে মধ্যে রেখে বন্দনা করছিল পুরনারীরা শঙ্করাচার্য রচিত গঙ্গাস্তোত্রে—

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে—
ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে—
শঙ্করমৌলিনিবাসিনী বিমলে—
মমমতিরাস্তাং তব পদকমলে।
হরিপাদপদ্ম বিহারিণী গঙ্গে—
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে—
খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে॥

দেবী গঙ্গা স্মিতহাস্যে শস্যশীর্ষ দিলেন গৃহস্থ বধূকন্যাদের। সাধু-সন্ন্যাসীদের দিলেন সিদ্ধি, বণিকদের দিলেন কড়ি শঙ্খ। এবং জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে পুষ্কর সলিলরাশির স্রোতে মকরবাহনে আরোহণ করে অগ্রসর হলেন।

তাঁরা চলে যেতেই এল আরও কয়েকটি বিচিত্র মূর্তি।

এরা পুষ্কর মেঘ ছাড়া অন্য মেঘ।—সম্বর্ত-আবর্ত-দ্রোণ। কেউ পিঙ্গলবর্ণ, কেউ কর্দমলিপ্ত কুটিল কৃষ্ণবর্ণ, কারও বর্ণ ধূসর ধূলিবর্ণ। হাতে ধ্বজা। কারও ধ্বজায় বজ্র এবং ঝড়, কারও ধ্বজায় বন্যা ও মড়ক, কারও ধ্বজায় অনাবৃষ্টি এবং মড়ক। এরা সকলেই বিক্ষুব্ধ অপমানিত।

গঙ্গাবতরণে তাদের মেঘপুষ্প বর্ষণের অধিকার দেওয়া হয় নি। তারা অপাংক্তেয় ?

সঙ্গে সঙ্গে এলেন সমুদ্র-মন্থনে অমৃতবঞ্চিত মৃত অসুরদের আত্মা—যাঁরা নিহত হয়েছিলেন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এবং বাসুকি নাগের বিষে।

কেন আমরা আজ আমাদের জীবন-মহিমাকে পাঠাতে পাব না মর্ত্যভূমে? আর্যাবর্ত বলে?

সঙ্গে সঙ্গে এলেন হিমাচল-মহিমা-বিদ্বেষী পর্বতেরা। কেন হিমাচল-শিখরেই অবতীর্ণ হল দেব-মহিমা? কেন আমরা বঞ্চিত হলাম?

এর পর এলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য।

বললেন—উত্তম কথা। দৈত্য শিষ্যবৃন্দ, তোমরা দৈত্য হয়েও বাহুবলে স্বর্গ অধিকার করেছিলে একদা। আজ মৃত্যুলোক থেকে পাঠাও তোমাদের মহিমাকে কুমার-কুমারী রূপে। পর্বতবৃন্দ, তোমরা তাদের ধারণ কর, গ্রহণ কর পালক-পিতা রূপে। যেমন হিমাচল আজ গঙ্গার জনক, সিন্ধুর জনক, ব্রহ্মপুত্রের জনক। তেমনি তোমরা হও এই বীর্যবানদের পিতা। আর মহাশক্তিশালী মেঘবৃন্দ, তোমরা এদের বহন কর—তোমাদের শক্তিতে এদের শক্তিমান কর। খর্ব করো গঙ্গার মাহিমা। বন্যায় বিধ্বস্ত করে দাও গঙ্গা পুণ্যমহিমান্বিত অঞ্চল।

বেজে উঠল কাড়া-নাকড়া করতাল-শিঙা। গুরু গুরু গুরু—ঝন ঝন—বিচিত্র ঐকতান বাদন।

শুরু হল গান—'ত্রিপুরাসুত নন্দন আমি প্রলয়শৃঙ্খলধর—

ভীষণ রুদ্র সঙ্গে যুঝিব আমি রে ভয়ঙ্কর—

শুক্রাচার্য হাত তুলে বললেন—আমি দিনু বর, আর নাম—দামোদর। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লয়ে, অমিত বিক্রমে তুই বিচরণ কর।

ডোরাসে সকলে গেয়ে উঠল—স্বাগত সুস্বাগত—অমিত বীর্যধর—

জয় দামোদর—জয় দামোদর, জয় দামোদর!

আবার এল এক কুমার—সে এসে বললে—আমি বরা-কর।

তার হাতে গদা!

এমনি করে এল, কুমার-কুমারী। অনার্য সব। তেমনি বন্য বেশভূষা। মাথায় কোঁকড়া চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফ। গলায় শঙ্খের মালা। পশুচর্মে বক্ষদেশ ঢাকা। পরনে রক্তাম্বর। মেয়েদেরও তাই।

বোকারো এল, কোনার এল। ওদিকে আবির্ভূত হল দারুকেশ্বর।

কুমারীরা এল—কেউ বললে—আমি বড়কি গড়িয়া—

তুফান তুলে পড়ব আমি ভুঁয়ে ঝারিয়া—

ও দামোদর, ও দামোদোর, মোর তুফানে ধর!

একসঙ্গে এরপর দুজন—একজন বললে—হম যমুনিয়া—

হম গোয়াই—

দামোদরের চরণ ধোয়াই—

চলো-চলো হে দামোদর আর সহে না তর।

ওদিকে বরাকরের কাছে এল ইসরি আর খুদিয়া। দুই কন্যা। হাতে মালা নিয়ে গাইলে—হালকা পাতলা মেয়ে খুদিয়া নাচলে লাফিয়ে লাফিয়ে এঁকে বেঁকে! পাথর ডিঙিয়ে পাথরে সুড়ঙ্গ কেটে সে আসছে যে। আশ্চর্য তরঙ্গময়ী খুদিয়া। লাস্যময়ী।

আমি খুদিয়া—আমি খুদিয়া—আমি খুদিয়া—
হরিণীর লাফে নাচিয়া নাচিয়া—
সাপিনীর ছাঁদে আঁকিয়া বাঁকিয়া—
ভাঙনের তালে ভেঙে ভেঙে চলি কে ধরিবি মোরে ধর।

বরাকর এসে তার হাত ধরে বললে—আমি ব-রা-ক-র।

এই ভাবে শিলাই মিলল দারুকেশ্বরের সঙ্গে। ওদিকে চলল কাঁসাই কংসাবতী একা। চলো সকলে মিলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, খর্ব করব বিষ্ণুদুহিতা শুভ্রবরণী গঙ্গার উপর। সমুদ্রসঙ্গম মুখে, তাকে বন্দিনী করব। আমাদের জল গিয়ে পড়বে সমুদ্রে। গঙ্গা হারিয়ে যাবে আমাদের মধ্যে। এদিকে বন্যায় জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস আনব গঙ্গামহিমান্বিত দেশে। চলো-চলো-চলো। বরাকর খুদিয়া ইসরি—মিলিত হয়ে এসে দামোদরকে শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে তার সঙ্গে নিজের শক্তি মিলিয়ে দিলে।

দামোদর ভেরী বাজিয়ে হাঁক দিয়ে বললে—

বরণ-গরবী দেবতার মেয়ে শোনো গো শোনো
কালোদের দেশে এসেছ এবার নয়নেতে
কালো কাজল টানো।

গঙ্গাকে দেখা গেল—পটভূমির গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছেন প্রবাহিনী হয়ে, মুখে একটু স্মিতহাসি। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে তার গতির সঙ্গে। পাশে পাশে চলেছে লক্ষ্মীর নৌকা।

খুদিয়া খিল খিল করে হেসে উঠল, হায়রে কালো মরদ, তোর কাঙালীপনা ওই সাদা মেয়ের কাছে।

দামোদর সেকথা গ্রাহ্য না করে বললে—তা হলে এই হল যুদ্ধ-ঘোষণা।

গান আরম্ভ হল—ভাঙরে-ভাঙরে!

ভেরী কাড়া-নাকাড়া শিঙা বাজতে লাগল। নাচতে লাগল তারা। নেপথ্যে কলরব উঠল মানুষের।

আবার সূত্রধার নেপথ্য থেকে বললে—অবাধ ধ্বংসলীলা চলল এই দামোদরের। গ্রাম-নগর শস্যক্ষেত্র সরোবর উদ্যান গ্রাস করে চলল সে অবাধে—চলল ওই শ্বেতবরণীকে সমুদ্রসঙ্গমের আগেই ধরবে, বন্দিনী করবে। ওদিক থেকে দারুকেশ্বর এল, নাম পাল্টে রূপনারায়ণ হয়ে। এল কাঁসাই হলদি হয়ে। বসুমতীর বক্ষ ক্ষত বিক্ষত হল। লক্ষ্মীর আসনকে বিধ্বস্ত করলে। মানুষ কম্পিত হল দামোদরের ত্রাসে। কিন্তু আশ্চর্য! ওই যে শ্বেতবরণী দেবনন্দিনী—তার মহিমা খর্ব হল না। ওরা মিলিত ভাবে মোহনার মুখে সংগ্রাম দিলে। প্রচণ্ড সংগ্রাম। কিন্তু ভাগীরথীর জলধারার মহিমা ম্লান হল না। কেউ পূজা করলে না দামোদরকে। কত হাজার

বছর গেল—তবু না হল জয়, না হল সন্ধি—না পেলে দামোদর গৌরব।

তারপর সে অন্তরে অন্তরে তপস্যা শুরু করেছিল। অসুরত্ব-মোচনের।

গঙ্গা বলেছিলেন—তুমি ত্রিপুরাসুরের আত্মজ। ত্রিপুরারি শিবেরই বর্জিত দৈত্যভাবের অংশ সে। তাই তিনি ছাড়া কেউ তাকে বধ করতে পারেনি। বর্জন করে এস তোমার দৈত্যভাব। তোমাকে গ্রহণ করব, সন্ধি করব তখন। তুমি পূজা পাবে, যখন কল্যাণব্রতী হয়ে আসবে তখন।

তাই অন্তরে অন্তরে চলছিল তপস্যা।

সেই তপস্যায় কলিযুগে এই বিংশ শতাব্দীতে দেবলোক থেকে বৃহস্পতির শিষ্য বিশ্বকর্মার আত্মজেরা দেববিদ্যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁরা এসে বললেন—উপবীত ধারণ করে আত্মত্যাগে কল্যাণের ব্রত গ্রহণ কর দামোদর, বরাকর। তাহলেই দেবত্ব অর্জিত হবে।

দামোদর বললে—দাও আমাদের উপবীত। দীক্ষা দাও।

আয়োজন চলল উপবীত ও দীক্ষা গ্রহণের। বিরাট আয়োজন।

নৃত্যনাট্যে যজ্ঞকুণ্ড জেলে উপবীত ধারণ করলে দামোদর, বরাকর।

পুরোহিত বললেন—বন্ধন—সংযমবন্ধনকে স্বীকার কর।

—করলাম।

—নিজের জীবন—তোমার জলরাশি চারিদিকে মানুষের সেবায়, লক্ষ্মীর সেবায় প্রবাহিত কর।

—করলাম।

—তুমি দ্বিজ হলে। এই তোমার নবজন্ম। তুমি দেবত্ব লাভ কর।

গঙ্গা এলেন। দূরে আবির্ভূতা হলেন, বললেন—প্রসন্ন হয়েছি। হে কৃষ্ণবর্ণ রুদ্র, তুমি শুভ্রবর্ণ দেবতা থেকেও মহিমান্বিত হও। দ্বিজত্ব অর্জন করেছ, কল্যাণব্রত গ্রহণ করেছ—এস, অবসান হোক সকল দ্বন্দ্বের। চল—প্রসন্ন মিলিত ছন্দে মিলিত হব সমুদ্ররূপী হরিহরের সঙ্গে।

অবশ্যই এর পরে গান ছিল। কিন্তু এক বিস্ময়ে অভিভূত বিপাশা সে গান মন দিয়ে শোনেনি।

প্রথম বিস্ময় তার হয়েছিল দামোদরকে দেখে। দাড়ি-গোঁফ বাবরী চুলে দামোদরকে দেখে মনে হয়েছিল—এ কে? এ কে? বড় চেনা মনে হচ্ছে যেন? মনে করতে পারে নি। দিব্যেন্দু বলে সন্দেহই হয়নি। তার কথা প্রথমটায় তো মনে হবার কথা নয়। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের উদ্যোগে এই নৃত্যনাট্য, এ তাদের খানিকটা প্রচারধর্মী। গ্রন্থনের কল্পনাটি ভাল লেগেছিল। পুরাণের সঙ্গে এ যুগের ছোট-বড়ত্বের দ্বন্দ্ব মিশিয়ে আবরণটি ওদের নিপুণ মেক-আপের মতই মনটিকে রসময় করে দিয়েছিল। যতক্ষণ না দামোদর গঙ্গাকে বলেছিল—

বরণগরবী দেবতার মেয়ে শোন গো শোন—
কালোর দেশেতে এসেছ এবার নয়নেতে
কালো কাজল টানো—
কাজল দীঘিতে ডুব দিয়ে নাও—
সোনালী চুলের বরণ ফিরাও—

কালো চুলে হয়ে ভুবনমোহিনী মাল্য আনো।
শোনো গো শোনো।
আনিতে হবে—মানিতে হবে—
হাসিতে হবে বসিতে হবে—ভালোবাসিতে হবে—
দেবতা গরব কালো এ মাটিতে মিশিয়া যাবে—
জানো গো জানো।

এই গান শুনে একটু যেন চমকে উঠেছিল মনে মনে। ঠিক তো সেই কথা। বর্ণগরবিনী! কালোর প্রেমে তোমাকে পড়তে হবে। একবার মনে হয়েছিল—সে হলেও হতে পারে। হ্যাঁ, সে-ই তো এই ডি-ভি-সির অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনীয়ার! চ্যাটার্জি। নৃত্যনাট্যকার, পরিচালক এবং দামোদর—দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি!

শেষ দৃশ্যে উপবীত ধারণ করে দ্বিজত্ব অর্জনের সময় দামোদর এসেছিল দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে। তখন আর চিনতে বাকা থাকে নি! এই তো।

সেই কারণেই সে নিজেই দেখা করেছিল তার সঙ্গে।

প্রথমেই বলেছিল—চিনতে পারেন?

দিব্যেন্দু বলেছিল—নিশ্চয়। আপনি তো আমার নৃত্যনাট্যের গঙ্গার মতই অবিস্মরণীয়া!

তারপরই সে বলেছিল—কিন্তু আপনি এখানে? কি করে এলেন?

হেসে সে বলেছিল—আমি পাঞ্চেতে এসেছি। মিশনারীদের জেনানা মিশনে ট্রেনিং নিতে। ট্রাইব্যাল ডেভলপমেণ্টের বৃত্তি পেয়েছি একটা। মাত্র পাঁচদিন এসেছি অবশ্য।

তারপর হয়েছিল তাদের ইঙ্গিতে বাক্যালাপ।

পাঞ্চেতে ফিরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হয় নি। ওই দিল্লী কনস্টিটুশেন হাউস এবং মাইথনের রঙ্গমঞ্চের নৃত্যনাট্যের বিচিত্র যোগাযোগের কথা মনে করে কৌতুক অনুভব করেছিল। অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ এবং ঈষৎ সলজ্জ কৌতুক। ভাল লেগেছিল। একসময় মনে হয়েছিল—বড্ড ভুল হয়ে গেল। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে হত। সেটা দামোদর যখন বিপুল তরঙ্গ নিয়ে সমুদ্র মোহনার কাছে গিয়ে গঙ্গার জলে আছাড় দিয়ে পড়ল, তখন সে উঠে এসে মুঠো বাঁধা হাত তুলে দেখিয়ে হুঙ্কার দিল না কেন—এই পেয়েছি শুভ্রবর্ণ গরবিনী, এই পেয়েছি তোমার কুমারী হৃদয়। বলে হাত মেলে ধরতেই দেখা যেত মুঠোর মধ্যে হৃদয় নয়—যা এসেছে সে কাদা আর বালি। সমুদ্রের মোহনায় গঙ্গার গর্ভ—তাতে বিপাশার গর্ভের মত তো নুড়ি নেই!

পরের দিন বিকেল বেলাতেই দিব্যেন্দু এসেছিল। সে অনুমান করেছিল—আসবে সে, ঠিক আসবে। তার ভুল হয় নি। সে বসেছিল—পাঞ্চেতের ড্যামের যে দিকে লেক হবার কথা সেই দিকে। ড্যামের কাজ তখনও চলছিল। একটা পাথরের উপর বসে সে ওই আধখানা তৈরী ড্যামের দিকে চেয়ে ভাবছিল গত রাত্রের নৃত্যনাট্যের কথা। উপবীতধারী দামোদর বরাকর খুদিয়া যমুনিয়া—এরা চলে যাবার পর এই ড্যামের ভামিগুলি না দেখালে ভাল হত যেন। ঠিক এই সময়েই একটা স্কুটারের ফট্‌ফট্ শব্দ শুনে ফিরে দেখেছিল—দিব্যেন্দু! সে হেসেছিল। আসবে

সে জানত। লোকটিকে ভাল লেগেছে। গুণী মানুষ। দামোদর ওর সাজা উচিত হয়নি! ও মুষলধারী নয়। কিন্তু না-দেখার বা না-গ্রাহ্য করার ভাণ করেই সে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল। এবং প্রত্যাশা যা করছিল, তাই ঘটেছিল অক্ষরে-অক্ষরে।

এক সময় শুনেছিল তার কণ্ঠস্বর—দূর থেকে দেখেই চিনেছি, আপনি।

—রঙ আর চুল দেখে?

—ঠিক তাই।

—কাজললতা কোথায় পাওয়া যায় এবং কাজল দীঘি কোথায় আছে বলুন তো?

ঠিক সামনের পাথরে তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে বলেছিল—অনুমতি না নিয়েই কিন্তু বসলাম সামনা-সামনি।

—বসুন। আপনি আসবেন আমি জানতাম। তাই ওটা সামনে রেখেই বসেছি—আপনার জন্য ওটা রেখে।

—আপনি জানতেন?

—জানতাম।

—আমারই ভুল। কালো আলোর পিছনে ছোটে, আর আলো কালোর পিছনে ছোটে। মনে মনে ডাকেও। এটা জগতের নিয়ম! সুতরাং—

যেন চমকে উঠে বিপাশা তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল।

—কেন, অন্যায় বললাম নাকি? দেখুন আপনার এমন স্ফটিকশুভ্র রূপ, পিছনে কালো ছায়া নিঃশব্দে পায়ের তলায় পড়ে আছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে, পূর্ব দিগন্ত থেকে অন্ধকার এগিয়ে আসছে। আসছে নয়—ছুটছে ওই আলোর উৎসের দিকে।

—হুঁ। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বিপাশা।

দিব্যেন্দু প্রশ্ন করেছিল—রাগ করলেন নাকি?

—না।

—তবে?

—আপনার মনখানিও প্রদীপের শিখার মত। স্ফটিকের প্রদীপে আলোর শিখা।

বাধা দিয়ে বিপাশা বলেছিল—এত কাব্য কেন করছেন। তার থেকে চার পয়সার একটা মোমবাতি বলুন না। মোম সাদাও বটে এবং আলোও জ্বলে।

—উঁহু। মোমবাতি বড় সোজা এবং অত্যন্ত নরম। আলোর দহনে নিজেই বেদনায় গলে। স্ফটিক শুভ্র এবং কঠিন। তা ছাড়া দাম ওর অত্যন্ত কম। আপনার মূল্য স্ফটিক থেকেও বেশী।

এবার সে হেসে ফেলেছিল। পরিতৃপ্ত প্রসন্ন হাসি।

দিব্যেন্দু বলেছিল—যা হোক এবার হাসলেন।

সে বলেছিল—আর না-হেসে উপায় আছে? এতেও যদি না হাসি—তবে দুনিয়ায় কাব্যই মিথ্যে হয়ে যাবে।

দিব্যেন্দু বলেছিল—এবার নিশ্চিন্ত হলাম। দিল্লীর ওই ঘটনাটার পর কতবার যে মনে হয়েছে

—বোধহয় অন্যায়টা আমার।

—উঁহু!

—কেন?

—তাহলে গঙ্গা-দামোদরের বিরোধটা শাদা-কালোর ঝগড়া দিয়ে ফোটাতে চাইতেন না। ওটা আপনার মনের মধ্যে সদাসর্বদাই ছিল—

—তা ছিল। কিন্তু বললাম তো, আলো ছোটে—কালো তার পিছনে ছোটে।

—হ্যাঁ। এবং কালো জানে না যে আলোও তার পিছনে ছুটছে।

—বলতাম। একবার বলেছি। কিন্তু যা তাকালেন আপনি!

—না। সে জন্যে তাকাই নি। এই কথাটিই আমাকে বলেছিলেন আর একজন। এবং আপনার সঙ্গে যেদিন দিল্লীতে ওই ঘটনা ঘটে—তার পরদিন। সকালেই গিয়েছিলাম আপনার কাছে ত্রুটি স্বীকার করতে। কারণ তলোয়ারকর এসে বিপাশায় আপনার সাঁতার কাটার এবং ডুব দিয়ে পাথর তোলার ছাপানো প্রমাণ নিয়ে যখন এলেন—তখন লজ্জা নিশ্চয় হল, খুব লজ্জা হল। আমার নিজের রূপ লজ্জা পেল। ছি! ছি! ছি!

—বুঝতে পারছি। ভাবলেন—ওই কালো সাঁওতালটা—

—এবার ঝগড়া হবে।

—বেশ, বেশ! বলব না। আপনি বলুন, সারা রাত্রি ভেবে—

—না। সেইদিন রাত্রেই তলোয়ারকরকে সঙ্গে করে গিয়েছিলাম আপনার ঘরে। আপনি তখন তালাবন্ধ করে বেরিয়ে গেছেন।

—সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। দেবকী বোসের 'কবি' হচ্ছিল। বইটা পড়া ছিল। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে?' গানটা মনে পড়েছিল।

আবার হেসে ফেলেছিল বিপাশা। বলেছিল—কালো বলে তো আপনার নিদারুণ কম্‌প্লেক্স!

দিব্যেন্দু বলেছিল—তাই তো কালো ছায়া হয়ে আলোর সামনে পায়ের তলায় পড়ে থাকে। আলোর পিছনে ছোটে!

—হ্যাঁ। ওই কথা সেই কথা। পরের দিন সকালেও গেলাম। শুনলাম আপনি দিল্লী ছেড়ে চলে গেছেন। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। সেদিন আমার এক পরম হিতৈষীজন আমার মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছে বেটি! তোমায় এমন করে ভাবতে তো দেখি নে? আমি সব বললাম। তিনি বলেছিলেন ওই কথা। মা, কালোর শুভ্রতার দিকে, আলোর দিকে, অনুরাগ তো প্রকৃতির আবেগ। কালো ছোটে আলোর পিছনে, আলো ছোটে কালোর পিছনে। সে তোমাকে বলে গেছে কালোকে তোমাকে ভালোবাসতে হবে—সেটা আর অভিশাপ কিসের? কালো মানুষ তো রাম, কালো মানুষ তো কৃষ্ণ! একটু হেসে বলেছিলেন—বেচারা হয়তো উত্তপ্ত মস্তিষ্কে মনের কথাটাই বলে গেছে। কিন্তু মানুষ তো রূপই খোঁজে না মা, তার সঙ্গে মনও খোঁজে। তাই বাংলাদেশে বাউলরা বলে—খুঁজি আমি মনের মানুষ। হোক না কালো—হোক না গোরা।

—বাঃ! দিব্যেন্দু তারিফ করে বলেছিল—সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক! বাঙালী নিশ্চয়—যখন বাংলা দেশের বাউলের কথা বলেছেন।

—হ্যাঁ। বাঙালী সন্ন্যাসী।

—তিনিও কালো?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আজ আপনার ওই কথা শুনে, ওই ভাবে তাকানোর আরও একটা কারণ ছিল। কাল আপনাকে দামোদরের মেক-আপে দেখে প্রথম তো আপনি বলে ধারণাই করতে পারি নি। কিন্তু চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল, কোথায় দেখেছি যেন। আজ হঠাৎ তাঁর কথা মনে পড়তে মনে হল—আদলটা তাঁর মত হয়েছিল।

কালো এবং সন্ন্যাসী—দাড়ি গোঁফ চুল আছে, রক্তাম্বর পরেন—

—না রক্তাম্বর পরেন না। সাদা বহির্বাস পাঞ্জাবী। অদ্ভুত মানুষ, পণ্ডিত, উদার। আমাকে যা রক্ষা করেছিলেন।

—কি হয়েছিল?

—পাকিস্তান থেকে সেই পার্টিশনের দাঙ্গার সময় এলাম কোনরকমে—এক সর্দারজী, তিনি দেবতা—তার সঙ্গে জম্মু, সেখান থেকে অমৃতসর। পিতৃমাতৃহীন বারো বছরের মেয়ে—

সবিস্ময়ে দিব্যেন্দু বলে উঠল—আপনি তো বাঙালী।

—মা পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাবা বাঙালী ব্রাহ্মণ, লাহোরের কালীবাড়ির পূজারীর ছেলে বাবা, বাঙ্গালী!

একটু চুপ করে থেকে সে বলেছিল—সে দিনগুলোর কথা মনে হলেই রবীন্দ্রনাথের গানের একটি লাইন মনে পড়ে। 'নিবিড় তিমির নিশীথিনী'। শুধু অন্ধকার, আলো কোথাও নেই। দিনে সূর্য উঠেছে, তবু অন্ধকার। রাত্রে চাঁদ-তারা থাকতেও নিরন্ধ্র অন্ধকার। আর গ্রাম-নগর-বসতিও কিছু নেই। সব অরণ্য, বন। মানুষের মুখে জন্তুর চেহারা। ওঃ! আজ সে সব পার হয়ে এসেছি বলেই বলতে পারছি। জয়ী হলেই হয় অ্যাডভেঞ্চার—না হলে মানুষ বলে—থাক সে সব কথা!

সেইদিন সেই অপরাহ্নে, গুনতিতে দিব্যেন্দুর সঙ্গে পরিচয়ের তৃতীয় দিনে, হ্যাঁ তৃতীয় দিন; প্রথম দিন কনস্টিট্যুশন হাউসে সন্ধ্যায়, দ্বিতীয় দিন গতকাল রাত্রে অভিনয়ের পর ওদের সাজঘরে, তার পরদিন তৃতীয় দিন ওই পাঞ্চেতে দামোদরের তটভূমে পাথরের উপর বসে জীবনের কথা বলাবলির মধ্যেই তারা পরস্পরের কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল।

জীবনে দুঃখের কথা ব'লে ভিক্ষুকে করুণা লাভ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখকে জয় ক'রে যে বিজয়িনী কি বিজয়ী, সে—সে কাহিনী বলে যায় আনন্দের সঙ্গে। বোধ করি এই আনন্দ মানুষকে একটু মুখর করে তোলে, অন্তত সব কথা বলার একটা ব্যগ্রতা তাকে আপনা থেকে বলায়। তাই তার জীবনের দুঃখ জয় এবং দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী বলতে শুরু ক'রে বলেই গিয়েছিল। একবারও প্রশ্ন জাগে নি কি মনে করছে শ্রোতা!

অবশ্য দিব্যেন্দু মনে কিছুই করে নি। আজ দিব্যেন্দুর বিচিত্র অন্তর্ধানে সংশয় অনেক জাগছে,

তবু মনে হচ্ছে—না—না, সে প্রতারক নয়। কোন বিপদ, কোন কিছু এমন হয়েছে যার জন্যে হয়তো—!

চোখ তার জলে ভরে এল। ঝাপসা হয়ে গেছে পার্কের ইলেকট্রিক আলোর সারি। ওঃ! দিব্যেন্দু! দিব্যেন্দু সেদিন তার কাছে বসেছিল তানপুরা নিয়ে সঙ্গতকারের মত—সে গেয়েছিল তার দুঃখ-জয়ের জীবন-সঙ্গীত। তার তানপুরাতে তান উঠেছিল সমবেদনার খাদের গভীর 'সা'-এর সুর তুলে। সে বলে যাচ্ছিল। দিব্যেন্দু শুনছিল। মধ্যে মধ্যে নিম্ন-গভীর স্বরে বলেছিল—হে ঈশ্বর! অথবা—ওঃ! অথবা—মাই গড্!

মায়ের কথা সে যখন বলেছিল—মা বলেছিলেন—মরণা নেহি হ্যায় বেটি। মরণা হ্যায় তো লড়না হ্যায়। মরণাকে আগে মারনা হ্যায়।

সে বলেছিল—অদ্ভুত!

বাবার মৃত্যুর কথা শুনে বলেছিল—ওঃ, মানুষ কি হিংস্র!

সর্দারজীর কথা শুনে বলেছিল—আ! —আচ্ছা—!

সর্দারজীর কথা—জীবনকে ধরম হ্যায় জিন্দিগী! জিন্দিগী হ্যায় সাচ্চা। লেকিন আনন্দমে জিন্দিগী জিন্দাবাদ! নইলে আজও পর্যন্ত দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ—জিতা রহো। আনন্দ রহো কেন?

সে বলেছিল—বাঃ বাঃ! এই তো!

সে তন্ময় হয়ে বলেই চলেছিল—মনে হয়েছিল দিব্যেন্দুকে আপনার জন।

* * *

সে বলেই চলেছিল—ক্রীশ্চান মিশনারী সাহেব এই রং আর চুলের জন্যেই বোধহয় ধরেই নিলেন আমার রক্তের মধ্যে আছে ক্রীশ্চিয়ানিটির বীজ; হিন্দু সমাজের মধ্যে যে রক্ত এবং জীবনবীজ বন্দী হয়ে থেকে বহু গ্লানি বহু নির্যাতন সহ্য করেছে—হয়তো বা অধোগতির পথে প্রায় অন্ধকারে ডুবতে চলেছে তাকে মুক্ত করতেই হবে। বাইবেল ইস্কুলে পড়তে হত। সেইজন্য কিছু কিছু জানতাম। তাই আমাকে ক্রীশ্চান করবার আয়োজন করতে লাগলেন।

আমি বিপদে পড়লাম। বারো বছর বয়স হয়েছে। ধর্মের জন্য দুঃখ সয়েছি। বাপ হারিয়েছি। মা আমার মনে পাকা ভিত গেঁথে গেছলেন—তার উপর স্ট্রাকচার উঠতে শুরু করেছে। আমার মনে হল—এ ভয়ানক বিপদ। আমি কাঁদতাম।—ম্যায় হিন্দু হুঁ। ক্রীশ্চান ন বনেগী! নেহি। নো-নো-নো! ওঁরা বুঝিয়ে যান। বিরাম নেই। দিন-রাত্রি। আজকাল ব্রেনওয়াশিং বলে একটা কথা উঠেছে। জানি নে সেটা কতদূর কি সত্যি। কিন্তু কথাটা শুনে মনে হয়—তাকেও বলা যায় ব্রেনওয়াশিং। সে যে আমার কি আত্মার যন্ত্রণা! মাকে রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি, কাঁদি। তবে এটা বলব, হ্যাঁ, ওরা জবরদস্তি কিছু করে না। কিন্তু খেতে দিয়ে পরতে দিয়ে আশ্রয় দিয়ে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে ওরা অনুরোধ করে—আমি রাখতে পারিনে, সে কি যন্ত্রণা বলুন তো! এই সময়! বুঝলেন—কি ভাবে কার কাছে সংবাদ পেয়ে এই সন্ন্যাসী এলেন। একটি হিন্দু কন্যা—সে ক্রীশ্চান হতে চায় না শুনলাম। তাকে আপনারা ক্রীশ্চান করবেন কেন? আমার হাতে তাকে দিন। আমি তার ভার নেব!

মিশনের ফাদার বললেন—সে হয় না। অসম্ভব! আপনি কে? পরিচয় কি? এ দেশের লোক এ দেশের মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে বিক্রী করে—এদেশের লোকেই কেনে। আপনাকে বিশ্বাস করব কি করে?

তিনি বললেন—নিশ্চয় বলতে পারেন এ কথা। কিন্তু এ ধরনের বিপ্লবাত্মক দুর্যোগের মধ্যে পশুরা সুযোগ পায়। সব দেশেই পায়, কম আর বেশী। আপনাদের দেশের কথাও জানি, পড়েছি।

সে সব অনুরোধ বা কথা ওরা শুনবে কেন? শুনলে না। বললে—আপনাকে চলে যেতে বলছি আমি।

চলে গেলেন, কিন্তু পরের দিন আবার এলেন। সঙ্গে দিল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বাঙালী। পদস্থ লোক। তারা স্বামীজীকে চেনেন। হিন্দু অনাথদের জন্যে একটি আশ্রম করেছেন—ইস্কুল আছে। চলে সরকারী সাহায্যে। তিনি প্রতিষ্ঠাতা। আরও কয়েক জায়গায় আছে। তিনি যখন ক্রীশ্চান হ'তে অনিচ্ছুক এই হিন্দু মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন তখন ফাদারকে তাঁরা বললেন—ওঁরই হাতে তাকে দিতে। তাঁদের দেওয়া উচিত। না দিলে—। সরকারী কর্মচারী হিসেবেই তাঁরা বলছেন।

তখন কাজ হয়েছিল। উদ্ধার পেয়ে এসেছিলাম—তাঁর আশ্রমে। তিন বছর ছিলাম। ওখানেই বাংলা শিখেছিলাম। ছোট আশ্রম। একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির। অল্প কয়েকটি মেয়ে, সবগুলি অনাথা—কারুর চোখ নেই, কেউ খঞ্জ, এমনি। গুটি দুই যুবতীও ছিলেন। দুজনই স্বামী-পরিত্যক্তা। তাঁরাই কাজ-কর্ম করতেন। পাশে একটি ইস্কুল ছিল। বাঙালীর ছেলে-মেয়েরা পড়ত সেখানে; বাংলাভাষায় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তিন বছর ওখানে পড়ে ভর্তি হয়েছিলাম মেয়েদের ইস্কুলে! রেফেউজী ছাত্রী হিসেবে বৃত্তি পেতাম। উনি বললেন—এবার বোর্ডিংয়ে যাও তুমি। এ আশ্রমে অনাথাদের আশ্রয় মেলে। কিন্তু তোমাকে সক্ষম হয়ে ক'রে খেতে হবে, দাঁড়াতে হবে। এ জায়গায় তেমন মন তৈরী হবে না। আশ্চর্য উদাসীন মানুষ, দিনরাতই কি ভাবেন। রাধাকৃষ্ণে খুব ভক্তি। বলতেন—এই তো প্রেম। এই প্রেমেই তো ভগবান বাঁধা পড়েন। ইংরেজরা বলে, লাভ ইজ গড্—আমরা বলি গড্ লিভস্ ইন লাভ। প্রেমে তাঁর বসতি। ওঃ, কি প্রেম বল তো! কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্ক, তাই কলঙ্ক মাথায় করে রাধা ধন্য। চোখ দিয়ে জল পড়ত।

দিব্যেন্দু বলেছিল—আশ্চর্য! ওয়াণ্ডারফুল!

—আর কি জানেন? গোঁড়ামি, অন্য ধর্মের নিন্দা তিনি কখনও করতেন না। কখনও না। একবার তখন আমি ইস্কুল শেষ ক'রে কলেজে ঢুকেছি। ওঁদেরই কলেজে। ওঁরই পরামর্শে। উনি নিজে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বোর্ডিং আলাদা বলেছিলেন—ওকে আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কারণে। সে কারণ আর নেই। *মানে বড় হয়েছে, এখন বোধ হয়েছে। এখন বুঝে যদি ক্রীশ্চিয়ানিটি ভাল লাগে—হবে। আমি নিশ্চয় বাধা দেব না।* তবে আপনাদের কাছে লেখাপড়া শিখবে এটা আমার নিশ্চিত ধারণা এবং নিরাপদে থাকবে। তারপর আবার সেই অনুরোধ। কত উপদেশ। ভাল লাগত না। ওঁকে বলেছিলাম। কেন ওরা এমন করে বলুন তো? কেন ওরা ভাবে আমরা অন্ধকারে রয়েছি। উনি বলেছিলেন—মা, অনেকে অনেক ব্যাখ্যা করেন।

তার মধ্যে অনেক গূঢ় আবিষ্কার আছে। সেগুলো মন্দ, কুটিল। কিন্তু আমি জানি মা, একটা দিকের কথা অবশ্য, সেটা ওদের খুব আন্তরিক। মানুষকে নিজের ধর্মে এনে নিজের মতই উন্নত করতে চায়। তার কারণ কি জান? আমাদের অনেক তত্ত্ব ওরা বুঝতে পারে না। ধর, রাধাকৃষ্ণের প্রেম, ওরা বুঝতেই পারে না। ধর, আমরা বা আমার বাড়িতে এলেন একজন যুবা, আলাপ হল—তুমি আমার কন্যা, বাড়িতে আছ—সে এসে যে মুহূর্তে জানলে বা বুঝলে তোমার সঙ্গে তার বিবাহে সামাজিক বাধা আছে—তখনই সে তোমাকে বললে দিদি বা বোন। আমরা মা সম্পর্ক পাতাই, বোন দিদি সম্পর্ক পাতাই। ওরা তা করে না, কারণ প্রেম বিবাহ এ সব বিষয়ে ওদের সমাজের বাঁধন বল, পথ বল, অনেক শিথিল, অথবা প্রশস্ত।

একটু চুপ করে থেকে সে বলেছিল—ক'টা বাজল বলুন তো?

দিব্যেন্দু ঘাড় নেড়ে বলেছিল—বেশী না; সাড়ে সাতটা।

হেসে উঠেছিল বিপাশা—মোটে! অথচ গোটা জীবনের গল্পটাই বলা হয়ে গেল!

—ওই তো মানুষের আর্ট। বাস্তব পৃথিবীতে যা এক হাজার বছরে ঘটে—মানুষ সেটা ছেঁকে নিয়ে, চেঁছে-ছুলে পালিশ করে এক হাজার লাইনে—কি একশো লাইনে বলে দেয়। অথচ শেখাতে হয় না—মন আপনি যা মনে রাখবার মনে রাখে, বাকীটা ফেলে দেয়।

—দামোদরের উৎপত্তি থেকে এ পর্যন্ত ক'হাজার বছর? দেড় ঘণ্টায় শেষ করলেন কাল—

—তা হিসেব করি নি। ওখানে হিসেবের চেয়ে ফরমাস বড়। দেড় ঘণ্টাই বেশী হয়েছে। কর্তারা বলছিলেন।

—শেষটায় ড্যামের ডামিগুলোও ফরমাস?

—নিশ্চয়। না হলে খরচ-খরচা দেবে কেন ডি-ভি-সি?

হঠাৎ গত রাত্রের কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কাল রাত্রে একটা কথা ভেবেছিলাম, ঠিক করে রেখেছিলাম দেখা হলে বলব!

—বলুন।

—সাজেশন আমার।

—বলুন, বলুন। বিনয় করছেন বেশী। কিন্তু আপনাকে ওটা সাজে না।

—কেন সাদা রঙ বলে?

—আমার মানতে আপত্তি নেই। বলুন।

—ওই দামোদরের আর গঙ্গার যেখানে সত্য বিরোধ, ওই মোহনার জায়গায়—ওইখানে—।

—হ্যাঁ, বলুন।

—চলুন, উঠুন—বলতে বলতে যাই। রাত্রি হয়ে গেছে। আটটা হলেই মাদার খোঁজ করবে। ওদিকে নতুন ঝি—সে বসে থাকবে। ভাববে হয়তো। সে তো জানে না আমি পাকিস্তান পার হয়ে এসেছি দাঙ্গার সময়। চলুন।

চলতে চলতে বলেছিল—মানে, নাচটা ভাল হয়েছে। এরা সদলবলে তরঙ্গ নিয়ে গঙ্গার উপর আছড়ে পড়েছে, গঙ্গা ঠিক আপনার গতিতে নেচে চলেছে, হাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে আর এরা সরে

আসছে—বেশ হয়েছে। তবে—বলব? অন্ধকারে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু দেখতে পায় নি। দিব্যেন্দুও ওর ঠোঁটের চাপা হাসি দেখতে পায় নি। তবুও বলেছিল—এত যখন ভনিতা করছেন—তখন কথাটি নিশ্চয় ঝাঁঝালো।

—না। তা নয়। একটু ওখানে গম্ভীরভাবে হাস্যরস আনতে পারতেন। লোকে একটু উপভোগ করত।

—যথা?

—ধরুন, একসময় দামোদর খুব পাঁয়তারা কষে ঝাঁপ দিত, বলত—এইবার ঝাঁপ দিনু জলে—পণ মোর—। সেই কবিতার লাইন বসিয়ে দিতে পারতেন। বলে ঝাঁপ দিয়ে উঠে আসত ডান হাতখানা মুঠো করে তুলে। এবং সদম্ভে বলতে পারত—এই আনিয়াছি ওরে শুভ্রবরণী কন্যা, তোর কুমারী-হৃদয়খানি তুলে—এই বাহুবলে। বলে হাতখানি খুলত আর তা থেকে ঝরে পড়ত কালো কিষ্টনি কাদা—কারণ, মোহনার মুখে তো নুড়ি পাওয়া যায় না। সবই পলি আর কাদা। তারপর নিজেই বলত—এ কি? খুদিয়া বলতে পারে—হায় কালো মরদ ও শুধুই কাদা।

হো-হো করে হেসে দিব্যেন্দু বলেছিল—ওয়াণ্ডারফুল, ভাল বলেছেন। কিন্তু তা ছুঁড়ে মেরে তো দামোদরের কপাল ফাটানো যায় না।

—অন্তত মুখে কাদা মাখানো যায়!

আবার সে হেসে উঠেছিল। প্রাণখোলা হাসি। মোটা ভরাট গলার উচ্চ হাসি দামোদরের তটপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তখন স্কুটারটা সামনে। সেটাকে তুলে নেওয়া পর্যন্ত সে ভদ্রতার খাতিরে অপেক্ষা করেছিল। স্কুটারটা ঠেলে রাস্তায় এনে স্টার্ট দেওয়ার আগে দিব্যেন্দু বলেছিল—এবার একটা কথা বলি। রাগ করবেন না। রাগ করলে অবশ্য স্কুটারে চড়ে ছুটে পালাব, নাগাল পাবেন না।

—বলুন। আমি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি।

—বলছি, বিপাশা নদীর স্রোত ক্ষুরধার। কৌশলের বর্ম পরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে সেখানে নুড়ি তোলা যায়। কিন্তু সে যেখানে মানবী সেখানে তাঁর হৃদয়ের গভীরতা অতলস্পর্শী। সেখানে আছে একটি মণি বা মাণিক্য, হীরক-দীপ্তি বা প্রবাল-লাবণ্য তাতে। সে যে তুলে আনবে সে ভাগ্যবান। পালালাম। কাল আসব। বলতে বলতে স্কুটারটা স্টার্ট নিয়েছিল।

অর্ধসমাপ্ত ড্যামটার মুখ পর্যন্ত যে রাস্তাটা এসে থেমে গিয়েছিল তখন—ওই রাস্তা থেকেই সে এসেছিল কলোনির দিকে আর দিব্যেন্দু গিয়েছিল মাইথন। ওই রাস্তা থেকে সবে সেও কলোনির রাস্তায় নেমেছে—অমনি ওর স্কুটারটা ফটফট করে উঠেছিল। সে বারেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। কেন ঠিক বলতে পারবে না। দিব্যেন্দুকে সেদিন ভাল লেগেছিল এটা নিশ্চিত—কিন্তু সেটা অনুরাগের কিছু নয়। কনস্টিট্যুশন হাউস থেকে—এখানে এই আজ পর্যন্ত লোকটির চরিত্রের একটি একমুখী গতি এবং গতিটা ঝড়ো বাতাসের মত—ভাল লেগেছিল। স্কুটারটা আওয়াজ দিতেই মনে হয়েছিল চকিতে—বাহনটিও ভদ্রলোক চমৎকার বেছে নিয়েছেন। দেখতে দেখতে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছিল বাহন এবং সওয়ার। 'হেঁইয়ো মারি জোয়ান' বা 'চলো-চলো

দিল্লী চলো' গোছের একটা বেপরোয়া অথবা বুনো ঘোড়ার মত মানুষ। তার সঙ্গে রসবোধ আছে—তাই রক্ষা, না হলে লোকটি গোঁয়ার হত। বেশ কৌতুক বোধ আছে। যাক, দিল্লীর অপরাধটা, না—অপরাধ নয় ত্রুটি, ত্রুটিটা তার আজ বেশ মিষ্টি ভাবেই মিটে গেল।

পথে আবারও একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল।

লোকটি একটু বেশী এগিয়ে আসে না? যেমন—ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে তারপর একমুখ হেসে বলে—আসতে পারি? এবং তারও উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে বলে—নমস্কার! হাত দুটো কপালেও ঠেকায় না—একখানা চেয়ারের হাতল ধরে টানে। আজ অন্তত তাই করেছে সে!

হুঁ। নিজে সে উত্তর নিয়েছিল। এবং মনে মনে আপশোষ করেছিল—তার তরুণ জীবনে দিল্লীর রাজপথে প্রেম-পাগল বা বিলাসীদের সঙ্গে যে-সব ঘটনা ঘটেছে—তার দু তিনটে গল্প শুনিয়ে দিলে হত। যাক—কালও ও আসবে। তখন শুনিয়ে দেবে।

পাঁচ

পরের দিনটা ছিল রবিবার। কোয়ার্টারে সে বসেই ছিল; পড়ছিল; হঠাৎ বেলা দশটা নাগাদ একখানা জীপ এসে দাঁড়িয়েছিল তার দরজায়। জানলার পর্দাটা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখেছিল—দিব্যেন্দু নামছে! সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক। হ্যাঁ। বোধ হয় মাইথনের কর্তাব্যক্তি। সেদিন অভিনয়ের আসরে প্রথম সারিতে বসেছিলেন।

পরমুহূর্তেই দরজায় কড়ার শব্দ উঠেছিল। বিরক্ত সে হয়েছিল কিন্তু দরজা খুলে না-দিয়ে পারেনি।

দিব্যেন্দুই নমস্কার করে বলেছিল—নমস্কার মিস্ ভট্টাচারিয়া। ইনি আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। একটু বিরক্ত করতে এসেছি আপনাকে।

কথা ইংরিজিতে শুরু করেছিল। এবং তার মধ্যে অফিসের কেতাদুরস্ত ভাবও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ভদ্রলোক বলেছিলেন—গুড মর্নিং, মে উই কাম ইন?

এতক্ষণে সে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলেছিল—গুড মর্নিং, আসুন। বসুন।

—আপনি বসুন।

দিব্যেন্দু বলেছিল—আমার বস্ আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন। ওই ড্যান্স ড্রামা সম্বন্ধে।

—আমাকে? কি কথা?

ভদ্রলোকটি বলেছিলেন—কেমন লেগেছে আপনার?

—এত লোক থাকতে আমার মত জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

—দরকার আছে। আপত্তি না থাকলে অবশ্য বলতে বলছি।

আমার বেশ ভাল লেগেছে। তাই বা কেন—চমৎকার হয়েছে। অবশ্য মাইনাস ওই ড্যামের ডামিগুলি শেষকালে দেখিয়ে—সুন্দর জিনিসটি যথেষ্ট।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন—আর একটু ডেলিকেট প্রশ্ন করতে পারি? মানে—।

—বলুন?

—অর্থাৎ এতে এমন কিছু ছিল যাতে আপনি আহত হতে পারেন বা হয়েছেন? সবিস্ময়ে সে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। মনও সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এ কি প্রশ্ন? কিন্তু বুঝতে পারলে না কি উত্তর দেবে?

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—মিস ভট্টাচারিয়া, বলুন, উনি কি কাল আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন এ জন্যে?

সে দৃঢ়স্বরে বলেছিল—না। ড্যান্স-ড্রামা দেখে আমার আহত হবার কোন কারণ ঘটেনি। উনি আমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসেন নি। বরং আমারই নিজের—

এবার দিব্যেন্দু বলেছিল—না মিস্ ভট্টাচারিয়া, আপনার আমার মধ্যে যদি আমার কোন ত্রুটি থাকে, কোন অন্যায় থাকে, তা আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন—কিন্তু আপনার ত্রুটি এক্ষেত্রে উল্লেখের কথা নয় এবং তা নিশ্চয়ই উনি জানতে চাচ্ছেন না।

সে বলেছিল—তাই কি ঠিক? প্রশ্ন করেছিল অফিসারকে।

তিনি এবার একটু হেসে বলেছিলেন—হাঁ, তাই ঠিক। তাতে আপনাদের পুরোনো কথা জানাতে হবে। এবং আপনার কি অন্যায় সেটা জানতে চাওয়া বা জানা আমার অধিকারের বাইরে।

বলেই তিনি বলেছিলেন—আমি আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে খুব দুঃখিত। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জিকে আমি স্নেহ করি, সুতরাং তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ হলে আমাকে সতর্ক হয়ে কঠোরভাবে তদন্ত করতে হয়। এবং আপনার প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান সেও একটা কারণ। যাই হোক —আমি উঠি। মার্জনা করবেন আমাকে।

—কিন্তু, কিন্তু কি ব্যাপার আমি জানতে পারি না?

—ওই ড্যান্স-ড্রামায় মিঃ চ্যাটার্জি আপনাকে ইঙ্গিতে অপমান করেছেন—আপনি আহত হয়েছেন মনে মনে। প্রতিবাদ করেছেন। দরখাস্ত করেছেন। চ্যাটার্জি ক্ষমা চেয়েছেন ইত্যাদি। আচ্ছা—। নমস্কার।

—নমস্কার। মুখে বলেও হাত তুলতে ভুলে গিয়েছিল সে।

সংসারে মানুষগুলো কি? এত কদর্য কেন?

—নমস্কার। আমিও যাই। দিব্যেন্দু বলেছিল।

—একটু থেকে যেতে পারেন না?

দিব্যেন্দু অফিসারকে বলেছিল—স্যার, আমি একটু থেকে যাই, আপনি যদি অনুমতি দেন।

—ওঃ—সার্টেনলি! উইশ ইউ গুড টাইম।

—কি হয়েছিল বলুন তো?

—বলছি। আগে—চা খাওয়াতে অসুবিধে হবে? রাগ হলে আবার আমার গলা শুকিয়ে যায়।

—ঠাণ্ডা জল খান না তার থেকে।

—অগত্যা, অবশ্য। দিন, তাই দিন। দুধের স্বাদ ঘোলে, চায়ের তেষ্টা জলে! দিন।

এবার হেসে ফেলেছিল বিপাশা। বলেছিল—চা দেব না বলি নি। বলতে চেয়েছিলাম, ততক্ষণ জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোন। চুড়কি, দু-কাপ চা করো। জলদি!

বলে ও ঘরে গিয়ে ফল এনে নামিয়ে দিয়েছিল। দিব্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বাদাম কয়েকটা তুলে নিয়ে বলেছিল—বাঃ! বাদাম ভারী চমৎকার জিনিস!

—বলুন তো মিঃ চ্যাটার্জি, কি হয়েছিল?

—কি আবার? শুনলেন তো সবই। গত কাল রাত্রে, মানে বিকেলবেলা এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করেছি—খবরটি সঙ্গে সঙ্গে মাইথন পৌঁছেচে। পরশু রাত্রে গ্রীনরুমে আমার সঙ্গে আপনি দেখা করলেন—কয়েকটা কথা আমাদের হল বক্রভাবে বঙ্কিমপন্থায়, সেই সূত্রপাত। তার উপর আপনার মত শুভ্রাঙ্গিনী, স্বর্ণাভ কেশিনী! ব্যাস, আর যায় কোথায়? ওরা সবাই হয়ে গেল খুদিয়ার মত। মনে মনে রাগ, মুখে বলল—হায় কৃষ্ণাঙ্গ বীর! অনেক কল্পনা এবং কাল বিকেলে যখন এলাম তখন আর ওদের সইল না এবং অনুমানেও বাধল না যে নৃত্যনাট্যে আপনি চটেছেন। আপনাকে অপমান করা হয়েছে। নিশ্চয় আপনি দরখাস্ত করেছেন। সুতরাং তারা বেনামী পত্র লিখে আপিসের ডাক বাক্সে রাত্রে রেখে এসেছে। সকালে বস্ সেই পত্র পেয়ে আমাকে তলব। তখন আমি বললাম—বেশ তো, ওঁকে ডাকুন, ডেকে সোজা জিজ্ঞাসা করুন। বললেন অবশ্য—না, তুমি বল। আমি বললাম—না স্যার, এটা আমার নামে অপবাদ। এটারও তদন্ত আপনাকে ওঁর কাছ থেকেই করতে হবে। উনি বললেন—তা হলে পর্বতকে মহম্মদের কাছে যেতে হবে। চলুন। তিনি যদি বলেন, আমি মাপ তো চাইবই, চাকরি ছেড়েও চলে যাব।

চুড়কি চা এনে নামিয়ে দিল।

—বিস্কুট খেলেন না?

—না। মেওয়া খেলাম। আপনি বোধ হয় ছেলেবেলা থেকেই খান!

—হ্যাঁ।

—তাই।

—তাইটা কি?

—মেওয়া খেলে রঙ ফরসা হয়। মেওয়ার রক্ত! ব্লু ব্লাড বলে না? ওটা মিল্ক ব্লাড! জানেন, ছেলেবেলা বেনারসে রোজ গঙ্গা স্নান করতাম এবং অন্তত আধঘণ্টা ধরে গঙ্গার পলি মাটি মাখতাম। কেন? না—রঙ ফরসা হবে। তারপর অন্তত আবার আধঘণ্টা সাঁতার।

উঠে গিয়েছিল বিপাশা। ও ঘর থেকে আরও কিছু মেওয়া নিয়ে ফিরে এসে বলেছিল—তারপর?

—সে আর কি শুনবেন! যত আনইণ্টারেস্টিং জীবন-কথা!

* *

—বাঃ বাঃ বাঃ! কাল আমার কথা তো সব শুনে নিয়েছেন! বেশ তো লোক!

হেসে দিব্যেন্দু বলেছিল—শহুরে চোর আর গেঁয়ো চোরের গল্প জানেন?

—সেটা কি?

মানে দুই চোর অ্যাবস্কণ্ডার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় একটা গাছতলায় মিলেছিল। এবং হাব-ভাবে আকারে-ইঙ্গিতে রকমে-সকমে নিজেদের এক গোত্রের লোক বলে চিনে কথাবার্তা শুরু করেছিল। এখন দুজনের কাছেই কিছু কিছু খাদ্য অথচ তাতে পুরো পেট কারুর ভরবে না। এর কাছে চিঁড়ে ওর কাছে দই, এর কাছে কলা ওর কাছে গুড়, এমনি আর কি। তখন দুজনে খাদ্য এক জায়গায় মিশিয়ে খেতে বসল। এখন শহুরে চোর বললে—খেতে খেতে গল্প কর ভাই। বল, তোমার কথা বল। কে কে আছে বাড়িতে! বলতেই গেঁয়ো চোর বলতে শুরু করল—বাপ, মা, ভাই বোন স্ত্রী পুত্র, না-ছিল কি? আজ আর কেউ নেই। শহুরে বললে—আহা! কি হল? গেঁয়ো বিগলিত হয়ে বললে—বাপ প্রথম গেল। হল টাইফয়েড। বাস্ বর্ণনা চলল। শেষ যখন শেষজনের মৃত্যু বর্ণনা শেষ করলে—তখন দেখে গল্প বলতে গিয়ে সে হাত গুটিয়ে বসে আছে। আর শহুরে ইতিমধ্যে দুজনের খাদ্য একাই শেষ করে এনেছে। তখন চাতুরী বুঝে সে বললে—এবার তোমার কথা বলো ভাই। শহুরে বললে, নিশ্চয়। আমার ভাই মা বাপ ছেলেবেলায় মরেছে, মনেই নেই। তারপর বিয়ে করলাম। গেঁয়ো বললে—হুঁ। তার পর? শহুরে বললে—তারপর আর কি, অসুখ করল। গেঁয়ো বললে—কি অসুখ? শহুরে বললে—জ্বর হয়ে ফুলল। গেঁয়ো বললে—ফুলল? শহুরে বললে—হুঁ। গেঁয়ো বললে—তারপর? শহুরে বললে—তারপর আর কি, ফুলল—আর মরল। বাস্। বলতেই অবাক হয়ে গেল গেঁয়ো। শহুরে ইতিমধ্যে বাকী খাদ্যটুকু খেয়েদেয়ে উঠে ঢেঁকুর তুলে বললে—চল, ঘাটে জল খেয়ে একটা বিড়ি খাই। আছে নাকি?

হেসে ফেললে বিপাশা—তার মানে, আপনি শহুরে আমি গেঁয়ো।

—হে ভগবান! গুড স্বর্গ! মানে গুড হেভেন্স্! তাই বলতে পারি? আপনি আসছেন রাজধানী থেকে। যে দিল্লী দূর অস্ত, যে দিল্লীর দেওয়ানী খাসে নাকি লেখা আছে হামিনস্ত এই স্বর্গ, সেই দিল্লী থেকে। তবে বলছি—আমার জীবন ঐ শহুরে জীবনের মতই সংক্ষিপ্ত!

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সে। বলেছিল—তবে এক জায়গায় আপনার সঙ্গে আমার একটা মিল আছে। আপনিও বাল্যে পিতৃমাতৃহীন, আমিও তাই। বাবা এক বছরে, মা—পাঁচ বছরে। আপনার তবু তাঁদের মনে আছে। আমার কোন স্মৃতিই নেই। মা-বাবার স্মৃতি বড় পবিত্র। বড় পবিত্র এবং আশ্চর্যের কথা—।

তার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ এমন গাঢ় এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল যে অকস্মাৎ শরতের দুপুরে ঘনকৃষ্ণ মেঘ এসে সব ছায়াচ্ছন্নই করে দেয় নি—ঝিমি ঝিমি বর্ষণে সে বিষণ্ণতাকে সজল করেও তুলেছিল। দিব্যেন্দু যে এমন বিষণ্ণ বেদনাচ্ছন্ন হতে পারে সে তা কল্পনাও করতে পারে নি।

হঠাৎ সে থেমে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—জানেন আমার কতবড় দুঃখ? এই যুগ—এই যুগে বাবা ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, বিলেত গিছলেন, মা আমার ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন,

মাতামহ ছিলেন ছোটখাটো হলেও গভর্নমেন্টের গেজেটেড অফিসার—অথচ মা-বাবার মধ্যে কারুর ফটো নেই!

চোখ তার জলে ভরে উঠেছিল।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিপাশা। মনে হয়েছিল জলের মধ্যেও নাকি আগুন থাকে। তার নাম বাড়বানল। যে জল বাতাসের মধ্যে থাকে তা পাহাড়ের মাথায় শীতের রাত্রে অকস্মাৎ একদিন তুষারের ফুল হয়ে ঝরে। তার মধ্যেও কি আগুন থাকে?

টপ-টপ করে চোখের জল ঝরতেই দিব্যেন্দু রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে বলেছিল—প্রথম প্রথম দাদামশায় দিদিমা উত্তর দিতেন না। আমার দিদিমা। ওঃ, সে এক খাণ্ডারনী ছিলেন বটে, আমার মায়ের অধিক—আমাকে সেই বুড়ীই মানুষ করেছিলেন—কিন্তু খাণ্ডারনী বটে! ওঃ, সে গালাগাল যা দিতেন না—সে একেবারে গঙ্গাস্তবের মত 'বন্দীমাতা সুরধুনি, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী'—গোছের মিলিয়ে মিলিয়ে। লক্ষ্য তার কন্যা, জামাতা, পুত্রদ্বয়, কিন্তু তাঁদের তো পেতেন না—সুতরাং উপলক্ষ্য নিয়েই তা দিয়েই কর্ম সমাধা করতেন। লক্ষ্য তাঁদের পুত্র কন্যা জামাতা, 'আমি' ছিলাম উপলক্ষ্য এবং পুত্র পুত্রবধূ হলে তাদের পিতা ও শ্বশুর তাঁর নিজের স্বামী ছিলেন উপলক্ষ্য। আমাকে বলতেন—

'আবাগীর বেটা, ওরে পাষণ্ডের পুত,
আমাকে অশান্তিনলে জ্বালাইলি প্রতিফলে,
অনন্ত অনন্ত কাল হয়ে থাক ভূত!'

হেসে বলেছিল—ওগুলো অবশ্য ছন্দে গেঁথে নিয়েছিলাম আমি। ভুলে গেছি সব এখন। ওই দিদিমা আমার মা এবং বাবার ছবি বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাও গঙ্গায় নয়, উনোনের আগুনে। বুঝেছেন। বাবা বিলেতে মারা গেলেন—খবর আসতেই মায়ের মাথা খারাপ হয়। তিনি বিধবা সাজবেন না। তিনি মন্দিরে গিয়ে আবিষ্কার করলেন—ঠাকুর তার স্বামী। আমাকে ফেলে দিলেন মাটিতে। এবং শেষে আমায় পাঁচ বছরের রেখে তিনিও গেলেন। শুনেছি আত্মহত্যা করেছিলেন। কথাটা কিছুতেই বলেন নি। দাদামশায়ের সঙ্গে তীর্থে গিয়েছিলেন, সেই তীর্থে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেইজন্যে দিদিমা মাকে যে গালাগালি দিতেন—আবাগী, অর্থাৎ অভাগী, দগ্ধকপালি, পিণ্ডিখাগী ছাইখাগী বলে—সেগুলো আমার বেশ ভালই লাগত।

আজও দিদিমাকে মনে পড়লে বলি—

খাণ্ডারনী রূপিণী তুমি দিদিমা লোলরসনা,
তোমার তুলনা নাস্তি ডেপুটি স্বামীশাসনা—
কন্যা জামাতা তব পাপেতে প্রেতা প্রেতিনী,
পুত্র পুত্রবধূ তব ভয়েতে দূরবাসিনী।
তবুও তুলনা নাস্তি—দিব্যেন্দু জীবন-পালিকা—
এ স্তব আমার দেবী অম্লান ভক্তি-মালিকা।

সত্যিই তার তুলনা নেই! শী ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল। ওঃ, দাদামশায়কে যখন তেড়ে যেতেন

এবং মুখের কাছে মুঠি বাঁধা হাত নেড়ে বলতেন—কানা, যবনের এঁটোখেগো, গেলাম, সব অনর্থের মূল তুই।

দাদামশায় ভয় পেয়ে বলতেন—চোখের কাছে এমন করে হাত নেড়ো না, চশমাটা ঠিকরে পড়ে গেলে ভেঙে যাবে। এ লেন্সের দাম অনেক, এখানে পাওয়া যাবে না।

ওটাই ছিল দাদামশায়ের অমোঘ অস্ত্র। চশমা ভেঙে গেলে অনেক টাকা খরচ হবে। দিদিমা অগত্যা কাঁদতে শুরু করতেন। অবশ্য সুর করে বিলাপ করতেন না। কারণ হাজার হলেও গেজেটেড অফিসার-পত্নীর ট্রেনিংটা ছিল। নিরস্ত হয়ে বলতেন—মনে থাকে না আমার। আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে! আমি তো কোন পাপ করি নি। কো-ন-ও পাপ করি নি। তবে? আমার এ দুঃখ কেন? এ শাস্তি?

দাদামশায় বলতেন—হ্যাঁ। রেসপনসিবল্ আমি।

দিদিমা কাঁদতেন। দাদামশায় স্বীকার করতেন—পাপ! হ্যাঁ, এও পাপ বইকি। আচারই পাপ!

এবং সেটা হল তাঁর যৌবনের সাহেবিয়ানা, তিনিই উৎসাহিত করেছিলেন ছেলেদের সাহেবিয়ানায়। তিনিই তালিম দিয়েছিলেন। হয়তো আজ বেঁচে থাকলে আমাকেও ম্লেচ্ছ যবন বলে কপালে করাঘাত করতেন। আপনি—না, আপনি যদি যেতেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে তা-হলে কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না আপনি বাঙালী, আপনি হিন্দু—আপনি এদেশী।

এই ভাবেই সেদিন শেষ হয়েছিল। এরপর ঠিক এইখ নেই চুড়কি এসে বলেছিল— নেহাবে না? বাতই করবে সারাদিন?

দিব্যেন্দু ঘড়ি দেখে বলেছিল—ওঃ ফাদার, এ যে বারোটা! আজ উঠলাম।

সে অপ্রতিভ এবং বিব্রত হয়েছিল। এই দুপুরবেলা সে স্নান করবে, খাবে আর দিব্যেন্দু যাবে এখন মাইথন! অথচ থাকতে, স্নান আহার করতে বলতে বাধছে। লোকে কি বলবে। এখানকার লোকের মনের ও জিভের যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে—!

দিবেন্দু তখন ঘরের বাইরে গেছে। হঠাৎ হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল—হে—! হে—! হে—! বলেই ছুটতে আরম্ভ করেছিল। সেও বাইরে এসেছিল। একখানা ট্রাক যাচ্ছিল—তাকেই হে-হে শব্দে চীৎকার তুলে থামিয়ে সে ওতেই উঠবে।

সে এই লোকটির আচরণের মধ্যে আশ্চর্য প্রাণবন্ত গ্রাম্যতা বা অসভ্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছিল। এর কিছুতে বাধে না!

গাড়িটা চলে গিয়েছিল। এবার সে নেমে এগিয়ে গিয়ে তাকে ডাকবে বলেই স্থির করেছিল। যে যা বলে বলুক। কিন্তু এগিয়ে যেতে সে দেখেছিল পথের উপর সাইকেল আরোহী এখানকার অফিসারকে। সাইকেলসুদ্ধ ধরে তাকে নামিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে চেপে মাইথন পাড়ি দিচ্ছে তখন।

তবু সে ডেকেছিল—শুনুন—শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি!

কে শুনবে? দুপুরে রোদে মোটা গলায় নৃত্যনাট্যের একটা গান ধরে সে সাইকেল চালিয়ে

ছুটেছে।—চল রে—চল রে—চল রে—

যা পড়ে সমুখে প্রলয় নৃত্যে সবল চরণে দলরে।

এর পর নৃত্যনাট্যে সঙ্গিনীরা কোরাসে ধ্বনি তুলেছিল—

তোল্ কল্লোল্—কল্ কল্ কল্—থল্ থল্ থল্—

কল্ কল্ কল্ কল্ রে—

চল্ রে!

এর পর নিজেই সে বিকেলে গিয়েছিল মাইথন।

মাইথন কলোনীতে পথে অনেকেই তাকে দেখে অর্থপূর্ণ বৃষ্টিপাত করেছিল। সেটা তার কাছে সহজেই বোধগম্য হয়েছিল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করে নি! তাদেরই প্রশ্ন করেছিল—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার মিস্টার চ্যাটার্জির বাংলো কোন্‌টা বলতে পারেন?

তারা অসম্ভ্রম করে নি। ভদ্রতার সঙ্গেই দেখিয়ে দিয়েছিল—ওই যে। ওই দুটোর পর। ওইটে।

দিব্যেন্দু তখন বাগান কোপাচ্ছিল একা একা। তাকে দেখেই সবিস্ময়ে কোদাল ফেলে এসে বলেছিল—আসুন, আসুন! কি ব্যাপার? কি কাণ্ড! আপনি এলেন কেন? এলেন কিসে?

সে হেসে বলেছিল—ক্ষমা চাইতে এসেছি। এসেছি ট্রাকে।

—ক্ষমা? কিসের ক্ষমা?

—ত্রুটির ক্ষমা।

—ত্রুটি কিসের?

—আগে ভেতরে চলুন। ওই দেখুন, দূরে কৌতূহলীরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। এবং ক্রমশঃ ভিড় বাড়ছে। বলে সে নিজেই ঠেলে ভিতরে ঢুকেছিল। বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে আবার উঠে বলেছিল—না চলুন, ভিতরে যাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে। ওরা একটু ভাবুক।

ভিতরে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিল—বাঃ, আপনি তো চমৎকার গোছানো লোক! সুন্দর গুছিয়ে রেখেছেন তো। নিজেই রাখেন? না? না—ভাল চাকর আছে?

—ওটা আমার ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস। বোধহয় মাতৃস্নেহের অভাবের ওটা কমপেনসেশন। দাঁড়ান, আমি আসছি। হাত-মুখ ধুয়ে একটু ভদ্র হয়ে আসি।

—আগে ত্রুটি স্বীকারটা করে নিই।

—না। তাহলে কথা ফুরিয়ে যাবে আপনার। আপনি উঠবেন।

—না। চা খাব। এবং বাদাম খেলে রঙ যেমন ফরসা হয় তেমনি যা খেলে—রঙ চোখ চুল কালো হয় তাই খাব। বলুন তো সে বস্তুটা কি?

—তেল মেখে মুড়ি।

—চমৎকার। এখন শুনুন। আমার অত্যন্ত অপরাধ হয়ে গেছে। সেই দুপুরে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি—অস্নাত অভুক্ত। মেয়েদের পক্ষে এর চেয়ে কি অপরাধ হতে পারে? আপনাকে ডেকেছিলাম। কিন্তু আপনি অদ্ভুত। একজনকে—

হেসে উঠে দিব্যেন্দু বলেছিল—ঘোষ আমার কলীগ! সেও অবাক হয়েছে। বাইসিক্লটা ধরে বললাম—নামো। নামতেই চড়ে বসে বললাম—নিয়ে চললাম, পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এটাকে আপনি এত বড় করছেন কেন?

—কারণ অন্তরে সেটা অনুভব করেছি।

—কিন্তু আমরা বন্ধু। অন্তত আমরা দুজনে বাল্যে পিতৃমাতৃহীন বলে বন্ধু হতে পারি।

—সেই জন্যেই দুঃখ বেশী পেয়েছি মিঃ চ্যাটার্জি।

—তা হলে দিব্যেন্দু বলতে বলব!

—বলব। দিব্যেন্দুবাবু—

—আমি বিপাশা দেবী বলব।

-- বলবেন।

চারদিনে তারা পরস্পরের কাছে দিব্যেন্দুবাবু এবং বিপাশা দেবী হয়ে গিয়েছিল।

বাঁধন তখনই অনুভব করেছিল।

তারপর মাসখানেক যেতে-না-যেতে হয়েছিল দিব্যেন্দু বিপাশা। তারপর দিব্য এবং বিয়াস। আপনি থেকে তুমি। তখন ফুলের সময়। দামোদর বরাকর খুদিয়ার দুই তটে তটে সে কি কুরচি ফুলের সমারোহ। বর্ষা নেমেছে। নদীগুলি ভরে উঠেছে। গেরুয়া জল কানায় কানায়। নদীতে সত্যিই ডাক উঠেছে। কল কল্লোল। এ যখন আসে তখন আশ্চর্য সমারোহ। সে কি সঙ্গীত চারিদিকে। আকাশে মেঘ গুরু গুরু শব্দে ডাকত। সে শুয়ে শুয়ে ভাবত—দিব্য কি করছে?

নদীর ধারে কতদিন দুজনে ভিজেছে বৃষ্টিতে।

লোকের মুখরতার আর বাকী ছিল না।

তবু বিবাহের কথা বলে নি। অন্তরে বলা হয়ে গিয়েছিল। মুখে বলতে বাকি ছিল। থাকলেও তাতে সে অন্তত নিঃসন্দেহ ছিল।

দিব্যেন্দু একদিন বলেছিল—যে কথা বলা প্রয়োজন বিয়াস, সেটা অনুক্তই থাক। বললেই যেন তোমাকে জয় করার ও পূর্বরাগের যে আনন্দ সেটা ফুরিয়ে যাবে!

চুড়কি জিজ্ঞাসা করত—তুমাদের বিয়া হবে কবে?

সে বলত—হবে-হবে। তোকে একজোড়া ডুরে কাপড় দেব।

—তা দিয়ো। তবে বিয়াটি কর ক্যানে।

—কাপড়টা তাহলে কালই বলব এনে দিতে।

—উঁহু। তা বুলি নাই। বুলচি বিয়াটি বাকি রাখছ ক্যানে?

মাদার গ্রাহাম তাকে প্রশ্ন করেছিলেন—বিয়ে তোমাদের ঠিক হয়ে গেছে? সেটেল্ড্?

সে বলেছিল—ইয়েস, মাদার গ্রাহাম!

* * *

সেই দিব্যেন্দু এইভাবে অকস্মাৎ যেন চোরের মত লুকিয়ে গেল, পালিয়ে গেল? কেন? সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তবে আজও সে তাকে প্রতারক বলে ভাবতে পারে না। না। সে তা

ভাবতে পারবে না। কিন্তু এ অঞ্চলে কথাটা যেন দামোদরের বন্যার মত ছড়িয়ে পড়েছে। জানা-জানি হয়ে গেছে। সকলেই বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বক্রহাসি হাসছে! কি করবে সে? হে ভগবান!

দিব্যেন্দু! কি হল দিব্যেন্দুর!

তার নিজের জীবনে কোন গ্লানির কারণ সে ঘটিয়ে যায় নি। তার মনে তার আসন অক্ষয় হয়ে গেছে। সারাটা জীবন কোন অভিযোগ না করে—পবিত্র বেদনা-বিধুর চিত্তেই সে আসন পেতে রেখেই প্রতীক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তার অপবাদ সে সহ্য করবে কি করে? এবং তার কি হল?

চুড়কি এসে বলল—কি খাবেক্ বুলো।

সে বললে—কিচ্ছু না। তুই যা।

বাইরে এই মুহূর্তে কড়া নড়ল। চমকে উঠল সে—কে?

—আমি। মাদার গ্রাহাম।

—মাদার গ্রাহাম? দরজা খুলে দিলে সে। প্লিজ কাম ইন। আসুন—বাইরে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। সন্ধ্যেবেলা এসেছি।

চেয়ার টেনে নিয়ে মাদার গ্রাহাম বললেন—আমি শুনলাম সে পালিয়েছে!

—কে?

—চ্যাটার্জি! আমি জানতাম! তোমাকে আকারে ইঙ্গিতে আমি বারণ করেছিলাম।

—এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমি অনিচ্ছুক মাদার গ্রাহাম।

—আমি তোমার ভালোর জন্যে বলতে চেয়েছিলাম মিস ভট্টাচারিয়া।

—প্লীজ মাদার গ্রাহাম!

—মাঝখানে ইংল্যাণ্ডের একটি দম্পতি মাইথন দেখতে এসেছিলেন। মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস অ্যাণ্ডার্সন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। চ্যাটার্জি দেখাচ্ছিল সব। যাবার সময় তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন। তিনি ওর মুখ দেখে ওকে চিনেছিলেন। ওর বাবাকে তিনি জানতেন। তিনিও এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি বলে গিয়েছিলেন ওর বাপ ছিল প্রতারক। অ্যাণ্ড—

—হোয়াট মোর মাদার গ্রাহাম?

—এ ছেলে তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান নয়। ব্যাস্টার্ড—জারজ—

—মাদার গ্রাহাম!

—জারজ ব্যাস্টার্ড কথাটা রূঢ়; তবে সে তাই—

—মাদার গ্রাহাম, আপনি প্লীজ—

সে আঙুল দেখিয়ে দিল দরজার দিকে। যান, আপনি যান।

মাদাম গ্রাহাম চলে গেলেন, বলে গেলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। সে তোমার চরম ক্ষতি করে নি। ওর মা ছিল হার্লট। এলিস অ্যাণ্ডার্সন একজন অত্যন্ত সৎ ইংরেজ মহিলা। আমার কাছেই শুনেছিলেন তোমার কথা ওরই প্রসঙ্গে। তাই তোমাকে সাবধান করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—মাদার গ্রাহাম, একটি কুমারীর জীবন এইভাবে নষ্ট হবে! তুমি ওকে বোলো।

বোলো ইংরেজ মহিলা মিথ্যা বলে না। কিন্তু আমি তখন পারি নি বলতে। কি করে বলব? আজ বলছি। কারণ এইভাবে চলে যাওয়াটাই তার এই জন্ম-কলঙ্কের একটা বড় প্রমাণ। গুড নাইট।

বিপাশা ছুটে গিয়ে দেওয়ালে নিজের মাথাটা ঠুকলে।—হে ভগবান!

চুড়কি অবাক হয়ে শুনছিল আড়াল থেকে। ইংরাজী কথা বুঝতে পারে নি, কিন্তু একটা প্রচণ্ড শঙ্কাজনক কিছু তা বুঝতে বেগ পেতে হয় নি। সে ছুটে এসে তাকে জাপটে ধরলে।

—কি করছ? না-না! না!

টেনে এনে সে তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। এবং তার পাশে বসল মায়ের মত। বিপাশা কাঁদতে লাগল। চুড়কি শুধুই বললে—তাকে তুমি খুঁজে ধর। ছেড়ে দিবে ক্যানে? ধর তাকে। কেঁদো নাই।

ছয়

ঘণ্টা কয়েক লাগল তার আত্মসম্বরণ করতে। প্রায় রাত্রি দুটোর সময় সে উঠল। চুড়কি ঢুকছিল। তাকে বললে—তুই শুগে যা চুড়কি, ঘুমিয়ে নে একটু।

—তুমি?

—আমি ঠিক আছি, তুই ভাবিস নে।

কিন্তু চুড়কি বিশ্বাস করতে পারলে না। সে ওই ঘরেই মেঝের উপর শুয়ে রইল। চেষ্টা করতে লাগল জেগে থাকতে। ইংরাজী কথাবার্তা বুঝতে সে পারে নি, কিন্তু এটা সে বুঝেছে—দিব্যেন্দুকে নিয়ে যা ঘটেছে তাতে এই মেয়েটির পক্ষে এখন সব কিছু করাই সম্ভবপর। সে জানে তাদের মেয়েদের গাছের ডালে গরুর দড়ি বেঁধে গলায় লাগিয়ে ঝোলার কথা। বিষ খাওয়ার কথা। নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা!

বিপাশা স্থির হয়ে বসে ভাবলে কিছুক্ষণ। তার জীবনের সেই নিবিড় তিমির নিশীথিনীর মত দিনগুলির কথা মনে করলে। এ যেন তার থেকেও অসহনীয়। আরও গাঢ়, নিবিড়তম তিমিরঘন কাল রাত্রি! ভগবানও বুঝি এখানে মৃত! সে নিশীথিনীতে যা এসেছে ভয়ঙ্কর ভীষণ সব কিছুকে স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখে ধরা গেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে পার হয়েছে, অতিক্রম করেছে ভীষণকে ভয়ঙ্করকে। সামনে দূরে ছিল সীমান্ত এলাকায় আলো এবং অন্ধকারের সীমারেখা। আর এর যেন শেষ নাই, অকস্মাৎ কোন দূর অতীতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার সাইক্লোন হ্যারিকেনের মেঘের মত পিছনের দিগন্ত থেকে এসে তাকে আবৃত করে ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত এগিয়ে গেল। একটা প্রেতিনী যেন পিছনে থেকে তার কৃষ্ণবর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সারা আকাশে কালো মাখিয়ে আলো ঢেকে দিলে।

তাহলে কি মাদার গ্রাহাম তার পরিচয় জেনেছে—এইটে জানতে পেরে সে পালাল? তা ছাড়া আর কি হতে পারে? হায় দিব্যেন্দু, তুমি সত্যকে গোপন করলে কেন? তুমি প্রথম যেদিন তোমার কথা বলেছিলে সেদিন মনোহরভাবে তোমার বাবা-মায়ের রচনা করা মৃত্যুকাহিনী

বলে চোখের জল ফেলেছিলে। সে জলে বিপাশার অন্তরলোক সজল হয়ে তৃণাঙ্কুর মেলে সবুজ হয়েছিল। কেন তুমি ওই চোখের জল ফেলেই জবালাপুত্র সত্যকামের মত বল নি—আমার বাবা মা-কে আমি দেখি নি বিপাশা—তাঁদের কথা এইটুকু বলতে পারি, তাঁরা পাপের পঙ্কে বাসর সাজিয়ে মিলিত হয়েছিল, সেই পঙ্কবাসরে হয়েছিল আমার জন্ম। আমি সেই পঙ্কতল থেকে পঙ্কজের মত ফুটতে চাই। জীবকের পূজা নিবেদন করতে চাই আলোক-আকর সর্বপাপঘ্ন দেবতার পায়ে। বলতে পারতে, আমি রক্তকমল নই—শুভ্রকমল নই, আমার বর্ণ ওই পঙ্কের মত কৃষ্ণ—আমি কৃষ্ণকমল। দিব্যেন্দু, আমি তাহলে বলতাম কি জান? বলতাম, তুমি দিব্যকমল দিব্যেন্দু, আমি শ্বেতভ্রমরী। তোমার মর্মলোকে আশ্রয়ের জন্যই আমার বোধহয় সৃষ্টি হয়েছিল! ওঃ, প্রতারক বলেই তা তুমি পারলে না। ছি-ছি-ছি! করলে কি। জান না তুমি, বুঝতে পারবে না, বিপাশাকে কি রিক্ততার মরুভূমিতে তুমি দাঁড় করিয়ে দিলে। জীবনে কোন ভদ্রজনকে বিশ্বাস করতে পারব না। ভালবাসার কথা দূরেই থাক। জীবনে তোমার কবিতার বিপাশার মতই আমি ব্রতচারিণী হয়ে কাটিয়ে দেব—অজ্ঞতার অন্ধতার পাশই মোচন করব। তুমি আমাকে চিনলে না। " আমি এক দুর্লভা কন্যা, আমি কতকাল পরে পরে জন্মাই—বিপর্যয় বিপ্লব করে দিয়ে যাই কুলে বংশে। আমার সাধ্য অনেক! আমি দুর্লভা শ্বেতভ্রমরী, আমি বসতাম কৃষ্ণকমলে, সৃষ্টি করতাম দিব্যকমলের! সংস্কারকে জয় করে—। আবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। সে উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালায়। পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে চাইল আকাশের দিকে। পূর্ব দিগন্তে শুকতারা উঠেছে। ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে নীলাভ দীপ্তি নিয়ে। সেই দিকে তাকিয়েই সে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার আর একটা কথা মনে হল। এই কারণেই কি দিব্যেন্দু তাকে দেবকন্যা গঙ্গা আর নিজেকে অনার্য-পুত্র দামোদর বলে চিত্রিত করেছে নৃত্যনাট্যে? সজ্ঞানে? না!

সকাল হতেই সে একখানা চিঠি লিখে চুড়কিকে বললে—মাদার গ্রাহামকে দিয়ে আসবি। পরে, এখন নয়। এখন চা কর।

মুখ হাত ধুয়ে রাত্রের কাপড় জামা বদলে বসল সে। সে যাবে—খুঁজতে যাবে দিব্যেন্দুকে। তাকে বের করা তার চাই। তার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা প্রশ্ন সে করবে শুধু। শুধু কয়েকটি প্রশ্ন।

—"এই কারণেই কি তুমি বলেছিলে মুখ ফুটে, শেষ কথাটা অনুক্ত এখনও থাক বিয়াস। পূর্বরাগের মাধুরী মধু বড় দুর্লভ। আমাকে সুদুর্লভা তোমাকে জয় করবার চেষ্টার আনন্দ উপভোগ করতে দাও।"

সে যদি বলে—হ্যাঁ, তাই।

তবে সে বলবে—অর্থাৎ যথেষ্ট সুযোগ চাইছিলে, যাতে নাকি আমাকে আয়ত্ত করে কোন অতি দুর্বল মুহূর্তে আমার কুমারী জীবন উচ্ছিষ্ট করে পৈশাচিক আনন্দ নিয়ে সরে পড়তে। না?

কি বলবে? জানে না। হয়তো চুপ করেই থাকবে। কারণ ওর মধ্যে দুটো বাস্তব সত্য সে দেখতে পাচ্ছে।

একটা ভয়। অপরটা ওর রক্তগত পাশবিক প্রলোভন।

তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে সেই বলবে—তোমার ওই ভয় দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হোক, সে তোমাকে আত্মহত্যায় প্রবুদ্ধ করুক। তোমার পশুত্বের তা নইলে মুক্তি নেই দিব্যেন্দু। তুমি মর দিব্যেন্দু—তুমি মর।

ভাবতে ভাবতে আবারও সে কেঁদেছিল।

মনের সঙ্কল্পেরও যেন পরিবর্তন হয়েছিল। ভেবেছিল—না, মৃত্যু কামনা নয়, 'মর' বলার মত রূঢ় কথা সে বলবে না। বলবে—তোমাকে ধন্যবাদ দিব্যেন্দু, তোমাকে লক্ষ ধন্যবাদ।

তারপর আবার একবার শুয়েছিল। দেহে ক্লান্তির আর সীমা ছিল না। শুধু মনের যন্ত্রণায় যে দেহে এমন যন্ত্রণা হতে পারে এ ধারণা তার ছিল না। মনে পড়ছে, অমৃতসরে যেদিন তার কলেরা ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়ায় এবং খাদে পড়ে যাওয়ার আঘাতের ব্যথায় ও সুদীর্ঘ পথশ্রমে যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থার কথা। কিন্তু মনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত। সেদিনের মন আশায় পৌঁছে দীর্ঘ রোগমুক্তির প্রসন্নতায় ছিল প্রসন্ন আর আজ একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি যেন আক্রমণ করে তার মনকে অজগরের মত গিলছে। শুয়ে সে ঘণ্টাদেড়েক ঘুমিয়েছিল। ঘুম ঠিক নয়—তন্দ্রা। শোকাহত বা নিষ্ঠুর বেদনাকাতর অবস্থায় এক ধরনের তন্দ্রা মানুষের আসে, যে তন্দ্রায় মধ্যে মধ্যে কাঁপানো দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—সেই ধরনের তন্দ্রা। এক আধবার সে তন্দ্রাও ভেঙে গেছে। মনে হয়েছে—কেউ ডাকছে নয়? কিন্তু না।

সকালের আলো চোখে পড়তেই সে উঠে বসেছে। দেওয়ালে সামনেই একখানা ছবি টাঙান ছিল। নোয়াখালিতে মহাত্মাজী। দীর্ঘ দণ্ডধারী কৌপীনবস্ত্র মহাত্মা—শ্মশানে, মনুষ্যত্বের শ্মশানে খুঁজতে চলেছেন, প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন মানুষের আত্মাকে। ছবিখানা রোজই দেখে, কিন্তু এত কথা কোনদিন মনে হয় না। আজ হয়েছে।

চুড়কি চা এবং পাঁউরুটি ডিম এনে নামিয়ে দিল। পাউরুটির প্লেটেই একপাশে কিছু মেওয়া। এবং বললে—শুনছ, খাও। প্যাটে খিদা থাকলে বল থাকে নাই। কিছু খেয়ে বল করে লাও। তবে মনটো দড় হবেক। না করো নি। হাঁ।

ভাল লাগে, চুড়কির এই স্নেহ তার ভাল লাগে। আজ আরও ভাল লাগল। সে বললে—কাল তুই রাত্রে কি খেয়েছিলি?

—সে কিছু-মিছু খেয়েছিলুম।

—ভাত?

ঘাড় নাড়লে চুড়কি এবং একটু হাসল।

বিপাশা বললে—জানি। কিছুই খাস নি। তুই খা, কি আছে? পাউরুটি ডিম, যা আছে পেট ভরে খা। আমি এ বেলা ফিরব না। সন্ধ্যের পর ফিরব। হয়তো এসেই আবার বেরিয়ে যাব। আমার সুটকেসে কাপড় জামা এটা ওটা গুছিয়ে দিস। বিছানাটাও। বুঝলি!

—কোথা যাবেক?

—যাব তাকে খুঁজতে। তুই বললি নে? ধর তাকে!

—হঁ। যাও। ঠিক পাবে। বুলছি আমি তুমি দেখো!

—ওই চিঠিটা মাদার গ্রাহামকে দিস।

—দিব।

চা খেয়ে উঠল সে। এখান থেকে যাবে মাইথন। মিস্টার মিত্তিরকে নিয়ে আপিস খুঁজে দিব্যেন্দুর কোয়ার্টারের জিনিসপত্র খুঁজে সে দেখবে তার কোন ঠিকানা পাওয়া যায় কি না! না পেলে যাবে ডি-ভি-সি হেড কোয়ার্টারে কলকাতায়। সেখানে দেখবে যদি কোন ঠিকানা সেখানে রেখে গিয়ে থাকে। সেখান থেকে বেনারস।

তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে কাটিয়ে দেবে সকাল থেকে সন্ধ্যা। গঙ্গাস্নানে তার বড় ঝোঁক ছিল। এখানেও প্রায় যেত লেকে সাঁতার কাটতে। সে বসে থাকত আর দিব্যেন্দু অবলীলাক্রমে সাঁতার কাটত। মধ্যে ডুব দিত। এবং উঠে বলত—পুরুষের হৃদয় অত্যন্ত গভীর বিয়াস। বিশেষ করে বরাকরের। দামোদর বড় ভাল। শুধু ক্রোধ বেশী, তরঙ্গ বেশী, কিন্তু খোলা হৃদয়।

পাঁচেতের রিজরভয়র তখনও শেষ হয় নি। জল তখনও পুরো রাখা হত না।

জানত না বিপাশা, যে সুচতুর দিব্যেন্দু শুধু রঙ্গই করছে না। নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছে।

আরও একটা প্রশ্ন সে করবে তাকে—জীবনে রঙ্গচ্ছলে যা করেছে তার সবই কি ব্যঙ্গ দিব্যেন্দু? হায়, জীবনকে কি এমনিভাবে নিজে হাতে ব্যর্থ করে?…

কিন্তু কোথায় দিব্যেন্দু?

দশদিন পর কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে, বিশ্বনাথের মন্দির-চূড়ার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—কোথায় দিব্যেন্দু? হে ভগবান!

মাইথনে মিত্তির এবং সেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভদ্রলোক তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। দিব্যেন্দুর কোয়ার্টার তার রেজিগনেশন পত্রের পর খালি করে, একটা গুদামে তার জিনিসপত্র এনে সেই দিনই রাখা হচ্ছিল। সেগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছিল। চিঠি-পত্রের সবই বন্ধুদের চিঠি। প্রায় সকলেই এঞ্জিনীয়ার। কাজ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বেনারসের দু-একজনের পত্রও ছিল। একটা আপিসের ফাইল ছিল। তার নিজের সঙ্গে আপিসের যে-সব বিনিময় হয়েছে—তার ফাইল। তার মধ্যে তার বেনারসের একটা ঠিকানা ছিল। আর কিছু না!

মিত্তির বলেছিলেন—তাই তো বিপাশা দেবী! এতে তো কিছু কিনারা হবে বলে মনে হয় না?

—একটা কাজ করে দিন আমার। বেশ ভেবেই সে বলেছিল।

—বলুন।

—রিপ্লাই পোস্টকার্ডে আপনি সকলকে একখানা করে চিঠি লিখুন। তারা যেন খোঁজ জানলে —আপনাকে জানায়। আর এই বিকেলেই আমাকে বরাকরের বিকেলের ডাউন ট্রেনটা ধরিয়ে দিন।

—সেখানে—

—ওখানে হেড অফিসে যদি কেউ কিছু জানে—খোঁজ করব। কলকাতায়ও খুঁজব। তার পর বেনারস আসব। বেনারসে খুঁজব।

—তারপর ?

—আর কি ? দশাশ্বমেধে মুক্তিস্নান করে চলব। যেমন একা চলছিলাম সংসার-পথে। মরতে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু সে ঠিক হবে না। আশঙ্কাভরে মিত্তির তার দিকে তাকিয়েছিল, বলেছিল—না, না, সে তো এমন স্কাউণ্ড্রেল নয়—

সে ঘাড় নেড়ে একটু হেসেই বলেছিল—না। সে ভয় নেই। ধর্ম আমার অক্ষুণ্ণই আছে, মরতে মায়ের বারণ, মা বলে গেছেন—মরণা নেহি হ্যায়। মরবি শুধু তখন যখন ধরম যাবে। একটু থেমে বলেছিল—সেই তো মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হচ্ছে—তাকে তো অদেয় আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু সে তো কোনদিন সে সুযোগ নিতে চায় নি! আপনার মতন—ভিতর থেকে—। সে থেমে গেল—সংযত করে নিজেকে। এসব কেন বলছে সে ? না। এ সংসারে একটি লোক ছাড়া এসব তো কাউকে বলতে পারে না সে। স্বামীজী! দিল্লীর স্বামীজী। আর একবার অমৃতসর গিয়ে খুঁজবে সে সর্দার হরদয়াল সিংজীকে, সব বলে বলবে—ফরমাইয়ে সর্দারজী, বলে দিন কি করব এখন ? মরব ? না বাঁচব ?

আর একটা কাজ করেছিল মিত্তিরের পরামর্শে। পোস্টাপিসে লিখেছিল—তার চিঠিপত্র যেন মাইথনে মিঃ মিত্রকে দেওয়া হয়।

মিস্টার মিত্র তার আরও উপকার করেছিলেন—তার চেক নিয়ে তাকে টাকা দিয়েছিলেন।

কলকাতায় সে এর আগে দুবার এসেছিল—একবার ছাত্রীজীবনে, ছাত্রীদলের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল মহানগরী। দ্বিতীয়বার এই সেদিন, এসেছিল কর্মজীবনের তাগিদে। এসে উঠেছিল, আলিপুরে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের একটি মেসে। অনেকটা ওই কনস্টিট্যিউশন হাউসের মতই তার কাঠামো। সেবার একটা অজুহাত করে দিব্যেন্দু সঙ্গে এসেছিল। সে উঠেছিল অন্যত্র, একটা হোটেলে। হোটেলগুলি খুব পরিচ্ছন্ন, আরামপ্রদ নয়, শৌখীন তো নয়ই; তবুও ভদ্র। কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি। দিব্যেন্দুই বলেছিল—এসপ্ল্যানেডের বড় হোটেলের কথা বাদ দাও—ওখানে সাধ্য কি আমাদের মত অল্প প্রাণীরা ওঠে। কিন্তু ওর আশেপাশে হোটেল আছে। যেখানে আরাম আছে। খরচ বড় হোটেলের থেকে কম, কিন্তু পরিবেশটা ইণ্টারন্যাশন্যাল করবার দিকে ঝোঁক বেশী। বার আছে—রেস্টুরেণ্ট আছে—রাত্রি নটা নাগাদ অনেক দামী লোকের দেখা মেলে। খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেইজন্যে ওদিক আর মাড়াই নে। এদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। এরা লোক ভাল। এইখানেই উঠি আমি।

সেবার দিবেন্দু ছিল পাঁচ দিন, সে ছিল ন দিন। দিব্যেন্দুর হোটেলে সে দুদিন এসেছিল সেবার। এবং দুদিন গিয়েছিল তারা বাংলা থিয়েটারে। দিল্লীর তালকোটরা গার্ডেনের অভিনয় দেখা চোখে, বাংলা থিয়েটারের শিল্প-সৌন্দর্যে, অভিনয়-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাকী কদিন, কোনদিন সন্ধ্যায় মেট্রোর সামনে—কোনদিন বিকেলে ডালহৌসি স্কোয়ারে দেখা হয়েছিল। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজ ছিল বিপাশার। সাড়ে চারটেতে বেরিয়েই সে তার দেখা পেয়েছিল।

পথে যেতে যেতে বলেছিল—তুমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলে, এত লোকের মধ্যে যদি আমি না দেখতে পেতাম, এবং তুমিও মিস করতে আমাকে।

সে বলেছিল—কি করব ? আপিসে সকাল-সকাল কাজ হয়ে গেল। বললে—কোল ফিল্ড এক্সপ্রেসে আজই যেতে পার তুমি। আমি অনেক কষ্টে কাটান দিয়েছি।

রাত্রেই কোন ট্রেনে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার কথা সন্ধ্যেবেলা—তোমার মেসে। এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেসে ফিরতে দেব না তোমাকে। এখান থেকেই চল খানিকটা ঘুরে—তোমাকে পৌছে দিয়ে পাড়ি দেব রাত্রে। চল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ঘুরে কালীঘাট মন্দির দেখিয়ে মেসে পৌছে দেব।

এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে সে-ই একদিন বলেছিল—কলকাতার এই একটি পয়েন্ট যেখানে দাঁড়ালে কলকাতার হারিয়ে-যাওয়া মানুষ মাসখানেকের মধ্যে চোখে তোমার পড়বেই।

এই হোটেলেই উঠেছিল বিপাশা। কিন্তু দিব্যেন্দুর খোঁজ পায়নি। সে এখানে আসেনি। ডি-ভি-সি হেড কোয়ার্টারে খোঁজ একটা পেয়েছিল—দিব্যেন্দু এসেছিল তিন সপ্তাহ আগে—শুধু পদত্যাগপত্র দাখিল করে চলে গেছে। কোন কথা বলে নি। কোন ঠিকানাও দেয় নি। দরখাস্তে ঠিকানা ছিল মাইথনের।

তবু সে কলকাতায় সাতদিন তাকে খুঁজেছে। হোটেলে হোটেলে ঘুরেছে, খোঁজ করেছে—দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি আছেন ? ফ্রম মাইথন ! টল, ডার্ক, রোবাস্ট ইয়ংম্যান !

বিকেল বেলাটা ওই এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে থেকেছে !

কিন্তু কোথায় দিব্যেন্দু ?

সাত দিন পর সে এসেছিল বেনারস। আপিসে সংগ্রহ করা ঠিকানা বের করে তার খোঁজ করেছিল। কিন্তু সে তো ভাড়ার বাড়ি। আশেপাশে পুরনো বাসিন্দের কাছে খোঁজ করেও কিছু পায় নি। দিব্যেন্দুর সন্ধান ঠিক নয়—তার অতীত কথা। তার দিদিমা এবং তাকেই কয়েকজন মনে করতে পারলেন—কিন্তু সে ওই মনে করাই। তার বেশি কিছু নয়। তারা কাশীতেই পূর্বে অন্য ঠিকানায় থাকত, দাদামশায়ের মৃত্যুর পর এখানে এসেছিল—কম ভাড়ার বাসায়। ছেলেটি—সত্যিই ভাল ছেলে ছিল। কিন্তু ইদানীং তো সে আসেনি ! কাশীর সে দু-তিনজনের চিঠি পেয়েছিল দিব্যেন্দুর বাসায়, তারা বললে—দিব্যেন্দু ! কই না তো ! সে তো আসে নি ! কিন্তু আপনি—? আপনি কে ? তাকে খুঁজছেন ?

সে বলেছিল—তাকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন !

ঘুরিয়ে বলেছিল।

সকাল সন্ধ্যায় গিয়ে বসে থাকত দশাশ্বমেধের ঘাটে। ভোর বেলা থেকে পুরনো বাসার ঠিকানায় গিয়েছিল। স্থানটায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে আছে বাসিন্দার মত। তারা মনে করতে পেরেছিল ; দাদামশায়—মুখুজ্যেমশাই পেনসন পেতেন। চুরোট খেতেন, গিন্নী বড্ড বকতেন। মেয়েটি বিধবা হয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিল। ছেলে দেখত না। সধবা সেজে থাকত। কারুর সঙ্গে কথা বলত না। মাথায় বিকৃতি ঘটেছিল। তীর্থে গিয়ে মারা গিয়েছিল। ছেলেটি বড় ভাল ছিল। বড় দুর্দান্ত, কিন্তু প্রাণবন্ত। এর বেশী কিছু নয়।

যে প্রেসে সে প্রুফ দেখত—সেখানেও গিয়েছিল।

সেখানেও সেই এক কথা।—হ্যাঁ, ছিল। কাশীতে থাকতেন দাদামশায় দিদিমা, তাদের কাছেই মানুষ হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুটা শোচনীয়। সম্ভবত সুইসাইড। মাথা খারাপ ছিল তাঁর। সঠিক তো বলতে পারব না।

নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথের কাশী। এখানে যত বিষ সব কিছুকে আশ্রয় দেন—বিশ্বনাথ। অথবা কাশীর সমাজ। পাতিত্য নিয়ে এখানে মন্থন করে না কেউ।

কাশীতে পঞ্চম দিন—সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে সে উঠে দাঁড়াল।

কোথায় দিব্যেন্দু?

দিব্যেন্দু কোন অন্ধকারে বা কোন অজ্ঞাতস্থানে গিয়ে আবার খুঁজছে কোন নূতন নায়িকাকে।

তুমি সত্যই অনার্য দিব্যেন্দু—

বাইরের দেহবর্ণটা কৃষ্ণবর্ণ হলেই অনার্য হয় না। অন্তরটাও কালো। সত্যই তুমি অনার্য।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে কাল বিপাশা তোমার স্মৃতি নিঃশেষে ধুয়ে মুছে ফেলে মুক্তির জীবন নিয়ে ফিরবে।

ফিরল সে—হোটেলে। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই হোটেল।

পরদিন তাই সে করল। দশাশ্বমেধে স্নান করে মনে মনে বললে—এই গঙ্গার স্রোতে তোমার সব আমি ভাসিয়ে দিলাম। নীলকণ্ঠের কণ্ঠে থাকুক আমার মনের দুঃখ বেদনা। বিকেলে বরাকরের টিকিট কেটে সে ট্রেনে চাপল।

কিন্তু নীলকণ্ঠেরও বোধহয় এতকালের মানুষের জীবন মন্থন করা বিষ সহ্য হয় নি, তাঁরও বোধহয় এ বিষে মৃত্যুর কাছে পরাজয় ঘটেছে। এতকাল পরে বিষের ক্রিয়ায় সত্যই পাথর হয়ে গেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে। অথবা তাঁর কণ্ঠে আর স্থান নেই। বিপাশার মনের বেদনা, স্মৃতি কিছুই তিনি নিতে পারেন নি। ট্রেনের গতির সঙ্গে অনুভব করলে বিপাশা সে বেদনা, স্মৃতি, কলকাতা কাশী দু-জায়গায় অনুসন্ধানের ব্যর্থতায় হাহাকার করছে। মধ্যে মধ্যে মাথায় যেন আগুন জ্বলছে, বুক জ্বলছে।

পাঞ্জাবের শর্মা বংশের বিচিত্র যে মেয়েরা বিষ খেয়ে মরেছে, বুকে ছুরি বসিয়েছে, বাপের অস্ত্রের তলায় গলা পেতে দিয়েছে, কাপড়ে আগুন ধরিয়ে পুড়ে শুভ্রবর্ণকে কালো করে মরণের মুখে চলেছে, যে মেয়ে অপহরণকারী শক্তিমানের বুকে পিঙ্গল চুলের খোঁপায় লুকানো সোনায় বা রূপোয় মোড়া হৃৎপিণ্ডভেদী ইস্পাতের কাঁটা বসিয়ে দিয়েছে—সেই মেয়ে যেন ওই আগুনের আঁচে জাগছে।

একসময় মনে হল—গভীর রাত্রে এই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটন্ত মেলটা থেকে সে পড়বে? ঝাঁপ দিয়ে পড়বে? মরবে? কি হবে বিষাক্ত জীবন রেখে। এ বিষজর্জরতা তো গেল না। গঙ্গার জলে ধুয়ে গেল না, দশাশ্বমেধের পুণ্যে না, নীলকণ্ঠের প্রসাদে না। তবে?

না তাকে না-মেরে নয়।

হ্যাঁ। না, তাকে মেরে তবে সে মরবে।

মরণা হায় তো পহেলে মারণা হায়। লড়না হায়, মারণা হায়—তব মরণা হায়।

বরাকরে নামল সে শেষ রাত্রে। তুন এক্সপ্রেস। রাত্রি আড়াইটে। বাকী রাত্রিটা সে ওয়েটিং-রুমে কাটিয়ে ভোরবেলা ট্যাক্সি করে এল বাসায়।

চুড়কি তাকে দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল।—ও মা!

—কি? বুঝতে পারে নি সে।

চুড়কি এবার বললে—ভয় লাগছে তুমাকে দেখে।

তার নিজের দৃষ্টি পড়ল এবার আয়নার দিকে। দেওয়াল ঘেঁষে রাখা টেবিলের উপরকার আয়নাটা ছোট নয়।

প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা তার মুখে চোখে—তার বিশৃঙ্খল স্বর্ণাভ—না স্বর্ণাভ নয়, পিঙ্গলবর্ণ চুলে যেন উন্মাদের ছোপ বুলিয়ে দিয়েছে!

সে কি পাগল হয়ে যাবে? হে ভগবান! সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল নিজেকে।

চুড়কি এগিয়ে গেল। টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

সে অসহিষ্ণু ক্রোধে বললে—কি? ওখানে কি? দাঁড়ালি কেন আড়াল করে?

চুড়কি টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে একটা বড় লম্বা খামের প্যাকেট বের করে বললে—ইটো—

আপিসের চিঠি, কাগজ—! সে দ্রুতপদে গিয়ে হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

চুড়কি বললে—মিস্তির সাহেব পরশু দিয়ে গেল যি। রেজেষ্টালী—। বুললে দিবু সাহেবের চিঠি—

—কার?

—সেই আমাদের সাহেবের—

—কার? ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিল সে। হ্যাঁ। রেজেষ্ট্রি করা লম্বা খামের চিঠি। দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি,—কেয়ার অফ—পোস্টমাস্টার, এলাহাবাদ।

বুকের মধ্যে যেন হৃৎপিণ্ড মাথা কুটছে। ফেটে যেতে চাচ্ছে।

কম্পিত হাতে সে খুলে ফেললে খামটা।

দীর্ঘ পত্র।

সাত

দীর্ঘ পত্র। সম্বোধনহীন।

"কোন্ সম্বোধনে আপনাকে সম্বোধন করতে পারি জানি না। বোধ হয় কোন সম্বোধনেই আমার অধিকার নেই। 'তুমি'ও আমি বলতে পারি না। আপনার পবিত্র নাম বিপাশা দেবী বলেই শুরু করছি। 'বিয়াস' বলবারও অধিকার নেই। কারণ সংসারে প্রেম প্রীতি স্নেহ শ্রদ্ধা যাই আমার জীবনপাত্রে পড়বে, তাই-ই আমার কলঙ্কবিষ-বিষাক্ত জীবনপাত্রে পড়েই নীল হয়ে যাবে

বিষে। কলঙ্কিত জীবনপাত্র আমার। বিপাশা দেবী, আমি আমার মাতাপিতার বিবাহিত জীবনের পুণ্যফল নই, আমি তাঁদের গোপন পাপ, ব্যভিচারের ফল। আমি অবৈধভাবে উৎপন্ন—জারজ!

আমার মা নিজে আদালতে দাঁড়িয়ে এই কথা সাক্ষী হিসাবে বলে গেছেন।

বিপাশা দেবী, দাসী জবালার পুত্র সত্যকাম। দাসী জবালাও পুত্রকে এমনি কথাই বলেছিল—কিন্তু সে ছিল দাসী। সে ছিল জন্ম হতে সেদিনের সমাজ-নির্দেশ অনুযায়ী প্রভুর ভোগ্যা। সমাজের অবিচারে, নির্যাতিতার সে-দিন এই ছিল ভাগ্য; তাকেই বিধিবিধান মনে করে, অন্ন-কাঙালিনী, আশ্রয়-কাঙালিনী, জবালা যেদিন বলেছিল—বহু পরিচর্যার মধ্যে তুমি এসেছ আমার গর্ভে, আমার কোলে, সেদিন তাঁর সত্যভাষণে সত্যকাম লজ্জিত হয় নি। তার জননীর সঙ্গে সঙ্গে তার জন্মের মধ্যে পাপ বা কলঙ্ক বড় হয়ে ওঠে নি। সেদিন দাসীপ্রথার সঙ্গে প্রভুর দাসী রাখার অধিকার ছিল। আজ দাসীপ্রথা নাই, পাপ বলেই উঠে গেছে। আজ ও-কথা বলতে সত্যকামও থমকে দাঁড়াতেন। আজও বেশ্যাপুত্র হয়ে শিক্ষা লাভ করে যদি মানুষ হতাম—তবে বলতে পারতাম—সত্যকামের মতই অসঙ্কোচে বলতে পারতাম— আমার জন্মকথা এই। বেশ্যাপুত্র জারজ নয়, তার পরিচয় সে বেশ্যাপুত্র। পৃথিবীতে জন্ম তার অবৈধ নয়, ওই তার বৈধ জন্ম। বেশ্যারা তো ভ্রূণ হত্যা করে না।

আজকের সমাজে যে-সব নবজাতকেরা রাত্রির অন্ধকারে পথপ্রান্তে অথবা আবর্জনাস্তূপে অথবা নরকের মত কদর্য দুর্গন্ধময় মানুষের অগম্য স্থানে, মৃত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, তারাই অবৈধ, তারাই জারজ। আইনগতভাবে রাজ্যে তাদের স্থান হয়তো আছে, কিন্তু মানুষের মনের রাজ্যে, স্নেহ-প্রীতির রাজ্যে তাদের স্থান নেই। শ্রদ্ধা সম্মান প্রেমের রাজ্যে তো—নেই—নেই—নেই।

জারজ কথাটা উচ্চারণ করুন—দেহ মন একটা অস্বস্তি অনুভব করবে। ঘৃণায় শিউরে উঠবেন। আমি অনুভব করছি জ্বালা। সমস্ত দেহে মনে নিষ্ঠুর একটা দাহ-যন্ত্রণা। মৃত্যু-প্রদাহের মত।

পৃথিবীর সকল দেশেই আমার মত যারা, তারা এ জ্বালা অনুভব করে। এ সর্বজনীন সত্য। আমার মা, সৎ সম্ভ্রান্ত পিতামাতার সন্তান, মাতামহ ছিলেন গেজেটেড অফিসার—লেখাপড়া শিখেছিলেন, গান জানতেন, শান্তিনিকেতনে নাকি পড়েছিলেন কিছুদিন। অন্নের অভাব ছিল না—বস্ত্রের না, দাসীর পরাধীনতায় আবদ্ধ ছিলেন না—তবে? আমার বাবা, তিনিও তাই। মায়ের সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখন শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে বেরিয়েছেন, বিলাত যাবেন, শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়—না, তাঁর তো দায়িত্ব নাই, মা-ই তাঁকে প্রতারণা করেছিলেন। আদালতে এই-ই আমার মায়ের স্বীকৃতি। শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় আদালতে দাঁড়িয়ে আমার মায়ের সাক্ষ্য নীরবে স্বীকার করেছেন। তাঁরা বিবাহ করেন নি, কিছুদিন লালসা-বশে, এক মাস—মিলিত হয়েছিলেন মাত্র। পশু এবং পশুনারীর মত। তারপর মা ফিরে আসেন পিতৃগৃহে—তিনি চলে যান বিলেত। আমার জন্মের পর তিনি বিলেত থেকেই অস্বীকার করেন—আমার জন্মের দায়িত্ব। কারণ আমার জন্মের মাস থেকে—আমার—।

যাক।

আমার বুকে সর্বনাশের আগুন জ্বলছে, সেই প্রদাহে আমি সকল সহ্যশক্তির সীমা অতিক্রম

করে আর্ত চিৎকারে বিলাপ করছি। কিন্তু এ বিলাপ অশুচি, এ বিলাপ কুৎসিত, এ বিলাপ পাপ। আমি জানি আপনি অন্তরে অন্তরে পীড়িত হবেন। হওয়াই স্বাভাবিক। এ আমার লেখা উচিত নয়। তবু লিখছি—আজ সপ্তাহ দুয়েক উন্মাদের মত বিনিদ্র রাত্রি জেগেছি—আপন মনে প্রলাপ বকেছি, চিঠি লিখে ছিঁড়েছি—আবার লিখেছি—আত্মহত্যা করতে গিয়ে মাকে খুঁজবার জন্যে আর আপনাকে এই পত্র লেখার জন্যে নিরস্ত হয়েছি। আমি এই সত্য জানতাম না বিপাশা দেবী। এক মাস আগে পর্যন্তও জানতাম না। বাল্যকাল থেকে যদি জানতাম তবে নিশ্চয় এ জ্বালা এ যন্ত্রণা অনুভব করতাম না। সংসারে এমন শিশু কম নয়; তাদের জন্য অনাথ আশ্রম আছে। আবার অনেক শিশু আছে—যারা সংসারে থেকেও জেনেছে—মনে মনে সয়ে গেছে তাদের। আজ এই নিষ্ঠুর মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে মনে হচ্ছে যে, হয়তো সত্যকাম বাল্যাবধি তার মায়ের ভর্তৃহীন সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলেই এই সত্যের আভাস পেয়েছিল—মনে মনে এটা সহ্য হয়েছিল—তার উপর অবশ্যই তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ সত্যকাম, তাই বলাটাও সহজ হয়েছিল। জীবনে মর্মদাহী কোন যন্ত্রণা তার আসে নি।

এ সত্য আমি জানতাম না। জানলে হয় আপনার অন্তরঙ্গ হতে চাইতাম না অথবা আপনার অমৃতের মত মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনে মৃত্যুর মত বিষের জ্বালা সঞ্চারিত করে—পৈশাচিক উল্লাসে উল্লসিত হতাম। আমি জানতাম না—তাই বোধহয় সেই পাপ পাশব সত্তার জাগরণ আমার মধ্যে হয় নি। সত্তারও জাগরণ আছে। শক্তির মত। লড়াইয়ে না নামলে যেমন শক্তির জাগরণ হয় না, তেমনিই বোধহয় এরও জাগরণ হয় নি। আমি সতী ভদ্রনারীর সন্তান—সৎ উচ্চশিক্ষিত মানুষ আমার জন্মদাতা—এই বিশ্বাসের শৃঙ্খলে বাঁধা নররক্ত-পিপাসু শ্বাপদ-শিশুর মত শৈশব থেকে মানুষের শিশুর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে খেলা করেছি—মানুষের ধর্মে। আজ যেদিন থেকে জেনেছি—সেদিন থেকে চকিতে চকিতে যেন এর জাগরণের চমক অনুভব করব কল্পনা করছি। তার আগেই চিঠি লিখছি এবং তার আগেই আমার এ পাপ জীবন শক্তিকে—। থাক, পরে অবশ্য সে সংবাদ পাবেন।

আমি জানতাম আমার জনক পবিত্র—আমি পবিত্র—এই পবিত্র মানুষের সমাজকে শুধু আমার কর্ম দিয়ে নয়, পবিত্রতা দিয়ে সমৃদ্ধ করে সার্থক হব। আপনার সঙ্গে দেখা হল। মনে হল মূর্তিমতী পবিত্রতা আপনি। আপনার কাহিনী শুনলাম—মহাদুর্যোগের মধ্যে পাপের ভয়ঙ্কর আক্রমণকে প্রতিহত করে অন্ধকারের মধ্যে অকম্পিত আলোক-শিখার মত আপনি পার হয়ে এসেছেন। আপনাদের বংশ আপনার এই রূপের আকস্মিক আবির্ভাবের এবং তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে সাধ হয়েছিল—আপনার সঙ্গে জীবনকে যুক্ত করব। এতে এতটুকু কোন মলিনতা ছিল না, কলুষ ছিল না। আপনি শুচিশুভ্র, তা থাকলে আপনি নিশ্চয় অনুভব করতেন।

আপনি জানেন—আমার দাদামশাই মামাদের বঞ্চিত করে আমাকে সব উইল করে দিয়েছিলেন। উইলটা নিতান্তই একটা ছুতো। কারণ, দেবার মত তো কিছু ছিল না। ইনসিওরেন্সের টাকার অবশিষ্ট—সে পেয়েছিলেন দিদিমা। সেটাও উইলে ছিল। থাকবার মধ্যে তার

দেশ হুগলী জেলায় ছিল—একটা সরীকানি দেবত্রে অংশ। সামান্য। দেবসেবা চালাতে হত। তার জন্য ছিল কিছু এজমালী, যার বছরে আয় ছিল দাদামশায়ের অংশে তিনশো টাকা। দেবসেবায় তিনি কিছু দিতেনও না, নিতেনও না। সরীকদের সঙ্গে ওইটেই ব্যবস্থা ছিল। ওটাই তিনি আমাকে উইল করে দিয়েছিলেন—মামাদের বঞ্চিত করে। উইল রেজেষ্ট্রী করে গিয়েছিলেন। আমাকে কিছু করতে হয় নি। আমি শুধু হেসেছিলাম। কারণ শূন্য দান আর শূন্য গ্রহণ, এতে হাসি ছাড়া আর কি আছে। মামাদের নিষ্ঠুর কথায় কেঁদেছিলাম। জানি না আপনাকে বলেছি কি না সে কথা। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁরা যখন কাশী এসেছিলেন বাপের শ্রাদ্ধ করতে, তখন তাঁদের অশৌচ অবস্থায় আমি জল দিয়েছিলাম, কিন্তু সে জল ফেলে দিয়ে তাঁরা আমাকে বলেছিলেন—পাপ কোথাকার! এ দুটোই সেদিন আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু ওই দাদামশাই শূন্যোপম সম্পদ আমাকে উইল করে দিয়ে আমার জন্ম বৈধ করতে চেয়েছিলেন দৌহিত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে—তা সেদিন বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, এটার মধ্যে আছে পুত্রদের প্রতি অপমান মাত্র। সুতরাং ও নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। দেবসেবায় টাকা খরচ হয় সেই পর্যন্ত। কোনদিন কোন খোঁজও করি নি।

মাস দেড়েক কি প্রায় মাস দুয়েক আগে হঠাৎ একটা নোটিশ এল। সেটেলমেণ্ট বিভাগের নোটিশ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে—জমিদারী থাকবে না, তার আগে জরীপ হচ্ছে। জমিদারী রাষ্ট্রসম্পত্তি হবে। জমিদারেরা ক্ষতিপূরণ পাবেন। তিনশো টাকা আয়—সেখানে ছ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবার কথা। আমি সরীকদেরই লিখলাম—আপনারা চিরকাল সব করে আসছেন, আপনারাই করবেন। লেখাবেন আমার নাম। নির্ভর আপনাদের উপরেই করলাম! কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিলাম। কারণ সেটেলমেণ্ট বিভাগের দুর্নীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় অনেক প্রশ্নোত্তর হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে চিঠি পেলাম, আমার মামারা আপত্তি দিয়েছেন—সম্পত্তির মালিক তাঁরা। দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় নয়।

মনে মনে হেসেছিলাম। বাৎসরিক তিনশো টাকা আয় এবং তিনশো টাকা ব্যয় যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ এর উপর কোন দাবী তাঁদের ছিল না। এবার নগদ মূল্য ছ হাজার। দেবতাদের ক্লেম দেবতারা দেখবেন—সেবাইতরাই টাকাটা যখন হাতে পাবেন তখন মামারা আর উদাসীন থাকতে পারেন নি। আমার লোভ ছিল না। ঠিকানা জানতাম না, না হলে লিখতাম—আমি কোন দাবী করব না, আপনারাই নেবেন টাকা।

হঠাৎ এমনই সময় মামারা সত্যকে উলঙ্গ করে আমার সামনে ধরলেন। রেজেষ্ট্রী চিঠি এল। হাসতে হাসতেই খুলেছিলাম। কিন্তু মুহূর্তে হাসি ফুরিয়ে গেল, দিনের আলো যেন নিভে গেল, বায়ুস্তর শ্বাসরোধী হল। পৃথিবীর শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। ওঃ, মনে হল, মাথায় আমার বজ্রাঘাত হয়েছে। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, আমিও বর্ণনা করতে পারব না সেই ক্ষণটুকু!

চিঠি নয়—আমার মৃত্যু-পরোয়ানা।

দিব্যেন্দু, তুমি আমাদের সহোদরা লাবণ্যপ্রভার গর্ভজাত পুত্র; কিন্তু বৈধ সন্তান নও, তুমি

তাহার অবৈধ সন্তান। বাবা এবং মা তাঁহাদের অন্ধস্নেহে তোমাকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের সহিত সংস্রব রাখি নাই। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার তিনি তোমাকে দিয়া গেলেও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না।

তুমি সকল বিষয় অবগত আছ কিনা জানি না। বাবা-মা এ বিষয়ে বরাবরই সমস্ত চাপা দিয়া আসিয়াছেন। তোমার কাছেও চাপা রাখিয়া থাকিতে পারেন। লাবণ্যের প্রতি অন্ধ স্নেহে তাহার সকল উচ্ছৃঙ্খলতা এবং পাপের হেতু তাঁহারাই। সুতরাং তুমি না জানিলেও না জানিতে পার। কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণ প্রয়োগ সবই আছে।

তোমার বাবা শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় তোমার জন্মের পর বিলাত হইতে যে পত্র লেখে সে পত্র আমাদের কাছে আছে। তাহাতে সে তোমার পিতৃত্ব অস্বীকার করিয়াছে।

তাহার পর এলাহাবাদ কোর্টে—১৯৩৫ সালে মিসেস এলিস চ্যাটার্জির সঙ্গে শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের যে প্রতারণার ও ডাইভোর্সের মামলা হয়, তাহাতে তোমার মা ইহা স্বীকার করিয়াছেন—তাহার নথিপত্রও আমাদের কাছে আছে। তিনিও সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। এখন এই সকল প্রমাণ প্রয়োগ সেটেলমেণ্ট আদালতে উপস্থিত করিয়া বা অন্য আদালতে উপস্থিত করিয়া আমাদের বংশের তোমার মায়ের, বিশেষ করিয়া তোমার মুখে প্রকাশ্যভাবে কলঙ্ক লেপন করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। কিন্তু তুমি বাধ্য করিলে অবশ্যই আমরা বাধ্য হইব। ইহা জানিয়া যাহা অভিপ্রায় আমাদের জানাইবে। অর্থাৎ তোমাকে নিজে হইতে স্বীকার করিয়া দরখাস্ত করিতে বলিতেছি—সেটেলমেণ্ট আদালতে যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তোমার মাতুলেরা। তুমি নও। ইতি—

মনে পড়ছে বিপাশা দেবী, স্পষ্ট এই মুহূর্তটা মনে পড়ছে। ফ্যাক্টরীতে ভোঁ বাজবার সময়। মাইথনের চারিপাশে কলিয়ারীতে ফায়ার ব্রিক্স ফ্যাক্টরীতে ভোঁ বাজতে লেগেছিল। মনে হয়েছিল হো—হো—শব্দ করে তারা দুনিয়ার সমাজকে ডাকছে। শোন—হো—।

আমি পাগলের মত চিৎকার করে উঠেছিলাম—না-না। আমার মনে আছে। নিজের ছোট ঘরটার মধ্যে ঘটেছিল সবটা, নইলে সহকর্মীরা সচকিত এবং বিস্মিত হতেন। শুধু বেয়ারাটা ছুটে এসেছিল। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আমি তাকে ইঙ্গিতে চলে যেতে বলেছিলাম।

* * *

বিপাশা দেবী, চোরের সন্তান—খুনীর সন্তান—এমন কি অক্ষম মানুষের সন্তান নিজের যোগ্যতার যত উচ্চ বেদীতেই দাঁড়িয়ে থাক—পিতাকে যখন স্মরণ করে তখন লজ্জা হয়, মাথা আপনি নীচু হয়ে আসে—তাও যদি না আসে তবে চিত্ত অপ্রসন্ন হয়, এ সত্য নিঃসন্দেহ। কিন্তু মা যেখানে নির্দোষ—সেই তার পুণ্যের আধার সান্ত্বনার আশ্রয়। সেই মুহূর্তেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন? আমার মাতা পিতা দুজনেই মনুষ্যত্বকে খোলসের মত পরিত্যাগ করে শিলুট ছবির মত সেই ঘরখানার দুই কোণে দাঁড়িয়ে কদর্য হাস্য করে উঠেছিল। সভয়ে আমি চোখ মুদেছিলাম।

দীর্ঘক্ষণ—বোধহয় ঘণ্টাখানেক পর ভেবেছিলাম মাইথন ড্যামের উপর থেকে রাত্রির অন্ধকারে

গলায় পাথর বেঁধে ঝাঁপ খাব।

মাথা ধুয়ে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে হঠাৎ মনে হয়েছিল—মামারা যে সত্য বলছে তার প্রমাণ কি? এদের তো জানি। নিজেদের মায়ের সঙ্গে এদের ব্যবহার দেখেছি। সম্পত্তি সম্পদ কিছু ছিল না বলে মাতৃশ্রাদ্ধ করে নি। সেদিন সেই সম্পত্তির মূল্য ছিল না বলে—সেদিন এ সত্যের প্রকাশ হওয়া উচিত বলে মনে করে নি। আজ বিচিত্র ভাবে এর মূল্য ছ'হাজার টাকায় পরিণত হয়েছে বলে—এই সত্যকে প্রকাশ করতে চান। এঁদের বিশ্বাস কি?

মন—আশাকে আঁকড়ে ধরে কল্পনা শুরু করলে। সে কত কল্পনা শুরু করলে। সে কত কল্পনা! কল্পনায় মামাদের নিষ্ঠুর অপমান করলাম। তারা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন—ক্ষমা করো দিব্যেন্দু! ক্ষমা করো। যদি ভয়ে ওটা ছেড়ে দাও—তাই এমন মিথ্যা লিখেছিলাম। আমাদের অনেক অভাব। আমি কল্পনা করলাম—আদালতে আমিই থাকব এর উত্তরাধিকারী। তবে এ অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। দিয়ে দেবো তোমাদের।

ছোটমামা, যিনি তেল কোম্পানিতে কাজ করতেন—তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন। চিঠিতে বাসার ঠিকানা ছিল তাঁরই।

টেনে নিলাম একখানা কাগজ। ছুটির দরখাস্ত লিখলাম। পারিবারিক গুরুতর আকস্মিক প্রয়োজনে আমি ছুটি চাই।

দরখাস্তখানা সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে দিয়েই আমি বললাম—আমার না গিয়ে উপায় নেই। আমি যাচ্ছি। এই আধঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন। এই ট্রেনেই আমি যাব।

চলে এসে—আমি একটা ছোট ব্যাগে জিনিসপত্র এবং যা টাকা ছিল তাই নিয়ে স্কুটারে চেপে চলে গেলাম, ট্রেন ধরতে পারি নি। আসানসোলে ট্রেন ধরেছিলাম। স্কুটারখানা আসানসোল স্টেশনে একজন পরিচিত কর্মচারীর কাছে রেখে দিলাম।

ভোরবেলা হাওড়া পৌঁছেছিলাম।

স্টেশনেই হাতমুখ ধুয়ে সরাসরি গিয়ে উঠেছিলাম মামার ঠিকানায়। তিনি আমাকে তাঁর প্রথম যৌবনে দেখেছিলেন। তখন কৈশোর সবে অতিক্রম করছি। তার সঙ্গে এখনকার আমার আকারের, রূপের তফাৎ হয়েছে। তার উপর আমার চোখে মুখে, অন্তরের বহ্নিদাহের ছাপ ফুটে উঠেছে। আমার কালো মুখে চোখের শুভ্রাচ্ছদে রক্তের আভাস ফুটে উঠেছে। দরজা খুলে আমাকে দেখেই তিনি ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষন নির্বাক হয়ে। আমি বলেছিলাম—আমি দিব্যেন্দু! তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ।

আমি সরাসরি বলেছিলাম—কি প্রমাণ আপনাদের আছে, দেখতে এসেছি। যদি সত্য হয়—প্রমাণ পাই, তা হলে যা বলেছেন—লিখে দিয়ে চলে যাব। না পেলে এই নিষ্ঠুর মিথ্যার শাস্তি আমি নিজের হাতে দিয়ে যাব।

মাথার মধ্যে যে আগুন জলছিল, তার উদ্গীরণ সেই মুহূর্তে চেপে রাখা—আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। আমি বলেছিলাম—আপনাদের রক্তের ঋণ আমি আজ শোধ করব। আমার মা যদি

নির্দোষ হন, যদি অভিযোগ মিথ্যে হয়, তবে—তবে আপনাদের খুন করে ফাঁসি যাব। যদি অভিযোগ সত্য হয়, যদি আমার মা—। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম, আত্ম-হত্যা করে এ রক্ত-ঋণ শোধ করব।

মামা নিজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এবং প্রকৃতিতেও নিষ্ঠুর নির্মম তিনি, সেই হেতুই বোধহয় অবিচলিত থাকতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন—বস। প্রমাণ দেব বৈকি। প্রমাণ না থাকলে—এতবড় অভিযোগ কি কেউ নিজের সহোদরার উপর আনতে পারে? এ নিয়েই আমাদের সঙ্গে বাবা-মায়ের বিরোধ সেই গোড়া থেকে। বস।

—না। বসতে আমি আসি নি।

—বসতে একটু হবে। কারণ প্রমাণগুলি দেখতে হবে। বস। বলে আলমারি খুলে একটি পরিষ্কার কাপড়ে বাঁধা কতকগুলি কাগজ বের করেছিলেন। একটি দপ্তর। দপ্তর খুলে আদালতের ছাপ মারা আদালত-সম্মত স্ট্যাম্প কাগজে টাইপ-করা একটি নথি বের করে আমার হাতে দিয়ে-ছিলেন। বলেছিলেন—ছিঁড়ো না। অবশ্য আরও কপি একটা আছে দাদার কাছে।

আমি দেখছিলাম নথিটা। মাথার মধ্যে যে আগুন জ্বলছিল—সেও যেন ক্ষণিকের জন্য স্থির বা স্তব্ধ হয়েছে।

এলাহাবাদ কোর্টের—১৯৩৫ সালের ফৌজদারী আদালতের নথি। মিসেস এলিস চ্যাটার্জি বনাম শরদিন্দু চ্যাটার্জি।

মামা বললেন—ওটা রাখো। আগে এটা দেখো। শরদিন্দুর পত্র। সে বিলেত থেকে লিখেছিল। পত্রের ফটোস্টাট কপি।

তারও আগে—শোন—ঘটনা যা ঘটেছিল। আমাদের বিশ্বাস তুমি জান না। বাবা বা মা তোমাকে বলেন নি। বলা সম্ভবপর ছিল না। জানলে তুমিও এমনভাবে রুদ্র মূর্তিতে এসে খুন করব বা খুন হব বলে ব্র্যাভাডো করতে না।

লাবণ্য আমাদের দুই ভাইয়ের অনেক দিন পর জন্মেছিল। বোধহয় ছ'বছর পর। বাবা ছিলেন—প্রথম দিকটায় সত্যিকারের এলিট। আমাদের দুই ভাইকে তৈরী করেছিলেন সেই ভাবে। সাহেবদের ইস্কুলে পড়েছি, সেই শিক্ষায় বড় হয়েছি। একসময় লোকেরা নিন্দে করত। অনেকে বলত ক্রীশ্চান। অনেকে বলত—ব্রাহ্ম। মা অনেক ঝড় তুলেছেন—তুলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বাবাকে টলাতে পারেন নি। এবং আমরাও ছিলাম বাবার ডান হাত বাঁ হাতের মত। তারপর বাবা ট্রান্সফার হলেন বীরভূম। বোলপুর। লাবণ্য তখন আট বছরের। দেখতে সুশ্রী ছিল। অত্যন্ত সুশ্রী। সুন্দরী বলতো লোকে। কিন্তু—? থাক—। বাবা পড়লেন শান্তিনিকেতনের ইনফ্লুয়েন্সে। রবীন্দ্রনাথের তখন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তার উপর বীরভূম বামাক্ষ্যাপার দেশ। বোলপুরের কাছেই কঙ্কালীতলা। বাবা ওই সব ইনফ্লুয়েন্সে পড়ে পাল্টালেন। খাওয়ায়-দাওয়ায় চাল-চলনে। প্রাচীন ভারত-বিধি-বিধান চালাবেন। উই ফট। আমরা লড়াই করেছিলাম। কিন্তু কি করব। আমরা ছিলাম তাঁর মুখাপেক্ষী। রোজগার তাঁর। বীরভূমেই বাবা ছিলেন আট বছর। নাইন্‌টিন টুয়েন্টি থেকে নাইন্‌টিন টুয়েন্টিসেভেন। বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট। লাবণ্যকে পড়তে দিয়েছিলেন

শান্তিনিকেতনে। সে হয়ে উঠল বিচিত্র জীব। রোমান্টিক এবং উচ্ছৃঙ্খল। অবশ্য আমি উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য শান্তিনিকেতনের শিক্ষাকে দায়ী করি নে—এটা ছিল তার চরিত্রে। বাবা-মায়ের আদরে তা প্রশ্রয় পেয়েছিল। ইয়েস। প্রশ্রয় পেয়েছিল। তার উপর বাবারও হল ডিগ্রিতে ডিগ্রিতে ধর্মজগতে প্রমোশন। তিনি হলেন কীর্তন-ভক্ত। বৈষ্ণবপ্রেম। আমার মাদারের জয়-জয়কার। লাবণ্য গান গাইত বড় ভাল। তাকে বাবা কীর্তন শেখাতে লাগলেন। গানের মাস্টার রাখলেন। আমরা আপত্তি করেছিলাম। এ কি করছেন? বাবা বলতেন—অয়েল ইওর ওন মেশিন বয়েজ। তাঁর সঙ্গে ঝগড়া তখন আমাদের শুরু হয়েছে। আমরা বিয়ে করেছি। চাকরি করছি। আমাদের দুই ভাই-ই ইংরেজী মতে চলি। পছন্দ করেই বিয়ে করেছিলাম। ঝগড়াটা আমাদের সেখান থেকেই শুরু। অবশ্য লাবণ্যের শিক্ষা নিয়ে ঝগড়া তার আগে থেকেই ছিল। এবং লাবণ্যের চালচলন এবং বাবা-মার তাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া দুটোতেই আমাদের খুব আপত্তি ছিল। মা বলতেন—বোনকে তোমরা হিংসে করি। বাবা বলতেন—পুরুষরা বেশী স্বার্থপর হয়, কিন্তু তোমাদের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তোমাদের অধিকারের সীমা নির্দেশ করে দিতে আমি বাধ্য হচ্ছি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দিচ্ছি। তারপর আমাদের বিয়ের পর আমরা পৃথকই হয়ে গেলাম কার্যত।

এরপর—তখন নাইনটিন টোয়েন্টিনাইন, নভেম্বর, বাবা তখন বছর দুয়েক এসেছেন কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। হঠাৎ চিঠি পেলাম—লাবণ্যের বিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে ভাল পাত্র পাওয়া গেছে। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে—শরদিন্দু চ্যাটার্জী—ই-আই-আর-এ চাকরি করছিল। এখন সুযোগ পেয়েছে, বিলেতে যাবে বড় ডিগ্রীর জন্য। বাপ মা নেই। বাবার পাশের বাসাতে তার এক বন্ধুর বাড়ি আসত। লাবণ্যের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নিজে এসে আলাপ করে। তারপর আসা-যাওয়া করেছে। এখন নিজেই সে উপযাচক হয়ে বিয়ে করতে চেয়েছে। বিয়ের পরেই সে বিলেত চলে যাবে। ফিরে আসা পর্যন্ত লাবণ্য বাবার কাছেই থাকবে।

বিয়েতে আমরা অবশ্যই এসেছিলাম। কিন্তু পাত্রটিকে আমরা দুই ভাই-ই পছন্দ করতে পারি নি। বিয়ের পর কয়েকদিনেই আলাপে আমরা বুঝেছিলাম—এ ছেলে একটা অ্যাডভেঞ্চারার। এক ধরনের রসিক নাক-উঁচু, বিদগ্ধ লোক আছে যারা সংসারে সুখ-দুঃখ-শোক, মানুষের পুত্রশোক নিয়েও রসিকতা করে—সেই ধরনের লোক। সকল লোককে আঘাত করে। এ তাই। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের দুই ভাইকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অস্থির করে তুলেছিল। দাদাকে বলত—রেল-দা, আমাকে বলত—তেল-দা! আমরা সহ্যই করেছিলাম। তবে বাবাকে বলে এসেছিলাম—ভাল করেন নি এ বিবাহ দিয়ে।

বাবা হেসে বলেছিলেন—কি ব্যাপার, রেলদা-তেলদা বলাতে চটে গেছ!

লাবণ্য দাঁড়িয়েছিল—সে হেসেছিল। নির্লজ্জের মত হাসি।

আমরা চলে এসেছিলাম। শরদিন্দু এক মাস পরেই বিলেত গিয়েছিল। এক মাস লাবণ্য শরদিন্দুর কোয়ার্টারে ছিল। তাকে সে রেখে দিয়ে গেল বাবার বাসায়।

তারপর মাস কয়েক পর আমি এসেছিলাম কলকাতায়, তখন শুনলাম লাবণ্য সন্তান-সম্ভবা।

বাবাকে একটু চিন্তাগ্রস্ত দেখলাম। শরদিন্দু চিঠিপত্রে এরই মধ্যে যেন বড় অমনোযোগী হয়েছে। তখন প্রায় দুটো মেল পেরিয়ে গেছে! লাবণ্য বিষণ্ন। বাবা টেলিগ্রাম করেছেন লণ্ডনে শরদিন্দুকে —কেমন আছ?

এরপর আট মাসের মাসে তোমার জন্ম।

বিলেতে চিঠি লিখলেন বাবা। শরদিন্দু তখন চিঠি প্রায় লেখে না। উত্তরে শরদিন্দুর এই পত্র এল।

"আপনারা আমাকে প্রতারণা করিয়া বিবাহ দিয়াছেন। লাবণ্য বিবাহের সময়েই সন্তান-সম্ভবা ছিল। হিসাব করিয়া দেখিলে দেখিবেন—বিবাহের তারিখ হইতে সন্তানের জন্ম-কাল পর্যন্ত পূর্ণ আট মাসও নয়। এ সন্তানের পিতৃত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি।"

এই দেখ তার ফটোস্টাট কপি।

তারপর এই পত্রের কপি দেখ। শরদিন্দু লিখেছে—লাবণ্যর সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক নাই।

বাবা লিখেছিলেন—আর পত্র তুমি লিখিয়ো না। আজ হইতে তুমি আমাদের কাছে মৃত। আমরা জানিব—লাবণ্য বিধবা।

লাবণ্য তাকে কোন চিঠি দেয় নি, সেও তাকে কোন চিঠি দেয় নি। সংবাদটা বাবা দেন নি, কিন্তু তিনি পেনসনের সময় হওয়ার আগেই রিটায়ার করে কলকাতা ছেড়ে কাশী যাচ্ছেন শুনে আমি দাদা দুজনেই গিয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম এর জন্য নালিশ করতে। কিন্তু লাবণ্য কঠিন পণ ধরেছিল—না।

বাবা চুপ করেই ছিলেন। শুধু বলেছিলেন—দেখ, যদি রাজা হয়। আমি হার মেনেছি।

আমরা বারবার প্রশ্ন করেছিলাম - কেন? কেন না বলছিস। তার সেই এক উত্তর—না। অর্থহীন 'না'।

কেমন যেন? বললাম—নালিশ না করলে ভবিষ্যতে কি হবে জানিস?

—না।

ভাবলাম, জানে না বলেই বলছে—না।' বুঝিয়ে বলেছিলাম—না হলে ওর কথাটাই অভি-যোগটাই মেনে নেওয়া হবে। মানে—

তার উত্তর—না। আর কান্না তখন ঠিক বুঝি নি—বুঝি নি যে সে নিজে অপরাধী। ক্রাইম তার কিন্তু রেসপনসিবিলিটি আমার বাবা-মার। মেয়ের দিকে নজর রাখেন নি। কলকাতার পাড়ায় কানাকানি চলছে। বাবা রিটায়ার করে চলে গেলেন কাশী লাবণ্যকে নিয়ে। আমাদের সঙ্গে বাবা-মায়ের নিষ্ঠুর কলহ হল। সেই সময় এই সব চিঠিগুলি আমাদের হাতে এসেছিল, সঙ্গেও চলে এসেছিল।

তারপর—এই প্রমাণ। এই এলাহাবাদ কোর্টের নথি।

বাবা প্রচার করেছিলেন—মেয়ে বিধবা। স্বামী বিলেতে পড়তে গিয়ে মারা গেছে। লাবণ্য ভজন, কীর্তন আর পুজা নিয়ে রি-অ্যাকশনারীর যে জীবন—তাই-ই পালন করত। বাবা-মা

অবশ্যই খুব গৌরব বোধ করতেন। কিন্তু ভুল ভাঙল।

শরদিন্দু বিলেতে এলিস বলে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে দেশে ফিরল। রেলেই বড় চাকরী পেয়েছিল। সে পুরো সাহেব তখন। কিন্তু বাংলা ভাষার উপর ঝোঁকটা ছিল। সে ভুল করলে। এলিসকে বাংলা শেখালে, এবং একদিন এলিস পেলে কতকগুলি চিঠি। চিঠিগুলি থেকে গিয়েছিল কোন-কিছুর তলায়। পড়ে সে জানতে পারলে—এখান থেকে যাবার আগে শরদিন্দু বিবাহ করেছিল। ইংরেজ মেয়ে—ক্রীশ্চান, সে জ্বলে উঠল। তাহলে তো তার বিবাহ অসিদ্ধ। সে তো তাহলে স্ত্রী নয়, সে তো রক্ষিতা। উপপত্নী! সে চ্যালেঞ্জ করলে শরদিন্দুকে। শরদিন্দু অস্বীকার করলে। শুধু তাই নয় সে তখন খুব উদ্ধত, প্রচুর মদ্যপান করে। হি স্ল্যাপ্‌ড্‌ অন হার ফেস। এলিস ক্ষেপে গেল। বিলেতে তার করে নিজের বাবাকে আনালে। কলকাতায় এন-কোয়ারী করলে। বাবাকে পায় নি—তিনি বেনারসে—দাদা কলকাতায়, তার সঙ্গে দেখা করলে। এবং কেস করলে এলাহাবাদ কোর্টে। ক্রিমিন্যাল কেস। চিটিং অ্যাডাল্টি— তার সঙ্গে ডাইভোর্স।

শরদিন্দু জবাব দিলে—না। সব মিথ্যা। কারণ যে-বিবাহের কথা এলিস উত্থাপন করেছে তা অসিদ্ধ। কারণ এই কন্যা তখন গর্ভবতী ছিল। সেই হেতু হিন্দু ধর্মানুযায়ী এ বিবাহ অসিদ্ধ এবং নিছক একটি প্রতারণা মাত্র। এবং কন্যা পূর্বে বাপ-মায়ের অজ্ঞাতসারে বিবাহ করেছিল। সে কথা সে স্বীকার করেছিল তার কাছে।

এলিস দাদাকে সাক্ষী মেনেছিল। দাদা সাক্ষী দিয়েছিলেন। বিবাহের তারিখ—তোমার জন্ম তারিখ দাখিল করেছিল। এবং বাবার পত্র দাখিল করেছিল। এলিস লাবণ্যকেও সাক্ষী মেনে-ছিল।

শরদিন্দুর জবাবে বাবা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। অবশ্য কাশীর সমাজে কথাটা গোপন রাখা হয়েছিল। দাদা এসে বাবাকে এবং লাবণ্যকে বলেন—সাক্ষী দিতেই হবে লাবণ্যকে। লাবণ্য সাক্ষী না দিলে—কোর্ট বিশ্বাস করবে শরদিন্দুর কথাই সত্য। লাবণ্যকে রাজী হতে হয়েছিল। উপায় ছিল না। বাবা-মা তীর্থে যাচ্ছি বলে, গিয়েছিলেন এলাহাবাদ। কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে লাবণ্য কি সাক্ষী দিয়েছিল—জান? সেটা নথিতেই আছে পড়।

নথি খুলে তলায় লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া অংশটা তিনি দেখিয়ে দিলেন। আমি পড়লাম। মামা মুখে মুখে বলে গেলেন—ওটা তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

হাঁ, ওঁর সঙ্গে যে বিবাহ সে বিবাহ অসিদ্ধই বটে। আড়াই মাস আগে আমি একজনকে গোপনে বিবাহ করেছিলাম। সন্তান তার। এঁর সঙ্গে বিবাহের পর ওঁর বাসায়—সে কথা প্রকাশ পায়। আমি স্বীকার করেছিলাম। এবং বলেছিলাম অন্তত রক্ষিতার অধিকারে এ ক'টা দিন আমাকে থাকতে দিন। আপনি বিলেত চলে যাবেন। আমি তখন বাপের বাড়িতে সব কথা খুলে বলে ব্যবস্থা করব। অথবা গৃহত্যাগ করে চলে যাব। কিন্তু তা পারি নি। উনি বিলেত থেকে পত্র দিলে সেই কারণেই আমি কোন কথা বলি নি। ওঁকেও পত্র লিখি নি।

উকিল প্রশ্ন করেছিল—যাঁর সঙ্গে সত্য বিবাহ আপনার হয়েছিল তাঁর নাম কি? উত্তর দিয়েছিল লাবণ্য—তিনি উনি নন। তার নাম আজও আমি প্রকাশ করতে পারব না।

বাবা দাদা মাথা হেঁট করে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। টিটকিরি পড়েছিল কোর্টে। এরই মধ্যে লাবণ্য বেরিয়ে এসেছিল।

তাকে আর পাওয়া যায় নি। শুধু এইটুক জানা গিয়েছিল, বেরিয়েই একখানা টাঙা করে সে চলে গিয়েছিল।

বাবা আর খোঁজ করেন নি। বলেছিলেন—যাক। ও আমার কাছে মৃত। কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। দাদা বলেছিলেন অরফ্যানেজে দিতে, কিন্তু মা দেন নি।

শরদিন্দু খালাস পেয়েছিল কিন্তু ডাইভোর্স আটকায় নি এরপর। ডাইভোর্স হয়েছিল।

দেখ, ওর মধ্যে সবই আছে। দলিল মিথ্যে বলে না।

সত্য নিষ্ঠুর। হয়ত নিষ্ঠুরতম সত্য।

আমাদের বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে—লাবণ্য টাঙা করে গিয়েছিল এলাহাবাদের বাঈ-পল্লীর দিকে। এর কিছুদিন পরই এলাহাবাদে এক বাঈজীর খুব নামডাক হয়। সে লাবণ্য বলেই মনে করি।

* * *

দলিল মিথ্যা বলে না। তার সত্য আমার জন্য বহ্নিজ্বালা সঞ্চয় করে রেখেছিল। আমার এই সাতাশ বছরের জীবনের বুকে চিতা জেলে দিয়ে গেল। পত্র পেয়ে অবধি তখন পর্যন্ত চিতা সাজাচ্ছিলাম, এবার তাতে আগুন লেগে গেল—ওই আগুন। ওই দলিলে যেন সঞ্চিত ছিল সেই আগুন—যে আগুন বান্ধবহীন, গোত্রহীন, অপঘাতে মৃত মানুষকে চিতায় চড়িয়ে খড়ের নুড়ো জেলে মুখে দিয়ে চিতায় জেলে দেয়। এতকাল ধরে বিপাশা দেবী পিতৃমাতৃহীন আমি—মা বাপের স্নেহ পাই নি, চোখে দেখি নি, কিন্তু তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রেখে জগতে আনন্দ-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ নিজে যেচে গ্রহণ করে জীবনকে যথাসাধ্য আনন্দ আর সমারোহে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে চেয়েছি। নিজে জল ঢেলেছি নিজের জীবন-বৃক্ষে, নিজে গোড়া খুঁড়েছি, সার ঢেলেছি, বলেছি—ফুল ফোটাও, ফুল ফোটাও। ফুল নয় ফুলঝুরি; হাসি-হাসি-হাসি! কান্না নয়, দুঃখ নয়। ও পালা তোমার মা আর বাবার স্নেহ-বঞ্চনার শোধ হয়েছে—শেষ হয়েছে। আর নয়। তুমি হাস, তুমি নিজের শক্তিতে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন কর; সুখে আনন্দে নীল আকাশে শাখা মেল, প্রশাখা মেল, ফুল ফোটাও, গোড়া বেয়ে উঠুক লতা, জড়াক সর্বাঙ্গে, ফুটুক অজস্র ফুল।

এই আগুন লাগল সেই গাছে। এক মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গাছে পাতায় কাণ্ডে কি দাহ্য উপাদান ছিল, আগুনের স্পর্শমাত্র দাউ দাউ করে জ্বলল এবং পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিপাশা দেবী, বাবা এঞ্জিনীয়ার ছিলেন—তাই আমিও এঞ্জিনীয়ার হয়েছিলাম। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল।

এ বড় জ্বালা। এ বড় লজ্জা। এ বড় ঘৃণা।

মামাকে বললাম—বলুন, কী কাগজে কি সই করতে হবে?

মামা বললেন—তৈরী করে রেখেছি। উকীল ড্রাফট্ করে দিয়েছেন

বললাম—দিন, সই করে দি। কিন্তু একটি শর্ত

—কি ? বল ?

—এই সব প্রমাণগুলি আমাকে দিতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—তাই হবে। তবে দাদার কাছে যে কপি আছে সেটা আনতে হবে। তুমি পরশু এসে নিয়ে যাবে। আজ এগুলি নিয়ে যেতে পার।

—বেশ। বলে সই করে দিয়ে ওই কাগজগুলো স্যুটকেশে পুরে বেরিয়ে এলাম।

পথে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে মনে হল—ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ট্রামের তলায়। যাক, শেষ হয়ে যাক। দিতামও ঝাঁপ। কিন্তু ট্রামটা থেমে গেল, একখানা গাড়ি ডান দিক থেকে এসে তার সামনে চলতে শুরু করে দিলে। গাড়িটার সামনে কোথা থেকে এল একটা ছোট ছেলে। বেঁচে গেল—ড্রাইভার গাল দিলে। সে হেসে জিভ বের করে ভেংচি কেটে গেল।

মনে হল ছেলেটা ভেংচি ওকে কাটে নি। আমাকেই কেটেছে।

তারপর ডি-ভি-সি হেড কোয়ার্টারে গিয়ে রেজিগনেশন দিয়ে এলাম। উঠলাম—যে হোটেলে উঠতাম সে হোটেলে নয়। এসপ্ল্যানেডের আশে-পাশের হোটেলে। যেখানে প্রয়োজন হলে বারের পানীয়ের সান্ত্বনা মিলতে পারবে। বিশ্বাস করুন, জীবনে মদ আমি কখনও খাই নি। তবে শুনেছি নিদারুণ শোকে দুঃখে আঘাতে মদ খায়। একদিন মদ কিনেছিলাম। কিন্তু তার গন্ধ ভাল লাগে নি। মুখের কাছে তুলে ফেলে দিলাম।

রাত্রে মরব স্থির করলাম। তার আগে আপনাকে চিঠি লিখতে বসলাম। মনে হল—একটা জবাবদিহি আপনার কাছে দিতে আমাকে হবে। আমার শিক্ষা—আমার সংস্কৃতি সব কিছুর মূল্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—তবু যেন হৃদয়ের অংশ কিছুতেই পোড়ে নি। শবদাহের অভিজ্ঞতা আপনার নেই—থাকলে জানতেন একটু অংশ সহজে ছাই হয় না। একটা স্নায়ুর পিণ্ড অবশিষ্ট থেকে যায়। এ যেন তাই। এটা আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়ে থাকি। আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা আমার ওই স্নায়ুপিণ্ডের মত। ওটাকে আমার জীবনের এই কথার মৃত্তিকা দিয়ে মুড়ে পাঠাব আপনাকে—আপনি গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবেন। কিন্তু পরে ভাবলাম—কি হবে ?

ছিঁড়ে ফেললাম।

তারপর সারাটা দিন কাঁদলাম। সন্ধ্যায় আবার বসলাম চিঠি লিখতে। কিছুটা লিখে ছিঁড়ে দিলাম। পরের দিন চলে এলাম হাওড়া স্টেশন।

কোথায় যাব ?

টিকিট কাটলাম এলাহাবাদের। খুঁজব—আমার মাকে খুঁজব। শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্য কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর অপরাধ কি ? তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই বা কি !

এলাহাবাদে এসেছি আজ পঁচিশ দিন। মাকে খুঁজলাম। এলাহাবাদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। ভোরবেলা উঠে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত।

ভোরবেলা যেতাম—গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে। বসে থাকতাম। ফোর্টের দেওয়ালে হাতে লিখে চল্লিশ-পঞ্চাশখানা কাগজ সেঁটে দিয়েছি।

লাবণ্য দেবী, মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছি, কোন

মহিলা তা পড়েন কিনা। পড়ে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হয়।

বিপাশা দেবী, বেলা দুপুরে সেখান থেকে ফিরে পথে পথে ফিরেছি।

লিখতে ভুলেছি বিপাশা দেবী, মামার কাছ থেকে দুখানা ছবি পেয়েছিলাম। একটায় বিবাহ-সজ্জায় বাবা ও মা। অন্যটায় শুধু মা। বাবার না—শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মুখে কালি লেপে দেওয়া আছে। দিয়েছিলেন মামা। যাক—তার চেহারায় তো আমার প্রয়োজন নেই। রাগও বোধ হয় মামার অকারণ। কারণ সমস্ত কিছুর দায় তো আমার, আমার মায়ের। তাঁর যদি এতখানি সাহসই হল, তবে আমাকে তিনি প্রসবের পর কাশীর কোন কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন নি কেন? এই প্রশ্ন করবার জন্যই তাঁকে খুঁজছি। জানি না যদি ক্রোধ হয় তবে হয়তো মাতৃহত্যাই করব। কিন্তু কই আজও তো পেলাম না। রাত্রিতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত যে মহল্লায় গান-বাজনা হয় খুঁজেছি। সন্ধান করেছি 'বাঙালী বাঈজী' কেউ আছে কিনা? বাঙলা গান কেউ শোনাতে পারে কি না? কি নাম? কত বয়স? ছবি দেখিয়েছি—এর সঙ্গে কোন মিল আছে কি না? বাঙলা গান জানা বাঈ আছে। বাঙালীও আছে। কারুর সঙ্গে মেলে নি। তারা কেউ নয়। তাঁকে পাই নি।

কেউ বলে—লক্ষ্ণৌ খোঁজ কর। গানের সমাদর, রূপের সমাদর সেখানে।

কিন্তু অকস্মাৎ আমার ধৈর্য ভেঙে গেছে।

কি করব খুঁজে? কি হবে?

এই সংসারে যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় কুল-ধর্ম, শিক্ষা, জীবনের গৌরব, প্রশংসা সব বিসর্জন দিলে—তারা কি জবাব দেবে?

কল্পনা করেছি, দেখা পেয়েছি, প্রশ্ন করেছি—তুমি এ কাজ কেন করলে?

চোখে সুরমা, মুখে রঙ, ঠোঁটে রঙ, সুবিন্যস্ত কেশ কলাপের মধ্যে হয়তো কয়েকটি রূপোলী চুল—তিনি হেসে বলেছেন—এর জবাব নেই। হয় না। আমি তবু প্রশ্ন করছি—কেন হয় না? বল।

অকস্মাৎ তার চোখে অগ্নি-দীপ্তি খেলে গেল—তিনি বললেন—জানি না, জানি না, জানি না। তুমি চলে যাও।

আবার কল্পনা করেছি—দুটি জলের ধারা নেমে এল চোখের কোল থেকে। উদাস দৃষ্টিতে কুৎসিত ছবিতে ভরা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলেছেন—জানি না। বলতে পারব না। সুতরাং কি হবে খুঁজে আর? কিন্তু আমি? আমি কি করব? আজ পঁচিশ দিন ধরেই এই চিঠিটা একটু একটু করে লিখছি। আজ চিঠি শেষ করছি। কারণ ভবিষ্যতের কথা আমি স্থির করেছি। আপনাকে সবটা জানানো—বলেছি তো কোন যুক্তি থেকে নয়, শুধু হৃদয়ের তাড়নায় লিখছি। প্রেম নয়। প্রেমে আমার অধিকার নেই। শুধু আপনার কাছে আমি প্রতারক নই এই একটি কথা উপস্থিত করতে—সব কথা না লিখে উপায় ছিল না। তাই লিখলাম। শেষ আগেই করতে পারতাম। ওই মামার বাড়ির ঘটনার পর। কিন্তু তবু সেটাকে টেনে যাচ্ছিলাম কেন জানেন? নিত্য ব্যর্থ হয়ে ফিরে সেই কথা চিঠিতে জুড়ে যেন মনটা একটু সান্ত্বনা পেয়েছে। এবং মায়ের সঙ্গে দেখা হলে—তিনি কি বলেন—সেটাও আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম।

এইখানে শেষ করলাম। ভাবছি, যে জিন্দিগীতে আনন্দ নেই—সে জিন্দিগী সাচ্চা না ঝুটা?

আমাকে কি সব শুনে কেউ 'জিতা রহো' বলে আশীর্বাদ করবে ? আমার ভিতর থেকে কেউ যেন বলছে—মর যাও। তুম্ মর যাও। তুম্ মর যাও।

ইতি—হতভাগ্য দিব্যেন্দু

ঠিকানা নাই। শুধু রেজেস্ট্রী করা খামে প্রেরক ডি. চ্যাটার্জির নাম তলায় লেখা—কেয়ার অফ পোস্ট মাস্টার—

পৃথিবীটা কালো হয়ে গেছে। অর্থহীন হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে সে জানে না। কিন্তু কেমন হয়ে গেছে।

চিৎকার করে উঠল চুড়কি—পড়ে যেছ যি। হেই! হেই! হেই!

ধরে ফেলল সে বিপাশাকে।

আট

তিন দিন পর এলাহাবাদ স্টেশনে নামল বিপাশা। থাকতে সে পারে নি, ছুটে এসেছে। এ তার প্রেম, না প্রীতি, না মায়া, না মমতা, না স্নেহ সে তা বিশ্লেষণ করে নি। একটা দুর্নিবার আকর্ষণে আর দুরন্ত আশঙ্কায় সে ছুটে এসেছে। দিব্যেন্দুর পত্রের ওই শেষ লাইনটা—মর্ যাও। তুম্ মর্ যাও। তুম্ মর্ যাও।—এইটে যেন কোন মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর মানুষের আর্তনাদের মত তাকে আহ্বান করছে। গিয়ে তাকে কি বলবে, সে তা জানে না, বলতে পারে না। চিঠিতে তারিখ ছিল না, কিন্তু ডাকে দেওয়ার তারিখ বারো দিন আগে। সে কলকাতা চলে যাওয়ার পরই এসেছে। মিত্তির নিয়ে রেখেছিল। কদিন আগে বাইরে যাওয়ার সময় সে চুড়কিকে দিয়ে গেছে। বারো দিন!

সে যদি আজও বেঁচে থাকে এবং দেখা হয়—তবে তাকে সে কি বলবে জানে না। সে যদি প্রশ্ন করে—বলুন, বেঁচে থেকে কি করব ? তার উত্তরে সে কি বলবে, জানে না। তবু সে এসেছে। এমন একটি মানুষ, এমন একটি প্রাণ, তার এই মর্মান্তিক বেদনায় সে থাকতে পারে নি—ছুটে এসেছে। ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত সমস্ত কিছুর পিছনে ছিল একটি দুর্বার আবেগের ঠ্যালা। ট্রেনে উঠে ছিল শুধু উদ্বেগ। মর্মান্তিক উদ্বেগ। কি দেখবে গিয়ে ? কি দেখবে ? এলাহাবাদের যত কাছে এল ততই প্রশ্ন জাগল—কি বলবে ? স্থির করতে পারলে না কি বলবে। স্টেশনে নেমে প্যাসেঞ্জার-দের ভিড়ের সঙ্গে অনেকটা স্রোতে-ভাসা বস্তুর মত বেরিয়ে এল।

কুলিটা প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবে মেমসাহেব ?

—অ্যাঁ ? এ কথাও ভাবেনি। সে প্রশ্ন করলে—অ্যাঁ ?

—কাহা যাউঙ্গী ? হোটেল ?

—হ্যাঁ।

—টাঙ্গা না ট্যাক্সি ?

—ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিওয়ালা প্রশ্ন করলে—কোন্ হোটেল ?

বিপাশা বললে—পহেলে চলো প্রয়াগসঙ্গম ঘাট।

—সঙ্গম ঘাট ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওর পরে আসব হোটেলে। তোমার ট্যাক্সিতেই আসব।

দিব্যেন্দুর পত্রে ছিল সে ভোর বেলা থেকে এসে বসে থাকে এই সঙ্গম-তীর্থের ঘাটে। দেওয়ালে সে সেঁটে দিয়েছে, "লাবণ্য দেবী—মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে।" আজও যদি সে বেঁচে থাকে তো সেখানেই পাবে। মনে তার সংশয় নেই। বিরোধী যুক্তি ওঠেই নি। উঁকি মারতে চেয়েছিল। সুস্থ হয়ে কোন দূর দেশান্তরে গিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারে—যেখান পর্যন্ত এই পরিচয় পৌঁছবেই না। নিজের মনই তিরস্কার করেছিল—ছি—ছি—ছি!

ভোরবেলা সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। রাস্তায়-ঘাটে লোকজন কম। মধ্যে মধ্যে সতর্ক হয়ে রাস্তার লোকজনের দিকে দেখছিল বটে, কিন্তু চোখে যেন দৃষ্টি ছিল না, একটা আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন ছিল —মর্মান্তিক শোকের পর যেমন একটা আচ্ছন্নতা মানুষকে মগ্ন করে রেখে দেয়, ঠিক তেমনি। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মনে হচ্ছিল—ও কে ? বা, ও সে নয় ? পিছনের কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। না, সে নয়। প্রথম সচেতনতা এল সঙ্গম ঘাটের উপরে এসে। গাড়ি থেকে নেমেই গঙ্গার শুভ্র জলধারার দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল দিব্যেন্দুর নৃত্যনাট্যের কথা। গঙ্গার কি মহিমাই সে বর্ণনা করতে চেয়েছিল। সে তো তার বন্দনা! চোখে তার জল এল। এবার তাকালে সে সঙ্গমতীর্থের দিকে। নীল যমুনার জল আর শুভ্রধারা গঙ্গার জল পাশাপাশি চলেছে। যমুনা যদি নদ হত!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অগ্রসর হতে গিয়ে প্রথম মনে হল—কি বলবে সে ? আবার দাঁড়িয়ে গেল। তাই তো! গিয়ে কি বলবে ?

মুহূর্তে কথা মনে এসে গেল। পেয়েছে সে।

বলবে—তার হাতখানি ধরে বলবে—ওঠ! ফিরে চল!

চলতে লাগল সে। বলবার কথা পেয়েছে সে। সঙ্গে বল পেয়েছে।

কোথায় সে ? সে বলবে, অনেক কথা তার মনের মধ্যে যেন জমে উঠেছে, কথার পর কথা। সে বলবে—ওঠো। চল। না-থাক তোমার কুল-পরিচয়, পিতৃ-পরিচয়—তুমি হও নূতন বংশের প্রথম পুরুষ। তোমার পরিচয় তোমার কর্মে, তোমার কীর্তিতে, তোমার আচরণে। তুমি নূতন সত্যকাম। ওঠো।

হোক তোমার জন্ম অন্ধকার পঙ্ক-বাসরে—তুমি তা থেকে উঠেছ পঙ্কজের মত। তুমি কৃষ্ণ-কমল—

চলতে চলতেই সে মনে মনে আওড়াচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে মনে কথা গাঁথাও বন্ধ হল। দৃষ্টি পড়ল তার কোটের দেওয়ালের গায়ে। একখানা চৌকো কাগজ সাঁটা। তাতে বড় হরফে বাংলায় লেখা—"লাবণ্য দেবী! মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে।

দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী।"

ওই আর একটা। বোধহয় আর একটা। হ্যাঁ। ওই আরও আরও দূরে আর একটা। কিন্তু সে কই? সে? সেইখানে দাঁড়িয়েই সে তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে কোর্টের কোণের ঘাট পর্যন্ত। অনেক মানুষ। জনতা। যাচ্ছে আসছে। নারী-পুরুষ, মাঝি-মাল্লা, পাণ্ডা-সাধু-সন্ত স্নানার্থী-ফেরিওলা। সারি সারি ভিক্ষুক বসে আছে। কিন্তু সে কই? হঠাৎ তার মনে হল—সে কি তার সকল জীবন-গৌরব ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে সর্বাঙ্গ ধুলিধুসর করে নিয়ে ওই ভিক্ষুকদের মধ্যে বসে আছে!

সে তাদের সারির দিকে তাকিয়েই চলতে লাগল। এসে দাঁড়াল একেবারে কোর্টের কোণে। যমুনার তটে। কিন্তু কই সে?

লোকজন একটু কৌতুহলী হয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে। তার সেই বিচিত্র রঙ চোখ চুল। ভেবেছে বোধহয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কি মেমসাহেব শাড়ি পরে দেখতে এসেছে প্রয়াগের সঙ্গমতীর্থ। কিন্তু তার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে খুঁজছিল—সে কই? কোথায়?

বুকের মধ্যে আবেগ তার আর রুদ্ধ করে রাখতে পারছে না সে। ইচ্ছে করছে চিৎকার করে ওঠে 'দিব্যেন্দু' বলে।

সকল সংকোচের বাধা-বন্ধ ঠেলে সরিয়ে ফেলে এখানকার মাঝি-মাল্লা দোকানদার যারা থাকে এখানে—তাদের সে জিজ্ঞাসা করবে? জিজ্ঞাসা করবে—তাকে দেখেছ? যে এইসব কাগজ দেওয়ালে সেঁটেছে, যে রোজ এইখানে এসে কোন একটা কাগজের নীচে উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে থেকেছে—লম্বা মানুষ, কোঁকড়া চুল, বড় চোখ, কালো রঙ, ভরাট গলা—দিব্যেন্দু নাম—দেখেছ?

* * *

দেখেছে।

খোঁজ মিলল। সংকোচ ঘুচিয়ে দোকানদারের কাছে যেতেই তারা বললে।

দেখেছে বইকি। প্রতিটি দিন ভোর থেকে দুপহর বেলা পর্যন্ত এখানে বসে থেকেছে। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলে নি, আলাপ করে নি, কিন্তু চোখ সকলেরই তার উপর পড়েছিল। কিন্তু—। বারো দিন আগে, সে দিন ভোরবেলা তাকে ওই—ওইখানে ওই একটা কাগজের তলায় সে আপনার গলা আপনি কেটেছে একটা ব্লেড দিয়ে। দেখতে পাবে ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠে কাগজটার উপরে লেগেছে, দেওয়ালে লেগেছে, মাটি যদি দেখ—তবে এখনও দেখতে পাবে, রক্তে ভিজে মাটি কাদা হয়েছিল, শুকিয়ে ডেলা বেঁধে গেছে। এখনও কুত্তাগুলো উয়ার গন্ধ পায়, ঠোকরায়। দশ-বারো রোজ হয়ে গেল, এখনও রক্তের গন্ধ ওঠে।

—সে নাই? চিৎকার করে উঠল সে!

লোক কিছু জমেছিল। দোকানীর ভুরুতে প্রশ্ন জাগল।—আপনার কেউ?

—হ্যাঁ। সে তাহলে—

—জানি না ঠিক। সে গলা কেটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, ভাগ্যক্রমে এক সাধু সেই অবস্থায় তাকে দেখতে পান। স্নানে আসছিলেন তিনি। তিনি হল্লা করে লোকজন ডেকে এখানকার সিপাহীকে ভি নিয়ে গাড়ি করে তুলে নিয়ে যান। আপনি কোতোয়ালীতে যান, যেখানে বিলকুল

খবর আপনার মিলবে। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, তামাম খুন তার বেরিয়ে গিয়েছিল। আঃ—জোরদার জোয়ান—সে খুন কি লাল আর কি গরম! ওঃ হো!

সিপাহীটি বললে—হ্যাঁ। ও তো হাসপাতালে আছে। মরলে তো হয়ে গেল, বাঁচলে ওর বিচার হবে। আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। পুলিস তো ওকে গ্রেপ্তার করেছে। জামিনে আছে, ওই সাধুজী ওর জামিন দিয়েছে।

* * *

অদৃষ্টের পরিহাস?

তাছাড়া কি বলবে? নইলে যে কলঙ্করেখা দিব্যেন্দু নিজের কণ্ঠনালী ছিন্ন করে রক্ত ঢেলে রক্তাক্ততার মধ্যে অবলুপ্ত নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল, সেই লেখা ওই রক্তবর্ণের অনুরঞ্জনে অগ্নি-বর্ণ হয়ে ফুটে উঠতে চলবে কেন? দিব্যেন্দু ভাবে নি—হয়তো তার ভাববার মত মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না; ভাবে নি—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর চিকিৎসাবিদ্যায় এইভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা, মৃত্যুর কিছু পূর্বে চোখে পড়লে এবং চিকিৎসা হলে—সার্থক হয় না।

সে গোঙাচ্ছিল, ছটফট্ করছিল, সাধুটি টর্চ জ্বেলে দেখে এগিয়ে এসেছিলেন। লোকজন ডেকে-ছিলেন। তারপর হাসপাতালে এনেছিলেন। রক্তের দরকার হয়েছিল; রক্ত তিনিই দিয়েছিলেন।

বিচিত্র কথা—দিব্যেন্দুর দেহের রক্ত যে গ্রুপের, তাঁর রক্তও সেই গ্রুপের। এই বারো দিনে সন্ন্যাসী দুদিন রক্ত দিয়েছেন।

কোতোয়ালীর অফিস-ইন-চার্জ বললেন—বেঁচে সে গিয়েছে। কিন্তু দেখুন অদৃষ্টের পরিহাস—আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধে মামলা হবে—সেই মামলায় যা ঢাকতে উনি এই কাণ্ড করেছেন, তা প্রকাশ হয়ে যাবে। একখানা চিঠি পাথর চাপা দিয়ে কাছে রেখেছিলেন ভদ্রলোক; ওর হোটেলে খানাতল্লাসী করেও আর একখানা পেয়েছি। তাতে লিখেছিলেন কি জানেন? লিখেছিলেন—"আমার জীবনের কলঙ্কলেখা রক্ত ঢেলে লেপে নিশ্চিহ্ন করছি আমি। এ আমার বিষাক্ত রক্ত—নিঃশেষে নির্গত করে দিয়ে মরতে চাই। আমার এই মৃত্যু স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ। এর জন্য কেউ দায়ী নয়।"

হাসলেন কোতোয়ালীর অফিসার-ইন-চার্জ।

বিপাশা যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

বেঁচে গেছে দিব্যেন্দু। বারো দিন পার হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে মর্মান্তিক আশঙ্কার উদ্বেগটা আর নেই। কিন্তু সে ভাবছিল কোতোয়ালীর অফিসারের কথাটাই কি সত্য? অদৃষ্টের পরিহাস? দিব্যেন্দুকে আদালতে দাঁড়াতে হবে, এবং এই কলঙ্কের শীলমোহরের ছাপ এঁকে নিতে হবে?

সে হয়তো আদালতে কোন কথা না তুলে অপরাধ স্বীকার করে নিতে পারে। কিন্তু পুলিস তো উদ্ঘাটন করতে দ্বিধা করবে না। হে ভগবান!

কোতোয়ালী থেকে হাসপাতালের ঠিকানা নিয়ে সে হাসপাতালে চলল। মুহুর্মুহু চোখ ফেটে জল আসছিল। অকস্মাৎ যেন একটা চিন্তা তার মস্তিষ্কের মধ্যে খেলে গেল।

সে হবে মিথ্যাবাদিনী। মিথ্যা কলঙ্ক সে নেবে তার মাথায়। সে আদালতে গিয়ে বলবে—

উনি যে কথা বলতে চান না, সেই কথা আমি বলছি। উনি আমার স্বামী। আমরা গোপনে বিবাহ করেছিলাম। দিল্লীতে তখন আমি পড়ি। বোর্ডিংয়ে থাকি। সরকার থেকে বৃত্তি পাই পিতৃমাতৃ-হীনা কুমারী রেফ্যুজী বলে। স্বামী চাকরী করেন—এই কারণে যদি তা বন্ধ হয়, সেই ভয়ে গোপন করেছিলাম। তারপর পাঞ্চেতে যখন এলাম, তখন আর একজনের সঙ্গে প্রেমে পড়ি আমি।

কিন্তু কি করে বলবে সে? কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। বারবার চোখ মুছলে। গাড়িটা এসে প্রায় সেই মুহূর্তেই দাঁড়াল হাসপাতালে।

নামতে নামতে সে মনকে দৃঢ় করলে। বলতেই হবে। বললে—আমি বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছিলাম। এবং এই নিয়ে তার সঙ্গে কুৎসিত ঝগড়া হয়। উনি ক্ষোভে রাগে মাইথন থেকে নিরুদ্দেশ হন। আমি পরে অনুতপ্ত হয়ে ওঁকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি।

সে আফিসে গিয়ে ঢুকল।

বললে—ফোর্টের ধারে দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী—যিনি গলা কেটে সুইসাইড করতে গিয়েছিলেন—তাঁর খোঁজে এসেছি। তিনি—

ডাক্তার বললেন—তিনি এখন আউট অফ্ ডেঞ্জার, ভালো আছেন।

—আমি তাঁকে দেখতে চাই একবার।

—এখন তো ভিজিটিং আওয়ার্স্ নয়। তাছাড়া,—তিনি পুলিস কেসের আসামী, অবশ্য জামিনে আছেন।

কাতর মিনতি করে উঠল বিপাশা—প্লিজ! প্লিজ; আমি বহুদূর থেকে আসছি। বাংলাদেশ থেকে। আমি—আমি তাঁর স্ত্রী!

—স্ত্রী! কি বলছেন?

—হ্যাঁ, আমি তাঁর স্ত্রী।

—তিনি জ্ঞান হয়ে অবধি বলছেন—কেউ কোথাও নেই আমার। বিশ্ব-সংসারে আমি একা—।

—আমার উপরেই অভিমান করে। ডাক্তারবাবু! পাঁচ মিনিটের জন্য।

ডাক্তার বোধ করি বিরক্তি এবং করুণা দুয়ের জন্যই বিচলিত হলেন। একটু ভেবে বললেন—দাঁড়ান দেখি। বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন—একটু বসুন। সি-এম-ও পারমিশন দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর ঘরে এখন সেই সাধুটি আছেন। যিনি তাঁকে বলতে গেলে বাঁচিয়েছেন। এখনও যিনি তাঁর জামিনদার।

মন তার বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত। সব উত্তেজনা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বড় পরিতৃপ্ত। তাই সে বলবে। দিব্যেন্দুকে বলবে—তুমি না বলতে পাবে না। আমি তা বলব।

টেবিলের উপর মাথা রেখে সে কল্পনা করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন মনে পড়ছে—'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মক্ষিকার মত।'

আদালতে মানুষের ভিড় জমেছে। ফিস ফিস কথা, হাসি। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে—দিল্লীতে তার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। গোপনে বিবাহ করেছিলাম—

—উঠুন আপনি। স্বামীজী এসে গেছেন।

—এ্যাঁ! মাথা তুলল বিপাশা। এসে—? কিন্তু কথা শেষ হল না তার। এ কি?

—বিপাশা! তুমি! দিল্লীর স্বামীজি। যিনি তাকে মিশনারীদের হাত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের আশ্রমে।

—আপনি? আপনি দিব্যেন্দুকে বাঁচিয়েছেন?

—তুমি চেন দিব্যেন্দুকে?

ডাক্তার বললেন—উনি ওঁর স্ত্রী বলছেন।

—স্ত্রী!

বিহ্বল হয়ে গেল বিপাশা। সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে তার এতক্ষণের সেই রচনা করা মিথ্যাটি বলে গেল। তার সঙ্গে সে জুড়লে—সেই যে কনস্টিটুশন হলে কবিতা নিয়ে ঝগড়ার কথা বলেছিলাম—সে ওঁরই সঙ্গে। শুধু মিটমাট নয়, বিবাহ হয়। গোপনে।

একটি অর্ধস্ফুট ম্লান হাসি স্বামীজীর মুখে ফুটে রইল সারাক্ষণ। তিনি শুনছিলেন, না কোন দূরের কোনও কথা ভাবছিলেন—ঠিক বোঝা গেল না। শুধু বিপাশার কথা শেষ হতেই একটু বেশী হেসে ফেললেন। আশ্চর্য, চোখ দুটিও সজল হয়ে গেছে। চোখ মুছে বললেন—এমন করে ঝগড়া করো না মা। যাতে—। আবার হাসলেন, বললেন—দৈবক্রমে আমি এসে গিয়েছিলাম। আমি সন্ন্যাস নিয়েছিলাম এই প্রয়াগের ঘাটেই ব্রাহ্মমুহূর্তে। সে অনেক দিনের কথা, বাইশ বছর। প্রতি বৎসর ঐ দিনটিতে আসি, এখানে স্নান করি। ত্রিরাত্রি বাস করি, আবার চলে যাই। এবারও এসেছিলাম মা। তবে ত্রিরাত্রির বদলে পাঁচ রাত্রি হয়ে গেল—আটকা পড়েছিলাম। হঠাৎ সেদিন ভোরবেলা সঙ্গমতীর্থে স্নান করব—নামছি—কানে গেল মানুষের গোঙানি। হাতে টর্চ ছিল, জ্বেলে দেখি সবল যুবা রক্তে ভাসছে। ছুটে গেলাম। লোকজন ডাকলাম। ভগবানের কৃপা—আর কি? বেঁচে গেছে, সুস্থই প্রায় হয়েছে। যাও, তুমি যাও, দেখা করে এস। যাও।

ডাক্তার বললেন—আসুন।

বিপাশা অগ্রসর হল। তার পা আবার কাঁপতে শুরু করছে।

৬

নতুন বাড়ি হাসপাতালের। দীর্ঘ প্রশস্ত সিঁড়ি। সিঁড়িটার একধার ঘেঁষে রেলিংটা আশ্রয় করে উঠল বিপাশা। এখনও যেন পা কাঁপছে, বুকের মধ্যে আবেগটা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে।

ছোট একখানি ঘরে দিব্যেন্দুকে রাখা হয়েছিল। একটা কেবিন। দরজা খুলে ডাক্তার বললেন—মিঃ চ্যাটার্জী!

অর্ধশায়িত দিব্যেন্দু তাকিয়েছিল খোলা জানালা দিয়ে। চোখে সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি আকাশ-পাতালে ছড়িয়ে আছে, যার মধ্যে কোন কল্পনাও নেই, আছে শুধু অসীম ব্যর্থতার শূন্যতা।

আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে দিব্যেন্দু বললে—ইয়েস, ডাঃ সিন্‌হা—বলতে বলতেই সে চমকে উঠল। বিপাশা ডাক্তারকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছে। চোখের ধারা আর বাঁধ মানে নি, নেমে এসেছে। দিব্যেন্দু বলে উঠল—বিপাশা দেবী!

• •

আমি বিশ্বাস। বলে দ্রুতপদে গিয়ে সে বিছানার একপ্রান্তে বসল।

ডাক্তার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

ক্লান্ত দুর্বল দিব্যেন্দু শীর্ণ পাণ্ডুর। তার মুখে চোখে যে একটি সজীব আনন্দের বর্ণাঢ্য প্রকাশ ছিল—তা নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। বিষণ্ণ বেদনাতুর শোকার্ততার ছায়া যেন নীল আকাশের উপরে দূরস্থিত কোন ঘনকৃষ্ণ মেঘের ছায়ার মতই বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। সেই দিব্যেন্দু, দুর্বল অবশ্য, কিন্তু তার চোখের, মুখের হাসির, কথার আনন্দ-দীপ্তি ওই ছায়ার মধ্যে হারিয়ে গেছে। গলার ব্যাণ্ডেজটা খোলা রয়েছে—সেখানে একটা রক্তাভ মোটা দাগ দেখা যাচ্ছে। ওঃ, কি নির্মম ভাবেই সে নিজেকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

—আমি বিশ্বাস। বলে বসে দিব্যেন্দুর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিতেই দিব্যেন্দুর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল—চোখ থেকে দুটি বিশীর্ণ 'ধারা' নেমে এল। কোন রকমে আত্ম-সম্বরণ করে সে বললে—আপনি কেন এলেন বিপাশা দেবী আমাকে দুঃখ দিতে?

দিব্যেন্দু, এ কথা তুমি বলো না, এমন করে তুমি বলো না। না।

—না-বলে কি করব? আমার পত্র তো পেয়েছেন?

—পেয়েছি। পেয়েই ছুটে এসেছি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

—ফিরিয়ে নিয়ে যেতে? হাসল সে।—এরও পর?

—হ্যাঁ, এরও পর। তুমি পুরাতন সত্যকাম নূতন জন্ম নিয়েছ। তুমি লিখেছ,—পঙ্কবাসরের সূতিকাগৃহে তোমার জন্ম। কিন্তু তুমি পঙ্কজ হয়ে ফুটেছ, জলতল ভেদ করে আলোকের সত্যে প্রকাশ করেছ নিজেকে। তুমি মানস সরোবরের সুদুর্লভ নীল কমল। আমি শ্বেত ভ্রমরী—

—না-না-না। বিপাশা দেবী, মরতে গিয়ে মরা আমার হয় নি, ওই সন্ন্যাসী পুণ্য অর্জনের জন্য আমাকে বাঁচালেন। বাঁচতে আমাকে হবে—এই মাতৃকলঙ্ক শিরোধার্য করে জীবন আমাকে টানতে হবে। টানব। দূরে দূরান্তরে পতিতের মধ্যে অন্ত্যজের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে বাঁচব। আমার সঙ্গে আপনি নিজেকে জড়াবেন না। আবার তার চোখ থেকে নামল জলের ধারা।

বিপাশা তার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বললে—তুমি কাঁদছ? না। কাঁদবে কেন? কি প্রয়োজন তোমার জন্ম-পরিচয়ে? তুমি করবে নূতন বংশ, নূতন গোত্রের প্রতিষ্ঠা। ধর্মে পুণ্যে কর্মে বীর্যে—স্মরণীয় প্রথম পিতা। আমি সেই বংশকুলের প্রথম মাতা।

আর্তনাদ করে উঠল দিব্যেন্দু। না—না—না। তুমি ভুলে যাচ্ছ বিশ্বাস—

বিপাশা বলে উঠল—আঃ, বাঁচলাম, তুমি আমাকে বিশ্বাস বললে—

বিষণ্ণ হেসে দিব্যেন্দু বললে—ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তুমিও ভুলে যাচ্ছ—তোমার মাতামহ বংশের কোন্ মহিমময়ী কন্যা তুমি—যারা—

বাধা দিয়ে বিপাশা বললে—বললেই চুকে যায় দিব্যেন্দু ওই মিথ্যে আমি বিংশ শতাব্দীর মেয়ে—আমি বিশ্বাস করি নে। বাবা যা বলতেন—তাই সত্যি, হেরিডিটির বিচিত্র খেলায় আমার মত মেয়ে মধ্যে মধ্যে জন্মায়—আমিও তাই; সচরাচর সাধারণ থেকে আমরা স্বতন্ত্র, বিচিত্র। কালে-কালে কাল অনুযায়ী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তা বলব না—তোমার কথাকে বড় করেই উত্তর

দেব—আমি আমার বংশের মহিমময়ী সুদুর্লভা মেয়ে, আমি লোক-নিন্দা সমাজ-ভয় সমস্ত কিছুকে অবহেলায় অতিক্রম করে গোত্রহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, সত্যকামকে বরণ করে সত্যকাম-বংশ প্রতিষ্ঠা করব। এ আমিই পারি। এরই জন্যই এবার আমার নব জন্ম।

স্তব্ধ হয়ে গেল দিব্যেন্দু। আবারও কাঁদছিল সে। একটু পর ঘাড় নেড়ে সে বললে—না। তবু হয় না।

—হয়। কেন না?

—হয় না বিপাশা এইজন্য যে, যখন তোমার সন্তান তোমাকে প্রশ্ন করবে—বল মা, আমার সাত পুরুষের নাম বল। পিতামহের নাম? প্রপিতামহের নাম?

—বলব ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ভগবান চট্টোপাধ্যায়। অথবা সত্য চট্টোপাধ্যায়। হঠাৎ থেমে বললে—কোর্টে আমি এ কথা তুলতে দেব না।

—কি করে আটকাবে?

—বলব অপরাধ আমার। তুমি আমার স্বামী, আমি কিন্তু অন্যে অনুরক্তা হয়েছিলাম—

—না—না—না! হতে পারে না। হতে দেব না। সত্য আমি বলবই।

—বেশ। তাই বলো। তবু আমি আমার কথা প্রত্যাহার করব না। তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার স্ত্রী। তুমি পুরুষ, আমি নারী। তুমি সৎ, আমি সতী। তুমি পুণ্যবান, আমি পুণ্যবতী!

সে দিব্যেন্দুর হাতখানা বুকে তুলে জড়িয়ে ধরল।

দিব্যেন্দু কাঁদতে লাগল।

* * *

সেইদিনই বিকেল বেলা যখন সে এল, তখন তার অন্তর পরিপূর্ণ। এক গোছা ফুল নিয়ে এসেছে, সঙ্গে একটা ফুলদানীও এনেছে। সাজিয়ে দেবে। বইয়ের দোকান খুঁজে খুঁজে রবীন্দ্রনাথের তিনখানি কবিতার বই এনেছে। পড়বে দিব্যেন্দু এবং সে এসে শুনবে। তবে কাল-পরশুর মধ্যেই তাকে হাসপাতাল ডিসচার্জ করবে। তারপর কেস পর্যন্ত থাকতে হবে এখানে। পুলিসের কাছে খবর নিয়ে তার জামিনদারের নাম সে জেনে নিয়েছে। একজন বড় বাঙালী ব্যারিস্টার। মিঃ গুহ। তিনি নিজেই জামিন হয়েছেন, অথবা স্বামীজী নিযুক্ত করে গেছেন, তা ঠিক জানে না। তিনিও নিশ্চয় আসবেন। আসবেন নয়, ঘরে ঢুকে দেখলে, নিখুঁত স্যুটপরা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বসে আছেন। বোধ করি তিনি ঢুকবার পরই সে ঢুকল। তিনি পিছন ফিরে তাকে দেখে বললেন—কয়েক মিনিট আপনাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলতে পারি? আমি এঁর ব্যারিস্টার—কিছু কথা বলব—

দিব্যেন্দু নমস্কার করে বললে—আপনি মিস্টার গুহ? নমস্কার। বসুন।

—নমস্কার! চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তিনি।

দিব্যেন্দু বললে—উনিও থাকবেন। উনি বিপাশা দেবী—

সঙ্গে সঙ্গে বিপাশা পূরণ করে দিল—আমি ওঁর বাগ্‌দত্তা পত্নী।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন বিপাশার মুখের দিকে মিস্টার গুহ। বিপাশা একটু অস্বস্তি অনুভব করেও দিব্যেন্দুর বিছানার একপাশে বসল। ফুলদানীটা রেখে দিল টেবিলটার ওপর।

মিস্টার গুহ বললেন—আমিই আপনার জামিনদার। স্বামীজী—যে সন্ন্যাসী আপনাকে বাঁচিয়েছেন বলতে গেলে, তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

দিব্যেন্দু বললে—জানি। আজও সকালে বলে গেছেন—মিস্টার গুহ তোমার জামীন আছেন। কেসেও তিনি ডিফেণ্ড করবেন।

—আমার আরও একটা পরিচয় দিতে পারি—যেটা আপনার জানা। বাইশ বছর আগে এখানে একটা কেস হয়েছিল—এলিস চ্যাটার্জি ভার্সাস শরদিন্দু চ্যাটার্জি। চার্জ ছিল চিটিং অ্যাণ্ড অ্যাডালট্রি। সে কেসে আমি শরদিন্দু চ্যাটার্জির পক্ষের কাউনসেল ছিলাম।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালে দিব্যেন্দু। মুখে তার কোন কথা বের হল না। একটু পর সামলে নিয়ে সে বললে—তিনি—তিনি—

তার কথায় বাধা দিয়ে মিস্টার গুহ বললেন—তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। বিলেতে একসঙ্গে ছিলাম প্রথম এক বছর। বলতে পারেন—একটা দল। সেম লট যাঁকে বলে। আমি সব জানি। আজ তিনি চেঞ্জড্ ম্যান। অবশ্য যে শিক্ষা, যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তাতে পাথরও বদলায়, গলে বোধ করি জল হয়।

তিনি বেঁচে আছেন?

কথার জবাব মিস্টার গুহ সরাসরি দিলেন না। বললেন—তিনি একটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন—কোর্টে এফিডেবিট করে স্টেটমেণ্ট আমাকে দিয়ে গেছেন। তার মধ্যে তিনি সব অপরাধ স্বীকার করেছেন। পুলিস আপনার হোটেলের রুম থেকে এলিস ভার্সাস শরদিন্দু চ্যাটার্জির মামলার যে নথিপত্র সংগ্রহ করেছে—কেস যদি গড়ায়ই তবে সেটা আমি দাখিল করব ওটার পরিপূরক হিসেবে।

দিব্যেন্দু উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল। প্রশ্ন করলে—তিনি কোথায়?

মিস্টার গুহ হেসে বললেন—উত্তেজিত হবেন না। তিনি আছেন। আপনি ফোর্টের দেওয়ালে যে কাগজগুলো মেরেছিলেন—"লাবণ্য দেবী—মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে"—সেই দেখেই তিনি আপনাকে চিনেছিলেন। এই খামটা ধরুন। ওই এফিডেবিট করা স্টেটমেণ্টের কথাই এতে আপনাকে সম্বোধন করে লিখেছেন। এ তাঁর কনফেশন। পড়ে দেখবেন। কিন্তু উত্তেজিত হবেন না। কাল আপনাকে ডিসচার্জ করবে। আমি হোটেল ঠিক করে রাখছি। আপনার বাগ্‌দত্তা এসেছেন—আমি নিশ্চিন্ত। আপনি ওঁর উপর নজর রাখবেন।

চিৎকার করে উঠল দিব্যেন্দু—মিঃ গুহ, বলে যান তিনি কোথায়?

—ওরই মধ্যে পাবেন।

—আমার মা?

—তিনি স্বর্গের দেবী। মিস্টার গুহ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন এবং বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন—স্টেটমেণ্টে সবই আছে।

আকুল আগ্রহে কম্পিত হস্তে খামখানা ছিঁড়ে ফেললে দিব্যেন্দু!

নয়

তুমি আমার পুত্র, আমি তোমার পিতা। কিন্তু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা বলবার অধিকার আমার নেই; সাহসও নেই। সম্ভবত মৃত্যুর পর যদি পরলোক সত্য হয়, তবে তোমার প্রদত্ত পিণ্ডের জন্য আমার বিদেহী আত্মাও সম্মুখীন হতে সাহস পাবে না। আজ বেঁচে থেকেও ছদ্মনামের অন্তরালে ঘুরে বেড়াই। সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

হাসপাতালে তোমার পাশে বসে থেকেছি, তুমি যখন চেতনাহীন তখন কেঁদেছি, তোমার জ্ঞান ফিরলে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করে সাহস সঞ্চয় করে বলতে চেয়েছি—সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চাইলেই তিলে তিলে সঞ্চয়-করা সাহস যেন শূন্যে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে আতঙ্ক হয়েছে, এ কথা শুনলে তোমার ওই সদ্য শুকনো কণ্ঠনালীর ক্ষত আবার ফেটে যাবে, এবং আমার যে রক্ত নূতন করে তোমার দেহে সঞ্চারিত করা হয়েছে, নিদারুণ ঘৃণায় তা উদ্গীরিত হয়ে যাবে।

আমি তোমার পিতা—তুমি আমার সন্তান—আমার ঔরসজাত, আমার বিবাহিতা সতীসাধ্বী হিন্দু পত্নী লাবণ্যের পুণ্য গর্ভজাত। তুমি পবিত্র, তুমি শুদ্ধ, তুমি পুণ্যফল। আমি পাষণ্ড, আমি কামার্ত, রূপমোহান্ধ; শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্যের প্রচ্ছদের অন্তরালে ছদ্মবেশী নরপশু। বোধ করি, বংশের মধ্যে ভাল ও মন্দের ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়—তার মধ্যে ওই মন্দটিই ছিল আমার জীবন-স্রোতের উৎস। আমি যেমন মন্দটি পেয়েছি, তেমনই তুমি পেয়েছ ভালোটি। এলাহাবাদে আমার সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন আমি প্রতি বৎসর আসি স্নান করতে। গোপনে আসি, গোপনে যাই। কারণ, এখানে আমার অনেক লজ্জা। এবার এসে দেওয়ালে ওই লেখা দেখে চমকে গেলাম। "লাবণ্য দেবী! মা, তোমার ছেলে দিব্যেন্দু তোমাকে খুঁজছে।" সারি সারি। তোমাকে দেখেই চিনলাম। দেরি হল না। তুমি আমার ঔরসজাত—অবিকল আমার যৌবনের প্রতিমূর্তি। আমি আর ফিরতে পারি নি দিব্যেন্দু। তোমার সম্পর্কে একটা শঙ্কা, একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠা আমাকে বিচলিত করেছিল। তোমার মুখ-চোখ, তোমার পদক্ষেপ আমাকে বলে দিয়েছিল, তুমি এমনি একটা কিছু করবে। যে ছেলে এমন করে সমাজ-সংসার কর্তৃক অপবাদ-লাঞ্ছিতা পরিত্যক্তা মাকে খোঁজে, পথের ধারে বসে থাকে—সে সেই মায়ের জন্য না-পারে কি? এবং সেই কারণেই তোমার সম্মুখীন হতেও পারি নি। শুধু তোমার পিছনে পিছনে ঘুরেছি। ঘুরেছি সর্বত্র। সেদিন কয়েক মিনিট, বোধ করি বিশ মিনিটের এদিক-ওদিকে, এটা ঘটে গেল। সেদিন তুমি কিছু আগে এসেছিলে সঙ্গমের ঘাটে। আমি যখন এলাম তখন—।

—হে ভগবান! যেন আর্তনাদ করে উঠল দিব্যেন্দু—আমি চিনতে পারলাম না?

—আমার মনে হয়েছিল। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। তোমার এই দাড়ী-গোঁফে—। আমি যাই—

আমি যাই দেখি—

—না। বিয়াস তুমি যেয়ো না। আমার মধ্যে একটা ক্রোধ জেগে উঠছে। বিয়াস, আমার মা—!

সে কাঁদতে লাগল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগল। তারপর বললে—বিয়াস, তুমি পড়, আমি শুনি।

বিপাশা পড়ে গেল।

ডাক্তার হাসপাতালে যখন বললেন—রক্ত চাই, কে রক্ত দেবে? আমি বললাম—আমি। ডাক্তার বললেন—সাধুজী, ওর গ্রুপের সঙ্গে মেলা চাই তো। আমি বলেছিলাম—দেখুন, ঠিক মিলবে। পরমাত্মা বলছেন মিলবে। মিলেছিল। আমি জানতাম যে!

যাক। এখন কোর্টে যা এফিডেবিট করেছি—যা আমার জীবন-সত্য, আমার দুর্বলতার, লজ্জার কথা, যা একদিন কোর্টে বলতে পারি নি—তাই আজ বলছি। যেদিন তোমার সতী-সাধ্বী মা আমাকে কলঙ্কলজ্জা ও জেল থেকে বাঁচাবার জন্য নিজে কলঙ্কিনী অপবাদ গ্রহণ করেছিলেন—সেদিন আমি চেষ্টা করেও বলতে পারি নি। বলতে পারি নি, আমি জন্ম-পাষণ্ড।

এমন পাষণ্ডের শিক্ষাতেও বোধহয় পাষণ্ডত্বের মোচন হয় না। এমন শিক্ষিত পশু সকল কালে সকল দেশেই ছিল এবং আছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কালের একটা বাতাস আসে, অথবা এমন কিছু একটা হয় বা আসে—যখন শিক্ষা সভ্যতা দর্শন সব যেন এর সহায়তা করে।

আমার প্রথম যৌবনে এমনই একটা কাল এসেছিল, হাওয়া বয়েছিল। অশিক্ষিতা বলে বিবাহিতা পত্নী ত্যাগ করে শিক্ষিতা পত্নী গ্রহণের একটা হিড়িক পড়েছিল। মুসলমান হয়ে তালাক দিয়ে স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা এবং আবার শুদ্ধি করে হিন্দু হওয়ার চলনটা ওই সময়েই। বিবাহ করে বিলেত গিয়ে সেখানে আবার বিবাহ করার নীচতা আমাদের বরাবর ছিল—রবীন্দ্রনাথের প্রভাতকুমারের গল্পে পাবে, খোঁজ করলেও অনেক পাবে। এ সময় তার ঢেউটা বেড়েছিল। বিবাহিত জীবনে প্রেম বিস্বাদ হয়ে গেছে তখন। চন্দ্রমুখীর প্রেম খুঁজে বেড়াই। বিবাহের চেয়ে বড় যে প্রেম, তার স্বপ্নে মশগুল। সাহিত্যে যৌবনের পূজায় নারীর রূপ, নারীর দেহ-কোমলতা, তার কটাক্ষের উপকরণ সংগ্রহের ঢেউ উঠেছে।

আমার এক ধনী বন্ধু-পুত্র, তিনি পত্নী-ত্যাগ করে নবপত্নী গ্রহণ করলেন। আমি উৎসাহী সমর্থক এবং বরযাত্রী ছিলাম। বন্ধুর পিতা অনুতপ্ত হয়ে পরিত্যক্তা বধূকে অর্ধেক সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তা নেন নি। হাসিমুখেই বলেছিলেন—না।

এক বন্ধু অভিনেত্রী বিবাহ করলেন। তাতেও ছিলাম বরযাত্রী। রেজেস্ট্রি বিবাহ। খাতায় সাক্ষী হিসাবে সই আছে আমার। কিছু মানি-না'র কাল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ইওরোপের ঢেউ এসেছে। জীবনপাত্রে মদিরা পূর্ণ করে পান করে নাও আকণ্ঠ। হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়। এই কালের মানুষ আমি, তার উপর পাষণ্ড। হয়তো জন্ম-পাষণ্ড। এবং সে সময় আমার মত অনেক বিদগ্ধ পাষণ্ড প্রকাশ্য রাজপথে ধুলো উড়িয়ে বেড়ায়। সব ঝুট হ্যায়।

যাক, অনুক্রম রেখে বলি। আমার বিচার তুমি করো। নিজের অন্তর্জ্বালা মোচন করো। ধৌত করে নিয়ো আমার চোখের জলে। আমার স্টেটমেণ্ট—তোমার বিচারের সময় তোমার কথার সঙ্গে একত্রিত করে তোমার জীবনকাহিনী সম্পূর্ণ করে নিয়ো।

—আমাদের বাড়ি বোধ হয় ছিল হুগলী জেলায়। পিতামহ দেশত্যাগ করেছিলেন। চাকরি হয়েছিল উপজীবিকা। বাপ-মায়ের এক সন্তান আমি। মানুষ আবাল্য কলকাতায়। ফরাসী ধরনে হাসি, বিলিতি ধরনে কাশি, কথা বলি বেঁকিয়ে, পরিহাস করে উড়িয়ে দি সবকিছুকে—ঈশ্বর চরিত্র সমাজ সংস্কার সব কিছু। সে বৈদগ্ধ্য আজও আছে। হয়তো বেড়েছে। কিন্তু সেদিন যেন এর রূপ ছিল আরও তীক্ষ্ণ, আরও সর্বনাশা। চরিত্রকে ভ্রষ্ট করে তখন বাহবা দিতাম আমরা নিজেরাই নিজেদের। আমি ওই বিদগ্ধ দলের একজন।

অবিদগ্ধেরা যখন চরিত্রহীনতার পথে হাঁটে, তখন তারা ভিড় বাড়ায় দেহব্যবসায়ের পল্লীতে। ডাকাতি করেও তারা নারীর অপমান করে। জবরদস্তি হরণ করে। আর বিদগ্ধেরা যখন চরিত্রহীনতার পথে হাঁটে, তখন তারা ভদ্রজনের লক্ষ্মীর সংসারে রাবণের মত তপস্বীর ছদ্মবেশে দেখা দিয়ে সর্বনাশ করে। ইন্দ্রের মত গুরুর ছদ্মবেশ ধরে অহল্যাকে পাষাণী করে।

আমি বিদগ্ধ। তখন শিবপুর থেকে বি-ই পাস করেছি। চাকরি পেয়েছি রেলওয়েতে। বাবা-মা দুই-ই বিগত হয়েছেন। অর্থ কয়েক হাজার বাবা রেখে গেছেন। চাকরি করি। সন্ধ্যায় বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় বসি, অট্টহাস্যে, কথার ফুলঝুরিতে মজলিশ হয়ে ওঠে সোমরস-গন্ধ-ভরপুর। কেটে যায় অর্ধরাত্রি। এক একদিন শেষ রাত্রি পর্যন্ত। ওঠবার সময় বলি—আনন্দম্! আনন্দম্! আনন্দম্!

এর উপর সুযোগ পেলাম বিলেত যাবার। সাহায্য করবেন রেলওয়ে কোম্পানি! খুশি হয়ে উঠলাম।

এরই মধ্যে তোমার মায়ের গান শুনলাম। দেখলাম। ভবানীপুরে আমার এক বন্ধু থাকতেন, তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। পাশের বাড়িতে অপরূপ কণ্ঠের গান শুনলাম। ঘরের জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখলাম। সে কন্যা অপরূপা মনে হল। মনে হল, এই কন্যাকে জীবনে না পেলে জীবনই বৃথা। তোমার মাতামহ মাত্র কয়েকদিন হল তখন বীরভূম থেকে ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় এসেছেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। ভাড়া নিয়েছেন ওই বাড়ি।

এরপর —।

থাক। তোমার মায়ের আশ্চর্য বিস্ময়কর নিঃশব্দ আঘাতহীন আঘাত আমার পূর্বের আমি-কে যেন মুচড়ে দুমড়ে সব নিঃশেষ করে দিয়েছে, রেখেছে শুধু কাঁদবার শক্তিটুকু, আর হায় হায় করবার শক্তিটুকু! তাছাড়া তুমি আমার পুত্র। সে সব বিশদ বিবরণ থাক। তবে শেষ পর্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে মাতামহের সঙ্গে আলাপ করলাম! তাঁকে দেখেছ—জান। তবে সেকালের তাঁকে জান না। ছিলেন ইংরিজীনবীশ—তখন হচ্ছেন নতুন করে হিন্দুনবীশ দুই মিশিয়েছেন। বাক্যে পটু ছিলাম। বাক্য দিয়ে ঐক্যের গ্রন্থিবন্ধন বিদ্যায় পারঙ্গম ছিলাম। তাছাড়া, ইংরাজী লেখাপড়ায় বিজ্ঞানেও দখল ছিল। এরই মধ্যে যেদিন তোমার মাকে দেখলাম—সেদিন সত্যই যেন আমি

আত্মহারা হয়ে গেলাম। এ কি অপরূপা মেয়ে! এ কি তার কণ্ঠস্বর! মনে হল, এই কন্যাকে না-হলে জীবন বৃথা, আমি বাঁচব না।

পাত্র হিসাবে (যে হিসাব করে পাত্র বিচারে—অবস্থা শিক্ষা স্বাস্থ্য) তার কোনটায় অযোগ্য ছিলাম না। সুতরাং বাধা পাইনি অগ্রসরের পথে—উৎসাহিতই হয়েছিলাম। তোমার মা না করেন নি। তিনি ছিলেন আশ্চর্য স্থির, তিনি এতটুকু আকর্ষণ করতেন না নিজের দিকে। ঈশ্বর-ভক্তি ছিল বেশী। ওঃ, সেইটি যদি না থাকত!

এই অবস্থায় দিব্যেন্দু, একদিন তোমার মাতামহের কাছে বন্ধু-মারফৎ জানালাম কথাটা এবং অনুমান করতে পার—সহজেই সম্মতি পেলাম। এর আগে একদিন তোমার মাকে বলেছিলাম—

—লাবণ্য, তোমাকে যদি বিবাহ করতে চাই, তবে তুমি মত দেবে তো?

লাবণ্য কোন কথা না বলে উঠে চলে গিয়েছিল।

তোমার মাতামহের মত যেদিন পেলাম, সন্ধ্যায় একটি সুযোগে বললাম—কি? আজ মত দেবে তো?

সে হেসে চলে গিয়েছিল এবং বলেছিল—নিশ্চয়।

অথচ সে ঘরে বান্ধবীদের মধ্যে চঞ্চলা ছিল—তোমার মামীরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় পুজোর সময় তোমার মাতামহ গেলেন পুরী। তাঁদের অনুসরণ করলাম। তখন এমনই আমার আকর্ষণ যে, লাবণ্যকে না দেখলে থাকতে পারি নে। এই পুরীতে সমুদ্রতটে দুজনে দুজনের হাত ধরে বসে থাকতাম। অনুভব করতাম সেই শরাঘাতের জ্বালা—যাতে মহাকালের ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে হাত ছাড়িয়ে উঠে যেত লাবণ্য। বুঝতাম সে নিজেকে সংযত করছে। এরই মধ্যে একদিন যাওয়ার কথা ভুবনেশ্বর। সব ঠিক। হঠাৎ লাবণ্যের হল একটু জ্বর। যাওয়া বন্ধ হতে হতে হল না। আমাকে রেখে তারা গেলেন—সকালে যাচ্ছেন বিকেলে ফিরবেন। দিনের বেলা, কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র—তার উপর আমি ভাবী জামাতা। সামনে কার্তিক মাস, পরে অগ্রহায়ণেই বিবাহ।

এই নির্জন সুযোগে দিব্যেন্দু, আমার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বৈশাখের অপরাহ্ণে কালো মেঘের মত যেন ফুলে উঠল। নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারলাম না। লাবণ্য অসহায়, তার উপর সেও রক্তমাংসের গড়া মানুষ—আমি তার ভাবী স্বামী।

হয়তো সেদিন সে নির্জনতার মধ্যে তারও মনে রঙ ধরেছিল। তবু সে বিধানকে বিস্মৃত হয় নি। বলেছিল—চল, তবে মন্দিরে চল। সেখানে জগন্নাথকে সাক্ষী রেখে তাঁর প্রণামী মালা নিয়ে বদল করব। বিমলা মায়ের মন্দিরে গিয়ে প্রসাদী সিন্দুর নেব। সেই সিন্দুরের একটি ছোট্ট বিন্দু দিয়ে দেবে আমার সিঁথিতে। সেই হবে আমাদের বিবাহ। তারপর আমাদের বাসর। তাই করেছিলাম।

এবং বাড়ি ফিরে সারাটা দ্বিপ্রহর বাসর পেতেছিল সে।

দিব্যেন্দু, আমাদের সামাজিক বিবাহ হয়েছিল দু মাস পর—কার্তিকের পর অগ্রহায়ণে। সেই কারণে সামাজিক বিবাহের তারিখ থেকে তোমার জন্ম আট মাস পর।

লাবণ্য কোনদিন আমাদের সামাজিক বিবাহের উপর গুরুত্ব দেয় নি। তার কাছে আসল বিবাহ ছিল সেই জগন্নাথ সাক্ষী রেখে মন্দিরে বিবাহ।

সেই কারণে সে যখন কোর্টে সাক্ষী দেয়—। থাক, ক্রম-ভঙ্গ হচ্ছে।

এরপর চলে গেলাম বিলেত। লাবণ্য ফিরে গেল তোমার দাদামশায়ের কাছে।

বিলেতে কয়েকদিন যেতে-না-যেতে আপসোস হল। বিয়ে কেন করে এলাম। নিজেকে আজ জিজ্ঞাসা করি, এমন করে লাবণ্যকে বিবাহ করবার জন্য পাগল হয়েছিলাম কেন? বাঁধন পড়বার মত মন আমার ছিল না। বিলেতের স্বপ্নও তো সামনে ছিল—তবে? এক-একসময়ে মনে হয় আমি সত্যই তাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু আমার পাশব প্রবৃত্তি বহু-ভোগের আকাঙ্ক্ষা আমার ভালবাসার চেয়ে শক্তিতে প্রবলতর ছিল। সেটা সত্য হোক বা না হোক দিব্যেন্দু, এটা নিশ্চিত সত্য যে, আমি বিলেত চলে যাব, কুমারী লাবণ্যকে অন্য কেউ বিবাহ করবে এ কল্পনা আমার সহ্য হয় নি। লাবণ্য আমার!

বিলেতে এসে ছ মাস যেতে না যেতে আমার মন বিদগ্ধ চরিত্রহীন বল্গাহীন ঘোড়ার মত ছুটতে লাগল। সাহেবীয়ানায় পুরনো বন্ধুরা হেরে গেল। মদ্যপানে পোক্ত হয়ে গেলাম। সঙ্গিনী নিয়ে সমুদ্রতটে সারাদিন পড়ে থাকতে ছিল সব থেকে শখ। তবে পড়াশুনায় ভাল ছিলাম। বৃত্তিও একটা পেলাম। এরই মধ্যে বাঁধা পড়লাম এলিসের সঙ্গে। এলিস আমার প্রফেসরের মেয়ে। তার নিন্দা করতে পারব না। কিন্তু ওরা স্বতন্ত্র জাত। আচার, আচরণ বোধ—সব আলাদা। এলিসকে নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছিল একজন ইংরেজ ছেলের সঙ্গে। এতেই হয়ে গিয়েছিলাম উন্মাদ। হিত-অহিত ন্যায়-অন্যায় কোন জ্ঞান রইল না। হয়তো প্রয়োজন হলে সেই ইংরেজ ছেলের সঙ্গে ডুয়েল লড়েও মরতে পারতাম। জ্ঞান ছিল না যে লাবণ্য আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এই সময় চিঠি এল—সংবাদ এল তোমার জন্মের! মনে পড়ে গেল। মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম। গোপন করব না—মনে মনে তোমাদের মাতা-পুত্রের মৃত্যু কামনা করেছিলাম। সারাটা দিন মদ্যপান করেছিলাম। তারপর অকস্মাৎ মনে হয়েছিল—তাই তো! যে মেয়ে বিবাহের পূর্বে আমাকে আত্মদান করেছে, সে অন্যকে করে নি তার প্রমাণ কি? এ পুত্র আমার তার প্রমাণ কি? জানতাম সম্পূর্ণ মিথ্যা। নিজেই প্রতিবাদ করেছি নিজের। কিন্তু আমার পাষণ্ড সত্তা তা শুনবে কেন? সে বললে—এই তো সুযোগ। এই যে সন্তান, এ তো প্রকৃত পক্ষে সাত মাসে। নামে আট মাস। কেন নেব দায়িত্ব? লিখে দিলাম তাই। উত্তর এল—আমরা আজ হইতে জানিব লাবণ্য বিধবা। তুমি আমাদের কাছে মৃত! হু-র-রে! বলে নিজের ঘরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। দুটো ডাকে আর চিঠি আসে নি। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এলিসের পিছনে ছুটলাম। এবং একদা তাকে বিবাহও করলাম।

দেশে এসে চাকরি নিয়েছিলাম উত্তর প্রদেশে। রেলেরই চাকরি। বেতন অনেক। সুখেই ছিলাম। এলাহাবাদে আমার খুব খাতির ছিল। স্ত্রী আমার বিদেশিনী শ্বেতাঙ্গিনী। আমি যেন বিজয়ী বীর। নিশ্চিন্তই ছিলাম—লাবণ্য বা তোমার দাদামশাই এ কথা প্রকাশ করবেন না। এমন অনেক আছে আমাদের দেশে। এদেশের হতভাগিনীরা স্বামীর সুখের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে

লোকলোচনের অন্তরালে ভগবানকে ডাকে। বলে—এ জীবনের শেষ কর।

তার জন্য আমার আপসোস ছিল না। জীবন চলেছিল জোয়ারের নদীর মত। হঠাৎ ভাঁটা পড়ল।

তোমার বড় মামা রেলের চাকরে। তিনি বদলী হয়ে এসেছিলেন এলাহাবাদ। আমার তাঁকে মনে ছিল না। জীবনে একবার কয়টা দিনের জন্যে দেখা। অফিসার গ্রেডের লোক হলেও নীচের অফিসার। কে মনে রাখে? তাঁর মুখ, তাঁর নাম, কিছুই মনে ছিল না। কিন্তু তিনি চিনেছিলেন। তিনি লাগালেন আগুন। এ আগুন আমার প্রাক্তন। আমার কর্মফল। সে চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হল না। বিয়ের ফটোগ্রাফও পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এলিস আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে, কৈফিয়ৎ চাইলে। সেটা ১৯৩৫ সাল।

আমি অস্বীকার করলাম। তার সন্দেহ গেল না।

সে ফটোটা দেখিয়ে বললে—এ কে তবে? কন্কুবাইন? ইয়োর রাধা? এলিসকে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখে শুনে রাধার উপর সে ঘৃণা প্রকাশ করেছিল।

আমি সহ্য করতে পারি নি—তার গালে চড় মেরেছিলাম। বাস্, হয়ে গেল। ওদের প্রেম আছে, কিন্তু সে প্রেমে ক্ষমা নেই। অন্তত আমাদের দেশে যে ক্ষমা, তা নেই।

এরপর ওখানকার ইংরেজরা এক হল। এলিসের বাপ এল। এলিস মামলা করলে। এবং সাক্ষী মানলে তোমার মাকে। তোমার মা বলেছিলেন, আমি যাব না।

ব্যারিস্টার গুহ ছিলেন আমার পক্ষে। তিনি পথ খুঁজছিলেন। আমি তখন মরিয়া। বললাম —গুহ, পথ খুঁজো না। পথ পেয়েছি।

সে বললে—কি?

আমি রিভলভারটা বের করলাম।

সে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে বললে—না।

শুধু তাই নয়, আমাকে ঘরে বন্দী করে রেখে দিল। তারপর একদিন বললে—আমি আজ বেনারসে যাচ্ছি। ঘুরে আসি, যদি পথ না পাই তো রিভলভারটা তোমার হাতে তুলে দেব।

সে তোমার মায়ের কাছে গিয়েছিল।

পরের দিন কেসের শেষ দিন।

ফিরে এসে বলেছিল—ঠিক আছে। তবে প্রমিস্ মি, যা বলব তাই করবে। বলেছিলাম—করব।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালাম। গুহ বললেন—লাবণ্য দেবী সাক্ষী দেন নি। তাঁর সাক্ষ্য সব থেকে জরুরী। তিনি এসেছেন—তাঁকে ডাকা হোক।

লাবণ্য এসে দাঁড়াল।

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। গুহকে বিশ্বাসঘাতক ভাবলাম। ভাবলাম, পুলিসের ঘুষ খেয়ে অথবা তার প্রসাদলাভের জন্যে—

লাবণ্য তখন বলছে—না, ওঁর সঙ্গে যে বিবাহের অনুষ্ঠান আমার হয়েছিল—তা অসিদ্ধ। স্ত্রী-

লোকের আমাদের দেশে দুবার বিবাহ হয় না। তার দু মাস আগে আমার সঙ্গে অন্য একজনের বিবাহ হয়েছিল গোপনে। সাক্ষাৎ ভগবান তার সাক্ষী।

পুলিসের উকিল বললেন—তিনি কে? নাম কি?

লাবণ্য বললে—তিনি উনি নন।

—আপনি এঁর বাড়িতে এক মাস ছিলেন? কি অধিকারে?

লাবণ্য কম্পিত কণ্ঠে বললে—রক্ষিতার অধিকারে। নইলে—। আর সে বলতে পারেনি।

আমি, দিব্যেন্দু, চেতনা হারাই নি। জ্ঞান হারিয়েছিলাম। চোখে দেখেছিলাম, জগন্নাথের সেই মন্দির। সেই স্বর্ণচূড়া। তার মধ্যে লাবণ্য আর আমি। তার হাতে মালা—আমার হাতে মালা।

মামলার ফল জান।

কিন্তু তোমার মা? গুহের ইচ্ছা ছিল আমাদের সে আবার মিলিত করে দেবে। কিন্তু লাবণ্য ডক থেকে নেমে জনারণ্যে হারিয়ে গেল।

তার বাবা ভাই লজ্জায় কোর্ট থেকে চলে গিয়েছিল। তার জন্য অপেক্ষাও করে নি। লাবণ্য—সে-ও কারও জন্যে অপেক্ষা করে নি। তাই কি সে করে? তাকে তুমি মিথ্যা খুঁজতে গিয়েছিলে এলাহাবাদে জঘন্য পল্লীতে। সে কি তাই যেতে পারে? সে যথাস্থানে গিয়েছিল।

না—মরে নি।

সন্ন্যাসী হয়েছিলাম এর পর। আর কোন্ পথ ছিল বল?

হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসের পথেই ওকে আবিষ্কার করলাম। কিন্তু সম্মুখে যেতে পারি নি। তাকে দেখলাম জগন্নাথে।

জগন্নাথের মন্দির-দ্বারে ভিক্ষা করত।

আমি সম্মুখে যেতে পারি নি। মস্তিষ্কের তার বিকৃতি ঘটেছে। ভাবে জগন্নাথ তার স্বামী। আজও তার তেজ বহ্নির মত। আমি একখানা ছোট বাড়ি করিয়ে পাণ্ডাদের টাকা দিয়ে বলেছিলাম—প্রভুর স্বপ্নাদেশে সেবাইত পুরীর মহারাজা তাঁর জন্য এই বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন। আবেদন করেছেন, ওখানেই তাঁকে থাকতে হবে। মন্দির থেকে প্রসাদ যায়। কিন্তু আমি তার সম্মুখে যেতে পারি নি। সে মুহূর্তে যা সম্মুখে পাবে, তাই দিয়ে নিজেকে আঘাত করবে।

তুমি পার তো তোমার মাকে ফিরিয়ে এনো।

আমার শেষ। আমাকে খুঁজো না। পাবে না।—

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

দশ

এক মাস পর।

পুরীর সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়াল বিপাশা এবং দিব্যেন্দু।

কেসে দিব্যেন্দু খালাস পেয়েছে। বিচারক সাবধান করে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা সর্বাগ্রে

এসেছে পুরীতে।

পাণ্ডা বললে—এই বাড়ি।

ছোট্ট সুদৃশ্য একখানি একতলা বাড়ি। দরজাটি বন্ধ।

ভিতরে গান গাইছিল কেউ নারীকণ্ঠে। মীরার ভজন।

অপূর্ব সে সঙ্গীত। অপূর্ব সে আত্ম-নিবেদন।

গান শেষ হতেই দিব্যেন্দু বললে—ডাকুন।

—না বাবু। একদম পাগল। চিৎকার করে উঠবে। নিজেকে জখম করে ফেলবে। ঘরের মধ্যে যখন গান করেন তখন বেশ। কিন্তু বাইরে এলেই উন্মাদ।

—তবে?

—চলুন, ফিরে চলুন বাবু। হোটেলে চলুন। ও আর কি দেখবেন?

—কেন?

—পাগল। ওই—ওই বের হচ্ছেন বাবু মাতাজী। সরে আসুন।

বলতে বলতেই দরজা খুলল। হাতে একটা ভাঁড়—সে এক অর্ধ-নগ্নিকা, মুণ্ডিতকেশা, কঙ্কালসার নারী, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। নগ্নতার জন্য লজ্জা নাই। ভাঁড়ের ওই জল ছিটিয়ে পা দিয়ে দিয়ে বের হয়ে এল। হঠাৎ বসল। তারপর কাতর করুণ কণ্ঠে বলে উঠল—আঃ—মানুষকে ভজলে কলঙ্ক হয়, ভগবানকে ভজলে পাথর হয়। পৃথিবী অশুচি হয়। আমার কি হবে গো! আমি কি করব গো!

ছুটে গেল দিব্যেন্দু—মা—মা—মা! সঙ্গে সঙ্গে বিপাশা। বেদনায় দর দর ধারায় তার চোখে জলধারা বইছিল।

অর্ধনগ্নিকা চমকে উঠল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে উঠে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকল এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে উঠল—ছুঁয়ো না। আমাকে ছুঁয়ো না। না—না—না!